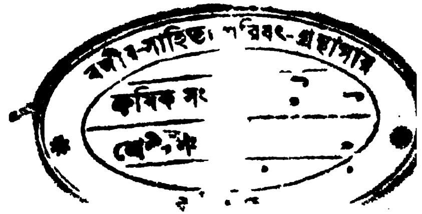
ওঁ



'আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসাংতিমিরবারবারকঃ।
স্তোতয়ন্বিজয়তাং বিপশ্চিতা
মচ্ছিবা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ'





আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্রত্য ঋষি বিদ্যালয় হইতে

ব্রহ্মচারিগণ দ্বারা পরিচালিত



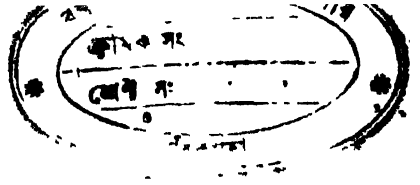
১৯শ বর্ষ—১৩৩৩

সম্পাদক—শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী

বার্ষিক মূল্য—২৲]

[প্রতি সংখ্যা ৶৹

মুদ্রাকর—সতীশ ব্রহ্মচারী
যোগমায়া-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্
সারস্বত মঠ, যোরহাট, আসাম



সূচী

—:*:—

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ | বৈশাখ | প্রথম খণ্ড
সমষ্টি সং ১৯৩ | | প্রথম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণম্

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৬১।১

—*—

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—উষো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতা
স্তোমং জুষস্ব গৃণতো মঘোনি।
পুরাণী দেবি যুবতিঃ পুরন্ধি-
রনু ব্রতং চরসি বিশ্ববারে॥

ওগো উষা, অন্নপূর্ণা, হোমশিখা জ্ঞানবেদিকার—
কবি-চিত-উচ্ছ্বসিত, গরবিণী, ধর উপহার!
পুরাণী তরুণী তুমি, লীলাময়ী, ওগো কমনীয়া—
বহিতেছ ব্রত নিত্য অকুণ্ঠিতা বিশ্ববরণীয়া!

উষো দেব্যমর্ত্যা বি ভাহি
চন্দ্ররথা সুনৃতা ঈরয়ন্তী।
আ ত্বা বহন্তু সুযমাসো অশ্বা
হিরণ্যবর্ণা পৃথুপাজসো যে॥

হে অমৃতা, দীপ্তিময়ী, রোদসীরে কর গো ভাস্বর,
জ্বলুক্ সোণার রথ—দিকে দিকে কেঁপে যাক্ স্বর!
আছে যত ভীমবেগ অশ্ব তব হিরণ-বরণ,
আজিকে তোমারে তারা, সন্তর্পণে করুক বহন।

উষঃ প্রতীচী ভুবনানি বিশ্বা
ঊর্দ্ধা তিষ্ঠস্যমৃতস্য কেতুঃ।
সমানমর্থং চরণীয়মানা
চক্রমিব নব্যস্যা ববৃৎস্ব॥

এ বিশ্বভুবন পানে টিপি-টিপি আসিতে নামিয়া
অমিয়-সঙ্কেতে বহি—ঊর্দ্ধপথে রহিলে থামিয়া!
এক্-ই পথ বাহি তুমি, ওগো উষা, যেতে বুঝি চাও?
নবীনে নন্দিয়া নিতি চক্র হেন আবর্ত্তিয়া যাও!

অব স্যূমেব চিন্বতী মঘোনী
উষা যাতি স্বসরস্য পত্নী।
স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা
আন্তাদ্দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ॥

আঁধার-বসনখানি বিশ্বতনু হতে চয়নিয়া
ওই বুঝি যায় উষা—গরবিণী সবিতার প্রিয়া!
সুভাগিনী, সুনিপুণা, সুরলোক ছিল উজলিয়া—
নীলিমা-আঁচল ছাড়ি শ্যামা অঙ্গে পড়িল ঢলিয়া।

অচ্ছা বো দেবীমুষসং বিভাতীং
প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্।
ঊর্দ্ধ্বং মধুধা দিবি পাজো অশ্রেৎ
প্র রোচনা রুরুচে রণ্বসংদৃক্ ॥

তোমাদেরি আঁখি 'পরে পড়ে ওই দেবতার আলো,
প্রণমিয়া পায় তাঁর হৃদয়ের আকুলতা ঢালো।
বুকভরা মধু তাঁর—কিবা রুচি, আহা মরি মরি!—
দ্যুলোক-আলোক ছানি তনুখানি নিল বুঝি গড়ি!

ঋতাবরী দিবো অর্কৈরবোধ্যা
রেবতী রোদসী চিত্রমস্থাৎ।
আয়তীমগ্ন উষসং বিভাতীং
বামমেষি দ্রবিণং ভিক্ষমাণঃ ॥

অন্তরীক্ষে ঋতরূপা জাগে উষা সবিতা-কিরণে,
তারি সনে রোদসীর ফোটে মায়া কত না বরণে।
আসে, অগ্নি, উষা ওই—তনুছায় উজলি ধরায়—
নাও চেয়ে তাঁর কাছে চিত তব যাহা আজি চায়।

ঋতস্য বুধ্ন উষসামিষণ্যন্
বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহী মিত্রস্য বরুণস্য মায়া
চন্দ্রেব ভানুং বিদধে পুরুত্রা ॥

হের ঋতপ্রবর্ত্তক, কল্পতরু—উষা দূতী তাঁর—
সুবিশাল রোদসীর মাঝে হের সবিতা-সঞ্চার!
হের উষা—মিত্র আর বরুণের অপরূপ মায়া—
নিখিল ভুবনখানি দীপিয়াছে তাঁরি স্বর্ণ কায়া!

নববর্ষে

—ঃ{*}ঃ—

বলং ধেহি তনূষু নো বলমিন্দ্রানডুৎসু নঃ।
বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে
ত্বং হি বলদা অসি ॥

—হে ইন্দ্র, আমাদের তনুতে তুমি বলাধান কর, আমাদের বাহনসমূহে বলাধান কর, আমাদের সন্তানসন্ততিতে বলাধান কর, যাহাতে তাহারা বীর্য্যশালী হইয়া বাঁচিয়া থাকে; তুমিই তো আমাদের বলদাতা।

নব বর্ষ বিশ্বের নিকট মধুময় হউক! কাল অনন্ত, বর্ষভেদ তাহাতে কল্পনা মাত্র! কল্পনা মায়া; কিন্তু মায়ার মাদকতা আছে, শক্তি আছে। নিরঞ্জন সত্যে কল্পনার রেখাপাত হইল—ইহাই সৃষ্টি। সৃষ্টি চির নূতন—তাই তাহা পরম বিস্ময়ের সামগ্রী। যাহারা সৃষ্টির কুক্ষিগত, তাহারা আশায়, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় নূতনকে অভিনন্দিত করে—তাহারা যৌবনের জয়গান করে। সৃষ্টির যিনি প্রবর্ত্তক, সবিস্ময় আনন্দে তিনিও নূতন সৃষ্টিকে অভিনন্দিত করেন—কিন্তু তিনি জানেন, ইহা তাঁহারই পুরাণী প্রতিভা। ঋষি উভয়কে দর্শন করিয়া সৃষ্টির উষালোকে গাহিলেন—"পুরাণী দেবি যুবতিঃ পুরন্ধিঃ"—হে জ্যোতির্ম্ময়ী লীলাময়ী মায়া—তুমি পুরাতনী, আবার তুমি নবযৌবনা—অতএব তুমি চিরসুন্দর;" বর্ষারম্ভে আমরা সেই রহস্যময় চিরসৌন্দর্য্যকেই নমস্কার করি—আমাদের শুদ্ধ হৃদয়ের কল্পনা সত্যের অভিমুখে প্রচোদিত হউক।

আমরা দুর্ব্বল, ইহাই আমাদের পাপ। অধ্যাত্মসাধনাই যদি জাতীয় সাধনার প্রতীক হয়, তাহা হইলে দেহে, ইন্দ্রিয়ে, মনে দুর্ব্বল থাকিতে তাহা সিদ্ধ হইবে, সে আশা বিড়ম্বনা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—অহংরূপে আপনাকে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করিতেছি, অথচ পাইতেছি না—ইহাই তো দুর্ব্বলতা। আপনাকে পাওয়ার অর্থ কি?—আপনাকে মহাবীর্য্যবন্ত, অদীনসত্ত্ব, বজ্রসংহত ইচ্ছার প্রবর্ত্তক বলিয়া অনুভব করা—ইহাই আপনাকে পাওয়া। আমি দেহে থাকি, মনে থাকি, বুদ্ধিতে থাকি—সর্ব্বত্রই আপনাকে বীর্য্যশালী বলিয়া অনুভব করিতে হইবে—ইহাই আত্মলাভ—আপনাকে পাওয়া।

বীর্য্য প্রকাশিত হয় স্বভাবের স্ফূর্ত্তিতে, সংরক্ষিত হয় আচারের সংযমে; সংযম প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞানে। আমরা চাই বীর্য্যশালী পুত্রকন্যা—আচারের নিষ্পেষণে, কদাচারের সন্তাড়নে যাহাদের স্বভাব বিকৃত হয় নাই—অতএব যাহাদের অদীন প্রাণ, অসীম উৎসাহ, অনাবিল আনন্দ। সে প্রাণ, সে আনন্দ সংযমের বেষ্টনীতে সুষমামণ্ডিত হইয়া দেখা দিবে—দেহে তাহা আনিবে লাবণ্য, মনে ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড স্ফুরণ। সর্ব্বোপরি জ্ঞানের প্রজ্ঞার দীপ্তিতে তাহাদের অন্তর বাহির সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। নববর্ষে এমনি পুত্রকন্যায় পরিবৃত ভারতবর্ষকে কল্পনা নয়নে ধ্যান করিতেছি। অন্তরে অন্তরে এই কল্পনাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি, বাহিরে ইহা জয়যুক্ত হউক, ইহাই কামনা।

এই কল্পনাকে যাহারা সফল করিবে, মহৎ কর্ত্তব্য তাহাদের সম্মুখে। তাহাদের পথ

কি ?—অমোঘ অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঋষি তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। স্বীকার কর—"ত্বং হি বলদা অসি"—হে দেবতা, তুমিই বলদাতা। বল আমার নয়, বল তোমার, এই অনুভূতিকে জীবনে প্রবল কর। স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, তুমি দুর্ব্বল, কেননা তুমি আস্ফালনে মুখর হইয়া উঠিয়াছ। শক্তিকে ধারণা করিবার সামর্থ্য যদি তোমার থাকিত, তাহা হইলে নিথর হইয়া যাইতে, এত আস্ফালন থাকিত না। অতএব বলশালী বলিয়া যে অভিমান কবিতেছ, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; তোমার উক্তিই তাহা প্রমাণ করিতেছে। এই অভিমান ছাড়—"অহং বলী" না বলিয়া বল—"ত্বং হি বলদা অসি।"

"তুমি বলদাতা" এই স্বীকৃতিতে আত্মবল ক্ষুণ্ণ হয় না—ইহাতে প্রমাণ হয় না যে আমি দুর্ব্বল। অহংকে কোথাও ঠাঁই দিও না—"আমি দুর্ব্বল" এমন কথাও বলিও না। অহংকে সম্পূর্ণ নিরসন করিতে হইবে—আমি সবল কি দুর্ব্বল সে বিচার করিয়াও অহংকে কোথায়ও প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। অহং ক্ষুদ্র—ত্বং ভূমা। অহং বলিতে বুঝি দেহের ক্ষুদ্র আয়তন বা মনের স্বল্প পরিসর; আবার ত্বং বলিতে বুঝি সীমার বাহির; ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। অতএব অহং ছাড়িয়া ত্বং বলিতে হইবে—তাহা হইলেই আপনার গণ্ডী ছাড়িবার উপায় হইবে। বলের উপাসনা করিতে হইবে—কিন্তু অহংএর ক্ষুদ্র পরিসরে নয়—ত্বংএর ভূমানন্দময় বিস্তৃতিতে।

বল, "ত্বং হি বলদা অসি"—অহং নিরসন করিয়া এই কথা জপ কর, আনন্দে প্রাণ পূরিয়া যাইবে—বল কি, তাহার আনন্দময় অনুভূতি লাভ করিবে; কিন্তু কোনও অনুভূতির উপরেই অহংএর ছাপ দিও না—দেখিবে, উহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এইরূপে দেবতার সামীপ্য লাভ করিবে, কালে তুমিই দেবতা হইয়া যাইবে। তোমার অহংকে নিদলিত করিয়া অতর্কিতে কণ্ঠ হইতে ঋষির ছন্দে ধ্বনিত হইবে—

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা
ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং মে আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতূ রজসো বিমানো
অজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম।

—আমি অগ্নি, আমি শুক্র; জন্ম হইতেই আমি জন্মের রহস্য জানি, অতএব আমি স্বয়ম্ভূ; প্রদীপ্ত আমার চক্ষু, অমৃতের আস্বাদ আমার রসনায়—অতএব আমিই দ্রষ্টা, আমিই ভোক্তা। আমি প্রাণ, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ধাতা আমি—আমি মহাকাশের অসীম প্রসার। অফুরন্ত জ্যোতির ভাণ্ডার আমি; আবার আমিই সেবার অজস্র উপকরণ।

এই অনুভূতিতে তুমি আমি একাকার। ক্ষুদ্র অহংএর নিরসনে ত্বংএর উপাসনা মহা অহংএর জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। ইহাই আত্মজ্ঞান—অনন্ত বলের ভাণ্ডার।

আবার বল, "ত্বং হি বলদা অসি"—হে অনন্ত বলের ভাণ্ডার, তুমি তো তোমার বলকে কৃপণের মত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে না, পরমানন্দে ঘটে ঘটে যে তাহা বিলাইয়া দিতেছ। "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াং কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাম্"—পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেবতা রূপে রূপে ছড়াইয়া পড়িতেছেন—বার বার ছড়াইয়া পড়িতেছেন; নিজের তনু হইতে এ কি অপরূপ মায়ার সৃষ্টি তিনি করিলেন! হাঁ, ক্ষুদ্র অহং-ও জগতে আছে; কিন্তু সে তো একা তোমার অহংটী নয় যে শুধু তাহাকে আঁকড়াইয়া কোণে বসিয়া থাকিবে। একবার চাহিয়া দেখ, ঘটে ঘটে কত অহং-এর মেলা;

কত আমিত্বের বুদ্বুদ ফুটিয়া উঠিয়াছে—দেবতার ঐশ্বর্য্য তাহাদের বর্ণে বর্ণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে! শক্তির অপর্য্যাপ্ত ভাণ্ডার হইতে অজস্র স্ফুলিঙ্গ দিকে দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে! নিজের ভাবনা ছাড়িয়া দেবতার এই লীলা প্রত্যক্ষ কর, আর আনন্দগদ্‌গদ কণ্ঠে বল—হে মঘবন্, হে বিচিত্র সম্পদের আধার, ত্বং হি বলদা অসি!

বলাধানের ইহাই বেদমন্ত্র; ঋষি ইহাই প্রত্যক্ষ করিলেন, ইহাই প্রচার করিলেন। ঋষির এই অমোঘ নির্দ্দেশকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ কর। "শ্রদ্ অস্মিন্ ধত্ত"—ইহাতে শ্রদ্ধা রাখ—সত্য লাভ করিবে।

ইহার পর তিনটী উক্তিতে ঋষি এই সত্যের সাধন সঙ্কেত বলিয়া দিতেছেন। তিনিই বলদাতা, এই কথা জানিয়া প্রথমতঃ স্বীয় তনুতে বল প্রার্থনা কর—বল, "বলং ধেহি তনূষু নঃ"—সত্যাস্থিত আমাদের প্রতিজনার তনুতে তুমি বলাধান কর। আমাদের স্থূলতম প্রতীক এই তনু। ইহাকে **শরীর** বলিতেছি না, বলিতেছি **তনু**, কেননা বিশরণ-ধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়া আমরা ইহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাই না। এই জড়পিণ্ডের মাঝেও যে প্রাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে—যাহা সর্ব্বত্র **সন্তত** বা ব্যাপ্ত হইতে চাহে, আমরা তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছি, আমাদের **তনুতে** তুমি বলাধান কর; এই দেহকে বলশালী করিয়া বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় যাহাতে ব্যাপ্ত করিতে পারি, এই ক্ষুদ্র আধারে অবরুদ্ধ প্রস্ফুরৎ প্রাণকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ আমাদের কর। অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যাই তাহার উপায়; আমরা ব্রহ্মচারী হব, আমরা বীর্য্য লাভ করি—তবেই আমাদের তনুতে বলাধান হইবে। হে বলদাতা, সেই বীর্য্যবল তুমি আমাদের দাও!

আবার বল, "বলমিন্দ্রানডুৎসু নঃ"—হে ইন্দ্রিয়ের অধিপতি দেবতা, আমাদের বাহনসমূহে তুমি বলাধান কর। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেব তু, ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ"—হে দেবতা, তুমি নিজকে রথী বলিয়া জান—আর জান, আমার এই দেহই তোমার রথ; আর সেই রথের বাহন হইল আমার ইন্দ্রিয়গণ। হে ইন্দ্র, তুমি এই বাহনসমূহকে বলশালী কর, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ তোমার বলাধানে তেজস্বী হউক। যে তনুতে বল লাভ করিয়াছে, তাহার ইন্দ্রিয় যে তেজস্বী হইবে, ইহা স্বাভাবিক। দেহে বীর্য্য ধারণ করিলে ইন্দ্রিয়ও বীর্য্যশালী হইবে।

শেষ প্রার্থনা—"বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে"—হে দেবতা আমাদের সন্তানসন্ততিতে বলাধান কর, যেন তাহারা বাঁচিয়া থাকে। আত্মাতে বলাধানের সঙ্কেত জানিয়া যে দেহেও ইন্দ্রিয়ে বীর্য্য সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার এই প্রার্থনাসিদ্ধি কত সহজ। অথচ এই প্রার্থনাই আজ এই বীর্য্যহীন দেশে কত পিতামাতার হৃদয়ে করুণ সুরে ধ্বনিত হইতেছে। শিশুপ্রাণের দুঃসহ অপচয় দেখিয়া জাতির প্রাণ কাঁদিয়া বলিতেছে—"হে দেবতা, আমাদের সন্তানসন্ততিতে বলাধান কর, যেন তাহারা বাঁচিয়া থাকে!"

কিন্তু ইহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় কি? ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছেন—নিজের দেহকে, ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বীর্য্যবন্ত কর; তোমার "তোক" এবং "তনয়"—পুত্র এবং পৌত্র বলশালী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু

জানিও, অনন্ত বলের ভাণ্ডার যিনি, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ মাথায় না লইলে তোমার বলের সাধন বৃথা হইবে। ব্রহ্মচর্য্য, কর্ম্মশক্তি, কুলপ্রতিষ্ঠা— সমস্তই সার্থক হইবে আত্মসমর্পণে। দেশকে বাঁচাইবার, জগৎকে জাগাইবার ইহাই এক মাত্র পথ। আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে শ্রীগুরুর নিকট নতজানু হইয়া আকুল কণ্ঠে আমরা প্রার্থনা করি—

বলং দেহি তনুষু নো বলমিন্দ্রানডুৎসু নঃ।
বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে ত্বং হি বলদা অসি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সম্যক্ দর্শন

—*—

বন্য অনার্য্যেরা স্বভাবতঃই সরল হয়, সত্যবাদী হয়; এটা কি ওদের গুণ বলব? ওদের স্বভাবসুলভ আচরণের অনুকরণ করব?— না। অজ্ঞানের পূজায় কখনো শুভ হতে পারে না। যাকে তোমরা স্বভাবসুলভ সরলতা বলছ, সে তো ওদের অজ্ঞানতারই পরিচয়। অশিক্ষিত একটা লোকের সরলতা দেখ্‌লে লোকে বলে, "লোকটা কি বোকা!" কিন্তু উচ্চবংশীয় কোনও ব্যক্তি ঠিক ওই রকম ব্যবহার করলে বলে, "আহা, ভদ্রলোক কি সরল!" সত্য মিথ্যার স্বরূপ না জেনে, সত্য-মিথ্যা আচরণের দোষগুণ না বুঝে, শুধু সত্য-ভাষণে আর সরল ব্যবহারেই অসভ্যেরা কি বড় হয়ে গেল? সত্য-মিথ্যা, সরলতা কপটতার স্বরূপ জেনে দোষগুণ বুঝে যদি কেউ মিথ্যা ছেড়ে সত্যের, কপটতা ছেড়ে সরলতার আশ্রয় নেয়, সত্য আর সরলতা তখনই গুণ, তখনই অনুষ্ঠাতার পক্ষে তারা শুভকর।

অনেক জীবজন্তুর মাঝে বিশেষ বিশেষ সদ্‌গুণ আছে। কুকুরের প্রভুভক্তির কথা ধর। এটা তার বিশিষ্ট গুণ। কিন্তু তা বলে দাস্যভাবের অনুশীলনে সিদ্ধব্যক্তি যে অবস্থা লাভ করবেন, কুকুর কি প্রভুভক্তির ফলে সেই অবস্থার অধিকারী হবে? কুকুরের প্রভুভক্তি তার প্রকৃতির ধর্ম্ম, স্বভাববশেই তা ফুটে ওঠে। বালকের সত্যবাদিতা ও সরলতাও প্রশংসনীয় বা অনুকরণীয় নয়; কারণ তার বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ উন্মেষ না হওয়ায় সে যা দেখে বা শোনে, তাই যথাযথ প্রকাশ করে, তার বিপরীত ঘটনার অবতারণা করতে পারে না। এতে তার অল্পবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানের অনুশীলনে যদি এই সব গুণ সুপুষ্ট হয়, অনুষ্ঠাতার মাঝে শুভেচ্ছার সঞ্চার করে, তবেই তাদের আচরণে শুভ হতে পারে।

সর্ব্বত্রই বিচার সুষ্ঠু হওয়া দরকার। সব বস্তুই বুদ্ধির চালুনীতে ফেলে তার অসার অংশ ছেড়ে দিয়ে সারটুকু নিতে হবে। এদেশের লোকের আজকাল সব যেন গুলিয়ে গিয়েছে। বিচারকের অভিমানটা আছে, ছটফটানীও

খুব আছে, কিন্তু সুষ্ঠু বিচার করবার মত স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, প্রশান্তি আছে কি না, সেদিকে কারু লক্ষ্য নাই। বিচারক হতে হলে বিচক্ষণতা চাই, তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি চাই। প্রশান্তির শীতলছায়ায় বসে বিচার করতে হবে। সংস্কারশূন্য হয়ে বিচার করতে পারলেই নিছক খাঁটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়—নইলে শুধু হাম্‌বড়াগিরিই সার।

আমাদের এদেশে সাধারণের বিচার-ধারাটাই বদ্‌লে গেছে। অন্তর্দৃষ্টিহীন হয়েই এদেশের এই দুর্দ্দশা। স্থূল নিয়েই যত মারামারি—ভিতরের দিকে কারু লক্ষ্য নাই। সাধুত্ব বিষয়েই এদেশের বিচার দেখ না কেন। একজন নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী, কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান লাভ করতে চাইছে। সাধারণে তাকে একজন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সঙ্গে সমান মনে করবে; কিম্বা নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীকেই হয়ত জ্ঞানীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে। যেহেতু লোকটা নিষ্ঠাবান্, যেহেতু সে ফলাহারী বা একাহারী, যেহেতু সে কৃচ্ছ্রসাধক বা তাপস—তাতেই কি সে শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ হয়ে গেল? সে আচারী বলেই কি বড় হয়ে গেল? আচার-বিচার তো চিত্তশুদ্ধির জন্যই। আগে দেখ, তার আচার-মূত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কি না; তার পর তার সার্থকতার বিচার কর। অন্তরশুদ্ধির জন্যই তো বাহ্যশুদ্ধি করিতে হবে। বাইর সাফ করার ফলে ভিতরটা কতটুকু শুদ্ধ হচ্ছে, তাই দেখ্‌তে হবে, আর তাই দেখে ভালমন্দের রায় দিতে হবে। অনেকে শুধু সংস্কারবশে ও রকম আচার মেনে চলে; তাতে কি তার ভিতর শুদ্ধ হয়?

তবে কি বলবো যে শুদ্ধাচারের কোনও সার্থকতা নাই? হাঁ, আছে। কর্ম্মের একটা স্বতন্ত্র ফল আছেই। যে বহিরাচারী, কর্ম্মের ফল হতে সে বঞ্চিত হবে না। শুচিতার সংস্কার অর্জ্জন করবার ফলে পরবর্ত্তী জীবনে বা জন্মান্তরে হয়তো সে শুভ জন্মকর্ম্ম লাভ করবে। শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে জন্ম নেওয়ার পর শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কালে তার উৎকৃষ্ট গতি হবে। অবশেষে জ্ঞান লাভ করে তার জন্ম সার্থক হবে। যিনি জ্ঞানাশ্রয়ী, তাঁর আসন কত উচ্চে! জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।

কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জ্ঞানলাভ। এ জ্ঞান অবশ্য ব্যবহারিক জ্ঞান নয়। তুমি-আমি, ঘট-পট, জীব-জগৎ বিষয়ে যে জ্ঞান, ও তো ব্যবহারিক জ্ঞান। এ জ্ঞান দ্বৈতকে আশ্রয় করে উৎপন্ন। এতে আমাদের মাঝে এক অখণ্ড সত্তার উপলব্ধি এনে দেয় না। এ মিথ্যা জ্ঞান বা অজ্ঞান বা জ্ঞানসামান্য। যাতে সমস্ত পৃথক ভাবের বিলোপ করে একই তত্ত্বের উপলব্ধি এনে দেয়, তাকেই বলি জ্ঞান। আমি তুমি, ঘট, পট, মঠ—এ সমস্ত কল্পনার বস্তু। এ সব সৃষ্ট পদার্থ—আমারই সৃষ্টি, আমার মনের সৃষ্টি। অহংজ্ঞানের ফলে জগৎ; কাঁচা আমির অভিনিবেশেই জগৎ; এ সব আমারই মানসকল্পিত। এ স্বপ্নরাজ্য! স্বপ্নে আমি বাঘ দেখছি—খেতে আসছে; আর ভয়ে অস্থির হয়েছি। স্বপ্ন ভাঙ্গলো, বাঘও পালালো, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জেগে কিন্তু বাঘও নাই চঞ্চলতাও নাই, ভয়ও নাই। তখন আমি স্বস্থ ও সুস্থ হলাম। স্বপ্নের বাঘ কি আর সত্যি-কার বাঘ? ও তো আমার মনেরই সৃষ্টি। এই মনই বাঘ সৃষ্টি করে আবার তারই ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। স্বপ্নের সময় যদি জানা যেত, এ স্বপ্নের বাঘ, মনের সৃষ্টি, এর কোনও

বাস্তব সত্তা নাই, তাহলে আর ভয় হত না—স্বপ্নরাজ্যও ধ্বংস হয়ে যেত। তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ড, জীব জগৎ সবই আমার সৃষ্টি—আমার কল্পনা। অহং আর ইদং-এর ভেদজ্ঞানে অবিদ্যায় এই জগৎ সৃষ্টি করেছি। এ মোহের ঘোর কাটলে আর স্বপ্নরাজ্য থাকবে না। তখন দেখব, এই এক আমি ছাড়া আর কিছুই নাই।

আমি আমার করেই জগৎটা মোলো। কোনটা বাপু তোমার? এত সাধের, এত যত্নের, এত আপনার এই যে দেহটা—যেটাকে আমার আমার করে একেবারে অস্থির হয়েছ, এর কোন্‌টা তোমার? এর ওপর কি তোমার কোনও কর্ত্তৃত্ব আছে? এই যে শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে, এই যে রক্ত চলাচল করছে, পাকস্থলীর ক্রিয়া হচ্ছে—এর কোনটা তোমার ইচ্ছাধীন? এই ক্ষুধা তৃষ্ণা, বাহ্য ইন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, এর কোনটা তোমার কর্ত্তৃত্বে চলছে? দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি, ক্ষীণত্ব-পীনত্ব—কোনটা তোমার ইচ্ছামত হচ্ছে? এতটুকু স্বাধীন ইচ্ছা বা কর্ত্তৃত্ব নিয়ে বৃথা এদের ওপর দাবী করে মরছ। তুমি নিজে এই আধারে পড়ে কি হয়েছ, আগে তাই দেখ।

এই যে জগৎজ্ঞান, একে যথার্থ দর্শন বলে না। এ একটা বিপরীতমুখী আভাস-জ্ঞান মাত্র। বেদান্তের মতে বলতে গেলে এ কেমন জ্ঞান? যেমন ধর, তুমি একটা ঘরের ভিতর বসে আছ। সে ঘরটার দরজা-জানালা সব বন্ধ, মাত্র এই একটা জানালা খোলা আছে, আর খোলা জানালার বিপরীত দিকে দেওয়ালে একটা আয়না বসান আছে। তোমার দৃষ্টি রয়েছে সেই আয়নার ওপর। ওই খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে জগতের প্রতিবিম্ব যতটুকু যেভাবে পড়ছে, তুমি সেইভাবেই ততটুকু দেখছো। কাজেই এ দর্শন তো সাক্ষাৎ দর্শন নয়। এ হচ্ছে বস্তুর আভাসদর্শন মাত্র। বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে হৃদয়দর্পণের ওপর যেরূপ প্রতিফলিত হয়, জীব বা গুহাহিত জন্তু, সংসারী বা ভোক্তা আমি, তাই দর্শন করি, তাই উপভোগ করি।

আর একজন দ্রষ্টা বা সাক্ষী চেতা পুরুষ আছেন, তিনি নির্লিপ্তভাবে সংস্কারবিমুক্ত হয়ে দেখছেন। সেই দ্রষ্টা বা সাক্ষী চেতার স্বভাবগত ঔদার্য্যই "আমিত্বের প্রসার।" সেই আমিই পাকা আমি।

পূর্ব্বে যে সামান্য জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, সে জ্ঞান কাঁচা আমিকে আশ্রয় করে রয়েছে। কাজেই সে জ্ঞান কাঁচা জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান বা আভাস জ্ঞান। দেশকাল-পাত্রের ভেদেই সংস্কার। সুতরাং দেশকাল-পাত্ররূপ গণ্ডীর ব্যবচ্ছেদেই পাকা আমির প্রসার। সংস্কারে আচ্ছন্ন হলেই জ্ঞান সঙ্কীর্ণ হয়। বিচার করতে হলে সংস্কারবিমুক্ত হয়ে করতে হবে, তবে সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে। সংস্কারানুরূপ শ্রদ্ধা হয়, শ্রদ্ধানুরূপ বুদ্ধিবিচার হয়। তাই বিচার সঠিক করতে হলে শ্রদ্ধাকে পুষ্ট করতে হবে, জ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে—শুধু স্বভাববশে বা সংস্কারবশে আচরণ করলেই হবে না।

ভক্তির স্বরূপ

—*—

ভক্তি কি? দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। এই সূত্রটী বিশ্লেষণ করিলে বুঝি, সর্ব্বভূতের শুদ্ধা প্রকৃতিই ভক্তি। দার্শনিক ঋষি বলিতেছেন, প্রকৃতির সমস্ত প্রবৃত্তিই পরার্থে প্রয়োজিত,—তাহার মাঝে স্বার্থচেষ্টা বিন্দুমাত্র নাই, থাকিতে পারে না। প্রকৃতি পরিণামিনী—ক্রিয়াশীলা, প্রসবধর্ম্মিণী। এই ক্রিয়ার ঊর্দ্ধ ও অধঃ দুই প্রকার পরিণাম আছে। অধঃ পরিণামে প্রকৃতির সৃষ্টিলীলা—বৈচিত্র্যের খেলা; এই প্রকৃতি পুরুষের ভোগার্থা। ঊর্দ্ধ পরিণামে প্রকৃতির সংহরণলীলা—বহুকে সংহৃত করিয়া ঐক্যে পর্য্যবসান ঘটাইবার চেষ্টা; পুরুষকে অপবৃক্ত, বিবিক্ত বা কেবল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রকৃতির দুই প্রবৃত্তি। প্রকৃতির বাহিরে থাকিয়া বিচার করিলে দেখি, এই উভয় প্রবৃত্তির মূলে একই তত্ত্ব; উহা আত্মদান, আত্মসমর্পণ—পরের জন্য আপনার সব বিলাইয়া দেওয়া। আমার অন্তঃশক্তিকে প্রস্ফুটিত করিয়া ঐশ্বর্য্যের বিকাশ করিতেছি—ইহাও পরকে খুসী করিবার জন্য; আবার সব ছাড়িয়া কাঙ্গালিনীর বেশে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি—ইহাও পরের স্বরূপবিশ্রান্তিসুখের জন্য। পর কাহাকে বলি?—আমা হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই পর; ইহাতে দূরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উভয় লক্ষণই বর্ত্তমান। জীবের গুহাহিত স্বরূপই পর। জৈব প্রকৃতি এই পরের সুখেই স্বাভাবিক সুখী হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে লিলীন থাকিয়া আত্মসুখ বাঞ্ছা করিলে জীবকে দুঃখ পাইতেই হয়, অতৃপ্তির জ্বালায় জ্বলিতেই হয়। পরের সুখে সুখী হওয়াই তাহার যথার্থ তৃপ্তি, যথার্থ সুখ। প্রকৃতির এই অন্তরঙ্গ পরিচয়কেই বলি ভক্তি।

ভক্তি জীবের স্বভাব—এ কথা অতি সত্য। জীবকে জগতের মধ্যে রাখিয়া, শক্তির দিক দিয়া যদি দেখি, তাহা হইলে অসঙ্কোচে বলিতে পারি—সমস্তটা সৃষ্টিই ভক্তির একটানা প্রবল উচ্ছ্বাস মাত্র। ভক্তির সার্থকতা হয় পূজায়—যজ্ঞে। যাহাতে মমত্ব বুদ্ধি ছিল, তাহাতে পরকীয় বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করাই যজ্ঞ। এই যজ্ঞ, এই পূজা, এই সমর্পণের ব্যাকুলতা দেখিতেছি সৃষ্টির অণুতে অণুতে। এত শোভা, এত বিলাস, কাহার জন্য? আবার মরণের রিক্ততা জীব প্রকৃতিতে কাহার স্মৃতি আনিয়া দেয়? বেদনাবিধুর প্রকৃতি আপনাকে নিষ্পেষণ করিয়া যে রস আস্বাদন করে, তাহার প্রতি তাহার স্বাভাবিক রতি থাকে না কি? যে জীবনে যথার্থ ব্যথার সাক্ষাৎ পাইয়াছে, মরণের মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—সেই এ রহস্য জানে। তাই বলিতেছিলাম, জীবনে-মরণে, সৃষ্টিতে-প্রলয়ে সমস্ত প্রকৃতি জুড়িয়া পরার্থ-সাধনার একটা প্রবল স্রোত মাত্র। ব্যষ্টি আধারে ইহাকেই বলি ভক্তি; সমষ্টি দৃষ্টিতে ইহাকে স্বভাব ছাড়া আর কি বলিব? অতএব ভক্তি জীবের স্বভাব, এ কথা বলিতে সঙ্কোচ কোথায়?

প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াধারা অভিপ্রেত বস্তুটী

কি ? কে তাহার প্রেমাস্পদ ? ঋষি বলিতেছেন, "যা—কস্মৈ।" এই প্রেমস্বরূপিণী কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে, তাহা সেই বুঝি ভাল করিয়া জানে না। ইহা সূত্রের সহজ অর্থ। শ্রুতিমুখে ইহার আর এক অর্থ পাই। শ্রুতিতে পরম দেবতাকে বলা হইয়াছে —"কঃ।" কেন তাঁহাকে কঃ বলা হইল, তাহার ব্যাখ্যা যাস্ক নিরুক্তে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"কঃ কমনো বা, ক্রমণো বা, সুখো বা"—তিনি কামীর কাম্য অর্থের সাধন, তাই তাঁহাকে বলি, ক (কম ধাতু); অথবা তিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, তাই তিনি ক; কিম্বা তিনি সুখস্বরূপ বলিয়াই ক। শ্রুতিতে অন্যত্রও আছে —"কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম ক=আনন্দ; ব্রহ্ম খ=আকাশ, নির্লেপ; উভয়ত্র একই বস্তুর ইঙ্গিত।

ব্যাকরণ-বিচার দ্বারা ক-এর আর এক রহস্য জানিতে পারা যায়। নন্দিকেশ্বর বর্ণ বিশ্লেষ করিয়া তাহার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "অকারো ব্রহ্মরূপঃ স্যান্নির্গুণঃ সর্ব্ববস্তুষু"; ক-কে তিনি বলেন প্রকৃতি—"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব সর্ব্বেষামেব সম্মতম্। সম্ভূতামিতি বিজ্ঞেয়ং কপরস্মাদিতি নিশ্চিতম্।" সুতরাং তাঁহার মতে ক=শক্তিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্য। আরও একটু রহস্য এই যে, 'কঃ' পদকে কিমের নিষ্পত্তিরূপে গ্রহণ না করিয়া ক স্বরূপেই উহার সর্ব্বনামত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য, নিরুক্তকার "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম:" এই শ্রুতি উদাহৃত করিয়াছেন। [illegible] সমর্পণের মন্ত্র—অতএব ভক্তির বীজস্বরূপ; দ্বিতীয়তঃ ইহার উদ্দিষ্ট দেবতা সর্ব্বনাম চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। মহাভাষ্যকার বলিতেছেন, "সর্ব্বেষাং নামানি, তৎ সর্ব্বনাম।" ক স্বরূপেই সর্ব্বনামরূপে ব্যাখ্যাত—ইহা নিগূঢ় ইঙ্গিত বটে; কেননা এক পরতত্ত্ব ছাড়া যথার্থ সর্ব্বনাম আর কাহাকে বলিব ?

বিচার থাক। কেননা বিচার পরস্বরূপের বিচার। আমরা জীব, আমাদের সাধনা প্রকৃতির অনুসরণে। আমাদের এইটুকু বুঝিতে হইবে, আমাদের প্রকৃতি পরমপ্রেমরূপা। ভালবাসাই আমাদের স্বভাব। উহা স্বভাব বলিয়াই নির্নিমিত্ত প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত। তাই আমরা কাহাকে যে ভালবাসি, তাহা বিশেষ করিয়া না জানিয়াও ভালবাসিতে পারি। আমাদের প্রেমের দেবতা, কি জানি কে ? তাই করিয়া জানি না বলিয়া ভালবাসিতে গিয়া দুঃখ পাই, প্রেমের পরম প্রকাশ সকল ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে ? হে বিচারক, তুমি আমাদের স্বভাব বুঝিয়া তার পর দোষ ধরিতে হয় ধরিও। আলোর যেমন প্রকাশ করাই স্বভাব, কাহাকে প্রকাশ করিতেছে, সে বিচার সে করে না, তেমনি ভালবাসাই আমাদের প্রকৃতি। আমরা স্বভাবতঃ প্রেমরূপ বলিয়া এই দুটী ক্ষীণবাহুর বেষ্টনীতে যাহা কিছু আসিয়া পড়ে, তাহাকেই আকুল হইয়া জড়াইয়া ধরি—, আমাদের প্রকৃতি "কস্মৈ কস্মৈ প্রেমরূপা।" সে প্রেম অবম না পরম, সে বিচার, হে বিচারক, তুমি পরে করিও। বলিও, "এই প্রেমের বস্তু উৎকৃষ্ট নয়, কাজেই ইহাকে আসক্তি নাম দিলাম; আবার ইহার বিষয় অতি উৎকৃষ্ট, অতএব এই পরম প্রেমকে ভক্তি নাম দিলাম।" আমরা দেখিতেছি, উভয়ত্র আমাদের প্রকৃতির মূল প্রবৃত্তিই প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। আসক্তি হইতে ভক্তিতে উত্তীর্ণ হইব, ইহাই

আমাদের নিয়তি; সুতরাং ভয় নাই—স্বভাবের পথে চলিলে কোনও ভয় নাই।

ভক্তি অমৃতস্বরূপা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উর্দ্ধ ও অধঃ ভেদে প্রকৃতির দুইটী পরিণাম। উর্দ্ধ পরিণামে বিবেক বৈরাগ্য; উহাই প্রেমের পূর্ব্বাভাস, ভক্তির বীজ। অধঃ পরিণামে সিসৃক্ষা, আসক্তি; ইহাই সংসারের বীজ। সংসার মদন-মরণের লীলাক্ষেত্র। মদনের অভিনয়ে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু সে আনন্দ যে জ্ঞানীর তৃতীয়নয়নের বহ্নিজ্বালাতে ভস্মীকারে পরিণমিত, তাহা কি জান না? সংসারে রতি মূর্চ্ছিতা, সে কামবধূ। যে রতির বিলাস-সজ্জায় মদনের সার্থকতা আশা করিয়া তুমি উৎফুল্ল হইয়াছ, জ্ঞানী যে দেখিতে পাইতেছেন তাহার পিছনে বৈধব্যের করাল ছায়া—তাহার আনন্দকূজনের পরিসমাপ্তি অরুন্তুদ বিলাপে। আসক্তির পথ ছাড়িয়া নিরোধের পথ, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন কর, মরণের ভয় থাকিবে না। কামে মরণ, কেননা তাহা আগাগোড়া অভাব দিয়া গড়া; আর প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী, কেননা তাহা আমাদের স্ব-ভাব, স্বরূপ। ভাবের অভাব বা রূপের অদর্শন কি সম্ভব হয়?

অমৃতের পিপাসায় কণ্ঠ জলিয়া গেল, কিন্তু তাহাকে পাইবার জন্য মরণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছি। ইহাই মায়া। এই মায়াকে অতিক্রম করিবার জন্য প্রকৃতির পরাবর্ত্তন আবশ্যক। প্রকৃতি দুঃখ পায়, আপনাকে নিরাশ্রয় ভাবিয়া; তাহার বেদনা বিরহের বেদনা। তাহাকে আশ্রয় দাও, তাহার বুকভরা ভালবাসা সঁপিয়া দিতে পারে এমন অচঞ্চল আধার জুটাইয়া দাও—আনন্দের বসন্তহিল্লোলে তাহার তনুমন মুঞ্জরিত হইয়া উঠিবে।

অমৃত রসস্বরূপ। রসের প্রতি রতি বা পিপাসা প্রকৃতির মজ্জাগত। কিন্তু রসস্বরূপে নিমজ্জিত হইয়া একাত্মতা লাভ না করিলে রতির চরিতার্থতা ঘটে না। আমাদের প্রকৃতি মজিয়া আছে রসে নয়—রসাভাসে। তাই এখানে মিলনের আভাস আছে মাত্র—বাস্তবতা নাই। এই বিচ্ছেদের দুঃখই সংসার ক্লেশ। ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে প্রকৃতির শুদ্ধি চাই, রসস্বরূপে আত্মসমর্পণ চাই। সমর্পণ সিদ্ধ হইলেই স্বভাবের স্ফূর্ত্তি; উহাই অমৃত। "সোমমপাম অমৃতা অভূম:"—ইহা ভক্ত ঋষির অনুভূতির চরম সার্থকতা।

ভক্তিতে কি হয়? **"যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি"**—ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়। জগৎ জুড়িয়া দেখিতেছি, প্রকৃতির বাসকসজ্জার ভাব। এত আয়োজন, এত বিলাস সম্ভার, কাহার জন্য? যাহার জন্য এই সজ্জা, সে যদি না আসিল, তবে ইহাদের জড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে কি বুক জুড়াইবে? হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে না কি? মিলনের আশায় প্রকৃতির আয়োজন; ততক্ষণই কর্ম্ম। আশা মিটিলেই কর্ম্মবিরতি, ইহাই সিদ্ধি। কিন্তু এই কর্ম্মবিরতি জড়ত্ব নয়, মৃত্যু নয়—ইহা অমৃতস্বরূপ; কেননা ইহা বিরহিণী প্রকৃতির স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন—চিরবাঞ্ছিতের সহিত চিরমিলন। ইহাই তৃপ্তির পরম নিদান। অমৃতের আস্বাদনেই তৃপ্তি। মরণধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির অধঃ পরিণাম, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাতে চঞ্চলতা বাড়িয়াছে—অতৃপ্তিও বাড়িয়াছে। প্রকৃতির অতৃপ্ত বাসনাই মরণের প্রতিরূপ।

তাহার শক্তি আছে—তাই সে গড়ে; কিন্তু মনের মতন করিয়া তো গড়িতে পারে না—তাই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া গড়ে। এই যে গড়িতে চাহিয়া গড়িতে পারিতেছে না—ইহাই তাহার বুক জুড়িয়া অতৃপ্তির তপ্তশ্বাস জাগাইয়া রাখিয়াছে—তাহার আনন্দের মাঝে মরণের করাল ছায়া আনিয়া দিয়াছে। অবশেষে যেদিন আপনার সিসৃক্ষাকে সে সংহৃত করিয়া অতৃপ্তিতে ব্যাকুল আঁখি দুটী ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া দেখিল, সেইদিন কোন্ অজানা পুরুষের সদাজাগ্রৎ অমৃতদৃষ্টির বিনিময়ে তাহার সারা অঙ্গে পুলকের বান ডাকিয়া গেল—আপনার সিসৃক্ষার অতৃপ্তিকে সেই দেবতার পায় নিবেদন করিয়া দিয়া সে তৃপ্তি লাভ করিল, অমৃতা হইল, তাহার প্রবৃত্তির সার্থকতা ঘটিল। যেমন বহিঃপ্রকৃতিতে, তেমনি আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও নিয়ত এই লীলার অভিনয় হইতেছে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং—ইহা শ্রীভগবানের আদেশ। দুইটী আত্মা কি করিয়া হয়? অর্থ এই—পরম পুরুষের আশ্রয় দিয়া প্রকৃতিকে ঊর্দ্ধমুখে প্রেরণ করিবে। পুরুষ-প্রকৃতির প্রেমসম্পর্ককে লক্ষ্য করিয়া উভয়কে আত্মা বলিয়াছেন—এ তার আপন, ও তার আপন—দুই-এ এক আত্মা। প্রকৃতির ঊর্দ্ধগতি না হইলে কি হইবে? তাহাতে আশা, শোক, দ্বেষ, আসক্তি, কর্ম্মচঞ্চলতা—এইগুলি ফুটিয়া উঠিবে। ইহাদের সকলের মূল কথা—বিরহ। বিরহই আশা জাগায়, আবার দুঃখে পীড়িয়া মারে, অপ্রেমের সৃষ্টি করে। আবার আশা হইতে আসক্তি ও উৎসাহও ডাকিয়া আনে। এইগুলি মন্দের ভাল, কিন্তু মিলনের আনন্দের সহিত তুলনায় ইহারা কি? প্রিয়জনের সহিত মিলনে আশা, আসক্তি, কর্ম্মচঞ্চলতার বন্ধনও ঘুচিয়া যায়।

এই প্লাবন যখন প্রথম নামিয়া আসে, মানুষ তখন "উন্মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি।" উন্মাদের আচার বিপরীত—ইহা প্রাকৃত লোকের উক্তি। সংসারভূমিকের দৃষ্টিতে, প্রকৃতির স্বরূপে পরাবর্ত্তনে বিপর্য্যয় তো ঘটিবেই। পরমহংসদেব বলিতেন, কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকিলে যেমন হয়, ভাবে তেমনি হয়। কিন্তু কালে এই আলোড়ন শান্ত হইয়া যায়। সে শান্তি এত নিথর যে বাহিরের কিছুতেই আর তাহা ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। স্তব্ধতার বুকে বিক্ষোভের আলোড়ন, তাহাতেও স্তব্ধতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে না—ইহাই সিদ্ধরূপ। শ্রুতি বলিতেছেন, "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" দুই-এ এক হইলেই ইহা সম্ভব। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিতেছেন—ভক্ত আত্মারাম। ইহা স্বরূপসিদ্ধি। ইহার পরে বিলাস। তাহাই ভক্তির পরমোৎকর্ষ। ভাগবতে তাহার ইঙ্গিত আছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥



হিমালয়ের পত্র

—:{*}:—

{ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর }

ওম্ আনন্দম্—আনন্দম্—আনন্দম্। সুগভীর রহস্যে ঘেরা এই জগৎ—কি অপরূপ তার শোভা! এর হৃদয়ে যে ভাবের স্পন্দন, তা কি কেউ ধরতে পেরেছে—তার বেদনা কেউ বুঝতে পেরেছে? কিন্তু প্রকৃতির স্পন্দমান হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের সুরটী মিলিয়ে নাও—দেখবে আদি অন্ত সব সহজ হয়ে গেছে!

একজন আমেরিকান্ ভাবুক বলেছিলেন, "প্রকৃতি হচ্ছে ভাবেরই ঘনবিগ্রহ; বরফ যেমন জল হয়ে বাষ্প হয়ে যায়, প্রকৃতিও আবার তেমনি ভাবে ফিরে যাবে।" মনের প্রতিফলনেই জগৎ; জগতের আসল তত্ত্বটী উধাও দস্তুর মত নির্ম্মুক্ত ভাবের মাঝে অনন্ত মুক্তি পাচ্ছে। এই জন্যই দেখি, সংহত বা অসংহত অবস্থাতেই হোক্, প্রাকৃত পদার্থ মনের ওপর সর্ব্বদাই অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করছে। জড়ে আবদ্ধ মানুষ, অণুপরমাণুতে সংহত মানুষ, উদ্ভিদ্জগতের মর্ম্মবাসী মানুষ এই স্থূলবিগ্রহধারী মানুষের সঙ্গে কথা কইতে চায়।

প্রশ্ন হতে পারে; জগৎ যদি আমারই কল্পনা, তবে আমার ইচ্ছানুরূপ তার পরিবর্ত্তন হয় না কেন?

এর উত্তরে আচার্য্য গৌড়পাদ বলছেন, স্বপ্নরাজ্যেও দেখছি, চেতনা দুইধারায় বিভক্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে—একদিকে তা বাইরের বিষয়, আর একদিকে তা অন্তরের বেদনা, বাসনা ইত্যাদি। সে অবস্থায় মনে হয়, অন্তরের ভাবগুলি যেন আমাদের অধীন, অতএব পরিবর্ত্তনসহ—তাদের সত্তাও যেন অপেক্ষাকৃত অবাস্তব। কিন্তু বহির্বিষয়কে মনে হয়, তারা যেন আমার অধীন নয়, তাদের যেন একটা নিরপেক্ষ কঠিন সত্তা রয়েছে—যেমন স্বপ্নে মুখচাপায় ধরলে মনে হয়।

কিন্তু বাস্তবিক যে জেগে রয়েছে, তার দিক হতে দেখতে গেলে, স্বপ্নের বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ বিষয় বাস্তবই হোক্, আর অবাস্তবই হোক্, উভয়ত্র তা শুধু ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া, জাগ্রত ব্যক্তির কাছে সে ভাব তার নিজস্ব, তার আপনার সৃষ্টি। আবার জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ কতকগুলি বহিরঙ্গ বিষয়কে কঠিন অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বলে বিশ্বাস করে, আর অন্তরঙ্গ ভাবধারাকে অবাস্তব সংজ্ঞা দিয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কল্পনা করে। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে, কঠিন বস্তুই হোক্, বা বিগলৎ সত্তা ভাবধারাই হোক্—দুই-ই, স্বপ্নের মত তুচ্ছ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের প্রাভভাস রয়েছে, ততক্ষণ তারা নিজস্ব বলেই প্রতিভাত হয়; যদিও ইচ্ছামত তাদের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় না, তবু তারা জ্ঞানীরই নিজস্ব চিন্তা। কি করে তোমার চুল বাড়ে, তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়, বুদ্ধি তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারে না—কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তো তাদের নিজস্ব বলেই জান। তেমনি যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি নিজকে

সকলের আত্মারূপে অনুভব করেন বলে সব তত্ত্বকেই তাঁর আপন বলে জানেন। তিনি প্রেমে পূর্ণ। তাঁর কাছে বস্তুসত্তা বাস্তবই হোক্, অবাস্তবই হোক্, এক চৈতন্যই ক্রমান্বয়ে তাদের উদ্ভাসিত করছে—সেখানে দ্বিতীয় চৈতন্য তো নাই।

(৩)

মশাল ঘোরানো ভারতবর্ষে কোনও অসাধারণ ব্যাপার নয়। জ্বলন্ত মশালটা কখনও একটা প্রশস্ত আলোকচক্রের মত, কখনও বা সূক্ষ্ম অগ্নিরেখার মত, কখনও বুদ্বুদের মত, কখনও উর্দ্ধে, কখনও নীচে, কত খেলাই খেল্‌তে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত খেলা কি আগুনের ধর্ম্ম বল্‌ব? এগুলো মশাল থেকে হলো না বাইর থেকে এলো? মশালটা যখন স্থির ছিল্, তখন কি এই সমস্ত খেলা তার ভিতর ঢুকে গেল? যখন মশাল থাম্‌ল, তখন তারা গেল কোথায়? সমস্ত প্রশ্নের জবাবেই আমরা বল্‌ব—না। মশালটা যখন চক্রাকারে ঘোরে, তখনই সোজা, আঁকা বাঁকা কত রকম রেখা দেখা যায়। মশালের গতি থামলেই আর এই সমস্ত রেখার খেলা দেখা যায় না। মশালটা দ্রুতবেগে ঘোর্‌বার সময় আলোর রেখাগুলো যদিও আমাদের চোখে পড়ে, তবুও তাদের সত্য বল্‌তে পারি না।

ঠিক তেমনি শুদ্ধচৈতন্যের বেলায়। স্থির মশালের মত তার মাঝে বিচিত্র নামরূপের কোনও নিদর্শনই পাবে না। যখনই নামরূপ দেখা দিচ্ছে, তখনই জান্‌ছি, ঘুরন্ত মশালে আঁকা রেখাচিত্রের মত সেটা নিতান্তই ফাঁকী। এ সমস্ত খেলা চৈতন্যকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না বা মলিন করে না। এসমস্ত খেলার আলোর সত্তাকে অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু আলোতে এই সমস্ত চিত্রের সত্তা স্বীকার করা তো চলে না। তেমনি সমস্ত নামরূপের প্রাতিভাসের মাঝেই রাম, হচ্ছেন প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম—কিন্তু রামে তারা আরোপিত মাত্র। মশালের রেখাচিত্র যেমন আবর্ত্তনের দরুণ অবাস্তবসত্তা নিয়ে দেখা দেয়, তেমনি নামরূপের বৈচিত্র্যও চৈতন্যের মায়াশক্তির প্রভাবে দেখা দেয়।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" শক্তির কোন স্বাধীন সত্তা নেই। তার প্রকাশ হতেও পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু সে পৃথক হয়ে থাক্‌তে পারে না। প্রতি ব্যষ্টি জীবে এই শক্তি চৈতন্যের স্পন্দন বা মন আকারে দেখা দেয়। স্পন্দমান মন আর প্রাতিভাসিক জগৎ একই বস্তুর এ পিঠ আর ও পিঠ; স্পন্দহীন মন আর চৈতন্য একই কথা। মন হতে বাসনার খাদ দূর হলে তার চঞ্চলতা দূর হয়, ক্রমে তা স্থির হয়ে আসে। সম্পূর্ণ স্থির হলে মন ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই হল সাক্ষাৎকার; এতে মায়া জয় হয়, জগৎ স্বর্গোদ্যানে পরিণত হয়, হারানো স্বর্গ আবার ফিরে পাওয়া যায়, মনে হয়, সৌন্দর্য্য সব জায়গায় উপ্‌চে পড়ছে যেন। ভেদবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেলে সব ভাবনা চিন্তা সচ্চিদানন্দের পরম রসায়নে চিরকালের জন্য ডুবে যায়।

একটা ঘুণা রামের সামনেই একটা গোলাপ ছিঁড়ল—শুঁকবে বলে। কিন্তু নাকের কাছে সেটা ধর্‌তে না ধরতেই একটা মৌমাছি বেরিয়ে এসে তার নাকের ডগায় কামড় বসাল। লোকটা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠ্‌ল, গোলাপটা তার হাত হতে খসে পড়ল।

গোলাপের পাপ্ড়িতে কি ভ্রমর লুকানো থাকে? হাঁ, থাকে বৈ কি? ইন্দ্রিয়াসক্তির যত গোলাপ, সবের মাঝে একটা করে দুঃখের মৌমাছি লুকানো আছে। অসংযত বাসনার শান্তি হয় অপরিহার্য্য বেদনাতে।

হে মোহবিভ্রান্ত জীব, নিজকে ভুলো না কখনও। গোলাপকে সুন্দর দেখে তুলতে যাচ্ছ কেন? ফুল যেখানে ফুটে রয়েছে, তুমিও যে সেখানে আছ, তার রক্তিমা, তার সুগন্ধি তো তোমার। রাজার ঐশ্বর্য্য তোমার; সৌন্দর্য্যের মাদকতা তোমার; মণিমাণিক্যের দীপ্তি তোমার! নিরর্থক বাসনা পুষে মরছ কেন, কিসের লোভে? সর্ব্বময়ের সঙ্গে তোমার ঐক্য অনুভব কর। ব্রহ্মের সঙ্গে আপনাকে একীভূত জান। শত শত গোপকুমারীর হাতে হাত ধরে রাসোৎসবে যিনি নৃত্য করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে তুমিই। তুমি প্রাসাদে আছ, সমুদ্রে আছ—উপবনে আছ, মরুভূমিতে আছ—রণক্ষেত্রে আছ, গর্ভগৃহে আছ!

উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হতে তারস্বরে রাম বলছেন, যারা বলছে আমরা দুর্ব্বল, আমরা দীনহীন, তারা জানছে না যে তারা রাজরাজেশ্বর—তারা স্বয়ং রাম! নিজের কল্পনায় কারারুদ্ধ হয়ে থেকো না। জাগো, জাগো—মোহনিদ্রা টুটে যাক্—জগৎস্বপ্ন উড়ে যাক্! দুঃখের পাঁকে অসহায় হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছ কেন, যখন জানছ যে তুমিই সব ঠাঁই জুড়ে আছ! আত্মচৈতন্যে সদাজাগ্রৎ হও—সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তুমিই যে সর্ব্বসুখের সার, সকল আনন্দের প্রাণরস তুমি। তোমার কে ক্ষতি করতে পারে? রামের দোহাই দিয়ে বলছি, "আত্মানং বিদ্ধি!" পিছিয়ে আছ কেন? আত্মাকে যখন জানতেই হবে, তখন আর জানতে বাকী রাখা কেন? অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, অদম্য উৎসাহে সুখের পেছনেই না ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছ দিনরাত? কিন্তু পদে পদে তাতে পরাভূত হওনি কি? তবে আর এ বোকামী কেন? ইন্দ্রিয়বিষয়ে সুখ খুঁজো না। ইন্দ্রিয়ের দাস সব!—ছেড়ে দে তোদের বাইরে খোঁজা! অমৃতের সায়র যে তোর মাঝে রে! তুমি যে অমিয় হতে অমিয় গো! তোমার মন আর এই জগৎ ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হয়ে যাক্। তোমার ক্ষুদ্র অহঙ্ক আনন্দের পাগলাঝোরায় ভাসিয়ে দাও না।

বাছারে, এই তো মাটীর দেহের চুঙ্গীঘরে আটকা আছিস্—আর তাবি এত দরদ? এই অনাত্মবস্তুর শেষ গতি কি হবে, তারই বা এত ভাবনা কেন? সমস্ত সম্বন্ধের কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল দেখি! যে আঁখি ব্রহ্মদর্শন করে না, তাকে উপড়ে ফেল! যে হৃদয়ে বাসনারোগ বাসা বেঁধেছে, সে চুলোয় যাক না কেন! ব্রহ্মভাবের সব অভাব একদম মুছে ফেল, তোমার সত্তাস্থিতিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধর। সেখানে নিন্দা নাই, স্তুতি নাই, ক্ষুদ্র সুখদুঃখের তরঙ্গ নাই। ব্রহ্মভাবে দেহতরী বোঝাই কর আগে, তারপর অন্য কথা। এর পর কোথায় বা থাকবে তীর, কোথায় বা থাকবে পাল, কোথায় বা থাকবে তুমি! হাঁ, এই ভাঙ্গা দেহতরীর আধছেঁড়া আধময়লা পালে বৈরাগ্যের ঝড়ো হাওয়া এসে লাগুক—ব্রহ্মচৈতন্যের অপার পারাবারে ভেসে যাক সব! স্বর্গসুধায় মাতাল যে, সেই তো সুখী। যিনি ব্রহ্ম মাতোয়ারা, মরণ মতবালা—তিনিই ধন্য। যিনি আত্মানন্দে বিভোর, তিনিই পূজ্য। ওঁ—ওঁ!*

* শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ

হিন্দু-মুসলমান

—ঃ{*}ঃ—

পশ্চিমে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ পাকিয়া উঠিয়াছে, এই খবরটাই কিছু দিন ধরিয়া পাইতেছিলাম। এবার বুঝি বিরোধের বিষ পূর্ব্বেও বিসর্পিত হইতে চলিল। দূরে থাকিয়া কলিকাতার হাঙ্গামার যে বিবরণ শুনিলাম, তাহাতে আশা-আশঙ্কা দু'য়েরই অবকাশ আছে দেখিতে পাইতেছি। উভয় সম্প্রদায়ের মাঝেই নির্ব্বিরোধ লোক আছেন, তাঁহারা শান্তি স্থাপনের জন্য অকৃত্রিম চেষ্টা করিয়াছেন, বিদ্বেষ ভুলিয়া শরণাগতকে আশ্রয় দিয়াছেন, ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই কল্যাণের সূচক। ধর্ম্মগত অনৈক্য এই হাঙ্গামার মূল হইলেও ধর্ম্মবোধহীন দুর্ব্বৃত্তদের অর্থলোলুপতা অরাজকতার সুযোগ পাইয়া বিরোধকে আরও ঘনাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে—এই সংবাদে হর্ষ বিষাদে দু'য়েরই কারণ বর্ত্তমান। হয়ত এই বিরোধ মর্ম্মান্তিক নাও হইতে পারে—ইহাতে এমন একটা আশা জাগে। কিন্তু ইহার স্মৃতি ম্লান হইতে না হইতে যদি একই সূত্র ধরিয়া অন্যত্র বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সমস্যা আরও জটিল বলিতে হইবে।

হিন্দুরা হাঙ্গামায় মার খাইয়াছে বেশী, ইহা দুঃখের কথা; ইহাতে যদি তাহাদের নির্ব্বিরোধিতা ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে এই ব্যাপারকে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া পাই না। দেবস্থান রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু যুবকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনে পর্য্যন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—ইহা অতি সুখের কথা, বড় আশার কথা। এই হাঙ্গামায় নারী জাতি ধর্ষণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে—ইহা তাহাদের বহু ভাগ্য বলিতে হইবে। বোধ হয় সহরবাজার বলিয়াই এরূপ হইয়াছে; নতুবা সে-আব্রু পল্লীগ্রামে নারীর যে লাঞ্ছনার বিবরণ নিত্য শোনা যায়, তাহাতে হিন্দুর পৌরুষের প্রতি ধিক্কার আসে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে। কিছু দিন পূর্ব্বে উত্তরাঞ্চলে এক নীচজাতীয়া ধর্ষিতা হিন্দুনারীর রক্ষার প্রস্তাবে অভিজাত হিন্দু ক্ষুদ্রচেতার মত যে তাচ্ছীল্যভরা উত্তর দিয়াছিল, তাহার কথা এখনও হয়ত অনেকের মনে আছে। আবার এই সেদিন আসামেই উত্তেজিত আহোমদের হাতে নিঃসহায় নারীদিগকে সঁপিয়া দিয়া বাঙ্গালী মুসলমান প্রাণভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে—ইহাও শুনিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোকের সম্মুখে একটী মাত্র কামোন্মত্ত গোরা এক অসহায় ভিখারিণীর উপর প্রকাশ্য রাজপথে অত্যাচার করিয়া নিষ্কৃতি পাইল, ইহাও শুনিয়াছিলাম। এই সমস্ত ঘটনাগুলি মিলাইয়া দেখিলে কি সিদ্ধান্ত হয়? পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র নারীধর্ষণে মুসলমানেরই হাত বেশী, এইরূপ একটা নিরুপায় আক্রোশের কথা শুনিতে পাইতেছি। উভয় সম্প্রদায়ের ইহাও একটা বিরোধের হেতু হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহার মাঝে প্রকৃত তথ্য কি, অপরাধের ভাগ কার কতটুকু, উপরোক্ত তিনটী বিভিন্ন মুদ্রার উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আজকার নয়, আর কালই যে চলিয়া যাইবে, ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বর্ত্তমানে হিন্দুমুসলমান ছাড়া তৃতীয় এক শক্তি দেশের মাথার উপর রহিয়াছে। এই শক্তি না থাকিলে বিরোধ কোথায় গড়াইত, স্বরাজও কতখানি আগাইয়া আসিত, তাহা ভাবিবার বিষয়। রাজশক্তির অপচার নিবারণের জন্য সংহতির প্রয়োজন; হিন্দুমুসলমানের বিরোধ তাহা ঘটিতে দিতেছে না। রাজনীতিবিদেরা তাই রাতারাতি উভয় সম্প্রদায়ের বুকের উপর মিলন সৌধের ভিত গাড়িতে চান। কিন্তু চালাকীর মিলন টিকে কি? দুইটী বুদ্ধিমান্ মানুষই যৌথ স্বার্থের খাতিরে বহুক্ষণ মিলিয়া থাকিতে পারে না—আর এ তো দুইটা প্রকাণ্ড জাত। ইহাদের মাঝে মিলন কালসাপেক্ষ, প্রাকৃতিক আনুকূল্যসাপেক্ষ।

বাধ্য হইয়া যদি একত্র ঘরকন্না করিতে হয়, তাহা হইলে হাজার বিরোধ থাকিলেও আপোষ না করিলে চলে না। ইতর জাতির মাঝে এই সংঘর্ষ ও সামঞ্জস্যের নীতি চোখের উপরই দেখা যায়; ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়া দেখিলে মানুষের মাঝেও ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বই কি? সেই দিক দিয়া দেখিতে গেলে হিন্দু-মুসলমান মিলিতেছে এবং মিলিবে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু অবান্তর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এ ক্ষেত্রে চালাকী করিতে গেলে বিরোধ আরও পাকিয়া উঠিবে—এ কথাও ধ্রুব!

এক একটা জাতির মূলগত এক একটা প্রেরণা আছে; বিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে তাহার মাঝে এই সূত্রটী আবিষ্কার করিয়া শক্তি ও চেষ্টার প্রয়োগ করিতে হইবে। এদেশে হিন্দু, মুসলমান আর খৃষ্টান এই তিনটী সভ্যতার মূলে তিনটী তন্ত্র দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুর জাতীয়তা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রমূলক। মুসলমানের ক্ষাত্র-তন্ত্র, আর ইউরোপের বৈশ্যতন্ত্র। হিন্দুর অতীত বলিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিকাশ মাত্র বুঝি। তার রাজনীতি, যুদ্ধনীতির মাঝেও তত্ত্বকথার এত ছড়াছড়ি। হিন্দুর রাজা রাজত্ব করিতেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার কর্ণ ধরিয়া আছেন। অর্থ হিন্দুর কাছে অনর্থ; তাই স্বদেশে থাকিয়া যদি স্বল্পায়াসে স্বধর্ম্মাচরণ হয়, তাহা হইলে বিদেশে পা বাড়াইবার প্রলোভন কোনও হিন্দুর মনে জাগে না। অনেক বিপ্লবের পর শ্রীকৃষ্ণ একবার হিন্দুকে টানিয়া উপরে তুলিয়াছিলেন। রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য—আবার সে রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য—কুরুক্ষেত্র হইয়া গেল, কিন্তু হিন্দু তাহার ফলে পাইল তত্ত্বজ্ঞান। অশোকের কীর্ত্তি "গান্ধার হইতে জলধিশেষ" পর্য্যন্ত ছাইল বটে—কিন্তু তাহারও আদ্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিকাশ মাত্র। ভাল বল, মন্দ বল, হিন্দুর ইহাই বিশেষত্ব। হিন্দু ধর্ম্ম বাঁচাইয়া অরাজকতা সহিবে, লাঞ্ছনা সহিবে, মার খাইবে—ইহা তাহার স্বভাব।

মুসলমানের মাঝে ক্ষাত্রভাব প্রবল। যে জাতির মাঝে এই ধর্ম্মের উদ্ভব, আজও তাহারা পোষ মানে নাই। এমন কি এই ধর্ম্মের গোড়া পত্তন হইয়াছে তরবারি দিয়া, বিদেশে প্রচার হইয়াছে তরবারির মুখে। Pan-Islamismর স্বপ্ন মুসলমান এদেশে বসিয়াও দেখে। আভিজাত্যের গর্ব্ব মুসলমানের মজ্জাগত; তাহারা বাদশার জাত, একথা আজও ভুলিতে পারে নাই। বাংলা, ফারস্ তুরুক মুলুক হইতে বহু দূরে, তাই এখানকার মুসল-

মান জলবায়ুর গুণে কতকটা শান্ত। কিন্তু যতই পশ্চিমে যাইবে, ততই মুসলমানের আভিজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যে রাজা, সেই গুরু; ইহাতে মুসলমানের উপাসনা পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয়তার উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর ক্ষাত্রযুগের কথা স্মরণ কর। ক্ষত্রিয়েরা দেশটা ওলট্‌পালট করিয়া ফিরিত। রাজসূয়, অশ্বমেধের কল্পনা অন্য জাতি করিতে পারে নাই; তেজ দেখাইবার অভিনব ফন্দী বটে! আর "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—ইতিহাস পুরাণ তার সাক্ষী। এখনকার হিন্দুর কাছে এ সব স্বপ্ন; কিন্তু মুসলমানের কাছে আজও ইহা সত্য। এই তুলনায় মুসলমান সভ্যতার প্রকৃতি বুঝা যাইবে।

ইউরোপের বৈশ্যতন্ত্র। শুধু ইংরেজ বলি না, কেননা আমরা ইংরেজের অধীন তো নই শুধু—গোটা ইউরোপের বাণিজ্যকুশল জাতি মাত্রেই আমাদের রাজা। ইহারা তপস্যা করে না, লড়াই করে না, কিন্তু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ইষ্টসিদ্ধি করিতে জানে। আজ জগতে বৈশ্যতন্ত্রের অভ্যুদয়। যারা জগতে আজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্ব করে,ব্রাহ্মণের দৈন্য তাহাদের কাছে উপহাসের বিষয়; হাতাহাতি করাটা অসভ্যতা। চাই অর্থ, চাই বিলাসোপকরণ; যার টাকা করিবার ফফিকির জানা আছে, সেই রাজা। আমেরিকা গত যুদ্ধে হাতেনাতে লড়াই করে নাই—কিন্তু যুদ্ধে জিতিয়াছে সেই।

শুধু হিন্দু মুসলমানে নয়, ভারতবর্ষে আজ এই ত্রৈবর্ণিক তন্ত্রের মাঝেই লড়াই সুরু হইয়াছে। জগতে শূদ্র তন্ত্র সবে জাগিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতেছে, ইহারা জাগিলে লড়াইটা আরও পাকিবে।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ। ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধ—এটা অবান্তর কথা। অন্ততঃ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া লড়াই করিবার মত মুখ মুসলমানের নাই। আঙ্গোরায় মুসলমানধর্ম্মের সমাধি হইয়া গিয়াছে। এখানকার মুসলমান দূরে আছে, তাই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছে না। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সেখানে মুসলমান রাষ্ট্র গড়িতেছে। ইউরোপে ইহার পরীক্ষা হইবে—বৈশ্যতন্ত্রের সহিত সংঘর্ষে। কিন্তু ধর্ম্মের মুখোস খসিয়া পড়িলে এখানকার মুসলমানের থাকিবে কি? থাকিবে আভিজাত্যবোধ, ক্ষাত্র উত্তেজনা। আজও মুসলমান তাহাই নিয়া লড়িতেছে—ধর্ম্ম একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে পূর্ব্বেও এদেশে একবার বিরোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বহু সহিয়া শেষে পরশুরামের জন্ম দিয়াছিল। ক্ষাত্রশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া শেষে তাহার কুলরক্ষাও করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের সঙ্করে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছিল, তাহারা বোধহয় শান্ত শিষ্ট হইয়াছিল। দুইটী সভ্যতার আদর্শ পরস্পরের সংঘর্ষে শেষে এই সামঞ্জস্যে পরিণত হইল। পুরাণকারের এই রূপকের পুনরাবির্ভাব হইবে কি? অবশ্য পরশুরাম যে মাতৃঘাতী একথাও ভুলিতে পারি না।

সে যাহাই হউক, ব্রাহ্মণকুলেও পরশুরামের প্রয়োজন আছে। তাই পরমানন্দ ঠিক বলিয়াছেন, "দুর্ব্বল আর সবলে মৈত্রী হাসির কথা। 'ভেড়িয়া' আর 'ভেড়ে' কখনও সন্ধি হয়? ছাগের অহিংসায় বাঘের হিংসা দূর হয় কি?" বর্ত্তমান সমস্যা হিন্দুকে এই দিক হইতেও ভাবিতে হইবে।

বিপ্লবের প্রতীকার কি করিয়া হইবে, ইহা সকলেই চিন্তা করিতেছেন। তবে অবশ্য

সুদূর ভবিষ্যতের হাতে, কিন্তু কাজ তো এখন হইতেই সুরু করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় হইবে, ইহা বিশ্বাস করি, কিন্তু ধর্ম্ম তো দুর্ব্বলের ক্রীড়াপুত্তলী নয়। বর্ত্তমানে হিন্দু সবল কি? দুর্ব্বলের ক্ষমায় অনাচার নিবারণ হয় না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বাহন হইতে হইলে কাঁধ শক্ত করিতে হইবে। সমাজের অধঃস্তর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বীর্য্য সঞ্চার করিতে হইবে—শুধু শাস্ত্রের ফাঁকা বুলি আওড়াইয়া নয়, যথার্থ করিতকর্ম্মা হইয়া। হিন্দু গোঁড়াই হউক আর উদারই হউক, সে হিসাব এখনও তাহার হয় নাই বলিয়াই মনে করি। একাগ্র চিত্তে স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া হিন্দু বলসঞ্চয় করুক, ব্রাহ্মণ্যদায়িত্বকে বহন করা তবেই তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে—সর্ব্বপ্রকার বিরোধের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই জয়ী হইবে।

ধরা পড়া

এতদিন তবে বঁধু,
বুঝেছি কি ভুল!
অস্ফুট বেদনা দিয়া
তোমারে গড়েছে হিয়া,
কেঁদেছে স্মৃতিরে ঘিরি
বাসনা ব্যাকুল;—
এ শুধু আমারি ব্যথা,
আনন্দ বিপুল—
ভেবেছিনু এতদিন,
সে কথা কি ভুল!

তোমারো আঁখিতে এ কি,
অশ্রু দেখা যায়!
স্ফুরিয়া অধর দুটি
আকুলতা রহে ফুটি,
গোপনে বুকের মাঝে
বেদনা ঘনায়;—

তোমারো পরাণ তবে
আমারেই চায়!
নহিলে আঁখিতে কেন
অশ্রু দেখা যায়!

আর কোথা যাবে বল,
পড়িয়াছ ধরা!
বিরহ নহে তো বঁধু,
আমারি হিয়ার মধু,
তোমারো পরাণখানি
কাঁদনেতে ভরা;—
মিছে কেন কাছে এসে
দূরে সরে পড়া!
চকিতের আঁখিজলে
পড়িয়াছ ধরা!

ছাত্রগণের প্রতি.

—*—

"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ" ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা অর্থাৎ ছাত্রগণ জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই সকল চেষ্টা ও শক্তি নিয়োগ করিবে। এই সময়ে অন্যবিধ চিন্তা ও চেষ্টায় চিত্তের গতি বিভিন্নমুখী হইলে একাগ্রতা জন্মাইতে বিঘ্ন ঘটে, সুতরাং সম্যক্‌রূপে জ্ঞান অর্জ্জন হয় না। এই জন্য প্রাচীনকালে আমাদের দেশে গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণ জ্ঞানার্জ্জনে রত হইত। প্রকৃতির উন্মুক্ত উদার কৃত্রিমতাবর্জ্জিত নিভৃত লীলাক্ষেত্রে এই আশ্রম জীবন সদ্‌গুরুসকাশে ব্যয়িত হইত। সেখানে সংসারের আবিলতা স্থান পাইত না, সুতরাং ছাত্রগণের জীবনেও কোনরূপ আবিলতা প্রবেশ করিতে পারিত না। তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ স্বভাবানুকূলেই গঠিত হইত। অকাল-পকতা দোষ তাহাদের ভিতর আসিত না। তাহারা রাজাপ্রজা, ধনীদীন নির্ব্বিশেষে মনুষ্য-সন্তানরূপেই প্রতিপালিত হইত; সুতরাং আভিজাত্যের বা পদমর্য্যাদার গর্ব্ব তাহাদের শিক্ষার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইত না। যাহার ভিতর যে বীজ থাকিত তাহাই সুপরিণত হইয়া সময়ে ফলে ফুলে সুশোভিত হইত। শাস্ত্রা-দিতে যে সকল সত্য লিপিবদ্ধ আছে, ছাত্রজীবনে পরীক্ষা করিয়া তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিবারও তাহাদের সুযোগ ঘটিত। সর্ব্বোপরি আচার্য্য ও গুরু তাহাদের নিকট জীবন্ত শাস্ত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। সুতরাং শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর ব্যক্তি তাঁহার অনুকরণ করে—এই সত্য সফল হইয়া ছাত্রগণের জীবন মধুময় করিয়া তুলিত।

শিক্ষাকালেই যাহাদের জিহ্বা ও উপস্থ সংযত হইয়া যাইত, তাহারা সত্যানুশীলন ও জগতের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিত। আর যাহারা এই উভয়ের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইত, তাহাদিগকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিতে হইত। পূর্ব্বের সংযম, শিক্ষা ও আদর্শ প্রবল থাকায় তাহারা এই পরীক্ষায় অবাধে উত্তীর্ণ হইতে পারিত। তখন তাহারা আবার উচ্চ উচ্চতর জ্ঞান লাভের প্রয়াসী হইয়া তদনুকূলে জীবন যাপন করিয়া পূর্ণতা লাভ করিত। এইরূপে প্রত্যেকের জীবনে পূর্ণতা লাভ করাই সে কালের আদর্শ ছিল। সে যুগে এমনভাবে সমাজ সংগঠন করা হইয়াছিল যে উহার সর্ব্বত্রই শিক্ষাক্ষেত্র এবং সমস্ত ব্যবস্থাই মনুষ্য জীবনের সার্ব্বভৌম লক্ষ্যমুখী। এই শিক্ষায় ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ কাহারও ভিতরে বিরোধ ছিল না। মনুষ্যমাত্রেই এইরূপ আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে জীবন যাপন করিয়া সেই একই লক্ষ্যমুখে ধাবিত হইত। সমাজ-শৃঙ্খলার ভিতরেও কোন বিরোধ উপস্থিত হইবার কারণ ছিল না। গুণকর্ম্ম অনুসারে সমাজের বিভিন্ন স্তর থাকিলেও লক্ষ্য এক ছিল বলিয়া সকলের ভিতর সহযোগিতা ছিল, বিরোধ ঘটিবার কোনই কারণ ছিল না।

বর্ত্তমানে বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবিত

হইয়া ভারত সেই আদর্শ ভুলিয়াছে। ভারতের পূর্ব্বোক্ত উচ্চতম আদর্শই দেশের প্রাণ। দেশকে জাগাইতে হইলে আবার এই আদর্শকে জাগাইতে হইবে। দেশকে জাগাইবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত রোগ নির্ণয় না করিতে পারিলে যেমন নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিফলমনোরথ হইতে হয়, আজ দেশের পক্ষেও তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষাক্ষেত্রের ও আদর্শজাতীয় শিক্ষার অভাবে আমরা দেশের একমাত্র আশাভরসাস্থল কচি ও কোমলপ্রাণ বালক-বালিকাগুলিকে কিরূপ অধঃপাতের পথে পরিচালিত করিতেছি, তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। আমরা স্বরাজের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। কিন্তু এই স্বরাজ রক্ষা করিবে কাহারা? যাহারা শিক্ষায় দীক্ষায়, আচারে ব্যবহারে, চালে চলনে বিলাসব্যসনে সম্পূর্ণ পরদেশীভাবাপন্ন হইতে শিক্ষা পাইতেছে, তাহারাই কি স্বরাজ রক্ষা করিবে? মুখে বলিতেছি স্বরাজ, আর মনে প্রাণে মানিয়া নিতেছি বৈদেশিক শ্রেষ্ঠতা। ছেলেরা শিক্ষা পাইতেছে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অতিরঞ্জিত। নানা দেবদেবীর ভজন, সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার, জাত্যভিমান, অস্পৃশ্যতা দোষ, আহার-ব্যবহারে পোষাকপরিচ্ছদে অসভ্যতা ইত্যাদিতে আমরা বিব্রত; আর যাহা কিছু বৈদেশিক তাহা সব ভাল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণ, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি পাঠের অবসর ছাত্রগণকে দেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে বাল্যকাল হইতেই বৈদেশিক ভাষার সঙ্গে বৈদেশিক শাস্ত্রবিজ্ঞান ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহাও আবার বিদেশী শিক্ষকের নিকট। কাজেই সর্ব্বতোভাবে বৈদেশিক আদর্শের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া তাহারা যে তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবে, ইহা অসম্ভব। আবার বাল্যকাল হইতে এই ভাব অস্থিমজ্জাগত হওয়ায় তাহাদের স্বদেশীয় ভাবও যে লোপ পাইবে, ইহাও অবধারিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই আমরা চালচলনে আহারে বিহারে ষোল আনা বিদেশী ভাবই দেখিতে পাই। ইহারাই আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শস্থানীয়। সুতরাং দেশবাসী যে তাহাদের অনুকরণ করিয়া বৈদেশিক ভাবাপন্ন না হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? এই বৈদেশিক ভাবাপন্ন দেশের স্বরাজলাভের প্রয়াস উপহাসাস্পদ নহে কি?

বৈদেশিক শিক্ষা, বৈদেশিক পারিপার্শ্বিক ও বৈদেশিক আদর্শ আমাদের দেশের শিক্ষিতের মধ্যে কিরূপ ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে হাকিম, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার ও প্রফেসর। এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই কতটা স্বদেশী ও কতটা বিদেশী ভাবাপন্ন, তাহা তাঁহাদের আসবাব, পোষাক, পানভোজন, যানবাহন দেখিলেই টের পাওয়া যায়। তাহার পরেই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ। ইহাদের বেশভূষা, আচারব্যবহার ও অসংযমের ভাব দেখিলেই বুঝা যায়, উহারা বৈদেশিক আচার ব্যবহারে কতটা তালিম দিতে শিখিয়াছে।

শিক্ষায় আদর্শে বৈদেশিক প্রভাব পড়িয়া আমাদিগকে কতটা স্বরাজ হইতে চ্যুত করিতেছে, তাহার দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। আমরা দেশের অন্যরূপ ব্যাধি কল্পনা করিয়া

তাহারই প্রতিকারে প্রয়াস পাইতেছি। বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া শাখাপ্রশাখায় জল দিলে যেমন বৃক্ষটীকে রসগ্রহণে সাহায্য করা হয় না, সেইরূপ আমাদের সর্ব্ববিধ চেষ্টাও আমাদের, অজ্ঞতায় ব্যর্থ হইতেছে।

আমাদের দেশে এই দেড়শ' দুশো বৎসর ধরিয়া বৈদেশিক শিক্ষা পাইয়াও আজও শতকরা ৯০ জন মূর্খ রহিয়া গিয়াছে। দেশের এই মূর্খত্ব দোষ ঘুচাইবার জন্য আজ যদি দেশের লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিত, তবুও বুঝা যাইত, কতকটা রোগ নির্ণয় হইয়াছে। কিন্তু না, দেশ যে একেবারে বিভিন্নপথে ছুটিয়াছে। দেশে যাহা কিছু আন্দোলন আলোচনা কেবল কতকগুলি পাশ্চাত্যশিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে। আর তাহা মুখে, কাজে নয়। কারণ মনে প্রাণে দেশের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। তাহারা দেশের ঋষি-নির্দ্দিষ্ট কোনপ্রকার আচারঅনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহে। কারণ পাশ্চাত্যশিক্ষিত খুব কম লোককেই ঋষিদিগের পন্থা অনুসরণ করিতে বা তাঁহাদের প্রদর্শিত সত্যের অনুশীলন করিতে দেখা যায়। কাজেই বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত লোক দিয়াও আমাদের দেশের প্রকৃত কাজ হইবে না।

আমাদের প্রাচীন আদর্শানুগামী জীবন-যাপনকারী সাধুহৃদয় ব্যক্তিগণই আমাদের প্রকৃত আদর্শ এবং তাঁহারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একমাত্র যোগ্য আচার্য্য বা গুরু। ইঁহারাই যখন এই দেশের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন ও কলুষিত সমাজ হইতে বালকগণকে উদ্ধার করতঃ প্রকৃতির উন্মুক্ত ও নিভৃত স্বভাবক্ষেত্রে গুরুগৃহরূপ আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিবেন, তখনই দেশে প্রকৃত কার্য্য হইবে। দেশকে উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

এই দেশেই ব্যাস বাল্মীকির ন্যায় আদর্শ ঋষি, শঙ্কর বুদ্ধের ন্যায় আদর্শ ত্যাগী, গৌরাঙ্গের ন্যায় আদর্শ প্রেমিক, যুধিষ্ঠির রামচন্দ্রের ন্যায় আদর্শ রাজা, জনকের ন্যায় আদর্শ গৃহী, সীতাসাবিত্রীর ন্যায় আদর্শ রমণী, লক্ষ্মণের ন্যায় আদর্শ ভ্রাতা ইত্যাদি কতই না জন্মিয়াছেন। দেশের জলবায়ুর গুণে এখনও মহাপুরুষ ও গুণী জ্ঞানীর অভাব নাই। উচ্চ আদর্শ খুঁজিবার জন্য আমাদিগকে অন্য দেশে অনুসন্ধান করিতে হইবে না। এখনও এই দেশের মাটীতে কত ভাল জিনিষের বীজ সুপ্ত আছে। অনুকূল আবহাওয়া পাইলে তাহাতেই অঙ্কুরোদ্গম হইবে। কিন্তু সেগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা চাই। একমাত্র শিক্ষা-গুণেই এই দেশ উন্নত হইয়াছিল, আবার শিক্ষাদ্বারাই দেশকে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশের একমাত্র অভাব শিক্ষার।

অমুক নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, অমুক বিপথগামী হইয়াছে, অমুকের দোষে দেশের এই দুর্দ্দশা ইত্যাদি বলিলে নিষ্ঠীবন ঊর্দ্ধে নিক্ষেপের ন্যায় তাহা নিজের গায়েই আসিয়া পড়ে। সুতরাং এইরূপ কলহে সময়পাত না করিয়া আমাদের একযোগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দেশের যখন শিক্ষার অভাবই প্রকৃত রোগ, তখন এই দিকে সকলের সমবেতভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা পাশ্চাত্যের বাহ্যআড়ম্বরবিশিষ্ট বিলাসবাসনমুখী না হইয়া আমাদের প্রাচীন আদর্শ সংযম ও তপস্যায় ফুটিয়া উঠুক। আমরা আবার মানুষ হই। আবার দেবতার দেশে দেবচরিত্র ফুটিয়া উঠুক। জগতের আদর্শ এই দেশে ছিল,

আবার ইহাকে আদর্শ হইতে হইবে—পাশ্চাত্যের মিথ্যা ভ্রান্তির অনুসরণ করিয়া নহে, সত্যের অনুসরণে বীর্য্যলাভ করিয়া।

বিলাসব্যসনে বীর্য্যহানি হয়, সংযমে বীর্য্যলাভ হয়। এই সত্য প্রাচীন ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সত্য সমাজকে দান করিয়াছিলেন। ভারতীয় সাধনার মূলে এই তপস্যা, যে তপস্যায় যে সংযমে আমাদের বীর্য্য অর্থাৎ শক্তিলাভ হইত। এখন আমরা সংযমের নামে ভীত হই। এই সংযমের অভাবে আমাদের বীর্য্যহানি হইয়াছে। আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া চিত্ত ও দেহের উপর বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে।

সেকালে ছাত্রগণ গুরুগৃহে সংযম ও তপস্যার অনুকূল ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিত। এক্ষণে সে গুরুগৃহও নাই, ব্রহ্মচর্য্যও নাই। সুতরাং সংযমের অভাবে ছাত্রগণ বীর্য্যহীন হওয়ায় আর প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না এবং এইরূপ বীর্য্যহীন হইয়া সংসার ধর্ম্ম ও প্রণাসন পালনে সক্ষম হয় না। এই বীর্য্যহীন পিতার সন্তানগণ অল্পায়ু, ভগ্নস্বাস্থ্য, মূর্খ ও অঙ্গহীন হইয়া থাকে। এই সকল সন্তানগণই কালে সমাজ পরিচালন করে। সুতরাং সে সমাজের, সে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের এই দুর্দ্দশা।

দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া দেশের ভাবী ফল আরও কিরূপ ভীষণ দাঁড়াইবে, তাহা স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প হয়। ছাত্রগণকে বলি, তোমরা এখনও সাবধান হও। স্রোতে গা ভাসাইও না। দেশ যে কিরূপ উৎসন্নের পথে ছুটিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। শিক্ষার কথা দূরে থাক্, শিক্ষাক্ষেত্রগুলি এখন এমন ভাবেই কলুষিত হইয়াছে যে, ১০।১১ বৎসর কি তন্নিম্ন বয়ঃক্রম হইতে বালকগুলি সংসর্গদোষে অনৈসর্গিক উপায়ে শুক্র ক্ষয় করে। এই ব্যাধি এরূপ সংক্রামক হইয়াছে যে স্কুল কলেজের কোন ছেলে এমন নাই যে তাহাকে ঐ রোগে না পাইয়াছে। এই সকল বালক ইহার বিষময় ফল না বুঝিয়া অপরিণত, অপরিপুষ্ট শুক্র অনৈসর্গিক উপায়ে ব্যয় করিতে করিতে যখন একেবারে হৃতশুক্র ও ক্ষয় রোগগ্রস্ত হয়, তখন আর কোনও উপায় থাকে না। এরূপ কত ছেলে যে অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে। ঐ সকল বালক যখন উহার পরিণাম বুঝিতে পারে, তখন গোপনে চিকিৎসকের শরণাগত হয়, কিন্তু চিকিৎসকের অর্থোপার্জ্জন ছাড়া রোগীর আর রোগপ্রতিকার হয় না। তখন নানারূপ কৃচ্ছ ব্যাধির কবলে পড়িয়া জীবনের গণা দিন কয়টা হা-হুতাশেই কাটাইতে হয়। তখন তাহাদের জীবনে ধিক্কার আসে; কিন্তু তখন কাঁদিলে কি হইবে! এই ত বর্ত্তমানে ছাত্রদের অবস্থা! পিতামাতা ছেলেদের এই অবস্থা যে না জানেন, এমন নয়। কিন্তু তাঁহারাই বা কি করিবেন? দেশ যখন এই দিকেই ছুটিয়াছে, তখন তাহার গতিরোধ করিবে কে? এতটুকু সাহস ও বলবীর্য্য লইয়া আজকাল গৃহীরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম উদ্‌যাপন করেন! সুতরাং এই বীর্য্যহীন সমাজের দুর্দ্দশা যাহা হইবার তাহাই হইতেছে।

হে বালকবালিকাবৃন্দ, তোমরাই দেশের একমাত্র আশাভরসাস্থল, তোমরা তোমাদের এই অজ্ঞানকৃত দোষ দূর করিতে

চেষ্টা কর। তোমরা ছাত্রজীবনে তপস্যা ও সংযম দ্বারা বীর্য্য লাভ কর, শক্তিমান্ হও। তোমরাই দেশকে পরিচালিত করিবে, তোমাদের উপরই দেশের আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। তোমাদের এই অমূল্য জীবন ক্ষণিক উত্তেজনার বশে বিষময় করিয়া তুলিও না। তোমরা দেশের ভারস্বরূপ না হইয়া দেশের ভার লাঘব করিবার উপযুক্ত হও। তোমাদের সম্মুখে প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র। বালসুলভ চপলতাদোষে তোমাদের সুবর্ণময় ভবিষ্যৎ নষ্ট করিও না। যদি সমাজ তোমাদিগকে এখন সাহায্য না করে, তোমরা তোমাদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে চেষ্টা কর—স্বাবলম্বী হও। সংযত হও, তপস্বী হও, বীর্য্য লাভ কর। দেশ আবার তোমাদের পাইয়া ধন্য হউক। এই ঋষির দেশে আবার ঋষি হও। আবার গুণী জ্ঞানী হইয়া এই ভারতের মুখ উজ্জ্বল কর। পরানুকরণ পাপ, পরমুখাপেক্ষী হওয়া পশুবৃত্তি। এই পতিত দেশে, এই পরপদদলিত দেশে বিলাসব্যসন, হঠকারিতা, বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা শোভা পায় না। এই নিরন্ন দেশে কতলোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ বা অর্দ্ধোলঙ্গ রহিয়াছে, চিকিৎসাভাবে কত লোক অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে, শিক্ষার অভাবে কত লোক মূর্খ রহিয়াছে। তোমার দেশবাসী কুলীমজুরের ন্যায় অন্য কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত ভাবে জীবনপাত করিতেছে। আর তোমার কি উচিত, এত বিলাসব্যসন, এত আমোদপ্রমোদ? হ্যাটকোট, চসমা, ঘড়ি, মোটর, এই সকল ব্যবহার এই পরাধীন নিরন্ন দেশে শোভা পায়? ইহাতে নিজের জাতভাইকে উপহাস ও উপেক্ষা করা হয়, নিজের ইহাতে হীনত্বই প্রতিপন্ন হয়, কিছুমাত্র বাহাদুরি প্রকাশ পায় না।

সুতরাং হে প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, তোমরা জাতীয় জীবন হইতে এই কলঙ্ক অপনোদন কর, তোমরা আদর্শ চরিত্রবান্ হইয়া দেশের অভাব দূর কর, আর সত্যপিপাসু হও। আবার সংযম তপস্যার উপর তোমাদের চরিত্র গড়িয়া উঠুক, আবার ত্যাগ বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠুক। ইহাই আমাদের জাতীয়ত্ব, ইহাই আমাদের দেশের প্রকৃত শিক্ষা—যার জন্য এক দিন এই ভারত জগৎপূজ্য হইয়াছিল। এই ভারত চিরদিনই জগৎকে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে। কাহারও কাছে কোন দিন কাঙ্গাল বেশে কিছু প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু আমরা আমাদের সে গৌরব হারাইয়াছি তখনই যখনই আমাদিগকে আমরা হারাইয়াছি—আমাদের বৈশিষ্ট্য আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই।

সহজ সাধন

—ঃ{*}ঃ—

চিরন্তন সত্যকে যদি মানুষ ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস বশেও আবিষ্কার করে, তাতে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, অথবা তার কল্যাণ প্রভাব হতে মানুষ বঞ্চিত হয় না। কিন্তু উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি হয়ে গেলে কার্য্যক্ষেত্রে যখন আর সে সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, তখন অবিশ্বাসী মন অকর্ম্মণ্যতার অপরাধটা সেই সত্যের ঘাড়েই চাপিয়ে রেহাই পেতে চায়। সে ভাবে, তখন আমি যা জেনেছিলাম তা ভুল, নইলে তার নির্দ্দেশ মেনে পথ চলতেও ভুল হল কেন? তখন নূতন আর একটা সত্য আবিষ্কারের চেষ্টায় মানুষের মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার চাইতে পুরাতন সত্যকেই আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় তার চরম রূপটী দেখবার জন্য যে সাধক ব্যগ্র হয়ে ওঠে, মনের এই [illegible] ছলনা ও আত্মদ্বন্দ্ব হতে সেই সত্য সত্য বেঁচে যায়।

একটা উদাহরণ দিই। গুরুর কাছ থেকে যখন আমরা সেবাব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করি, তখন নব অনুরাগের প্রবল উচ্ছ্বাসে বলেছিলাম—সহজ কর্ম্মই সত্যলাভের পথ। সাধনক্ষেত্রের জন্য তখন আমাদের মোটেই কোনও ব্যগ্রতা ছিল না। আজ হয়ত সত্যকে পাবার জন্য আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছি, অথচ এদিকে কর্ম্মত্যাগ করে বসে আছি। ভাবছি, পাওয়ার একটা নূতন ফিকির খুঁজে বার করতে হবে; হয়তো সেটা ধ্যানে আছে, নয়তো জ্ঞানে, নয়তো ভাবুকতায়। কিন্তু সহজ কর্ম্মের পথটা যে পর্য্যন্ত যাচাই না হচ্ছে, সে পর্য্যন্ত মনকে নূতনের লোভে দিশেহারা করা কি সমীচীন হবে? এই কি বলব স্থৈর্য্যের লক্ষণ?

ইষ্টসিদ্ধি কে না চায়? আর কেই বা না জানে যে ইষ্টমূর্ত্তি স্থূল নয়; তার ভাবে গড়া তনু, আর সেই অতনু তনুতে সাধকের জগৎ আচ্ছন্ন করা যায়, তার কাছে তার ইষ্টমূর্ত্তিই নিত্য জগন্মূর্ত্তি। কিন্তু সাধারণ নজরে সামনে দেখছি, এই অতি স্থূল, অতি কঠিন জগতের বাস্তব মূর্ত্তি। এর মাঝে হিসাব নিকাশ, দায় ফ্যাসাদ রোগ শোক সবই আছে—অভাব শুধু ভাবের। যখন এই জগতের উৎপীড়নটাই জীবনে বিভীষিকা রূপে দেখা দেয়, তখন মনে হয়, আমার মনঃকল্পিত নন্দনবনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কোথায়?

সামঞ্জস্য নাই, তা মানি। কিন্তু সেই সামঞ্জস্য ঘটানোর জন্যই তো সাধনা। সিদ্ধ দৃষ্টিতে এই স্থূল জগতের অন্তরে বাহিরে সূক্ষ্মেরই জ্যোতির্ম্ময় সত্তা চোখে পড়ে। কিন্তু অসাধকের চোখে যদি তা না-ই পড়ে, তাতেই কি তার সত্তা মিথ্যা হয়ে যাবে? নন্দন কাননের স্বপ্ন দেখলেই তো হবে না, নিজের ভিতর যে মালমশলা আছে, তাই দিয়ে না নন্দনকানন তৈরী করে নিতে হবে।

এই স্বর্গ তৈরী করবার বায়নাটাই মানুষের মনুষ্যত্ব। এইখানেই তার সাধনা—পৌরুষের যাচাই। অরসিক উপহাস করে বলেছিল, "নিজের দেবতাকে যারা নিজ হাতে সৃষ্টি করে তাঁতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আস্পর্দ্ধা

কত! তারা আবার প্রাণ পাবে কিসে?" কিন্তু আমরা বলি, পৌত্তলিকতাই বৈদান্তিকতার চরমাদর্শ। যে দিন ভয় থাকবে না, দ্বিধা থাকবে না, সংশয় থাকবে না—একেবারে নিজের হাতে নিজের ইষ্টদেবতাকে গড়ে তুলতে পারব—তাও শুধু ভাবের বাষ্প দিয়ে নয়, এই কর্ম্মজগতের কঠিন বাস্তবতা দিয়ে, ঠিক আমার মতই মাটী দিয়ে তাকে গড়ে তুলতে পারব, সেই দিনই আমার সিদ্ধি।

তাই বলি, সহজ কর্ম্ম ছাড়া সহজ সাধন, একান্ত সাধন, সুত্য সাধন আর কোথায় পাব? সংযম তার পথ, মনন তার শক্তি। বাঁচে-মরে জগতে সবাই, কিন্তু সে খবর জানে কয় জনা? জন্মমৃত্যু রোধ করাটা তো আমার মুক্তির গরজ নয়—আমার মুক্তি হচ্ছে, সেই জানাতে। জানতে হলে শুধু চোখ মেলে চাইতে হয়—সত্যের আলো আপনি এসে চোখে পড়ে। এর মাঝে আজগুবি সাধনার ঠাঁই কোথায়?

ধ্যানযোগ

—*—

[প্রবক্তা—আচার্য্য নীলকণ্ঠ]

—*—

আত্মা কি, তাহা নিরূপণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে হয়। ধ্যানের চারিপ্রকার আলম্বন বা আশ্রয় ভেদে ধ্যানযোগ চারি প্রকার। পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই চারি প্রকার আলম্বনের কথা বলিয়াছেন—"প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য", "বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিঃ" "স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানমালম্বনং বা", "যথাভিমতধ্যানাদ্বা।" তাৎপর্য্য এই, নিম্নলিখিত চারিটী উপায়ে চিত্ত স্থির করা যাইতে পারে—(১) রেচক অথবা পূরকের অভ্যাসে বায়ু স্থির করিয়া তাহাই মনের অবলম্বন করিতে হয়; বায়ু স্থির হইলে মন স্থির হইবে, ইহা নিশ্চয়। (২) বাহিরের সূর্য্য, চন্দ্র বা তাহাদের কিরণ অথবা কোন প্রতিমা ইত্যাদি, অথবা নিজের মাঝেই নাসিকাগ্র বা জিহ্বাগ্র প্রভৃতিকে চিত্তের অবলম্বন করিলে চিত্ত স্থির হইবে। (৩) জাগ্রদবস্থা এবং নিদ্রাবস্থা, এই দুইটীর মাঝামাঝি "কেবল আমি আছি" —এই প্রকার যে অস্মিতামাত্রের বোধ, তাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করা যাইতে পারে। (৪) নিজের রুচি অনুযায়ী শিব অথবা বিষ্ণুর মূর্ত্তি, ষট্চক্র, দেবতা ইত্যাদির আলম্বনেও চিত্ত স্থির হয়। ইহা ছাড়াও চিত্ত স্থির করিবার অন্য উপায় আছে, কিন্তু

বিচার করিয়া দেখিলে সেগুলি ইহাদের মাঝেই পড়ে।

অধিকারিভেদে আবার এই ধ্যানকে বিতর্কাখ্য, বিচারাখ্য, বিবেকাখ্য ও নির্ব্বীজ—এই চারি ভাগ করা যাইতে পারে। ধর, মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়া সেই সূক্ষ্ম বিষয়ে কেহ চিত্তের প্রণিধান করিতেছে; ইহাকেই বলি বিচার, ইহা মধ্যমাধিকারীর ধ্যান। বিচারাখ্য ধ্যানকেও আবার সবিচার ও নির্ব্বিচার এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মূর্ত্তিভাবনা করিবার সময় যদি ধ্যেয়বিষয়ের প্রতিপাদক শব্দ ও তাহার অর্থের জ্ঞান চিত্তে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে তাহা সবিচার ধ্যান। ভাষা ও চিন্তা প্রথম অবস্থায় পরস্পর সাপেক্ষ থাকে বলিয়াই এরূপ হয়। শব্দ আর অর্থের উল্লেখ না থাকিলে তাহাকে বলি নির্ব্বিচার ধ্যান। আবার এই ধ্যানের বিষয়ই যদি সূক্ষ্ম মনঃকল্পিত বস্তু না হইয়া স্থূলমূর্ত্তিই হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিতর্কাখ্য ধ্যান বলে। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ইহারও সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক এই দুইটী ভেদ আছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বিচারেই হউক আর বিতর্কেই হউক, উভয়ত্র মানসিক কিম্বা ভৌতিক মূর্ত্তিই তো আলম্বন; কীটের যেমন ভ্রমরাবস্থায় পরিণতি হয়, মূর্ত্তির ধ্যানে সাধকও তেমনি করিয়া মূর্ত্তির সারূপ্যই লাভ করিবে। ইহাতে তাহার কৈবল্য বা মুক্তি হইবে না। তাহা হইলে মূর্ত্তিপূজা বা মূর্ত্তিধ্যান মুক্তির উপায় কি করিয়া বলা যাইতে পারে? —ইহার উত্তর এই, ধ্যান দুই প্রকার—ভাবনা ও প্রণিধান। সত্য অথবা কল্পিত কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া ভাবনা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে—এ ক্ষেত্রে বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান অনাবশ্যক। কিন্তু প্রণিধানরূপ ধ্যানের একটু বিশেষত্ব আছে। সামান্যতঃ একটা মণি দেখিতে পাইতেছ; ইহার বিশেষ কি গুণ, তাহা তুমি জান না, কিন্তু অপরে তাহা তোমাকে বলিয়া দিল। তখন তোমার সামান্য দর্শনে ব্যাপারিত সেই চক্ষু দুটীকেই যত্নসহকারে উক্ত মণিতে সংস্থাপিত করিলে। ইহাতে তোমার বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান হইবে। ইহাই প্রণিধান। প্রণিধান ছাড়া আমরা বস্তুর তত্ত্ব জানিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, স্ফটিক স্বতঃই স্বচ্ছ; কিন্তু যদি তাহার কাছে একটা জবাফুল থাকে, তাহা হইলে অপ্রণিহিতচিত্ত মধ্যমদর্শক স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া মনে করিবে। দর্শনের ভাষায়, স্ফটিকে সে রক্তবর্ণের অধ্যাস করিবে। অধম দর্শক হয়ত তাহাকে স্ফটিক বলিয়াই চিনিতে পারিবে না—সে মনে করিবে, এটা বুঝি পদ্মরাগ মণি। তাহার স্ফটিকে পদ্মরাগের অধ্যাস হইবে। আবার অতি মূঢ় দর্শক কখনও হয়ত জ্যোৎস্নাকেও ইন্দ্রনীল বলিয়া ভ্রম করিয়া বসে।

ঠিক এইরূপে দেখি—চিদাত্মা স্বতঃশুদ্ধ; মায়ার সান্নিধ্য হইলে তাঁহাকে বলি ঈশ্বর; অবিদ্যায় তাঁহার ব্রহ্মভাব আরও আচ্ছন্ন হইলে তাঁহাকে সূত্রাত্মা বলিয়া ভ্রম হয়; অবিদ্যা আরও প্রবল হইলে বিরাটের অধ্যাস হয়। এইরূপ অজ্ঞানের প্রবলতাবশতঃ অধ্যাসের গাঢ়তা জগতের সমস্ত বস্তুতেই হইতেছে। কোন বস্তুতে চিত্ত প্রণিধান করিলে পর পর এক একটী করিয়া অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাসটী অবশিষ্ট থাকে। আর যদি সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে স্ফটিকের মত উপাধিরহিত আত্মতত্ত্ব আপনিই প্রকাশিত হয়।

এখন ধর, তুমি ধ্যানের সবিতর্ক অবস্থায় আছ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের উল্লেখপূর্ব্বক স্থূল-মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছ। প্রণিধানের গাঢ়তা-বশতঃ ক্রমে তুমি নির্ব্বিতর্ক সূক্ষ্মধ্যান, সবিচার সূক্ষ্মধ্যান, এবং পরিশেষে নির্ব্বিচার সূক্ষ্মধ্যানে উপনীত হইলে। ইহার পর বিচারাখ্য ধ্যানের ফলে তোমার চিত্ত যখন ইষ্টমূর্ত্তির আকার ধারণ করিল, তখন সমগ্র মূর্ত্তিটীর ধ্যান না করিয়া এক একটী অবয়ব ছাড়িয়া দাও; অবশেষে শুধু তাঁহার মুখের হাসিটুকু বা চরণনখের জ্যোতিটুকুর মাত্র ধ্যান করিতে থাক। তার পর তাহাও ছাড়িয়া দিয়া গুরুপ্রদর্শিত উপায়ে বিন্দু হইতে মনকে বিরাটে নিয়া ফেল। এইরূপে পূর্ব্বোক্তক্রমে নির্গুণের ধারণা হইবে।

বিতর্কধ্যানে স্থূলপ্রতিমায় যদি চিত্ত প্রণিধান করিতে পার, তবে তাহাতেও তত্ত্বজ্ঞান হইবে, ইহা অযৌক্তিক নহে। সচেতন পুরুষকে যদি স্থাণু বলিয়া ভ্রম কর, তাহা হইলে সে তোমার কাছে অচেতন; কিন্তু তথাপি তাহার স্বরূপ চৈতন্যই বটে। তেমনি প্রতিমার স্থূলে অভিব্যক্ত বিরাট্‌রূপে অচৈতন্যের অধ্যাস বা ভ্রম হওয়ায়, তোমার কাছে প্রতিমা অচেতন; কিন্তু বাস্তবিক তাহার তত্ত্ব চৈতন্য। একটা উদাহরণ দিই। ধর, ঝিনুকে তোমার রূপা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু যদি তীব্র অভিনিবেশ সহকারে তাহার দিকে চাহিয়া থাক, তাহা হইলে রূপা গিয়া ঝিনুকটাই তোমার চোখে ফুটিয়া উঠিবে। এমনি করিয়া প্রতিমাকে যদি ভগবান জ্ঞানে তীব্র অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা কর, তাহা হইলে তাহার জড়ত্ব দূর হইয়া চৈতন্যের স্বতঃই আবির্ভাব হইবে। বাণরাজা শিবের সঙ্গে কথা বলিতেন ইত্যাকার যে অনেক আখ্যায়িকা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই।

এ তো গেল অচেতনরূপে কল্পিত প্রতিমার কথা। চেতন মূর্ত্তিরও এই একই তত্ত্ব। তাহারও স্বরূপ—বিশ্বরূপ। তীব্র অভিনিবেশ সহকারে কোনও চেতনমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাক, বিশ্বরূপের আবির্ভাব দেখিতে পাইবে। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখে, অর্জ্জুন তাঁহার শরীরে এইরূপেই বিশ্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সুতরাং বিতর্কধ্যান বা বিচারধ্যান উপহাসের বিষয় নয়। এই বিতর্কজাত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যোগভাষ্যে ব্যাসদেব বলিতেছেন—"ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ; আগম ও অনুমান প্রমাণের ইহাই বীজ।" নির্ব্বিচার ধ্যানের পরিপাকে সর্ব্বজ্ঞতা পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, পতঞ্জলি যোগসূত্রে তাহাও বলিয়াছেন—"নির্ব্বিচার ধ্যানে পরিপক্ব হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ হয় এবং তাহা হইতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।" ইহার পর পূর্ব্বোক্ত ক্রম অনুসারী নির্গুণে চিত্ত লয় করা যায়। দেহ ভুলিয়া গিয়া চিত্ত যখন সর্ব্বতোভাবে বাহ্যমূর্ত্তির আকার ধারণ করে, তখন কীট ভৃঙ্গে পরিণত হইলে তাহার কীটভাব যেমন দূর হইয়া যায়, তেমনি সাধকেরও জীবভাব দূর হইয়া কেবল ইষ্টমূর্ত্তির আকার হইয়া যায়। যোগসূত্রে ইহাকে মহাবিদেহা ধারণা নাম দেওয়া হইয়াছে।

যে বিতর্ক ও বিচার ধ্যানের কথা বলিলাম, তাঁহাদের আলম্বন ব্যক্ত; উহারা অধম ও মধ্যম অধিকারীরই উপযুক্ত। আবার অব্যক্তকে আলম্বন করিয়া দুই প্রকার ধ্যান

আছে—সানন্দ ও সাস্মিত; উহারা উত্তম ও অত্যুত্তম অধিকারীর উপযুক্ত। গুরুপ্রদর্শিত উপায়ে অব্যক্তে চিত্ত ধারণা করিলে যখন একেবারেই দেহ ভুল হইয়া যায় তখন "আমিই এই সমস্ত হইয়াছি"—এইরূপ বেদান্তপ্রোক্ত অনুভূতি হয় এবং সর্ব্বাত্মকতা, সর্ব্বকামতা প্রভৃতি ঈশ্বরগুণসমূহ সাধকে স্ফুরিত হয়। ইহাই সানন্দ ধ্যান। আবার এই সমস্ত গুণ দূর হইয়া গিয়া যদি কেবল অস্মিতাবোধটুকু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা সাস্মিত ধ্যান। ইহাকেই বিবেকাখ্য ধ্যান বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃতি ও পুরুষ যে বিবিক্ত বা পৃথক, এই জ্ঞান আবির্ভূত হয়; শাস্ত্রে ইহাকেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ বলে। অত্যুত্তম অধিকারীর পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া সমস্ত ভোগবাসনা নিঃশেষে নষ্ট হইলে যোগৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব না হইয়াও এই বিবেক উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য ইহাকে মুখ্যধ্যান বলা হয়। সানন্দ ধ্যানকে ইহারই অন্তর্গত ধরিয়া বিতর্ক, বিচার ও বিবেক এই তিন প্রকার ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে।

বিবেকধ্যানের আলম্বন অব্যক্ত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই আলম্বন সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে—"ঘুম হইবার পূর্ব্বে এবং জাগার ঠিক পরেই যে ভাব অনুভূত হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভাবনা প্রবর্ত্তিত করিলে অক্ষয় সুখ ভোগ করা যায়।" কিন্তু তথাপি গুরূপদেশ ছাড়া এই পথে চলা বড় কঠিন ও কষ্টসাধ্য—বিশেষতঃ দেহাভিমানীর পক্ষে। গীতাতেও আছে "অব্যক্তে আসক্তচিত্তের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে।"

চারি প্রকার ধ্যানযোগের মধ্যে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও চৈতন্য লইয়া বিতর্ক; সূক্ষ্ম, কারণ ও চৈতন্য লইয়া বিচার; কারণ ও চৈতন্য লইয়া বিবেক; নির্ব্বীজ ধ্যানই কৈবল্য বা মুক্তি। সমস্ত সাধনার উহা ফলস্বরূপ, কাজেই উহাকে সাধনরূপে না ধরাই ভাল।

সন্ন্যাসী

রমাৎ, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী, বল্লভাচারী, আউল, বাউল, চরণদাসী, মধ্বাচারী, সৎনামী আদি বহু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আছে। একদিন এই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীয়ে ত্যাগ বৈরাগ্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ভারতের বুকে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়পতাকা উঠাই সগর্ব্বে ভারতের মূল ধর্ম্ম ত্যাগ-বৈরাগ্য প্রচার করিছিল, একদিন এই লোকে সকলো প্রকার উন্নতির চরম সীমাত উপনীত হৈছো, শিয়াল-কুকুরর দরে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুত ভোল নগৈ পরমার্থ লাভত আত্ম নিয়োগ করিছিল।

এই সম্প্রদায়বিলাক বিভিন্ন হলেও, সকলোরেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দুই শ্রেণীর। এক বিবেকী, অপর ভক্ত। যি সকলে আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা আত্মস্বরূপ লাভর আশাত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে, তেঁওলোক বিবেকী,

আৰু যি সকলে সচ্চিদানন্দবিগ্ৰহ লাভৰ আশাত ব্যাকুল হৈ গৃহস্থাশ্ৰম ত্যাগ কৰে, তেঁওলোক ভক্ত নামে পৰিচিত। দুয়োৰো ভাব পৃথক হলেও মূলত এক ত্যাগবৈৰাগ্যই তাৰ ঘাই কাৰণ। কাজেই উভয়েই সন্ন্যাসী।

আগৰ দিনত গৃহস্থই নিজৰ লৰা এটী সন্ন্যাসী কৰিব পাৰিলে বংশ ও নিজক ধন্য জ্ঞান কৰিছিল, কিন্তু আজিকালি শিক্ষাৰ দোষতেই হওক নাইবা দীক্ষাৰ দোষতেই হওক, তাৰ বিপৰীত ভাবহে দেখা যায়। যদি কোনো লৰাই নিয়মসংযমাদি পালন কৰে, নিৰামিষ আহাৰ কৰে, নাইবা সদ্‌গ্ৰন্থ পাঠ কিম্বা সাধুসঙ্গ কৰে, তেন্তে মাকবাপেকৰ এটা বিশেষ ভয়ৰ কাৰণ হয়। হবৰেই কথা; কাৰণ আজি প্ৰকৃতিৰ অধঃস্ৰোতত পৰি সকলোৰেই ভাবনীয় শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত; কাজেই সন্ন্যাসীৰ মহোচ্চ গভীৰ তত্ত্ব বুজিবলৈ অপাৰগ। নতুবা আজিকালি অধিকাংশ সন্ন্যাসী উন্মাৰ্গ হোৱা দেখিহে হয়তো পুতেকক সেই পথে যাবলৈ দিয়াত দ্বিধা বোধ কৰে। ভগৱান গৌৰাঙ্গদেৱৰ ককায়েক বিশ্বৰূপে যেতিয়া গৃহস্থাশ্ৰম ত্যাগ কৰি সন্ন্যাসাশ্ৰমলৈ গ'ল, তেতিয়া মাকবাপেকে ব্যাকুল হৈ নিজ ইষ্টদেৱৰ ওচৰত কান্দি কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, "যেন মোৰ বিশ্বৰূপ আকৌ ঘৰলৈ উলটি আহে।" ধন্য মাকবাপেক! পুতেক সন্ন্যাসী হৈ পুনৰ ঘৰলৈ উলটি আহিলে পতিত হব, সেই কাৰণে পুত্ৰবৎসল মাকবাপেকে পুত্ৰশোকত মৃতপ্ৰায় হয়ো পুত্ৰৰ মঙ্গল কামনা কৰিছিল। এনেকুৱা মাকবাপেক নহলে কি গৌৰাঙ্গৰ দৰে পুত্ৰলাভ হয়। আধ্যাত্মিক গভীৰ চিন্তানিৰত ভগৱদ্ভাববিভোৰ ভাৰতেই মাথোন এদিন তাৰস্বৰে গাইছিল—

কুলং পবিত্ৰং জননী কৃতাৰ্থা
বসুন্ধৰা পুণ্যবতী চ তেন।
অপাৰসম্বিৎসুখসাগৰেঽস্মিন্
লীনং পৰে ব্ৰহ্মণি যস্য চেতঃ॥

অপাৰ সচ্চিদানন্দসমুদ্ৰস্বৰূপ ব্ৰহ্মত যাৰ চিত্ত বিলীন হয়, তেঁওৰ দ্বাৰা কুল পবিত্ৰ, জননী কৃতাৰ্থা ও বসুমতী পবিত্ৰা হয়। তেন্তেই দেখা, সন্ন্যাসীৰ আসন কিমান উচ্চত। সেই দেখিয়েই শিৱাৱতাৰ শঙ্কৰাচাৰ্য্যেও এই কৌপীনধাৰী সন্ন্যাসীসকলক উদ্দেশ কৰি গাই গৈছে—

বেদান্তবাক্যেষু সদা ৰমন্তো,
ভিক্ষান্নমাত্ৰেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকৰণে চৰন্তঃ,
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বৈদিক মতে সন্ন্যাসী হবলৈ হলে জীৱনৰ শেষ ভাগত হোৱাই কৰ্ত্তব্য। দ্বিজকুমাৰে প্ৰথমে সাবিত্ৰী মন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰি দণ্ডধাৰণ কৰি গুৰু ঘৰলৈ যায়। গুৰুঘৰত থাকি ব্ৰহ্মাভ্যাসৰ লগে লগে নিজ নিজ ধৰ্ম্ম, বেদ, শাস্ত্ৰাদিজ্ঞান, ও চিত্ত সংযম আদি শিক্ষা কৰিব। বিদ্যা শিক্ষা ও সংযম অভ্যাসৰ দ্বাৰা চিত্ত যেতিয়া স্থিৰ হৈ জ্ঞানৰ বিকাশ হব, তেতিয়া নিজ ঘৰলৈ সমাবৰ্ত্তন হৈ শাস্ত্ৰোক্ত মতে বিয়া কৰাই গাৰ্হস্থ্যাশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিব। এই আশ্ৰমত থাকি শাস্ত্ৰীয় ক্ৰিয়াকলাপ কৰি ধৰ্ম্মাৰ্থে পুত্ৰ উৎপাদন কৰিব। তাৰ পাচত বানপ্ৰস্থ। এই আশ্ৰমত উপনীত হলে গৃহকৰ্ত্তৃৰ সকলো ভাৰ পুত্ৰৰ হাতত গতাই দি নিজে আত্মানাত্ম বিচাৰ কৰিব; আৰু যেতিয়া তীব্ৰ বৈৰাগ্য হব, তেতিয়া সন্ন্যাসগ্ৰহণ কৰিব। এয়ে শাস্ত্ৰীয় মতে সন্ন্যাসীৰ পথ।

কিন্তু ব্ৰহ্মচৰ্য্যাশ্ৰমতেই যাৰ জিহ্বোপস্থ সংযত হৈ বিষয় বৈৰাগ্য উপস্থিত হয়, তেওঁৰ কাৰণে অন্য কোনো আশ্ৰমৰেই আৰু প্ৰয়োজন নাই, অইন কি সন্ন্যাসৰো দৰকাৰ নকৰে। যি সকলে গাৰ্হস্থ্যাশ্ৰমত থাকি বিষয়ত আসক্ত হৈ পৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণেই সন্ন্যাসাশ্ৰম বিহিত। তাকো উপযুক্ত সময়ত গ্ৰহণ কৰা কৰ্ত্তব্য। নতুবা যি বুঢ়া মাকবাপেক, পতিব্ৰতা স্ত্ৰী আৰু কেঁচুৱা লৰাক ত্যাগ কৰি সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰে, সি মহাপাতকী—

মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ
স্ত্ৰীবধী ব্ৰহ্মঘাতকঃ।
অসন্তৰ্প্য স্বপিত্ৰাদীন্
যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্ৰমে॥

যি লোকে পিতৃ মাতৃ লৰা তিৰোতাক ভৰণ পোষণ ও সুখী নকৰি সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰে, সি মাতৃবধ, পিতৃবধ, স্ত্ৰীবধ ও ব্ৰহ্মবধ পাতকত পৰে। সেই কাৰণে শাস্ত্ৰত আছে—

বিদ্যামুপাৰ্জ্জয়েদ্ বাল্যে
ধনং দাৰাংশ্চ যৌবনে।
প্ৰৌঢ়ে ধৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মাণি
চতুৰ্থে প্ৰব্ৰজেৎ সুধীঃ॥

লৰা কালত বিদ্যা উপাৰ্জ্জন, যৌবনত ধন, আত্মীয়াৰ্থ ধৰ্ম্ম ও বুঢ়াত সন্ন্যাস অৰ্জ্জন কৰিব। শাস্ত্ৰীয় আদেশ ইমান কঠোৰভাবে থাকোতেও যে বুদ্ধদেব, শঙ্কৰাচাৰ্য্য, কপিলদেব, শুকদেব, গৌৰাঙ্গদেব আদি অৱতাৰ সকলে আত্মীয়স্বজনক শোক সাগৰত পেলাই সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিলে, এওঁলোক কিতেন্তে পাতকী? নহয়, এওঁলোকৰ দ্বাৰা এয়ে প্ৰমাণিত হল যে, প্ৰকৃত বৈৰাগ্য উপনীত হলে কালাকাল বিচাৰ নকৰি যি কোনো সময়তে সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। এই কাৰণেই শাস্ত্ৰত "তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে" আদি বাক্য দ্বাৰা সন্ন্যাসৰ অধিকাৰ নিৰ্ণয় কৰি গৈছে। ভগবানৰ প্ৰেমাকৰ্ষণ যি অনুভৱ কৰিছে, যি এবাৰ ভগবানৰ প্ৰেমানন্দ স্বৰূপ আস্বাদ লাভ কৰিছে, তেওঁৰ ওচৰত শাস্ত্ৰ যুক্তিৰ মৰ্য্যাদা ৰক্ষণীয় নহয়। সেই কাৰণেই প্ৰেমৰ মহাজন শ্ৰীমৎ ৰূপগোস্বামীয়ে কৈ গৈছে—

তত্তদ্ভাবাদি মাধুৰ্য্যে
শ্ৰুতে ধীৰ্যদপেক্ষতে।
নাত্ৰ শাস্ত্ৰং ন যুক্তিঞ্চ
তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥

সেই মাধুৰ্য্য ভাব উদয় হলে যুক্তি কিম্বা শাস্ত্ৰোক্ত বিধি মানিবৰ সময় নেথাকে। অতএব উপৰোক্ত শাস্ত্ৰবাক্যবোৰ অনধিকাৰৰ শাসন মাত্ৰ। ব্ৰহ্মচৰ্য্য মুক্তিকল্পতৰুৰ মূল, গাৰ্হস্থ্য তাৰ ডালপাতযুক্ত গা-গছ, বানপ্ৰস্থ তাৰ মুকুল ও সন্ন্যাস তাৰ শান্তিসুধাৰসভৰা পকা ফল। এই অমৃতময় ফল যি লাভ কৰা নাই, তাৰ জীৱনত লাভ কি? কাজেই তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলেই সংসাৰলালসা পৰিত্যাগ কৰি সন্ন্যাসাশ্ৰম গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন।

ভগবান্ শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ধৱৰ ওচৰত "সন্ন্যাসঃ শীৰ্ষণি স্থিতঃ" অৰ্থাৎ সন্ন্যাস মোৰ মূৰত স্থিত বুলি সন্ন্যাসাশ্ৰমৰ গুৰুত্ব বুজাই গৈছে। কিন্তু আজিকালি শিক্ষাৰ অভাবতেই হওক বা প্ৰকৃত সন্ন্যাসীৰ অভাবতেই হওক সাধাৰণৰ সন্ন্যাস আশ্ৰমৰ প্ৰতি এটা হেয়ভাব উপস্থিত হৈছে। এয়ে দেশৰ অকল্যাণৰ মাই কাৰণ। যি পৰিমিত সন্ন্যাসীৰ প্ৰতি আদৰ নহয়, যি পৰিমিত সন্ন্যাসীৰ লগত গৃহস্থৰ এটা সম্বন্ধ

স্থাপিত নহয়, সেই পৰিমিত দেশৰ যে বিশেষ কিবা উপকাৰ হব, তাক কব নোৱাৰি।

মুক্তিকল্পতৰুৰ ফল ভক্ষণৰ যদি ইচ্ছা থাকে, তেন্তে সন্ন্যাস আশ্ৰম গ্ৰহণ কৰা নিতান্ত প্ৰয়োজন। ই হিন্দু, বুদ্ধ, মুচলমান, খৃষ্টান আদি সকলো জাতিৰ আচাৰ্য্য সকলৰ অনুমোদিত পথ। কিন্তু আজি হিন্দুধৰ্ম্মানু-মোদিত ব্ৰহ্মচৰ্য্যৰূপ মূল নোহোৱাত মুক্তি কল্পতৰুৰ অন্যান্য অঙ্গবোৰো শ্ৰীহীন ও নীৰস হৈ পৰিছে। এই কাৰণেই গাৰ্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই দুই আশ্ৰমেই ক্ষীণ হাবচালবিশিষ্ট হৈ পৰিছে। আজিকালি বিদ্যা, জ্ঞান ও সংযম শিক্ষা হওক বা নহওক, দীঘল চুলিডাৰি ৰাখি ভাবহীন কেইটামান বাহ্যিক নিয়ম পালি চলিব পাৰিলেই সি সমাজৰ ওচৰত ব্ৰহ্মচাৰী। দেৱকৃত পিতৃকৃত স্বাধ্যায় ও আশ্ৰ-মোচিত অন্যান্য ক্ৰিয়া কৰক নকৰক, বিয়া কৰি কিছুমান সন্তান উৎপাদন কৰিব পাৰি-লেই সি মস্ত গৃহস্থ। কেইটামান বুজৰুকি শিকি শাস্ত্ৰৰ দুই এটা শ্লোক আওৰাই গৈৰিক বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলেই তেঁও সাধু। শিক্ষিতা বোৱাৰীৰ মন্ত্ৰণাত পুত্ৰই ঘৰৰ পৰা খেদাই দিলে বানপ্ৰস্থ; আৰু প্ৰাণ বায়ু বাহিৰ হলে নশ্বৰ দেহ জীৰ্ণ বস্ত্ৰেৰে আচ্ছাদিত কৰি শ্মশানত পেলালেই সন্ন্যাস সিদ্ধ—পূৰ্ণ সমাধি।

সন্ন্যাস হেন পাপপুণ্যাতীত পবিত্ৰ আশ্ৰম আজিকালিৰ প্ৰভাৱত সাধাৰণৰ চকুত সন্দেহ ও হেয় দৃষ্টিত পৰিব লগা হৈছে; কি কুক্ষণত ৰাক্ষসৰাজ ৰাৱণে কপট সন্ন্যাসীৰ বেশ ধৰি সীতাক হৰণ কৰিলে, কব নোৱাৰিছোঁ। সেই অৱধি চোৰ ডকাইত, নৰঘাতক, বদমাইস লোকে দুৰভিসন্ধি সাধিবলৈ সন্ন্যাসীৰ বেশ ধাৰণ কৰা হল। সন্ন্যাসী হিন্দুসমাজৰ শীৰ্ষ স্থানীয়; সেই কাৰণে হিন্দুৱে সাধু সন্ন্যাসীক অকপটে শ্ৰদ্ধা ও ভক্তি কৰে ও তিৰোতা সকল নিঃসঙ্কোচে তেঁওলোকৰ আগত ওলায়, এই কাৰণেই বদমাইস লোকে নিজ দুৰভিসন্ধি সাধিবলৈ সন্ন্যাসীৰ বেশ ধৰি সমাজৰ নানা ক্ষতি কৰিছে। ভাল বস্তুৰেই নকল হয়। ইও সন্ন্যাস আশ্ৰমৰেই মহত্ত্ব ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু সাধাৰণ লোকে বাৰে বাৰে এই দৰে ভণ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হৈ সন্ন্যাসীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি কমি অহাৰ কাৰণ হৈছে। বিশেষতঃ অপৰিশুদ্ধ চিত্তবশতঃ সাধাৰণে প্ৰকৃত সাধুক চিনিবৰো শক্তি নোহোৱা হৈ পৰিছে। "সাঁচ কহে ত মাৰে লাঠি; ঝুটা জগৎ পতিয়ায়;" কাজেই বচনৰচনবাগীশ ভণ্ডই সমাজক ভুলাই নিজৰ মতলব সিদ্ধি কৰে। প্ৰকৃত সাধুক অগ্ৰাহ্য কৰি, আপোন হৃদয়ৰ আদৰ্শ অনুযায়ী জটাজূট সমাযুক্ত চিমটা খৰম কমণ্ডলুধাৰী সন্ন্যাসীৰ অনুসৰণ কৰে। তেওঁলোকে প্ৰকৃত সাধুৰ ওচৰলৈ গৈ ভাল নেপায়, কাজেই সতৰ পৰা আঁতৰি থাকে। কাজেই সমাজৰ দুৰ্দ্দশা দিনে দিনে বাঢ়িছে। আৰু সাধু সন্ন্যাসীয়ে সমাজৰ পৰা বিতাৰিত হৈ হাবিজঙ্গলত আশ্ৰয় লৈছে। বদমাইসে বেশ ধাৰণ কৰি সমাজক ঠগাই ফুৰিছে। নহলে সাধু সূৰ্য্যস্বৰূপ। কোনেও নেদেখিলেও অধ্যাত্ম চকু যাৰ আছে, তেওঁৰ ওচৰত অপ্ৰকাশিত নহয়। সাধুৰ মূৰ্ত্তি শান্ত ও আনন্দময়। যাৰ ওচৰলৈ আহিলে ত্ৰিতাপক্লিষ্ট জীৱেই ক্ষন্তেকলৈ হলেও শান্তি পায়, সেয়ে প্ৰকৃত সাধু। ইয়াৰ বাহি-ৰেও সাধুৰ বহুত লক্ষণ শাস্ত্ৰত আছে, কিন্তু সেই বুলি ইন্দ্ৰজাল ও শক্তিমত্তা সাধুৰ লক্ষণ বুলি কোনো শাস্ত্ৰতে লেখা নাই। আৰু

সাধাৰণ বুদ্ধিৰে চালেও দেখা যায় যে, প্ৰকৃত সাধুৰ অভাব কি? কিয়নো তেওঁ বাহিৰ কাৰ্য্য দেখুৱাই সমাজক মোহিত কৰিবলৈ যাব? তেওঁলোক আছে অজ্ঞানী, পাপী, ত্ৰিতাপক্লিষ্ট জীবক শান্তি দিবলৈ। বুজৰুকি দেখুৱাই সমাজক ভুলোৱাটো উদ্দেশ্য নহয়।

এই কাৰণেই কওঁ যে ভণ্ডৰ ভণ্ডামীত ভোল নগৈ প্ৰকৃত সাধুৰ অনুসৰণ কৰা, যদি তোমাৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে। এই ভণ্ডবোৰক বিশ্বাস কৰি তোমাৰ জীবনক লক্ষ্যহীন কৰা সমাজৰ পক্ষে বৰ অমঙ্গলজনক।

স্বামী রামতীর্থ

—:*:—

(ছাত্রজীবন)

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বহির্ম্মুখীনতাই আমাদের দেশের বর্ত্তমান ছাত্রজীবনের একমাত্র অভিশাপ। বিজাতীয় সভ্যতা ও বৈদেশিক শিক্ষা-নীতির কল্যাণে এই পাপের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্রজীবনে অসংযম ও ব্যসনাসক্তির মূলেই এই বহির্ম্মুখীনতা। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া ও আমোদআহ্লাদ করিয়া বেড়ানো ইত্যাদি সমস্ত প্রকার বিলাসব্যসনই চিত্তের অধোবাহী গতিরই পরিচয় দিয়া থাকে। আমরা অবশ্য বাহ্যিক ত্যাগকেই বড় মনে করি না; কিন্তু যেখানে মানুষ মোটেই ভিতরের দিকে নজর দিতে চায় না, বহিঃসর্ব্বস্ব হইয়া আত্মহত্যা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, সেখানে বাহিরটাকেও লজ্জা দিবার প্রয়োজন আছে। বাহিরের তুলনায় তীর্থরামের নিঃস্পৃহ অকিঞ্চন ছাত্রজীবনের কাছে আজকালকার অনেক ছাত্রই লজ্জা পাইতে পারে। তীর্থরামকে মানুষ হইতে হইয়াছে সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করিয়া; এমন কি নিজের গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজেই জোটাইয়া লইতে হইয়াছে; আর এইটুকু জুটাইতেই তাঁহাকে কতখানি সহিতে হইয়াছে, তাহাও কাহারও অজানা নয়। নিজের কষ্টের উপার্জ্জন লইয়া যদি কেহ ছিনিমিনি খেলে, তাহাতে তাহাকে দোষী করিলেও দায়ী করা যায় না; কিন্তু যাহারা পরাবলম্বী হইয়া, পরের খাইয়া, পরের পরিয়া, বাবুগিরি করিতে লজ্জাবোধ করে না, তাহাদিগকে আর কি বলিবার আছে?

তবুও আমরা বলি, এটা বাহিরের বিচার। তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলাম, তীর্থরামের বিলাসব্যসনবর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন জীবন তাঁহার চেষ্টাকৃত নহে। অভাবে পড়িয়াই তিনি এত সাদাসিধা ভাবে চলিতেন; সঙ্গতি থাকিলে কি করিতেন কে বলিতে পারে? এ কথার মাঝে কতকটা যৌক্তিকতা আছে বটে। কিন্তু আমরা জানি, অভাবের মাঝেই থাকি, আর স্বচ্ছলতার মাঝেই থাকি, আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—পারিপার্শ্বিককে আমরা যে ভাবে গ্রহণ করিতেছি, সেই দৃষ্টি দিয়া।

অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়াও যদি কাহারও স্বভাবের স্নিগ্ধতা লোপ না পায়, মুখের শিশুসুলভ হাসিটুকু ম্লান না হয়, তবে বুঝিব মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় সেই পার হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাব অভাবের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের জীবনকে একটী নিরূপিত লক্ষ্যের অভিমুখে প্রণোদিত করিবার সামর্থ্য যে রাখে, তাহাকেই বলি মানুষ। সে তো কেবল বাহির দেখে না—সে দেখে অন্তরের চিরন্তন সত্যকে। যে কোনও অবস্থার মাঝে পড়িয়াও অন্তরের এই সত্যকে স্ফুরিত ও জয়যুক্ত করাই তাহার পণ। আমরা তীর্থরামের জীবনে এই অটুট সত্যসঙ্কল্প, এই অবিচল সত্যপ্রতিষ্ঠার সাধনাই মূর্ত্তিমতী দেখিতে পাই। তিনি যদি গরীবের ঘরে না জন্মিয়া রাজার ঘরেও জন্মিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার দৃষ্টি এমনি করিয়া অন্তরের দিকেই নিবদ্ধ থাকি—বিলাসব্যসনের মত্ততা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। সুখে দুঃখে এমন সদানন্দ, আত্মসাধনায় এমন তৎপর কয়টি ছাত্র আমাদের দেশে মিলে? তাহা ছাড়া বিশ্বহিতে আত্মদানের লক্ষ্য লইয়া কয়টি ছাত্র জ্ঞানার্জ্জনকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে?

তীর্থরামের এই অন্তরের কথাটী বুঝিতে পারিলেই তাঁহার আচার ব্যবহারের মর্ম্ম তাৎপর্য্যটী আমরা বুঝিতে পারিব। ছাত্রজীবনে বিলাসব্যসনের আমরা বহু নিন্দা করিয়াছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছি, বাহিরের চেয়ে ভিতরটাই আমরা বড় বলিয়া জানি। এই ভিতরের দৃষ্টি আয়ত্ত হইলে ছাত্রজীবনের কৃচ্ছ্রতার একটী নূতন তাৎপর্য্য আমাদের চোখে পড়ে। শাস্ত্রে ইহাকে বলে অপরিগ্রহ। ইহার অর্থ এই, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর যতটুকু আমার প্রাণধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, আমরা ততটুকু মাত্রই গ্রহণ করিব, ইহার অতিরিক্ত কেহ যাচিয়া দিলেও লইব না। অন্তর্ম্মুখী লক্ষ্য না হইলে অপরিগ্রহের স্বরূপ বোঝা যায় না। কতটুকু ভোগবর্জন করিলে তাহা ত্যাগের উদ্‌যাপক হইবে, ইহা মানুষ সব সময় বিচার করিয়া উঠিতে পারে না। ফলে আত্মপীড়ন ও আত্মপ্রবঞ্চনা উভয়ের হাতেই তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হয়। ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বই এইখানে। তীর্থরামের জীবনকে যদি আমরা অপরিগ্রহের দিক দিয়া বিচার করি, তাহা হইলে তাঁহার সংযম ও কৃচ্ছ্রতার উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে পারিব। আর তাঁহার ছাত্রজীবন যদি আমাদের ছাত্রদের অনুকরণীয় হয়, তাহা হইলে ব্যর্থ বাহ্যিক অনুকরণের দুর্ভোগ হইতে বাঁচাইয়া এই অপরিগ্রহের আদর্শই তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। তীর্থরামের মত তাহারা বুঝুক,—"বাহিরকে আমি কেয়ার করি না, আমার রাজত্ব ভিতরে; আমার জন্য আমি খাটি না, আমি খাটি জগতের জন্য; জ্ঞানের অনুশীলনে শুধু আত্মার আনন্দময় বিকাশ অনুভব করাই আমার লক্ষ্য; মরি আর বাঁচি, এই সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইব না।" ছাত্রজীবনের ইহাই মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র জপে বিলাসাসক্তি, অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হয়; চিত্ত নির্ম্মল হয়, তপস্যা সহজ হয়।

এই তো গেল সূক্ষ্ম বিচার। আর একটী স্থূল কথার উপর তীর্থরাম বরাবর জোর দিয়াছেন, আধুনিক ছাত্রদিগকে আমরা তাহাও লক্ষ্য করিতে বলি। তীর্থরাম বারবার বলিতেন, "তোমার মন খারাপ হইয়াছে কেন জান? নিশ্চয় তোমার পেটে অসুখ হইয়াছে।"

কথাটা শুনিতে অদ্ভুত বটে, কিন্তু ইহার মূলে একটা গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন—তিনটীই জীবের স্বভাব। স্বভাব বলিয়াই ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করা বড় কঠিন; আর ইহাদিগকে আয়ত্ত করাই সিদ্ধি। ছাত্রদিগকে এই কথাটী বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের মূল ভিত্তিই এই ত্রিবিধ সংযমে। সাধারণতঃ ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আমরা মৈথুনবর্জ্জনই বুঝিয়া থাকি। তাই চরিত্রকে এই দিক দিয়া বিশুদ্ধ রাখিতে পারিলেই আমরা যথেষ্ট হইল মনে করি। কিন্তু আহার ও নিদ্রার উপর কর্তৃত্ব না জন্মিলে বীর্য্যধারণ কখনও সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে না। বিশেষতঃ আহারের সংযম এ বিষয়ে সব চেয়ে প্রয়োজন। নিদ্রার বিলাসের অবকাশ ততখানি নাই, তাই সেটা মানুষকে তত উদ্‌ভ্রান্ত করে না। কিন্তু খাওয়ার মাঝে মানুষের কারিগরি যথেষ্ট আছে বলিয়া ভুলও সে ক্ষেত্রে বেশী হয়। উপনিষদে আছে, আহার শুদ্ধে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। কথাটা একেবারে সহজ ভাবেই সত্য, আহার শব্দের এখানে টানিয়া-বুনিয়া অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই। এই গোড়ার কথাটাকেই উনি বিশেষ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি ঠিক বুঝিয়াছিলেন, দেহের রোগই বল, আর মনের রোগই বল, পেটের রোগই সকলের মূল। তাই সমস্ত ছাত্রজীবনে আহারসংযম তাঁহার বিশেষ অনুধ্যানের বিষয় হইয়াছিল। তিনি দুইটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন,—মানসিক পরিশ্রমের অনুপাতে আহারের পরিমাণ কমাইয়া লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করিতেন এবং সর্ব্ব প্রকার উত্তেজক ও স্নেহ যুক্ত দ্রব্য বর্জ্জন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ যেখানে শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই, সেখানে অভ্যর্থিত হইয়াও অন্নগ্রহণ করিতেন না।

আহার সম্বন্ধে এই সূক্ষ্মবোধ তাঁহার অধ্যাত্মশক্তি স্ফুরণেরই বিশেষ পরিচায়ক। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভাবটুকু কেহ না ধরিতে পারিলেও স্থূলতঃ তাঁহার এই আহারবিষয়ক সংযমের অনুসরণ যদি কেহ করে, তাহা হইলে ক্রমশঃ সে সূক্ষ্ম বোধেরও অধিকারী হইবে, ইহা নিশ্চয়। একমাত্র আহার নিদ্রার সংযমে এমন সমস্ত নিগূঢ় রহস্য মানুষের আয়ত্ত হইতে পারে, যাহা বুদ্ধির মারপ্যাঁচে ধরা পড়ে না। আমরা ছাত্রদিগকে নিজে যাচাই করিয়া ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করি। মৎস্যাশী বাঙ্গালী জাতি মাছের মতই রসনার কোটরায় সদা বঁড়শী গিলিয়া বসিয়াছে—তাহার চৈতন্য হইবে কবে?

—✻—

অভিনব শিশুশিক্ষা

—✻—

সঙ্কলয়িতার কথা

ছেলেবেলায় শিশুশিক্ষা, বাল্যশিক্ষা, শিশুবোধ ইত্যাদি বই অনেকেই পড়েছি। যাঁরা এই সমস্ত বই লিখেছেন, তাঁরা জন্মজন্মান্তরের গুরুমশাই। এঁদের নীচু নজরে দেখ্‌ছি না, কিন্তু, শিশুচরিত্রের প্রতি এঁদের যে মনোভাব, তার সমালোচনা না করে পারছি না। এঁদের আওতায় মানুষ হয়ে একদিন আমারও মনে হত, শিশুচরিত্র বোঝা খুবই সহজ, ছেলেকে মানুষ করবার সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে অবিচল গাম্ভীর্য্যের সহিত বুড়োর ভাব ছেলের মাথায় ঢুকে দেওয়া। অনেককেই এই নীতি

অনুসরণ করতে দেখেছি; সেখানে এই নীতি সফল হয়নি, সেখানে দোষটা যে ছেলের বদ্-স্বভাবের, এমন রায়ও শুনেছি এবং তার ফলে উৎপীড়নের মাত্রা বাড়তেও দেখেছি। দেখেছি ছেলেদের শেখাবার আগ্রহটাই অনেকের মাঝে দুরন্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু বিনীত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্ত নিয়ে তাদের কাছেও কিছু শিখবার আছে, সে কথাটা কেউ খেয়াল করে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আজকাল উলটো স্রোত বইতে আরম্ভ করছে। দেশ বিদেশে আজ শিশুচরিত্র একটা গুরুতর অধ্যয়নের বিষয় হয়ে পড়েছে। এখন শিশুই প্রকৃত শিক্ষক, শিক্ষকেরা নম্র ও উৎসুক হৃদয় নিয়ে এই মুকুটবিহীন রাজাদেরই মনোরঞ্জন করতে ব্যগ্র। এই আন্দোলনের মাঝে কোথায়ও যে আতিশয্য নাই, সে কথা বলতে পারব না, কিন্তু এর একটা বিশেষত্ব এই দেখ্‌তে পাচ্ছি, শিশু ও শিক্ষকের আধ্যাত্মিক জীবনের স্ফুরণের সঙ্গে এই আন্দোলনের সফলতার একটা সম্বন্ধ আছে। যে কোনও বিজ্ঞানের মাঝে, উপায়কে নয়, লক্ষ্যকে বড় করে দেখতে হবে, এই হচ্ছে এদেশের সনাতন মত। শিশুবিজ্ঞানেও আজ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ধুম পড়ে গেছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণে যে নীতি আবিষ্কার হবে, তার লক্ষ্য যদি সমগ্র মানবজাতির চরম লক্ষ্যের সঙ্গে এক না হয়, তাহলে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করে দেখেছি, চরম সত্যের পানে যে শিক্ষক আপনার জীবন পরিচালিত করছেন, মনস্তত্ত্বের আইনগুলো তাঁর স্বচ্ছ হৃদয়ে আপনা হতেই স্ফুরিত হয়। প্রকৃতির নিগূঢ় অভিপ্রায়টা যেন তিনি দিব্য চক্ষে দেখতে পান এবং শিক্ষানীতিকে তারই ইঙ্গিতে পরিচালিত করতে পারেন। এই অধ্যাত্মপ্রেরণার বলেই শিক্ষাজগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। প্রাচীনের সংস্কারান্ধ নীরস একঘেয়ে শিক্ষাপ্রণালী আর অর্ব্বাচীনের বহু আড়ম্বরপূর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালী—উভয়ের মূলগত সত্যটী আবিষ্কৃত হবে কেবল শিক্ষকের অধ্যাত্মদৃষ্টির বিকাশে।

শিক্ষক আর গুরু এক পর্য্যায়ের বস্তু। আত্মপ্রতিষ্ঠ না হলে কারু গুরুত্ব ফোটে না। শিক্ষক যিনিই হউন না কেন, বাস্তবিক আত্ম-প্রতিষ্ঠ না হলে তাঁর দ্বারা শিক্ষার কিছু সার্থকতা হবে, এমন আশা করা যেতে পারে না। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব, বেদান্তোক্ত সাক্ষী চেতার ভাব শিক্ষকের মাঝে যখনই ফুটেছে, তখনই তাঁর শিক্ষায় ফল হয়েছে, অপরের হৃদয়কে তা স্পর্শ করেছে—শিক্ষকেরা এটা লক্ষ্য করে দেখ্‌বেন। শিক্ষাকে আত্মপ্রবোধনের উপায়স্বরূপ যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই জানেন, অন্ধকারে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত শিক্ষকের অধ্যাত্মদৃষ্টি সকলের মাঝেই চকিতের মত কখনও না কখনও ফুটে ওঠে। এই শুভ মুহূর্ত্তগুলির একটা বিবরণ সঙ্কলন করে শিক্ষকদের দরবারে পেশ করবার ইচ্ছা আছে। শিক্ষক বলতে পিতামাতাকেও বুঝি এবং শিক্ষাক্ষেত্র বলতে একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থালীর চিত্র মনে জাগে, এ কথা পূর্ব্বেই বলে রাখা ভাল। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত ঘটনা কল্পনা করব, তা গুরুতর কিছু নয়; শিশুজীবনে প্রায়ই গুরুতর কিছু ঘটে না। কিন্তু এই সমস্ত ছোট ছোট ঘটনার সমাধান হতেই শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে, এই কথাটা সকলকে মনে রাখ্‌তে অনুরোধ করি।

শিক্ষকের কথা

বিজয়কে আমি বরাবর ভাল ছেলে বলেই জানি। শেষকালে সে যে এমনটা করবে,

এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিছু দিন ধরে তার মন অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার দরুণ আমিও একটু কড়াকড়ির বন্দোবস্ত করেছিলাম। এ কি তারই প্রতিক্রিয়া?

সেদিন বাইরে থেকে স্কুলবাড়ীতে ফিরতেই আমার সহকর্ম্মী সুরেশ একটা ছোট কৌটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আজকে এইটী আবিষ্কার করেছি।" খুলে দেখি, তাতে কিছু দোক্তার উপকরণ। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কোথায় পেলে?" সুরেশ বললেন, "বিজয় আর রমেশকে একটু কাজে বাইরে পাঠিয়েছিলাম। ফিরবার সময় দেখি, এইগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। রমেশ লুকাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। তবে আর কখনও এমন কাজ করবে না বলছে।"

আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। রমেশ নূতন ছেলে; দুজন প্রায় সমবয়স্ক বলে বিশেষ করে বিজয়ের সঙ্গে তার একটু ভাব আছে। অনুমান করলাম, এই কাণ্ডের মূলে রমেশ। "আর করব না"—এটা ছেলেদের বাঁধি গৎ—কুইনিন দিয়ে জ্বর আটকানোর মত অনেকেই মেরে ধরে ভয় দেখিয়ে ওই স্বীকারোক্তিটুকু আদায় করেই নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু তাতে প্রতীকার তো হয়ই না, বরং মিথ্যা কথা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, ছলনা, ভীরুতা ইত্যাদি নানা আপদগুলো এসে জুটে। দুজনকে ছাড়াছাড়ি করাতে গেলেও ফল হবে না—তাতে বিজয়ের জেদ বেড়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করাই প্রথম কর্ত্তব্য বুঝতে পারছি; কিন্তু পাপের মূলোচ্ছেদ কি করে হবে, তা ভাবনার বিষয়।

সুরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বিজয় কি বলল?" সুরেশ বললেন, "আমি ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ সব খেয়েছিস্?' সে জবাব করল, 'যদি খেয়েই থাকি, আপনি তার কি করবেন?'" জবাবটা শুনে আমার ব্রহ্মাণ্ড অবধি জ্বলে গেল। এতটুকু ছেলের মুখে এত বড় কথা! ইচ্ছা হল, আচ্ছা করে তখনি ঘা কতক দিয়ে কি করতে পারি তা দেখিয়ে দিই। কিন্তু উত্তেজনার সময় যাই করা যায় না কেন, তার ফল কখনও ভাল হয় না—এ কথা আমি ধ্রুব সত্য বলে মানি। তাই জোর করে নিজকে ধরে রাখলাম; এমন কি আলোচনা-প্রসঙ্গেও, যদি মনের উত্তেজনা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই ভেবে সুরেশের সঙ্গেও কোন কথা বললাম না। ঘরে এসে কৌটাটী টেবিলের ওপর রেখে চুপ করে বসে রইলাম। ভাবলাম, দেখি ঘটনার স্রোত কোনদিকে গড়ায়। মাথা ঠাণ্ডা হলে ভগবান্ নিশ্চয়ই কাজ করবার একটা সূত্র ধরিয়ে দেবেন।

সন্ধ্যার পর ছেলেরা রোজ একবার আমার কাছে আসে। সেদিন আর সবাই এল, বিজয় এলো না। আমার মন হতে একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। বুঝলাম, সুরেশের কাছে স্পর্দ্ধাভরে যাই বলে থাকুক না কেন, বিজয়ের মনে লজ্জা বা সঙ্কোচ হয়েছে, অন্যায়কে ন্যায় প্রতিপন্ন করবার জেদটা তা হলে চুপসে গেছে। মালমসলা শুদ্ধ কৌটাটা প্রকাশ্য-ভাবেই আমার টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। ভাবলাম, বিজয় এ ঘরেই শোয়; যেতে আসতে তার অপকীর্ত্তির নিশানাস্বরূপ কৌটাটা চোখে পড়বেই। যদি দেখি, তার ভিতরকার মালমসলা নয়ছয় হয়েছে, তা হলে বুঝবো রোগ গুরুতর; আর তা না হলে তার অপকীর্ত্তির নিদর্শনটা যে মূক হয়ে অহরহ তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এতেই বিজয়ের মনে অনুশোচনা আসবে। আমার শাসনের

চেয়ে এই মনোদ্বন্দ্বে তার উপকার হবে বেশী। সেদিন আমি শোয়ার পর বিজয় ঘরে এসে চুপি চুপি শুলো। আমি টের পেলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না।

এমনি করে দু' দিন কেটে গেল। বিজয় একটু সঙ্কোচ করে চলছে বুঝতে পারছি; কিন্তু আমি ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য দেখালাম না, অথচ বেশী মেশামেশি করবারও চেষ্টা করলাম না। আমাদের দু'জনার মনের মাঝে যে কোথায় টান পড়েছে, তার নির্ব্বাক্ সাক্ষি স্বরূপ কেবল কৌটাটা আমার টেবিলের উপর পড়ে রইল।

তিন চার দিনের মাঝেই বিজয়ের সঙ্কোচ-টুকু সম্পূর্ণ কেটে গেল। আবার আগের মতই সে আমার কাছে এসে গল্প, আব্দার ইত্যাদি জুড়ে দিল। আমিও কোনও সঙ্কোচ রাখলাম না, প্রাণ খুলে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলাম। কথার মাঝে হঠাৎ বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, "বিজয়, নেশা করলে শেষটায় কি হয়, জান?" বিজয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে ঢোক গিলে বলল, "মানুষ মরে যায়।" "যারা ভাল ছেলে, তারা নেশা করে?" বিজয় চোখ নীচু করে মাথা নাড়ল শুধু। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি সেদিন ওগুলো আনলে কেন?" বিজয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল; "আমার ভাল হতে ইচ্ছা করে না, আমার মরে যেতে ইচ্ছা হয়!" আমি তাকে বুকের কাছে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কোন অন্যায় করলে কেউ যে মনে ভারী ব্যথা পেতে পারে, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?" বিজয় মাথা নেড়ে বলল, "না।" আমি বললাম, "কিন্তু তুমি জানো না, তুমি অন্যায় করলে আমার প্রাণে কি কষ্ট হয়! আমি যে তোমায় ভালবাসি, তুমি কি আমার মনে ব্যথা দিতে পার?" বিজয় বলল, "না।" আমি বললাম, "আজ থেকে তাহলে মনে রেখো, তুমি যদি কোনও অন্যায় কর, তাহলে যে তোমায় ভালবাসে, তার মনে ভারী লাগবে। যে ভালবাসে, তার মনে কিছুতেই ব্যথা দিতে নাই।"

এমনি করে চোখের জলের মাঝে আমাদের সন্ধি হয়ে গেল। বিজয় তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে কি না জানি না; কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি, ভালবাসা শিক্ষার মূল মন্ত্র; আমার ভালবাসায় যদি কোনও ছলনা না থাকে, তাহলে তার শক্তিকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না। যদি সে শক্তি সব ক্ষেত্রে সফল নাও হয়, তাতেই বা কি! আমার হৃদয় তো মধুময় হয়ে থাকবে।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৩।৯

ঋষি যে দেবতার স্পর্শ পেয়ে সগৌরবে বলেছিলেন, "সোমম্ অপাম অমৃতা অভূমঃ" সেই দেবতাই যে তোমার আমার ভিতরে রয়েছেন। কিন্তু আমরা মোহান্ধ হয়ে কামনাবাসনার জাল দিয়ে তাঁর প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছি, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ, সর্ব্বদা প্রকাশিতই রয়েছেন, আমরা তাঁর প্রকাশের পথে মায়াময় জালের আড়াল দিয়ে রেখেছি। জাল ছিঁড়ে ফেল, দেখবে তোমার ভিতরেই

অমৃত সঞ্চিত রয়েছে—কি সুধায় তোমার প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তুমি ওঠ—জাগ—এ উপনিষদের যুগে আর মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। দেবতা এসে তোমার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁকে হৃদয়ে বরণ করে নাও।

*

এ জগতে এই একটা মজা, গাছের খবর পশুর খবর, কীটপতঙ্গের খবর, গ্রহনক্ষত্রের খবর নিতেই সকলে ব্যস্ত। কিন্তু নিজের খবর জানতে চায় অতি অল্প লোকে। আত্মজ্ঞানের কথা হলে লোকে একটা আজগুবি স্বপ্নরাজ্যের কথা বলে ভাবে। আত্মা এক কাল্পনিক পরীর দেশের সোণার গাছে হীরার পাতা আর মাণিকের ফলের মত জিনিষ নয়—তা হচ্ছে আসল তোমার কথা—তুমি আমি যা, তারই কথা হচ্ছে। এ অটল সত্যে বিশ্বাস কর, লাভ হবে তোমার, না করলে তুমিই ঠকবে। এই যে তোমার নিজকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, ঐটাই মহামায়ার খেলা, মায়ায় ভুলে নাকফোঁড়া বলদের মত রূপরসের দিকে ছুটে চলেছ। ইন্দ্রিয়ের সুখকে নিজের সুখ ভেবে অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছ—জ্ঞানামৃতের স্বাদ যদি একবার পেতে, দেখতে কি তুচ্ছ সুখে তুমি মগ্ন হয়ে আছ।

*

এই যে পরিদৃশ্যমান্ স্থূল জগৎ, এটা মনের স্থূলাকার সংস্কার ভিন্ন আর কিছু নয় সব রোগের মূল ঐ সংস্কার। এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ সংস্কার দূর করবার জন্য এত চেষ্টা করতেন। প্রথমে কুসংস্কার দূর করে সুসংস্কারাপন্ন হতে হয়, তার পর তাকেও ত্যাগ করে নিজের শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করতে হবে। এই হল আর্য্যশিক্ষার মূলনীতি। সমস্ত সংস্কার দূর হয়ে গিয়ে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে প্রহ্লাদের ন্যায় তার নিকট বিষও অমৃত হয়ে ওঠে।

সংবাদ ও মন্তব্য

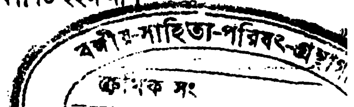
আগামী ৩১ বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়া হইতে পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অত্র সারস্বত মঠের উনবিংশ বার্ষিক উৎসব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত, আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণকে উক্ত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব উৎসবের পূর্ব্বেই অত্র মঠে পদার্পণ করিবেন এবং কিছুকাল এখানেই থাকিবেন।

পশ্চিমবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত প্রভাকর চৌধুরী বিগত ৫ই চৈত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে উক্ত আশ্রম অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। শ্রীগুরুকৃপায় তাঁহার শোকগ্রস্ত পরিবার সান্ত্বনা লাভ করুন।

বিগত ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল উত্তরবাঙ্গালা ভক্তসম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন কুচবিহার সহরে হইয়াছে। বগুড়ার প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৫ই এপ্রিল তারিখে কলেজের ছাত্রগণের বিশেষ অনুরোধে সুবক্তা শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র সেন ছাত্র ও অধ্যাপকগণের একটী সম্মিলিত সভায় ছাত্রগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

স্থানাভাবশতঃ দানপ্রাপ্তিস্বীকার, গ্রন্থপরিচয় ইত্যাদি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না।



ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ
সমষ্টি সং ১৯৪

জ্যৈষ্ঠ

প্রথম খণ্ড
দ্বিতীয় সংখ্যা

অগ্নয়ে

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।২।২]

[বৈশ্বামিত্র ঋষভ ঋষিঃ—অগ্নির্দ্দেবতাঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

আ হোতা মন্দ্রো বিদথান্যস্থাৎ
সত্যো যজ্বা কবিতমঃ স বেধাঃ।
বিদ্যুদ্রথঃ সহসস্পুত্রো অগ্নিঃ
শোচিষ্কেশঃ পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেৎ ॥

এসেছেন দেবহোতা যজ্ঞভূমে আনন্দের খনি—
সত্য তিনি, ধাতা তিনি—যজমান, কবিশিরোমণি।
বিজলীর রথবাহী হের অগ্নি সাধনার ধন—
দীপ্ত তাঁর জটাজালে ধরাবক্ষে ছড়ায় কিরণ!

অশ্যামি তে নমউক্তিং জুষস্ব
খাতাবস্তুভ্যং চেতসে সহস্বঃ।
বিদ্বাঁ আ বক্ষি বিদুষো নিষৎসি
মধ্য আ বর্হিরূতয়ে যজত্র॥

জানাই তোমারে নতি, বীর্য্যবান্‌, কর তা গ্রহণ—
তুমি যজ্ঞ-অধিরাজ, নিখিলের চিত্তবিবোধন;
জান তুমি গুণিগণে, সবে ডাকি আনগো হেথায়,
যজ্ঞভাগী হয়ে বসো কুশোপরি তাদের সভায়।

দ্রবতাং ত উষসা বাজয়ন্তী
অগ্নে বাতস্য পথ্যাভিরচ্ছ।
যৎ সীম্‌ অঞ্জন্তি পূর্ব্ব্যং হবির্ভির্‌
আ বন্ধুরেব তস্থতু দুরোণে॥

হে দেবতা, ধনধান্যে সুমঙ্গলা উষা আর নিশি
ছুটে আসে তোমা পানে বায়ুপথে চঞ্চলিয়া দিশি;
চিরন্তন তুমি তাই পূজে সবে হবি উপচারে;—
যুগ হেন তারা দুটী বাঁধা আছে মোদের দুয়ারে।

মিত্রশ্চ তুভ্যং বরুণঃ সহস্বো
অগ্নে বিশ্বে মরুতঃ সুম্নমর্চ্চন্‌।
যচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র তিষ্ঠা
অভি ক্ষিতীঃ প্রথয়ন্‌ সূর্য্যো নৄন্‌॥

মিত্র আর বরুণের চোখে তুমি মহাবীর্য্যশালী,
জানে তাহা বিশ্বদেব, বহি আনে আরতির ডালি;
বীর্য্যসাধ্য তুমি দেব, ধরামাঝে বিথারিয়া জ্বালা,
সূর্য্য হেন মহিমায় নিখিলেরে করিয়াছ আলা।

বয়ং তে অদ্য ররিমা হি কামম্
উত্তানহস্তা নমসোপসদ্য।
যজিষ্ঠেন মনসা যক্ষি দেবান্
অস্রেধতা মন্মনা বিপ্রো অগ্নে॥

এনেছি তোমার তরে যাহা চাহ ভরিয়া অঞ্জলি—
যাচিয়া প্রসাদ তব নমি পায় দিনু তাহা তুলি;
ডেকে আন দেবতায় যজ্ঞভূমে, করি সমর্পণ
কল্মহীন স্তুতিগাথা—হোক তাহে সবার তর্পণ।

অগ্নে পুত্র সহসো বি পূর্ব্বীর্
দেবস্য যন্ত্যূতয়ো বি বাজাঃ।
ত্বং দেহি সহস্রিণং রয়িং
নোদ্রোঘেণ বচসা সত্যমগ্নে॥

শক্তির তনয় তুমি, ভক্ত জন পেল বহুবার
শতবিঘ্নবিনাশন তোমা হতে কত উপচার;
পূরিয়া সহস্র সংখ্যা হে দেবতা দাও আনি ধন;
দ্রোহহীন বাক্যে তব সত্য পথে করি বিচরণ।

তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো যানীমা
দেব মর্ত্তাসো অধ্বরে অকর্ম্ম।
ত্বং বিশ্বস্য সুরথস্য বোধি
সর্ব্বং তদগ্নে অমৃতং স্বদেহ॥

দক্ষ তুমি, হে দেবতা, জান সব যত আয়োজন
করেছি তোমার তরে যজ্ঞভূমে মোরা মর্ত্ত্যজন;
কর তা স্বীকার দেব—দাও ভক্তে সুশোভন রথ;
অমৃত পিপাসা তব যাক্ মিটে—দেখাও সুপথ।

সাক্ষী চৈতন্য

জীবের তিনটী অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই তিনটী অবস্থা নিয়ে তিনটী শরীর। তিন অবস্থাতেই আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ রাখা হচ্ছে সাধনা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে জ্ঞানপ্রবাহ অবিচ্ছেদে প্রবাহিত রাখতে পারলে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের জ্ঞান হয়। সাধারণতঃ জাগ্রতের জ্ঞান স্বপ্নে আর স্বপ্নের জ্ঞান সুষুপ্তিতে থাকে না। জাগ্রতের "আমি"কে স্বপ্নে সজাগ করতে পারলেই আর স্বপ্ন থাকে না। স্বপ্নের "আমি"র এ জ্ঞান থাকে না যে আমিই জাগ্রতের আমি, স্বপ্ন দেখছি। দেহান্তে জীব স্থূল ছেড়ে সূক্ষ্মে যায়, সাধারণ ভাষায় তাকে বলে মৃত্যু; কিন্তু সেই সূক্ষ্ম শরীরে এই স্থূলের জ্ঞান থাকে না। তখন একথা মনে থাকে না যে সেই স্থূলের আমিই স্থূল ছেড়ে সূক্ষ্মে এসেছি। স্থূলের জ্ঞান হওয়া সহজ—যেমন জাগ্রৎ অবস্থার জ্ঞান। সূক্ষ্মকে আয়ত্ত করা কঠিন। স্থূল হতে সূক্ষ্মের এলাকা আরও বড়। বুদ্ধি, মন, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি সতেরটী পদার্থ নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর। মনন দ্বারা সূক্ষ্মের জ্ঞান হয়, আর নিদিধ্যাসনে কারণ জ্ঞান হয়। কারণ এক; অবিদ্যা বা মূলা প্রকৃতিই কারণ। সুষুপ্তিতে অহংকে প্রবুদ্ধ রাখতে পারলেই দ্রষ্টৃত্ব শক্তি জন্মায়।

সমাধি লাভ না হলে সম্যক্ জ্ঞান জন্মায় না। আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহং নই, ইত্যাদি যে সমস্ত জ্ঞান জাগ্রতে মনন করছ, তারা আভাস জ্ঞান মাত্র। স্থূল শরীর নষ্ট হলে জ্ঞানকে খাড়া রাখা যায় না। জীব যখন স্থূল ছেড়ে সূক্ষ্মে যায়, তখন তার স্বরূপ জ্ঞান ভুল হয়ে যায়; সে এক রকম অভিভূত অবস্থায় থাকে। স্বপ্নের সময় যেমন মনে রাখতে পারি না যে জাগ্রতের আমিই স্বপ্নদ্রষ্টা হয়েছি এবং আমারই মনের কল্পনা দিয়ে কত কি সৃষ্টি করে তার দরুণ সুখদুঃখ পাচ্ছি, তেমনি সূক্ষ্মে গিয়েও আমাদের স্থূলের জ্ঞান লোপ হয়। কাজেই সে সময় শ্রেয়ঃ, ইষ্ট, গুরু জ্ঞান ইত্যাদির কথা স্মৃতিতে আসে না। যদি ধ্যানসহায়ে বা নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বপ্নের "আমি"কে সজাগ রেখে সূক্ষ্মের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পার, তাহলে মৃত্যুর পরও স্বরূপজ্ঞান ফুটে উঠবে। তখন জানতে পারবে যে তুমি কে। সূক্ষ্মের জ্ঞান লাভ করতে পারলেই কারণের জ্ঞান সুগম ও সহজসাধ্য হয়।

সাধারণ কথায় বলে, জীব যখন গর্ভে থাকে, তখন ওপারের জ্ঞান থাকে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হলেই সে জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, তখন তার সব ভুল হয়ে যায়। তেমনি স্থূল শরীর নাশের পরও জীবের স্থূল জ্ঞান থাকে না, এপারের খবর ওপারে নেওয়া বা ওপারের খবর এপারে আনার ক্ষমতা থাকে না। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রতের জ্ঞান পৌঁছাতে পারে; কিন্তু যখনই মনে হয়, আমি স্বপ্ন দেখছি, অমনি স্বপ্নাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়, ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠে। যত কিছু সাধনা, এই "আমি" কে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রবুদ্ধ রাখা। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জ্ঞান আয়ত্ত হলে আর ভুল হয়

না, তখন শরীরনাশের পরও গুরু, ইষ্ট ও প্রয়োজ্ঞান জাগ্রৎ থাকে। উৎক্রান্তি প্রাণকে আশ্রয় করেই হয়ে থাকে। মানুষ ও আরও দু'একটা বুদ্ধিমান্ জীব ছাড়া আর কারও উৎক্রান্তি হয় না। আবার মানুষের মাঝেও যাদের প্রাণবায়ু হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে শরীরপাত হয়, তাদেরও উৎক্রান্তি হয় না। এই জন্যই অপঘাত মৃত্যু বা আকস্মিক মৃত্যুতে মানুষকে পশু জন্ম নিতে হয়। কারণ, তখন তার মন সর্ব্বভাব ও সংস্কারবর্জ্জিত থাকে; কোনও আশা আকাঙ্ক্ষা বা কামনাবাসনা না থাকায় তার মন হঠাৎ তমে অভিভূত হয়ে পড়ে, নিজকে জাগিয়ে রাখবার জন্য সংস্কারের কোনও অবলম্বন পায় না; কাজেই সে অবস্থায় সে প্রকৃতির ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। পশুযোনি প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত, রক্ষিত ও প্রকৃতির দ্বারাই ধ্বংস হয়। প্রকৃতিই তাদের জন্ম, আয়ু ও ভোগের নিয়ামক।

যোগীর শরীর নাশও হৃৎপিণ্ডে বায়ু রুদ্ধ করেই হয়, কিন্তু তাঁর উন্নততর গতি লাভ হয়, কারণ যোগী তাঁর আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ রেখে প্রাণবায়ু ছেড়ে দেন। প্রাণবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে স্থূল আর সূক্ষ্মের সংযোগ রক্ষা করে চলছে। বিষয় আর ইন্দ্রিয় এক দিকে, আর একদিকে মন—মধ্যে রয়েছে প্রাণ। শ্বাস গ্রহণ করবার সময় ইন্দ্রিয় আহরিত বিষয়গুলি মনের নিকট পৌঁছে দেয়, মন বুদ্ধির জ্যোতিতে সেগুলো উজ্জ্বল করে তোলে; আবার প্রশ্বাস ত্যাগের সময় ইন্দ্রিয়ই স্বসংযুক্ত বিষয়ের প্রতি বহির্মুখী প্রেরণা নিয়ে আসে। সুতরাং প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ করলেই বিষয় সম্বন্ধ ত্যাগ হবে। কিন্তু বিষয় সম্বন্ধ ত্যাগ হলেও মনের ক্রিয়া চলতে থাকবে, সে তার সঙ্কল্প বিকল্প বৃত্তি নিয়ে ক্রিয়াশীল হবে। সুতরাং প্রাণের রোধ করবার পরও মনের মননক্রিয়া বন্ধ করবার জন্য প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যানের সহায়তা নিতে হয়।

একটা কিছু অবলম্বন দিয়ে মনকে কোনও বস্তুতে একাগ্র করতে হয়। মনের শতধা-বিভক্ত চিন্তাপ্রবাহকে প্রত্যাহার করে একটা বিশিষ্ট বিষয়ের ধারণা উৎপন্ন করে বিক্ষেপশূন্য অবস্থায় একাগ্র বৃত্তিতে তদ্‌গত করাই হল ধ্যান। এর পরিপক্ব অবস্থাতে ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যানের ভেদ নষ্ট হয়ে গিয়ে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলেই মনবুদ্ধির লয় হয়ে যায়। তখন বাসনার বীজ পুড়ে যায়; বীজের আকার মাত্র থাকে, কিন্তু তার অঙ্কুর উদ্‌গমের শক্তি নষ্ট হওয়ায় আর নূতন কর্ম্মবীজের সৃষ্টি হয় না। একেই বলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ। সুষুপ্তি হচ্ছে তমঃ, তমের পরপারে জ্ঞান। সুষুপ্তিতে যিনি আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ রাখতে পারেন, তিনি তমঃকে অতিক্রম করে জ্ঞানের ভাস্বর রাজ্যে পৌঁছান। তখন তিনি জীবন্মুক্ত। তখন তাঁকে কর্ম্ম আর বাঁধতে পারে না—কর্ম্ম অকর্ম্ম বলে তখন আর তাঁর কিছু থাকে না। তিনি কর্ত্তা হয়েও অকর্ত্তা, অকর্ত্তা হয়েও কর্ত্তা—সুতরাং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অতীত। তিনি সব করেও কিছু করেন না, আবার না করেও সব করেন—"হত্বাপি স ইমান্‌ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

তাই বলে কি জ্ঞানী অপকর্ম্মই করেন? তা নয়। আবার করেন না—একথাই বা জোর করে বলি কেন? সিদ্ধ জীবন্মুক্তের কাছে সবই সমান—কাজেই তাঁর কর্ম্মাকর্ম্ম নাই। একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ একটা প্রসিদ্ধ মঠের মোহান্ত হয়েও চামারের কাজ করে জীবিকা

অর্জ্জন করতেন। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে সবই উজ্জ্বল হয়ে থাকে, কিন্তু তাঁর ব্যবহার ঠিক সাধারণ মানুষের মত। জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি যদি জানতে পারেন যে অমুকের বিষপ্রয়োগে তাঁর শরীর নষ্ট হবে, তবুও তিনি তার প্রতিকার চেষ্টা করেন না, কারণ এসম্বন্ধে কোনও রূপ প্রযত্ন তাঁর শরীরের প্রতি মমতারই পরিচায়ক। আসক্তিই তো বন্ধনের কারণ। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা প্রারব্ধবশে চলেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ই তাঁদের উদ্দেশ্য। জীবন্মুক্তই হউন আর যাই হউন, প্রারব্ধ অবশ্যই ভোগ করতে হবে। একথাটী একটী গল্প দিয়ে বোঝান যেতে পারে।

একটী লোকের একমাত্র পুত্র বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে বিদেশে ছিল। একদিন সে তার মৃত্যুসংবাদ পেল। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বৃদ্ধ পিতা শোকে অভিভূত হয়ে পড়্‌ল, এমন কি তার পক্ষে জীবন ধারণ অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। অবশেষে মৃত্যুকামনায় সে একটা লাঠি নিয়ে নিজের মাথায় মেরে বস্‌ল, তাতে মাথা কেটে ক্ষত হয়ে গেল। লোকটী মরল না বটে, কিন্তু লাঠির ঘায়ে তার মরণযন্ত্রণা হতে লাগ্‌ল। ঘটনাক্রমে তার পুত্র হঠাৎ জীবিত অবস্থায় তার সম্মুখে এসে উপস্থিত। ছেলেকে দেখে পিতার শোকজনিত সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে গেল বটে, কিন্তু মাথার ক্ষতজনিত ব্যথা দূর হল না। তার দরুণ তাকে কিছুকাল ভুগ্‌তে হলো, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ওষুধ দেওয়া ইত্যাদি কর্ম্মও থাক্‌ল। এইরূপে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরও সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়ে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ ও কর্ম্মবীজ ভর্জ্জিত হলেও, অভিমৃত্যুর হাত হতে পরিত্রাণ পেলেও তাঁকে প্রারব্ধবশে যা ভোগ করবার তা করতেই হবে। প্রারব্ধ শুধু ভোগেই শেষ হয়—এ আইন সকলের প্রতিই প্রযোজ্য।

জানে যে জ্ঞানীর কি আনন্দ, অপরে তা কি করে বুঝবে? সাধারণে বলে, জ্ঞানীর শুষ্ক জীবন। কিন্তু তা নয়। জ্ঞানী যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করেন, তিনি আনন্দময়, আনন্দই তাঁর স্বরূপ। তাঁর ক্ষুদ্র অহং দূর হয়ে গিয়েছে, বিরাট্ অহংকে প্রসারিত করে দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুকে তিনি আপন জ্ঞানে প্রেমভরে বুকে জড়িয়ে রেখেছেন আর নিজে দ্রষ্টা, সাক্ষী, চেতা হয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আস্বাদ করছেন, তার আভাস যে পেয়েছে, সেই ধন্য হয়েছে। অনাস্বাদিত বস্তুর স্বাদ অপরকে দেওয়া যায় না, সুতরাং অপরকে সে আনন্দের কথা বুঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমি যে আনন্দস্বরূপ, অমৃতের সিন্ধুস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ। আমাতেই সব অবস্থিত; আমা হতেই উদ্ভূত, আবার আমাতেই সব লীন হচ্ছে। এই যে আকাশে অগণিত গ্রহনক্ষত্রের মেলা—এ তো আমারই বিকাশ। আমি স্বপ্রকাশ—ওরা আমার জ্যোতিঃতেই জ্যোতিষ্মান্। আমার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে—স্থল, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সব আমিই ধারণ করে আছি। আমিই সব—আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি পূর্ণ, আমি মহান্—আমি সেই—আমি সেই—"সোঽহং—সোঽহং।" ওম্।

কর্ম্ম-সঙ্কেত

—✱—

কাজ করতে গেলেই অভিমান জুটবে এসে। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, ভগবদ্দর্শন না হলে অভিমান যায় না। সে তো বহু দূরের কথা। তত্তটা যে কবে হবে, সাধারণ কর্ম্মী তার আন্দাজই করতে পারে না। তবে প্রথম হতেই অভিমান হতে যতটা তফাৎ থাকা যায়—অন্ততঃ নিজের চেষ্টায়—ততটাই ভাল। কর্ম্মযোগের এটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। অভিমানের একটা রূপ হচ্ছে আত্মশ্লাঘা—নিজের বাহাদুরী মুখ ফুটে বলা। আত্মশ্লাঘা নিন্দার কথা—এটা আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারণা। কিন্তু সে ধারণা অনুযায়ী কাজ খুব কম হয়। আত্মশ্লাঘাকে বিনয় বলে চালিয়ে দেবার প্রয়াস সব জায়গাতেই দেখা যায়। অতি ভালমানুষকেও দেখি, ভাবে কেন, ভাষায় শুদ্ধ নিজের গুণপনা জাহির করে ফেলেন। অবশ্য বুঝি, অভিমান ছাড়া কর্ম্ম হয় না। কাজ করলেই মনে হবে, এটা আমি করেছি—তা ভালই হোক, আর মন্দই হোক্। আর তাই থেকে নিজের ওপর, কাজের ওপর একটা মমতা জন্মে যায়। যতই ফাঁকা হবার চেষ্টা কর না কেন, একটু না একটু আমির রেশ থেকেই যাবে। তা থাক। তবে আমিই করেছি—এ কথাটা অপরকে জানাবার জন্য ব্যগ্র না হই—এই প্রথম কথা। এই ব্যস্ততাটুকুই হল অভিমানের জড়্। আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারি, যদিও তার মাঝেও কোথা হতে অভিমান এসে জোটে। কিন্তু অপরকে নিজের বাহাদুরী জানিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা—এ হচ্ছে আত্মহত্যার নামান্তর। তাই কর্ম্মীর নীরব হওয়া খুবই প্রয়োজন। মুখ বুজে—একেবারে দাঁতে জিভ্ চেপে কাজ করে যাও, দেখবে অভিমানের অর্দ্ধেক বোঝা নেমে গেছে। মনের মাঝে তবুও ঘাত প্রতিঘাত চলবেই; তা চলুক। কারু ভাল কথাতেও কান দিও না, মন্দ কথাতেও না। মুখ বন্ধ থাক্‌লে মনটাও ক্রমে চুপ হয়ে আস্‌বে। কথায় কথায় বাড়ে—এটা চল্‌তি কথা; শুধু কথা বাড়ে না—অভিমানও বাড়ে। চালচলন হাবভাব সব নরম কর, কোমল কর। হয় প্রার্থনা, নয় আত্মস্বরূপে সমাধান—দুই পথ।

✱

কেউ জিজ্ঞাসা করতেই টপ্ করে বলে ফেল্‌ব, তাঁকে পাওয়ার জন্যই আমাদের যা কিছু আয়োজন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, কথাটা কি ঠিক? কি করছি তাঁকে পাওয়ার জন্য? কিছুই না। সেই নিত্যকার মত খাওয়া-পরা শোওয়া-বসা—এই ব্যাপারেরই তো অহরহঃ পুনরাবৃত্তি চলছে। আবার এও ভাবি, কিই বা করবে? সাধন কি আর একটা দূরদূরান্তরের জিনিষ? এই নিত্যকার খাওয়া-শোওয়ার মাঝে যে সাধন চালাতে না পারে, দূরান্তরের সাধনে তার ভরসা কি? নিত্যকাজের মাঝেও সাধনা চলছে বই কি; তবে কিনা সেটা তাঁর সাধনা নয়, আমার সাধনা—অভিমানের সাধনা। অহংএরই সাধনা

করছি, অথচ আমিই তার খবর জানি না—এত বড় ভুল আর কোথায় দেখেছ? যেদিন এ খবর জান্‌বে, সেদিন চমক ভাঙ্‌বে, এই কর্ম্মের জোয়ারই সেদিন তাঁর পানে উজান বইবে। কিন্তু এখন করছি কি? কথায়, কাজে, ভাবে কেবল প্রচার করছি, আমি কি। আর যখন যতটুকু আমার স্বরূপ প্রচার হচ্ছে, ততটুকুতেই ভারী খুসী। দুটো উপদেশের বুলি আওড়ালাম, অমনি আমি আচার্য্য; 'দু' ছত্র লিখলাম, অমনি আমি কবি; দুটো ছেলে ঠ্যাঙালাম, অমনি আমি শিক্ষক; সংসারের কাজে দুটো পরামর্শ দিলাম, অমনি আমি ব্যবস্থাপক। কাজগুলো বিচার করে দেখ—কত সামান্য, অথচ তার দরুণ উপাধিটা যা মিলছে, তা কত বড়! একে লাভের ব্যবসা বলব না? আর মজা এই, যখন আমি যা, তাতেই মহা খুসী—যেন ওতেই আমার সব পরিচয় নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমি যে ওর চেয়ে কত বড়, কত মহান্—সে খবর রাখে কে? তা বুঝতে হলে বলতে হবে, কাজে যে উপাধি জুটিয়ে আনে, তার একটাও আমার নয়—আমি একেবারে অকর্ম্মা, শিব সচ্চিদানন্দ।

*

কাজ কখন করবে আর কখন ছাড়বে—এ ঠিক করতে ভারী হুঁসিয়ার হতে হবে। সোজা কথা এই—ভাবের জোয়ার এসে যতক্ষণ তোমায় অতর্কিতে অবশ করে না ফেলে, ততক্ষণ কাজ ছেড়ো না। তা যদি কর, তা হলে বুঝতে হবে তোমায় বেবাক ফাঁকী। পূর্ণসত্ত্ব আর পূর্ণতমো—দুইই বাইরে দেখ্‌তে একরকম; তাই দুয়ে ভুল হবার খুবই সম্ভাবনা। হয়ত পূর্ণ তমোতেই ডুবে আছ, আর ভাবছ মহাসাত্ত্বিকতার দরুণ বুঝি কর্ম্ম বিরতি এসে পড়েছে। তখন মনে হয়ত কোনও ভাবনাচিন্তারও ঢেউ খেলছে না; কিন্তু তা বলে মনে করো না যে ওটা উপরতির লক্ষণ; আসলে হয়ত ওটা নিশ্চেষ্টতারই নিশানা। প্রমাণ, দু'চারটা ভাবনার নমুনা। শুধু তমোতেও মানুষ থাকতে পারে না, শুধু সত্ত্বেও না—চিন্তায়, কাজে মাঝে মাঝে তাকে রজোতে নেমে আসতে হয়। তখন যেমন প্রবৃত্তি জাগে, তাতেই বোঝা যায়, চিত্ত কোন্ ভূমিতে ছিল। আলো আর আঁধার, সত্ত্ব আর তমঃ—দুটোই ভাণ্ডার। কাজ করবার সময় দুটো হতেই রসদ মেলে। তাই তো জগতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, দুই মার্গ রয়েছে—সু-কু রয়েছে। নিশ্চেষ্টতার পর যদি দেখ, কু ভাবে, কু কাজে চিত্ত প্রেরিত হচ্ছে, তাহলে বুঝবে, এতক্ষণ তমোতেই ডুবে ছিলে। গীতায় এটাকেই বলছেন—তমোর প্রমাদফল। যদি দেখ, নিশ্চেষ্টতার পর সু ভাবে সু কাজে প্রেরণা পাচ্ছ, তাহলে বুঝবে, সত্ত্বে ছিলে। আত্মার রজো থেকে সত্ত্বে বা তমে যাওয়া চলে—ভাব আর কাজের ধারা ধরে।

*

এই জন্য চিত্তশুদ্ধি করতে কর্ম্মের প্রয়োজন—তপস্যার প্রয়োজন। অ-তপস্বীর যোগসিদ্ধি হয় না। সত্ত্বশুদ্ধি হলেই চিত্তশুদ্ধি হল। সৎকাজে, সৎচিন্তায় যে রজোবৃত্তির চর্চ্চা হয়, তাতে রজের নিবৃত্তি হয়ে সত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। আবার অসৎ কাজে, অসৎ চিন্তায় রজোনিবৃত্তি হয়ে তমে বিশ্রাম লাভ হবে। রজোকে খাটিয়ে নিতে পারলেই নিবৃত্তি, তা ছাড়া তার কোনও সার্থকতা সম্ভব হয় না। কাজই প্রমাণ হয়, কর্ম্ম করাই জীবের

স্বভাব। এখন যে দিকে কর্ম্ম করবে, সেই দিকেই প্রতিষ্ঠা হবে। কিছু না করে কেউ থাকতে পারে না। হাতে পায়ে না খাট, মনে তোলপাড় চলবেই। ভাল বিষয়ের ভাবনা না কর, মন্দ বিষয় উঠবেই—কেননা মন্দের সংস্কার তো পাকা। এই জন্য ভাল হবার দরুণই সাধ্যসাধনা দরকার, মন্দ তো হয়েই আছি। কিছু না করলেও মন্দ হয়ে যাব—আর কিছু না করলে ভাল হব না—তাই কিছু করা চাই-ই।

*

অভিমান আসতে থাকবে আর দু'হাতে তাকে ঠেলতে থাকব, এই হল কর্ম্মীর অন্তঃ-সাধনা। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই লড়াই করতে হবে। অমুকে বলল, ওঃ তুমি খুব বুদ্ধিমান্; শুনেই মনটা নেচে উঠল। কিন্তু শুনছ না, দিব্যপুরুষ অন্তর থেকে বলে উঠছেন, "ততঃ কিম্।—হলিই বা তুই বুদ্ধিমান্—এই কি তোর সবটুকু? না, তুই যে আরও বড়!" কেউ বললে "তুই ভণ্ড!"—মনটা নেমে গেল। আবার শুনছি, সেই গম্ভীর প্রশ্ন—"ততঃ কিম্?—যদি সত্যসত্যই ভণ্ড হস্, তাহলে সত্য কথায় রাগ করবি কেন? আর যদি মিছামিছিই তোকে ভণ্ড বলে থাকে, তবে রাগ করেই বা কি করবি?" তাই বলছি, চিত্তের স্থির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। সুখ হোক, দুঃখ হোক, টলবে না—কাজ করে ভালও চাইবে না, মন্দও চাইবে না। একটা পরমাশ্রয় না পেলে এ ভাব সহজ হয় না। সে আশ্রয় হয় স্বরূপ, নয় ভগবান্। দুই-ই এক।

হিমালয়ের পত্র

—ঃ{*}ঃ—

বশিষ্ঠাশ্রম

আজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। মেঘগুলো নানা আজগুবি আকার ধরে, কোথায়ও বা ঘন কোথায়ও বা পাতলা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মেঘ হতে আলোক প্রতিবিম্বিত হয়ে চারদিক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, নন্দন কাননের শিশুরা যেন নানাবর্ণের মনোরম সজ্জায় সেজেছে। এ শোভা চিত্রকরের তুলিতে ফোটে কি? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে রঙ্গের লুকো-চুরী হচ্ছে, কোনও দর্শক তার নিশানা পাবে কি? যে দিকেই তাকাও না কেন, লাল, জরদা, বেগুণী রঙ্গের অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্যে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চিরস্নিগ্ধ নীলের ভূমিকা মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে দেখতে পাবে। এই দিকে দিকে বিচ্ছুরিত সুষমায় রামের চোখ যে জলে ভরে এল, আনন্দে যে তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন। মেঘের খেলা মিলিয়ে যায়, কিন্তু কি অপরূপ কাহিনী যেন সে রেখে যায়। বঁধুর

কাছ থেকে অমিয়ার পেয়ালা যেন তারা নিয়ে এসেছিল, আমার ঠোঁটে ছুঁইয়ে আবার ফিরে গেল কি? জগতে যা কিছু মন লোভায়, তারই রহস্য এই। তারা চকিতের মাঝে ফুটে ওঠে, তারপর রামের দ্যুতিতে ঝিক্‌মিকিয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। সঞ্চরমাণ মেঘমালার সঙ্গে যে আশনাই করতে যায়, তাকে দেওয়ানা ছাড়া আর কি বলব? অথচ লোকে এই আপাতপ্রতীয়মান ও শতভঙ্গিলীয়মান মেঘমালার মায়াকেই আঁকড়ে রাখতে চায় —আর তারা চলে গেলে ছেলের মত কেঁদে ওঠে। ভারী মজা তো! ওঃ, আমি যে আর হাসি চাপতে পারছি না গো!

কেউ কেউ আবার করে কি, মেঘের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে যে পরিবর্ত্তন হচ্ছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার হিসাব খতিয়ে রাখতে গিয়ে সময়ের অপব্যবহার করে। মাগোঃ! ওরা কেমনধারা মানুষ? ওদের চারদিকে আলোর অজস্র প্রস্রবণ, তবুও আলোকের আকুল তৃষ্ণা তাদের মিটবে না কি? এদেরই না লোকে বলে বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক। তারা চুল চিরে দুভাগ করতেই ব্যস্ত, কিন্তু সে কেশ যে বঁধুর শিরোভূষণ, তা কি তাদের নজরে আসে না ছাই! ওঃ—আমি যে আর হাসি চেপে রাখতে পারছি না! যাঁর দৃষ্টি নামরূপের মেঘে আড়াল করে দেয়নি, আলোকের আকর্ষণীর মূল নিদান যিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পান, যে আত্মদর্শীর প্রেম সাধ্যবস্তুকে লাভ করেছে, মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া নদীর মত সমুদ্র পাবার আগেই যাঁর প্রেম শুকিয়ে যায়নি, সেই ধন্য। সম্বন্ধ-সুখ থেকে দূর হতেই হবে। সম্বন্ধ যেন ডাকহরকরা। সে যে প্রিয়তমের প্রণয়লিপি বয়ে এনেছে, তা যেন খুইয়ে বসো না। দিশলাইয়ের কাঠি ধরতে না ধরতে পুড়ে যায়, কিন্তু তা দিয়ে যে চিরকালের মত প্রদীপ ধরিয়ে নিতে পেরেছে, সেই তো চতুর। বাষ্প খরচ হয়ে যাবে, রসদ ফুরিয়ে যাবে, এ তো জানা কথা; কিন্তু তার আগে জাহাজ এনে বন্দরে লাগাতে পারলে তবে না বাহাদুরী। দু' চোখে যা ঠেকছে, তাই ভগবদ্দর্শনের নিদর্শন যে করতে পারে, ঈশ্বরদর্শনের দর্পণ যে করতে পারে, তারই জীবন সার্থক। গ্রহ-নক্ষত্র, নদী-পর্ব্বত সমেত এই সমগ্র বিশ্ব তারই উদ্দেশে সৃষ্ট হয়েছিল। এ একেবারে খাঁটী কথা জানবে—আমি তোমাদের মিছে বলছি না।

উন্মুক্ত উদার প্রকৃতিতে চিরনূতন সৌন্দর্য্য রয়েছে, নগরের ধূমে আবিল রাজপথের সঙ্গে তার তুলনা করে দেখ দেখি। প্রকৃতি কারু স্তুতি বা নিন্দা করে কারু মাঝে খণ্ডবোধ জাগিয়ে দেয় না, কাউকে সে কোণঘেঁষা করে রাখতে চায় না। তার সামনে মানুষ সহজেই সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করতে পারে। সুসভ্য সমাজের চেয়ে উদ্ভিদ্‌জগতে বোধ হয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরিমাণ বেশী; কিন্তু সে সংঘর্ষের আনন্দ উপভোগ করে কে? যে তাদের মাঝে থেকেও নিজকে নির্ব্বিকার সাক্ষিস্বরূপ রাখতে পারে। অরণ্যে স্বচ্ছন্দবিহার করবার মত লোকসমাজে যিনি নিরুদ্বেগে বিচরণ করতে পারেন, নির্ব্বিকার সাক্ষিচৈতন্যরূপে অবস্থান করতে পারেন—দেহের সঙ্গে আপনাকে ঘুলিয়ে না ফেলে নিজের দেহটাকেও অপর দশটা দেহের সামিল বলে ভাবতে পারেন, এ জগৎ তাঁরই কাছে নন্দনকানন। যাঁরা এমনি ভাগবতজীবন যাপন করেন, তাঁরাই জগজ্জ্যোতিঃ। যে জ্যোতিঃ নির্ব্বিকার সাক্ষি-

রূপে সকলকে দর্শন করে, নিখিল দুঃখের সেই হচ্ছে প্রাণ।

প্রাণের স্রোত বয়ে চলেছে। ব্রহ্ম ছাড়া আর কারু সত্তা নেই। কাকে আমার লজ্জা, কাকেই বা ভয়? সমস্ত প্রাণের বিকাশ সেই মহাপ্রাণেরই লীলা—সে আর আমি এক। সমস্তটা জগৎই আমার হিমালয়ের অরণ্যবিহার ভূমি। আলো ফুটলে ফুল হাসে, পাখী গায়, তটিনী নৃত্য করে। ধন্য সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ। জ্যোতির সমুদ্র বয়ে চলেছে, আনন্দের হাওয়া ছুটে চলেছে!

এই মধুর নিকুঞ্জে—আমি শুধু হাসি, গাই, আনন্দ করি, নাচি! ওকি কারু বিদ্রূপ ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি? না, এ যে সমীরণের মৃদুপ্রবাহ! কারু উপেক্ষার হাসি কি? না, ও তো পত্রের মর্ম্মরধ্বনি! তরুলতায়, জলে স্থলে আমারই নাড়ীর স্পন্দন—সে কি আমাকেও ছাপিয়ে উঠবে নাকি!

আমি নাচি—নাচি—মধুর আনন্দে নাচি শুধু। আর আমার নৃত্যচঞ্চল চরণাঘাতে পথের ধূলি তারা হয়ে ফুটে ওঠে।

আমার ঈর্ষ্যা নাই, ভয় নাই—আমি সবার আঁখির তারা। পাপ নাই, শোক নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, শত্রু নাই, ক্ষতি নাই, পীড়া নাই, ভীতি নাই! আমি বিশ্ব-আত্মা, অমৃতের প্রস্রবণ। আমি সবার আনন্দ, সবার স্বাস্থ্য। তটিনীর কলকলে আমি, আশার মধুর স্বপনে আমি। আমি অমৃত প্রলেপ—আমি শুদ্ধ শান্ত রাম। যে সুরের আমি ঝঙ্কার তুলেছি, তাতে গ্রহ-গ্রহান্তর লোকলোকান্তর যে গাঁথা রয়েছে!

*

বাসনশৃঙ্গ

চাঁদ উঠেছে—প্রশান্তির রজতোচ্ছ্বাসে চারিদিক প্লাবিত হয়ে গিয়েছে, রামের তৃণশয্যার উপর পূর্ণচন্দ্রের আলো উপচে পড়ছে। এই পাহাড়ে যেখানে সেখানে শাদাগোলাপের অপরিমিত দীর্ঘ বীথি নির্ভীক আনন্দে বিসর্পিত হয়ে থাকে; চাঁদের আলো প্রতিহত করে এমনি ভাবে তাকে তারা কাঁপিয়ে তুলছে যে মনে হচ্ছে নিথরসুপ্ত জ্যোৎস্নার মধুর স্বপ্ন যেন তারা। ঘুমো, বাছা ঘুমো—

যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, সুমেরু, কেদার, বদ্রী প্রভৃতি হিমশিলা এত কাছাকাছি রয়েছে যে মনে হয়, হাত বাড়ালেই যেন তাদের ছোঁয়া যাবে। বাস্তবিক এই বশিষ্ঠ আশ্রমের চারিদিকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে হীরকশৃঙ্গগুলি যেন রত্ন-মুকুটের মত ঝিক্‌মিক্ করছে। জোছনার দুধসায়রে চূড়াগুলো যেন ডুবে রয়েছে, আর তাদের গভীর সোহংধ্বনি স্নিগ্ধ সমীরণপ্রবাহে এখানে ভেসে আসছে যেন।

এই পাহাড়ের সব বরফ গলে গিয়েছে, আর এখন চূড়োর কাছাকাছি বিপুল অধিত্যকাতে নীল, হলদে, শাদা, লাল কত রঙের ফুল ফুটে রয়েছে—তার মাঝে কারু গন্ধ এত মিষ্টি। এখানে লোকে আসতে ভয় পায়—তারা বলে এটা পরীস্থান। এই সংস্কার থাকাতে প্রাকৃতিক সুসমার ধর্ষকদের হাত থেকে এই দেবভোগ্য উপবনের মর্য্যাদা রক্ষা পেয়েছে। রাম এই ফুলবনের উপর দিয়ে চলবার সময় খুবই সাবধানে চলেন, যদিই বা অতর্কিত পদক্ষেপে কোনও ছোট ফুলের গায়ে ব্যথা লাগে।

কোকিল, দোয়েল ইত্যাদি কত পাখী ভোরে এসে রামের কাছে বৈতালিক গায়।

বহু উঁচুতে গরুড় উড়ছে, দুপুরের কৃষ্ণমেঘকে স্পর্শ করে—এই কি গরুড়বাহন বিষ্ণুর প্রতীক নয়? সেদিন রাত্রে একটা বাঘ রামের পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

ঐ ঝিলটার ধারে ধারে পুষ্পিত বনস্পতির কি অপরূপ সজ্জা। ওরা কোন্ বাঁধনে বাঁধা পড়েছে? সে তো পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বাঁধন নয়। একটা সমাজ-সংহতি তাদের আছে, কেননা সবাই একই জলাশয়ে তাদের শিকড় মেলেছে। এই রসপ্রীতিই তাদের সংহত করেছে। আমরাও যেন সত্যের মাঝে তেমনি শ্রদ্ধার সংহত হই—দ্যুলোকে মিলি, হৃদয়ে মিলি, রামে মিলি!*

* শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ

সন্ন্যাসী আৰু নিৰ্লিপ্ত গৃহী

সন্ন্যাস অৰ্থে সং=সম্যক্‌ৰূপে+ন্যাস=ত্যাগ; সম্পূৰ্ণৰূপে যি ত্যাগ, তাকে সন্ন্যাস বোলে। এই সন্ন্যাস তত্ত্ব সহজে ধাৰণা কৰা টান; গতিকেই সাধাৰণে সন্ন্যাসৰ প্ৰকৃত তত্ত্ব বুজিব নোৱাৰি, একোটা মনগঢ়া ভাবত সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম আৰোপ কৰে। কোনোৱে ভাবে যে কাম্যকৰ্ম্ম ত্যাগেই সন্ন্যাস, কোনোৱে ভাবে কৰ্ম্মফলত্যাগেই সন্ন্যাস, কোনোৱে ভাবে গৃহ-ত্যাগ, জটাজূট ধাৰণ, গৈৰিক পৰিধান আদি-য়েই সন্ন্যাস।

সম্যকৰূপে ত্যাগেই হল প্ৰকৃত সন্ন্যাস। ত্যাগ কি প্ৰকাৰ? "আসক্তি পৰিহাৰঃ।" আসক্তি পৰিহাৰেই ত্যাগ।

যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি ৰাঘব।
মনসা সংপৰিত্যজ্য সেব্যমানঃ সুখাবহঃ॥

যাক মনৰ পৰা ত্যাগ কৰা যায়, সেয়ে প্ৰকৃত ত্যাগ; নতুবা বাহ্যিক ত্যাগ ত্যাগেই নহয়। কৰ্ম্মফল ও বিষয় ভোগৰ লিপ্সা যি সমূলে ত্যাগ কৰিব পাৰিছে, সেয়ে ত্যাগী— সন্ন্যাসী। তত্ত্বজিজ্ঞাসু অৰ্জ্জুনে ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণক কৰ্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ ও কৰ্ম্মফলত্যাগ এই উভয়ৰ তাৰতম্য শোধাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল "হে পাৰ্থ, দান যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম কৰা কালত নিজ কৰ্ত্তৃত্বাভিমান ও স্বৰ্গাদি ফল-ভোগৰ কামনা ত্যাগেই মোৰ মতে শ্ৰেষ্ঠ।" কামনাযুক্ত কৰ্ম্মই বন্ধনৰ কাৰণ; অতএব সকাম কৰ্ম্ম বৰ্জ্জন কৰা সন্ন্যাসীৰ অৱশ্য কৰ্ত্তব্য। দেহ থকা সত্ত্বে জীৱই কৰ্ম্ম নকৰি নোৱাৰে। কৰ্ম্ম কাৰবই, কিন্তু সেই কৰ্ম্ম ভগবানত অৰ্পিত হ'ব। ফলাশা নকৰি, আসক্তি বা বিৰক্তি ব্যতিৰেকে উপস্থিত কৰ্ম্ম কৰি যোৱাই হ'ল কৰ্ম্মসন্ন্যাস। কৰ্ম্মত্যাগ তিনি প্ৰকাৰ, সাত্ত্বিক, ৰাজসিক ও তামসিক। ফলাশাশূন্য হৈ কৰ্ম্মৰ অনুষ্ঠান সাত্ত্বিক ত্যাগ। সন্ন্যাসীৰ এই সাত্ত্বিক ত্যাগ অৱলম্বনীয় হলেও, ই গুণময়। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই "ত্ৰৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্ৰৈগুণ্যো ভবাৰ্জ্জুন" বুলি যি ত্যাগৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেই ত্যাগ নিৰ্গুণাত্মক।

এই গুণাতীত সন্ন্যাসেই মুমুক্ষু সকলৰ অৱলম্বনীয়। ফলত্যাগৰূপ সাত্ত্বিক ত্যাগত নিত্য-কৰ্ম্মাদিৰ কৰ্ত্তব্যবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে; কৰ্ত্তব্য পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সন্ন্যাসাশ্ৰমৰ অধিকাৰ নহয়; গতিকে এই দুই বিৰুদ্ধ ভাবৰ সামঞ্জস্য ৰাখি কৰ্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যতিৰেকে উপস্থিত কৰ্ম্ম ফলাভিসন্ধিশূন্য হৈ কৰি যোৱাই নিৰ্গুণ ত্যাগ। পদুমপাত পানীতে থাকিও যেনেকৈ পানীত লীন নেযায়, সেইদৰে কৰ্ত্তব্য-বুদ্ধি শূন্য হৈ স্ব স্ব ইন্দ্ৰিয় দ্বাৰ কৰ্ম্ম কৰি গলে, কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মফলত জড়িত হব নেলাগে। এই ত্যাগৰ নাম গুণাতীত ত্যাগ। এয়ে প্ৰকৃত সন্ন্যাস। এই ত্যাগ সন্ন্যাসৰ মহিমা কীৰ্ত্তন কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে—

সৰ্ব্বলোকেষ্বপি ত্যাগী সন্ন্যাসী মম দুৰ্লভঃ।

সমাজত থাকি পাবৰ আশাত ফলমূল আহাৰ কৰা ৰাজস ত্যাগ, আৰু চিত্তশুদ্ধিৰ কাৰণে বিধি অনুসৰি সংযমী হোৱা সাত্ত্বিক ত্যাগ। কিন্তু কেউবিধেই গুণময়, কাজেই সন্ন্যাসীৰ অৱলম্বনীয় নহয়। সন্ন্যাসীৰ ত্যাগ নিৰ্গুণাত্মক। প্ৰলুব্ধ নোহোৱাকৈ অনাসক্ত-ভাবে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য স্ব স্ব বিষয় ভোগ কৰাৰ নাম গুণাতীত ত্যাগ। নতুবা লেংটি মাৰি গছৰ তলত বহি থকাৰ নাম ত্যাগ নহয়। লেংটিত আসক্তি, গৰদত বিৰক্তি, কম্বলত আসক্তি, নিহালিত বিৰক্তি, পজাত আসক্তি, দালানত বিৰক্তি, শাকত আসক্তি, মিষ্টান্নত বিৰক্তি নিৰ্গুণ ত্যাগৰ লক্ষণ নহয়। আসক্ত ও বিৰক্ত নহৈ স্ব স্ব ইন্দ্ৰিয় দ্বাৰা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কৰাকেই গুণাতীত ত্যাগ বোলা যায়। এনে নিৰ্গুণ ত্যাগীয়েই প্ৰকৃত সন্ন্যাসী। কছুৱে আপনাৰ সকলো ত্যাগ কৰিব পাৰে; কিন্তু নিজক কোনেও সহজে ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। সুতৰাং সৰ্ব্বোত্তম সন্ন্যাসী তেঁৱেই, যি সকলো কামনা পৰিত্যাগ কৰি, শৰণাগত ও ভক্তিপৰায়ণ হৈ নিজক পৰমেশ্বৰৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰিব পাৰিছে। যেতিয়া তোমাৰ "তুমিত্ব" ব্ৰহ্মস্বৰূপত কিম্বা ভগবানৰ সত্তাত ডুবি যাব, যেতিয়া তোমাৰ অস্তিত্বৰ লেশমানো স্বতন্ত্ৰতা নেথাকিব, তেতিয়াই তুমি ত্যাগী;—তেতিয়াই তুমি বৈৰাগী;—তেতিয়াই তুমি প্ৰকৃত সন্ন্যাসী।

এই পৰিমিত যি আলোচিত হ'ল, তাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ'ল যে কৰ্ত্তব্যজ্ঞান শূন্য হৈ উপস্থিত কৰ্ম্ম কৰা, নিৰ্লোভী হৈ অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ কৰা ও নিজৰ নিজত্ব ভগবানত অৰ্পণ কৰাই গুণাতীত ত্যাগ। সম্যকৰূপে এই প্ৰকাৰ ত্যাগ কৰাকে প্ৰকৃত সন্ন্যাস বোলা যায়। ভগবান নিৰ্গুণ; গুণৰ অভাব নহয়—গুণৰ অতীত অৱস্থা মাত্ৰ; অৰ্থাৎ তেওঁ গুণত লিপ্ত নহৈ গুণৰ দ্বাৰা কৰ্ম্ম কৰে মাত্ৰ। সেইদৰে সন্ন্যাসীৰ ত্যাগ নিৰ্গুণাত্মক—তেওঁলোকে গুণত লিপ্ত নহৈ, গুণৰ দ্বাৰা কৰ্ম্ম কৰে, কৰ্ম্মত আসক্তি বা বিৰক্তি নাই। এনে ধৰণৰ ন্যাসেই প্ৰকৃত সন্ন্যাস পদবাচ্য।

সংসাৰত থাকিও মুমুক্ষু লোক সন্ন্যাসী হব পাৰে। সেই কাৰণেই জনক, অম্বৰীষ আদি মহাত্মা সকল গৃহী হৈয়ো সন্ন্যাসী নামে পৰিচিত। নতুবা লেংটিৰ মায়া এৰিব নোৱাৰিলে সন্ন্যাসাশ্ৰমত থাকিলেও সি গৃহস্থাধম।

যি কোনো আশ্ৰমীয়েই হওক, যদি নিৰ্লিপ্ত ভাবে সংসাৰত থাকে, তেন্তে তেওঁ সন্ন্যাসী—মুক্তিৰ অধিকাৰী। নিৰ্লিপ্ত গৃহী ও প্ৰকৃত সন্ন্যাসী এক। এওঁ লোকৰ ভিতৰত ব্যবহাৰিক ভাবে পাৰ্থক্য থাকিলেও পাৰমাৰ্থিক

ভাবে কোনো ভেদ নাই ; আমালোকে পুৰাণৰ হৰিহৰ মূৰ্ত্তিৰ দ্বাৰা ইয়াকে শিক্ষা পাও। ইয়াত হৰ অৰ্থে শ্মশানবাসী, জটাজূটধাৰী শিব, আৰু হৰি অৰ্থে বৈকুণ্ঠ বিহাৰী বিষ্ণুক বুঝাই। হিন্দু মাত্ৰেই জানে যে হৰিহৰ অভিন্ন। কিন্তু বাহ্যতঃ উভয়ৰ আকাশ পাতাল প্ৰভেদ। এক জন সৰ্ব্বস্বত্যাগী, শ্মশানবাসী, বাঘচাল মাত্ৰ সম্বল, বিৰূপ বেশ ; কাজেই হৰ ত্যাগী—বৈৰাগী—সন্ন্যাসী। ইজন হ'ল মণিমুক্ত খচিত ন্যৃত্যগানে আমোদিত বৈকুণ্ঠ বিহাৰী ;—লগত অনুপমা সুন্দৰী—কাজেই হৰি ভোগী—বিলাসী—গৃহবাসী। স্থূলতঃ দুয়োৰে মাজত পাৰ্থক্য দেখিলেও মূলতঃ কোনো বিভিন্নতা নাই। শিব সন্ন্যাসী সচা;—কিন্তু চোৱা—তেওঁৰ কোলাত কোন্ সেই বিশ্ববিমোহিনী ? এওঁ জীবজগৎৰূপা বিশ্বৰূপিণী প্ৰকৃতি। শিব সন্ন্যাসী হৈ আমিত্বৰ সঙ্কীৰ্ণতা নাশ কৰিছে হয়, কিন্তু জগৎজীবক বুকত সাবটি ধৰিছে ; পৰাৰ্থে স্বাৰ্থ পদ দলিত কৰিছে ; নিজৰ বুলিবলৈ তেওঁৰ একো নাই সচা, কিন্তু প্ৰতিভূতেই তেওঁৰ, প্ৰত্যেকৰ হিতৰ কাৰণেই তেওঁ ৰত। সেই কাৰণেহে তেওঁ ভূতনাথ নামে অভিহিত। তেন্তে দেখা গ'ল শিব সন্ন্যাসী হৈয়ো সংসাৰত লিপ্ত। আৰু আমি যে হৰিক গোকুল বিহাৰী ৰূপে দেখিছো, তেওঁ গোকুলত গোপগোপী লৈ প্ৰেমত মাতোৱাৰা, ৰাধাৰ প্ৰেমত যেন জলকলা, ৰাধাৰ সামান্য অদৰ্শনতে ৰাধাকুণ্ডত প্ৰাণ পৰিত্যাগ কৰিবলৈ উন্মত, সকলোৱে জানে যে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাধাগত প্ৰাণ। ৰাধাৰ ক্ষন্তেক বিৰহত যেন তেওঁ নৈবাচে। কিন্তু ক'তা ? যেই অক্ৰূৰ আহি মথুৰাৰ সম্বাদ জনালে, সেই মথুৰালৈ যাত্ৰা কৰিলে, ৰাধাৰ ওচৰত দেখা কৰি বিদায় লোৱাৰ অবসৰ তেওঁৰ নহল বা প্ৰয়োজন নেভাবিলে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ মথুৰাযাত্ৰা সংবাদ পাই ৰুক্মিণীৰাই আহি বাটত দীঘল দি পৰি ক্ষন্তেক বৈ যাবলৈ কতনো ধৰিলে, কতনো কান্দিলে, অৱশেষত ৰথৰ তলত পৰি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলৈকো উন্মত হ'ল ; কিন্তু ক'তা। ৰুক্মিণীৰ সেই প্ৰেমোন্মাদ মৰ্ম্মভেদী কাতৰতালৈ ভ্ৰুক্ষেপ নকৰি শ্ৰীকৃষ্ণই মথুৰা যাত্ৰা কৰিলে। ৰাম অৱতাৰত পতিপ্ৰাণা সীতাক বিনা অপৰাধত ৰজাৰ কৰ্ত্তব্য অজানত বনলৈ দিলে। তেনেহলে দেখা গ'ল, তেওঁ স্ত্ৰী পুত্ৰ, বিষয় বৈভৱ লৈ ভোগত ভোল থাকিলেও, স্ত্ৰী পুত্ৰৰ আচল ধৰি নিজ কৰ্ত্তব্যত হেলা নকৰিছিল, আত্মসুখত অন্ধ হৈ জীৱৰ দুঃখ নেপাহৰিছিল। সঙ্কীৰ্ণ আত্মস্বাৰ্থত পৰি পৰাৰ্থ পদদলিত কৰা নাছিল ; নিজৰ হিত কৰিবলৈ গৈ পৰৰ হিত পাহৰা নাছিল ; গতিকেই তেওঁ গৃহী হলেও নিৰ্লিপ্ত। হৰ সন্ন্যাসী হৈয়ো লিপ্ত, আৰু হৰি গৃহী হৈয়ো নিৰ্লিপ্ত। লিপ্ত সন্ন্যাসী ও নিৰ্লিপ্ত গৃহী একে কথা—কাজেই হৰিহৰ এক—অভেদ। ইফালে গৃহীৰ আদৰ্শ হৰি, সন্ন্যাসীৰ আদৰ্শ হৰ। যি গৃহস্থই হৰিৰ আদৰ্শত জীবন গঠন কৰিছে, তেওঁ হৰৰ আদৰ্শত গঠিত সন্ন্যাস জীবনৰ সৈতে একে। দুয়োৰো মাজত কোনো বিভিন্নতা নাই। বৰং হৰিৰ গঠিত গৃহস্থী হৰৰ আদৰ্শত গঠিত নোহোৱা সন্ন্যাসীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। আৰু হৰৰ আদৰ্শত গঠিত সন্ন্যাসী সকলো প্ৰকাৰ গৃহস্থতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, এই কথা কোৱাই বাহুল্য। সেই কাৰণেই সেই কালত সন্ন্যাসীৰ ওচৰত দোৰ্দ্দণ্ডপ্ৰতাপ ৰজা পৰ্য্যন্ত সকলোৱে কৰজোৰ কৰিছিল। হৰিহৰ অভেদ হলেও হৰই "জগদ্গুৰু" ৰূপে পৰিচিত।

অতএব গৃহস্থই হোৱা বা সন্ন্যাসীয়েই হওঁৱা, যি আত্মস্বৰূপত থাকি নিৰ্লিপ্তভাবে

বিষয়ভোগ কৰি, অনাসক্তভাবে জগতৰ হিত অনুষ্ঠানত জীবন উৎসর্গ কৰিছে, তেওঁৱেই শ্রেষ্ঠ। এইপ্রকাৰ গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীৰ কোনো ভেদ নাই। সেই কাৰণেই গৃহী ব্যাসদেৱ ও সন্ন্যাসী শঙ্কৰাচাৰ্য্যই একাসনত ঠাই পাইছে। তেন্তে দেখা গ'ল, আহাৰত কিম্বা বিহাৰত, লেংটিত অথবা চিমটিত, দণ্ড কিম্বা কমণ্ডলুত, ছাইমাটি কিম্বা ত্রিপুণ্ড্র তিলকত, অথবা দেশে দেশে গৈৰিক বেশে ফুৰাই সন্ন্যাস নহয়।

আকৌ কওঁ, যেন মনত থাকে, যি আমিত্বৰ সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গি বিশ্বময় আমিত্ব প্রসাৰিত কৰি সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টিৰে জগতৰ হিত অনুষ্ঠানত জীবন উৎসর্গ কৰিছে; যি নৰক অমৃত দি নিজে গৰল পান কৰিছে; যি পৰৰ দিঙ্গিত মণিহাৰ পিন্ধাই নিজে ফণিহাৰ ধাৰণ কৰিছে, তেওঁৱেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আহাঁ, আমি সকলোৱে নতচিত্ত হৈ এই মহাযোগী সন্ন্যাসীৰ চৰণত নতজানু হওঁ।



শক্তিতত্ত্ব

জগতের মূলে শক্তি। অহরহঃ পরিবর্ত্তনই জগৎ। যদি পরিবর্ত্তন থাকে, তাহা হইলে তাহার বিপরীত অপরিবর্ত্তনের অবস্থাও নিশ্চয়ই আছে—ইহা আমাদের বুদ্ধি বলিয়া দেয়। চঞ্চল আর অচঞ্চল—এই দুইটী ধারায় বিভক্ত না করিয়া জগতের কোনও অবস্থার বিষয় আমরা চিন্তা করিতেই পারি না। চঞ্চলতার আর এক নাম গুণ বা বিক্ষোভ। তাহা হইলে অচঞ্চল তত্ত্ব হইল নির্গুণ, নির্ব্বিকার। এই কথাটাকেই বেদান্তের পরিভাষায় বলে, ব্রহ্ম নির্গুণ, শক্তি সগুণ। কিন্তু তা বলিয়া দুইটী তত্ত্ব নয়—একই তত্ত্বের দুইটা দিক, যেমন একই পাতার দুইটা পিঠ। আমাদের বুদ্ধি দোটানার মাঝে পড়িয়াছে কি না, তাই তার কাছে ব্রহ্ম আর শক্তি, স্থৈর্য্য আর চঞ্চলতা দুইটী আলাদা আলাদা বলিয়া মনে হয়। এটাই তো ভ্রম বা অবিদ্যা বা ভেদদর্শন। ব্রহ্ম আর শক্তিতে, সগুণে আর নির্গুণে, স্থৈর্য্য আর চঞ্চলতায় মেঘে বিদ্যুতের মত জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে—এইরূপ অনুভব করাই অদ্বৈতজ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞান মানে সব এক-সা করিয়া ফেলা নয়—দুইয়ে মিলিয়া যে পূর্ণতা, ইহাই জানা অদ্বৈতজ্ঞান। মিলনের তত্ত্ব অদ্বৈততত্ত্ব, বিচ্ছেদের প্রতিভাস হইল দ্বৈতভ্রম। বৈষ্ণবের রাসের চিত্র অদ্বৈত বিলাসের ফটো; শাক্তের হরপার্ব্বতী অদ্বৈততত্ত্বের ঘনবিগ্রহ।

শক্তিকে আমরা বলি মা। মাকে অনুভব করিব কোথায়? আপনার হৃদয়ে। সন্তান ক্ষুধার মাঝে মাকে অনুভব করে; যখন বাহিরের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আশ্রয় খোঁজে, তখন মাকে অনুভব করে—আপনার অন্তরের ব্যাকুলতায়। ভীত, ত্রস্ত, বুভুক্ষিত সন্তান "মা মা" বলিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে—সেই ব্যাকুলতাই জমাট বাঁধিয়া করুণার ঘনবিগ্রহ হইয়া মা রূপে দেখা দেয়, মমতার সুকোমল বেষ্টনে সন্তানকে জড়াইয়া ধরে। মাতৃসত্তার

প্রমাণ এই অন্তরের ব্যাকুলতায়। আগে ভিতরে মাকে চাও এবং পাও—তাহা হইলে বাহিরে পাইতে আর কতক্ষণ?

শিশুর হৃদয়ে এই সহজ সরল মাতৃঅনুভূতি-কেই দার্শনিক চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না, কার্য্যদ্বারা তাহার অনুমান হয়। একটা ঢিল ছুঁড়িলে, বিশ হাত দূরে সেটা ছিটকাইয়া পড়িল। কেন পড়িল? তুমি বলিবে, আমার বাহুপেশীতে যে শক্তি অবরুদ্ধ ছিল, তাহাকে মুক্ত করিয়া ঢেলাটার মাঝে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছি, তাহাই ঢেলাটাকে এতদূরে বহিয়া নিয়া ফেলিল। তোমার হাতখানা দেখিতেছি, ঢেলাটাকেও দেখিতেছি, কিন্তু হাত হইতে কি বস্তু আসিয়া ঢেলাটাকে সচল করিল, তাহা তো দেখিতেছি না। অথচ সে বস্তু নাই, এমন বলিতে পারি না। ইহা তোমার বাহুর শক্তি, বাহুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, প্রয়োজন হইলে কার্য্যে অভিব্যক্ত হয়, নতুবা বাহুতেই লীন থাকে। আজকাল বিদ্যুতের বলে কি না হইতেছে; আলো, তাপ, গতি, ইত্যাদি কত বিচিত্র কার্য্যে তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আসলে বিদ্যুৎটা কি, কোথায় আছে, তাহা কেহ জানে না—বিদ্যুতের কাজগুলি যেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, বিদ্যুৎ সেরূপ হয় না। এই হইতেছে শক্তির রহস্য। শক্তি আছে—নইলে কাজ হয় কিসে? আবার সে নাই-ও, কারণ তাহার কাজ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাকে তো দেখিতে পাই না। অতএব শক্তি সদসতী, বা অনির্ব্বচনীয়া।

এই কথাটাই একবার জগতের মাঝে আরোপ করিয়া বোঝ দেখি। জগৎটা দেখিতেছি চলিতেছে; কিন্তু কে চালায় তাহাকে তো দেখিতে পাইতেছি না। অথচ কাজ দেখিয়া কর্ত্তার অনুমান না করিয়া উপায় নাই। নৈয়ায়িক এই যুক্তিতে ঈশ্বর প্রমাণ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, জগৎ একটা কার্য্য, কেননা তার মূলে দেখিতেছি কৃতি বা প্রযত্ন; তাহা হইলে কর্ত্তা একজন আছেন, এ কথা নিশ্চয়; তিনিই ঈশ্বর। এইরূপে কাজ দেখিয়া ঈশ্বরের অনুমান আসে, তার পর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা—ইহাই নৈয়ায়িকের রীতি। সাংখ্যবাদীরা বলেন, ঈশ্বর মানি না; কিন্তু তাঁহারাও কার্য্য মানেন, আর কার্য্যের মূলে স্বভাব মানেন, নতুবা কার্য্যপরিণামের তো কোনও ব্যাখ্যা হয় না। নৈয়ায়িকের ঈশ্বরও শক্তি, সাংখ্যবাদীর স্বভাব বা প্রকৃতিও শক্তি। ইহারা সকলেই শক্তিকে বাহিরে বাহিরে দেখিয়াছেন। শক্তিকে অন্তরঙ্গভাবে দর্শন করিয়াছেন বৈদান্তিক; কি করিয়া, তাহা বলিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কার্য্য দেখিয়া আমরা শক্তির অনুমান করি; ইহাতে প্রমাণ হয় শক্তি আছে। নৈয়ায়িক ও সাংখ্যবাদী এইরূপে শক্তি মানিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ চিন্তায় শক্তির স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যখন কার্য্যের অভাব হয়, তখন শক্তি কোথায় থাকে, এই প্রশ্ন আপনা হইতেই মনে জাগে। অনুমানবাদীরা বলিবেন, শক্তি তখন সুপ্ত অর্থাৎ নাস্তি। ইহাতে প্রকারান্তরে শক্তির অসত্তাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু শক্তির এই সুপ্তাবস্থা বা অনভিব্যক্ত অবস্থা যদি আমার নিজের মাঝে আরোপ করি, তাহা হইলে আর এক রহস্য চোখে পড়ে। একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইতেছি। মনে কর, তোমার সম্মুখে বীররসের অভিনয় হইতেছে। অভি-

নয়ের ধর্ম্মই এই, তাহা দ্রষ্টার মাঝে রসের উদ্রেক করে। তুমি স্বয়ং চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, আস্ফালন ইত্যাদি তোমার স্নায়ুপেশী ইত্যাদিতে অনুরূপ ক্রিয়া জাগাইয়া দিবে। কিন্তু তুমি দর্শক বলিয়া নিজকে সংযত করিয়া রাখিবে, ঐ সমস্ত ক্রিয়াকে অভিব্যক্ত হইতে দিবে না। এখন অভিনেতা ও দর্শক, এই উভয়ের অবস্থা তুলনা কর। দেখিতে পাইতেছি, অভিনেতা সক্রিয়, দর্শক নিষ্ক্রিয়। কিন্তু অভিনেতার মনে যে ভাব, যে প্রেরণা, দর্শকের মনেও তাহার সমস্তই পুনরাবৃত্ত হইতেছে। তাহা হইলে দেখিতেছি, উভয়ের মূলে একই শক্তি— কিন্তু অভিনেতাতে তাহা ক্রিয়াশীল, দর্শকে নিষ্ক্রিয়। অথচ মজা এই, অভিনেতা শক্তির পরিচালনায় তন্ময়, সুতরাং রসের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত; কিন্তু দর্শক অভিনেতার সমস্তগুলি ভাব পাইয়াও নির্ব্বিকার, অতএব অভিনয়ের রসিক সমজদার। এইখানে দেখি, অভিনেতার মাঝে কার্য্যবশে শক্তি স্ফুরিত, কিন্তু দর্শকে তাহা অনভিব্যক্ত বা সমাহিত। অভিনেতার মাঝে শক্তির অনুমান মাত্র, কেননা অভিনেতা তন্ময় হইয়া আছে বলিয়া তো শক্তির স্ফুরণ অনুভব করিতে পারিতেছে না; আর দর্শকের মাঝে শক্তির স্বরূপানুভূতি—কেননা দর্শক যেমন কার্য্যও দর্শন করিতেছেন আবার সেই কার্য্যের মূলগত প্রেরণাকেও অন্তরঙ্গরূপে তাঁহার মাঝেই আস্বাদন করিতেছেন। কার্য্যপ্রেরণা তাঁহার ভিতরেও ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তিনি তাহা চাপিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া প্রেরণার আনন্দ সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিতেছেন, কার্য্যের হট্টগোলে তাহার স্বরূপানুভূতি হারাইয়া ফেলিতেছেন না।

এইরূপে বৈদান্তিক বোঝেন, বাহিরে যাহা দেখিতেছি, তাহা শুধু কার্য্যমাত্র, তাহা সত্য নহে। কার্য্যের মূলে যে কারণ তাহাকেই দেখিতে হইবে; কারণই কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত, ইহাই মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। আর এই কারণকে চিনিতে হইলে কার্য্য হইতে পরাবৃত্ত হইয়া নিজের মাঝে তাহাকে অনুভব করিতে হইবে। বৈদান্তিকের কার্য্যকারণৈকাত্মতাবাদ, নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ, মায়াবাদ সমস্তই শক্তির অন্তরঙ্গানুভূতির ফল।

বৈদান্তিকের দর্শনধারা ধরিয়াই আমরা বলি, মাতৃতত্ত্বকে তোমার অন্তরে অনুভব কর। সন্তানের কাছে মা কি?—মা তার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, মা তার পরম আশ্রয়, মা তার সমস্ত অভাব ও ব্যাকুলতার চিরশান্তি। সন্তানের স্বরূপ কি?—সন্তান ক্ষুধিত, পিপাসিত, ভীত, অভাবজড়িত, নিরন্তর ব্যাকুল। এই উভয় ভাবের সন্ধি হইলেই আনন্দ, তাহাই সিদ্ধি। মাকে বাহিরে পাইবার পূর্ব্বে তোমার সন্তানত্বের দাবীকে পাকা কর। আগে বোঝ, এই যে সংসারে দুঃখজ্বালাযন্ত্রণা পাইতেছ—ইহারা মায়েরই আগমনীর ব্যাকুলতাভরা সুর; এই যে মাতৃদর্শনের জন্য তোমার প্রাণ জুড়িয়া হাহাকার বাজিয়া উঠিয়াছে—ইহাই তো মায়ের স্বরূপ, এই তো তোমার মাঝে মা। যেখানে জ্বালা, সেখানেই শান্তি তার পেছনে; যেখানে ব্যাকুলতা, তার পেছনেই তৃপ্তি। জ্বালা তুমি—শান্তি মা; ব্যাকুলতা তুমি—তৃপ্তি মা; অসহায়তা, একান্ত নির্ভর তোমার স্বরূপ—করুণা, মমতা, মায়ের স্বরূপ। জগৎ জুড়িয়া এমনি করিয়া মায়ে ছেলেতে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। যেখানে যাইবে, সেখানেই মাকে পাইবে, যদি নিজের মাঝে সন্তানকে জাগাইয়া মায়ের প্রাণে স্নেহের পিপাসা জাগাইয়া থাক। কার্য্য দেখিয়া কারণ বুঝি; সন্তানকে দেখিয়া মাকে জানি। আগে যথার্থ সন্তান হও—মাকে পাইতে কোনও বাধা থাকিবে না।

সাধনা ও আত্মানুভূতি

—:{*}:—

মুক্তিপথের যাত্রী মাত্রই সাধক—তা তিনি সম্মুখ তোরণ দিয়া রাজদরবারে উপনীত হউন বা প্রাসাদপশ্চাদ্ভাগের দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ পথে রাজাধিরাজ সকাশে উপস্থিত হউন। বাষ্পীয় যানের ন্যায় সাধকের একটা ধরাবাঁধা পথ নাই, যে অবস্থায় আছি, তাহাই সাধনার অবস্থা—পারিপার্শ্বিক যেরূপই হউক না কেন, সে শুধু তাঁহার ইচ্ছা। যেরূপ দুঃখযন্ত্রণার আগ্নেয়-গিরি হৃদয়ে জ্বলুক না কেন—সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা প্রাণে প্রাণে অনুভূত হউক না কেন, জানি তাহা তাঁহার ইচ্ছা। বুঝিতেছি, আশ্রিত-জন তাঁহার ইচ্ছার ক্রীড়াশীল কন্দুকের মত সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে একদিন বাতায়ন বিগলিত হইয়া মুক্ত হইয়া পড়িবে। তাই মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থাই আমার সাধনার অবস্থা। যথাশক্তি অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্য করিয়া নিজ লক্ষ্যে শ্যেনদৃষ্টি রাখিয়া দিনের পর দিন অতিবাহন করিতে হইবে—শুধু সেই দিনের অপেক্ষায়, যে শুভমুহূর্ত্তে শ্রীগুরুর কৃপায় অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, যেদিন একান্ত শান্তি উপস্থিত হইবে। শান্তি! যদি জিজ্ঞাসা কর, শান্তি অর্থে কি বুঝিব? তবে বলিব, শান্তি অর্থে আত্মানুভূতি। আত্মানুভূতিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় একান্ত বিশ্রান্তিই শান্তি। কিন্তু এই আত্মা কি, অনুভূতি কি, অনুভূতি আসিবার সাধনাই বা কি—তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে।

আত্মানুভূতির জন্যই জগতে যত কিছু সাধন ভজন। কিন্তু বাহ্য অনুষ্ঠানে সাময়িক ভাবে মনের সমতা হইলেও অনুভূতি আসিতে পারে না। অনুভূতি অন্তরের জিনিষ—উহা বহিঃসম্বন্ধশূন্য। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দৃশ্যমান জগৎ সংসার হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্ত জড়বস্তুর আসক্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজকে এক ঘনান্ধকারময় রাজ্যে লইয়া আসিতে হইবে; সেই অন্ধকারে সম্পূর্ণ নিরা-লম্ব অবস্থায় অবলম্বনস্বরূপ নিত্য আলোর সন্ধান করিতে হইবে। চক্ষু নিমীলনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধহীন হইলে তখনই মাত্র ক্ষণেকের তরে মনে হইবে যে, আমি স্ব-তন্ত্র, আমি চৈতন্যমাত্র; আমার বন্ধন নাই, জড়পদার্থ কখনও আমার বন্ধন হইতে পারে না—উহা মায়ার খেলা মাত্র।

অনেকে হয়ত এরূপ মনে করিতে পারেন যে গুরুই কৃপা করিয়া অনুভূতি জাগাইয়া দিবেন, অতএব সাধনভজনের প্রয়োজন নাই। আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন, যিনি কৃপা করিয়া সাধনভজনের শক্তি দিবেন, ঘোর কৃচ্ছ্র সাধনার ক্লেশ সহিবার ধৈর্য্য দিবেন, সত্যানুসন্ধানের অদম্য ও অপ্রতিহত ইচ্ছা অন্তরে জাগাইয়া দিবেন। আমি কিছু করিব না, গুরুই সব করিয়া দিবেন—এরূপ সত্যলাভে আনন্দ কোথায়? যদি চিরবাঞ্ছিতের পায়ের ধ্বনি শুনিবার জন্য সারা জীবন কুরঙ্গের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া না রহিলাম, তবে তাঁহার প্রাপ্তিতে তৃপ্তি

কোথায়? তাই বলি, হে ঠাকুর, যদি দয়া করিয়া ধরা দিয়াছ, তবে যে বস্তু সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, তাহাকে বুঝিতে যেন একটা উল্কাপিণ্ডের ন্যায় প্রলয়কালীন ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া নিজেই জ্বলিতে জ্বলিতে সাধনগগনের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে গিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারি। তাই ডাকি, হে ভগবান্, দুঃখ দাও, সাধনভজনের যতপ্রকার কৃচ্ছতা আছে সবই দাও, সঙ্গে সঙ্গে তাহা বহিবার ও সহিবার শক্তি দাও—তবেই না তোমাকে পাইলে আনন্দ হইবে।

এ পথ বন্ধুর; যিনিই এ পথে গমনেচ্ছু, তিনিই মনে মনে দৃঢ়ভাবে জানিয়া রাখুন—সাধকের সহায় কেহ নাই। গুরু পূর্ব্ব জন্মের সাধনার সঙ্গে এ জন্মের সাধনা যোজনা করিয়া দিবেন এবং অভীষ্টসিদ্ধির সহজ পথটা বলিয়া দিবেন। সাধনা কিন্তু নিজকেই করিতে হইবে। তবে যদি কখনও চেষ্টা করিয়া কোন বিষয়ে হতাশ হও, তবে তোমার ব্যাকুলতায় ব্যথিত ও কৃপাপরবশ হইয়া গুরু তাহা সহজ করিয়া দিতে পারেন। মনে রাখিবে, গুরু ও ভগবান স্বরূপতঃ এক। আর এ কথাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে, যিনি ফলদাতা, তিনি অনধিকারীকে তাহার কর্ম্ম ব্যতীত ফল দিতে পারেন। তবে এটুকু হইতে পারে যে তোমাদ্বারা কর্ম্ম করাইয়া লইয়া তারপরে তিনি ফল দিতে পারেন। আত্মদর্শনের পর জীবের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে না। তাহার ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা মিলিয়া এক হইয়া যায়। তখন আর অযথা কৃপার ইচ্ছা হয় না—হইতে পারে না। তাই বলি, সাধনজগতে তুমিই তোমার বন্ধু। এ কথা শ্রীভগবান অর্জ্জুনকেও বলিয়াছিলেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

আত্মা চিন্মাত্র। আর জীব চিদাভাস। চিদাভাস বা জীবাত্মা আত্মাকে অনুভব করেন সাধনা দ্বারা। চিৎ নিত্য, শাশ্বত, ক্ষয়বৃদ্ধিহীন, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্লিপ্ত, সুখদুঃখের অতীত, সাক্ষিমাত্র এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। আর জীব বা চিদাভাস বিনশ্বর, সুখ দুঃখ ও মোহে অভিভূত। এই চিদাভাসের আবার পাঁচটী শরীর আছে। এই শরীর পাঁচটী পরমাণুময় হইয়া সমস্ত শরীরেই ওতপ্রোত। পরমাণুর সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে উত্তরোত্তর আরও সূক্ষ্ম অবস্থাই উৎকৃষ্ট কোশের স্বরূপ। সাধনাদ্বারা এক এক করিয়া চারিটী অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিলেই পঞ্চম অবস্থায় চিদাভাসের আত্মানুভূতি হইয়া থাকে। আর এই পঞ্চম অবস্থায় যদি জীব শ্রীভগবানের একান্ত অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হয়, তখনই সে শ্রীভগবানের সহিত মিশিয়া যায়। সচরাচর আমরা যাহাকে আত্মা বলি, তাহা কখনই আত্মা নহে। উহা চিদাভাসের চতুর্থ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। চৈতন্য প্রথমে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন। সেই বিম্বের আভা আবার পরবর্ত্তী শরীরে অসংস্কৃত-পরমাণুপুঞ্জ বা বিজ্ঞানময় কোশকে আভাসিত করিয়া সতেজ করে। এইরূপে এক একটী কোশ পর্য্যায়ক্রমে পরবর্ত্তী কোশকে সতেজ করে। এখন দেখিতে হইবে যে আমরা যাহাকে 'আত্মা' বলিয়া অনুভব করি, তাহা প্রকৃত আত্মা কি না?

অধ্যাত্মজগতে সাধনার তিনটী অবস্থা আছে যথা—প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ। যাঁহারা ভগবানকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তদুপদিষ্ট সাধনাদিতে অনুরক্ত হইয়া সাধনার ক্লেশ অবাধে সহ্য করেন, তাঁহারাই প্রবর্ত্তক

শ্রেণীর। এই প্রবর্ত্তকের প্রথম যে আত্মার অনুভূতি হয়, তাহা ত' আত্মা নহে—উহা প্রাণময়কোশ আভাসিতকারী চিদাভাস। প্রবর্ত্তক এই চিদাভাসের সাড়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া শ্রীভগবানকে জানিবার জন্ম ব্যগ্র হন। বহু সাধনার পর প্রবর্ত্তক যখন শ্রীভগবানকে জানিতে পারেন, তখনই তিনি সাধক। সাধকের অবস্থার পরেই সিদ্ধির অবস্থা। সিদ্ধির অবস্থায় ভগবানের সারূপ্য লাভ হয়। মানবমাত্রেরই ভিতর কোন না কোন প্রকার সাধনার ইচ্ছা প্রসুপ্ত আছে। মানব সব সময় ভোগে রত থাকিতে পারে না। ইহার কারণ, মানবের ভিতর শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি, তটস্থ শক্তি ও মায়া শক্তি—এই ত্রিবিধ শক্তিই কার্য্য করিয়া থাকে। স্বরূপ শক্তিই চিচ্ছক্তি; তটস্থ শক্তিকে কেহ জীব-শক্তি বলেন, কেহ বা কুণ্ডলিনী বলেন। এই জীবশক্তি বা তটস্থ শক্তির ভিতরই স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি উভয় শক্তিই বিদ্যমান। তজ্জন্য জীব দোলকের মত একবার এদিকে, একবার ওদিকে দোলায়িত হইতেছে। মায়ার আবরণী শক্তিতে জীব মোহগ্রস্ত হইলেও স্বরূপ শক্তির সহিত জীবশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর মিলন স্বাভাবিক। যাহার জীবশক্তি প্রবুদ্ধ হইবার সময় হইয়াছে, সেই প্রবর্ত্তক।

এই চিচ্ছক্তির অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইলে আত্মানুভূতি হইবে। কিন্তু কি উপায়ে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে? তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইলে একই স্থানে, নিয়মিতকালে, পরিমিত সময় কোন স্থির পদার্থে লক্ষ্য রাখিয়া পরে নেত্র মুদিত করিয়া সম্পূর্ণ নিরালম্ব অবস্থায় নিজকে ছাড়িয়া দিবে। সেই অন্ধকারে তুমি নিজকে অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। যেমন অন্ধকারের ভিতর থাকিলেই বৈদ্যুতিক আলোর জন্য প্রাণটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, নেত্র নিমীলনে, তদ্রূপ সর্ব্বত্রই অন্ধকার দেখিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠে—চাই আলো, চাই সেই জ্যোতি, যে জ্যোতির স্বরূপ আমি। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান সহ মন্ত্রের মানস জপ কর। যদি তোমার মন্ত্র ও মূর্ত্তি কিছু না থাকে, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; সময় হইলেই গুরু আপনিই হাজির হইবেন। স্বয়ং ভগবান তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মন্ত্র ও মূর্ত্তি ঠিক করিয়া দিয়াছেন, বন্ধনের সঙ্গেই তোমার বন্ধনমোচনের উপায়ও করিয়া রাখিয়াছেন—কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার প্রভাবে তাহা ভুলিয়া গিয়াছ! তোমার প্রতি শ্বাসে যে মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে, সেই প্রণব শ্রবণের অধিকার তোমার সহজাত। এই স্বতোত্থিত ধ্বনি তোমারই মনোলয়ের জন্য। শ্বাসের তালে তালে হৃদয় হইতে সে ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—সেই ধ্বনিতে মনন করিবে। দেখিবে ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত হইয়া গিয়া স্থূল শরীরের অস্তিত্ববোধ পর্য্যন্ত লয় হইয়া যাইবে এবং তুমি জ্যোতি অনুভব করিতে থাকিবে। এখান হইতেই তোমার সাধনার আরম্ভ, কারণ শরীর জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত যত সাধনা সমস্তই বিফল। শরীর জ্ঞান লোপের সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুভূতির প্রথম সোপানে প্রথম পাদক্ষেপ হইল জানিতে হইবে।

তার পর সাধনার দ্বিতীয় অবস্থা। এ অবস্থায় শ্বাসের বহির্গমন বন্ধ হইয়া মনস্থির হয় এবং সময়ের পরিমাণবোধ লোপ হয়। শ্বাসের বহির্গমন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত প্রাণায়াম আরম্ভ হয়। আত্মজ্যোতি বা চৈত-

ন্ত্রের আভা তখন আরও উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ বোধ হয় এবং মন্ত্রমূর্ত্তির সুস্পষ্ট দর্শন লাভ হয়। কিছু দিন পর সাধক মনোময়শরীরে অবস্থান করেন এবং বাহিরের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখন হৃদয়াভ্যন্তরীণ জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী হৃদ্পদ্মাসীন ইষ্টদেবতার বাক্স্ফুরণ হয় এবং সাধক তাঁহার সহিত নানা হাস্যপরিহাস করেন। সাধক তখন ভুলিয়া যান যে তিনি নিজেই ইষ্টদেব হইয়া নিজেরই সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

এ অবস্থায় যে সমস্ত ক্ষমতা লাভ হয়, তাহা ইন্দ্রাদি দশ দিকপালের ক্ষমতার সমান। কিন্তু এই সমস্ত অবস্থা পরমহংসত্বের অনেক নিম্ন অবস্থা। একমাত্র পরমহংস অবস্থাতেই আত্মদর্শন বা আত্মানুভূতি হইয়া থাকে। যে সমস্ত সাধক এই সমস্ত ক্ষমতালাভে তুষ্ট হন, তাঁহারা আর অধ্যাত্মরাজ্যের তৃতীয় স্তরে গমন করিতে পারেন না। চৈতন্য মনোপাধিক থাকায় সাধক রূপ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্ম শ্রোত্রাদি সহিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা গঠিত বিজ্ঞানময় অবস্থায় গমন করিবার সময় হইলে রূপের লয় হইতে থাকে। এই বিজ্ঞানময় অবস্থাই জ্ঞানের নিম্নভূমি; এখানে পৌঁছিতে পারিলে ঈশ্বরত্ব লাভ হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিবার ক্ষমতা জীবের আয়ত্ত হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি নিজেকে, তাহা অবগত নন। শ্রীভগবান তাঁহাদের ভিতর যেরূপ প্রেরণা দেন, তাঁহারা তদনুযায়ী কর্ম্ম করেন। যে সমস্ত মানবাত্মা এরূপ অবস্থা লাভ করেন, সময়ে তাঁহারাও আত্মজ্ঞানে অধিকারী হন।

ইহার পরের অবস্থা আনন্দময় কোশ। আনন্দময় কোশ যে কি তাহা আমাদের বুদ্ধিগম্য নহে। আচার্য্য বলিয়াছেন—"কোন অন্তর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তি ভোগকালে চিদানন্দ প্রতিবিম্বাবশিষ্ট এবং ভোগপরিসমাপ্তিতে প্রকৃতিতে লীন হয়, তাহাকেই আনন্দময় কোশ বলে।" এই আনন্দময় শরীর আত্মার স্বরূপ নহে। এই আনন্দময় শরীরে জীব যখন উন্নীত হয়, তখন মাত্র তাহার গোপীভাব লাভ হয় এবং তখন মাত্র তাহার আত্মানুভূতি হইয়া থাকে—তৎপূর্ব্বে নহে। এই অবস্থা লাভ হইলেই তখন তাহাকে সাধক বলে।

সাধকের দ্বৈতাবস্থা হইতে শ্রীভগবানের একান্ত করুণায় অদ্বৈতভাবের অবস্থা হইলেই সাধক সিদ্ধ হন বা তখন পরমহংসপদ লাভ করেন। ইহাই অনুভূতির স্বরূপ অবস্থা।

মনঃস্থৈর্য্য

—*—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥

এই হচ্ছে রোগের নিদান, এই ধরে চিকিৎসা করতে হবে। জগৎ প্রাণময়—স্পন্দমান; কাজেই বিষয় আসছে যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়ও ছুটাছুটী করছে। এই যেন শক্তির চাঞ্চল্য—রজস্তমের ক্রিয়া। চিত্ত সত্ত্বাংশ বা জ্ঞানাংশ হতে উৎপন্ন। কাজেই তার মাঝে সাক্ষিভাব কতকটা আছে, আবার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিও আছে। ইন্দ্রিয় এসে বিষয়ে যুক্ত হল—স্বভাবের বশে। মন তখন তার পিছু লাগল। মন যদি সত্ত্ব হতে বিচ্যুত হয়, তাহলে অমনি রজের আবর্ত্তে পড়ে অতি-মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠবে, নানা ফিকিরফন্দী বের করতে থাকবে, ইন্দ্রিয়ের উপর হুকুম চালাবে—এমনি করে সে বিষয়ের নৈকট্য খুঁজবে। আর তাতেই প্রজ্ঞা হৃত হয়ে, মানুষ অমানুষ হবে।

কাজেই মানুষের অধঃপতনের জন্য দায়ী তো ইন্দ্রিয় নয়, দায়ী হচ্ছে মন। মন যদি সত্ত্ব হতে বিচ্যুত হয়, তবেই সর্ব্বনাশ, তাহলে বিষয়ের রাজস ও তামস বিকার শুধু তার ভোগে আসবে। আর মন যদি সত্ত্বে প্রতি-ষ্ঠিত থেকে বিষয় গ্রহণ করত, তাহলে বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান হত, আনন্দলাভ হত। ইন্দ্রিয় তখন ক্রিয়াশীল হলেও ক্ষতি ছিল না, আত্মা তাতে গুণাবৃত হতেন না। এই হচ্ছে বেদা-ন্তীর ভোগ—শুদ্ধসত্ত্বের ভোগ। এই অব-স্থাতেই "রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ"—অথচ রমণসুখের কোটীগুণ আনন্দ মিলে।

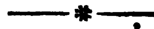
বিষয় গ্রহণ করবার সময়, চিত্তকে চঞ্চল হতে দেবে না—তা নইলেই ধূমের সৃষ্টি হবে। আর ধূম বেশী হলে দীপনির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী। দীপশিখা যখন স্থির থাকে, চারদিকে কাচের বেষ্টনী থাকে, তখনও প্রাকৃত নিয়মে ধূম উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির উন্নততর নিয়মে সেই ধূম দগ্ধ হয়ে দীপশিখাকে আরও উজ্জ্বল করে। সাধারণের ভোগে আর শুদ্ধ-সত্ত্বের ভোগে এই তফাৎ।

মনকে নিগৃহীত করাই তা হলে সকল সাধনার সার; তা হয় অভ্যাস দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা। অভ্যাস Numerical strength; বৈরাগ্য Logical strength। যুক্তিতর্ক দ্বারা বিচার দ্বারা চিত্ত প্রশান্ত করতে হবে, এ তো আছেই; তা ছাড়া একেবারে সংখ্যা ধরে বিষয় ভোগের মাত্রা কমাতে হবে, ত্যাগের মাত্রা বাড়াতে হবে। এ দুটো কাজ সমানে চললে তবে মনোনিগ্রহ হবে।

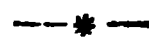
সংস্কার মরে না কেন? স্মৃতির অভাবে, অবিশ্বাসের দরুণ। সংস্কারবশতঃ ভোগ করে কষ্টও পেয়েছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর তা মনে নাই। তাই আবার ভোগের পানে ছুটলাম। একবার ভোগ করে ইন্দ্রিয় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন প্রকৃতি বিশ্রাম দিল; আবার কিছুক্ষণ পরে নূতন করে শক্তিসঞ্চার করে ইন্দ্রিয়কে যখন সঞ্জীবিত করে তুলল, তখন আবার ভোগের স্পৃহা ও সামর্থ্য জেগে উঠল। এমনি করে প্রকৃতি চিরযৌবনের

ডালি পুরুষের সামনে ধরে দিচ্ছে। এই ভোগের কি শেষ আছে? তাই শাস্ত্রে বলে, সংসার অনাদি, অনন্ত।

শেষ থাকার কোনও প্রয়োজনও তো নাই। তবে স্বাধীন হয়ে ভোগ করা চাই, পরাধীন থেকে নয়। তাই ভোগের আয়োজনের মাঝে স্থির থাকা। এমনি করে প্রাকৃত ভোগকে অচঞ্চল হয়ে গ্রহণ করতে পারলে তবে অপ্রাকৃত আনন্দের উদয় হবে। এ কথা মানুষ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না—তাই ত্যাগকে কিম্ভূতকিমাকার মনে করে আঁৎকে ওঠে। বিষয় ত্যাগ তো নয়, মূলে হচ্ছে বাসনাত্যাগ। ত্যাগ মানে উন্নততর উপায়ে ভোগ, যে ভোগে বিরতি নাই, বিরক্তি নাই। ভোগের আয়োজন আছে, ভোক্তা আছে—এ দুটীর পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়; পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে করণের। করণশুদ্ধি হলেই সফলতা মিলবে। স্থির হতে বলছি এই জন্যই।



ছাত্র রামতীর্থ



বেশভূষা সম্বন্ধে তীর্থরাম কিরূপ নিঃস্পৃহ ছিলেন, তাহা লালা বনস্পতিজীর নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বোঝা যাইবে—

"গ্রীষ্ম ও বর্ষায় তীর্থরাম মোটা খদ্দর পরিতেন। মাথা প্রায়ই খালি থাকিত। দেশী পাঞ্জাবী ঢঙ্গে চুল ছাঁটিতেন। বাহিরে যাইতে হইলে একটা শাদা মকমলের পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়া লইতেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাঁহার মাথায় কখনও টুপী দেখি নাই। শীতকালে কেবল মাত্র একটী কাশ্মিরী পট্টুর কোটে শীত নিবারণ করিতেন। বিলাতী ঢঙের পোষাক পরা তাঁহার আদপেই পছন্দ ছিল না। একদিন দেখি, তিনি যেন কি একটা সঙ্কটে পড়িয়াছেন, ভাবনার যেন আর কূল কিনারা পাইতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দুই এক দিনের মধ্যেই ইউনিভার্সিটীর কনভোকেশন্ হইবে। সার্টিফিকেট আনিবার জন্য তাঁহাকে সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে। তাঁহাকে বলা হইয়াছে যে এই সময় বিলাতী কোট ও বুট পরিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া কিছুতেই এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ তর্কের পর এই সাব্যস্ত হইল যে, ও দুটী জিনিষ কলেজেই কাহারও নিকট হইতে কিছুক্ষণের জন্য চাহিয়া লইয়া কাজ চালানো হইবে। অবশেষে এই রফা অনুসারেই কাজ করা হইল।"

তাঁহার সাদাসিধা চালচলন ও সরলতা সম্বন্ধে তাঁহার এক অধ্যাপক বলিয়াছেন—

"তীর্থরামের সে সময়কার চালচলন নিতান্তই সাদাসিধা ছিল। তাঁর ঘরে আসবাব পত্রের মধ্যে শুধু একটী খাটিয়া ও তাহার উপর নেহাৎ সাধারণ একটা তক্তপোষ ও এক

খানা চাদর বিছান থাকিত। কিন্তু তীর্থরাম প্রায়ই মাটীর উপর শুইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। আর পুঁথি পুস্তকগুলি খাটীয়ার উপর তুলিয়া রাখিতেন। বাজার হইতে তাঁহাকে খাবার কিনিয়া আনিতে হইত। দরিদ্রতার দরুণ পর্য্যাপ্তপরিমাণে দুধ খাইতে পাইতেন না—একটু ঘি সংগ্রহ করা তো দূরের কথা। কাপড়চোপড় নিতান্ত সাদাসিধা ও মোটা রকমের হইত; কিন্তু তাহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।"

তাঁহার ছাত্রাবস্থার আহার সম্বন্ধে আর একজন লেখক লিখিয়াছেন —

"কেবলমাত্র দুধই গোঁসাইজীর আহার ছিল, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অনেক সময় দিবাভাগেই তিনি ভোজনব্যাপার সমাধা করিয়া রাখিতেন। দুখানি নিতান্ত পাৎলা রুটী ছাড়া তাঁহাকে কখনও আর কিছু খাইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দিনের পর দিন তিনি কেবলমাত্র একটু দুধ খাইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, এমনও দেখিয়াছি। যদি কখনও কোনও ভাল খাবার খাওয়ার জন্য নিতান্ত জেদ ধরিতাম, তাহা হইলে শুধু আমার মনরক্ষার জন্য কণিকামাত্র ভাঙ্গিয়া মুখে দিতেন। তাঁহাকে কখনও ঔষধ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তবে দুই একবার সামান্য সর্দ্দি হইলে কোনও হিন্দু কারখানা হইতে এক আধ বোতল সোডা কিনিয়া খাইতে দেখিয়াছি। মাংসভক্ষণকে তো তিনি প্রকাশ্যেই পাপ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, এমন কি কেহ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেও তাঁহার ঘৃণা বোধ হইত। তিনি বলিতেন, যদি কখনও বাজার করিবার সময় কোথা হইতে মাংসের গন্ধটুকু নাকে ঢুকিত তো বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মাথা ঘুরিতে থাকিত। এইরূপ মাদক পদার্থকেও তিনি হলাহল বলিয়া বর্ণনা করিতেন।"

ব্যায়াম ও যুক্তাহার বিষয়ে তিনি নিজেই একবার ধন্নারামজীকে লিখিয়াছিলেন, "মহারাজজী, আজকাল আপনার শরীর কেমন? আপনি যতটুকু পারেন, ব্যায়ামের অভ্যাস রাখিবেন এবং মাঝে মাঝে দুই একদিন উপবাস করিবেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ইহাতেই আপনি আরাম হইয়া যাইবেন। আমার তো মনে হয়, অসুখের সময় পানাহারের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ঔষধপত্রের দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়াতেই আপনি কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন।"

রীতিমত ব্যায়াম করা তীর্থরামের নিত্যকর্ম্ম ছিল। অধ্যক্ষ হর্ভিঙ্গ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে ব্যায়াম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। হর্ভিঙ্গ বলিয়াছেন, "আমেরিকা হইতে আমি যখন প্রথম এই কলেজে প্রিন্সিপাল হইয়া আসি, তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর এক অতি সুশীল, শান্ত, বিনয়ী বিদ্যার্থী আমার চোখে পড়ে। নানারকমে সে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। ছেলেটীকে আমার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে তাহাকে সর্ব্বদা প্রশংসার দৃষ্টিতে না দেখিয়া আমি থাকিতে পারিতাম না। তাহার শরীর দুর্ব্বল দেখিয়া একদিন নির্জ্জনে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, 'তুমি যদি একটু আধটু ব্যায়াম কর তো ভাল হয়, কারণ স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে তোমার লেখাপড়া ঠিক ঠিক চলিবে না।' আমার কথাটা তাহার মনে লাগিল। ইহার পর যেমন তাঁহার শরীরের উন্নতি হইতে লাগিল,

তেমনি তাঁহার মত কুশাগ্রবুদ্ধি ছাত্র একটীও কলেজে রহিল না। গণিতে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং এই বিষয়ে প্রথম হইতেই সে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল।"

তিনি যে ব্যায়াম করিতেন, তাহা একটু নতুনতর। তাঁহার এক বন্ধু বলিতেছেন—

"এম এ পড়িবার সময় তীর্থরামকে এক-প্রকার ব্যায়াম করিতে দেখিয়াছি, যাহা আর কাহাকেও কোনও দিন করিতে দেখি নাই। ঘরের মেঝের উপর একটা খাটিয়া পাতিয়া তাহার দুইটী পায়া ধরিয়া তিনি যতদূর পারেন সোজা সেটাকে উঁচু করিয়া তুলিতেন এবং ধীরে ধীরে আবার তাহাকে সোজা নামাইয়া রাখিতেন। মুখ বন্ধ রাখিয়া তিনি ঘন ঘন এই কসরত করিতেন।" এই অদ্ভুত কসরত একবার প্রিন্সিপাল বেল সাহেবকে দেখাইয়া তাঁহাকে কিরূপ চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চিঠি হইতেই আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই ব্যাপার হইতে তাঁহার শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে তাঁহার ছাত্র-জীবনের প্রেরক ও ধারকশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে—

"তোমার যথার্থ স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিও। ইহা ছাড়া অন্য কোনও সম্পর্ক বিষয়ের লেশমাত্র চিন্তাও হৃদয়ে স্থান দিও না। সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ ও নির্জ্জনবাস দ্বারা স্বরূপে নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়। আত্মস্বরূপে নিষ্ঠা থাকিলে সমস্ত সংসার তোমার দাস হইবে।

"সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ ও ভজনকীর্ত্তন—এই তিনটী বস্তু তোমাকে ত্রিলোকের রাজা করিয়া দিতে পারে। কুসঙ্গসেবাদ্বারা কেবল মাত্র ঈশ্বরের কোপ নিজের উপর টানিয়া আনা হয় এবং তাহার দরুণ অশেষ দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়। নির্জ্জনবাস ও অনাহার করিলে স্বয়ং পরমাত্মা আসিয়া তোমার সঙ্গ করিবেন।

"যিনি ভক্ত, তিনি ধন ও উপকরণহীন হইয়াও বাদশাহের দৌলত ভোগ করিয়া থাকেন। বস্তুমাত্রের সাহায্য না লইয়া ভক্তি মানুষকে উভয় লোকের রাজা করিয়া দেয়।

"কবীরজীর এই দোঁহাটীতে কি সুন্দর অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে—

মন ঐসো নির্ম্মল ভয়ো জৈসে গঙ্গানীর;
পিছে পিছে হরি ফিরে কহত কবীর কবীর।"

(ক্রমশঃ)

যম ও নিয়ম

—*—

[প্রবক্তা—ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব]

—*—

যোগের আটটী অঙ্গের মধ্যে প্রথম হইল যম ও নিয়ম। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী যম। ইহাদের মধ্যে যে কোনও সময়ে যে কোনও উপায়ে যে কোনও প্রাণীর প্রতি দ্রোহ না করাই হইল **অহিংসা**। পরে যে আরও নয়টী যম নিয়মের কথা বলিব, অহিংসাই তাহাদের ভিত্তি। অহিংসায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যই তাহাদের অনুষ্ঠান প্রয়োজন। অহিংসার স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে অন্যান্য যম নিয়মের কথা বলা হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ যত রকম ব্রতই অনুষ্ঠান করুন না কেন, সমস্ত দ্বারা অহিংসার স্বরূপটীই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন মাত্র। প্রমাদবশতঃ তিনি যাহা কিছু অন্যায় আচরণ করেন, তাহার মূলে থাকে হিংসা। তাঁহার ব্রতাচরণের অন্যতম উদ্দেশ্য, এই হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া।" অর্থাৎ একমাত্র অহিংসা প্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের সমস্ত সাধনা ইহাই স্থির জানিতে হইবে।

বাক্য ও মনের যথার্থ ভাবই **সত্য**। অর্থাৎ যাহা যেমন দেখিয়াছি, কিম্বা যেমন অনুমান করিয়াছি সেইরূপ বলা বা চিন্তা করাই সত্যপ্রতিষ্ঠা। নিজের অনুভূতি অপরের মাঝে সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে যে বাক্য প্রয়োগ করা হইল, তাহাতে যদি প্রবঞ্চনা না থাকে, ভ্রম না থাকে, কিম্বা শ্রোতার কাছে তাহা অর্থশূন্য না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সত্য বাক্য বলিব। কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইবে, যাহাতে সকল প্রাণীর হিত হয় এই উদ্দেশ্যে; কাহারও অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যথাভূত বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহা সত্যপদবাচ্য হইবে না। যদি সত্য কথা বলার ফলে দেখা গেল, তাহাতে প্রাণীর অহিতই হইতেছে, তাহা হইলে তাহাকে সত্য বলিব না, তাহাকে বলিব পাপ। তোমার কাছে এরূপ সত্য কথা পুণ্য বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা পুণ্যের আভাস মাত্র—যাহার ফলে তোমার কেবলমাত্র বিষাদ ও অন্ধকারই লাভ হইবে। এই জন্য সব দিক দেখিয়া শুনিয়া যাহাতে সর্ব্বভূতের হিত হয়, এরূপ সত্য কথাই বলিবে।

অধর্ম্ম করিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করাই স্তেয়। **অস্তেয়** তাহার বিপরীত; কোনও কিছুতে স্পৃহা না থাকাই যথার্থ **অস্তেয়**।

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া উপস্থের সংযম করাই **ব্রহ্মচর্য্য**। তাৎপর্য্য এই, উপস্থ সংযম করিয়াও যদি কেহ কুভাবে স্ত্রী অঙ্গ দর্শন, স্পর্শন কিম্বা তাহাদের সহিত আলাপাদি করে, তবে তাহার আচরণকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হইবে না।

বিষয় অর্জ্জন করিতে গেলে কষ্ট, রক্ষা করিতেও কষ্ট, নষ্ট হইয়া গেলেও কষ্ট; আবার বিষয়ের প্রতি আসক্তি হইলে সংস্কার-বশতঃ কষ্ট পাইতে হইবে; তাহা ছাড়া বিষয় অর্জ্জনে হিংসা অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার দরুণ কষ্টভোগ আছে। এইরূপের বিষয়ের দোষ দেখিয়া বিষয়সংগ্রহে বিমুখতাই **অপরিগ্রহ**। অহিংসা হইতে অপরিগ্রহ পর্য্যন্ত এই পাঁচটী যম।

জাতি, দেশ, কাল বা আচারের কোনও-রূপ গণ্ডী না রাখিয়া সার্ব্বভৌমভাবে এই সমস্ত যম অনুষ্ঠান করিতে পারিলে মহাব্রত সাধিত হইয়া থাকে।

অহিংসায় জাতির গণ্ডী কিরূপ? যেমন জেলে কেবল মাত্র মাছেরই হিংসা করে, অন্যত্র সে অহিংসাচরণ করে। ইহাকে পূর্ণ অহিংসা বলা যাইতে পারে না—এখানে জাতির গণ্ডী সুস্পষ্ট। দেশের গণ্ডী যেমন—তীর্থে প্রাণিবধ করিব না। কালের গণ্ডী যেমন—চতুর্দ্দশীতে প্রাণিবধ করিব না, কিম্বা আজ পুণ্য দিন, আজ হিংসা করিব না। এই তিন প্রকার গণ্ডী না থাকিলেও অহিংসায় আচারের গণ্ডী থাকিতে পারে—যেমন, (দেশাচারানুযায়ী) দেবতা বা ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যেই প্রাণিবধ করিব, অন্য উদ্দেশ্যে নয়। কিম্বা ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে হিংসা করিতে পারে, কিন্তু অন্যত্র করিতে পারে না। এই প্রকার জাতি, স্থান, কাল বা আচারের গণ্ডী না রাখিয়া অহিংসা প্রভৃতি যমগুলি সকল অবস্থাতেই পালন করা উচিত। চিত্তের যে কোনও ভূমিতে, যে কোনও বিষয়ে, যে কোনও প্রকারে এই পাঁচটী যম সাধনায় যদি কোথায়ও ব্যভিচার না হয়, তাহা হইলে সেই সার্ব্বভৌম যমানুষ্ঠানকে মহাব্রত বলা যায়।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম। তন্মধ্যে মৃত্তিকা জল ইত্যাদি জনিত ও পবিত্র আহারাদি জনিত শৌচকে **বাহ্যশৌচ** বলা যায়। অভিমান, অহঙ্কার, ইত্যাদি চিত্তমল সমূহের ক্ষালন **আভ্যন্তরশৌচ**। যে উপকরণ আমার নিকটে রহিয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করিবার ইচ্ছা না থাকাই হইল **সন্তোষ**। দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই **তপস্যা**। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম, স্থিরাবস্থান ও আসন, কাষ্ঠমৌন ও আকারমৌন—এইগুলি দ্বন্দ্ব। (মুখে কিছু না বলিয়া ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করা আকারমৌন, আর ইঙ্গিতেও কিছু প্রকাশ না করা কাষ্ঠমৌন।) কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, সান্তপন ইত্যাদি ব্রতকেও তপস্যা বলে। মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন বা প্রণবজপকে **স্বাধ্যায়** বলে। পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করাকে **ঈশ্বরপ্রণিধান** বলে। শয্যায় কিম্বা আসনে থাকুন, অথবা পথেই চলিতে থাকুন, যিনি সর্ব্বদা আত্মস্থ, যাঁহার সংশয় ও বিপর্য্যয়রূপ বিতর্কজাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারবীজকে সর্ব্বদা ক্ষয় হইতে দেখিতেছেন, তিনিই ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত এবং অমৃত ভোগের অধিকারী—ঈশ্বর প্রণিধানের ইহাই লক্ষণ। সূত্রকারও বলিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রণিধানে প্রত্যক্ চেতনা অধিগত হয় এবং যোগের অন্তরায় দূর হইয়া যায়। এই সমস্ত যম ও নিয়মের বিরুদ্ধ ভাবকে বিতর্ক বলে।

চিত্ত বিতর্কদ্বারা আক্রান্ত হইলে বিপরীত ভাবনদ্বারা তাহাকে দূর করিবে। ব্রাহ্মণের চিত্তে যদি হিংসা প্রভৃতি বিতর্ক উপস্থিত হয় অর্থাৎ তিনি যদি চিন্তা করেন, "যে আমার অপকার করিয়াছে, তাহার অনিষ্ট করিব, মিথ্যা কথা

বলিব, ইহার জিনিষটা আমি লইব, কিম্বা অমুকের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিব, অমুকের বিষয়ের আমিই কর্ত্তা হইব," তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহার চিত্ত উন্মার্গগামী হইতেছে, জরতপ্তের মত বিতর্কের তাপে তিনি তপ্ত। তাঁহার তখন প্রতিপক্ষ ভাবনা অর্থাৎ বিতর্কের বিপরীত চিন্তাস্রোত প্রবর্ত্তিত করা উচিত। তখন তিনি চিন্তা করিবেন, "এই সংসারবহ্নিতে জলিয়া পুড়িয়া অবশেষে আমি যোগধর্ম্মের শরণ লইয়াছি এবং সেই দিন অবধি আমা হইতে কাহারও কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। এইরূপে একবার বিতর্ক ত্যাগ করিয়া আবার তাহাকে গ্রহণ করায় আমি বান্তভোজী কুক্কুরের ন্যায় আচরণ করিতেছি। কুকুর যেমন বমি করিয়া আবার তাহাই ভোজন করে, তেমনি পরিত্যক্ত বিষয় আবার গ্রহণ করিয়া আমিও কুক্কুর তুল্য ব্যবহার করিতেছি।"

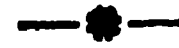
হিংসা-প্রভৃতি বিতর্কসমূহ স্বয়ংকৃত, অপরের দ্বারা কারিত অথবা অনুমোদিত হইতে পারে; ক্রোধ, লোভ বা মোহ তাহাদিগের নিদান হইতে পারে; তাহাদিগের বেগ মৃদু, মধ্যম কিম্বা তীব্র হইতে পারে; যেরূপই হউক না কেন, তাহারা অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞানের কারণ।—এইরূপ চিন্তাধারাকে চিত্তে দৃঢ় করাই প্রতিপক্ষ ভাবনা।

যেমন ধর, হিংসা একটা বিতর্ক। স্বয়ং হিংসা করিলে উহা কৃত; নিজে হাতে-কলমে না করিয়া অপরকে দিয়া করাইলে উহা কারিত; কেহ হিংসা করিলে যদি তাহার সমর্থন করি, তবে তাহাতে আমারও অনুমোদিত হিংসা করা হয়। লোভ, ক্রোধ ও মোহকে নিদান ধরিলে ইহাদের এক একটীকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন মাংসের বা চর্ম্মের লোভে হিংসা করিলে; কিম্বা অমুকে আমার অপকার করিয়াছে, এই বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া হিংসা করিলে; কিম্বা এইরূপ করিলে আমার ধর্ম্ম হইবে, এই প্রকার ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া হিংসা করিলে। আবার লোভ ক্রোধ ও মোহের মৃদু, মধ্যম ও তীব্র বেগ অনুযায়ী তিন প্রকার ভেদ হইতে পারে। তাহা হইলে মোটের উপর হিংসার সাতাইশটী ভেদ হয়। আবার মৃদু, মধ্য ও তীব্রেরও মৃদু মৃদু, মধ্য-মৃদু, তীব্র মৃদু—এইরূপে প্রত্যেকের তিনটী করিয়া ভেদ হইতে পারে। তাহাতে মৃদু-মধ্য, মধ্য-মধ্য, তীব্র মধ্য; আবার মৃদু তীব্র, মধ্য-তীব্র, তীব্র-তীব্র—এই কয়েকটী ভেদ পাওয়া যায়। সর্ব্বসমষ্টিতে তাহা হইলে হিংসার একাশীটী ভেদ হয়। ইহার পরও সূক্ষ্মবিচার দ্বারা হিংসার আরও অসংখ্যভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে। মিথ্যা, স্তেয় ইত্যাদির বেলাতেও এইরূপ জানিবে।

"অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞান এই বিতর্ক সমূহের ফল"—এইরূপ ভাবনাই প্রতিপক্ষ-ভাবনা। হিংসা সম্বন্ধেই বিচার করিয়া দেখ, হিংসক প্রথমতঃ বধ্য প্রাণীর বীর্য্য অর্থাৎ শারীরপ্রচেষ্টা নষ্ট করিয়া দেয়; তার পর অস্ত্রাঘাতে তাহাকে ব্যথা দেয়; তার পর তাহাকে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করে। ইহার ফলও হিংসককে ফলিয়া থাকে। বধ্যের বীর্য্য বিনষ্ট করার দরুণ হিংসকের চেতন ও অচেতন সর্ব্বপ্রকার উপকরণই ক্ষীণবীর্য্য হয়। (স্ত্রীপুত্র চেতন উপকরণ; শরীর ধন ইত্যাদি অচেতন উপকরণ।) বধ্যপ্রাণীকে দুঃখ

দের বলিয়া নরক, তির্য্যক বা প্রেতযোনিতে হিংসককে দুঃখ পাইতে হয়। আর বধ্যের প্রাণ হরণ করে বলিয়া প্রাণসংশয়কর অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া প্রতিক্ষণ মরণের পথ চাহিয়াও কোনও রকমে তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, কেননা, কর্ম্মের ফল যেরূপে পরিপক্ক হইয়া অনুভবগোচর হইবে, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা আছে। হিংসার ফলে যে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তাহার ভোগ সমাপ্ত না হইলে তো প্রাণ বাহির হইবে না। যদি হিংসার সহিত পুণ্যের কোনও যোগ থাকে, তাহা হইলে কিছু সুখভোগ হয় বটে কিন্তু হিংসককে তথাপি অল্পায়ুঃ হইতে হয়। অতএব বিতর্কের এইরূপ ফল, ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া চিত্তকে প্রণিহিত করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

অপ্রমাদ



“অনিচ্চা বত সংখারা—অপ্পমাদেন বিহরথা ভিক্খবে—হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারসমূহ অনিত্য, তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ কর”—এই ছিল বুদ্ধদেবের শেষ উপদেশ। এর পরেই বুদ্ধজ্যোতিঃ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন। কাজেই বল্‌তে পারি, বুদ্ধদেবের আজীবন জ্ঞানপ্রচারের সার নিষ্কর্ষ এই অপ্রমাদের উপদেশটী। এটী বিশ্লেষণ করে বুঝবার প্রয়োজন সকলেরই আছে।

বেতালে কখনো পা না পড়ে, সাধকজীবনের এই হল একান্ত লক্ষ্য। এর জন্য নিষ্ঠা প্রয়োজন। অন্তর না জাগ্‌লে নিষ্ঠায় সফলতা লাভ করা সহজ হয় না। কত সংস্কার আমাদের মাঝে পুঞ্জীকৃত রয়েছে। যখন যেমন নিমিত্ত উপস্থিত হচ্ছে, তখন তাকেই আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য তারা সর্ব্বদা যেন ঠেলাঠেলি করছে! ভিতরে এই সংস্কারের হট্টগোল সর্ব্বদা চল্‌ছে বলেই কোনও কিছুতে আমরা একমুখী নিষ্ঠা নিয়ে থাক্‌তে পারছি না। সংস্কারের এই ঠেলাঠেলি স্বাভাবিক—একেই বলি প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া। একমাত্র তত্ত্ব জান্‌লে গুণের এই বিক্ষোভকে রোধ করা যায়, নতুবা চঞ্চলতা দূর করবার আর কোনও উপায় নাই। সংস্কারসম্বন্ধে তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, ওরা অনিত্য, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে আমার কাছে নিত্যসত্তার মুখোস পরে হাজির হচ্ছে। যখনই যে সংস্কার আমার মাঝে চাড় দিয়ে উঠ্‌ছে, তখনই তাকে ধ্রুবসত্য স্বীকার করে তার হুকুমে চল্‌তে যাচ্ছি, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাকে পর্য্যুদস্ত করে আর একটা নূতন সংস্কারের উদয় হচ্ছে। তখন আবার মনে হচ্ছে, এটাই বুঝি নিত্য। এমনি করে আমাদের প্রজ্ঞা মলিন হয়ে সংসারে কত কষ্ট পাচ্ছি!

যদি জগৎটাকে শুধু প্রাকৃত সংস্কারের সমষ্টিরূপে ধরি, তাহলেও দেখি, এখানেও আমাদের প্রতিনিয়ত অনিত্যে নিত্যভ্রম হচ্ছে। এই ভ্রমই প্রমাদ। এর স্বরূপই

আমাদের বুদ্ধি স্থির থাকছে না। সংস্কারকে তাই অনিত্য বলে জেনে তার প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে নির্ব্বাণের দিকে অবিচল লক্ষ্য রেখে চলতে হবে—বুদ্ধবাণীর এই হল তাৎপর্য্য।

"পমাদো মচ্চুনোপদম্—প্রমাদ মৃত্যুর পথ"—এ কথাও তিনি বারবার বলেছেন। জীবনে মৃত্যুর পথেই আমরা পুনঃ পুনঃ পা দিচ্ছি। কিন্তু বুদ্ধানুশাসন তখন স্মরণ থাকে না কেন? জীবনটাকে কতরকমেই নিঃশেষ করে দেওয়া যায়। কেউ পশুর মত, কেউ মানুষের মত, কেউ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে, কেউ বা জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন পাত করছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এরা কেউ এমন একটা কিছু ধরে নাই, যা নাকি সার্ব্বভৌম বলা যেতে পারে। সমস্তই এক একটা পথ মাত্র; এটা ভাল, ওটা মন্দ, এমন ভাবা মনের ভুল। যার যেমন রুচি, যেমন আশা, যেমন সঙ্গতি, সে তেমনি পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিহিসাবে সব পথই তো তুল্যমূল্য। তাই যদি হয়, তাহলে নিষ্ঠাসহকারে একটা পথ আঁকড়ে থাকবার একটু সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়; তাহলেই আর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা বা বিরোধের ভাব থাকে না। এই নিষ্ঠাটুকুই হল শ্রেয়োলাভের উপায়। গীতাকার তাই বলেছিলেন, সবাই স্বধর্ম্ম পালন কর, পরধর্ম্ম আশ্রয় করলে সব যাবে। বরং স্বধর্ম্মে মরণ ভাল, তবু পরধর্ম্ম আশ্রয় করো না—ওতে ভয়ের কারণ আছে। গীতাকার আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—স্বধর্ম্মের দোহাই দিয়ে প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে যে তোমাকে প্রলুব্ধ করছি, তাও মনে করো না। স্বধর্ম্ম হলেই যে সেটা ভাল ধর্ম্ম হবে, এমন কথা তো নয়। হয়ত আদর্শের দিক থেকে বিচার করতে গেলে পরধর্ম্ম সুন্দর ও স্বনুষ্ঠিত হতে পারে, তোমার স্বধর্ম বিগুণ হতে পারে, তবুও স্বধর্ম্ম ছেড়ো না।

এর মাঝে দুটী কথা আছে। প্রথমতঃ স্বধর্ম্ম নিরূপিত হয় সংস্কার অনুযায়ী। বহু সংস্কারের দ্বন্দ্বের মাঝে যেটা প্রবল হবে, যেটা তোমার মজ্জাগত হবে, তারই ক্রিয়া হতে দিতে হবে। নিষ্ঠা ও অপ্রমাদের প্রয়োজন এই খানেই। সব সংস্কার একেবারে তুমি উড়িয়ে দিতে পার না; দিতে গেলে ফল কখনও ভাল হবে না। তাই অনিত্য সংস্কার সমূহের মাঝেও স্বভাবানুকূল সংস্কারটাকেই পাকা করতে হবে। আর এক কথা এই—স্বধর্ম্ম পালনে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সবারই আছে—এই কথার উপর নির্ভর করেই গীতাকার স্বধর্ম্মাচরণে কর্ম্মক্ষয়ের পথ বলে দিলেন। যেটা যার স্বভাব, তার অনুসরণে সে আরাম পায়। তাই স্বধর্ম্মের পথে চলা আরামের পথ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা বলে এর মাঝে যে শাসন নাই, এমন নয়। মোহের ছলনায়, সংস্কারের দ্বন্দ্বে এমন সুখাবহ স্বধর্ম্মও মানুষ ভুলে যায়। তখন নিষ্ঠার অঙ্কুশ তাড়নে তাকে পথে ফিরিয়ে আনতে হয়। এইটাই হল বুদ্ধকথিত অপ্রমাদ।

যা করবে, তা বোধের সঙ্গে করবে। এক পথ ধরে চলবে, বানচাল হবে না। সাময়িক বিরক্তির দরুণ মনে হতে পারে, দূর হোক ছাই, আমি যে পথ ধরেছি, তার চাইতে অমুকের পথটাই তো আরামের। কিন্তু তখন মনে করতে হয়, পথের মূল্য সর্ব্বত্রই সমান—পথটাই লক্ষ্য নয়। যে পথ ধরেছ, তারই চরমে যাবার চেষ্টা কর। অপ্রমত্ত হও। একটা শেষ করে আর একটা ধর, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আজ এটা, কাল ওটা এমনি করে ভবঘুরে হয়ে বেড়ালে কোনও দিন আর পথের অন্ত মিলবে না। অনিত্য সংস্কারকে উচ্ছেদ করতে হবে, কিন্তু তার পথই হচ্ছে স্বভাবে স্বধর্ম্মে অপ্রমত্ত থেকে কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মক্ষয় করা।

মুক্তাবাই

—:{*}:—

মুক্তাবাই দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মগুরু আচার্য্য জ্ঞানেশ্বরের কনিষ্ঠা ভগিনী। আচার্য্য জ্ঞানেশ্বরের জীবনকাহিনী ইতিপূর্ব্বে "আর্য্যদর্পণ" পত্রিকা-স্তম্ভে আলোচিত হইয়াছে। "জ্ঞানেশ্বরী" নামক তাঁহার রচিত গীতাভাষ্য মহারাষ্ট্রভাষার রত্নস্বরূপ। হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বরের পিতার নাম বিট্‌ঠলপন্থ, মাতার নাম রুক্মিণী দেবী। বিট্‌ঠলপন্থের তিন পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র নিবৃত্তিনাথ, দ্বিতীয় জ্ঞানেশ্বর, তৃতীয় সোপানদেব। সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার নাম মুক্তাবাই।

অদৃষ্টের বিপর্য্যয়ে চারিটী ভাইবোনের জীবন সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া এক প্রকার নিঃসঙ্গভাবেই কাটিয়াছিল। মুক্তাবাইর পিতা বাল্যকাল হইতেই সংসারে বীতস্পৃহ ছিলেন। পিতামাতার উপরোধে বিবাহ করিবার পরও সংসারে তাঁহার মন বসে নাই। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া স্বামী রামানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন। বিট্‌ঠলপন্থ বিবাহ করেন নাই, সংসারেও তাঁহার কেহ নাই—এই বিশ্বাসে রামানন্দ তাঁহাকে সন্ন্যাস দিয়া স্বীয় মঠের কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন। কিছু দিন পরে রামানন্দ স্বামী শিষ্যবর্গের সহিত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বিট্‌ঠলপন্থের শ্বশুরালয় আলন্দীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে ঘটনাক্রমে রুক্মাবাইর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রুক্মাবাই যে বিট্‌ঠলপন্থের পরিত্যক্তা স্ত্রী ইহা জানিয়া রামানন্দ স্বামী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পুনরায় কাশী ফিরিয়া আসেন এবং আত্মগোপন করার অপরাধে বিট্‌ঠলপন্থকে মঠের কর্ত্তৃত্বভার ছাড়াইয়া পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন।

গুরুর আদেশে বিট্‌ঠলপন্থ আবার আলন্দীতে ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্তা পত্নীকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইল। সন্ন্যাস ছাড়িয়া পুনরায় সংসারী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সমাজচ্যুত হইলেন, অথচ গুরুর আদেশে তাঁহার সংসার ফেলিয়া যাওয়ারও উপায় রহিল না। এইরূপ অবস্থাসঙ্কটের মাঝে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ও নিতান্ত দুঃখদারিদ্র্যাপন্ন অবস্থায় ক্রমে তাঁহার তিনটী পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

ঘরে অন্ন নাই, পিতা পূর্ব্বাপর সংসারে নিঃস্পৃহ ও আপনভাবে বিভোর; সমাজ পরিত্যক্তের সন্তান বলিয়া পাড়াপ্রতিবেশী সহায়-সম্বলও কেহ নাই, এমন কি স্পর্শদোষের ভয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত ইহাদের সহিত খেলাধূলা করিতে আসে না—এইরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরম স্নেহে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া চারিটী ভাইবোন মানুষ হইতে লাগিল। ইহারা কিরূপ সংসারে লালিত পালিত হইতেছিল, তাহা মহারাষ্ট্র কবি মহীপতি ও নিরঞ্জনমাধবের নিম্নলিখিত উক্তি হইতেই বোঝা যাইবে। মহীপতি লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্ম-

ণেরা ও বন্ধু বান্ধবেরা বিট্ঠলপন্থকে পরিত্যাগ করিল। তিনি অরণ্যের মাঝে একটী পর্ণ-কুটীর বাঁধিয়া স্ত্রীকে লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। পরিবার পোষণের জন্ত তিনি ভিক্ষা মাগিয়া আনিতেন এবং দিনরাত ইষ্টচিন্তায় কাটাইয়া দিতেন। সর্ব্বদা গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থের শ্রবণ মনন করিতেন এবং সর্ব্বক্ষণ আপনার চিত্তকে প্রসন্ন রাখিতেন।" নিরঞ্জনমাধব লিখিয়াছেন, "বিট্ঠলপন্থ চৈতন্যা-শ্রম ছাড়িয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করি-লেন। চারিদিকে নিন্দা রটিয়া গেল, কেহ তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিত না। যে ভিক্ষা মিলিত, ধীরে ধীরে তাহাও বন্ধ হইয়া আসিল। কখনও কখনও দিনে একবার মাত্র অন্ন জুটিত। কখনও গাছের পাতা খাইয়া, কখনও বা বায়ুভক্ষণ করিয়া দিন কাটাইতে হইত। এইরূপে বার বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু তথাপি বিট্ঠলপন্থ আপন লক্ষ্যে অটল রহিলেন।"

এইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শিশুর চরিত্র যে ধৈর্য্য, বৈরাগ্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার আলোকসম্পাতে উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ধৈর্য্য ও কল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি মাতা ছাড়া মুক্তার বাল্যকালের সঙ্গিনী কেহ ছিল না। মুক্তা কখনও সংসারে প্রবেশ করিবে এরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পিতা কোনও দিনই পোষণ করিতেন না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগবৈরাগ্য ও জ্ঞানচর্চ্চাকে আদর্শ করিয়া বিট্ঠলপন্থ যেরূপ পুত্রসন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, কন্যার বেলা-তেও তাহার ব্যতিক্রম করিলেন না। পিতার শিক্ষায় এবং ভ্রাতাদের আদর্শে ব্রহ্মচারিণী মুক্তাও বিদুষী ব্রহ্মবাদিনী হইয়া উঠিলেন। এদিকে জননীর নৈপুণ্যে গৃহ-কার্য্যেও তাঁহার অবিশেষ দক্ষতা জন্মিল।

পুত্রদিগের উপনয়নের সময় উপস্থিত হইলে বিট্ঠলপন্থ একবার সমাজপতিদিগের নিকট তাহার দরুণ অনুমতি প্রার্থনা করি-লেন। সমাজপতিরা সে কথায় কান তো দিলেনই না, অধিকন্তু বিট্ঠলপন্থের পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রাণবিসর্জ্জনের পাঁতি দিয়া দিলেন। পুত্রদের কল্যাণকামনায় বিট্ঠল-পন্থ এবং রুক্মিণীদেবী মাথা পাতিয়া এই বিধি মানিয়া লইলেন। একদিন নিশীথে কিশোর-বয়স্ক পুত্রকন্যাদিগকে ভগবানের হাতে সঁপিয়া দিয়া এই দম্পতী গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রয়াগের পুণ্যতীর্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সমাজের শাসন হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

পিতামাতার গৃহত্যাগের পর চারিটী ভাই-বোনের সংসারে মুক্তাই গৃহিণী হইয়া কল্যাণী জননীর স্থান অধিকার করিলেন। সমাজ যেমন বাঁকিয়া ছিল, তেমনি বাঁকিয়াই রহিল, কিন্তু ইহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ অপর সকলের গুরু ছিলেন। ভ্রাতাদের সেবা করিয়া এবং অবসর সময়ে তাঁহাদের সহিত অধ্যাত্মচর্চ্চা করিয়া ব্রহ্মচারিণী মুক্তার আনন্দে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, নারীসুলভ সংসারচিন্তা ক্ষণেক কালের জন্যও তাঁহার চিত্তে স্থান পাইল না।

মুক্তাবাই অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। ভ্রাতা জ্ঞানেশ্বরের ন্যায় তাঁহারও অসামান্য কবিপ্রতিভা ছিল। জ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রভাষায় মুক্তাবাই বহু অভঙ্গপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাইয়েরা যখন ধর্ম্ম-প্রচারার্থে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন,

মুক্তাবাইও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া প্রচারে সহায়তা করিতেন। জ্ঞানেশ্বর ও নিবৃত্তিনাথের জীবন কথা ও প্রচার কাহিনীর অধিকাংশ উপকরণ আমরা মুক্তাবাইর রচনা হইতেই জানিতে পারি। মুক্তাবাইর জ্ঞান-বৈরাগ্য সমুজ্জ্বল অভঙ্গ রচনা ছাড়া তাঁহার জীবনের আর কোনও বিশেষ কথা জানিতে পারা যায় না। নিম্নে তাঁহার জীবনের দুইটী ঘটনা মাত্র আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আর কিছু জানিতে পারি নাই। কাহিনী দুইটীর মাঝে প্রথমটী জ্ঞানেশ্বরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় মাত্র, সুতরাং তাহাকে আমরা তত মূল্যবান মনে করি না। দ্বিতীয় কাহিনীটীই সুন্দর এবং মুক্তার নির্ম্মল অবদানের পরিচায়ক।

প্রথম কাহিনীটী এই। একদিন নিবৃত্তিনাথের "মাঁড়" (একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য) খাইবার ইচ্ছা হয়। এই খাদ্যটী প্রস্তুত করিতে হইলে সরার উপর আগুনে সেঁকিয়া নিতে হয়। ঘরে সরা ছিল না; মুক্তাবাই কুমারবাড়ীতে সরা আনিতে চলিলেন। পথে বিষোবা নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত দেখা। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছুঁড়ী, কোথায় যাচ্ছিস্?" মুক্তাবাই তাঁহার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলেন। হিংসুক ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কুমারবাড়ীতে যাইয়া তাহাদিগকে বলিল, "খবরদার, এই মেয়েটাকে তোরা কিছুই দিবি না। যদি দিস্, তো মজা দেখ্‌তে পাবি।" মুক্তাবাই যেখানে যান, ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সকলকে বারণ করিয়া দেয়। ফলে মুক্তা কোথায়ও সরা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। দাদাকে খাইতে দিতে পারিলেন না ভাবিয়া তাঁহার মনে ভারী কষ্ট হইল। কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখে ক্ষোভে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানেশ্বর তাঁহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "তার জন্য কি? বাসনপত্রের কোনও প্রয়োজন নাই। তুই আমার পিঠের উপর মাঁড় সেঁকিয়া নে।" এই বলিয়া তিনি যোগবলে অগ্নি আবাহন করিয়া পৃষ্ঠদেশকে কাঁচাসোণার মত তপ্ত করিয়া তুলিলেন। মুক্তাবাই জ্ঞানেশ্বরের পিঠে মাঁড় সেঁকিয়া দাদাকে খাইতে দিলেন। বিষোবা ব্রাহ্মণ আড়াল হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া নিজের কুব্যবহারের দরুণ ইহাঁদের কাছে ক্ষমা চাহিল।

কালক্রমে নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের বহু ভক্ত জুটিয়া গেল। একদিন মুক্তাবাই 'সহজ স্থিতি' অর্থাৎ নগ্ন হইয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ চাঙ্গদেব নামে এক ভক্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঙ্গদেব মুক্তাকে তদবস্থায় দেখিয়া অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, মুক্তা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেতেছেন—"এটা দেখছি গুরুদ্রোহী!" চাঙ্গদেব কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং মুক্তার স্নান শেষ হইলে তাঁহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার এমন কি অপরাধ তুমি দেখিলে যে তখন আমাকে গুরুদ্রোহী বলিলে?" মুক্তাবাই তীক্ষ্ণ ও অচঞ্চল দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "রাস্তায় চলিতে চলিতে যদি কেহ একটা মাটীর দেয়াল দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার চিত্তে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় কি? গুরুকৃপায় তুমিও তাঁহার কাছে উপদেশ পাইয়াছ যে, নারীদেহকে মাটীর দেয়াল বলিয়া মনে করিও। গুরু যদি তোমার হৃদয়ে থাকিতেন, তবে তোমার

চিত্তে বিকার জন্মিত না। একটা গাই যেমন বনে বসনহীন হইয়া বিচরণ করে, লোকালয়ে আসিয়াও তেমনি নগ্নদশাতেই বিচরণ করে। আমাকেও সেই দৃষ্টিতেই দেখা উচিত ছিল না কি? কিন্তু গুরূপদেশ পাইয়াও যখন তোমার চিত্তে বিপরীত ভাবনার উদয় হইতেছে, তখন তোমাকে গুরুদ্রোহী বলিব না ত কি?"

মুক্তার এই তেজস্বী উক্তি শুনিয়া চাঙ্গদেব ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি যোগসাধনা করিতেন, জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, পৌরুষের অভিমান তাঁহার মাঝে যথেষ্টই ছিল। কিন্তু মুক্তার কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, মুক্তা জ্ঞানের কোন্ উচ্চভূমিতে বিচরণ করিতেছেন, আর তিনি কত নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছেন। মুক্তা তখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকামাত্র, আর তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি এই তেজস্বিনী ব্রহ্মবিদুষীর নিকট তাঁহার নিজকে শিশুর মত অসহায় মনে হইতে লাগিল! তিনি নতজানু হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, তোমাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তুমি মহাশক্তিস্বরূপিণী, তোমায় সামান্য দৃষ্টিতে দেখিয়া আমি তোমার অপমানই করিয়াছি। সন্তান বলিয়া যদি করুণা করিলে, তবে আর আমাকে ছাড়িয়া যাইও না মা!" মুক্তা সুগভীর স্নেহে চাঙ্গদেবের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "মা কি সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, চাঙ্গদেব? কিন্তু তবুও তুমি দাদার কাছে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি আমাদের সকলেরই গুরু।" চাঙ্গদেব তখনই নিবৃত্তিনাথের কাছে গিয়া সকল কথা নিবেদন করিয়া মুক্তাবাইর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার অনুমতি চাহিলেন। নিবৃত্তিনাথের অনুমতি অনুসারে মুক্তা চাঙ্গদেবকে মহাবাক্য শুনাইয়া অদ্বৈততত্ত্বের উপদেশ দ্বারা জ্ঞানের প্রান্তভূমিতে আরূঢ় করিয়া দিলেন। যে বটবৃক্ষের মূলে মুক্তা চাঙ্গদেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আজও "বিশ্রান্তি বট" নামে প্রসিদ্ধ আছে। মুক্তাবাইর উপদেশে উদ্বুদ্ধ চাঙ্গদেব উত্তরকালে দাক্ষিণাত্যের এক জন শক্তিশালী আচার্য্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১২০১ শকাব্দে মুক্তাবাইর জন্ম হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মোটে ষোল বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যেই এই ব্রহ্মবাদিনী কুমারী নারীজগতে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা মিলে না। মহারাষ্ট্রবাসীরা আজও মুক্তাকে ভুলিতে পারে নাই। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, মুক্তা এখনও মহাসমাধি লাভ করে নাই, তাঁহার কল্যাণদৃষ্টি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এখনও ভারতসন্তানের উপর অমৃত বর্ষণ করিতেছে। পন্ধরপুর তাঁহার পিত্রালয় ছিল, কেহ কেহ মনে করেন, তিনি এখনও সেখানেই আছেন। খান্দেশের এদলাবাদ গ্রামে কেহ কেহ তাঁহার সমাধি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।



ভক্তি ও নিরোধ

—*—

জীবের প্রাণে নিত্য হাহাকার, তার চারিদিকেই অভাবের তাড়না। অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ যদিও তাহার হৃদয়েই লুকাইয়া রহিয়াছে, তথাপি সে তাহার সন্ধান জানে না, অন্তরের ধন সে বাহিরেই খুঁজিয়া বেড়ায়। নিজের চেষ্টায় তাহার সকল অভাব মিটে না বলিয়াই তাহাকে অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, অপরের কাছে হাত পাতিতে হয়। প্রাকৃত জগতে এই প্রকার কামনামূলক পরবশ্যতা জীবের একেবারে মজ্জাগত। লৌকিকভাবে আমরা কতজনার নিকট কত কিছুই না কামনা করিয়া থাকি; যদি স্বজাতীয়ের নিকট কামনা পূরণ না হয়, তাহা হইলে সংস্কারানুযায়ী বিজাতীয় ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার দরবারে কামনার আরজী পেশ করিতে কসুর করি না। চাহিতে গেলেই মাথা নীচু করিতে হয়, দাতার তুষ্টিসাধনের প্রতি নজর যায়। এই দৈন্য ও প্রসাদন স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হইলেও অনেক সময় বিকৃতবুদ্ধির নিকট ভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ভক্তির সহিত যে স্বার্থসম্বন্ধ নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে কামনামূলক দৈন্য ও প্রসাদন ভক্তির বাহ্য লক্ষণাক্রান্ত হইলেও প্রকৃত ভক্তি হইতে দূরে।

ভক্তি, ভাব ও প্রেম মূলতঃ একই বস্তু—গাঢ়তার তারতম্যানুযায়ী সাধনশাস্ত্রে ইহাদের ভেদ কল্পনা করা হয়। ঋষিপ্রণীত ভক্তিশাস্ত্রে তিনটীকেই ভক্তি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; বর্ত্তমান প্রবন্ধেও আমরা ভক্তি-শব্দটী সেই ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিব।

কামনা যদি অ-ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ভক্তি ও ভাব যদি একপর্য্যায়ের বস্তু হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃই তো দেখিতে পাই, কামনা ও ভক্তি আলোক ও আঁধারের মত বিরুদ্ধধর্ম্মী। কামনার মূল কথা অভাব, অপূর্ণতা। ভাবের তাৎপর্য্য স্ব-ভাব, পূর্ণতা। যদি অভাব থাকে, তাহা হইলে যাহার অভাব নাই, তাহার কাছে অভাবপূরণের আশায় আমরা হাত পাতি। ভক্তিতেও দেখি, যে পরমবস্তুকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করি, তাঁহার প্রতি চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতাতেই তাহার সার্থকতা। তাহা হইলে উভয়ের মাঝে ভেদ হয় কোথায়? ভেদ এই ক্ষেত্রে যে, অপূর্ণের পূর্ণের প্রতি স্বভাবসঙ্গত প্রবণতাই কামনা; আর পূর্ণের পূর্ণবস্তুর প্রতি স্বভাবসঙ্গত প্রবণতাই ভক্তি। কামনায় জীবস্বভাবের অপূর্ণতাই কেবল ফুটিয়া উঠে; আর ভক্তিতে ফোটে জীবস্বভাবের পূর্ণতা। সুতরাং বাহ্যতঃ প্রবণতা, দৈন্য, প্রসাদন ইত্যাদি লক্ষণ উভয়ত্র একরূপ হইলেও মূলে উভয়ের মাঝে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

জীবে ও শিবে স্বরূপতঃ ভেদ নাই, তাহা মানি। তথাপি জীবের পূর্ণতা আর পরমবস্তুর পূর্ণতাতে একটু ভেদের আভাস কল্পনা করিতে হয়, নতুবা আনন্দের আস্বাদ হইতে পারে না। ভক্তি সম্বন্ধতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সামরস্য না থাকিলে সম্বন্ধ মধুর হয় না। এই জন্য স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার করিয়াও জীবে ও শিবে ভেদের আভাস রাখিয়া দিতে হয়—

আস্বাদনের জন্য। জীব ভক্তিতে পূর্ণতালাভ করে অপূর্ণজীবের ভক্তি কামনার ছদ্ম আবরণ মাত্র। যুগপৎ দুইটী পূর্ণ সত্তা স্বীকার করিতেছি, ইহা একটী রহস্য বটে। শ্রুতিও এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—পূর্ণমদঃ, পূর্ণমিদম্। এইখানে যে আছে সে-ও পূর্ণ, আর ওখানেও যে আছে, সে-ও পূর্ণ। পূর্ণস্বরূপের প্রতি পূর্ণের অভিসারই ভক্তি বা ভাব বা প্রেম।

জীবের পূর্ণতা কেমন?—যেমন ফলের পূর্ণতা। কলি ফুল হইয়া ফুটিল—দেখিতে বড় সুন্দর; কিন্তু ওই বর্ণরাগ তো অনুরাগ নয়, ও যে বাসনার রক্তরাগ। গন্ধ ছুটাইয়া, রঙ ফুটাইয়া, পাপড়ি মেলিয়া সে কেবল আপনার অপূর্ণ বাসনার তৃপ্তিই খুঁজিতেছে—বৈজ্ঞানিক এ কথা ভাল করিয়াই জানেন কিন্তু সেই ফুল ঝরিয়া যখন ফল ধরিল, তখন সে পরিপূর্ণ। ফুলে সমগ্র গাছটা নাই, কিন্তু ফলের মাঝে কত গাছ, কত ফুল, কত ফলের সম্ভাব্যতা নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অথচ ফলটী ক্ষুদ্র, গাছেরই একটী অংশ মাত্র। কিন্তু অংশ হইয়াও ফুলের মৃত্যুতে, বাসনার নিরোধে সে পরিপক্ক হইয়াছে, পূর্ণ হইয়াছে। জীবও ঠিক এইভাবে পূর্ণের অংশস্বরূপ হইয়াও অনন্ত সম্ভাব্যতায় অসীম, পূর্ণ।

ভক্তিশাস্ত্রের ঋষি বলিতেছেন—**সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ**—ভক্তি কামনা নয়, কেননা তাহা নিরোধস্বরূপ। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে জ্ঞান ভক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। জলের নীচে রত্ন রহিয়াছে; যদি জলে ঢেউ খেলিতে থাকে, তাহা হইলে রত্ন দেখা যায় না; জল স্থির হইলে তাহার দীপ্তি আপনি ভাসিয়া উঠে। বাসনা চিত্তের চঞ্চল অবস্থা; উহা দূর না হইলে ভক্তি বা জ্ঞান কিছুরই বিকাশ হইবে না।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, চিত্তের পাঁচটী অবস্থা আছে—ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। সাধারণ মানুষের কামনাযুক্ত চঞ্চল চিত্তভূমিকে ক্ষিপ্ত বলা হয়। কোনও একটা কামনার পরিপূরণে সুখের উদয় হইলে যে ক্ষণিকতৃপ্তিপূর্ণ সত্ত্বযুক্ত ভাব জাগে, তাহাই বিক্ষিপ্ত অবস্থা এবং সুপ্তসংস্কারযুক্ত ও আপাত নিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান তমোময় অবস্থা চিত্তের মূঢ় ভূমি। যতক্ষণ জীবের সংসারদশা, ততক্ষণ তাহার মাঝে এই তিনটী অবস্থারই উদয় বিলয় হয়। সংসারবিমুখ হইলে তবে চিত্তের বহুমুখী গতি রুদ্ধ হইয়া একাগ্র অবস্থা উৎপন্ন হয়। একাগ্রতাই ভক্তির বীজ। অনুরাগ শুধু একজনকেই চায়, বহুর সঙ্গ বর্জ্জন করে। এই জন্য ভক্তিসাধনায় ইষ্টনিষ্ঠার এত মাহাত্ম্য।

পূর্ণ একাগ্রতা সাধিত হইলে চিত্তের বৃত্তিসমূহ আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি উপস্থিত হয়। সমাধি ভিন্ন জ্ঞান বা ভক্তির স্বরূপ বোঝা যাইতে পারে না। ভক্ত ভগবানের মিলনই সমাধি; প্রেমের সমাধিতে শুধু সে আর আমি—বিদ্যুতে বিদ্যুতে জড়াজড়ির ন্যায় দুইটী হৃদয়ের একান্ত মেশামিশি। সেখানে জগৎ আছে কি নাই, কে তাহার খবর রাখে? সংসারদশা জীবের বিরহের অবস্থা; তাই সেখানে আকুলতা, অপূর্ণতা, বৃত্তিভেদ। সমাধি সংসারভূমির অতীত পরিপূর্ণ মিলনের অবস্থা। সেখানে পরম লাভ, পরম সিদ্ধি, পরম তৃপ্তি। সুতরাং বৃত্তিবিকল্পের অবসর কোথায়?

নিরোধ ভক্তির স্বরূপলক্ষণ; সন্ন্যাস তাহার তটস্থ লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

স্বানুভূতি ছাড়া স্বরূপ বুঝিবার আর কোনও উপায় নাই; কিন্তু তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বাহির ধরিয়া ভিতরের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সততবহির্ম্মুখী জীবের পক্ষে এই জন্য সাধনরাজ্যে তটস্থ লক্ষণের একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। বাহিরের লক্ষণ ধরিয়া সাধনা করিতে করিতে অন্তরে স্বরূপ জাগিয়া উঠিতে পারে। ঋষি তাই নিরোধকে ভক্তির স্বরূপলক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তটস্থ লক্ষণরূপে বলিলেন, "নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ"—লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যসমূহের সম্পূর্ণ ত্যাগই নিরোধ।

এক্ষণে কর্ম্মত্যাগ কি, তাহাই অবধারণ করিতে হইবে। স্থূলতঃ কর্ম্মবিরতি কর্ম্ম ত্যাগের লক্ষণ হইতে পারে না, কেননা তাহা প্রাকৃত নিয়মবিরুদ্ধ এবং তদনুকূল প্রচেষ্টা জীবের তমোবৃদ্ধির হেতু। কর্ম্মের ফলত্যাগই যথার্থ কর্ম্মত্যাগ। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের সন্ন্যাস বলিলে প্রথমতঃ ফলাশারহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই বুঝিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যেরা পুনঃ পুনঃ ইহা বলিয়া গিয়াছেন। বাসনাত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ—উহাই কামনার নিরোধ বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং ভক্তির প্রাপক। ইহা বুঝিতে কোনও গোল নাই।

সন্ন্যাসের এই অন্তর্ম্মুখীনতাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিতেছেন—"তস্মিন্নন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ" অর্থাৎ ঈশ্বরে অনন্যভাব এবং তাহার বিরোধী বিষয়মাত্রেই ঔদাসীন্যকেও নিরোধ বলে। এই উক্তিকে ভক্তের সন্ন্যাসের পরিচয় রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভগবানে অনন্যতা কি?— অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা"—অন্য আশ্রয়ের ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করাই অনন্যতা। আমাদের অতৃপ্ত চিত্ত অন্তরে স্থিতির হেতু না পাইয়া তৃপ্তির আশায় বহির্ম্মুখে ধাবিত হয়, এ কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অন্যের প্রতি এই প্রবণতা ভক্তিরই অস্পষ্ট আভাস, ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু চিত্তের এই অন্যপ্রবণতা বহিবিষয় হইতে পরাবৃত্ত হইয়া যখন পরম তৃপ্তির নিদানকে আপনার মাঝেই খুঁজিয়া ফিরে, তখনই ভক্তির উন্মেষ হয়। তিনি আছেন, আমার হৃদয় জুড়িয়া আছেন। বাহিরেও তিনি আছেন, এ কথা আমার কাছে তখনই সত্য হইবে, যখন ভিতরে তাঁহাকে পাইব। এখন বাহিরে যাহা দেখি, তাহাই চঞ্চল, খণ্ডিত; আমারও দৃষ্টি অশুদ্ধ। তাহা হইলে বাহিরে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইবে কি করিয়া? কাজেই বাহিরকে ছাড়িয়া আসিতেই হইবে। বাহিরের মোহ অতিক্রম করিতে পারিলে তবে ভিতরে রস পাইব। আর অন্তরের রসধারা একবার উৎসারিত হইলে, বাহিরকে তাহা প্লাবিত করিয়া দিবে। তখন দেখিব, ভিতরে বাহিরে তিনিই। এই চরম সত্যটুকু লাভ করিবার জন্যই বহিরাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্তরাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই অনন্যতা, ইষ্টনিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ, বা ভক্তের সন্ন্যাস।

বাহির ছাড়িলেও তাহার সহিত সম্বন্ধ দূর হয় না। সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিয়া নিরালম্ব শূন্যতার মাঝেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহি না। তবে বাহিরের সহিত আমার সম্বন্ধ অন্তরের সঙ্গে কি আকারে সমঞ্জস হইয়া থাকিবে? —ঋষি বলিলেন, বাহ্যব্যাপারে উদাসীনতাই তাহার একমাত্র পথ। আবারও স্মরণ করাইয়া দিতেছি, স্থূলকর্ম্মসন্ন্যাসে প্রবর্ত্তিত

করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বাসনাত্যাগ হইলে কর্ম্ম থাকুক আর না থাকুক সে তাঁর ইচ্ছা—বাসনা ছাড়িতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। এই দিক হইতে বিচার করিলে বুঝি, ঔদাসীন্য বলিতেও স্থূল কর্ম্মবিরতি বুঝায় না। উৎ—ঊর্দ্ধে, আসীন যিনি—তিনিই উদাসীন; কর্ম্ম-কোলাহলের ঊর্দ্ধে তিনি—তিনি নির্লিপ্ত। অহংবোধে জীব কর্ম্মে লিপ্ত হয়। অহংটী যে পরম বস্তুর কাছে সঁপিয়া দিয়াছে, তাহার কর্ম্মে লিপ্ত হইবার আশঙ্কা কোথায়? ভক্তি শাস্ত্রের পরিভাষায় সে কর্ম্মকে বলে সেবা। ভক্তের কর্ম্ম আছে—তাহা পরপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত, অতএব সেবা। তাই ঋষি বলিতেছেন, লোকে বেদেষু তদনুকুলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা—লোকে ও বেদে বিহিত ভগবানানুকূল কর্ম্মের আচরণই যথার্থ উদাসীনতা। তাঁহার তুষ্টি বিধানই ভক্তের ঔদাসীন্য বা কর্ম্মসন্ন্যাসের রূপ। ঔদাসীন্যের মাঝে যে অবহেলার ভাব রহিয়াছে, তাহা অহংএর প্রতি; স্বংএর প্রতি নয়।

এতক্ষণ কর্ম্মের দুইটী ভেদের কথা বলিয়া আসিয়াছি—লৌকিক ও বৈদিক। ইহার তাৎপর্য্য আছে। কতকগুলি কাজে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি রহিয়াছে—সেগুলি সংসার-স্থিতির পরিপোষক। ইহাদের অনুষ্ঠানে যে লাভ হয়, তাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় বলে অভ্যুদয়। অভ্যুদয়মূলক কর্ম্মই লৌকিক কর্ম্ম, উহা প্রবৃত্তিপথের দোসর। আর যে সমস্ত কাজ আপ্তজনদ্বারা প্রেরিত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, অতএব নিবৃত্তিমূলক বলিয়া যাহা সংসারস্থিতির প্রতিকূল, তাহাই বৈদিক। ইহার অনুষ্ঠানে নিঃশ্রেয়স বা অভ্যুদয় হইতেও পরমোৎকৃষ্ট স্থিতি লাভ হয়।

এক্ষণে কথা এই, প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম কমাইবার মত নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মও কমাইব কি না? যদি কর্ম্মত্যাগের যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে বলিব, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উভয়ই আমার কাছে অপ্রয়োজক। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ" ইত্যাদি বচন কর্ম্মসন্ন্যাসের জ্ঞাপক। কিন্তু হৃষীকেশকে যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে না পাইতেছি, সেই পর্য্যন্ত নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অজ্ঞাতসারে প্রবৃত্তিরই পোষকতা করা হইবে মাত্র। কাজেই যে পর্য্যন্ত "আমি করিতেছি না—তুমিই সব করাইতেছ"—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত নিবৃত্তিমূল শাস্ত্রশাসন মানিয়া চলিতেই হইবে, নতুবা পতনের আশঙ্কা আছে। ঋষি তাই বলিতেছেন—"ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণম্, অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া।"

লৌকিক আচারের বেলাতেও এই কথা খাটে। তবে লৌকিক কার্য্য যত কমে, জীবন যত সরল হয়, ততই ভাল। সব ছাড়িতে পারা যায়, কিন্তু দুটী অন্ন দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনটা আমরণ থাকিয়া যায়। "মরণও তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছি, সুতরাং তিনি যতদিন না মারেন, ততদিন তাঁহার ইচ্ছায় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে বই কি? বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যতটুকু লৌকিক প্রচেষ্টা, ততটুকুই কর্ত্তব্য। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির পরও তাঁহারই ইচ্ছাতে এই কর্ম্মটুকু অবশিষ্ট থাকে। তাই ঋষি বলিয়াছেন—লোকেঽপি তাবদেব; কিন্তু ভোজনাদিব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি"—লৌকিক আচারও যতদিন বুদ্ধি নিশ্চয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত; কিন্তু শরীরটা যতদিন আছে, ভোজনাদি ব্যাপার ততদিন থাকিয়াই যাইবে।

—※—

আরণ্যক

•—❋—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৭১

—ঃ{❋}ঃ—

যেমন সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ নিত্য বর্ত্তমান, সেইরূপ ব্রহ্ম ও সংসার। ব্রহ্মসমুদ্রে সংসারতরঙ্গের উত্থানপতন অবিরাম চলেছে। নির্লিপ্ত দর্শক লহরীর পর লহরী দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে যান। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও তেমনি দূর হতে লহরী দেখে আনন্দলাভ করেন। আর এক প্রকার লোক আছে, তারা তরঙ্গের মাঝে যায়, কিন্তু এমন কৌশলে নিজকে রক্ষা করে যে তরঙ্গ তাদের কিছুই করতে পারে না। সংসারেও এইরূপ: যাঁরা সংসারের রহস্য জেনে কৌশলে জীবন যাপন করেন, তাঁদের ভয় নাই। মরে কেবল অজ্ঞ অকুশল ব্যক্তি। তরঙ্গের মাঝে সাঁতার দেবার কৌশল যারা জানে না তারাই ডুবে মরে, অনভিজ্ঞ অতত্ত্বজ্ঞ সংসারীরও ঠিক এই দশা।

❋

অন্ধকার দেখলে আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে যাই, আর আলো দেখলে প্রাণে বল আসে, নবীন উৎসাহ জেগে ওঠে কেন?

এর কারণ হচ্ছে, আলো বা জ্যোতিঃই আমাদের স্বরূপ। তা অবশ্য এই জড় আলোক নয়—সচ্চিদানন্দময় জ্যোতিঃ, কিন্তু সেই কারণেই এই জড় জ্যোতি দর্শনেও আত্মজ্ঞানবিমূঢ় মানবের অন্ধকারময় হৃদয়ে স্বরূপের আভাস যখন ফুটে উঠে, তখনই আমরা আনন্দে বিভোর হয়ে যাই—আর যেন মৃত্যু-বিভীষিকা থাকে না। তাই দিনের আলোকে আত্মজ্ঞান কতকটা উন্মেষিত হওয়ায় আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করি—আর রাত্রির অন্ধকারে আত্মজ্ঞানের অভাবে ভয়ে কাতর হই। সুতরাং জীবনে যারা জ্ঞানের আলো লাভ করেছেন বা নিজকে স্বপ্রকাশস্বরূপ বলে জেনেছেন, তাদের আর কখনও আলোকের অভাব হয় না—ভয় তাঁদের নিকট হতে চিরকালের জন্য পলায়ন করে—অভয়ে, অমৃতত্বে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন।

❋

তিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ কি না, তাই তাঁর জগতের সব জিনিষকেই পূর্ণানন্দ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জগতের অণুপরমাণুও পূর্ণ—এর কোথাও তাঁর অভাব নাই—তাই অপূর্ণতাও নাই। নিজকে অপূর্ণ ভেবে জগৎ হতে বিষয় আহরণ করতে যাওয়া, এ যেন দীপ্ত দিবালোকে চোখে হাত দিয়ে অন্ধকার দেখার মত। হাতটা খুলে নিলে সব দেখতে পাবে। যুগ যুগ ধরে সংস্কার জমে অন্তরকে অন্ধকারাগার করে রেখেছে। সব সংস্কার ধুয়ে মুছে হৃদয়কে নির্ম্মল স্বচ্ছ করে তুললেই জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠবে—নিজকে পূর্ণ বলে উপ-

লব্ধি করতে পারবে। আনন্দ অমৃত তোমার মধ্যেই আছে, তাকে অনুভব করতে হবে।

যত দিন তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস না হয়, তত দিন জ্ঞানবিচার ভাল লাগে। ঠিক ঠিক বিশ্বাস এলে তখন বিচারতর্ক রুক্ষ কর্কশ বোধ হয়। তখন কেবল তাঁকে ভালবাসতে আর অনুভব করতে প্রাণ মন আকুল হয়ে উঠে। তাই সাধক গাহিয়াছেন, "কাজ নাই আর জ্ঞান বিচারে আমায় দে মা পাগল করে।"

নিবেদন

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব আগামী শারদীয় পূজার অবকাশে তাঁহার জন্মভূমি পরিদর্শন উপলক্ষ্যে নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিবিসনের অন্তঃপাতী কুতুবপুর গ্রামে পদার্পণ করিবেন এবং তাঁহার বহু শিষ্যভক্ত এই শুভ সুযোগে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মভূমি মহাপীঠ দর্শন করিতে তাঁহার অনুগামী হইবেন—এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব বিগত ভক্তসম্মিলনীতে গৃহীত হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভক্তসহ জন্মভূমি দর্শন তিথিটী চিরস্মরণীয় করিতে এবং তাঁহার বিরাট্ উদ্দেশ্যের আংশিক সফলতা-কল্পে তাঁহারই শুভ নির্দ্দেশের অনুসরণ করিয়া ভক্তমণ্ডলী এই উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মভূমিতে একটি আশ্রম ও তৎসহ "ঋষি-বিদ্যালয়" স্থাপন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের উপযোগী এক খণ্ড জমী খরিদ করিবার আয়োজন হইতেছে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের পিতৃপিতামহের ভিটায় একটী ইষ্টক মন্দির তুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের জন্য সম্প্রতি ৩।৪খানা ঘর উঠানও প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমি তদীয় শিষ্যবর্গের নিকট সর্ব্বতীর্থের সারস্বরূপ ; এই পুণ্য ভূমিতে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে পাওয়া আমাদের মহা সৌভাগ্যের পরিচায়ক, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অনুরাগী শিষ্যভক্ত মাত্রই এই শুভ অনুষ্ঠানটীর সফলতা কল্পে সাগ্রহে অগ্রসর হইবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্ত্তিক হইতে

৩রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে তাঁহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক ব্যয়াদি নির্ব্বাহজন্য জন প্রতি ৫৲ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, সুতরাং উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত সমাগত ভক্তগণের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হওয়া প্রয়োজন।

কুতুবপুরে যে আশ্রম ও ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহার সাহায্যার্থ যিনি যাহা দিতে চাহেন, তাহাও উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে সাদরে গৃহীত হইবে।—

চিঠিপত্র লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত এম, এ, বি এল,
সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
(অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ

জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব এবং অত্রত্য সারস্বত মঠের ১৯শ বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষ্যে ৩১শে বৈশাখ হইতে ২রা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত অত্র মঠে শ্রীশ্রীগুরুযজ্ঞের পূজা, হোম, আরত্রিক, বেদাদি পাঠ ও নামযজ্ঞাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীহট্ট, কুচবিহার, ঢাকা, ফরিদপুর, নওগাঁ প্রভৃতি স্থান হইতে ভক্তদিগের সমাগম হইয়াছিল। যোরহাটের প্রবাসী বাঙ্গালী ও মঠের নিকটবর্ত্তী ভক্তমণ্ডলী যোগদান করিয়াছিলেন। পূজা ও যজ্ঞান্তে সমাগত ভক্তগণ তিলক ধারণ করেন। পরে ফল-মূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রভৃতি প্রসাদ বিতরিত হয়।

অন্যান্য শাখাশ্রমগুলিতেও অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ২৯শে বৈশাখ মঠে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি মঠেই থাকিবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যকৃতং তীর্থযাত্রা-তত্ত্বম্—

—কলিকাতা, শ্যামবাজার সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য সদস্যপক্ষে ।/০, সাধারণ পক্ষে ।✓০। গ্রন্থখানি রঘুনন্দনের সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের বহির্ভূত একখানি অপ্রকাশিত তত্ত্বগ্রন্থ। ইহাতে গয়া, প্রয়াগ ও বারাণসী, এই তিনটী তীর্থের প্রয়োগবিধি বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানির উপযোগিতা সম্বন্ধে অবশ্য কাহারও মতভেদ হইবে না। পরিষৎ বহু অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রণ ভার গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতবিদ্যামোদী ও স্বদেশানুরাগীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের মুদ্রণাদি পরিপাটী হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, ইহা দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইলে বহুল প্রচারের পক্ষে আরও সুবিধা হইত।

উৎসবে সাহায্যপ্রাপ্তি

সারস্বত মঠে।

শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাস ২৫৲, শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্রপাল ১৫৲, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র সইকিয়া ১৩৲, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মাইতি ১০৲, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র দে ৯৲।

পাঁচ টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—গোবর্দ্ধন কুণ্ড, কুমুদিনী কান্ত সাহা, অতুলচন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র গুহ, আদিত্য চন্দ্র কার্য্যী, ভুবন মোহন রায়, ইন্দ্র পদ সাধুর্খা, বিহারী মোহন শর্ম্মা, নলিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র লাল কুরি।

চারি টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—হেমন্ত কুমার ঘোষ, বিরজা-চরণ মিত্র, ভূষণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তিন টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—রমাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী, ভীমাচরণ বসু, মন্মথনাথ বসু, অক্ষয়কুমার রায়, মহেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুষমাশোভা দেবী।

দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—ব্রজেন্দ্র মোহন চৌধুরী, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ নন্দী, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অনুকুল চন্দ্র রায়, জনৈক অজ্ঞাতনামা দেবেন্দ্রনাথ দে, কৈলাস চন্দ্র দাস, কামদেব মহাপাত্র, গগন চন্দ্র দে, শম্ভুনাথ দালাল, উমেশচন্দ্র পাল, বিশ্বেশ্বর বসু, নলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধু-ভূষণ কর্ম্মকার, অন্নদা কুমার সেন, নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়, গোপীনাথ স্মৃতিভূষণ, দেবেন্দ্রনাথ দে, সুরেন্দ্রনাথ দে, ভবরঞ্জন গুহ, ব্রজবাসী কুরি, ঈশ্বরচন্দ্র কুরি, রমেশচন্দ্র কুরি, কালী-নাথ দত্ত।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—অমূল্য দাস, অতুল চন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্র নাথ মাইতি, প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, নলিনী কান্ত মুখোপাধ্যায়, রাস মোহন চক্রবর্ত্তী, প্রসন্নকুমার কর্ম্মকার, নৃসিংহ-পদ পাল, অশ্বিনী কুমার পাল, হরি নাথ কর, কুমুদিনী গুহ, অমূল্য মোদক, সন্ন্যাসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার পাল, অশ্বিনী কুমার দাসগুপ্ত, ঘনশ্যাম দলই, করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায়, নিকুঞ্জবিহারী নাথ, প্যারী মোহন নাথ, উর্ব্বশী দেবী, দ্বারকানাথ সিংহ, প্রসন্নকুমার রক্ষিত, কৃষ্ণমোহন দাস, গোবিন্দ চন্দ্র পুততুণ্ড, যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত, হরপ্রসাদ রায়, শশিকুমার দাস গুপ্ত; কুরি—শ্রীনন্দন, যদুনন্দন, বনবিহারী, নিদানচন্দ্র।

আট আনা করিয়া—

কুরি—প্রসন্নময়ী, মনমোহন, যোগেন্দ্র লাল, প্রাণবন্ধু, রাজমোহন, সুচিত্রময়ী, নন্দ-রাণী, রাসময়ী, নিত্যময়ী, গৌরচরণ, ব্রজময়ী, ঈশানচন্দ্র। বিজয়চন্দ্র তালুকদার, অমরনাথ মণ্ডল, গুরুচরণ দাস ও কেনারাম মণ্ডল।

ময়নামতী আশ্রমে

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত ৩৲।

দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—হেমন্তকুমার ঘোষ, বিধুভূষণ কর্ম্মকার। কুরি—ব্রজবাসী, বনবিহারী, ঈশ্বরচন্দ্র।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—প্রাণহরি আচার্য্য, রাধানাথ দে, অশ্বিনীকুমার আদিত্য, সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী, ব্রজবাসী আচার্য্য, মহেন্দ্রনাথ পাল, অক্ষয়কুমার পাল, শরৎচন্দ্র পাল, প্রসন্নকুমার সাহা, হরেন্দ্রকুমার বণিক্য, মনমোহন মাণিক্য বৈকুণ্ঠকুমার নমঃ। কুরি—নিদানচন্দ্র, শ্রীনন্দন, যদুনন্দন।

আট আনা করিয়া—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাহা, কুরি—প্রসন্নময়ী, মনমোহন, যোগেন্দ্রলাল, প্রাণবন্ধু, রাজমোহন, সুচিত্রময়ী, নন্দরাণী, রাসময়ী, নিত্যময়ী, গৌরীচরণ, ঈশানচন্দ্র, ব্রজময়ী, অমরচাঁদ।

দানপ্রাপ্তি-স্বীকার

—*—

হালিসহর আশ্রমে—

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ১০৲

পাঁচ টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, " ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, " নৃসিংহপদ পাল, " শ্যামলাল লালা, " রজনীকান্ত মিত্র, " নিতাইচন্দ্র দত্ত, " সিদ্ধেশ্বর সাধু খাঁ, " জীবেন্দ্রনাথ দত্ত, " মহেশচন্দ্র হংস, " বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

তিনটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার রায়, " শম্ভুনাথ দালাল।

দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র পাল, " পি, সি, চক্রবর্ত্তি, " ব্রজেন্দ্রকিশোর বন্দোপাধ্যায়, " তারকনাথ দে, " হরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, " যুগলচরণ সাহা, " দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, " সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, " বদরীনারায়ণ চেলেঙ্গী, " রাধানাথ রায়, " R. N. Paul. " Major B. D. Bose. Manager—Indian Press.

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারমণ রায়, মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ মণ্ডল, সত্যেন্দ্রনাথ দে, জনৈক শান্তিপুরবাসী, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, উচ্ছবানন্দ বসাক, হেমচন্দ্র দাস, বিজয়বল্লভ সাহা, ললিতমোহন সাহা, জ্যোতির্ম্ময়ী রায় চৌধুরাণী, রেবতীমোহন রায়, গগনচন্দ্রকুমার মর্দ্দন চন্দ্র সাহা, রামগোপাল সাহা, যতীন্দ্রমোহন সাহা, দীনেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, সত্যেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ডাক্তার যুগলবাবুর স্ত্রী, মুক্তিনাথ ভট্টাচার্য্য, তারাপ্রসন্ন বাগচী, জনৈকা স্ত্রীলোক, হরিপদ কুণ্ডু, অশ্বিনীকুমার পাল, বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ত্রিবেণী সেন, রামানন্দ বিশ্বাস, বেণীমাধব ঘোষ, আত্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মহানন্দ রায়, হরিনারায়ণ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, জনৈক হিতৈষী, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচু পাঁড়ে, Juryan Biswas, বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী নৃসিংহপ্রসাদ বিশ্বাস, পাঁচুলাল নন্দী, ব্রজগোবিন্দ সেন, নবীনচন্দ্র চৌধুরী, বিধুভূষণ রায় চৌধুরী, চিন্তাহরণ ভুঞা, ডাক্তার সুরেন্দ্রলাল দে, নবীনচন্দ্র দে, কামিনী কুমার পাল, বগলাকুমার পাল, অক্ষয়কুমার ভৌমিক, ক্ষীরোদচন্দ্র মহাজন, শশীভূষণ দে, কালীশঙ্কর পণ্ডিত, প্রসন্নকুমার কর্ম্মকার, চন্দ্রকুমার বড়ুয়া, করুণাকান্ত বড়ুয়া, মহিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা চৌধুরী, সারদাচরণ চৌধুরী, চন্দ্রকুমার বড়ুয়া, অক্ষয়কুমার মুখার্জ্জী, ডাক্তার কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মান রাজা, মোহিনীমোহন দত্ত, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, জনৈক ভদ্রলোক, যামিনীরঞ্জন চৌধুরী।

আট আনা করিয়া—

শ্রীযুক্তঃ—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল মান্না, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার সেন, গুরুপ্রসাদ মুখার্জ্জী, D. N. Pal।

খুচরা সংগৃহীত—

উড়িয়া কুলিগণ ১৲, মাঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১।০, আলিপুর বারলাইব্রেরী ৪।১০, সুত্রাগড় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ১৲, মাঃ শ্রীযুক্ত গোপাল ব্রহ্মচারী ২৭৶০।

ভাওয়াল আশ্রমে—

শ্রীযুক্ত মোহান্ত ভগবানদাস ননীপুর ৫৲।

দুইটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তঃ—নির্ম্মলকুমার সিংহ, নরপৎ সিংহ, (বহরমপুর) রমণীমোহন সেন, লেডী ডাক্তার, পি. এন. গুপ্ত, পি. সি. গুপ্ত, কুমার অমরেন্দ্রনাথ রায়, একজিকিউটিভ অফিসরগণ।

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তঃ—নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অনাথ নাথ রায়, (বহরমপুর) প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য্য, প্রিন্সিপাল বি, সি, দাস, প্রফেসর বি, সি নাগ, প্রফেসর হেমন্তকুমার সেন, প্রফেসর ডি, ডি ঝা, প্রফেসর বি. সি, রায়, ধিরাজচন্দ্র রায়. কালীকুমার বানার্জ্জি, মোহমোহন সেন, বিভূতিভূষণ ভট্ট, ত্রিভঙ্গমোহন সেন, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, জিতেন্দ্রমোহন বানার্জ্জি, নলিনীনাথ চাটার্জ্জি, অনিলকুমার চাটার্জ্জি, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, গিরিজাভূষণ শর্ম্মা, অরবিন্দকুমার পাল, হীরালাল সেন, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ইন্দুভূষণ ধার, কুলদাকান্ত ভট্টাচার্য্য, অবনীমোহন শর্ম্মা, অন্নদাকুমার অধিকারী, সুরেশচন্দ্র নাগ, প্রভাতচন্দ্র সেন, শৈলেশচন্দ্র ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র সাহা, বিধুভূষণ সান্না, মৌলভী জিআর রহমান, মৌলভী এ, হক, বেণুরঞ্জন সেন, মণিমোহন সেন, রায় বাহাদুর এন্ সি, নাগ, দ্বারকানাথ গুপ্ত।

খুচরা সংগৃহীত—

নসীপুর রাজবাড়ী ২৲, শ্রীযুক্তা রাণী সরযূবালা দেবীর কাছারী ২৲ হেমিল্টন হোষ্টেল ৯৸০, হুইলার হোষ্টেল ৬৸০, মেন হোষ্টেল ৪৲, কুমার হোষ্টেল ৩৲ মহারাজ হোষ্টেল ২৲ সায়ান্স হোষ্টেল ২৲, রিট্রীট হোষ্টেল ১৲, নিউ হোষ্টেল ১৲, শান্তি নিকেতন মেছ ৩৲, সেটেলমেণ্ট অফিসারগণ ৫৸০, সবডিভিসনাল অফিসারগণ ৩৲, কয়েকজন হিতৈষী ৮৲, অন্যান্য ১৬৲।

খড়কুসুমা আশ্রমে—

শ্রীশশিভূষণ কুণ্ডু ২৲, শ্রীকাশীনাথ রুদ্র ২৲।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীগণেশ চৌধুরী, হরিপদ মান্না, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, শ্রীধর্ম্মদাস ঘোষ, শ্রীভূতনাথ সরকার, শ্রীবনীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীরসময় মণ্ডল, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সরকার রুদ্রষ্টেট্, শ্রীহরিপদ দাস কুণ্ডু, শ্রীশশধর দে, শ্রীঅমূল্যচরণ নন্দী, শ্রীবাসুদেব রায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র হাজরা, শ্রীশশীভূষণ চানক।

আট আনা করিয়া—

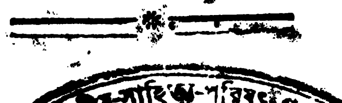
শ্রীহরিসাধন রায়, শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীরামচন্দ্র পাল শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীরসিকলাল ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ।

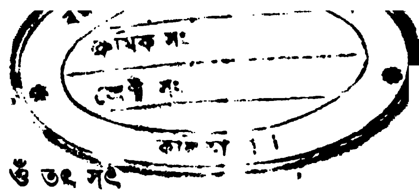
খুচরা সংগৃহীত—

ইড়পালা হাইস্কুলের ছাত্রগণ ৮৷৷০ ইড়পালা স্কুলের শিক্ষকগণ ৩৷৶০ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ মাঃ পার্ব্বতী দিগর খড়ার শ্রমিক দল ৬৷৶০, মিহিরবাবুর কুঠি ২৸০, অন্যান্য ৯৷৷৶০।

সারস্বত মঠে—

শ্রীলবনাথ শর্ম্মা ১৲, শ্রীনীলধর বরুয়া ১৲, শ্রীডিম্বেশ্বর গগৈ ৷৷০ শ্রীনীরজানাথ ভট্টাচার্য্য ১৲ শ্রীযুক্ত গুণেশ্বর বরা ৷৷০, " জ্ঞানানন্দ বরঠাকুর ২৲, D. N. Ray. ১৲, " ভোলানাথ শর্ম্মা ২৲, " পূর্ণানন্দ শর্ম্মা ৷৷০ " হোমেশ্বর শর্ম্মা ১৲, " পদ্মধর শর্ম্মা খাউণ্ড ১৲। (ক্রমশঃ)





ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ
সমষ্টি সং ১৯৫

আষাঢ়

প্রথম খণ্ড
তৃতীয় সংখ্যা

অগ্নয়ে

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৮।২।৩]

—*—

[কাত্য উৎকীল ঋষিঃ—অগ্নির্দ্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

বিপাজসা পৃথুনা শোশুচানো
বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ।
সুশর্ম্মণো বৃহতঃ শর্ম্মণি স্যাম্
অগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ॥

রয়েছে উজলি কায়, অগ্নি, তব দীপ্তি সুবিপুল,
অরি মম রোগহীন রক্ষঃকুলে কর নির্ম্মূল;
হে মহান্, চিরসুখনিকেতন যাচি তব পায়,
কণ্ঠ ভরি নিই নাম, যজ্ঞশালা দীপি মহিমায়।

ত্বং হ্যো অগ্রা উষসো ব্যুষ্টৌ
ত্বং সূর্য্ উদিতে বোধি গোপাঃ।
জন্মেব নিত্যং তনয়ং জুষস্ব
স্তোমং মে অগ্নে তন্বা সুজাত॥

ফুটেছে ঊষার আলো, হে দেবতা, জাগো এইবার,
ছড়ায় কিরণ, রবি—নাও এসে আমাদের ভার।
গাঁথিয়াছি গীতি তব—তনয়েরে চাহ করুণায়—
দিব্যতেজে দীপ্ততনু জাগো অগ্নি যজ্ঞবেদিকায়।

ত্বং নৃচক্ষা বৃষভানু পূর্ব্বীঃ
কৃষ্ণাস্বগ্নে অরুষো বি ভাহি।
বসো নেষি চ পর্ষি চাত্যংহঃ
কৃধি নো রায় উশিজো যবিষ্ঠ॥

অন্তর্য্যামী কল্পতরু, নিখিলে যে ছড়ায়েছ আলো,
অরুণ কিরণ ঢালি হরে নাও নিশীথের কালো।
দৈন্য মম কর দূর, বক্ষপুটে দাও চিরবাস,
যৌবনের রাজা তুমি, দাও কণ্ঠে অমিয়-পিয়াস।

অষাড়্হো অগ্নে বৃষভো দিদীহি
পুরো বিশ্বাঃ সৌভগা সংজিগীবান্।
যজ্ঞস্য নেতা প্রথমস্য পায়ো
র্জাতবেদো বৃহতঃ সুপ্রণীতে॥

হে বৃষভ, দুর্দ্ধর্ষ, দীপ্ততেজে ব্যাপি বিশ্বময়,
বিপক্ষের বক্ষ দলি কেড়ে নাও গোপন সঞ্চয়।
যে আদিম যজ্ঞ হতে ক্ষরে বিশ্বে কত না কল্যাণ—
অন্তর্য্যামী নেতারূপে কর তুমি তায় অধিষ্ঠান।

অচ্ছিদ্রা শর্ম্ম জরিতঃ পুরূণি
দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যানঃ সুমেধাঃ।
রথো ন সস্নিরভি বক্ষি বাজম্‌
অগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুমেকে॥

তুমি রুদ্র, মহাকাল, জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানবিভূষণ,
দেবতারে দিনু যাহা, ত্রুটী তার কর সম্পূরণ;
রহ যজ্ঞ আগুলিয়া, বহ অন্ন রথের মতন;—
দ্যুলোক-ভূলোকে করে দীপ্তি তব রূপে অতুলন।

প্র পীপয় বৃষভ জিন্ব বাজান্‌
অগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুদোঘে।
দেবেভির্দ্দেব সুরুচা রুচানো
মা নো মর্ত্তস্য দুর্ম্মতিঃ পরিষ্ঠাৎ॥

দাও অন্ন কল্পতরু, ঋদ্ধিভার করিব বহন,
মিটাব পিপাসা আজি রোদসীরে করিয়া দোহন;
এসো নিয়ে দেবগণে, আলোকিয়া রহ চিত্তপুর,
মর্ত্ত্যের দুর্ম্মতি যত অবিরত করি দিও দূর।

ইড়ামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ
শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা
অগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে॥

যে ডাকে তোমারে নিতি, জানি দেব তুমি দাও তারে
উজলিয়া প্রজ্ঞা তার ক্ষয়হীন অন্ন ভারে ভারে;
যাচি হেন পুত্র আজ, বাড়াবে যে কুলের গরিমা—
লভে যে আশিষ্‌ তব, গরবের কোথা তার সীমা।

———॥———

গুরু ও গীতা

গীতা ঐতিহাসিক কি না, তা নিয়ে অনেকে তর্ক করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বলে বাস্তবিক কেউ ছিলেন কি না, ঐতিহাসিক তার প্রমাণ চান, নইলে তাঁর চোখে গীতার মূল্য কমে যায়। এ যুক্তির সারবত্তা সব সময় বুঝ্‌তে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের যে ভাবঘন বিগ্রহ আমার মনের মাঝে দেখতে পাচ্ছি, সেই জীবন্ত অনুভূতির চেয়ে মরা ইতিহাসের সাক্ষ্য কি বেশী প্রামাণ্য হবে? চিত্তের গতি নিতান্ত জড়মুখী না হলে সত্যাসত্যের এমনতর বিচার কেউ করে না। আমি মানি, শ্রীকৃষ্ণ একটা ভাব, অর্জ্জুন একটা ভাব; ভাবরূপে তাঁরা নিত্য। সেই ভাব যে কতবার বিগ্রহে মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠ্‌ল, তার খবর কি ইতিহাস রেখেছে? গীতার কুরুক্ষেত্র কবেকার কোন ঘটনা, শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জ্জুন কোন্ যুগের মানুষ—এই বুদ্ধি নিয়ে যদি গীতা পড়, তবে তার পরিপূর্ণ আস্বাদ পাবে না।

'কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ গুরুশিষ্যের সংবাদ।' শ্রীকৃষ্ণ সদ্‌গুরু, অর্জ্জুন প্রপন্ন শিষ্য। অর্জ্জুনের শিষ্যত্ব আমরা সহজে স্বীকার করি, কেন না আমাদের মাঝে যে দৈন্য ও জিজ্ঞাসা আছে, অর্জ্জুনেও তাই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু গুরু কি বস্তু, তা অনুভব করতে পারি না বলে শ্রীকৃষ্ণে গুরুত্বের বা গুরুতে কৃষ্ণত্বের আরোপ করতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে। শ্রীকৃষ্ণ যদি গুরু হন, তাহলে একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে যান কি না; তাঁকে তেমনি সহজভাবে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি ভগবান্ হয়ে দূর থেকে আমাদের পূজা আদায় করলে আমরা অনেকটা স্বস্তিতে থাকি। শ্রীকৃষ্ণকে গুরু বলে ভাবতে এই দিক দিয়ে আমাদের খট্‌কা। আবার নিজ গুরুকে শ্রীকৃষ্ণ ভাব্‌তে গেলেও গীতায় ভগবদ্ভাবের যে সমস্ত উক্তি ও ক্রিয়াকলাপ আছে, সেগুলো আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট নরাকার বিগ্রহে আরোপ করতে খুব জোর বিশ্বাসের প্রয়োজন। বিশেষতঃ আজ কাল গুরুতে যেমন গুরুত্বের অভাব দেখা যায়, তাতে গুরুরাও কেউ জোর করে শ্রীকৃষ্ণের আসন নিতে সাহস পান না। এই জন্য সন্দেহও বেশী হয়। বিচারের অভাবে, শ্রদ্ধার অভাবে এমনি করে এই গীতাপ্লাবনের যুগেও গীতার সাধনা আমাদের জীবনে মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠ্‌ছে না।

আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ না ভেবে একজন মহাযোগেশ্বর ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ বলে মনে করে গীতার ব্যাপার ও উক্তিগুলি সাজিয়ে যাও দেখি—দেখ্‌বে গীতার উক্তিতে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার হয়েছে। ভগবান্ বলে ভাব্‌তে মানা করি এই জন্য যে, ভগবান্ আসলে কি তা তো আমরা জানি না, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে বিচিত্র সংস্কার পোষণ করে তাঁকে একটা কিম্ভূতকিমাকার করে ফেলি। তা ছাড়া, আর একটা কথা আছে। অমুক কথাটা ভগবানের উক্তি—এই বললে দেখেছি, অধিকাংশস্থলেই কথাটা আমরা শুধু নির্ব্বি-

চারে গিলে বসি, তাকে পরিপাক করবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা হয় না—এমন কি তা সম্ভব কি অসম্ভব, তা নিয়েও একটা প্রশ্ন মনে জাগে না। এগুলো কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বাসের পরিচয় নয়—এ হচ্ছে এক রকম আধ্যাত্মিক জড়তা। অতিমাত্রায় শাস্ত্রের দোহাই আর অবতারের প্রাচুর্য্যে এই জড়ত্বের ভাবে আমাদের দেশটা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। এই জন্য ভগবানের কথার চেয়ে মানুষের কথায় আমার চিত্তে সাড়া দেয়ে বেশী। ভগবান্ তো আমার কাছে মৃত, আর মানুষ জীবন্ত। মানুষের কথা হলেই মনে হয়, ওটা আমার সমজাতীয়ের কথা—ও শুধু বিনা বিচারে গিল্‌তে হবে না, পরখও করা যাবে। আর যেখানে বিশ্বাসই করতে হয়েছে, সেখানে দেখেছি, মানুষের কথায় বিশ্বাস করে যে জোর পেয়েছি, মনের ওপর তা যেমন দাগ কেটে বসেছে—ভগবদ্ভক্তিতে তেমন বিশ্বাস আসে নি—একটা আবছায়া ভাব, ভুলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা তাতে লেগেই রয়েছে। এই থেকে বুঝেছি, আজ ভগবান্ এসে সরাসরি সামনে দাঁড়ালেও তাঁকে খুঁজবো না, যদি মানুষের ভিতর দিয়ে তাঁকে না পাই। ভগবান্ পাওয়ার আগে গুরু পাওয়া এই জন্য বেশী দরকার।

আর এই জন্যই বলছিলাম, গীতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ হয়ে থাকলে তেমন রস পাই না, কিন্তু তিনি মহাপুরুষ বা ব্রহ্মবিদ্ গুরু হলে গীতার উক্তি আমার কাছে আশ্চর্য্য রকম জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর মনে হয়, গীতা অমর, কেননা গুরু সত্য, তাঁর উপদেশ সত্য। তখন আর ঐতিহাসিকের ভুয়া বিচারের কথা মন আমলেই আন্‌তে চায় না। এমন কি, অর্জ্জুনের কাছেও যে শ্রীকৃষ্ণ আগে মানুষ ও গুরু, তার পরে ভগবান—এর প্রমাণ যত্র তত্র রয়েছে। কিন্তু কাজের বেলায় সে কথাটা আমরা ভুলে যাই।

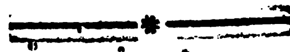
গীতাতে অর্জ্জুনের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠলেন, তার আলোচনা করলে শিষ্যের হৃদয়ে সদ্‌গুরুর প্রকাশ ধারার একটা আভাস পাওয়া যাবে। অর্জ্জুন বললেন, আমি যুদ্ধ করব না—এই বলে অহিংসার গুণ কীর্ত্তন করে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ চুপ করে শুনলেন, শেষে হেসে বললেন—হাঁ, পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে। এই বলে তাঁর বলবার যা ছিল, তাই অর্জ্জুনকে বোঝাতে লাগলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রিশ শ্লোকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বোঝাপড়া। এর মাঝেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের পত্তন করলেন—যা নাকি অনেকের মতে গীতোক্ত বিশেষ ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশগুলি খুব সাধারণ ও ব্যাপকভাবের উক্তি, নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর ঝোঁক দিয়ে এর মাঝে কোথাও তিনি কিছু বলেননি। যে কোনও গুরুর মুখে, আমরা এমনি উপদেশ শুনবার প্রত্যাশা রাখি।

কিন্তু কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচ্য কথা হচ্ছে এই যে, এতে প্রচলিত সাধনার একেবারে বিপরীত বিধান দেওয়া হল। যুক্তি, বিচার, দর্শন ইত্যাদিতে প্রতিপন্ন করছে যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ ; কর্ম্ম ছাড়লে তবে সংসার চক্র হতে নিস্তার পাওয়া যাবে। কিন্তু সে জায়গায় যদি কেউ উপদেশ দেন, "দেখ তুমি সহজ কর্ম্ম ছেড়ো না, ও সব বেদের দোহাই শোনবার তোমার কোনও প্রয়োজন নাই, তুমি বেদের পরপারে চলে যাও, বেদ তো ব্রহ্মের

কথাই বলছেন, এই কর্ম্মও সেই ব্রহ্মেরই বিকাশ, কর্ম্ম আর যজ্ঞ এক কথা, এই যে কর্ম্মের চক্র চলছে সংসারে, যে এর আবর্ত্তন না করে, সে ইন্দ্রিয়ের আরাম খুঁজে বৃথা বেঁচে আছে, কাজেই অনাসক্ত হয়ে তুমি কর্ম্ম কর" তখন বুঝি, যে সংসারকে আমরা ভয় করছি, এড়িয়ে যেতে চাইছি, সেই সংসারকে যিনি আরও পাকা করে দিতে চান্, প্রকৃতির একটা গোপন শক্তির ভাণ্ডার তাঁর হাতে। খুব ভাল সাঁতারু বলেই তিনি অগাধ জলে আমাকে ঠেলে দিয়ে হেসে বলছেন, জল কেটে আমার দিকে আয় দেখি!

আমরা জানি, সংসার বজায় রেখে সংসার বন্ধন যিনি কাটতে পারেন, তিনিই সদ্‌গুরু। এমন গুণী পুরুষের দেখা সহজে মেলে না—কিন্তু তা বলে তিনি নাই, তাঁর জায়গায় এক কল্পিত ভগবান্ দাঁড় করিয়ে শাস্ত্রের মীমাংসা করতে হবে, এ কথা তো মানতে পারি না। আজকাল অনেকে বলেন, কসে কর্ম্ম কর, অকর্ম্মে দেশটা উৎসন্ন গেল। কিন্তু কসে কর্ম্ম করার ফলে মনে যে ময়লা জমে, তা হতে রেহাই পাবার পথটা কেউ বলে দিতে পারেন? আর দেখছি, পথ বলে দিলেও হয় না—পথ তো শাস্ত্রে কতই লেখা আছে—চাই একটা জীবন্ত মানুষ; তাঁর কথা, তাঁর প্রেরণা তাঁর শক্তি আমার মাঝে জলজল্ হয়ে উঠবে, তবে না বুঝব—হাঁ, সহজ কর্ম্ম করেও, সংসার করেও কোথায়ও বাধা অনুভব করছি না—কোদাল মেরে, কুড়ুল মেরে, মোট বয়েও আমি রাজার রাজা! শুধু ভগবান্ মানলেই যে কর্ম্মের এই সিদ্ধিটুকু মেলে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। শুধু মানামানিতে কি হয়? চোখে দেখা চাই—মানুষের সঙ্গ চাই। সংসার যদি ভগবানের সংসার হয়, তা হলে তার বন্ধন থাকে না, এ কথা শাস্ত্রে বলে। কিন্তু ভগবান্ মানুষ না হলে এই সংসার যে সত্যি সত্যি তাঁরই সংসার, এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না; মুখে বলি ভগবানের, কিন্তু প্রাণে জানি, ও বাজে কথা। ভগবান গুরু হলে তবে বুঝি, হাঁ তাঁরই সংসার বটে। গুরুগৃহে থেকে সহজ কর্ম্মে দিনগুজরাণ করলে তবে বুঝি, কর্ম্মযোগ কত সহজ, কত উপাদেয়। জীবনে এই ভাগ্যটুকু না ঘটলে গীতার কর্ম্মযোগ বুঝবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র! আর যে এই যোগের আস্বাদ পেয়েছে, সেই জানে, গুরু আর কৃষ্ণ এক; কৃষ্ণ ভগবান্, এ কথায় তার প্রাণে তত সাড়া দেয় না, কিন্তু কৃষ্ণ গুরু—গুরু কৃষ্ণ শুনলে সে একেবারে এলিয়ে পড়ে। গীতা যে সত্যি সত্যি ইতিহাস, তার প্রমাণ সে বুকের মাঝে পায়।

এই তো গুরুর ধর্ম্ম। এখন শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে অর্জ্জুনের কাছে তাঁর গুরুত্ব প্রকাশ করলেন, সেই কাহিনীই বলি। (ক্রমশঃ)



অজ্ঞানের স্বরূপ



অজ্ঞান সম্বন্ধে বৈদান্তিকের কয়েকটী সিদ্ধান্ত আছে, বিশেষ প্রণিধান সহকারে তাহাদের আলোচনা করিতে হইবে। সিদ্ধান্ত কয়টী এই—(১) অজ্ঞান জড়সমূহের আদি, (২) অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী (৩) অজ্ঞান ভাববস্তু, (৪) অজ্ঞান সৎও নয়, অসৎও নয়, অতএব অনির্বচনীয়, (৫) অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক।

এই কয়েকটী সিদ্ধান্তের মধ্যে—"অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী"—এইটীই বাস্তবিক অজ্ঞানের সংজ্ঞা। বাকীগুলি ওই সংজ্ঞারই পরিপোষক অজ্ঞানের ধর্ম্মের পরিচায়ক। এই ধর্ম্মগুলির বিচার করিয়া অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিরোধ কিরূপ, তাহাই আমাদিগকে নিরূপণ করিতে হইবে।

অজ্ঞান জড়সমূহের আদি—এই লক্ষণটীই বিচার করিয়া দেখা যাক। জড় কাহাকে বলি? যাহা দৃশ্য অর্থাৎ অনুভবগম্য, তাহাই জড়। অজড় একমাত্র চৈতন্য। চৈতন্য বলিতে আমি। তুমিও চেতন, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎভাবে আমি জানি না,. উপচারবশতঃ বলি, তুমি চেতন। একমাত্র আমিই চেতন, আমিই দ্রষ্টা। আমার বাহিরে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা কাজেই দৃশ্য বা জড়। এই দৃশ্য কি? প্রথমে দেখিতে পাইতেছি—এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। স্থূলতঃ ইহাকেই দৃশ্য বলি। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও সূক্ষ্ম দৃশ্য আছে। নিজকে ধরিয়া তাহার বিচার না করিলে বোঝা যায় না। প্রথমতঃ ধর, আমার দেহ। কথায় বার্ত্তায়, আচারে ব্যবহারে অনেক সময় দেহটাই "আমি" বলি—যেমন আমি অসুস্থ, আমি কালো ইত্যাদি। আবার কখনও "আমার" বলিয়া দ্রষ্টা আমি হইতে দৃশ্য দেহকে পৃথক্ করিয়াও নিই। আমার দেহ আমি হইতে পৃথক্—ইহা সোজা কথা। অধ্যাত্ম জগতে এই প্রথম দৃশ্য।

তার পর মন। মনের সঙ্গে মাখামাখি বড় বেশী, তাই আমি হইতে তাহাকে পৃথক করা সাধারণ মানুষের সাধ্য হয় না—তাহারা হয়ত এটা খেয়ালই করে না। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ মনস্তত্ত্ববিদেরা মনটাকেও দেখেন। মন না দেখিলে তাহার তত্ত্ব বিচার হয় কি করিয়া? আর নিজের মন না দেখিলে পরের মনই বা দেখা কিম্বা বোঝা যায় কি করিয়া? অতএব প্রমাণ হয়, মনও দৃশ্য। আধুনিক দর্শনের দৌড় এই পর্য্যন্ত। সুতরাং আমরাও এইখানে থামলাম। কিন্তু এই ধারায় বিচার করিয়া মনের সূক্ষ্মরূপ বুদ্ধিও দৃশ্য হয়।

তাহা হইলে প্রমাণ হয়—স্থূলজগৎ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সব দৃশ্য বা জড়। মাখামাখি ভাবটা যতই ছাড়াইয়া যাইবে, আমির আলো ততই পিছাইয়া যাইবে, আর তাহার সম্মুখে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি দৃশ্যরূপে ভাসিয়া উঠিবে। এই দৃশ্যগুলি আমি নই—কেন না আমি দ্রষ্টা। দ্রষ্টা চৈতন্য বা জ্ঞান। দৃশ্য তাহা হইলে জড় বা অজ্ঞান। ইহাই প্রমাণ

হয়, দেখিতে পারিলে আভাস্বর বুদ্ধি হইতে অনুজ্জ্বল মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সবই জড় বা অজ্ঞান। আমি হইতে ভিন্ন হইয়া অর্থাৎ "আমি নই" এই ভাব হইতে ইহাদের উৎপত্তি। যেখানে "আমি"র সঙ্গে মেশামিশি, সেখানে ইহাদের সত্তা নাই— যেমন "আমি সুখী"—এখানে বুদ্ধি নাই। অতএব প্রমাণ হয়, অজ্ঞানই জড়-সমূহের আদি।

অজ্ঞান যদি উৎপত্তির নিদান হইল, তাহা হইলে কাজে কাজেই বলিতে হয়—অজ্ঞান ভাববস্তু, জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞান বলে না। অর্থাৎ অভাব বলিতে যে একটা নাস্তি-বোধ বা শূন্যতা বুঝি, তাহাই অজ্ঞানের স্বরূপ নয়। অজ্ঞান একটা শক্তি, একটা ভাব পদার্থ। অজ্ঞানের একটু ছোঁয়াচ, ভুলের একটু রেশ লাগিয়াই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা বুদ্ধির রঙে রঞ্জিত হইলেন; আর একটু ঘন হইয়া মন হইলেন, প্রাণস্পন্দন হইলেন, শেষে বা দেহই হইলেন! দেহটা স্থূলভাবে দেখিতেছি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণেই তাহা কোথায় উবিয়া যাইবে—পরমাণু হইলে তো আর দেখাই যাইবে না! সুতরাং স্থূল বলিয়াই যে কাহারও সত্তার জোর দখল আছে, তাহা নয়। স্থূল সূক্ষ্ম হইয়া মিলাইয়া যায়, আবার কোথা হইতে আসিয়া উঠে। যখন মিলাইয়া যায়, তখন বুঝি, নাই—অর্থাৎ অভাব ঘটিল। কিন্তু একান্ত অভাব তো হয় না—নইলে আবার আসে কোথা হইতে? অভাব তাহা হইলে স্থূলে, সূক্ষ্মে কিন্তু ভাব। স্থূলের অজ্ঞান অভাব, কিন্তু সূক্ষ্মে তাহাই আবার ভাব। কাজেই অজ্ঞান=অভাব, একেবারে পুরামাত্রায় নাস্তি—এ সিদ্ধান্ত করি কি করিয়া? বরং অজ্ঞান সূক্ষ্মভাব—এই কথাই বলা যুক্তিযুক্ত। স্থূলদর্শীর অজ্ঞান=সূক্ষ্মদর্শীর বিজ্ঞান, সেখানে অভাবেরও সত্তা চোখে পড়ে। অতএব অজ্ঞান ভাববস্তু, যেহেতু তাহা দৃশ্যের নিদান—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন।

তার পরের কথা হইল, অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয়। পূর্ব্বের আলোচনা হইতেই ইহা বুঝিতে পারি। অনির্ব্বচনীয় মানে রহস্য, বাক্যে যাহা প্রকাশ করা যায় না। বাস্তবিক একটা তত্ত্ব যদি একদিক হইতে দেখি আছে, আর এক দিক হইতে দেখি নাই, তাহা হইলে তাহাকে অনির্ব্বচনীয় বলা ছাড়া আর উপায় কি? অজ্ঞানকে যেদিক দিয়াই বুঝি না কেন, তাহার ধারাটাও ঠিক এইরূপ। যদি অজ্ঞানকে একটা প্রত্যয় বলিয়াই ধরি, তাহা হইলে দেখি, স্থূলদর্শীর অজ্ঞান তাহার কাছে সৎ, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীর কাছে তাহা স্বরূপতঃই অসৎ। যদি অজ্ঞানকে উপাদান হিসাবে ধরি, তাহা হইলে ভেদদশায় অর্থাৎ সৃষ্টিতে তাহা সৎ, অভেদদশায় অথবা ভেদের প্রলয়ে তাহা অসৎ। তাহা হইলে অজ্ঞান স্বরূপতঃ সৎও নয়, অসৎও নয়। এই হইল প্রত্যক্‌দৃষ্টিতে অজ্ঞানের স্বরূপকথা।

আবার অজ্ঞানকে যদি সমষ্টিভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠরূপে দর্শন করি, তাহা হইলে তাহার আর এক রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। সহজে ইহার ধারণা হইবে না বলিয়া একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বলি। "জানিতাম না—জানিলাম" এই হইল আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধ। যখন জানিলাম, তখন আর অজ্ঞান রহিল না—সহজ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝি। কিন্তু জ্ঞানের ফলিত দিক হইতে বিচার করিলে বুঝি, যখন জানিলাম, তখনও

না-জানার সময়ের ব্যবহারটা কিন্তু জানি; হয় তার অনুবৃত্তি থাকে, নয় তার স্মৃতি থাকে। তাহা হইলে জানার সময় না-জানাও আমার মাঝে থাকে। এই যে জ্ঞানদশায় অজ্ঞান, এক দিক দিয়া বলিতে গেলে ইহা আছে, আবার আর এক দিক দিয়া নাই; হয়ত ব্যবহারে আছে, কিন্তু সার্থকতা হিসাবে নাই। এরূপ স্থলে অজ্ঞানকে সৎ বলি, না অসৎ বলি?

এখন সমষ্টিভাবে ভাবিয়া দেখ, ব্রহ্ম জ্ঞান, অজ্ঞান উপাদান। তিনি যদি উপাদানকে জানেন অর্থাৎ অজ্ঞানকেও জানেন, তাহা হইলে অজ্ঞান থাকিয়াও নাই অর্থাৎ উহা অনির্ব্বচনীয়। ব্রহ্ম অজ্ঞানেরও জ্ঞাতা; একেই লোকে বলে ভাণ। সংস্কৃতে আছে ভান। অজ্ঞানপ্রসূত জগৎটা ব্রহ্মের ভাণ বা ভান। যাহা ভাণ, তাহা থাকিয়াও নাই।

তার পর অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক। প্রকাশের উপর আবরণ পড়াই হইল গুণসঞ্চার। অজ্ঞান যে ভাববস্তু, এই বিচারেই বুঝিয়াছি, তাহার স্ফুরণের বা জমাটবাঁধার একটা তারতম্য আছে। যাহা স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া নাই হইয়া যায়, আবার নাই হইতে স্থূলে ফুটিয়া উঠে, তাহার ব্যবহারকে বলি পরিণাম। যদি জড়দর্শন নিয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে বলিব—স্থূল আছে—উহাই প্রতীতিগ্রাহ্য সত্তা; ক্রমে ফাঁকা হইয়া উহা প্রত্যয়ে পৌঁছাইলে নাই হইয়া যায়। কিন্তু তখনও উহা থাকে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই যে স্থূল, ইহাকে বলি তমঃ, আর স্থূলের অভাব প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে সূক্ষ্ম সত্তা, তাহাকে বলি সত্ত্ব। মাঝের স্পন্দনটুকু রজঃ। অজ্ঞান যদি ভাবাভাবের পরিণাম-ব্যাপার হয়, তাহা হইলে তাহা যে ত্রিগুণাত্মক, তাহা বুঝিতে তো বেগ পাইতে হয় না।

এক্ষণে এই লক্ষণ গুলি মিলাইয়া বুঝিতে হইবে অজ্ঞানে ও জ্ঞানে বিরোধ কোথায়। অজ্ঞান বলিতে জ্ঞানের অভাব বুঝিব না, তাহা হইলে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং অভাব অজ্ঞান ও জ্ঞানের বিরোধের হেতু নয়। অজ্ঞান স্বতন্ত্র একটা জ্ঞান, যেমন পূর্ব্বজ্ঞান; আর জ্ঞান স্বতন্ত্র পরবর্ত্তী জ্ঞান—এইরূপ বলাও চলে না। কেননা তাহা হইলে অজ্ঞানকে অসৎ বলিবার উপায় থাকে না; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ফলের দিক দিয়া ব্যবহারদশাতে অজ্ঞান একেবারে অসৎ হইয়া যায়। সুতরাং উত্তর-জ্ঞানবিরোধী পূর্ব্বজ্ঞান, ইহাও অজ্ঞানের লক্ষণ নয়। অজ্ঞান পরিণাম, উহা ত্রিগুণাত্মক অতএব উহাকে মিথ্যাও বলা চলে না। সুতরাং মিথ্যাত্ব নিয়াও জ্ঞান-অজ্ঞানে বিরোধ নয়। তাহা হইলে আসল বিরোধ কোথায়? অজ্ঞান জ্ঞানের অপনোদ্য—ইহাই উভয়ের বিরোধ। জ্ঞান অজ্ঞানকে হটাইয়া দেয়—একেবারে নাস্তিও করে না, স্বাতন্ত্র্য মানিয়া বিরোধ করে না, মিথ্যাও বলে না। জ্ঞানে জগৎ নাই, বা স্বতন্ত্র ভাবে বিরোধী হইয়া আছে, বা মিথ্যা—ইহার কোনটাই বলা চলে না। জ্ঞান হইলে জগতের কাঠামো থাকে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য বদলাইয়া যায়। জ্ঞানাজ্ঞানের বিরোধ, ফলিত বিরোধ—একেবারে নিছক্ কল্পনা নয়, নিরেট বিরোধও নয়। (৩০)

রাস

—ঃ{*}ঃ—

প্রেমের স্রোত বয়ে চলেছে জগতে, তার মাঝে রিরংসা যেন একটা পাকের মত। ওরে মাঝি, ওইখানে সাবধান হবি। কামের আদিতে অনাদি প্রেমের স্রোত; যে ভাগ্যবান্ তাকে উৎরে এসেছে, সে জানে তার অন্তেও অনন্ত প্রেমের স্রোত। মাঝে শুধু ওই একটা আবর্ত্ত। আবার বলি, মাঝি, ওইখানে হুঁসিয়ার।

রিরংসাতে সুখ আছে, এও সত্য—আবার তুষানলের জ্বালা আছে—এও তো সমানভাবে সত্য। যে সুখ ক্ষণিক, অবসানে তার দুঃখ থাকবেই। যে সুখ পেতে আয়োজনের প্রয়োজন, তা খণ্ডিত হবেই। আয়োজনের অপেক্ষাই কাম জাগিয়ে তোলে, নইলে সুখ তো সর্ব্বত্রই সমান।

কাম অভাব, প্রেম স্বভাব। তাই রিরংসা অনিত্য, তার আদি অন্ত আছে বলেই তাড়নাও আছে। আর প্রেম নিত্য—আনন্দ প্রেরণায় সমুজ্জ্বল। লৌকিক জগতে যা দেখছি, তারও একটা বিরাট্ রূপ আছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়লে অভাব বোধ থাকে না। রিরংসা হতে তখনই মুক্তি।

পরমার্থতঃ একটা ভোক্তৃভোগ্যভাব আছে জগতে—তাই হল দ্রষ্টৃত্ব। সে ভাবের মূলে আছে অসীম বিস্তার। ক্ষুদ্র ভোগে তার আভাসমাত্র প্রতিফলিত হয় বলে সুখের মাঝেও দুঃখের করুণ সুর বেজে ওঠে।

আজ যদি তোমার মাঝে রিরংসা জাগে, তবে তার তৃপ্তিতে ক্ষণিক আনন্দ লাভ হবে। কেননা এই একটা দেহ দিয়ে ভোগ করা তো! তার আর ক্ষমতা কতটুকু? আজ তোমার কাম চরিতার্থ হল, কিন্তু তাতে জগতের সকল নরনারীর তো হল না। তাই রিরংসা থেকেই গেল; কেননা তুমি দেহে বিচ্ছিন্ন হলেও আত্মায় যে নিখিলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তুমি কামতর্পণে দেহকে তৃপ্ত করলে, কিন্তু আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তি তো হল না।

একটা দেহ বা মনের ভোগে যে কোনও দিন তৃপ্তি আসে না, তাতেই প্রমাণ হয়—আত্মা বিভু। অন্তর্য্যামিরূপে তিনি বিশ্বের সকল রমণসুখের আস্বাদ অনুভব করছেন। যদি কামনায় অন্ধ হয়ে মোহের ছলনায় শুধু এই একটা দেহের ক্ষণিক উত্তেজনা দিয়ে তাঁর তর্পণ করতে যাও, তিনি খুসী হবেন না। এই জন্য প্রাকৃত ভোগে মানুষের কখনও কামনা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।

ক্ষুদ্র আধারে যে রিরংসা মিথ্যা ও ক্ষণিক, তাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করে দাও—প্রকৃতি-পুরুষের অনাদিসিদ্ধ মিথুনানন্দ উল্লসিত হয়ে উঠবে। ভাল কথা। কিন্তু সে আনন্দ ধারণা করবে কে? এই ক্ষুদ্র দেহ, এই ক্ষুদ্র মন? না। তাহলে তো ওদের তর্পণেই বিশ্বেশ্বরের তর্পণ হত—প্রাকৃত নরনারীর কাম লীলায় অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের রাসলীলা হত।

তাই সেই নিখিলব্যাপী মিথুনানন্দকে

ধারণা করবার জন্যই বেদান্তের সাধনা—প্রাকৃত দেহ-মন বুদ্ধির নিরসন। ক্ষুদ্রত্ববোধ চলে গেলে বৃগতের রঙ্গভূমিতে তখন রাসলীলা সুরু হবে।

সেই রাসলীলায় ক্ষুদ্র অহং-এর যে অধিকার, তাই দ্রষ্টৃত্ব; আর ভূমার যে অধিকার, তাই ভোক্তৃত্ব। সেখানে দর্শনই ভোগ, তা মানি। কিন্তু দর্শনের যে রিক্ততা, তা অহং-এর পক্ষে; আর তার যে বিলাস, তাই ভূমার আনন্দ। এই জন্য দুটীতে ভেদের কল্পনা করছি।

আমিরূপী কেন্দ্রবিন্দু তখন রিক্ত, কেননা বিরাটকে ভোগ করবার সামর্থ্য তার নাই। এই রিক্ততাকে পরমশূন্য মনে করে নির্ব্বোধেরা ভয় পায়, জানে না যে আমিত্বের পাত্র রিক্ত করে ভূমা আনন্দের সুধায় তা পূর্ণ করে পান করছেন।

যাকে আমরা বল্‌ছি দর্শন, ভূমার তাই ভোগ; এই মন যে দেখ্‌ছে, তাই হল অবাঙ্‌-মানসগোচরের ভোগের রীতি; নইলে মনের দেখায় কি আনন্দ হত? সুতরাং দ্রষ্টৃত্ব আর ভোক্তৃত্ব পরমার্থতঃ ওতপ্রোত হয়ে আছে। এই জীব শিব—অদ্বৈত—ভেদে অভেদ।

খণ্ডজগতে রিরংসা সত্য হতে পারে না। তোমার মাঝে এখন রিরংসা আছে, কিন্তু আমার মাঝে হয়ত নাই। তা হলে পূর্ণ অনুভূতি পেতে হলে শুধু তোমার রিরংসাকে ধারণা করলে তো হবে না, আমার মাঝে যে অভাব আছে, তাও তো ধারণা করতে হবে। তা হলে ভাবে অভাবে বিরোধ লেগে যায়। উচ্চকোটীতে সংশ্লেষণ না হলে এর মীমাংসা হবে না। এমনি করে ক্রমেই উপরে গেলে চরমে সেই পরিপূর্ণ রিরংসার অক্ষয় সুধাস্রোতের সন্ধান পাবে—যা নাকি প্রকৃতি-পুরুষের নিত্য বৃন্দাবনলীলার অনন্ত রসোদ্গার।

—*—

ব্যাকুল

—*—

সঙ্গীহীন রাত্রদিন কত যুগ ধরে
এমনি কেটেছে মোর; তপ্ত ভাল 'পরে
একটী চুমার লাগি কেঁদেছে পরাণ,
মাতৃস্নেহবুভুক্ষিত কিশোর সমান।
হারায়েছি শৈশবের নিশ্চিন্ত নির্ভর,
সুখ-দুঃখে সমস্রোত আনন্দ নির্ঝর
ঝরে নাহি পড়ে আর; অশান্ত এ হিয়া
মর্ম্মদাহে ব্যথাতুর ফিরে ফুকারিয়া—
কারে চাই? পাব কোথা? বুঝিনা যে কিছু
কেন তবু ছুটে যাই আলেয়ার পিছু!
অজানা ভাবনারাশি যদি মূর্ত্তি ধরি
ওঠে ফুটি, সর্ব্বদেহ উঠিবে শিহরি
চকিত বিস্ময়ে ভয়ে; ফুটিবেনা কথা,
ভুলে যাব সুখ-স্বপ্ন, ভুলিবনা ব্যথা!
যারে চাই, অজানা সে রহস্য এমনি,
নয়নে লুকায়ে থাক্‌ নয়নের মণি;
তারি আলো ঘুচাইবে জগতের কালো,
তবু তারে দেখিব না—এই মোর ভালো!

নাগিলা



বহুকাল পূর্ব্বে মগধ দেশে আর্য্যবান রাষ্ট্রকূট ও রেবতী নামে এক দম্পতী বাস করিতেন। ভবদত্ত ও ভবদেব নামে তাঁহাদের দুইটী পুত্র ছিল। ভবদত্ত যৌবনেই জৈনাচার্য্য সুস্থিতির নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। একদিন ভবদত্তের এক গুরুভাই আচার্য্যের নিকট বলিলেন, "প্রভু, বাড়ীতে আমার এক ছোট ভাই আছে, সে আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। অনুমতি করিলে একবার বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে আপনার চরণে আনিয়া সঁপিয়া দিতাম।" আচার্য্য সুস্থিতি বিরুক্তি না করিয়া আর এক জন শিষ্যসহ তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

শিষ্যটী বাড়ী আসিয়া দেখে, ভাইয়ের বিবাহ উপস্থিত—উৎসবের কোলাহলে গৃহ মুখরিত। ছোট ভাই বিবাহের আনন্দে এতই উন্মত্ত যে একবার দাদার খোঁজখবর করাও প্রয়োজন মনে করিল না। শিষ্য মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

গুরুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন এই কাহিনী বর্ণন করিল, তখন ভবদত্ত বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "আহা, তোমার ভাইটী দেখিতেছি নিতান্ত গোঁয়ার; বিবাহের আনন্দে কি মানুষ গুরুর সৎকার করিতেও ভুলিয়া যায়?" কথাটা সকলের কাছে ভাল লাগিল না। এক জন স্পষ্টই ভবদত্তকে বলিল, "ভাই, তুমি যে জ্ঞানী ও পণ্ডিত, সে কথা আমরা জানি। তোমারও নাকি একটী ছোট ভাই আছে। একবার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে সাধু বানাইবার চেষ্টা করিয়া দেখ না। পরের সমালোচনটা তখন মুখরোচক হইত।" ভবদত্ত একটু বক্রকটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মগধে যদি কখনো যাই, তখন দেখিয়া নিও।"

কিছু দিন পর ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য্য সুস্থিতি ভবদত্তের বাসগ্রামের কাছে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ভবদত্ত গুরুর কাছে একবার গৃহে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। সুস্থিতি শিষ্যকে চিনিতেন, তাই সঙ্গী বিনা তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ভবদত্ত বাড়ী আসিয়া দেখেন, ভাইয়ের বিবাহ উৎসব। জ্ঞাতিবন্ধুরা তাঁহাকে পাইয়া আরও উল্লসিত হইয়া উঠিল। ভবদত্ত বলিলেন, "তোমরা অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত আছ, আমি স্থানান্তরে যাই।" কিন্তু তাঁহাকে কেহই ছাড়িতে চাহিল না। ভবদেব তখন অন্তঃপুরে, কুলাচার অনুযায়ী নববধূ নাগিলার প্রসাধন করিতেছেন—সুগন্ধি ফুলের মালা পরাইয়া কপালে চন্দনলেপ দিয়া কস্তুরীর তিলক রচনা করিয়া দিতেছেন, এমন সময় খবর আসিল, ভবদত্ত আসিয়াছেন। ভবদেব আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া চলিলেন, অর্দ্ধ-প্রসাধিত নববধূর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সখীরা বলিল, "একটু পরেই না হয় যাও, সাজটা শেষ করিয়া দিয়া যাও, নহিলে অকল্যাণ

হইবে।" ভবদেব "এখনি আসিতেছি" বলিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেলেন।

বাহিরে আসিয়া ভবদত্তের তেজঃপুঞ্জ সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভবদেব মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিলেন। ভবদত্তও একটী কথা না বলিয়া ভিক্ষাপাত্রটী তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া আসিলেন। কৌতূহলবশতঃ অনেকেই ভবদত্তের পিছুনে পিছুনে চলিল, বিমূঢ় ভবদেবও চলিলেন। ক্রমে সকলেই ফিরিয়া আসিল, কেবল ভবদেব ফিরিতে পারিলেন না, কেননা তাঁহার হাতে দাদার ভিক্ষাপাত্র। কি জন্য দাদা উহা দিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কোনও প্রশ্নও করিলেন না।

এতক্ষণ ভবদত্ত নির্ব্বাক ছিলেন। এইবার ভাইয়ের সঙ্গে সংসারের সুখ দুঃখের কথা উঠাইলেন। ভবদেবের বুকের বোঝা অনেকটা হালকা হইয়া গেল। কথায় কথায় দুই ভাই আচার্য্য সুস্থিতির নিকট উপস্থিত হইলেন। ভবদত্তের পিছুনে বরবেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে ভবদেবকে দেখিয়া গুরুভাইয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ভবদত্তের অধরকোণে চকিতের মত একটী সূক্ষ্ম হাস্য রেখা খেলিয়া গেল।

আচার্য্য সুস্থিতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবদত্ত, এ যুবক কে?" ভবদত্ত বলিলেন, "মহারাজ, এ আমার ছোট ভাই, আপনার শরণাগত।" বলিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে ভবদেবের মুখের দিকে তাকাইলেন। সুস্থিতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইবে?" ভবদেবের হৃদয়ে তখন তুমুল ঝড় বহিতেছে। নববধূ নাগিলার শঙ্কাব্যাকুল করুণ আঁখি দুটী তো তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না। ভবদেবের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি তেমনি প্রশান্ত সৌম্যদৃষ্টিতে উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের প্যানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। সে দৃষ্টি ভবদেব সহ্য করিতে পারিলেন না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার ভাই সন্ন্যাসী, মিথ্যাবাদী নন।" দীক্ষা হইয়া গেল।

আত্মীয়-স্বজনেরা ছুটিয়া আসিল, বলিল, "নববধূকে অমন করিয়া ফেলিয়া আসা কি তোমার উচিত হইয়াছে? কে তোমাকে এ কুবুদ্ধি দিল?" ভবদেবের পক্ষে আত্মসম্বরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিল, তথাপি ভাইয়ের গৌরব রাখিবার জন্য তিনি চুপ করিয়া সমস্ত বাক্যবর্ষণ সহ্য করিলেন। সকলে আসিয়া ভবদত্তকে ধরিল, ভবদত্ত বলিলেন, "ভবদেব নির্ব্বোধ নহে। তাহার ব্রতে আমি বিঘ্ন ঘটাইব কেন?" নিরাশ হইয়া সকলে ঘরে ফিরিয়া গেল।

কালক্রমে ভবদত্ত প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভবদেব তখন যৌবনের প্রান্ত সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখনও নাগিলাকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। সন্ন্যাস তাঁহার ঈপ্সিত ছিল না, শুধু ভাইয়ের মান রাখিবার জন্য তিনি এ পথে আসিয়াছিলেন। ভবদত্তের মৃত্যুর পর তিনি ভাবিলেন, "শুধু দাদার আগ্রহে এ বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুতে এখন আমি মুক্ত। নাগিলার সেই কাতর দৃষ্টি তো এখনও ভুলিতে পারিলাম না। সেই অভাগিনীও কি আমাকে ভুলিতে পারিয়াছে? দূর হোক্ ছাই, আর কতকাল এমন করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব? দেখি, যদি নাগিলা, এখনও বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহাকে লইয়া আবার সংসারী হইব।"

এই মনে করিয়া ভবদেব একদিন চুপি

চুপি আশ্রম ছাড়িয়া নিজগ্রামে আসিয়া এক দেবালয়ে আশ্রয় লইলেন। গ্রামে আসিয়া প্রথমেই দুইটী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করিল। ভবদেব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গ্রামে আর্য্যবান্ রাষ্ট্রকূট ও তাঁহার স্ত্রী রেবতী দেবী বাস করিতেন। তাঁহারা এখনো বাঁচিয়া আছেন কি?" এক জন স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "না, বহুদিন হইল, তাঁহারা স্বর্গবাসী হইয়াছেন।" অপর স্ত্রীলোকটী ভবদেবের কথা শুনিয়া যেরূপ অনিমেষদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিলে ভবদেব কি মনে করিতেন বলা যায় না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার পুত্র ভবদেব বিবাহের দিন স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, সেই স্ত্রী কি এখনও বাঁচিয়া আছে?"

এইবার দ্বিতীয়া নারী কথা কহিলেন, স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনিই কি সেই ভবদেব?" বোধ হয় তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া গেল। ভবদেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, আমিই ভবদেব। তুমি কে? তুমি কি আমার নাগিলা?" নাগিলা এ কথার কোনও উত্তর করিলেন না—আঁচলে চক্ষু চাপিয়া অবনতমুখী হইয়া রহিলেন। ভবদেব ব্যগ্রভাবে উঠিয়া প্রসারিতকরে দুই পা সম্মুখে অগ্রসর হইয়াই আবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। উদ্গত অশ্রু মুছিয়া নাগিলা শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?" ভবদেব ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে হয়, নাগিলা? তোমাকে ভুলিয়া কোথায় গিয়া আমি স্বস্তি পাইব?"

সাধ্বী নাগিলার চক্ষু দুটী দুঃসহ তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিরস্কার করিয়া তিনি কহিলেন, "ছিঃ, তুমি এত দুর্ব্বল, তাহা তো জানিতাম না? তুমি আমাকে সংসারসুখের অধিকারিণী কর নাই বটে, কিন্তু তোমার অপূর্ব্ব ত্যাগের গৌরবে আমি যে চিরগরবিণী ছিলাম। আজ ব্রতভঙ্গ করিয়া তুমি আমার চিরদিনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ—কেন, আমি তোমার কি করিয়াছি? আমাকে তুমি ভোল নাই, সে আমার পরম গর্ব্বের কথা; কিন্তু সে আমি কি এই রক্তমাংসের খাঁচাটা, যে এতদিনের সংযম ভুলিয়া ইহারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছ? বাহিরে তোমাকে হারাইয়া অন্তরে যে আরও নিবিড় করিয়া পাইয়াছি; দীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় প্রেমের এই রহস্যও কি তুমি বুঝিতে পারিলে না? বিবাহ-বাসরে যে দেবতা কামের বন্ধন ছেদন করিয়া প্রেমের সিংহদ্বার আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিলেন, তুমি তাঁহাকে ভাই বলিয়া জান, কিন্তু আমি তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানি। আজ এমনি করিয়া তুমি তাঁহার স্নেহের অপমান করিলে?"

ভবদেব অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুগপৎ প্রত্যাখ্যানের বেদনা ও অনুশোচনার গ্লানিতে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। নাগিলা উন্নতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি গুরুর কাছে ফিরিয়া যাও। আবার যদি কখনও শুনি এই গ্রামে আসিয়াছ, তাহা হইলে আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়া মরিব।" এই বলিয়া সাধ্বী ধীরপদে নয়নের অন্তরাল হইয়া গেলেন—একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না, ভবদেব সেখানে আছেন কি না।

ভবদেব আবার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা হৃদয়ের দুর্ব্বার বাসনা জয় করিতে ব্রতী হইলেন।

শিক্ষার টোট্‌কা

—*—

সরল হলেই সত্যবাদী হবে, এমন মনে করা ভুল। ছোট ছেলেদের সরলতা সম্বন্ধে এই রূপ ধারণা পোষণ করে অনেক সময় আমরা তাদের ক্ষতি করি। ছোট ছেলে সরল, কিছু বানিয়ে বল্‌তে পারে না, যেমনটী দেখে তেমনটী বলে—এটা একটা স্বাভাবিক গুণ হলেও শিক্ষার দ্বারা এরও উৎকর্ষ প্রয়োজন। সরল বলে যেমন ওরা বানিয়ে বল্‌তে পারে না, তেমনি একটা ঘটনাকে ঠিক ঠিক দেখতেও পারে না। সুতরাং একটা ঘটনাকে সংস্কার দিয়ে বিকৃত করে দেখা বড়র পক্ষে যেমন দোষের, ছোটর পক্ষেও তাই। ছেলেরা পরস্পরের নামে নালিশ করে। অন্যায় করে মিথ্যা নালিশ না করলেও শিক্ষক লক্ষ্য করে দেখবেন, অধিকাংশস্থলেই ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝে তারা অভিযোগ করতে পারে না। এ স্থলে অভিযোক্তার কথা নিছক সত্য মেনে বিচার করতে গেলে অভিযুক্তের মনে একটা ক্ষোভ জন্মে এবং উভয়ের মাঝে অমিলের সূত্রপাত হয়। এই জন্য নির্ব্বিচারে ছেলের কথা মেনে যাওয়াতে ওদেরই ক্ষতি হয়। যে সরলতাবশতঃ ওরা সত্য বলে, ঠিক সেই আদিম সংস্কারসুলভ সরলতাবশতঃ ওরা মিথ্যাও বলে। ন্যায়দৃষ্টিতে দেখতে গেলে ওদের সত্য মিথ্যার তুল্য মূল্য। কেমন করে সত্য কথা বল্‌তে হয়, সত্য করে দেখ্‌তে হয়, তাও শিখাতে হয়; আর যিনি এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করে দেখেছেন, তিনিই জানেন, ব্যাপার বড় সোজা নয়।

❋

একটা ছেলের সামনে আর একটা ছেলেকে উগ্রভাবে শাসন করলে অনেক সময় ওদের বিশেষ রকম ক্ষতি হয়ে যায়। উগ্র শাসনে মাত্রা ঠিক থাকে না—অপরাধটা হয়ত আসলের চেয়ে বাড়িয়ে তোলা হয়। ছেলেদেরও সুনাম দুর্নামের একটা মূল্য আছে। সকলের সামনে একটা ছেলেকে অপমান করে আনাড়ী শিক্ষক অনেক সময় একটা হিংস্র তৃপ্তি অনুভব করে বটে; কিন্তু অযথা একটা ছেলের সুনামের ক্ষতি করে তাদের সমাজে তাকে একঘরে করে তার উন্নতির পথ যে সে কতটা রুদ্ধ করে দেয়, সেটা কি খেয়াল করে? তোমার বিচারে প্রতিপন্ন হল, অমুক ছেলেটা নিরেট মিথ্যাবাদী; এই ধারণাটা তার সহবাসীদের মাঝে প্রচার করে একে তো অপরের সহানুভূতি হতে তাকে বঞ্চিত করলেই, তা ছাড়া অপর ছেলেগুলির মাঝে একটা কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের সত্যবিচারের শক্তিকেও পঙ্গু করে ফেললে। দুর্নাম মানুষে সহজে বিশ্বাস করে, এখন সে ছেলেই হোক, আর বুড়োই হোক; নিন্দা করা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি; পাপের সঙ্গে পাপীকে ঘৃণা করাও স্বাভাবিক। শাসনের সময় শিক্ষক হুঁসিয়ার থাকবেন, তাঁর ব্যবহারে এই সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি যেন ছাত্র সমাজে জেগে না ওঠে। দশটা ছেলের সামনে একটা ছেলেকে প্রচণ্ডভাবে শাসন করে তাকে একটা character করে তোলা অধিকাংশ শিক্ষকের একটা বদভ্যাস।

❋

অপরের সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় কি রকম ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন, এ বিষয় শিক্ষক নিজেও ভাববেন, ছেলেকেও শেখাবেন। আমাদের নীতিশাস্ত্রে দোষগুণ সকলেরই এক একটা সংজ্ঞা আছে। সবাই জানেন, দার্শনিক সংজ্ঞাগুলি ব্যাপক—প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ থাকা সত্ত্বেও একই নামে তাদের পরিচিত করা হয়। গুণের সংজ্ঞা এমন ব্যাপক হলে তার ব্যবহারে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু দোষের ব্যাপক সংজ্ঞাগুলিকে নির্ব্বিচারে ব্যবহার করাতে ক্ষতি আছে। একটা উদাহরণ দিই। ছেলেদের মাঝে শুনতে পাবেন, সামান্য কারণেই এ ওকে হয়ত মিথ্যাবাদী বলছে, কিম্বা চোর বলছে—আর তাই নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে। আমরাও কখনও তাদের লোভী, হিংসুক ইত্যাদি সংজ্ঞায় আপ্যায়িত করছি। এতে অনেক সময় যে দোষটা তাদের মাঝে মৃদুভাবে আছে, নামের সম্মোহনে তাকে প্রবল করে তোলা হয়। "ও না জেনে বলেছে,"—আর "ও মিথ্যাবাদী", "ও না বলে নিয়েছে, আর "ও চোর"—এই দুই প্রস্থ কথার মানসিক প্রভাবে ঢের তফাৎ আছে। দোষের সংজ্ঞা ব্যবহার করলে অনেক সময় ওটা যেন চরিত্রের ওপর হলমার্কা হয়ে বসে যায়। এতে যে সংজ্ঞা ব্যবহার করে, তারও যেমন চিত্ত দুষ্ট হয়, তেমনি যার প্রতি ব্যবহার করা হয়, তারও ক্ষোভের কারণ ঘটে। তা ছাড়া এতে সত্যপ্রকাশের বাধা তো আছেই। দোষের সংজ্ঞা ব্যবহারে ভাষার দিক দিয়ে সুবিধা আছে বটে, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে ক্ষতি তার চেয়ে ঢের বেশী। সংজ্ঞা একটা নিরেট বস্তু, তার মাঝে ক্ষমার অবকাশ নাই। কিন্তু সেই সংজ্ঞার প্রতিপাদ্য বিষয়ই যদি কেউ কথায় ভেঙ্গে প্রকাশ করে, তাহলে ক্ষমা করবার, ভালবাসবার একটা পথ পাওয়া যায়। ওপরের দুই একটা উদাহরণ নিয়ে বিচার করে দেখলেই শিক্ষক এটা বুঝতে পারবেন। এই জন্য বলি, অভিযোগের ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষক খুব সাবধান হবেন।

*

"এইটে করিস্"—এই বলে ছেলেদের ওপর কাজের ভার দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত থাকি, আর হিসাবমত কাজটা না পেলেই চটে যাই—শোধ নেবার ইচ্ছাটা মনের মাঝে অদম্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এ জায়গায় ভেবে দেখা উচিত, শিশুমনের পক্ষে আমার নির্দ্দেশ মত কাজ করবার কি কি বাধা ছিল। হয়ত আদেশের চেয়েও রুচিকর আর একটা কিছুতে তাকে অন্যদিকে আকর্ষণ করে নিয়েছে। আমিত্ববোধ যাদের ভাল করে জাগেনি—তাদের এমনি মন ছটকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বভাব শোধরাব কি শাস্তি দিয়ে?—না। বরং তাতে কাজে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তিটাই বেড়ে ওঠে, কেননা তার মন দোটানার মাঝে—স্বভাব আর শাসনের দ্বন্দ্বে অজ্ঞাতসারে স্বভাবটাই তার মাঝে জয়ী হবে। শেখাতে হবে কত সন্তর্পণে। কাছে বসে, প্রাণ বুঝে, কাজের ভাগ নিয়ে তবে রুচি জাগাতে হবে। নইলে ব্যস্ততার অবকাশে দু' একবার খবরদারী করেই যদি ভাবি, আমার হুকুম তামিল করতে ছেলে বাধ্য—তাহলে সে ভুলের দরুণ আশাভঙ্গের মনস্তাপ ভুগতেই হবে।

ভক্তির লক্ষণভেদ

বস্তুমাত্রেই শুধু স্বরূপতঃ আস্বাদযোগ্য, অতএব অনির্ব্বচনীয়। আস্বাদন আমার নিজস্ব অনুভূতি; অপরকে তাহা বুঝাইতে গেলে মূল ছাড়িয়া বাধ্য হইয়া অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হয়। মূলের অভিব্যঞ্জক এই অবান্তর প্রসঙ্গকেই বলা যায় লক্ষণ। এই লক্ষণ বিচারেই শাস্ত্র পরিপূর্ণ। নহিলে আসল কথা কি কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে? পরমবস্তুকে কি শাস্ত্র কখনও প্রকাশিত করিতে পারে?

তাহা হইলে শাস্ত্রের কি প্রয়োজনীয়তা নাই? আছে। যাহারা মূল ধরিতে পারে না, তাহাদিগকে স্থূল ধরিয়া বুঝাইতে হয়; জ্ঞেয় বিষয়ের আলোচনা হইতে অজ্ঞেয় বস্তুর ইঙ্গিত বুঝিয়া লইতে হয়। এই জন্য সাধকের পক্ষে শাস্ত্রোপদেশ বা শাস্ত্রবিধির অসীম উপযোগিতা। বিধিকে অক্ষরশঃ অনুসরণ করিয়া গেলে তদভিব্যঙ্গ্য তত্ত্বের স্ফুরণ হইবে, ইহা অযৌক্তিক নহে। ভক্তি বা প্রেমের লক্ষণবিচারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই আরোহপ্রণালীরই অনুসরণ করিব।

প্রেম বা ভক্তি প্রাণের টান। প্রাণের টান প্রাণে প্রাণেই বোঝা যায়—কথায় বা কাজে কখনও সঙ্কেতিত হইলেও হৃদয়ের মাঝে তাহা চিররহস্যে ঢাকাই থাকিয়া যায়। মুখে অনুরাগের কথা ফুটিয়া বলে না, আচরণে তাহা প্রকাশ করে না, তবু প্রাণ উজাড়িয়া ভালবাসে—এমনটী কি হয় না? তাহা হইলেই তো বুঝি, ভালবাসা কর্ম্মের অতীত, মনোবাণীর অতীত।

গুণবিক্ষোভশূন্য অন্তশ্চরী প্রীতি যদিও বা স্বরূপবস্থা হয়, তথাপি প্রাকৃতজগতে তাহার গুণময় স্ফুরণ দেখা যায়। আশ্রয়ভেদে ইহার প্রকারভেদ হয়। ভক্তিমার্গের ঋষিরা ভক্তির গুণময় স্ফুরণের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করিয়া ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন।

ভক্তিপথের আচার্য্যদিগের মধ্যে ব্যাস, গর্গ, শাণ্ডিল্য ও নারদ—চারিজন ঋষি ভক্তির যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে ভক্তির ক্রমিক বিকাশের ধারাটী সুন্দররূপে বোঝা যাইবে।

মহর্ষি ব্যাস বলিতেছেন—তৎপূজাদিষু অনুরাগঃ, ইহাই ভক্তির লক্ষণ। এই লক্ষণটী বুঝিতে হইলে ভক্তি বা প্রেমের মূল তত্ত্ব যে আত্মসমর্পণ, এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্ব্বত্রই আমাকে সঁপিয়া দিয়াই অনুরাগের চরিতার্থতা বটে; কিন্তু আমি বলিতে কি বুঝি, তাহা ধরিয়া তবে সমর্পণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিরূপিত হইবে।

'আমি' বলিতে সাধারণ বুদ্ধিতে একটী বিন্দুমাত্র বুঝি, কিন্তু ব্যবহারে 'আমি' বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অহং-তা ও মমতা যতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, ততটুকুই বাস্তবিক 'আমি'—কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সবটাই 'আমি'। এই আমির রাজ্যে বৈচিত্র্য আছে, বিরোধও আছে; ইহা হইতেই কর্ম্মের সৃষ্টি।

কেবল আমাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম করিলে উহা বাসনার বেগবশতঃ নূতন নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করিবে এবং কর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখের বিচিত্র আস্বাদন আমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাতে অনুরাগ-বিরাগ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার ফলে বিচিত্র সংঘাতজনিত অস্বস্তিও অপরিহার্য্য। অথচ কর্ম্মমূলা বাসনা দ্বারা অহং সম্পূর্ণরূপে গ্রস্ত থাকায় কর্ম্মপ্রবাহ রোধ করিয়া অস্বস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়ারও কোনও উপায় দেখি না।

কিন্তু উপায় আছে। সে উপায় কর্ম্মকে অহং লক্ষ্য হইতে পরাবর্ত্তিত করিয়া ত্বং লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। ইহাই পূজা বা সেবা। "যৎ করোমি, জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"—ইহাতেই পূজার সার্থকতা। কর্ম্ম করিতেই হইবে; কিন্তু যাহা করি, তাহা তোমারই পূজা—এই ভাব চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে পূজার সার্থকতা—ভক্তির আত্যন্তিক স্ফুরণ।

কিন্তু সমস্ত কর্ম্মকেই এইরূপ সেবাপূজায় রূপান্তরিত করা সাধনসাপেক্ষ। এই জন্য বিধি অনুযায়ী বাহ্যপূজারও প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য ইহা ভক্তির নিম্নতম অঙ্গ। আমাদের সমাজে অধুনা এই পূজারই প্রচলন বেশী। বাহ্যপূজা আংশিক কর্ম্মসমর্পণ, উহা চিত্তশুদ্ধির সহায়। সংসারের সব কাজই আমার জন্য, সব উপকরণই আমার তৃপ্তির জন্য—ইহার মাঝে একটু কাজ, একটু সেবা, একটু উৎকৃষ্ট উপকরণ ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে তুলিয়া রাখিলাম—ইহাই লৌকিকপূজার তাৎপর্য্য। কিন্তু এই পূজাতেও যদি অনুরাগ না থাকে, বিত্তশাঠ্য, গতানুগতিকতা, বাহ্যাড়ম্বর ইত্যাদিই প্রবল হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে কতটুকু ভক্তির উন্মেষ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেহ ও প্রাণ লইয়াই কর্ম্ম করি। ইষ্টে উহা সঁপিয়া দেওয়াই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ—ইহাই ব্যাসদেবের মত। এই সাধনার উৎকর্ষে ক্রমে পরম বস্তুও লাভ করিতে পারা যায়।

মহর্ষি গর্গ আরও একটু উপরের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, ভক্তি হইতেছে—"তৎকথাদিষু অনুরাগঃ।" যেমন দেহ ও প্রাণে অভিমান রাখিয়া কর্ম্ম, তেমনি মন ও বুদ্ধিতে অহং অভিমান রাখিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, চিন্তন ইত্যাদি আন্তর ব্যাপার। যাহারা মানসিক শক্তিশালী, বাহ্য কর্ম্মের অপেক্ষা তাহাদের ততটা প্রবল নহে। এইরূপ অধিকারীর পক্ষে বাহ্যপূজা না করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানই প্রশস্ত। কিন্তু ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে চরম ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রবণকীর্ত্তনকারী, কর্ম্মী অপেক্ষা বিশেষ কোনও লাভের অধিকারী হইবে। কেবল প্রকৃতি অনুযায়ী অধিকার নিরূপণ করিয়া শাস্ত্রে এইরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ফল সম্বন্ধে সকলেই তুল্যভাগী।

তবে আর একটা কথা হইতে পারে। বিভিন্ন ঋষিনির্দ্দিষ্ট পথগুলিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সাধন না করিয়া ক্রমানুযায়ী সাধনাও করা যাইতে পারে। যেমন বাহ্যপূজা নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রশস্ত। উহাতে চিত্তশুদ্ধি হইলে বাহ্যানুষ্ঠানের বাহুল্য ত্যাগ করিয়া মানসক্রিয়ার অনুষ্ঠানরূপ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করা হইল। শ্রবণাদিতে চিত্ত উন্নত হইলে শাণ্ডিল্যপ্রোক্ত আত্মরতিমূলা উপাসনার অধিকার জন্মিল ইত্যাদি। এইরূপে চারিজন ঋষির চারিটী পথকে একই সাধকের সাধনার স্তর অনুযায়ী গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে যে ঋষি যে মত প্রকাশ করেন, তিনি যে সেই মতানুযায়ী চলিয়াই সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়া

তবে উহা জনহিতার্থ প্রচার করিয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এইরূপে প্রত্যেকটী পৃথকে স্বয়ংপূর্ণ রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মহর্ষি গর্গের পর মহর্ষি শাণ্ডিল্যের অধিকার। তাঁহার মতে ভক্তি **আত্মরত্যবিরোধেন অনুরাগঃ।** ইহা পরম দার্শনিকের কথা। যাঁহাদের মাঝে কর্ম্মস্পৃহা ও দৈহিকশক্তির স্ফূর্ত্তি প্রবল নহে, কিম্বা মানসিকভাবাবেগও উদ্দাম নহে, যাঁহারা বিচারী ও বিবেকী, মহর্ষি শাণ্ডিল্য তাঁহাদিগের অধিকার অনুযায়ী ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তি যে প্রাণের টান, এ কথা তিন ঋষিই বলিতেছেন। কিন্তু এই টানটুকু কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে ইহা নিয়াই লক্ষণের ভেদ। ব্যাস ও গর্গের মতে প্রাকৃত তত্ত্বসমূহের সত্তা স্বীকার করিয়াই তাঁহাদের ইষ্টে সমর্পণ করা বা মোড় ফিরাইয়া দেওয়া—ইহাই হইল ভক্তি। আর শাণ্ডিল্যের মতে প্রাকৃততত্ত্ব হইতে নিজকে বিবিক্ত করিয়া সেই শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ লইয়াই অনুরাগের প্রবাহ ছুটাইয়া দেওয়া হইল ভক্তি।

উপনিষদের একটী কথা স্মরণ করিলে শাণ্ডিল্য ঋষির উক্তির তাৎপর্য্য বোঝা যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, "দেখ, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে; কিন্তু সে ভালবাসায় বাস্তবিক সে স্বামীকে চায় না, সে চায় নিজকে (ন পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি)।" এই উক্তিটী জ্ঞানজগতের একটী মহাসত্য। ভালবাসার বহির্ম্মুখী প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করিয়া তাহারই অনুকূলে সাধনোপকরণ সঞ্চয় করি। কিন্তু ভালবাসা যতটা বাহিরে যায়, তার শতগুণ যে ভিতরে পায়, ইহা যিনি নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। "গোপী হইতে কৃষ্ণের যত সুখ হয়। তাহা হইতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়।"—ইহা অনুরাগের স্বভাব। এই যে কোটীগুণ সুখ আস্বাদন—ইহাই আত্মরতি। ভালবাসিয়া পরকে যতটুকু আলোকিত করি, তাহার চেয়ে নিজে আলোকিত হই বেশী। তবে কথা এই, সমর্পণের পথে যাঁহারা চলিয়াছেন, তাঁহারা নিজের কথাটা আমলে আনেন না। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ভক্ত, বিচারের পথে যাঁহারা চলিয়াছেন, তাঁহারা নিজকে ভুলিতে পারেন না। বাঞ্ছিতকে তাঁহারা আত্মানন্দেরই ঘনবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। আমারই অন্তরের আনন্দ দিয়া প্রিয়জনকে আমি গড়িয়া তুলিয়াছি—দেহ-মন বুদ্ধির বাধাই দূর করিয়া নিজকে যত নির্ম্মলভাবে অনুভব করিতে পারিব, প্রিয়জনকে ততই চিন্ময়রূপে দর্শন করিবার অধিকার জন্মিবে। আত্মা দ্বারা আত্মার দর্শন—ইহা শাণ্ডিল্যের ভক্তির চরম। যে ভালবাসে, সেও আত্মা—যাহাকে ভালবাসে, সেও আত্মা।

ইহার পর মহর্ষি নারদোক্ত লক্ষণ বাকী রহিল। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব।



মুক্ত কে?

[প্রবক্তা—শ্রীমৎ স্বামী সমর্থ রামদাস]

কেহ কেহ বলে, "যে অদ্বয় ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কল্পনা যাঁহার নাগাল পায় না, তাঁহার উপদেশ পাইয়া সেই বস্তু ধারণা করিবামাত্রই শ্রোতা তদাকারকারিত হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার পর আবার বৃত্তির উদয়ও তো অবশ্যম্ভাবী। আলোচনা প্রসঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমরা উঁচে উঠিয়া ব্রহ্ম বনিয়া যাই, আবার পরমুহূর্ত্তে বৃত্তি-রাজ্যে নামিয়া আসি। উড়ন্ত পতঙ্গের পায় সূতা বাঁধিয়া দিলে সে উঁচুতে উড়িয়া যায় বটে আবার সূতার টানে তখনি নীচে নামিয়া আসে। এমনি করিয়া আমরাও কি বার বার উঠা-নামা করিব? উপদেশের সময় যখন তদাকার হইয়া যাইব, তখন নিশ্চয় এই দেহটা পড়িয়া যাইবে, কিম্বা এ আপন, ও পর, এমনতর ভেদভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। তা যদি না হয়, তাহা হইলে, "আমি কেবল ব্রহ্মস্বরূপ" এমন কথা বলা লজ্জার বিষয়। ব্রহ্মরূপ হইয়া সে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিবে, এ তো বিপরীত কথা। যে স্বতঃই ব্রহ্মরূপ, সে আবার আসে কি করিয়া? এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আমাদের ভাল লাগে না। হয় ব্রহ্মরূপে মিশিয়া যাও, নয়ত সংসারেই থাকিয়া যাও—নতুবা দুই দিক হইতে ধাক্কা খাইবে কত? অধ্যাত্মনিরূপণের চর্চ্চা শোনার সময় জ্ঞান প্রবল হয়, আবার তার পরেই জ্ঞান লয় হইয়া ব্রহ্মরূপকে কামক্রোধে ঘিরিয়া ফেলে। ইহাতে পূর্ণ স্বার্থও মিলে না, পূর্ণ পরমার্থও মিলে না। সংসারের কাজ করিবার সময় যদি ব্রহ্মে প্রীতি উৎপন্ন হয়, আবার ব্রহ্মানন্দকে ভোগের সময় যদি গৃহকার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে এই টানা-টানির মাঝে সুখ কোথায়? ইহাতে চিত্ত বরং আরও চঞ্চল হইয়া যায়। সার কথা এই, ব্রহ্মজ্ঞান আর সংসার এই দুয়ের মাঝে কখনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না।"

আমি ইহাদের জিজ্ঞাসা করি, "যে জ্ঞানী ব্রহ্ম বনিয়া গিয়া কাজকর্ম্ম না করিয়া জড়ের মত পড়িয়া থাকেন, তিনিই তাহা হইলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন? তাহা হইলে ব্যাস-দেবাদি কর্ম্মযোগীরা কি ডুবিয়া গেলেন?" উত্তরে তাহারা বলে, "বেদ বলিয়াছেন, কেবলমাত্র শুক ও বামদেব এই দুইজন অদ্যাপি মুক্ত। এই দুইজন ছাড়া আর সকলেই মুক্ত হইয়া আবার বদ্ধ হইয়াছেন। বেদের বচনকে আমরা অশ্রদ্ধা করি কি করিয়া?"

জিজ্ঞাসা করি, জগতে কেবল এই দুইটী মাত্র মুক্ত পুরুষ? আমি তো জানি প্রহ্লাদ, পরাশর, অম্বরীষ ইত্যাদি মহর্ষি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি দেবর্ষি ও বিদেহ জনকাদি রাজর্ষি ইত্যাদি কত মহাত্মা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। যদি বামদেব ও শুকদেব মাত্র মুক্ত, তাহা হইলে আর সকলেই কি ডুবিয়া গেলেন? এ তো মূর্খের প্রলাপ মাত্র। বলিতে পার, বেদ কি তাহা হইলে মিথ্যা বলিয়াছেন? আমি বলি, বেদ এই দুই জনকে

কেবল উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু সাধারণ লোক পূর্ব্বপক্ষকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। শ্রুতির জীবোদ্ধারের সামর্থ্য রহিয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সেই সামর্থ্য কি এই দুই জনের উদ্ধারেই নিঃশেষ হইয়া গেল ?

যিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া কাষ্ঠবৎ পড়িয়া রহিলেন, কেবল তিনিই মুক্ত, এমন কথা বলিলে তুমি নিজেই ঠকিয়া যাইবে। কারণ যে শুকদেবকে তুমি মুক্ত বলিতেছ, তিনিই নানা প্রকারে সকলের আত্মবোধ জাগাইয়া দিয়াছেন। এইটুকু তিনি করিলেন কি করিয়া ? বেদ তাঁহাকে মুক্ত বলিতেছেন—বেশ কথা ; কিন্তু তিনি তো ব্রহ্মাকার হইয়া সর্ব্বদা উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন না। শুকদেব যোগীশ্বর ছিলেন। যদি সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপে থাকিয়া জাগ্রদবস্থায় আর তিনি ফিরিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে সারাসার বিচার তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল কি করিয়া ? যে ব্রহ্মস্বরূপ হয়, সেই যদি লাকড়ী বনিয়া যায়, তাহা হইলে শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইলেন কি করিয়া ? তখন তো তাঁহাকে কত বিষয়ের সারাসার বিচার করিতে হইয়াছে, উদাহরণ জোটাইতে চরাচর সৃষ্টি ঢুঁড়িতে হইয়াছে। ক্ষণেকের মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মে অবগাহন করিতে হইয়াছে আবার পরক্ষণে সম্পূর্ণ দৃশ্য সৃষ্টি ঢুঁড়িতে হইয়াছে, কত দৃষ্টান্ত আনিয়া নিজের বক্তব্য বুঝাইতে হইয়াছে। এই শুকদেবকে বদ্ধ বলিবে কে ?

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও, কাষ্ঠবৎ পড়িয়া না থাকিয়াও সদ্‌গুরুর উপদেশে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করা যায়। জগতে কেহ মুক্ত, কেহ নিত্যমুক্ত, কেহ বা জীবন্মুক্ত এ কথা খেয়াল থাকে যেন। এখানে কেহ যোগী, কেহ বা বিদেহমুক্ত, কেহ বা সমাধানী। দেহাভিমানহীন হইয়া যাঁহারা এই জগতে সচেতন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত, যাঁহারা অচেতন, তাঁহারা বিদেহমুক্ত ; ইহা ছাড়া যাঁহারা যোগীশ্বর, তাঁহাদিগকে নিত্যমুক্ত বলিতে পারি। স্বরূপের বোধ হওয়ামাত্র যিনি স্তব্ধ হইয়া যান, তাঁহাকে তটস্থ বলিয়া জানিও। এই তটস্থতা ও স্তব্ধতার মাঝে দেহসম্বন্ধ কায়েম রহিয়াছে। (শিষ্যের মতে স্বরূপবোধ হওয়ার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাওয়াই মুক্তির লক্ষণ এবং চলাফেরা বন্ধের লক্ষণ। কিন্তু সদ্‌গুরুর মতে চলাফেরা করা বা স্তব্ধ কিম্বা তটস্থ থাকা—এ সমস্তই তো দেহের দরুণ দেহের ধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইবে। দেহবুদ্ধি থাকিতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না। যদি কেহ বলে, 'আমি মুক্ত', তাহা হইলে বাস্তবিক সে বদ্ধ।)

মুক্তির নিদান হইতেছে স্বানুভব—ইহা ছাড়া আর সমস্তই নিরর্থক। তোমাকে মাত্র স্বানুভব দ্বারা তৃপ্ত হইতে হইবে। স্বানুভবতৃপ্ত পুরুষই মুক্ত ; তাঁহার লোকব্যবহার দেখিয়া লোকে বদ্ধ বলিলেই বা কি ? আকণ্ঠতৃপ্ত ব্যক্তিকে যদি কেহ ক্ষুধাতুর বলে, তবে লোকের কথাতেই আর সে ক্ষুধাতুর হইয়া যায় না। স্বরূপে তো দেহ নাই-ই, তবে তাঁহার আর চঞ্চলতা বা স্তব্ধতা দ্বারা মুক্তের নিশ্চয় হয় কি করিয়া ?

বদ্ধ আর মুক্ত কল্পনা তো বাস্তবিক দেহ পর্য্যন্তই ; দেহাভিমান রাখিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। এমন কি, মুক্ততার ভাবনাও যে বদ্ধ-

তার লক্ষণ; মুক্ত ও বদ্ধ দুইটাই ব্যর্থ কল্পনা। সৎস্বরূপে বন্ধ কল্পনা নাই, এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধই; যেমন বুকে পাথর বাঁধিয়া কেহ সাঁতার কাটিতে পারে না, তেমনি মুক্তির অভিমান রাখিয়া কেহ সৎস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। যিনি অহং হইতে ছুটী পাইয়াছেন, তিনিই মুক্ত। তার পর তিনি মূকই হউন, আর বাচালই হউন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিব। কোনওকালে বিন্দুমাত্র বন্ধন সম্ভাবনা যাঁহার নাই, তাঁহার মাঝে মুক্তির ভাবনা আসে কোথা হইতে? যাহার বন্ধন হয়, তাহারই তো মুক্তি হইবে। এই ভাবে বিচার করিলে বোঝা যায়, যেখানে গুণসম্পর্ক রহিয়াছে, সেখানে সমস্তই ব্যর্থ।

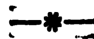
বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥

পরমশুদ্ধতত্ত্ব যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার কাছে বন্ধন-মুক্তির ভেদ নাই। বন্ধন ও মুক্তি দুটাই মায়ার খেলা। যখন নামরূপ নষ্ট হইয়া যায়, তখন মুক্তি কল্পনাই বা থাকে কোথায়? তখন তো বন্ধনমুক্তের সম্পূর্ণ বিস্মরণ ঘটে। প্রশ্ন করিতে পার, তাহা হইলে অমুক বদ্ধ, অমুক মুক্ত, এই কথাই বা আসে কোথা হইতে? ইহার উত্তর এই—একমাত্র দেহাভিমানই আমাদের বাধা। দেহাভিমানই জীবকে বাঁধিয়াছে। দেহকে আমি মনে করাই বন্ধন। এই জন্য লোকতঃ দেহাভিমানীকে বদ্ধ বলা হয়, এবং দেহাভিমানকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে মুক্ত বলা হয়।

কিন্তু বন্ধমুক্তি কল্পনা তো মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। মায়াতে এই মিথ্যা প্রতিভাস উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞানরূপী জাগৃতি উপস্থিত হইলেই এ মায়ার স্বপ্ন উড়িয়া যাইবে। স্বপ্নাবস্থায় বদ্ধ বা মুক্ত হইতে পার, কিন্তু জাগ্রৎদশায় কি তাহার অনুবৃত্তি চলে? স্বপ্নের তত্ত্ব যে জানে, সে আর স্বপ্নাবস্থায় পড়ে না; আত্মজ্ঞান হইলে সমস্ত লোকই মুক্ত। শুদ্ধজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে মুক্তি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেননা দেহবুদ্ধি নিয়াই বন্ধ মোক্ষের কল্পনা; কিন্তু মহাপুরুষেরা দেহাতীত বস্তু—এই জন্য তাঁহাদের বন্ধন বা মুক্তির কল্পনাই হয় না।



বাক্‌সংযম



"যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধঃ।"—শঙ্করাচার্য্য।
"আত্মানং বা বিজানীথ—অন্যাং বাচং বিমুঞ্চথ।"—শ্রুতি

বাক্‌সংযম চিত্তবৃত্তির নিরোধের মূল। বাক্‌সংযম না হলে ধ্যান কিছুতেই ফুটতে পারে না। বাকের সংযম শুধু কথার সংযম নয়—চুপ করে থাকা বা পরিমিত হিতবাক্য বলা নয়। এটা বাকসংযমের বহিরঙ্গ। বাক্‌তত্ত্ব না জানলে তাকে পরিচালিত করা সহজ হয় না। বেদ চারিটী বাকের কথা বলেছেন—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী।

বৈখরী মানে যা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত—এই যেমন আমাদের কথাবার্ত্তা। বৈখরী বাক্ হল স্থূলতম অভিব্যক্তি। এর মূলে যে সূক্ষ্মতর প্রেরণা রয়েছে, তাকে আয়ত্ত না করতে পারলে শুধু কথা না বললেই বাক্‌সংযম সিদ্ধ হবে না। অবশ্য প্রথম শিক্ষার্থীকে এই বৈখরী বাক্ রোধ করবার সাধনাই করতে হবে। তারই মানে নিছক্ চুপ করে থাকা। তবে চিন্তে যথার্থ ও হিতকর পরিমিত বাক্য প্রয়োগ করা—এ সংযমের আরও উন্নত স্তর; একটু ধীরভাবে চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবে।

বৈখরী বাকের স্থূল রূপ। বাক্ হতে জগৎ অভিব্যক্ত হয়েছে—এমনি একটা কথা শাস্ত্রে আছে। সেই হিসাবে বাক্ শক্তি, চৈতন্য তাতে অধিষ্ঠিত। বৈখরী বাকের অধিষ্ঠাতা বিরাট্। এটা সমষ্টি ভাবের কথা।

বৈখরীমূলে আছে তার সূক্ষ্মরূপ—মধ্যমা বাক্। এগুলো যেন চিন্তার ঢেউ। যখন বাক্যে প্রকাশ করি, তখন স্বভাবতঃ পদ-প্রত্যয়বিভাগ হয়ে যায়। যে কোনও একটা বাক্য ধরে বিচার করে দেখ, মূলে একটা অখণ্ড ভাব বা idea, তার বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে বাক্যের পদগুলি যেন এক একটা দিক আলোকিত করবার চেষ্টা করছে। আবার ভাবের এই বিভিন্ন দলগুলিকে একটী বোঁটায় গেঁথে রাখবার জন্য প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা জানেন, ভাষা যতই পুরাতন হয় (আমাদের ধারণায় মানুষের চিন্তা যত বহির্মুখী হয়), প্রত্যয়ের মাত্রা তত বেড়ে গিয়ে পদগুলি ততই বেশী ছিটকে পড়তে থাকে। বেদের ভাষা আর আধুনিক যুগের ভাষা তুলনা করলে বোঝা যায়, একটা কত জমাট, আর একটা কত বিস্রস্ত। যে কোন বাক্যপ্রতিপাদ্য বিষয়কে চিন্তায় আমরা এক দেখি; ভাষায় তাকে বহু করি। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রাও এই কথা স্বীকার করেন। চিন্তার মাঝে ভাষার এই সংহত আকৃতিই মধ্যমা বাকের স্বরূপ।

মধ্যমাতে পদপ্রত্যয়বিভাগ নাই, অথচ একটা ব্যাপারকে সমষ্টিরূপে ধারণা করবার শক্তি রয়েছে। চিত্তকে অন্তর্মুখী করে ভাষার এই মূল তত্ত্বটীকে আয়ত্ত করতে পারলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চার হয়, স্বল্পায়াসে বহু বিষয় নিখুঁতভাবে ধারণা করবার আশ্চর্য্য শক্তি জন্মে।

কিন্তু এই মধ্যমা বাক্‌কেও আমরা যথার্থ রূপে ধারণা করতে পারি না—বৈখরীকে এর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। তাই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভাষা আওড়ান চলে। তার ফলে সূক্ষ্ম চিন্তা আর স্থূল ভাষার সংমিশ্রণে বিকল্প জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। যেমন, "অনন্ত"—এই শব্দটী স্থূল, কিন্তু শব্দের উপর একান্ত নির্ভর করার বশে এর প্রতিপাদ্য সূক্ষ্ম অর্থের দিকে আমাদের মন যায় না অথচ একটা আবছায়া ধারণার উৎপত্তি হয়। ধ্যানের সময় এই-গুলিতে ভারী বাধা হয়।

অবশ্য বাক্য আর অর্থ সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকায় প্রথমাবস্থায় খুব উপকারও আছে। যেমন, "সোঽহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি"—ইত্যাদি কথা বলে বিশেষ কিছু না বুঝলেও, একটা জোর পাওয়া যায়। তবে ওইখানেই থেমে যেতে নাই। যে জোরটুকু পেলাম, তার মূল অনু-সন্ধান করতে হবে, শেষে শব্দানপেক্ষ হয়ে ভাব ধারণা করতে হবে।

ধ্যানের সময় এইটীই বিশেষ প্রয়োজন

হয়। কিন্তু বৈখরী বাক্‌নিরপেক্ষ চিন্তায় অভ্যস্ত না হলে ধ্যানে গুরুতর বাধা জন্মায়। এই জন্যই আচার্য্য বল্‌ছেন, শ্রুতি বল্‌ছেন, জ্ঞানের পথে চল্‌তে হলে প্রথমতঃই চাই বাক্‌সংযম। শুধু বৈখরী বাক্‌কে রোধ করা নয় মধ্যমা বাক্‌কেও তা হতে বিযুক্ত করা। যখন চুপ করে আছ, তখনও যতটা সম্ভব মনে মনে ভাষা ব্যবহার করবে না—ভাষানিরপেক্ষ হয়ে পিণ্ডাকারে বিষয় ধারণা করতে চেষ্টা করবে। চিত্তস্থৈর্য্য এই চেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলকথা, বাক্‌সংযমের এই গূঢ় তাৎপর্য্যের দিকে দৃষ্টি না দিলে ধ্যান সহজ হবে না।

সমষ্টি সূক্ষ্মবাক মধ্যমার অধিদেবতা হিরণ্যগর্ভ। ইনি প্রজাপতি—বিশ্বের architect। ইনি মনে মনে যা কল্পনা করছেন, তাই মধ্যমা বাক্‌। বেদ তাঁরই অভিব্যক্তি। মধ্যমার সঙ্গে বেদের গূঢ় সম্পর্ক, সে কথা আগেই বলেছি।

প্রথমতঃ বাক্‌তত্ত্ব এই পর্য্যন্ত জানলেই যথেষ্ট। এই জন্য আর দুটী বাকের সংক্ষেপে স্বরূপ নির্দ্দেশ করছি।

মধ্যমার পর পশ্যন্তী বাক্‌—এই হচ্ছে ঈশ্বর বাসনা। সবিকল্প সমাধিতে এই বাকের সাক্ষাৎকার হয়। ব্যষ্টিতে বলতে পারি, আমাদের মাঝে যে willforce, তাই পশ্যন্তীর রূপ, ইচ্ছা বা প্রেরণা চিন্তায় বিশ্লিষ্ট হয়ে বাক্যে ফুটে ওঠে। পাণিনীয় শিক্ষাতে শব্দাভিব্যক্তির আলোচনা কালে এ বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই তিনটী বাক্‌ নিয়ে জগৎ। প্রণবের সূক্ষ্মতর রূপ পশ্যন্তী। মূলাধার হতে কুণ্ডলিনীর সঙ্গে প্রণবের উত্থান কালে পশ্যন্তীর অনুভব হতে পারে।

তারপর পরা বাক্‌ জ্যোতিঃস্বরূপিণী—নির্ব্বিকল্পসমাধিগম্যা। এই হল প্রণবের তুরীয় রূপ।

এই কথাগুলি স্মরণে রেখে চিত্তকে একাগ্র করে ভাবকে শুদ্ধ করে বিচরণ করতে হবে, তবে প্রকৃত বাক্‌সংযম হবে।



বিপরীত

সেদিন বঁধু চাইলে যখন মৃদু মধুর হেসে—
ব্যথার বাঁশী বাজিয়ে গেলে সুখের বেশে এসে।
আজকে বাঁকা মুখের বাণী, কুটিল চোখের চাওয়া—
জাগ্‌ছে আশা প্রাণে কেন, নিবিড় হবে পাওয়া!
দুঃখ যে দাও আপন হাতে, সেই তো সুখের খনি—
ভালবাসার অবহেলা হল মাথার মণি!
বুঝেছি আজ—সব ভুলেছি, ভুলিনি সেই মুখ,
মরণ-সায়র মথনে তাই উথ্‌লে ওঠে বুক!



হিমালয়ের পত্র

জগদ্দেবী অধিত্যকা

ঘাসনশৃঙ্গের আশেপাশে সব জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে দেখে রামকে সে নন্দনকানন ছেড়ে আস্তে হল। নীচে ভারী সুন্দর একটা অধিত্যকায় তিনি নেমে এলেন, সেখানে সব সময় বায়ুর মুক্ত হিল্লোল। কত শাদা, হলদে যুঁই আর নানারকম ফুল সেখানে ফুটে রয়েছে। নানারকম জাম প্রচুর পেকে আছে। নূতন ছাওয়া কুটীরের পাশেই একটা সবুজ মাঠ দুটী নদীর মাঝ দিয়ে ওপারপানে উঠে গিয়েছে। সামনে ভারী সুন্দর দৃশ্য—জল বইছে, পাহাড়ের গা কচি পাতায় ছেয়ে গিয়েছে, বনানীর উপর দিয়ে সবুজের ঢেউ খেলে যাচ্ছে যেন। এখানে সেখানে পাথরের বড় বড় চট্টান রামের জন্য সিংহাসন পেতে রেখেছে। যদি ছায়ার দরকার হয়, শ্যামল নিকুঞ্জ তার আনন্দ শয়ন বিছিয়ে রেখেছে।

বনের রাখালেরা তিন ঘণ্টার মাঝে রামের জন্য এক পর্ণকুটীর সেজে দিলে। ছাউনীতে যাতে বৃষ্টিজল আটকায়, তার জন্য, তারা যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্র করেছে। রাত্রে খুব জোরে জল ঝড় এলো। তিন চার মিনিট পর পর বিদ্যুৎ চমকায়, তার পর এমন করে বাজ গর্জ্জে ওঠে যে সমস্তটা পাহাড় থরথর করে কেঁপে ওঠে। তিন ঘণ্টা ধরে এমনি করে ইন্দ্রদেবের বজ্রক্রীড়া চল্‌ল। অঝোর ঝরে জল ঝরতে লাগল। চাল দিয়ে জল পড়তে লাগল, ঝড় এসে ঘরখানাকে এমনি দোলা দিতে লাগল যে সব সময় ছাতা মেলে মেলে রেখে তবে বৃষ্টির হাত থেকে পুঁথি-পত্রগুলো বাঁচান গেলো। কাপড়চোপড় একেবারে ভিজে গেল। জমী ঘাসে ঢাকা বলে কাদা হল না বটে, কিন্তু চাল ফুটো করে অনবরত এত জল পড়ছিল যে মেঝেতে আর তা শুষে নিতে পারল না। মৎস্য আর কূর্ম্মের অবস্থাটা রাম তখন বেশ উপভোগ করছেন। একরাত্রির দরুণ এমনি জলচর হ'য়ে গিয়ে বেশ একটা আনন্দ হচ্ছিল।

ফারসী কবি গেয়েছেন, "তোমার পরিপূর্ণ আয়ুষ্কাল হতে একটা রাত আলাদা করে নাও—সে রাতটা আর ঘুমিও না।" যে রাত বঁধুর সঙ্গে এমনি করে মিলিয়ে দেয়, তাকে আশীর্ব্বাদ করি।

> মহে চনবাদ্রিবঃ পুরা শুল্কায় দেয়াম্।
> ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিব ন শতায় শতামঘ

'হে আদ্রিগরিক, হে বজ্রবান্, শত পাই, সহস্র পাই, অযুত পাই, তার শতগুণও যদি পাই, তবুও তোমায় ছাড়ছি না। কোনও উপকরণের মূল্য নিয়েও তোমায় ছাড়ছি না—হে অসংখ্যদানের রাজা!

> যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্।
> অতস্ত্বা গীর্ভি দ্যুগদিন্দ্র কেশিভিঃ সুতাবাঁ আবিবাসি॥

রামের ব্যাখ্যা—হে শক্র (সর্ব্বশক্তিমান্), তুমি দূরে থাক (গর্জ্জনশীল মেঘমালায়) অথবা হে বৃত্রহন্ (সংশয়হারক), তুমি কাছেই থাক (গর্জ্জনশীল বাতাসে,

বিক্ষোভে); এই দেখ স্বর্গভেদী গীতগুলি দীর্ঘকেশ ভুবঙ্গের মত তোমার অভিমুখে প্রেরণ করি; তুমি তাকে আরোহণ করে এস। আমার জীবন নিঙড়ে সোমরস করে রেখেছি. এস অন্তরে হৃদয়ে বস, আমার প্রাণের সোমধারা পান কর।

ক্ষুদ্র ভয় আর তুচ্ছ খবরদারীতে মানুষ তার জীবন কাটাবে, এই কি জীবনের তাৎপর্য্য? সারাদিন কেবল ভাবনা—ভাবে কি করে দিন যাবে, আমার কি হবে! বোলা সব! পশুপাখীর মাঝে যতটুকু আত্মমর্য্যাদা আছে, এমন কি গাছের যতটুকু আছে, অন্ততঃ ততটুকু ও তো মানুষের থাকা উচিত। ওরা তো ঝড়ে রৌদ্রে খুঁৎখুঁৎ করে না—প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে থাকে। এই ঝড় বাদল—এই তো আমি—এই তো আমি। আমি ডঙ্ক হানছি। আমি গর্জ্জন করছি। আমি কি সুন্দর, কি ভীষণ, কি সবল! হৃদয় হতে উপচে পড়ছে—

শিবোহং শিবোহং!

আ মেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥
ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢা মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥

এমন দিন যায় না, যে দিন খুব তোড়ে বৃষ্টি না আসে। কালিদাসের এ প্রথম শ্লোক-টীর বর্ণনানুযায়ী চড়াচড় করতে গিয়ে আমাকেও কখনও কখনও বৃষ্টিতে পাকড়াও করে। কিন্তু কাছে তো আর গুহা নাই যে আশ্রয় নেওয়া যাবে। কাজেই মেঘকেই তখন ছাতা করে নিয়ে মনে করতে হয়, এ বর্ণন আমারই।

দ্বিতীয় শ্লোকে যে দেবদারুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তারা কত সুখী। তারা কাঁপছে, তবু গঙ্গাশীকরের শীতলসম্পাত বুক পেতে নিচ্ছে!

আহা, ঝটিকার করুণ স্পর্শ আর তুষার পাতের নিবিড় শৈত্যের কাছে বুক পেতে দেওয়া কত বড় ভাগ্যের কথা।

সহস্রচক্ষু তাল

যত্রৈকদেশাবচিতাবশেষা-
ণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ॥
পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি
প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ময়ূখৈঃ॥

—অতি উচ্চে, হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে প্রশান্ত সরোবরে কমলেরা ঘুমিয়ে আছে। উত্তরা-কাশ আলোকিত করে রয়েছেন সপ্তর্ষি, তাঁরা নিজ হাতে তাদের চয়ন করে দু'চারটী বাকী রেখে দেন। সকালবেলায় সূর্য্য যখন প্রভাতী কিরণ ঢালেন, তখন তাঁর অরুণ রাগের দীপ্তি-ভরা চুম্বনে উপর থেকে এই আধফোটা কমল বালাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়, নবীন সুষমায় তারা আবক্ত হয়ে ওঠে।

গগনস্পর্শী পর্ব্বতপঞ্জরের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলছি—নীচে ভূর্জ্জ গাছের বন দিগন্তের কোলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে লুটিয়ে পড়ছে, ডাইনে বাঁয়ে পুষ্পমণ্ডিত গিরি-শৃঙ্গ। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মখমলের মত নরম ঘাসের গদী আঁটা, তাতে ছোট ছোট ফুলের মেলা—চলতে গেলে তারা পায়ে জড়িয়ে ধরে। দূরে কৈলাস শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে—তার বেগশালী প্রপাতের রজতোচ্ছ্বাস এখান হতেও চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট

কস্তুরী হরিণ বিদ্যুতের মত তোমার সামনে দিয়ে ছুটে যায়—চাঁদ যেন তাদের পিঠে সোওয়ার হলে মানায় ভাল। এই এদিকে, এই ওদিকে বিশাল বিচিত্র পাখা মেলে দিয়ে প্রকাণ্ড গরুড়েরা পথিককে হঠাৎ চমকে দিচ্ছে। চলতে চলতে মাঝে থেমে গিয়ে কৈলাসের ব্রহ্মকমল দুটী একটা কুড়িয়ে তুলি—তাদের পাপড়িতে যেন গন্ধ আর সোনা ঢেলে রেখেছে। কোথাও কোথাও মসার, গুগ্‌গুল ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জমে আছে, লোকে মহা উৎসাহে সেগুলো খুঁড়ে তুলছে। আমরা স্তোত্র গাইতাম আর প্রণবধ্বনি করতাম।

সে স্থানটী সংসার কোলাহলের বহু ঊর্দ্ধে। কৈলাসের নির্ম্মল নির্ঝরে হাওয়া ঝিলের বুকে ঢেউ খেলিয়ে বইছে—গভীর সুশীতল ঝিলগুলি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ উদার বিস্তার নিয়ে পড়ে আছে। চারিদিকে শুভ্র [illegible] তুষারের মেলা। সব মিলে যেন একখানা প্রকাণ্ড দর্পণ—সদ্য প্রস্ফুটিত আরক্ত তপন তাঁর মুখ দেখবেন বলে। এমনি নির্জ্জন তুষারশৃঙ্গে সূর্য্যদেবের জৌলুষের খোলতাই হয় বটে। এত উঁচুতে তো গ্রাম থাকবে না, ঘর থাকবে না। রাত কাটাতে হত গুহার মাঝে, বাতাসও যেন সেখানে স্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

আঃ, এই তো অহঙ্কারতপ্ত দেহাত্মবোধের গণ্ডসম ভূমিকে পেছনে ফেলে এসেছি। এখানে শুধু তপন পবনে কোলাকুলির আনন্দ—কেবল একমেবাদ্বিতীয়মের নিবিড় আনন্দের মাঝে সঙ্গীতের নিক্কণ। ওম্—ওম্।*

* শ্রী—স্বামী গাঙ্গুলী

রূপান্তর

ওরে ভোলা, আঁখি মুদি, মনের দুয়ার রুধি.
খুঁজেছিস্ কারে?
ছাতি-ফাটা পিয়াসায় ফিরেছিস কি আশায়
অজানার পারে?
বাসনার বৃন্ত পরে, ফুটেছে যে থরে থরে,
কবে সে গিয়েছে ঝরে, দেখিসনি চেয়ে ;—
অরূপা সে রূপে রূপে, মিশে আছে চুপে চুপে,
তারি আরতির ধূপে গেছে আজি ছেয়ে
বিজন দেউল খানি ;— তারি বুকভরা বাণী
নব অনুরাগে
তটিনীর কলগীতে, বিহগের কাকলীতে
পুলকে ছলকি চিত্তে মৌন হয়ে জাগে।

সেৱাৰ সহজ উপায়

—*—

সেৱাই একমাত্র আত্মোন্নতিৰ সহজ উপায়। সেৱাৰ অভাৱতে আজি সমাজ বোলা, ব্যক্তি বোলা, সকলো শ্ৰীহীন। পৰস্পৰ মিলনপ্ৰীতি নহলে, সহানুভূতি নহলে, শান্তি ক'ত ? আজি-কালি প্ৰায় সকলোকে স্বাৰ্থপৰ দেখা যায়। তাৰ পৰা দেশৰ ও নিজৰ যে কি সৰ্ব্বনাশ হৈছে, তাক কোনেও ভাবি নেচায়। গাঁৱে গাঁৱে নগৰে নগৰে যদি কিছুমান উদ্যোগী মানুহ সঙ্ঘবদ্ধ হৈ দেশৰ ও দহৰ সেৱাত নিযুক্ত হয়, তেন্তে দেশৰো উন্নতি হয়; নিজৰো আত্মমুক্তিৰ পথ পৰিষ্কাৰ হয়।

এদিন এজনে এজন মহাপুৰুষৰ কাষলৈ গৈ সুধিলে,

"আত্মমুক্তিৰ সহজ উপায় কি ?"

"নাৰায়ণসেৱাই একমাত্র সহজ উপায়।"

"ঈশ্বৰ নিৰাকাৰ, তেওঁৰ সেৱা কিৰূপে সম্ভৱে ?"

"দন্ত্য ন'ত হ্ৰস্ব ইকাৰ নহয়, দীৰ্ঘ ঈকাৰ। ঈশ্বৰ 'নীৰাকাৰ' অৰ্থাৎ পানীৰ আকাৰ। পানী যি পাত্ৰত থোৱা যায়, সেই পাত্ৰৰে আকাৰ ধৰে, ঈশ্বৰো তদ্ৰূপ। তেওঁ যেনে আধাৰত থাকে, তেনেকুৱাই তেওঁৰ আকাৰ। তাৰ পাচ'ত তোমাক আচল কথা শিকাই দিওঁ,—তুমি সদায় বানন কৰিবা ন'ত দীৰ্ঘ ঈকাৰ দি, 'নীৰাকাৰ'; এই দৰে বানন কৰোতে কৰোতে এদিন হঠাৎ দেখিবা, নীৰ বা পানী শুকাই গ'ল,—নন শূন্য হ'ল, তোমাৰ দীৰ্ঘ ঈকাৰ হ্ৰস্ব হৈ পৰিল; তোমাৰ মুখেদি বানন হব তেতিয়া 'নিৰাকাৰ', দীৰ্ঘ ঈকাৰ একেবাৰে হ্ৰস্ব হ'ল তোমাৰ অলক্ষ্যে. তেতিয়া কৰিবা কি জানা ? সদাই সেই হ্ৰস্ব ইকাৰ দিয়েই বানন কৰিবা 'নিৰাকাৰ।' বানন একোতেই নেৰিবা। তাৰ পাচত হঠাৎ এদিন তোমাৰ হ্ৰস্ব ইকাৰ আৰু দীৰ্ঘ ঈকাৰ সব গুচি যাব। তেতিয়া তোমাৰ মুখত ওলাব নৰাকাৰ। ন'ত হ্ৰস্ব ইকাৰ নাই, দীৰ্ঘ ঈকাৰো নাই। সেয়ে হ'ল আচল বানন—বুজিলা ? ঈশ্বৰ প্ৰথমে 'নীৰাকাৰ' পাচত 'নিৰাকাৰ' অৱশেষত 'নৰাকাৰ'। নৰ শব্দে মানুহ। সব মানুহতে ঈশ্বৰ দৰ্শন হব তেতিয়া। মনত ৰাখিবা তেওঁ নৰাকাৰ; নৰেই নাৰায়ণ। নৰৰ পূজা, নৰৰ সেৱাই হব নাৰায়ণ সেৱা। চিৰদিন এই নৰ নাৰায়ণ সেৱা কৰা; মানুহৰ মুখতেই ঈশ্বৰৰ শোভা পায় বেচি। অৰূপী নাৰায়ণ নৰৰূপেহে বিৰাজ কৰিছে। মই তোমাক সাৰ কথা কলো,—মানুহক ঘিণ নকৰিবা, মানুহৰ কাৰণে প্ৰাণ দিবা, মানুহৰ সেৱা কৰিবা। জীৱনত আৰু একোৰে প্ৰয়োজন নাই তোমাৰ—সাধন ভজনৰ সাৰ কথা নৰ নাৰায়ণ সেৱা।"

সেৱা চাৰি প্ৰকাৰ। ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এই চাৰি ভাৱৰ সেৱা। অজ্ঞানীক জ্ঞান দিয়া ব্ৰাহ্মণ ভাৱৰ, আতুৰক ৰক্ষা কৰা ক্ষাত্ৰিয় ভাৱৰ, দুখীয়াক অন্নবস্ত্ৰাদি দিয়া বৈশ্য ভাৱৰ ও ৰোগীআদিৰ পৰিচৰ্য্যা শূদ্ৰ ভাৱৰ সেৱা। যি যি ভাৱে পাৰে, সেইভাৱেই সেৱা কৰা উচিত। মূলত লাগে ত্যাগ।

ত্যাগেই হ'ল সেৱাৰ প্ৰাণ। অজ্ঞানীক জ্ঞান দি সেৱা কৰাই হ'ল উত্তম। দেশত আজি-কালি সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ অভাৱ। দেখিছা, তোমাৰ আগত কত ৰোগী বিনা চিকিৎসা বিনা পৰিচৰ্য্যাই মৃত্যু মুখত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কত বিধবা, পোৱা-কন্যাই এমুঠি অন্নৰ অভাৱত, এখন বস্ত্ৰৰ অভাৱত গছৰ তলত বা জুপৰিত পৰি চাতি ফুতি কৰিছে; দেখিছা কত দুৰ্ব্বলিয়ে বলীৰ অত্যাচাৰত বিপন্ন হৈছে, দেশত শতকৰা নেকনৈই জন মানুহে শিক্ষাৰ অভাৱত, অজ্ঞানান্ধকাৰত থাকি কলৌজপৌ, মায়ামোহত জৰ্জ্জৰিত। শিক্ষাৰ দোষত স্বাস্থ্য, বল, বীৰ্য্য, ধৰ্ম্ম, নীতি, নিয়ম পাহৰি নিস্তেজ, দুৰ্ব্বল, ৰোগী, ভীৰু হৈ অশান্তি ভোগ কৰিছে। এইবোৰৰ নিবাৰণত যদি কিছু লোক সঙ্ঘবদ্ধ হৈ দৃঢ় সংকল্পেৰে লাগি যায়, তেন্তে দেশৰ সৰ্ব্বতোভাৱে উন্নতি অৱশ্যম্ভাৱী। এনেবোৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰাই হ'ল মানুহৰ কৰ্ত্তব্য। ইয়াৰ দ্বাৰা আত্মাৰ উন্নতি হয় বিশেষৰূপে।

সেৱাই হওক তোমাৰ ব্ৰত; ত্যাগেই হওক তোমাৰ মন্ত্ৰ। ত্যাগমন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈ যদি সেৱাধৰ্ম্মত লাগিব পাৰা, তেন্তে তোমাৰ দ্বাৰা জগতৰ এনে কাম হব পাৰে, যি কাম তেজাৰ [illegible] স্বাৰ্থপৰ মনুষ্যৰ দ্বাৰা হব নোৱাৰে। মনত ৰাখিবা ত্যাগৰ সমান শক্তি নাই। এই মন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈয়ে আমাৰ পূৰ্ব্বপুৰুষ ঋষি সকলে জগতক জ্ঞানৰ দীপ জ্বলাই উজ্জ্বল কৰিছিল। স্বাৰ্থপৰ লোকৰ সুখ ক'ত? সন্তোষেই বা ক'ত? যাৰ পৰৰ দুখত দুখ নহয়, পৰৰ কষ্টত সহানুভূতি নহয়, সি কি মানুহ?

সঙ্ঘবদ্ধ হলে এটা বিশেষ শক্তি হোৱা যায়। যদি সঙ্ঘবদ্ধ হবলৈ মানুহ নোপায়, তেন্তে তুমি নিজেই ব্ৰতী হোৱা। যদি তুমি প্ৰাণেৰে সেৱা কৰা, তেন্তে তোমাক ভগৱানে সহায় কৰিব। তোমাৰ জীৱন যুদ্ধৰ সাৰথি তেওঁ স্বয়ং নাৰায়ণ। স্বয়ং যাৰ সাৰথি, তাৰ আকৌ ভয় কি? কিছুমান ধৈৰ্য্য ধৰি যদি সেৱা কৰিব পাৰা, তেন্তে দেখিবা— প্ৰত্যক্ষ দেখিবা, নাৰায়ণ তোমাৰ হৃদয়ত বহি তোমাক কিদৰে পৰিচালিত কৰিছে; তেতিয়া তোমাৰ বিপক্ষ সৈন্য, যি তোমাৰ মতৰ বিৰুদ্ধ, সিও আহি তোমাৰ লগত যোগ দিবহি। উদ্যমেই হ'ল সাফল্যৰ ভেটি। ধৈৰ্য্যই হ'ল অস্ত্ৰ। এই অস্ত্ৰ লৈ যদি কুৰুক্ষেত্ৰৰূপী সেৱা-ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰত অৱতীৰ্ণ হৈ ত্যাগমন্ত্ৰক সজাগ ৰাখি চলিব পাৰা, তেন্তে তোমাৰ সাফল্য ধ্ৰুৱ, জয় অনিবাৰ্য্য।

বহুতে ভাৱিব পাৰে যে সেৱা কৰিবলৈ হলে, দেশত কোনও হিতানুষ্ঠান কৰিবলৈ হলে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন। অৰ্থ নহলে বহুতে ভাবে যে কোনো কাৰ্য্য কৰিবৰ শক্তি নেথাকে। এওঁলোকে অৰ্থকে মূল বুলি ভাবে, কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে অৰ্থ মূল নহয়, প্ৰাণ হে মূল। প্ৰাণেৰে যদি এটা কামত ধৰা যায়, তেন্তে অৰ্থ আপোনা-আপুনি আহে; অৰ্থৰ কাৰণে ভাবিব নেলাগে। ধৈৰ্য্য ধৰি, শুদ্ধ ভাবে কামত নেম্নানেপেৰা কৈ লাগিলে সাফল্য হোৱাত কোনো সন্দেহ নাই। নিজক মহান্ কৰা, দুৰ্ব্বলতা দূৰ কৰা, বীৰৰ দৰে মহৎ কাৰ্য্যত লাগি যোৱা। তুমিতো দুৰ্ব্বলী নোহোৱা, যাৰ প্ৰাণ আছে, উদ্যম আছে, যাৰ অধ্যৱসায় আছে সি কিয় দুৰ্ব্বলী হব? ধৈৰ্য্য ধৰি কাম কৰা, ভগৱান তোমাৰ সহায়; শুভ কাৰ্য্যত সদায় ভগৱানে তোমাক সহায় কৰিব। অৱশ্যে

অৰ্থৰ যে প্ৰয়োজন নাই, এনে নহয়; কৰিব পাৰিলে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ এটা ভাল উপায় আছে। ধৈৰ্য্যেৰে যদি কৰিব পৰা যায়, তেন্তে অচিৰে অৰ্থৰ অভাব নেথাকে।

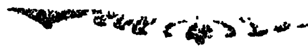
ভাৰতবৰ্ষত এটা বিশেষত্ব আছে। পাশ্চাত্য দেশৰ দৰে ভাৰত চহকী নহয়; কাৰণ এই দেশ কৰ্ম্মভূমি, আন দেশ হল ভোগভূমি। ভাৰতত জন্ম লৈ কৰ্ম্মযোগৰ সাধন কৰি আত্মমুক্তি লাভ কৰাই হল শ্ৰীগুৰুৰ ইচ্ছা। আৰু এক কথা, এজনে দহ টকা দিয়াতকৈ দহজনে দহ টকা দি এটা কাম কৰাৰ মূল্য বেছি। গতিকে যা'ত ভগিয়াৰ পৰা চহকী-লৈকে সকলোৱে সমভাবে যোগ দিব পাৰে, এনে ব্যৱস্থা কৰাত শ্ৰেয়ঃ—যদিও খাটনী লাগিব বেছি। বৰ্ত্তমান অৱস্থাত মুষ্টি-ভিক্ষা এটা ভাল অনুষ্ঠান। ভাৰতৰ বহুত ঠাইত এই অনুষ্ঠান দ্বাৰা বহুত উচ্চৰ ডাঙৰ কাম সম্পন্ন হোৱা দেখা গৈছে। যদি কিছুমান ডেকাই ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ বলি দি মহৎ স্বাৰ্থসিদ্ধৰ হ'কে আত্মনিয়োগ কৰি মুষ্টিভিক্ষাৰ প্ৰচলন কৰে, তেন্তে দেশৰ ও দহৰ উপকাৰ হব বেছি। সজ্জবদ্ধ হৈ গাঁৱে গাঁৱে নগৰে নগৰে মুষ্টিভিক্ষা প্ৰচলন কৰি সেবাৰ সাৰ্থকতা প্ৰচাৰ কৰা। ঘৰে ঘৰে মুষ্টিভিক্ষা কৰা। এই কাৰ্য্যত অন্যে সাহায্য কৰে ভালেই, যদি নকৰে অকল এজনেই লাগি যোৱা। যি পাৰা ধৈৰ্য্যেৰে ক'ৰ থাকা; প্ৰথমে যদি কোনো লোকে মুৰুজ ভাবক উপেক্ষা কৰে, কৰক—নিৰুৎসাহ নহবা। ধৈৰ্য্যেৰে কাম কৰি থাকা। মনত ৰাখিবা, সৎ উদ্দেশ্যে যেয়ে যিহকে কৰে, ভগবান্ স্বয়ং তাৰ সহায়। ভয় কি তোমাৰ? অনন্ত জীৱন পাই আছা মনুষ্যত; ধৈৰ্য্য ধৰি লাহে লাহে কাম কৰা, অচিৰে তোমাৰ অৰ্থ সংগ্ৰহ হব, লগে লগে তোমাৰ সহায়কো হব বহুত।

আজিকালি মানুহ বৰ স্বাৰ্থপৰ। যদি এমুঠি চাউল নিবলৈকো মানুহে আপত্তি কৰে, এনে আশঙ্কা বহুতৰ হব পাৰে। কিন্তু সেই ভয় নাই। ভাৰতত—অন্ততঃ হিন্দুৰ ঘৰত সেই ভয় নাই। যেয়ে যিমানেই ভগিয়া হওক, কৃপণ হওক, কিন্তু অভ্যাগতক, ভিক্ষুকক প্ৰত্যাখ্যান নকৰে কোনেও; কাৰণ হিন্দু মাত্ৰেই ধৰ্ম্মভীৰু। আগন্তুকক বিফলে পঠালে যে গৃহস্থৰেই অমঙ্গল।

কিন্তু ভয় হয়, ভিক্ষাৰী বুলি মানুহে যদি ঘিণ কৰে, নেওচা দিয়ে। যি নিজৰ কাৰণ ভিক্ষা কৰে, সি ভিক্ষাৰী। ভিক্ষাবৃত্তি বৰ বেয়া হয়, কিন্তু তুমি তো নিজৰ কাৰণ ভিক্ষা নকৰা—কৰিবা পৰৰ কাৰণ দেশৰ কাৰণ। যি পৰৰ কাৰণ ভিক্ষা কৰে, সি ত্যাগী। ত্যাগীৰ অৱমাননা যি কৰে, সি কি হিন্দু? তুমি কি দেখা নাই, গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই ত্যাগীৰ প্ৰশংসা কিদৰে কৰিছে? ত্যাগেই মানুহৰ মনুষ্যত্ব। সেইবাবে কোনো ভয় নাই তোমাৰ। যোৱা, তোমাক কোনেও প্ৰত্যাখ্যান নকৰে। কোনোৱে নেজানি একো কৰিলেও সহ্য কৰিব, ভগবানৰ ওচৰত তাৰ প্ৰনতি প্ৰাৰ্থনা কৰিবা—তাক বুজাবা। বুজিলে কোনেও বিমুখ নকৰে; বৰং সহানুভূতি দেখুৱাবেই সম্ভব বেছি।

মুষ্টিভিক্ষা দিয়াত তো গৃহস্থৰ লোকসান নাই। প্ৰতি সাঁজে এমুঠি কৈ খোৱা লগৰ পৰা চাউল দিব, তাত লোকচান কি? এটা মগনীয়ায়েও দিব পাৰে। এমুঠি চাউল কম বেছি হলে কাৰো খোৱাত কমবেছি নহয়; কাজেই গৃহস্থৰ কোনো লোকচান নাই

বহুতে লাভৰ দিকতো চাব পাৰে হয়। লাভৰ আশা নেৰেখিলে মানুহে আপত্তি কৰিব পাৰে হয়। কিন্তু তাৰ উত্তৰত কওঁ, চাউল এমুঠি দিব, তাত লাভ লোকচানৰ হিচাব কৰা সুবুদ্ধিৰ কাম নহয়। দান কৰোঁতে ফলৰ আশা কৰিব নেপাই। তাত ধৰ্ম্মৰ হানি হয়। হিন্দু ধৰ্ম্মত যাৰ বিশ্বাস, যি প্ৰকৃত গৃহস্থ, সি কেতিয়াও দানৰ প্ৰত্যাশা কৰিব বুলি মনে নধৰে। তথাপি তাৰ লাভ আছে। প্ৰথমেই হল ধৰ্ম্মলাভ; দ্বিতীয়তঃ হল সেৱা লাভ। ধৰ্ম্মলাভ হল—গুৰু অতিথি অভ্যাগত আদিক আগেয়ে খুৱাই পাচত গৃহস্থই খাব, এয়ে হিন্দু গৃহস্থৰ ধৰ্ম্ম; যি গৃহস্থই নিজৰ কাৰণে পাক কৰে, সি পাপকে ভক্ষণ কৰে এইটো শ্ৰীকৃষ্ণৰ গীতাত কোৱা কথা; আজি কালি মানুহৰ গুৰু, অতিথি আদিত শ্ৰদ্ধা ভক্তি কমি আহিছে, আৰু সুবিধাও নঘটে বহুতৰ; তেনে স্থলত যদি গৃহস্থই সদাই বাঙ্কবুলৈ লোৱা চাউলৰ পৰা এমুঠি চাউল নৰনাৰায়ণ সেৱাৰ অৰ্থে টেকেলিত থৈ যায়, তেন্তে সেই গৃহস্থই গুৰু, অতিথিক খুৱাৰ তুল্য হল; কাজেই আৰু পাপ ভক্ষণ নহল। দানৰ সমান পুণ্য নাই; ই এটা দান, কাজেই পুণ্য অৰ্জ্জনৰ সহায়ক; নিষ্কাম দানেই প্ৰকৃত দান; এমুঠি চাউল দি ফলৰ আশা নকৰাই সম্ভৱ। কাজেই নিষ্কাম দানৰ সাধন হল তাৰ। ইয়াৰ বাহিৰে সেৱা লাভ; মুষ্টি ভিক্ষাৰ টকাৰে তো তাহাঁতৰে সেৱা কৰিবা; কাজেই সেৱা লাভ কাৰ।



ব্রহ্মচর্য্য

—•—

প্রধানতঃ এই কয়টী বিষয় ব্রহ্মচর্য্য সাধনের বিষয়ীভূত—নিয়ম পালন, সাধন প্রণালী ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

সংযমশিক্ষাই ব্রহ্মচর্য্যের মূল উদ্দেশ্য। সংযম বলতে মন, বাক্ ও কায় এই তিনের সংযম। কায় সংযম বলতে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করা। স্থূল বাহ্য শরীর শুদ্ধি দ্বারা ও কতকগুলি আসন মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা এই কার্য্যসিদ্ধ হতে পারে। জল মৃত্তিকা গোময়াদি দ্বারা স্থূল শরীর শুদ্ধি করতে হয়। সাত্ত্বিক আহার গ্রহণও স্থূল শরীর শুদ্ধির অন্তর্গত। সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ স্থূল শরীর সাত্ত্বিক উপাদানে গড়ে তোলবার একটী প্রধান উপায়। সুতরাং সত্ত্বশুদ্ধি যার উদ্দেশ্য; তার আহার সংযম বিষয়ে অনবধান হলে চলবে না।

সত্ত্বশুদ্ধিই সব সাধনার লক্ষ্য। ব্রহ্মচর্য্য পালনেরও লক্ষ্য হল সত্ত্বশুদ্ধি। শুদ্ধসত্ত্ব হতে হলে মন, বাক্, কায় সংযত করতে হবে। এই স্থূলশরীরের শুদ্ধি করলেই যথেষ্ট হবে না। সব সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমার এই শরীর দ্বারা সংস্কারবশেও যেন

কারও কোনও অনিষ্ট না ঘটে, এ শরীর যেন কারও পীড়ার কারণ না হয়। এক দিকে যেমন অন্যায় ও অনাচরণীয় কর্ম্ম হতে একে নিবৃত্ত রাখবে, আবার অন্য পক্ষে একে সৎ নিমিত্তে নিয়োজিত করবার ও চেষ্টা পাবে। সর্ব্বদা চেষ্টায় থাকতে হয় যে কখন, কি করে এই শরীর দেশের ও দশের হিতে লাগাতে পারব। সব সময় গুরু, প্রাজ্ঞ, দেব, দ্বিজ সেবা পূজায় নিযুক্ত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে এবং যখনই সুযোগ ঘটবে তখনই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করবে।

বাক্য সংযম করার উপকারিতা অনেক। সে সব কথা বিস্তারে না বলে সংক্ষেপতঃ যা কর্ত্তব্য, তাই বলি। বাক্ সংযম না করলে গভীর চিন্তা করবার শক্তি জন্মায় না। পরের হিতের জন্য আবশ্যকবোধে যথার্থ অর্থাৎ অন্তর বাহ্যে ঐক্য রেখে বাক্য ব্যবহার করতে হয়। অবাস্তব বাক্যব্যয় সর্ব্বদা ত্যাগ করা উচিত। সুচিন্তিত ও মনঃপূত বাক্য ব্যবহার করা উচিত। লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন কোনও বাক্য প্রয়োগ করে প্রত্যাহার করতে না হয়। প্রিয় মধুর, ও হিতকারী বাক্যপ্রয়োগই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

মন সংযমই হচ্ছে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধন। সত্য লাভই মানব জীবনের একমাত্র চরম ও পরম উদ্দেশ্য। আর মনঃশুদ্ধিই হচ্ছে তার একমাত্র সোপান। বিনা মনঃশুদ্ধিতে কারও কোথায় সত্য লাভ বা ধর্ম্মলাভ হয়েছে, এমন জানা যায় নাই।

সংযম ও মনঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে কখনই কেউ জীবনে ধন্য ও কৃতার্থ হতে পারে কি? সমস্ত ধর্ম্মই সংযম ও মনঃশুদ্ধি বিষয়ে একমত। নিজকে ধন্য ও মহিমামণ্ডিত করতে হলে চিত্ত স্থির, গম্ভীর ও প্রশান্ত রাখতে হলে, জাগতিক বিক্ষোভ হতে অক্ষুব্ধ থাকতে হলে মনের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকা চাই, অসংযত মনকে সংযত করতে জানা চাই। মন স্বভাবতই চঞ্চল, তার স্বভাব বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটী করা। এই অসংযত মন সংযত করতে হবে। সংযত করতে হলে আগে তার মালিন্য দূর করতে হবে। জলের মত স্বভাবসিদ্ধ অধোগতি নিবারণ করবার জন্য তাকে একটী উর্দ্ধমুখী অবলম্বন দিতে হবে। অবশ্য সে অবলম্বনকে আশ্রয় করে সব সময় সে থাকতে পারবে না—স্বভাববশে নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হতে যাবেই। যখনই জানবে যে, সে নিম্নাভিমুখী হয়েছে, অমনি তাকে উর্দ্ধাভিমুখী করে দেবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার করতে করতে সে তার উর্দ্ধমুখী অবলম্বনে স্থিতি লাভ করতে অভ্যস্ত হবে।

মনঃশুদ্ধির আরও কতকগুলি সাধনা আছে। সব সময় সাত্ত্বিক আহার সংযোগের চেষ্টা করবে। কোনও কুচিন্তা কুভাব আসতে দেবে না, কুসঙ্গ করবে না। সব সময় নিজের জীবনের লক্ষ্যের প্রতি সমনস্ক থাকতে হবে। নিজ ইষ্টলাভের অনুকূল যে সব সৎ ও মহৎ চিন্তা, তাদেরই মনে স্থান দেবে, আর তৎ প্রতিকূল চিন্তাসমূহ দূর করে দেবে। কপটতা পিশুনতা হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা পরচর্চ্চা পরশ্রী কাতরতা, স্বার্থপরতা, রিপুপারবশ্য, অসত্য, এই সব দোষ মানবজীবনকে বিষময় করে তোলে। এদের কোনও একটীকে প্রশ্রয় দিলে অধঃপতন অতি দ্রুত হয়। সুতরাং এ সব অসদ্গুণকে বিষবৎ ত্যাগ করে ক্ষমা

আর্জ্জব দয়া সন্তোষ প্রেম পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের অনুশীলন করতে হয়। মনকে সব সময় উচ্চ ও মহান্‌ভাবে ভাবিত রাখ্‌তে হয়। মনঃশুদ্ধি করবার ও রাখবার আর একটী সহজ উপায় সাধু ও মহতের সঙ্গ করা।

ব্রহ্মচর্য্যসাধনের দুইটী বিভাগ—একটী অর্জ্জন আর একটা বর্জ্জন। যখনই আমি একটা কিছু বর্জ্জন করি, তখন একটা কিছু অর্জ্জনও করি। যখনই আত্মহিত সাধনের ইচ্ছা প্রকট রূপ ধরে দেখা দেয়, তখনই সেই ইষ্টার্জ্জনলোভে কিছু কিছু বর্জ্জনও করি। এ বর্জ্জনটী প্রথম প্রথম স্থূল দ্রব্য দিয়েই হয়ে থাকে, কাজেই প্রথমে দ্রব্যযজ্ঞেরই আহুতি দিতে হয়; সুতরাং স্থূলের ত্যাগ হতেই সাধনার সূত্রপাত হয়। তারপর তাতেও তৃপ্ত না হতে পার্‌লে আরও কঠোর ও কৃচ্ছ সাধনার সূত্রপাত হয়। একেই আবার অন্য পক্ষে তপোযজ্ঞ বলা যেতে পারে।

অধ্যয়ন ব্রহ্মচারীদের আর এক তপস্যা। "ছাত্রাণাম্‌ অধ্যয়নং তপঃ।" স্বাধ্যায় পাঠও ব্রহ্মচারীদের দৈনিক কর্ত্তব্য। স্ব+অধ্যায় =স্বরূপের অধ্যায়ই আজকালকার যুবকদের সহজ ও সুগম হবে – এটী সব সময়েই চল্‌তে পারে। এ ছাড়া ব্রহ্মচর্য্য সাধনের আর এক দিক আছে তপশ্চর্য্যা ও ব্রত নিয়ম পালন। যত কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধনা, তার একটী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। লক্ষ্যের প্রতি একান্ত দৃষ্টি রেখে যথাযথ কর্ম্মানুষ্ঠান করে গেলে ফল অবশ্য মিল্‌বে। যথাযথ সম্পাদিত কর্ম্ম লক্ষ্য বা সাধ্যবস্তুলাভ ঘটিয়ে দেয়। কর্ম্মের একটী স্বতন্ত্র ফল পাওয়া যায়ই। কাজেই তপশ্চর্য্যা ও ব্রত নিয়ম পালন কর্‌তে পার্‌লে তার অবশ্যলভ্য ফল তুমি পাবেই। তপশ্চর্য্যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে অশুদ্ধ শরীর ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করা। এই উদ্দাম বহুজন্মার্জ্জিত অসৎ এবং কুসংস্কারদুষ্ট মলিন দেহমনকে মালিন্যবর্জ্জিত স্বচ্ছ সূক্ষ্ম লঘু ও সংযত কর্‌বার জন্যই তপস্যার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা প্রবুদ্ধ না রেখে কতকগুলি মৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে গেলে ফল লাভ সুদূরপরাহত। যে কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর না কেন, তাহা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হওয়া চাই। সত্যনিষ্ঠা ও নিঃসংশয়ই আশু সিদ্ধি দান করে। (ক্রমশঃ)

ছাত্র রামতীর্থ।

—*—

শাস্ত্রে আছে, "ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ।" এই উক্তির তাৎপর্য্য তীর্থরামের জীবনে পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র জ্ঞানার্জ্জনকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া কিরূপে নিজের দেহ-মনকে তিনি সাধনার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন, এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু তাহাই নয়, অধ্যয়ন সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা ও শ্রমশীলতা ছিল অসাধারণ। তিনি নিজেই এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, "নিজে খাটিয়া যে একটা বস্তু

অর্জ্জন করিতে পারিল না, তাহার লাভ তো লাভই নহে।" আমাদের দেশে কর্ম্মে আলস্য, জড়তা, অপ্রবৃত্তি ইত্যাদি জাতির মজ্জাগত দোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—বিশেষতঃ ছাত্রদিগের জীবন সাংসারিক চিন্তাশূন্য থাকায় ও উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে শ্রমবিমুখীনতা তাহাদের মাঝে বেশী দেখা যায়। ছাত্রমহলে যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখা যায়, তাহা নিতান্তই যৌবনের রক্তের তেজ। উহা প্রকৃতিদত্ত সম্পদ বটে, কিন্তু বিধিমত অনুশীলন দ্বারা উহার শক্তি বাড়ানো প্রায়শঃই ছাত্রদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহার ফল পরবর্ত্তী জীবনেই দেখা যায়। নিরুৎসাহ, দৈবের ভরসা, দুঃখদৈন্য ইত্যাদি সমস্তই তো সেই যৌবনের শ্রমবিমুখীনতার ফল। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা না রাখিলে শেষে ভুগিতেই হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি।

তীর্থরামের শ্রমশীলতার দুই একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহার দিনচর্য্যা সম্বন্ধে নিজেই একবার ধন্নামলকে লিখিয়াছিলেন, "আজ কাল আমি ভোরে সাড়ে পাঁচটায় উঠিয়া সাতটা পর্য্যন্ত পড়ি। তারপর শৌচ, স্নান ইত্যাদি করিয়া ব্যায়াম করি, তারপর পণ্ডিতজীর কাছে যাই। রাস্তায় যাইতে যাইতে পড়ি। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে খাওয়াদাওয়া করিয়া তাঁহার সঙ্গে কলেজে যাই। কলেজ হইতে আসিবার সময় রাস্তায় দুধ পান করি। বাড়ী আসিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া নদীর দিকে যাই। নদীর ধারে গিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা থাকিয়া বেড়াই। সেখান হইতে ফিরিবার সময় সহরের চারিদিক ও বাগানেও কিছুক্ষণ বেড়াই। তারপর ঘরে আসিয়া ছাতের উপর বেড়াইতে থাকি। ততক্ষণে অন্ধকার হইয়া যায়। মনে রাখিবেন, ঘোরাফিরার মাঝেও কিন্তু আমার অধ্যয়নের নিবৃত্তি হয় না। অন্ধকার হইয়া গেলে ব্যায়াম করি, তারপর আলো ধরাইয়া সাতটা পর্য্যন্ত পড়ি। তারপর খাওয়াদাওয়া করিয়া প্রেমকে পড়াইতে যাই। ফিরিয়া আসিয়া ঘরের আড়া ধরিয়া দশ বার মিনিট ব্যায়াম করি। তারপর প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়া শুইতে যাই। আমার মনে হয়, যদি পেটে গোলমাল না থাকে, তাহা হইলে আনন্দ, চিত্তের স্ফূর্ত্তি, একাগ্রতা, পরমাত্মার স্মরণ-মনন ও অন্তঃকরণের শুদ্ধি অতি সহজেই হইয়া থাকে। বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিও তীব্র হয়। একে তো আমি খাই খুব কম; তা ছাড়া যা খাই, তাও ভাল করিয়া জীর্ণ করি।"

এই তো গেল তাঁর নিত্যকার নিরলস অধ্যয়ন। সময়বিশেষে গণিতের একটা প্রশ্ন লইয়া তিনি পুরাপুরি ২৪ ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন, তাঁহার আহারনিদ্রা বোধ পর্য্যন্ত থাকিত না। একবার এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "রাম যখন বিদ্যার্থী ছিলেন, তখন প্রায়ই রাস্তায় চলিতে চলিতে তিনি পুস্তক হাতে পড়িতে পড়িতে চলিতেন। তাহা দেখিয়া এক ভদ্রলোক একটু ঠাট্টার ছলে রামকে বলিলেন, 'তুমি এ কি করিতেছ? এ তো আর তোমার স্কুল নয়. রাস্তায় চলিতে গেলে বইখানা মুড়িয়া বগলে রাখিতে হয়।' রাম জবাব দিলেন, 'সমস্ত জগৎই আমার পাঠশালা।'"

আর একবার এই সম্বন্ধে তিনি একটী কৌতুককর কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"রাম যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন তাঁহারই

নামের আর একজন বিদ্যার্থী তাঁহার সঙ্গে পড়িত। এই সহাধ্যায়ীটী কেবল টো টো করিয়া বেড়াইত। বেশীর ভাগ সময় তার তান-গান, নাচা-কোঁদা আর ঘোরাফিরাতেই কাটিত। একদিন এক ভদ্রলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি সারাদিনের মাঝে পড় কতক্ষণ?' ছেলেটী হাসিয়া বলিল, '১৮ ঘণ্টা।' ভদ্রলোকটী বলিলেন, 'বল কি! পাঁচ ঘণ্টা তো তোমাকে বেড়াইতেই দেখি; খেলাধুলাতে কাটে আট নয় ঘণ্টা; বাকী রহিল দশ বার ঘণ্টা; তাহা হইলে আঠার ঘণ্টা পড় কি করিয়া?'

"'আপনি অঙ্কশাস্ত্র পড়েন নাই বুঝি? আমি অঙ্ক কষিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, কেমন করিয়া আঠার ঘণ্টা পড়ি।'

"'বটে, আচ্ছা বল দেখি, কি করিয়া?'

"'আমি আর রাম একই ঘরে থাকি। ঠিক ঠিক হিসাবমত তো আমার বারো ঘণ্টা পড়ার সময় থাকে; আর রাম পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা; ১২+২৪=৩৬ ঘণ্টা; দুইজন এক কোঠায় থাকি; সুতরাং গড় কষিলে আমার ভাগে আঠার ঘণ্টা পড়ে না কি?'

"'তুমি নাহয় বার ঘণ্টা পড়; কিন্তু রাম চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে, এ কথা মানি কি করিয়া? এ কি সম্ভব? আমি জানি, রাম অনেক গুলি বিষয় পড়িতেছে, তাহাকে খুব খাটিতে হয়, এমন কি সে অপর ছেলের চতুর্গুণ পরিশ্রম করে। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টা কাজ সে করিতে পারে কি করিয়া?'

"'রাম যখন খাইতে বসে, তখনও সে বিনা কাজে থাকে না; একটা কিছু না কিছু তাহার কাছে থাকেই। হয় সে কিছু পড়ে, না হয় কোনও সমাধান নিয়া তখনও ব্যস্ত থাকে। শুইয়া আছে তো কোনও সমস্যা নিয়া বিচার করিতেছে। ঘুমাইবার সময়ও সে যা ভাবে, তারই স্বপ্ন দেখে। কাজেই চব্বিশ ঘণ্টাই সে অধ্যয়ন করে বই কি!'

"সহাধ্যায়ী যাহা বলিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই সত্য; কারণ যে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে, তাহার জাগ্রদবস্থায় যে কাজ হয়, নিদ্রিতাবস্থাতেও তো তাহারই জের চলিতে থাকে।"

এইরূপ নিরলস অধ্যয়নের ফলে তাঁহার সূক্ষ্মানুভব এমন জাগিয়া উঠিয়াছিল যে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"রাম নিজের অনুভব হইতে বলিতে পারেন যে, তাঁহার পাঠাদশায় অনেক সময় জাগ্রদবস্থাতে গণিতের যে সমস্ত মীমাংসা অপূর্ণ রহিয়াছে অথবা বহু বিচার করিয়া যে বিষয়ের তিনি সমাধান করিতে পারেন নাই, তাহা স্বপ্নাবস্থায় আশ্চর্য্যরূপে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।"

এই নিরলসতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাঝে ছিল প্রচণ্ড আত্মনির্ভর। তিনি যাহা কিছু শিখিতেন, তাহা কেবল মাত্র নিজের চেষ্টায়—কোনও শিক্ষক বা সহাধ্যায়ীর নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। আত্মশক্তির এইরূপ অহরহঃ অনুশীলনের ফলে তাঁহার মেধা ও স্মৃতি এতই প্রখর হইয়াছিল যে ভুলিয়া যাওয়া কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেনই না। সর্ব্বোপরি পরমাত্মার উপর নির্ভর থাকায় তাঁহার সঙ্কল্পে এমনি একটা দৃঢ়তা ছিল যে, "দেহং পাতয়ামি বা কার্য্যং সাধয়ামি" বলিয়া অখণ্ড মনোবৃত্তি লইয়া তিনি একটা কাজে লাগিয়া যাইতে

পারিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "রাম যখন বিদ্যাপীঠের ঊর্দ্ধ শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে অধ্যয়ন বিষয়ে তিনি কখনও কোনও শিক্ষকের সাহায্য লইবেন না। অনেক সময় এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা দুর্ঘট হইয়া উঠিত। গণিত শাস্ত্রের দুরূহ অংশগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য রাম ঐরূপ কিছু পাওয়া মাত্রেই তাহাতে লাগিয়া যাইতেন এবং কোনও আচার্য্য বা সহায়পুস্তক আলোচনা না করিয়াই প্রশ্নটী আয়ত্ত করিতেন। কিন্তু সকল সময় জয় লাভ হইত না। হয়ত সন্ধ্যা পাঁচটা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত রাম একটা সমস্যা লইয়াই খাটিতেছেন, কিন্তু মীমাংসা মিলিতেছে না। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া একটু তাজা হাওয়া নিবার জন্য ছাতে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখনো হয়ত মীমাংসা হইল না। তখন রাম শরীরপাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন—আর অমনি মীমাংসা আপনা হইতে ভাসিয়া উঠিল।"

একদিনের ঘটনা রাম নিজে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"একদিন রাত্রে গণিতের খুব কঠিন কয়েকটা সমস্যা লইয়া রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজ ভোর না হইতে এগুলো তিনি মীমাংসা করিবেন। যদি না পারেন, তাহা হইলে মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবেন। তার জন্য বিছানার নীচে একখানা ছুরীও রাখিলেন। অবশ্য এ কাজটা ভাল বলা চলে না, কিন্তু রামের ইহা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল হউক মন্দ হউক, এইরূপ কঠিন তপস্যা দ্বারা তবে তাঁহাকে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। দুপুর রাত্রের পূর্ব্বেই চারিটী প্রশ্নের তিনটীর মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু চতুর্থ প্রশ্নটী লইয়াই গোল বাধিল। সেটীর মীমাংসা হইতে না হইতেই ভোরের আলো জানালার ভিতর দিয়া উঁকি দিল। প্রতিজ্ঞা অনুসারে রাম আসন ছাড়িয়া ছুরী নিয়া ছাতে উঠিলেন এবং সেটী গলায় বসাইয়া দিলেন। ছুরীটী গলায় বিঁধিয়া রক্তও বাহির হইতে লাগিল, এমন সময়ে রাম যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া গেলেন। তখনই সম্মুখে দেখেন, আকাশের গায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর অগ্নিঅক্ষরে লেখা রহিয়াছে। রাম উহা আয়ত্ত করিয়া অঙ্কটী কষিয়া ফেলিলেন। পরদিন তাঁহার সমাধান দেখিয়া কলেজের অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। বহুবার এমনি কঠিন তপস্যা দ্বারা রামকে গণিতের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইয়াছে।" (১৪)

নদীয়া—কুতুবপুর—

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানে আশ্রম-স্থাপনকল্পে দানপ্রাপ্তি

শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়াড়ী, নদীয়া ৩১৲, শ্রীকালীপদ দাস, নাটনা, নদীয়া ১৩৲, শ্রীকালীপদ দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত ০৭৲, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, ধিতপুর, ময়মনসিংহ ৫০৲, শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র রায়, ধিতপুর, ময়মন্সিংহ ১০৲, শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, গারুলিয়া, ২৪পরগণা ৪৲, ডাক্তার শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ, আবুতরাপ, চট্টগ্রাম ৫৲। (ক্রমশঃ)



আরণ্যক

—ঃ{*}ঃ—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

কাজের নেশায় মানুষ চোখের সামনে সর্ষে ফুল দেখে। কিন্তু সে ফুলে যে সরষে ধরেছে, এ কেউ কখনো শুনেছ? তবু নেশাখোরের খেয়াল, বুদ্ধির ঘানিতে পিষে সেই সরষে থেকে তেল বের করবে। মরণ আর কি! যার মগজটা একটু থিতিয়ে এসেছে সেই সাদা চোখে দেখতে পায়, কই, কোথায়ও তো কিছু নেই—সবি যে ফাঁকা! কাজের মাৎলামো থেকে জ্ঞানী তাই বিশ হাত তফাৎ দিয়ে যান। মাতাল কিন্তু ভাবে, যে মদ খেলে না, সে আবার মনিষ্যি!

*

বোধ হয়, বেশীর ভাগ মানুষই জবাবদিহীর ভয়েই কাজ করে। জবাবদিহী যার কাছে করতে হয়, সেই তো প্রভু। সে আছে বাইরে বাইরে, তার স্বরূপ জানি না বলেই ডরিয়ে মরি। কিন্তু আসল ভয় যে মানুষের নিজকে, সে কথা কেউ জানে না। নিজের কাছে যে জবাবদিহী করতে হয়, সেটা যত মারাত্মক, পরের কাছেরটা তত নয়। বুদ্ধির গোড়ায় জল এলে মানুষ এ কথাটা বুঝতে পারে। নিজের কাছে যদি মন খোলাসা হয়ে যায়, তবে পরের তোয়াক্কা রাখে কে? কিন্তু মানুষ নিজের মনের কাছেই ভয়ে সব কথা খুলে বলতে পারে না, অথচ ভাবে, সে বুঝি পরকে ডরায়, পরের গোলাম।

*

সংঘের যিনি নেতা—তাঁর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে আনন্দ করা—উৎসাহে সর্ব্বদা জ্বল জ্বল হয়ে থাকা। শুধু মুখেও যদি আমরা কাউকে প্রভু স্বীকার করে থাকি, তাহলেও তার প্রভাব হতে চিত্তকে নির্ম্মুক্ত রাখা বড় কঠিন। প্রভুর ব্যবহারে মনে মনে যতই বিদ্রোহ করি না কেন, তার মুখের ভালমন্দ দুটো কথায় মনটা যে ওঠে নামে, এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? সেবক এটাকে তার দুর্যোগ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু প্রভুর পক্ষে এই মনোবৃত্তিটাই হচ্ছে একটা মস্ত সুযোগ। আমার চিন্তার, আমার কথার ধার আছে, ভার আছে—এ ভাবটা মুখে বা ব্যবহারে প্রকাশ না করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মনে মনে যে বিশ্বাস করে, সেই যথার্থ প্রভুত্ব করতে পারে। এমন কি পরিস্থিতিকে আপন খুসীমত গড়ে তোলাও কতকটা তার আয়ত্তের মাঝে। নিজের মাঝে যে সম্মোহন শক্তি রয়েছে, এ কথা মানুষ জানে না বলেই দৈবের ভরসা করে দুঃখ পায়।

*

এ তত্ত্বটা যে বুঝেছে, নেতাগিরি তারই সার্থক। সে জানে, যে একবার আমার প্রভু স্বীকার করেছে, তাকে হাসানো কাঁদানো কতকটা আমার হাতেই। তবে কিনা লোকে

মাথা ঠিক না রাখতে পেরে ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করে ফেলে। বৈদান্তিকের মীমাংসা এই, গড়বার ভাঙবার শক্তি তোমার আছে—এই জেনে কেবল আনন্দ কর—সুখেও আনন্দ কর, দুঃখেও আনন্দ কর। নিস্তব্ধ থেকে আনন্দ কর, দেখবে যন্ত্র লঘু হয়েছে, তাতে প্রাণ এসেছে—সুধামুখ, বিষমুখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর তাই যদি বা না হয়, তোমার আনন্দ আর মারে কে? আনন্দের কারবারে সুবিধা এইটুকু যে পরের হিস্‌সা বজায় থাক্ বা না থাক্, নিজের ভাগ তো কেউ কাড়তে পারবে না।

*

আগে জাহাজ চলত পালের ভরসায়। বাইরে থেকে বাতাসে যদি ঠেলা দিল, তবে জাহাজ চল্‌ল—নইলে পাল মুড়ি দিয়ে অথৈ সমুদ্রে অচল হয়ে রইল। তার পর মানুষের যখন বুদ্ধি বাড়ল, তখন সে জাহাজের খোলের ভিতরেই কল বসাল। এখন আর দমকা হাওয়ার ভরসা করতে হয় না। কল টিপলেই জাহাজ চলে। আমরাও প্রথম যখন আনন্দ চাই, তখন পালের ভরসা করি; পরে দেখি, কল বসালেই তো হয়।

*

এক এক সময় প্রাণে অভাব জেগে ওঠে, অথচ বাইরের কিছুতেই তা মিট্‌তে চায় না। বুঝতে হবে, যিনি তোমার অন্তরে রয়েছেন, তাঁর মাঝে বিরহের সন্তাপ জেগে উঠেছে—তিনি চান, একবার বাইরের কোলা-হল ছেড়ে নিরালায় তাঁকে নিয়ে বসো। ধ্যান কর্‌বার, চিত্ত একাগ্র কর্‌বার ওই তো সময়। অথচ বোকা মানুষ তখন 'কিছু ভাল লাগ্‌ছে না' বলে কেবল এটাতে ওটাতে ঠোক্কর দিয়ে বেড়ায়—অন্তর্যামীর করুণ আহ্বান শুন্‌তে পায় না বা চায় না।

*

জীবন চাই না—মরণ চাই, এ হল গম্ভীর-ভেদী পুরুষের কথা। বাস্তবিক মরণে যত শান্তি, তত শান্তি বিষয়ের মাঝে কোথায়? শ্রান্তির বিশ্রাম, আর্ত্তির আরাম, ঝামেলার বিরাম—ওই তো মরণ। এ মরণ যেদিন প্রকৃতির পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়, সেদিন মানুষ হয়ত জীবনটাকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। অথচ জীবনের মুখরতার মাঝেই মরণের প্রশান্তি সে কতবার খুঁজেছে। তবে কি তার কাছে দুটো মরণ? হবেও বা! দেহের মরণ তার অবসরমত আসুক; আমি চাই মনের মরণ—সেই তো আমার খেয়াল-খুসীর খেলা।

*

সাধুর অপমান যারা করে, তারা প্রকৃতির অপমান করে শুধু। আসল সাধু তো শিব; তাঁর অপমান করে এমন সাধ্য কার? দক্ষ রাজার স্বর্গাভিমানের মত দেশে অভিমান ফেঁপে উঠেছে বড়; আপন মেয়ে সতীকে সে চিন্‌ল না; শিবের অপমান কর্‌তে গিয়ে সে আপন মেয়ের প্রাণ নিল। পরিণাম হল যে, ছাগের মুণ্ড, সেই দুঃখেই তো প্রাণ কাঁদছে। ভেবেছ কি সতী প্রকৃতি বেঁচে থাকতে শিবের গায়ে আঁচড়টুকু সে লাগ্‌তে দেবে? সাধুর নিন্দা কি এতই সহজ?

*

দেহটাকে তিল তিল করে হত্যা কর্‌লেও পাপ হয় না কাদের?—যারা বাসুদেবের দেখা পেয়েছে। বিদুর গান্ধারী প্রায়োপবেশনে মর্‌লেন, দুর্ভিক্ষে নয়; সে কি কম অধিকার?

সবার আশা পূর্ণ হোক্—নিরাশার বোঝা বইবার জন্য আছ তুমি—এই বীরত্বের গর্ব্বে নিষ্কিঞ্চন হয়ে থাক।

*

চেয়ে চেয়ে বিশ্বাস অর্জ্জন করো না—চেও না, আপনি পাবে। তুমি তো আর ভগবানের পরীক্ষক নও!

*

সিংহ আর অসুরে লড়াই হচ্ছে, উমা আমার পা রেখেছেন দুয়েরই উপর। বিরোধ হতে বাঁচবার এই পথ।

*

একটী নক্ষত্র জ্যোতির বিন্দু মাত্র—সে হিসাবে তার মূল্য নাই; কিন্তু অনন্ত নীলাকাশে একটী গোধূলির নক্ষত্র, সতীর শুভ্র ললাটে একটী সিন্দুরবিন্দু!—কার রূপে কার রূপ? ছোট হও, ক্ষতি নাই, কিন্তু নীলাকাশে তারা হয়ে ফুটে ওঠ!

*

মনমরা যদি হতে চাও, তো দৃষ্টি মস্ত রাখ। চোখ বড় মস্ত সমালোচক—মুখের দিকে তাকিয়েই ভাল না মন্দ রায় দিয়ে বসে; আর মন তা নিয়ে মেতে ওঠে। তাতে তোমার লাভ?

*

যাকে চোখ দিয়ে দেখি না, তাকে বুক দিয়ে দেখি। ভাবতেই যাকে পাই, সে যে আমার কত সকল, কত আপন, নাস্তিক তা মানবে কেন?

*

সোজাসুজি দেখার মানে জানা; আর আড়নয়নে চাওয়ার নাম ভালবাসা। যে আড়নয়নে তোমার দিকে চাইছে, তাকে শত্রু ভাবছ কেন? ও যে তোমার রসিক বঁধুর চোরা চাউনী। বাইরে যাকে দেখছ, সে তো দূতী মাত্র—সে লিখন এনেছে শুধু. ভিতরের খবর কি জানে?

*



নিবেদন

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব আগামী শারদীয় পূজার অবকাশে তাঁহার জন্মভূমি পরিদর্শন উপলক্ষ্যে নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিবিসনের অন্তঃপাতী কুতুবপুর গ্রামে পদার্পণ করিবেন এবং তাঁহার বহু শিষ্যভক্ত এই শুভ সুযোগে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মভূমি মহাপীঠ দর্শন করিতে তাঁহার অনুগামী হইবেন—এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব বিগত ভক্তসম্মিলনীতে গৃহীত হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভক্তসহ জন্মভূমি দর্শন তিথিটী চিরস্মরণীয় করিতে এবং তাঁহার বিরাট্ উদ্দেশ্যের আংশিক সফলতাকল্পে তাঁহারই শুভ নির্দ্দেশের অনুসরণ করিয়া ভক্তমণ্ডলী এই উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মভূমিতে একটি আশ্রম ও তৎসহ "ঋষি-বিদ্যালয়" স্থাপন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের উপযোগী এক খণ্ড জমী খরিদ

করিবার আয়োজন হইতেছে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের পিতৃপিতামহের ভিটায় একটী ইষ্টক মন্দির তুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের জন্য সম্প্রতি ৩।৪খানা ঘর উঠানও প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমি তদীয় শিষ্যবর্গের নিকট সর্ব্বতীর্থের সারস্বরূপ; এই পুণ্য ভূমিতে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে পাওয়া আমাদের মহা সৌভাগ্যের পরিচায়ক, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অনুরাগী শিষ্যভক্ত মাত্রই এই শুভ অনুষ্ঠানটীর সফলতা কল্পে সাগ্রহে অগ্রসর হইবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সাহায্যের পরিমাণ যত অল্পই হউক না কেন, তাহা দিতে কেহ কোনও সঙ্কোচ করিবেন না; মনে রাখিবেন—

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্ত্তিক হইতে ৩রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে তাঁহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক ব্যয়াদি নির্ব্বাহজন্য জন প্রতি ৫৲ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, সুতরাং উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তগণের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হওয়া প্রয়োজন।

কুতুবপুরে যে আশ্রম ও ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহার সাহায্যার্থ যিনি যাহা দিতে চাহেন, তাহাও উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে সাদরে গৃহীত হইবে।—

চিঠিপত্র লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত এম, এ, বি এল, সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
(অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমান মাসের ২৯শে তারিখ শিলং রওনা হইবেন। তথা হইতে শ্রাবণের প্রথম ভাগে কলিকাতা যাইবেন। কলিকাতা হইতে দেওঘর যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সম্ভবতঃ শ্রাবণের মধ্যভাগেই পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার পুরীর ঠিকানা—"নীলাচলকুটীর, স্বর্গদ্বার—পুরী।

স্থানাভাববশতঃ "মঠে দানপ্রাপ্তি-স্বীকার" এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না।



ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ সমষ্টি সং ১৯৩	শ্রাবণ	প্রথম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা

ইন্দ্রায়

—:—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৩।১]



[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

ইচ্ছন্তি ত্বা সৌম্যাসঃ সখায়ঃ
সুন্বন্তি সোমং দধতি প্রযাংসি।
তিতিক্ষন্তে অভিশস্তিং জনানাম্
ইন্দ্র ত্বদা কশ্চন হি প্রকেতঃ॥

সখা তারা, সৌম্য তারা, তোমারেই করে আকিঞ্চন,
নিঙারি হবির সাথে সোমরস করেছে সিঞ্চন,
অভিশাপ অপমান সহিয়াছে পাতি দিয়া শির,
জানে তারা, তোমা হতে, শ্রেষ্ঠ কেবা এই ধরণীর।

ন তে দূরে পরমা চিদ্রজাংস্য্
আ তু প্র যাহি হরিবো হরিভ্যাং।
স্থিরায় বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা
যুক্তা গ্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ॥

দূর যারে বলি মোরা, তুমি তারে কর না গণন,
হরিৎ তুরঙ্গে চাপি এস হেথা, হে হরিবাহন।
অচল অটল তুমি, কল্পতরু, কর সোমপান,
সমিদ্ধিয়া হোমশিখা জুড়িয়াছি সোমের পাষাণ।

ইন্দ্রং সুশিপ্রো মঘবা তরুত্রো
মহাব্রাতস্তুবিকূর্মি ঋঘাবান্।
যদুগ্রো ধা বাধিতো মর্ত্ত্যেষু
ক্বত্যা তে বৃষভ বীর্য্যাণি॥

দেবের সহায় তুমি, মঘবন্, কিরীটী সুন্দর,
সংঘনেতা, চিত্রকর্ম্মে রণমাঝে মহাভয়ঙ্কর।
শত্রু হতে পেয়ে বাধা উগ্ররূপ করিতে ধারণ—
কোথা সেই বীর্য্য তব, করিলে কি ভারে সম্বরণ?

ত্বং হি ষ্মা চ্যাবয়ন্নচ্যুতান্য্
একো বৃত্রা চরসি জিঘ্নমানঃ॥
তব দ্যাবা পৃথিবী পর্ব্বতাসো
'হনুব্রতায় নিমিতেব তস্থুঃ॥

অচ্যুতের দর্প দলি টলায়েছ তারে বার বার,
যেথা যে কলুষ আছে, ফিরিয়াছ করি ছারখার;
দ্যুলোক-ভূলোক-গিরি নেয় মেনে তোমার শাসন—
মহাশূন্যে তাই বুঝি পাতিয়াছে অটল আসন।

উতাভয়ে পুরুহূত শ্রবোভি-
রেকো দৃঢ়মবদো বৃত্রহা সন্।
ইমে চিদিন্দ্র রোদসী অপারে
যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে ॥

যাচিয়া অভয় তব রচি গাথা যুকারে যে সবে,
সত্য তুমি বৃত্রঘাতী, দৃঢ়কণ্ঠে বল, "ভাই হবে।"
দ্যুলোক-ভূলোক এই, নাহি যার হেরি পারাপার,
তাদেরো জুড়েছ তুমি—খ্যাতি তব ছেয়েছে সংসার।

প্র সূ ত ইন্দ্র প্রবতা হরিভ্যাং
প্র তে বজ্রঃ প্রমৃণন্নেতু শত্রূন্।
জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচো
বিশ্বং সত্যং কৃণুহি বিষ্টমস্তু ॥

হরিহয়যুক্ত রথ নিম্নপানে আসে গরজিয়া—
দীপ্ত তব বজ্র যেন অরাতির চূর্ণ করে হিয়া;
সম্মুখে যে পড়ে কেহ, পিছে থাকে, যায় পলাইয়া—
হান শিরে বজ্র তার সত্যালোকে বিশ্ব বিথারিয়া।

যস্মৈ ধায়ুরদধা মর্ত্ত্যায়া-
ভক্তং চিদ্ ভজতে গেহ্যং সঃ।
ভদ্রা ত ইন্দ্র সুমতি ঘৃতাচী
সহস্রদানা পুরুহূত রাতিঃ ॥

অসীম সম্পদ্ তব, কণা তার পায় যদি কেহ,
চোখে কভু দেখে নাই, হেন ধনে ভরে যায় গেহ;
জ্যোতির্ম্ময় শুভাশিষ নিখিলের করেছে কল্যাণ,
দাতা তুমি, বিশ্ব 'পরে ঝরে তব অফুরন্ত দান।



নারদীয়া ভক্তি



ইতিপূর্ব্বে ব্যাসদেব, গর্গ ও শাণ্ডিল্য এই তিন ঋষির কথিত ভক্তির লক্ষণ নিয়া আমরা সামান্যতঃ আলোচনা করিয়াছি এবং ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহাঁদের প্রদর্শিত সাধনা স্তরে স্তরে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে এবং একজন সাধকের জীবনেও স্তরভেদে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইতে পারে। অতঃপর দেবর্ষি নারদ কথিত ভক্তির লক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এক কথায় বলিতে গেলে নারদোক্ত ভক্তির লক্ষণ অপর তিনটী লক্ষণের সমন্বয় স্বরূপ। উহা ভক্তির প্রাণ বস্তুটীকে লক্ষ্য করিয়াছে বলা যাইতে পারে। নারদ বলিতেছেন, **তদর্পিতাখিলাচারতা ও তদ্বিস্মরণে পরম-ব্যাকুলতা**—ইহাই ভক্তির লক্ষণ। অন্যান্য ঋষির কথিত লক্ষণ হইতে তারতম্য দেখাইতে পারিলেই ইহার তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হইবে।

ব্যাসদেব বলিতেছেন, ভক্তির প্রকাশ পূজায়। পূজা বিধির আশ্রিত; উহাও কর্ম্ম বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কর্ম্ম। আপাততঃ পূজা বলিতে আমরা ইহাই বুঝি। সুতরাং প্রবর্ত্তসাধকের পক্ষে আংশিক কর্ম্ম সমর্পণই ভক্তি, ইহাই ব্যাসদেবের মত। নারদ বলিতেছেন, শুধু উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কেন, তুমি যাহা কিছু কর, সমস্ত তাঁহাকে সঁপিয়া দাও—তোমার সমস্ত আচার ভগবানে সমর্পণ কর। গীতার নবম অধ্যায়ের দুইটী শ্লোকে ভগবান্ এই দুইটী সাধনা পাশাপাশি করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথমে বলিলেন, ভক্তিপূর্ব্বক "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" যে আমাকে দেয়, আমি তাহার সে সমস্ত গ্রহণ করি। ইহাই পূজা, ব্যাসদেব ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তির সাধনায় এটী গৌণ। ভগবদ্ভক্তিতেও সেইরূপ ভাবেই ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। তিনিও বলিতেছেন—যে দেয়, তাহার দান আমি গ্রহণ করি; যেন, দাতার ইচ্ছার উপরই তিনি নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন, কাড়িয়া লইবার মত জোর দেখাইতেছেন না। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকেই আবার বলিতেছেন, "তুমি যা কর, যা খাও, যা হোম কর, যা দান কর, যা তপস্যা কর—সব আমাকে দাও।" ইহাই সমস্ত আচার তাঁহাতে অর্পণ করা—এ ভাব পূজার বাড়া। তাই ভগবানও এবার দূরে থাকিয়া বলিলেন না যে, যে আমায় দেয়, তারটা আমি নিই, একেবারে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি দাও—নহিলে আমার চলে না।" সম্বন্ধ নিবিড় হইল কোন্‌টাতে?

অবশ্য পূজার মাঝে যে সম্ভ্রম, যে সম্ভোৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। কিন্তু তথাপি এই সম্ভোৎকর্ষ, এই দেবারতির ধূপ-গন্ধটুকু যেদিন সমস্ত কর্ম্মে ছড়াইয়া পড়িবে, সমস্ত কর্ম্মই যে দিন পূজার আকার ধারণ করিবে, সেই দিন ভক্তির পরিপুষ্টি হইবে—উহাই হইবে নারদীয় কর্ম্মসমর্পণ।

গর্গ বলিতেছেন, শ্রবণকীর্ত্তনে অনুরাগই ভক্তি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা পূজা অপেক্ষাও

উন্নত অধিকার, কেননা উহা মননের অন্তর্গত। কিন্তু ইহার মাঝেও একটু বিধির গন্ধ আছে। যেখানে বিধি, বুঝিতে হইবে, সেখানে স্বভাবের উপর একটু জবরদস্তি হইতেছে—ঠিক প্রাণ হইতে আনন্দ উৎসারিত হইতেছে না। তাই বৈধ শ্রবণ কীর্ত্তনেরও পরিণতির অপেক্ষা আছে। কীর্ত্তন অপেক্ষা জপ শ্রেষ্ঠ। জপ যদি শ্বাসের সঙ্গে গাঁথা হইয়া যায়,তাহা হইলে আরও ভাল। যখন শ্বাস ছাড়িয়া থাকিতে পারি না,তখন জপ ছাড়িয়াও থাকিতে পারিব না। সুতরাং ইষ্টস্মৃতি সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিবে; যদি ক্ষণেকের জন্যও ভুলিয়া যাই, তবে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে। যেমন শ্বাস সহজভাবে নিই, তখন খেয়াল থাকে না, কিন্তু একটী বারের জন্য বন্ধ করিতে গেলেই প্রাণের বন্ধন উঘারিয়া আসিতে চায়; ইষ্টের স্মৃতি যখন এমনি করিয়া প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া যায়, তখন আর বাহ্য শ্রবণকীর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। ইহাও গর্গকথিত সাধনার পরিণতি। নারদ ইহার কথাই বলিতেছেন, তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা —ইহাও ভক্তির লক্ষণ।

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি, নারদোক্ত ভক্তিলক্ষণের দুইটী কোটীতে ব্যাসদেব ও গর্গাচার্য্যের লক্ষণ দুটী পরিণত ও পরিপুষ্ট হইয়া স্থান পাইয়াছে। শাণ্ডিল্যোক্ত লক্ষণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার নাই। উহা নারদোক্ত লক্ষণের অণুতে অণুতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। যেমন আমাকে আমি ভালবাসি, আমাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করি, আমাকে এক মুহূর্ত্তের তরুণ ভুলিতে পারি না, তেমনি করিয়া তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার কর্ম্ম করি, তাঁহাকে ভুলিতে পারি না। শাণ্ডিল্য জ্ঞানের খুঁটী ধরিয়া আছেন, নারদ তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান প্রেম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই একের লক্ষণ অপরে অনুপ্রবিষ্ট।

নারদের কথা একেবারে প্রাণের সহজ কথা। কোনও কৃত্রিম আচারের প্রয়োজন নাই, ভাঙ্গাগড়ার প্রয়োজন নাই; যেমনটী আছ, যেখানে আছ, ঠিক সেইভাবে সেইখানে থাকিয়া আপনাকে বিলাইয়া দাও। মানুষ দুঃখ পায় কখন?—যখন সে একা থাকে। এক হওয়ার, কেবল হওয়ার সাধনাও আছে বটে, কিন্তু আমি বলি, তার মাঝে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। এক হইয়াও দুই— এই হইল আনন্দ—ইহাই সহজ ভাব। বেদেও আছে, "পরম পুরুষ সৃষ্টির আদিতে এক ছিলেন, কিন্তু তখন যেন তাঁহার ভয় ভয় করিতে লাগিল; সেই অসোয়াস্তি দূর করিবার জন্য তিনি দুই হইলেন।" এটী পরম রসিকের অনুভূতি। তাই বলিতেছিলাম, একা একা শুধু আপনাকে নিয়া যদি থাকিতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম হইয়া উঠে জঞ্জাল, মন হইয়া ওঠে একটা বোঝা। তাই কর্ম্মকে সরস করিতে, মনকে স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিতে আর কাহাকেও আমার প্রয়োজন। যাহাকে চাই —সে আমার মত হইয়া আসুক; কিম্বা আমাকে তাহার মত করিয়া নিক্। মোট কথা 'বিজাতীয়, সজাতীয়, স্বগত, কোনও প্রকার ভেদ যেন না থাকে, অথচ দ্বৈতের বিলাসও যেন থাকিয়া' যায়। যাহার অন্তরে এমনি আর একটী আত্মা জাগিয়া উঠিয়াছে—আত্মা দ্বারা আত্মদর্শন করিতে যে শিখিয়াছে—সেই তো সুখী।

ঋষি শাণ্ডিল্যের কথাতেই বলি, আমাকেও আমি চাই বটে, কিন্তু তাহাকেও চাই; এক দিকে আত্মরতি আর এক দিকে অনুরাগ—দুইয়ে অবিরোধে সন্ধি হইয়া যাউক—এই মিলনের মালঞ্চে অখিলাচার-সমর্পণরূপী সেবার ফুল ফুটিয়া উঠুক—হারাই হারাই ভয়ে বিরহের ব্যাকুলতা অহর্নিশ আমাকে মধুর শঙ্কায় বিহ্বল করিয়া রাখুক। আর কি চাই, বল!

তুমি বলিবে, এমনটী কি কাহারও হইয়াছিল? নারদ বলিতেছেন, হাঁ, ব্রজগোপীদের তাই হইয়াছিল। ভগবান নিজ মুখে তাঁহাদের কথায় বলিয়াছিলেন, "তারা আমায় তনুমনপ্রাণ সঁপিয়া দিয়াছে, আমার জন্য লোকধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছে, তাই আমি তাহাদের বুকে করিয়া রাখিয়াছি। যদি আমি চোখের আড়াল হইয়া গেলাম, তাহা হইলে তাহারা আর প্রাণে বাঁচে না—বিরহে উৎকণ্ঠায় বিভোল হইয়া আমার কথাই ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের অঙ্গ এলাইয়া পড়ে। আমি আসিব, এই সংবাদটুকু পাইয়াই কোনও রকমে তাহারা বাঁচিয়া থাকে মাত্র। অধিক কি আর বলিব, আমিই তাহাদের আত্মা, তাহারা একান্ত ভাবে আমারই।"

এই ভালবাসা কি আত্মপ্রীতি? না, আবার হাঁ-ও বটে। যদি বল ভালবাসিয়াই গোপীর সুখ, তাহা হইলে সেই তো হইল আত্মরতি। যদি বল, গোপী কৃষ্ণ-সুখে সুখী, তাহা হইলে আত্মপ্রীতির অবকাশ রহিল কোথায়? এই একটা হেঁয়ালী। আসল কথা হইতেছে, আত্মপ্রীতি কথাটাই গণ্ডগোলের। আত্মা তো স্বয়ং প্রীতি স্বরূপ; সুতরাং যাহাতে তাঁহার স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহাতেই প্রীতিসুখ উথলিয়া উঠিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আত্মার স্ফূর্ত্তি তো সদাসর্ব্বদা হয় না; কত আবরণে তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে—এই আবরণগুলিই আত্মা, এই ভুলে জীব মজিয়াছে। যখনই ক্ষুদ্র একটা বস্তুকে আত্মা বলিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহারই স্ফূর্ত্তি সে খুঁজিয়াছে, তখনই তাহার মাঝে কাম জাগিয়াছে এবং এই কামে সুখের সঙ্গে দুঃখের জ্বালাও আসিয়া জুটিয়াছে। তাহা হইলেই দেখি, কামবর্জ্জনেই যথার্থ আত্মার স্ফূর্ত্তি, তাহাতেই আনন্দ, আত্মার সহজ বিমল আনন্দ। জোর করিয়া বর্জ্জন কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহার চেয়েও সরল একটা পথ আছে—সমর্পণের পথ। যাহা জীবস্বভাবে আমার কামনার ছিল, তাহা তোমার করিয়া দিলাম। তোমার শক্তি তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম—আত্মা নির্ম্মল হইল। এই বার প্রীতিসুখ উথলিয়া উঠিবে না কেন? সমর্পণের মূলে এই তত্ত্ব রহিয়াছে। এই জন্য দিয়া সুখ। দিলে আপনাকে পাই—যাহাকে দিই তাহাকেও পাই—দুইয়ে অভেদ হইয়া যায়। ইহাই আনন্দ—ভক্তির চরম সার্থকতা। ইহাকে আত্মরতি বল, আপত্তি নাই, তৎসুখসুখিত্ব বল—একই কথা। তবে এ যে আনন্দ—অক্ষয়, অব্যয়, সহজ আনন্দ—সে কথায় তো ভুল নাই।

দেবর্ষি নারদ এই সহজ আনন্দের পথটাই দেখাইয়া দিলেন—বলিলেন, "সব তাঁহাকে সঁপিয়া দাও; তাঁহাকে ভুলিও না—ভুলিতে পার না—কেননা সে যে তোমার আত্মা—ভুলিতে গেলে মর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে না?"



ভাব ও বস্তুর সমন্বয়

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—ঃ{*}ঃ—

হে নরনারীরূপী অদ্বিতীয় ভাব ও সৎস্বরূপ পরমাত্মন্,

আজ রাত্রিকার বক্তৃতার বিষয়টা ভারী কঠিন আর গোলমেলে। দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে যাদের পূর্ব্ব হতে একটু পরিচয় আছে, তারাই এর যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করতে পারবে। তোমরা ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে সবাই চলেই যাও, আর জগৎশুদ্ধ সবাই রামের কথা শুনতেই আস, তাতে তাঁর কিন্তু কিছুই আসে যায় না। সত্য হচ্ছে লোকরঞ্জনেরও বাড়া। বিজ্ঞানের আইন জগৎ শাসন করেছে, করছে এবং করবেই— এখন লোকে তা জানুক আর নাই জানুক। নিউটনের আবিষ্কারের পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণের আইন একই রকম ছিল। এমন কত আইন আছে, লোকে যার খবর জানে না, অথচ তার শাসনে জগৎ চল্‌ছে। খনিতে একখানা বড় হীরা পড়ে আছে, অথচ কেউ তার খোঁজ পায়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও হীরাতে তো আলো দেয়। তার পর লোকে তাকে তুলে নিয়ে মাথায়ই পরুক আর ফেলেই দিক, হীরার তাতে কি এল গেল?

বিষয়টা অবশ্য খুবই কঠিন; কিন্তু মন দিয়ে শুনলে তোমরা ধরতে পারবে বই কি! বল্‌তে পার, "এমন নিগূঢ়, যুক্তিবহুল, দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার কি প্রয়োজন ছিল? দরকার নেই—আমাদের কিছু নগদ বিদায় দিয়ে দিন—আমরা কাজের কথা চাই।" রাম কাজের কথাই এতদিন বলে এসেছেন বটে, কিন্তু ভাবের কথাও তো দুটা একটা চাই। মূলে একটা তত্ত্ব না থাক্‌লে কোনও ব্যাপারকেই পোক্ত করা চলে না। জানই তো, তোমাদের যত কিছু ব্যবহার সমস্তই হচ্ছে শক্তির কর্ম্মময় রূপমাত্র। কিছু লিখতে হলে কলম ধরবার আগে সমস্তটা বিষয় তত্ত্বরূপে মাথায় খেলে; সকল কর্ম্মের গোড়াতেই তাই ভাবের ভিত্ত। কোথায়ও যেতে হলে হাঁটাটা হল ব্যবহার, কিন্তু মন যদি দেহপেশীর গতিকে শাসন না করে, তাহলে চলা কি সম্ভবপর হয়? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এবং তার পাঠ্য বিষয়ের একটা ধারণা না নিয়ে কেউ কি কলেজে ভর্ত্তি হয়? চোর যদি প্রতিবেশী কারু ধন দৌলতের কথা হরদম শুন্‌তে থাকে, তাহলে এই সব উড়ো-খবরগুলো আর মনের ভাবগুলো একত্র জুটিয়ে তবে সে তাকে 'কর্ম্মের রূপ দেয় অর্থাৎ ধনীর ঘরে সিঁদ কেটে ঢোকে গিয়ে। মন না চললে কোনও কাজই হতে পারে না; যা করতে হবে, পূর্ব্বাহ্নে তার কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা চাই-ই।

তাই তোমরা যে ব্রহ্মস্বরূপ, এ কথাটা রাম বার বার তোমাদের কাণের মাঝে

সেঁধিয়ে দিতে চান, আর বুকের মাঝে ওই কথার ছাপ মেরে দিতে চান। দিনের পর দিন এই কথা শুনতে শুনতে বুকের মাঝে বসে যাক্ —পলে পলে মর্ম্ম বিদ্ধ করুক্। তারপর দেখবে, মনের আইনে এই যাকে বলছ বাক্যে কল্পনা, তাই তোমার কাছে কি করে মহাশক্তির নির্ঝর হয়ে ওঠে, এই জ্ঞানই তোমার মাঝে অফুরন্ত আনন্দ আর শান্তির খনি হয়ে ওঠে।

আজকার বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে, "বেদান্তের ভূমিতে ভাব ও বস্তুর সমন্বয়।" এও বলতে পার, আজকার বিষয়টা হচ্ছে, বৈদান্তিকের দর্শন ধারা। দার্শনিকের পক্ষে এটা ভারী জরুরী কিন্তু।

তার পূর্ব্বে ভাববাদ আর বস্তুবাদ সম্বন্ধে তোমাদের একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তার করবার সময় আমাদের নাই। যে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জগৎটা যেমন দেখাচ্ছে, আসলেও এটা ঠিক তাই, তাকে বলি বস্তুবাদ; আর ভাববাদীর মতে জগৎটা যা দেখছ, তা নয়; অবশ্য জগৎটা আছে, কিন্তু যেমনটী দেখাচ্ছে তেমনটী নয়। বস্তুবাদীর মতে জগৎটা ঠিক এই রকমই—এটা আসলেই খাঁটী। ভাববাদের আবার অনেক শাখা আছে। বিষয়িনিষ্ঠ ভাববাদ আছে—বার্কলে আর ফিক্‌টে হলেন তার পাণ্ডা। আবার বিষয়নিষ্ঠ ভাববাদ আছে—তার প্রবক্তা হলেন প্লাটো আর কান্ট্। নির্ব্বিশেষ ভাববাদ আছে—হেগেল আর শেলী তার ব্যাখ্যাতা—এমনিতর আর কত কি আছে।

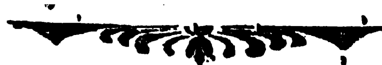
বেন ও মিলের মত দার্শনিক আবার বস্তুবাদের সমর্থক। বস্তুবাদ বা ভাববাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে সমস্ত মতবাদের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, আজকার রাতের বক্তৃতায় তাদের সমালোচনাও করব না। তবে তাদের সম্বন্ধে এইটুকু ইঙ্গিতে জানাব, যাতে বেদান্তের তত্ত্বটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

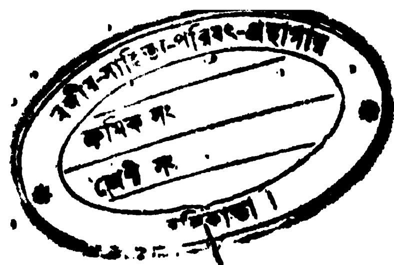
আসল কথা সুরু করবার আগে দুটী পরিভাষা বুঝিয়ে বলা দরকার—বিষয় এবং বিষয়ী। কথা দুটো এক এক শাস্ত্রে এক এক রকম ভাবে গ্রহণ করা হয়, এ বোধ হয় তোমরা জানই। দর্শন শাস্ত্রে বিষয়ী বলতে বোঝায় জ্ঞাতাকে, আর বিষয় বলে জ্ঞেয়কে। যখন এই কলমটা দেখছ, তখন এ হচ্ছে তোমার বিষয়, আর তুমি যে দেখছ, তুমি হচ্ছ বিষয়ী। যে দেখছে সে বিষয়ী, যা দেখছে তা বিষয়। সাধারণ কথায় বুদ্ধিকে বলবে বিষয়ী; কিন্তু বেদান্তের মতে বুদ্ধিও বিষয়। জ্ঞান তো, যাই দেখা যায় না কেন, তাই বিষয়; তুমি বুদ্ধিকেও দেখ, তার সম্বন্ধে চিন্তা কর, তর্ক কর, আইন কানুন দেখ কর। যার সম্বন্ধে চিন্তা চলে, তর্ক চলে, তাকে আর বিষয়ী বলি কি করে? সে তো বিষয়। যা খাঁটী বিষয়ী, চিন্তায় বা তর্কে তাকে ধরা যায় না। জ্ঞাতাকে কি করে জানা যাবে? ধর যে বিষয়ী, সে হয় জ্ঞাতা হবে, না হয় জ্ঞেয় হবে। যে মুহূর্ত্তে সে জ্ঞেয় হল, সেই মুহূর্ত্তেই সে বিষয় হল, আর বিষয়ী তো থাকল না। সাধারণ কথায় বিষয়ী বলতে কিন্তু আমরা বুদ্ধিকেই বুঝি। বেদান্তের মতে আসল বিষয়ী হচ্ছেন আত্মা—যিনি অনন্ত, ঘটে ঘটে এক ও অখণ্ড।

এই প্রসঙ্গে একটা সংস্কৃত কথা মনে রাখা দরকার। সংস্কৃতে বিষয়ীকে বলা হয় দ্রষ্টা আর বিষয়কে বলা হয় দৃশ্য। ব্রহ্ম বা আত্মা যথার্থ বিষয়ী। এই আত্মাকে সোপেনহাউর বলেন Will, হেগেল বলেন Absolute Intellect। জান তো সোপেনহাউর আর হেগেলের মত পরস্পরের বিরুদ্ধ। কিন্তু দেখ বেদান্ত তাঁদের মিলিয়ে দিচ্ছে। বেদান্ত বলছেন, সোপেনহাউরের Absolute Will ও যা, হেগেলের Absolute Intellect ও তা। সংস্কৃতে এই তত্ত্বকে বলা হয় ব্রহ্ম; ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ইচ্ছা, জ্ঞান, সত্তা ও আনন্দ।

তা হলে দেখ্‌তে পাচ্ছি, যথার্থ বিষয়ী হচ্ছেন আত্মা; আর ব্যবহারিক বিষয়ী হলেন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মা। তাহলে হল, বুদ্ধিকে কর্ত্তা রূপে রেখে আত্মাই হলেন বিষয়ী।

এখন দেখতে হবে, বস্তুবাদীরাই স্বপক্ষে কি যুক্তি দেখান, আর ভাববাদীরাই বা কি যুক্তি দেখান। এ একটা বিরাট বিষয়, তবে আলোচনাটা আমরা খুবই সংক্ষেপে করব। বার্কলের সমালোচনা করবার সময় আমাদের নাই। ভাববাদীদের উনি একজন চাঁই। তাঁর দর্শনের বনিয়াদ ভারী পাকা; যতক্ষণ বেদান্ত মেনে চলছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর যুক্তিকে কেউ প্রতিহত করতে পারেনি; কিন্তু বেদান্ত ছাড়বা মাত্রই তাঁর পথ ভুল হয়ে গেছে আর তিনি কেবল গোলক্‌ধাঁধার মাঝে ঘুরপাক খেয়েছেন। এসব খুব সরস সমালোচনা হত বটে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা অধ্যাপকদের সামনে বক্তৃতা করতে পেলে রাম হয়ত এ বিষয়ের দস্তুরমত আলোচনা করতে পারতেন। বাস্তবিক তাঁর দর্শনের প্রথম ভাগের সঙ্গে শেষ ভাগের কি আশ্চর্য্য বিরোধ। শেষকালে কিনা তাঁকে কতকগুলি ভাববিগ্রহ মান্‌তে হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে এক সগুণ ঈশ্বর; নইলে তো আর জগৎ ব্যাখ্যা করা চলে না। তিনি বলেন, প্রত্যেক বস্তুর পেছনেই একটা ভাবের বিগ্রহ রয়েছে—সেটা সূক্ষ্মদেহী না কি, তাও বলা যায় না। ইত্যাকার কত প্রলাপই না তিনি বকেছেন। যাক্ আজ রাতে আর সে কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না। (ক্রমশঃ)





কোন্ পথ শ্ৰেষ্ঠ ?

—*:():*—

তোমাৰ পথ যে শ্ৰেষ্ঠ, ইয়াৰ প্ৰমাণ কি যুক্তিতৰ্ক দ্বাৰা নিৰূপিত হব, নাই শাস্ত্ৰদ্বাৰাই নিৰূপিত হব ? শাস্ত্ৰ কিম্বা তৰ্ক কতো ইয়াৰ প্ৰমাণ নাই। তোমাৰ পথ যে শ্ৰেষ্ঠ, এইটোৰে প্ৰমাণ আছে তোমাৰ হাতত। তুমি তোমাৰ কৰ্ত্তব্য সমাপন কৰি তাৰ সাৰ্থকতা প্ৰমাণিত কৰিব লাগিব। তোমাৰ পথৰ শ্ৰেষ্ঠতা নিৰূপিত হব তোমাৰ কৰ্ত্তব্য দ্বাৰা। এই পথ সহজ, সিটো টান, এইটো এটা কল্পনা মাত্ৰ। তুমি অসমীয়া, সেই কাৰণে ইংৰাজৰ মাতৃভাষা তোমাৰ ওচৰত কঠিন; কিন্তু ইংৰাজলৰাৰ প্ৰতি তো টান নহয়। ভাষাৰ ভেদ থাকিলেও ভাব দুয়োৰো এক। এনে এঠাইলৈকে আমি যাব পাৰো, যত ভাষাৰ ভেদত ভাবৰ বিনিময় কৰাত কোনো বাধা নপৰে। তাত ভাবেই স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত—ভাষাৰ খোলা খহি পৰিছে।

সেই কাৰণেই কওঁ, সংসাৰত থাকিলে ভগবান লাভ হবনে, নাই সংসাৰ এৰিলে হব, এই তৰ্কই মিছা, যদি ভগবানৰ প্ৰতি প্ৰাণৰ টান নেথাকে। জীবনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য তেওঁক লাভ কৰা। কত তেওঁক পোৱা যায়, সেইটো তেঁৱেই তোমাক কৈ দিব। মোৰ পক্ষে যিটো সহজ তেওঁ তাৰেই ব্যবস্থা কৰি ৰাখিছে। জন্মিবৰ পূৰ্ব্বেই যি মাতৃস্তনত পিয়াহৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তেওঁ মোৰ প্ৰাণৰ সত্য সকলোতে আছে,—এই শ্ৰদ্ধাকণ লৈ চলিব পাৰিলেই হয়। সত্য সংসাৰতো আছে, বনতো আছে। মূলত লক্ষ্য উভয়ৰে এক, লক্ষ্য হেৰুৱালে সংসাৰতো ঠগিবা, বনতো ঠগিবা। সকলোৰে আকৃতি প্ৰকৃতি বিভিন্ন, কাজেই ৰুচিও সকলোৰে ভিন্ন। কাৰো পক্ষে সংসাৰেই ভাল, কাৰো পক্ষে বনেই ভাল। ইয়াৰ মাজত কোনটো ভাল কোনটো বেয়া, তাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ যোৱা অজ্ঞানৰ পৰিচায়ক মাত্ৰ। যি ইয়াৰ শ্ৰেষ্ঠতা বিচাৰে, সি নিশ্চয় মানুহৰ মাজত যি সত্য আছে তাক নেদেখে,—দেখে মাত্ৰ বাহিৰৰ চাল চাল, অৰ্থাৎ ভেল.টা।

মূৰ-গণ্‌তিত বেছী হলেই কোনো কিছু ডাঙৰ নহয়। সংসাৰী অনেক, বিৰাগী তাকৰ, সেই বুলিয়েই যে সংসাৰী শ্ৰেষ্ঠ, এনে ধাৰণা কৰা ভুল। সংসাৰী ও বিৰাগী উভয়ৰ মাজত বিচাৰিলে খাটি সংসাৰী বা খাটি বিৰাগী হাজাৰজনৰ যে কেইজন ওলায়, তাৰ ঠিক নাই। উভয়ৰ মাজত দলাদলি হোৱা, শ্ৰেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিচাৰ কৰা সুবুদ্ধিৰ কাম নহয়। বাহিৰ দেখি বিচাৰ নকৰি, উভয়ৰ মাজত যি সত্য নিহিত আছে, তাৰ বিচাৰ কৰা—দেখিবা উভয়ৰে লক্ষ্য এক; উভয়ৰে মাজত খুব ওচৰ সম্পৰ্ক—কাকো এৰি কাৰো নচলে।

হেপাহ বুজিও কি তাৰ কোনো ব্যবস্থা কৰা নাই? মই যত থাকিলে তেওঁক পাব পাৰে, ঠিক তেনে ঠাইতে তেওঁ মোক ৰাখিছে—আশা, আকাঙ্ক্ষা, হেপাহ মনত জগাই দিছে তেনে দৰেই। কেৱল হাত ভৰি এচাৰিলে হব কি? যতে ৰাখিছে, ততে স্থিৰ হৈ বহা। প্ৰবৃত্তিৰ আহ্বান আৰু নিবৃত্তিৰ আহ্বান—দুয়োৰো পাৰ্থক্য কৰিবলৈ শিকা। তেওঁৰ কথা শুনি যদি চলো—তেনেহলে আৰু ভয় নাই ক'তো—য'তেই থাকো. তালৈকে তেওঁ লৰি আহিব। মানুহে কি তেওঁক লাভ কৰিব জোৰ কৰি—যদি তেওঁ ধৰা নিদিয়ে? আকৌ ইয়াকো জানো, তেওঁ ধৰা দিবলৈকে বহি আছে। পৰীক্ষাৰ কথাকে ধৰা; তেওঁ তোমাক যেনে কঠিন সমস্যা দিছে, ঠিক তেনে উত্তৰো দিছে প্ৰাণত জগাই। যাৰ যিমান বিদ্যা, তাক তেনে দৰেই প্ৰশ্ন কৰে তেওঁ। তেওঁ এনে পৰীক্ষক নহয় যে ছাত্ৰক ঠগাই ফেল কৰিবৰ ইচ্ছাৰে কঠিন প্ৰশ্ন কাবৰ। পৰীক্ষাত পাশ কৰোৱাই তেওঁৰ ইচ্ছা—ফেল কৰোৱা নহয়।

যতে তেওঁ ৰাখিছে, ততে স্থিৰ হৈ বহা, মন, প্ৰাণ এক কৰি উৎকৰ্ণ হৈ তেওঁৰ কথা শুনা। যি অৱস্থাতেই থাকা, কৰ্ত্তব্য কতো কম নহয়। সংসাৰতো যেনে দায়িত্ব, সংসাৰৰ বাহিৰেও তেনে দায়িত্ব। দায়িত্ব কাৰো কম নহয়। দায়িত্ব, কিয়?—নাই তেওঁ তোমাক অলপ ইচ্ছাৰ স্বাতন্ত্ৰ্য দিছে বুলি। তুমি যে পশুপক্ষীৰ দৰে নোহোৱা। সিহঁতৰ তো কোনো চিন্তা নাই—খোৱা-শোৱা সকলোৰে ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত। কিন্তু মানুহৰ পক্ষে সেইটো নহয়। তুমি মানুহ, তোমাৰ মাজে দি তেওঁৰ লীলা ফুটি উঠিব আৰু আচৰিত ৰূপে। অকল ফুটি উঠাই নহয়—তুমি নিজে সেই লীলাৰ আস্বাদ অনুভৱ কৰিবা—কৰি আত্মহাৰা হবা। যিমানেই শক্তিৰ স্ফুৰণ হব, সিমানেই তেওঁৰ লগত একাত্মবোধ বুজিব পাৰিবা। সেই কাৰণেই তেওঁ তোমাক অসহায় অথচ স্বাধীন কৰি এৰি দিছে—ভাল বেয়া দুয়ো তোমাৰ সম্মুখত দিছে; বাচি লোৱা। আকৌ বাচনিত ভুল হলে তাকো সংশোধন কৰি দিছে;—সংশোধন কৰিছে আঘাত কৰি—বুদ্ধি জগাই—শক্তি জগাই। এই কাৰণেই মানুহ বুলি তোমাৰ কৰ্ত্তব্যৰ বোজা বেচি। কিন্তু পশুপক্ষীৰ কোনো কৰ্ত্তব্য নাই; সিহঁতৰ কামৰ ভাল বেয়াৰ বিচাৰ নাই।

কৰ্ত্তব্যই হ'ল জীৱনৰ নিয়ামক। সকলো কামকে কৰিবৰ সামৰ্থ্য ও প্ৰবৃত্তি আছে তোমাৰ, এনে স্থলত তুমি কোনটো কৰিবা, কোনটো নকৰিবা, এয়ে হ'ল সমস্যা। আদৰ্শও আছে তোমাৰ মাজতে। বিকাশ আৰু অবিকাশ, শক্তি আৰু দুৰ্ব্বলতা, চেতনা ও জড়তা—দুয়োকো তুমি বুজা; তাৰ মাজত তোমাৰ কোনটো ইষ্ট, তাকো বুজা বেচ। দেহ, মনত বল হওক, চিত্ত বিকশিত হওক, জ্ঞানৰ দীপ জ্বলি উঠক—এইটো ইচ্ছা নহয় কাৰ? সুতৰাং সেয়ে তোমাৰ পথ। কৰ্ত্তব্যক সেই আদৰ্শত পৰিচালিত কৰাই হ'ল তোমাৰ কাম।

কাজেই দেখা গ'ল, মানুহ মাত্ৰৰে আদৰ্শ এক—কৰ্ত্তব্যৰ ঠেলাও সকলোৰে পক্ষে সমান। অৱশ্যে পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাভেদে কৰ্ত্তব্যৰ প্ৰকাৰ ভেদ হ'ব পাৰে। কৰ্ত্তব্য সংসাৰীৰো আছে, বিৰাগীৰো আছে। যেতিয়ালৈকে উভয়ে উভয়ৰ কৰ্ত্তব্য কৰে,

তেতিয়ালৈকে উভয়েই খাঁটী। কৰ্ত্তব্যত ফাকি দি যি নিজক ঠগাই, সি ভণ্ড। অকল বৈৰাগীয়েই ভণ্ড নহয়, সংসাৰধৰ্ম্মত যি ফাকি দিয়ে, সিও ভণ্ড সংসাৰী। ভগবানৰ চকুত ধূলি মৰা সাধ্য নাই কাৰো। যি যেনে কাম কৰিব, তাক ঠিক তেনে দৰেই ফল দি ইহুৰাই-কন্দুৱাই শিকাব—নিজৰ কৰি ল'ব। তুমি যি খুচি কৰা, তোমাৰ সাত খুন মাফ—এনে পৰোৱানা তেওঁ কাকো নিদিয়ে। পিছে তৰ্কৰ জোৰত যদি তেওঁৰ কথাৰ এনে অৰ্থই কৰি লওঁ, তেন্তে সি আমাৰ দুৰ্ভাগ্য।

কোনে কয় যে সংসাৰ প্ৰবৃত্তিৰ পথ? বেচিভাগ লোকে প্ৰবৃত্তিৰ পথত চ'ল বুলিয়েই যে সেইতো ভগবানৰ আইন হ'ল, এনে ধাৰণা কৰা ভুল। সংসাৰ প্ৰবৃত্তিৰ পথ, এইটো এটা কথাৰ কথা মাত্ৰ—ভগবানৰ আদেশ নহয়। তুমি সংসাৰ পথত চলিছা বুলিয়েই কি তুমি কব পাৰা যে, প্ৰবৃত্তিই মোৰ পথ? এক হিচাবে প্ৰবৃত্তি সকলোৰেই পথ—কিন্তু লগে লগে আকৌ শাস্ত্ৰত কৈছে, "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—সুতৰাং নিবৃত্তিয়েই তোমাৰ আদৰ্শ পথ। প্ৰবৃত্তিৰ পথত চলা আপত্তি নাই—কিন্তু এদিন খুন্দা খাই উভতিবই লাগিব তুমি। পিছে যি বুদ্ধিমান, তেওঁ গুৰুজনৰ আদেশ শুনি ভাবে, খুন্দা খাই ওভোতাতকৈ সেই পথে নোযোৱাই ভাল।

সংসাৰৰ মাজতো এটা ভাব, বাহিৰতো এটা ভাব আছে; দুয়ো সুন্দৰ, দুয়োৰো সমন্বয়ে জীৱন পূৰ্ণ। পিছে কওঁ শুনা, ৰুচি অনুযায়ী, কৰ্ম্ম অনুসৰি নিজে নিজে এটা পথ বাচি লোৱা। দুয়ো যেতিয়া নিজ নিজ কৰ্ত্তব্য কৰি যায়, তেতিয়া বাধা নেথাকে কতো—উভয়েই সত্য লাভ কৰে, আনন্দ লাভ কৰে। কিন্তু য'তে কৰ্ত্তব্যত ফাকি, ত'তে খিৰাখিৰি, তাল-বেয়াৰ বিচাৰ। তেতিয়া এজনে আনজনক নিজ দললৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰে।

প্ৰবৃত্তি পথত বহুত লোকে চলে, কিন্তু সেই বুলিয়েই যে সেই পথৰে অনুসৰণ কৰিব লাগে, তাৰ'টো মানে নাই। এই কথা বাৰে বাৰে কৈছো; সংসাৰত আছা বুলিয়েই, তুমি প্ৰবৃত্তিৰ দখলিস্বত্ব পোৱা নাই, ইয়াত থাকিয়েই ভগবানৰ মহিমা নিজ জীৱনত বিকাশ কৰিব লাগিব; দহৰ ওচৰত আদৰ্শ হ'ব লাগিব—ঠিক ভগবানৰ দৰে সংসাৰী হ'ব লাগিব তুমি।

এটা গল্প মনত পৰিছে;—এক ব্ৰহ্মচাৰীয়ে গুৰুৰ ঘৰত পাঠ শেষ কৰি, গুৰুক সুধিলে, "প্ৰভো এতিয়া মই কোন আশ্ৰম গ্ৰহণ কৰিম? কোন আশ্ৰম শ্ৰেষ্ঠ, গাৰ্হস্থ্য নে সন্ন্যাস?" গুৰুৱে কলে, "এই কথাৰ উত্তৰ এতিয়া নিদিওঁ। তই কিছু দিন ফুৰি আহ;—তেতিয়া মই তোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। বাটত যদি আচৰিত কিবা দেখ তেন্তে আহি মোক কহিবি"। এই কথা শুনি ব্ৰহ্মচাৰী ভ্ৰমণৰ কাৰণে ৰওনা হ'ল। এদিন নানা ঠাই ঘূৰি ফুৰি আহোঁতে এখন হাবিৰ মাজতে সন্ধ্যা লাগিল। ব্ৰহ্মচাৰীয়ে সন্ধ্যা লগা দেখি, এজোপা গছত উঠি ৰাতিটো কটাব মন কৰি তাত উঠিল। সেই গছত এজোৰ চৰাইৰ বাহ আছিল। সেই দিনা বৰ বতাহ বৰষুণ। সন্ধ্যা লাগিল, কিন্তু মাইকী চৰাই জনী বাহলৈ অহা নাই, তাইৰ বিপদ শঙ্কা কৰি মতাটোৱে চিঞৰিছে; এনেতে এটা ব্যাধ বৰষুণত তিতিবুৰি আহি সেই গছৰ তলতে ক্লান্ত হৈ বহিলহি। তাৰ হাতত আছিল, সেই মাইকী চৰাইজনী। তাই মতা-

চৌৰ চিঞৰ শুনি কলে, "তুমি এতিয়া চিঞৰ এৰা, এই মানুহজন আমাৰ অতিথি, এওঁ বৰ ক্লান্ত, অচিৰে এওঁৰ শুশ্ৰূষাৰ ব্যৱস্থা কৰা।" এই কথা শুনা মাত্ৰে চৰাইটো নামি আহি ব্যাধক কলেহি, "প্ৰভো, আপোনাৰ সেবাৰ আজ্ঞা হওক।" ব্যাধে চৰাইৰ ব্যৱহাৰ দেখি আচৰিত হ'ল, আৰু কলে, "মই জাৰত বৰ কষ্ট পাইছো, সোনকালে জাৰ নিবাৰণৰ উপায় কৰা।" চৰায়ে এই কথা শুনা মাত্ৰে কিছুমান শুকান পাত সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু কৰবাৰ পৰা এডোখৰ জুই আনি জুই ধৰিলে। জুইৰ তাপ পাই ব্যাধৰ জাৰ গুচিল, তেতিয়া ব্যাধে পুনঃ কলে, "মই ক্ষুধিত; মোক কিছু খাবলৈ দিয়া।" চৰায়েটো কোনো বস্তু সাঁচি থোৱা অভ্যাস নাই, কাজেই চৰাইটো বিমোৰত পৰিল, ব্যাধক খাবলৈ কি দিব? অৱশেষত কলে, "প্ৰভো, মোৰ ঘৰত এনে একো নাই, যাক দি আপোনাৰ ভোক নিবাৰণ কৰিব পাৰে। অতএব মোৰ মঙহ খায়েই আজি আপোনাৰ ক্ষুধা গুচাওক—" এই বুলি চৰাইটো জুইত জাপ দি পৰিলে, তাকে দেখি মাইকী চৰাইজনীয়ে মাত লগালে, "এৰা, চৰাইৰ মঙহে আপোনাৰ কি ভোক গুচিব, অতএব মোৰ মঙহো খাওক"—এই বুলি তায়ো জুইত জাপ দিলে। এই চৰাই হালৰ আচৰিত আত্মোৎসৰ্গ দেখি ব্যাধ তধা লাগিল, সি মঙহ-তঙহ ধেনু-কাঁড় তাতে পেলাই ভগবানৰ নাম কৰি প্ৰস্থান হ'ল। গছৰ ওপৰৰ পৰা ব্ৰহ্মচাৰীয়ে ঘটনাটো দেখি আছিল। দেখি ভাবিলে যে এইটো এটা আচৰিত ঘটনা—গুৰুদেৱক জনাব লাগিব। এই বুলি পাচ দিনা আকৌ অইন ঠাইলৈ বাট ললে।

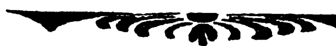
ফুৰি ফুৰি কিছু দিনৰ পাচত সেই ব্ৰহ্মচাৰী গৈ এখন ৰাজনগৰ ওলাই দেখিলে যে ৰাজবাটীৰ ওচৰত বহুত মানুহ সমাগম হৈছে। ৰজাই মন্ত্ৰী, সভাসদ্ সহ সম্মুখত বহি আছে, ওচৰতে এজনী পৰমা সুন্দৰী ছোৱালী থিয় দি আছে; আৰু দেখিলে ৰজাৰ সম্মুখত এখন কেৰাহিত তপত তেল উটলি আছে। ব্ৰহ্মচাৰীৰ কৌতূহল জন্মিল, ব্যাপাৰ কি জানিবৰ মনে ওচৰ চাপিল। পৰস্পৰৰ মুখে জানিলে যে, ৰজাৰ ওচৰত থিয় দি থকা ৰাজকন্যাৰ স্বয়ম্বৰ। ৰজাই পণ কৰিছে, যি তপত তেলত ডুব দি ওলাই আহিব পাৰিব, সেয়ে তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যাক বিবাহ কৰাব, আৰু ৰজাৰ মৃত্যুৰ পাচত ৰাজসিংহাসনৰ অধিকাৰী হব। বহুত ৰাজপুত্ৰ আহিছে, কিন্তু কোনেও এই দুঃসাহসিক কাম কৰিবলৈ সাহ কৰা নাই। লাহে লাহে বেলিও মাৰ যাব লগা হ'লহি। ৰজাই মনে মনে চিন্তা কৰিছে জানোচা তেওঁৰ পণ কোনেও ৰাখোতা নোলায়; জানোচা কন্যাৰ স্বয়ম্বৰ নহয়। এনেতে এজন সন্ন্যাসী কাৰোফালে ভ্ৰূক্ষেপ ন কৰাকৈ আহি কেৰাহিৰ ওচৰত উপস্থিত হল'হি। কিছু কাল কেৰাহিৰ ফালে চাই হঠাৎ কেৰাহিত জাপ দিলে আৰু অক্ষুণ্ণ শৰীৰে ওলাই আহি আপোন মনে পুনঃ যাবলৈ ধৰিলে। চাৰিও ফালে হৈ চৈ পৰিল। ৰজাই উৎফুল্ল চিত্তে গৈ সন্ন্যাসীক প্ৰণাম কৰি কলে, "আপুনি যাব কলৈ। মোৰ পৰম সৌভাগ্য, সেই হেতু মই আপোনাৰ নিচিনা এজন সাধুসন্ন্যাসীক জোঁৱাই ৰূপে লাভ কৰিলো। আপুনি মোৰ পণ অনুসৰি তেলত ডুব দিলে, গতিকে মোৰ একমাত্ৰ কন্যাক আজি আপোনাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিলো, আজিৰ পৰা মোৰ কন্যা ও

এই ৰাজ্য আপোনাৰ; গ্ৰহণ কৰি; কৃতাৰ্থ কৰক।”

সন্ন্যাসীয়ে অলপ আচৰিত হৈ কলে, “ৰজা, তুমি কৈছা কি? মই জো তোমাৰ পণৰ কথা একোকে নেজানো। তেল দেখি এটা প্ৰবৃত্তি হ’ল, সেই কাৰণ তেলত ডুব দিলো। তোমাৰ কন্যা বা ৰাজ্যত মোৰ প্ৰয়োজন নাই।” এই বুলি সন্ন্যাসী গুচি গ’ল। ব্ৰহ্মচাৰীয়ে ঘটনাটো দেখি চমৎকৃত হ’ল, আৰু ভাবিলে, ইও এটা আচৰিত ঘটনা—গুৰুদেবক জনাব লাগিব। এই ভাবি প্ৰস্থান হ’ল।

যথাসময়ত ব্ৰহ্মচাৰী গুৰুৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ দুয়োটা ঘটনা আদ্যোপান্ত নিবেদন কৰিলেহি। গুৰুৱে কলে, “বৎস, তুমি সুধিছিলা, গাৰ্হস্থ্যাশ্ৰম শ্ৰেষ্ঠ নে নাই সন্ন্যাসাশ্ৰম শ্ৰেষ্ঠ? তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই দুটা ঘটনাৰ মাজতে আছে। যদি চৰাইহালৰ দৰে আত্মোৎসৰ্গ কৰিব পাৰা, তেন্তে গৃহস্থ হোৱা—আৰু যদি সেই সন্ন্যাসীৰ দৰে অনাসক্ত হ’ব পাৰা, তেন্তে শেষ আশ্ৰম গ্ৰহণ কৰা।”

এতিয়া কোয়াচোন কোন পথ শ্ৰেষ্ঠ? মই সেই কাৰণেই কওঁ, সত্য সকলোতে আছে। মাত্ৰ লাগে, শ্ৰদ্ধা, অকৃত্ৰিম প্ৰাণ, আৰু প্ৰবৰ্ত্তকেৰ পক্ষে লাগে—কৰ্ত্তব্যত নিষ্ঠা।



বেদের কথা

—*※()※*—

একটা কথা আছে, বেদ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদ বলিতে আমরা একখানা কেতাব বুঝি, তাই কথাটা শুনিয়া অবাক্ হই। যদি বলি বেদ অর্থ জ্ঞান, তাহা হইলে বৈদান্তিকের মত কথাটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে আর একটা দিক ঢাকা পড়ে। মীমাংসক বলিবেন, বেদ শব্দরাশি। শব্দ যদি বেদের শরীর হয়, আর বেদ হইতে যদি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে শুদ্ধ শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করিবার একটা সঙ্কেত পাওয়া যায়। শব্দ হইতে জগৎ—এ কথাটার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আজকাল দুর্লভ নয়। কিন্তু বেদরূপ বিশিষ্ট শব্দরাশি হইতে জগৎ—এ কথাটার অনেকের খট্‌কা আছে। যদি বিশ্বাসবশে মানিয়া লই, তাহা হইলে ল্যাঠা চুকিয়া যায়। কিন্তু যদি কেহ প্রমাণ চায়, তাহা হইলেই মুস্কিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া কঠিন, কেননা বৈদিক সাধনার ধারা বহু যুগ ধরিয়া লুপ্ত। তবে অনুমান বলে কতকগুলি যুক্তি খাড়া করা যায়। বেদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে এখন আমাদের এই অনুমানই সম্বল। তবে ইহাতে লাভ আছে। বেদ জিনিষটা কি, তাহা বুঝিয়া হিন্দুয়ানীর গোড়ার কথাটা ধরিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

মোটামুটী দুই চারিটা কথার ইঙ্গিত

করিব, কেননা যে সাধনা বহুদিন বিলুপ্ত, তাহার সম্বন্ধে সবিস্তার বলা সাধ্যাতীত।

এই বেদ হইতেই জগৎ হইয়াছে—এমন প্রমাণ করা সহজ নয়। কিন্তু বেদের গাঁথুনী যে রকম, তাহাতে বেদের শব্দ-রাশি সৃষ্টির লয়ে বাঁধা, এ কথাটা বোধ হয় প্রমাণ করা যাইতে পারে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড সকামযজ্ঞের প্রবর্ত্তক। যজ্ঞ কামনাসিদ্ধির অলৌকিক উপায়, ইহাই বেদের মীমাংসা। বেদের মন্ত্রে যে বাসনার স্পন্দনগুলিকে রেকর্ড করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ইচ্ছা করিলে সেই স্পন্দন জাগাইয়া বিশিষ্ট সৃষ্টি করা সম্ভব, এই কথাটাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ একটা কথা বেদের অপর নাম ছন্দঃ। ম্যাক্‌সমুলার বলেন, ছন্দোভাগ বেদের প্রাচীনতম অংশ। সে তাঁহাদের কথা; ইহার সত্যাসত্য বিচার তাঁহারাই করুন। বেদ আর ছন্দঃ যে সমানার্থক, ইহাই আমাদের বক্তব্য। ছন্দঃ কথার দুইটা অর্থ পাই—এক কবিতা আর এক বাসনা। "কবিতার ছন্দঃ" এটা সবারই শোনা কথা; বাসনা অর্থে "স্বচ্ছন্দ" কথাটাও বাঙ্গালা ভাষার অপরিচিত নয়। এখন প্রশ্ন হয়, বেদের নাম ছন্দঃ হইল কেন।

বেদ যে গোড়াগুড়ি কবিতা, একথা সবাই জানি। কবিতার মাঝে একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই—আবর্ত্তন। গদ্য একটানা; কিন্তু পদ্যে যতি আছে, নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসা আছে। ইহাকে আমরা বলি মিল বা তুক্। যতি আর মিল, দুইটা নিয়া হয় ছন্দঃ। আমাদের ভাষায় যে কবিতা হয়, তার মিল হয় ধ্বনিতে। ইহার মাঝে ব্যঞ্জনের প্রভাব সুস্পষ্ট। দেবভাষায় যে কবিতা তাহার মিল স্বরে—একই পর্য্যায়ে স্বরের সঙ্গে স্বর গাঁথিয়া কবিতা রচনা হয়। ব্যঞ্জনের মিল আর স্বরের মিল, দুইটাতে একটা মর্ম্মান্তিক পার্থক্য আছে। ব্যঞ্জন একটা অভিঘাত—হোঁচট্ খাওয়ার মত। আর স্বর হইল কম্পন; সেই জন্য তার হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত ইত্যাদি ভেদ সম্ভব। কবিতার আবৃত্তিধর্ম্মের মাঝে যে সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, তাহা যদি আগা-গোড়া স্বর দিয়া গাঁথা থাকে, তাহা হইলে কঠিন ব্যঞ্জনাত্মক অংশটুকু বাদ দিলে কবিতাতে শুধু একটা স্বরের কম্পন অবশিষ্ট থাকিবে। সংস্কৃত কবিতার ইহাই বিশেষত্ব, ইহা সকলেই জানেন। আধুনিক বাংলা কবিতাতেও এই স্বরবাহুল্যের বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে স্বরকম্পন শুধু হ্রস্বদীর্ঘ নিয়া। কিন্তু বৈদিক ছন্দে তদতিরিক্ত উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এই তিনটী স্বর-ধর্ম্মের লীলা।

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতের স্বরূপ কি, আজ তাহা বলা কঠিন। ছন্দে শুধু তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ আছে, শিক্ষাগ্রন্থে অস্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু স্বরূপ চিনাইয়া দিবার কেহ নাই। মহাভাষ্যকার উদাত্ত ও অনুদাত্ত সম্বন্ধে দুইটী কথা বলিয়াছেন,—উদাত্ত আয়াম, আর অনুদাত্ত অন্বসর্গ। নিজেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, প্রথমটীতে সমস্ত শরীরের নিগ্রহ বা স্তব্ধতা, দ্বিতীয়ে শিথিলতা। ঊর্দ্ধ ও অধঃ দুইটী স্থানও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মূল সূত্রেও তাহা আছে। কিন্তু ইহাতেও ব্যাপারটা কি, তাহা স্পষ্ট হয় না। তাই মহাভাষ্যপ্রদীপে কৈয়ট বলিতেছেন, "অভ্যাসসমধিগম্যশ্চায়ং স্বরবিশেষঃ ষড়্‌জাদিবদ্ বিজ্ঞেয়ঃ—সারেগম

সাধিবার মত এই স্বরের সাধনা করিতে হয়।” কিন্তু এই সাধন করায় কে? ঋক্‌প্রাতি-শাখ্যের টীকাকার বলিতেছেন, “বায়ুবশতঃ শরীরের যে ঊর্দ্ধগমন, তাহা আয়াম, আয়াম সহ যাহা উচ্চারিত, তাহা উদাত্ত; বায়ুবশতঃ শরীরের যে অধোগমন, তাহা বিস্রম্ভ; বিস্রম্ভ সহ যাহা উচ্চারিত, তাহা অনুদাত্ত; বায়ুবশতঃ শরীরের আক্ষেপ বা তির্য্যগ্‌গমন সহ উচ্চারিত স্বরিত।”—এখানে বায়ু পরিচালনার কথা পাইলাম; অনুমান করিতে পারি, বায়ুর সহায়তায় সমস্তটা শরীর খেলাইয়া স্বর উচ্চারণ করিতে হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা কিছু বোঝা গেলনা।

শিক্ষাতে আর একটী কথা আছে—“উদাত্ত হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্ত হইতে ঋষভ ও ধৈবত এবং স্বরিত হইতে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমের উৎপত্তি।” এইটুক ইঙ্গিতে সায় দিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, বৈদিক স্বর musical accent মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাহা কেহ খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না। শিক্ষাতে আর একটী কথা আছে, “অনুদাত্ত হৃদয়ে, স্বরিত কণ্ঠমূলে এবং উদাত্ত মস্তকে।” বুঝিলাম, এই স্থানগুলিকে যথাক্রমে কম্পনের আশ্রয় করিতে হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা বোঝা গেল না।

প্রত্যেকটী স্বরে উদাত্ত, অনুদাত্ত বা স্বরিতের একটা না একটা বর্ত্তমান। ইহাদের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে পাঠক পূর্ব্বেই একটু ইঙ্গিত পাইয়াছেন। পারায়ণের সময় গুরুর মুখে শুনিয়া যথাযথ আবৃত্তি করিতে হয়। তাহার বিশেষ বিধান আছে। আবৃত্তির অনুকূলে শরীর ও মন গঠন করিবার জন্য বহু বিধিনিষেধ আছে। এমন কি এক একটা বেদভাগের আবৃত্তি অধিগত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে ব্রত গ্রহণ করিতে হয়—সেই জন্য অনুপ্রবচন বেদভাগের বিশেষ নাম। এতখানি আয়োজন করিয়া তার পর বায়ুকে হৃদ্‌পদ্ম হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত প্রতি স্বরে খেলাইয়া নিয়া কম্পন তুলিতে হইবে। স্বরের কম্পন ও চিত্তের স্পন্দন একাকার হইয়া যাইবে—শব্দ কাঁপিয়া কাঁপিয়া রূপের সৃষ্টি করিবে—ভাব মূর্ত্ত হইবে। বৈদিকছন্দের এইটুকু—বিশেষত্ব। সামান্যতঃ আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি, কিন্তু বিশেষ বিধি দেখাইয়া দিবার কেহ নাই।

প্রয়োগের তারতম্যে এই মন্ত্র একদিকে যেমন কামধেনু, অপরদিকে তেমনি বজ্রস্বরূপ। বেদ স্বয়ং তাহা বলিয়াছেন—“একা বাক্ সম্যক্ জ্ঞাতা সুপ্রযুক্তা স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ ভবতি”; আবার, “দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোপ রাধাৎ।” স্বরকম্পনের দোষে বৃত্র ইন্দ্রহন্তা না হইয়া ইন্দ্র বৃত্রহন্তা হইয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথব্রাহ্মণে এই কাহিনী সবিস্তার বর্ণিত আছে। শব্দের এই সূক্ষ্ম সাধনা আজ লুপ্ত, বেদপন্থা ম্লান। তন্ত্র এই শব্দতত্ত্বকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া মন্ত্রশক্তিকে অন্য উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন। সে কথা পরে বলিব।

ছন্দঃ সম্বন্ধে আর একটী কথা। ছন্দঃ আবৃত্তি বা তাল, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন। ছন্দঃ স্বরের লীলা। প্রাতিশাখ্য স্বরকে বলি-

তেছেন "অক্ষর"; উপনিষদেও ব্রহ্ম "অক্ষর।" ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইবে। অক্ষর স্বর ধ্বনির মূল; অক্ষর ব্রহ্ম জগতের মূল। মূল তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে বৈচিত্র্যের তরঙ্গ, তাহাই লীলা। ব্রহ্মের লীলা জগৎ, স্বরের লীলা ছন্দঃ—দুইটী তত্ত্ব সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে। যিনি ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, বেদ হইতে সৃষ্টি এ কথার অর্থ কি। ছন্দের আবৃত্তিধর্ম্ম, আর সৃষ্টিলীলা একই তত্ত্বের বিকাশ। শ্রুতিতে আছে—"যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—এই কল্পে যাহা আছে, তাহা পূর্ব্ব কল্পেরই আবৃত্তি। শুধু এক কল্প হইতে আর এক কল্প পর্য্যন্ত কেন, এক অয়ন হইতে আর এক অয়ন, এক পক্ষ হইতে আর এক পক্ষ, একদিন হইতে আর একদিন—সৃষ্টিতে আমরা দেখি, অক্ষরের বুকে আবৃত্তির লীলা। এই তো ছন্দঃ। ইহাকে বলি বিশ্ব-ছন্দঃ। শ্রুতিও বলিতেছেন—"পৃথিবী একটা ছন্দঃ, নক্ষত্রগুলি এক একটা ছন্দঃ, আকাশ ছন্দঃ, অন্তরীক্ষ ছন্দঃ ইত্যাদি।" এই বিচিত্র ছন্দে গ্রথিত অপরূপ বিশ্ব কাব্যের কবি সেই অক্ষরপুরুষ। বেদ বলিতেছেন, তিনি কবি, তিনি মনীষী।

বেদপন্থী বলিতেছেন, বেদ বিশ্বকাব্যেরই একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বিশ্বছন্দঃ যেমন অনাদি অনন্ত, বেদও তাই। বেদ সেই পুরুষেরই নিশ্বাসের তাল, অন্য কেহ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা নাই; তাই বেদ অপৌরুষেয়। যে কম্পন সৃষ্টির মূলে, তাহাই ঋষির বুকে নামিয়া আসিয়াছে—শুদ্ধহৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে। সৃষ্টির এই স্বরলিপিই বেদ—ঋষি তাহা ধরিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ অর্থে কর্ম্মে, জীবনে বিশ্ব-বাসনাকে মূর্ত্ত করিয়া তোলা। এই যজ্ঞ সেই আদিম দেবযজ্ঞেরই অনুকরণ মাত্র (পুরুষসূক্ত)। যজ্ঞ সম্বন্ধে যিনি একটু আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, উহাতে বিশ্বের এক একটা বিভাবকে মূর্ত্তি দেওয়ার সঙ্কেত রহিয়াছে। যজ্ঞের ফল অমৃতত্ব বা অদ্বৈতবোধে লয়। মন্ত্র তাহার সাধন। যে কম্পনের অবতরণে দ্বৈতের সৃষ্টি, সেই কম্পন ধরিয়া উজাইয়া যাওয়া। এই জন্য বেদপন্থীর কাছে বেদ ও বিশ্ব এক।

স্বরের বিচিত্র বিন্যাস ও আবৃত্তিই ছন্দের প্রাণ। আধুনিক ছন্দেও দেখি এই তত্ত্ব। আর বেদে তো কথাই নাই, সেখানে স্বর-বিন্যাসে কত সূক্ষ্ম নৈপুণ্য এবং সেই নৈপুণ্যকে রক্ষা করিবার জন্য কত সতর্কতা। এই সমস্ত চেষ্টা শব্দের স্থূলভাগকে রক্ষা করিবার জন্য—যথাযথ স্বরস্পন্দনটী বজায় রাখিবার জন্য। তাহার জন্য বীর্য্যশুদ্ধি, ক্ষেত্রশুদ্ধি, প্রজাশুদ্ধি প্রয়োজন ছিল; এই ছন্দঃ অধিগত করিবার জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান ছিল। ছন্দোরহস্য এত গভীর সাধনার ধন ছিল যে তাহা অনধিকারীর সংস্পর্শে আসিয়া পাছে বিকৃত হইয়া যায়, ঋষিসমাজ এই ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত ছিলেন। শুধু বিশুদ্ধ কণ্ঠ নয়, ছন্দঃ-শুদ্ধি রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ শ্রুতিরও প্রয়োজন। এ কথা আধুনিক Philologistরাও বলেন। কালের দোষেও স্বর বিকৃত হয়। তাই কঠিন শাসন ছিল, "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" আজকালকার লোক কথা-টার মাঝে শূদ্রনির্য্যাতনের গন্ধ পাইয়া লাফাইয়া উঠে। কিন্তু ভাবিয়া দেখে না, শুধু শূদ্র নয়, দ্বিজসমাজের স্ত্রী ও ব্রাত্যগণকেও ছন্দে অধিকার দেওয়া হয় নাই। এ কি

দ্বিজসমাজের পক্ষপাত বলিব ? অথচ ছন্দের যা ভাবগত তত্ত্ব, তাহাতে আচণ্ডালের অধিকার। আর্য্যসমাজ Cultureএর প্রসার, Mass Educationএর প্রসার উপলক্ষ্যে যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা জগতে মিলে না। আজও সেই Cultureএর প্রভাব আর্য্যসমাজ-সংস্পৃষ্ট কত অনার্য্যসমাজে অপ্রতিহতগতিতে প্রসারিত হইতেছে—অথচ তাহার মূলে কোনও আন্দোলন নাই, Propaganda নাই। কিন্তু Technique শিক্ষা সম্বন্ধে এই সমাজ অত্যন্ত হুঁশিয়ার। কোন সমাজই বা নয় ?

যাক্ সে কথা। ছন্দের বহিরঙ্গ আলোচনার আর একটা দিক্ তন্ত্রের মন্ত্রশাস্ত্রে নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্র ও সৃষ্টি, বেদ ও জগৎ দুইয়ের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তন্ত্র আজও তাহা প্রমাণ করিতেছেন। না দেখিয়া বিশ্বাস করা বা না করার কোনও মূল্য নাই। কিন্তু যে মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে—সে ছন্দঃ হইতে জগৎ সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়। এ কথার বিস্তার করিবার স্থানাভাব। বেদপন্থা আর তন্ত্রপন্থার একটা স্থূল পার্থক্য সম্বন্ধে শুধু এখানে ইঙ্গিত করিব। বেদের ভাষা জমাট; এত জমাট যে তাহা আধুনিক ভাষায় হুবহু ব্যক্ত করা অসম্ভব। শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার একটা তাৎপর্য্য আছে। যে ভাষা আমরা ব্যবহার করি তাহা আদিবাকের চতুর্থ নিম্নস্তর; তুরীয়ং বাচং মনুষ্যা বদন্তি—ইহা বেদেরই কথা। কিন্তু বেদবাণী এই তুরীয় বাক্‌কে ঠেলিয়া তাহারও উপরের স্তরের দিকে নিয়া চলিয়াছে, বেদার্থ আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। এইরূপে ভাষাকে ভাবে জমাট করিয়া বেদ শব্দতত্ত্বের এক দিক পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ক্রমিক পর্য্যবসান হইয়াছে জ্ঞানকাণ্ডে। তন্ত্র ভাষা ও ভাবকে বিশুদ্ধ শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া লইয়া গিয়াছেন; মাতৃকাবর্ণের তত্ত্ব ও ব্যবস্থা এই প্রয়াসের অত্যাশ্চর্য্য পরিণতি। সমস্ত জগৎকে কেবল কতকগুলি মূল শব্দস্পন্দনে পরিণত করা এক অদ্ভুত সিদ্ধি বটে।

আর একটী কথা বলিয়াই এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম ছন্দঃ অর্থে বাসনা। ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বাসনা হইতে সৃষ্টি, আর ছন্দঃ হইতে সৃষ্টি একই ধারা। বাসনার মূল তত্ত্ব পতঞ্জলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। সেখানেও দেখি, বাসনা অনাদি স্পন্দন, তাহারও প্রাণ আবৃত্তি—তাহা হইতেই স্মৃতি। ছন্দের স্মৃতি হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, ইহাও বেদের কথা। ছন্দঃ বা স্পন্দন হইতে জগৎ—ইহা অভিব্যক্তির স্থূল ইতিহাস; বাসনা বা স্মৃতি হইতে সৃষ্টি—ইহা তাহারই সূক্ষ্ম ইতিহাস। উভয়ের সংযোগসূত্র রহিয়াছে বেদের ব্যাহৃতিতত্ত্বে; সেখানে বাসনা ও ছন্দঃ একাধারে সম্পুটিত। পতঞ্জলির স্ফোটবাদ এই রহস্যেরই কুঞ্চিকা।



বেদান্তের অধিকার



[প্রবক্তা—ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য]

জগতে এই তিনটী জিনিষ পাওয়া বড় কঠিন—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, আর মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের কৃপা না হলে এ সব হয় না। একে তো মানুষ হয়ে জন্মানোই কঠিন; কিন্তু তার পরেও যদি কেউ মানুষের মাঝে পুরুষ হয়ে জন্মায়, আবার পুরুষ হয়ে বেদ-বেদান্ত পড়ে, অথচ এর পরেও আত্মমুক্তির জন্য চেষ্টামাত্র না করে, তাকে আমি বলি আত্মঘাতী। সে নিতান্তই বোকা বল্‌তে হবে, নইলে এত জেনে শুনেও সত্য বস্তু ছেড়ে অসত্যবস্তুর পানে ছোটে? যে নিজের স্বার্থ-টুকু পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারে না, মানুষদেহ পেয়ে, পুরুষ হয়ে বেদান্তের অধিকার যে হেলায় হারায়, তার চেয়ে নির্ব্বোধ আর কে?

মুক্তি কি সহজ কথা? শাস্ত্র পড়, যজ্ঞ কর, কর্ম্ম কর, ভজন কর—জানিবে সব মিছা। ব্রহ্ম আর আত্মা এক—এই জ্ঞান না হলে শত-কল্পেও কারু মুক্তি হয় না। এ হচ্ছে বেদের স্পষ্ট কথা। বেদেই আছে—বিত্ত দিয়ে কখনও অমৃতের আশা করো না। এ থেকেই বুঝি, কর্ম্ম কখনও মুক্তির হেতু হতে পারে না। এই জন্যই বলি, যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান যাঁর হয়েছে, তিনি আত্মমুক্তির জন্যই চেষ্টা করবেন। তার উপায় হচ্ছে—বাহ্যবিষয়ের সুখস্পৃহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সদ্‌গুরুরূপী মহাপুরুষের আশ্রয় নিয়ে তাঁরই উপদেশমত নিজকে সমাহিত করা। সংসার সমুদ্রে ডুবে মরছ যে তা কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? তোমার যে নিজেই নিজকে উদ্ধার করতে হবে। তার পথই হচ্ছে সম্যক্‌দর্শনে নিষ্ঠা রাখা, সর্ব্বদা যোগারূঢ় হয়ে থাকা।

যাঁরা ধীর, যাঁরা পণ্ডিত, আত্মতত্ত্ব অভ্যাসে যাঁদের রুচি আছে, তাঁরা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারেন, ভবের বন্ধন যদি এড়াতে হয়, তাহলে কর্ম্মসন্ন্যাস ছাড়া কোনও পথ নাই। কর্ম্মের যে কোনও অবস্থাতেই প্রয়োজন নাই, এমন কথা বল্‌ছি না। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর উপ-লব্ধির জন্য কর্ম্মের কোনও আবশ্যকতা নাই। বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান হয় বিচারে—ঝুড়িঝুড়ি কর্ম্ম করলেও কিছু হবার নয়। ভুল করে একটা দড়িকে তুমি কালসাপ ভেবেছ; তাতে তোমার ভয় হয়েছে, উদ্বেগ হয়েছে। এ যাবে কি করে? যদি যথাযথ বিচার করে এটা যে দড়ি, এই তত্ত্বটা ধারণা করতে পার, তবেই তা সম্ভব। নইলে সাপ বলে ধরে নিয়ে দড়ি-টাকে হাজার ঠেঙাও না কেন, তাতে তো ভয়-সংশয় দুঃখ যাবার নয়।

বস্তু নিশ্চয় হয় বিচারে, গুরুর উপদেশে—স্নান, দান বা প্রাণায়ামে নয়। তবে ফল পেতে হলে ঠিক ঠিক অধিকারী হওয়া চাই; দেশ, কাল ইত্যাদির যোগাড় তার সহায় মাত্র। এই জন্য বলি, আত্মবস্তু যদি কেউ জান্‌তে ইচ্ছা করে, তাহলে তার বিচার ছাড়া আর কোনও পথ নাই; আর সে বিচারও করতে হবে ব্রহ্মবিৎ দয়াসিন্ধু সদ্‌গুরুর কাছে বাস করে।

আত্মবিদ্যার অধিকারী কে? বেদান্তের

অধিকার পেতে হলে এই লক্ষণগুলি থাকা চাই—প্রথমতঃ বেশ পরিষ্কার মাথা থাকা চাই; দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রজ্ঞান থাকা চাই; তৃতীয়তঃ তর্ক উপস্থিত করবার ও খণ্ডন করবার কৌশলটি আয়ত্ত থাকা চাই। এগুলো হল বাইরের তোড়জোড়। আসল কথা হচ্ছে, ব্রহ্মবিদ্যায় তোমার অধিকার আছে বুঝবো যদি দেখি, তুমি বিবেকী, বৈরাগ্যবান্, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা এই গুণগুলি তোমার মাঝে আছে; বিশেষতঃ তুমি যথার্থ মুক্তির পিপাসু। এই যে চার দফা আয়োজনের কথা বললাম, শাস্ত্রে এদের বলে বেদান্তের সাধন। সাধনসম্পন্ন অধিকারী হলেই তবে ব্রহ্মবিচারে ঠিক্ ঠিক নিষ্ঠা হয়, নইলে পেছনে সাধনের জোর না থাকলে একবার বিচার এগোয় আর একবার পেছোয়—এমনি টালমটালই কেবল চলতে থাকে।

সাধনগুলির শাস্ত্রীয় নাম হচ্ছে—প্রথমতঃ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, দ্বিতীয়তঃ ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, তৃতীয়তঃ শমাদি ষট্‌কসম্পত্তি, চতুর্থতঃ মুমুক্ষুত্ব। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এমনি একটা দৃঢ় সংস্কার চিত্তে পোষণ করাই হচ্ছে নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক। "দেহজ্ঞান হতে আরম্ভ করে ব্রহ্মানুভূতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যা কিছু আমার ভোগের বস্তু, অতএব যা আমার বাইরে, তা সমস্তই অনিত্য, খুঁজলে সবার মাঝেই এমন একটা না একটা খুঁত দেখতে পাব, যাতে বুঝতে পারব তাদের সেবায় আমার পূর্ণ তৃপ্তি কিছুতেই হতে পারে না। তবে আর ভোগের বস্তুতে দর্শন শ্রবণের আসক্তি রাখা কেন?" এমনি বিচার করে বিষয় পরিত্যাগ করাকেই বলে বৈরাগ্য।

তারপর ষট্‌ক সম্পত্তি। নিজের লক্ষ্যটী সর্ব্বদা মনের মাঝে জাগিয়ে রাখা হচ্ছে শম অর্থাৎ চিত্তের ভারকেন্দ্রকে ঠিক রাখা—এদিক ওদিক টলতে না দেওয়া। বহিরিন্দ্রিয়ই হউক আর অন্তরেন্দ্রিয়ই হোক্ বিষয় হতে মোড় ফিরিয়ে তাদের নিজ নিজ গোলকে আবদ্ধ করে রাখাই হল দম। অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে বিষয় এসে যদি ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত হল, অমনি যে তারা উত্তেজিত হয়ে একেবারে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তা হতে দেব না, লাগাম কসে ধরে তাদের ঠিক ঠিক স্থানে রেখে দেব। চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম এই, সে কেবল বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়বে—আকাশ পাতাল নানা কথার আলোচনায় দিন কাটাবে। মনের এই বাইরের আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে উপরতি। দুঃখের পাহাড় মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ুক না কেন, নিঝুম হয়ে সব সয়ে যাব, তার প্রতীকারের পর্য্যন্ত চেষ্টা করব না, তার জন্য কান্না জুড়ে দেব না, এমন কি তার কথা চিন্তা পর্য্যন্ত করব না—ইহাই তিতিক্ষা। শাস্ত্রের কথা, গুরুর কথা ঠিক ঠিক সত্য বলে ধারণা করা—একেই বলি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা নইলে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। শুদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মে সর্ব্বদা বুদ্ধিকে স্থাপন করা হচ্ছে সমাধান—চিত্তকে বানচাল হতে দেওয়া নয়। শম হচ্ছে মনের শান্তি, সমাধান বুদ্ধির শান্তি। এই হল ষট্‌কসম্পত্তি।

অহং বোধ হতে দেহ বোধ পর্য্যন্ত সমস্তই বন্ধন, আর এ বন্ধন সত্যও নয়; আমি কে, তা জানিনে বলেই অজ্ঞানবশতঃ এই সমস্ত কল্পনা করেছি। আত্মস্বরূপ জেনে এই বন্ধন

হতে মুক্ত হবার ইচ্ছাই মুমুক্ষুত্ব। মুমুক্ষুত্বের আবার উত্তম, মধ্যম, অধম ভেদে মাত্রার তারতম্য আছে। তবে অধম বা মধ্যম রকম মুমুক্ষুত্ব থাকলেও বৈরাগ্য, শমদমাদি, গুরু-কৃপা ইত্যাদির বশে ক্রমে তার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং শেষে ফলদায়ী হয়ে থাকে। যার বৈরাগ্য ও মুক্তির পিপাসা এই দুটীই তীব্র, শমদমাদি তার পক্ষে যথার্থ ফলবন্ত হয়ে থাকে। আর এ দুটীর জোর যার মাঝে নাই, তার শমদমাদির কোনও মূল্য নাই। মরু-ভূমতে জলবিন্দুর মত তার শমদম একটা কথার কথামাত্র।

যতগুলি কারণ থাকলে মুক্তির সম্ভাবনা, তাদের মাঝে ভক্তিই প্রধান। আত্মস্বরূপ বা আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানই হচ্ছে ভক্তি অর্থাৎ আমি কে, পরম বস্তুর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ এইটুকু জানবার জন্য প্রাণের যে তীব্র ব্যাকু-লতা, তাকেই বলি ভক্তি। ভক্তি আর মুমু-ক্ষুত্ব এক পর্যায়ের বস্তু।

বেদান্তের অধিকার পেতে হলে এই চারটী সাধন থাকা চাই। তারপর পারের বাঁধন কাটতে পারেন এমন সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেওয়া চাই।

বাপ যদি ঋণ রেখে যান, তাহলে ছেলে তা শোধ করে; কিন্তু সংসারে যে বাঁধনে নিজকে বেঁধেছ, তুমি ছাড়া সে বাঁধন খুলবার আর তো কেউ নাই। মাথায় যদি কেউ ভার চাপিয়ে দেয়, তাহলে আর একজন এসে বোঝা নামিয়ে দুঃখ দূর করে দিতে পারে— কেন না এ দুঃখ বাইরের দুঃখ। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় যখন পেট জ্বলে, তখন সে দুঃখ দূর করবার তুমি ছাড়া তো আর কেউ নাই। যার রোগ, ঔষধ পথ্য তো তাকেই দিতে হবে, তবেই না রোগ আরাম হবে; না অপরে ঔষধ খেলে রোগীর রোগ সারবে? তাই বলি বস্তুস্বরূপ জানতে হলে জ্ঞানের দৃষ্টি মেলে তোমাকেই তা জানতে হবে, কেবল পণ্ডিত হলেই চলবে না। শব্দজাল তো মহারণ্য— চিত্ত কেবল তার মাঝে দিশেহারা হয়ে ঘুরেই বেড়ায়, কোনবার পথ পায় না; এই জন্য তত্ত্ব জানতে হলে তত্ত্বজ্ঞের কাছে যেতে হয়, পণ্ডি-তের কাছে নয়। শুধু ঔষধের নাম জানলেই রোগ পালায় না—ঔষধ খেতে হয়। তেমনি সাক্ষাৎ অনুভব না হলে শুধু "আমি ব্রহ্ম" বললেই মুক্তি হয় না॥



শ্রদ্ধাবীর্য্য

—:{*}:—

ভোগ আর যোগের সমন্বয়সাধনের একটা ধুয়া অনেকদিন হইতেই দেশে দেখা দিয়াছে। ধর্ম্মের সাধনাই জীবনের শ্রেয়ঃ এবং তাহার জন্য অনেকখানি কষ্টস্বীকার, ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন—এই ছিল আগেকার আদর্শ। এখন কষ্টস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মাঝে নানা কারণে মন্দা হইয়া পড়িয়াছে; হয়ত আর পূর্ব্বের মত জীবনীশক্তি নাই, কিম্বা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে পরিণামদর্শিতার ক্ষমতাও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যে কারণেই হউক, কলির জীব, বিশেষতঃ এই বঙ্গবাসী কলির জীব কষ্ট সহিতে নিতান্তই নারাজ। ভোগের একটা অদম্য পিপাসা লোকের কথায়-বার্ত্তায়, চালচলনে, সাহিত্যে-শিল্পে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যদি বলি, এই ভোগ-লালসা—মানুষের মাঝে যে-অংশটুকু পশু, তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, মানুষের মাঝে যে অংশটুকু দেবতা, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অপরিমিত লালসার একটা প্রতিষেধক খুঁজিয়া বাহির করাও স্বাভাবিক হইবে না কেন? দেবত্বের এই স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ মানুষ ধর্ম্মের আশ্রয় খোঁজে। স্বচ্ছন্দ ভোগের মুখে ধর্ম্ম একটা বল্গার মত। মানবজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে যিনিই সচেতন হইয়াছেন, তিনিই বলিবেন; এই ধর্ম্মের রাশটুকু টানিয়া ধরিবার প্রয়োজন কতখানি মর্ম্মান্তিক।

কিন্তু আজকাল উচ্ছৃঙ্খল ভোগতৃপ্তির যুগে ধর্ম্মের কথা মানুষের কাণে বজ্রধ্বনির মত কঠোর। অথচ ইহাকে উপেক্ষা করিয়া ভোগের স্রোতে গা-ভাসান দেওয়ার মত সাহস ও সামর্থ্যও তাহার নাই। এই জন্য বুদ্ধিমান মানুষ একটা নূতন ফন্দী আঁটিয়াছে। দার্শনিক কুতর্ক দ্বারা যদি ধর্ম্মের কঠোর মূর্ত্তিকে কোনও রকমে সরস করা যায়, সংসার সুখের আয়োজন ষোল আনার উপর আঠারো আনা বজায় রাখিয়াও ধর্ম্মের মুখোস যদি না খুলিতে হয়, মানুষ তাহার আয়োজনেই ব্যস্ত। আচার বিচারের শিথিলতার ভিতর দিয়াই যে জাতীয় চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নয়। বর্ত্তমান যুগের সৃজনী প্রতিভাও ভোগ-যোগের এই অপরূপ সমন্বয়ের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। উপনিষদের বাছা বাছা বুলি, বৈষ্ণবসাহিত্যের সরস পদাবলী আজকাল অনেকেরই কণ্ঠস্থ। সেগুলি দিয়া জ্ঞান আর প্রেমের উৎকর্ষ যতটুকু হউক না কেন, ভোগবাদের সমর্থন কিন্তু পূরা মাত্রাতেই চলিয়া থাকে।

ভোগে সুখ নাই, এ কথা যদি বলি, তাহা হইলে মিথ্যা বলা হইবে। সংসারের পোণে ষোল আনা লোভের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বৈরাগীর একটা বাঁকা কথাই কি কখনও কায়েম হইতে পারে? সুখ চাও, সে ভাল কথা, তার জন্য ভোগ প্রয়োজন—বেশ তো, তাই বা মন্দ কিসে। কিন্তু ভোগের সুখের সঙ্গে তার দুঃখের কথাটাও একবার

ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন নয় কি? এ কথার উত্তরে চার্ব্বাক একদিন বলিয়াছিলেন, দেখ, ভোগের সুখের সঙ্গে দুঃখ যে মিশাল থাকিবে, সে আর নূতন কথা কি? মাছে কি কাঁটা থাকে না? ধানগাছে কি খড় থাকে না? কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে মাছ খায়, ধানের চাষ করে। প্রতিপক্ষ চার্ব্বাকের এই যুক্তিতে বলিয়াছিলেন, নিত্য সুখের কথা; বলিয়াছিলেন, এতখানি দুঃখ সহিয়া তুমি সুখের জোগাড় করিবে, তার চাইতে এমন সুখের সন্ধান যদি তোমায় দিই, যাহার ক্ষয় নাই, উপকরণ প্রয়োজন হয় না, তাহা হইলে কি বল? চার্ব্বাক হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, শরীর শুকাইয়া কবে কোন্ লোকে গিয়া নিত্যসুখ পাইব, সে ভরসায় যে উপস্থিত লাভটা ছাড়িয়া যায়, তার মত বোকা আর কে? আমি বলি, যতদিন বাঁচিয়া থাক, ঋণ করিয়া ঘি খাও। দেহ একবার ছাই হইলে কি আর ফিরিয়া আসিবে?

মুখে আমরা না মানিলেও মনে মনে বোধ হয় প্রায় সকলেই চার্ব্বাকের এই যুক্তির তারিফ করি। কথাটা এই, উপস্থিত লাভ ছাড়িব কিসের ভরসায়? চার্ব্বাকের এই প্রশ্নের সোজা উত্তর কেহ দিতে পারেন নাই, কেননা এ কথার যে উত্তরই হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সংসার নিয়া মশগুল হইয়া আছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উপস্থিত লাভ ছাড়িবার কথা আমাদের তো কাহারই মনে আসে না। মস্তিষ্কে এমন শক্তি কোথায় যে দুদিন পেছনের ভাবনা আজ ভাবিয়া দেখি? দৃষ্টির এমন তীক্ষ্ণতা কোথায় যে গোটা সংসারটাকে করামলকের মত প্রত্যক্ষ করিয়া তার সকল হেরফের বুঝিয়া নিই। কাজেই দুর্ব্বলচেতা কূপমণ্ডুকের মত চার্ব্বাকের অনুকরণে ক্ষীণস্বরে সবাই চেঁচাইতেছি, উপস্থিত লাভ ছাড়িব কিসের ভরসায়?

এই প্রশ্নের মূলেই রহিয়াছে অবিশ্বাস। তুমি বিচক্ষণ, পরিণামদর্শী, তুমি আসিয়া আমাকে বলিতেছ, সংসারে ঐতটা আসক্তি ভাল নয়, আসক্তি কিছু কমাও, তাতে তোমার লাভ আছে। আমি অমনি বলিয়া বসিলাম—লাভের ভরসা কি? এর পর যিনি যত বিচক্ষণই হউন না কেন, আমার অজ্ঞাত একটা বিষয় নিয়া কতকগুলি কথার শ্রাদ্ধ ছাড়া তিনি আর কি করিতে পারেন? দর্শনের যত যুক্তি, যত তর্ক, সমস্তই যে দাঁড়ায় বিশ্বাসের উপর। দেখিতেছি, জগতে সব ফাঁক ফাঁক, বেদান্ত আসিয়া বলিলেন, ওটা তোমার ভ্রম, ফাঁক কোথায়ও নাই—সব নিরেট, সব অখণ্ড। এ একেবারে আমার জ্ঞানবুদ্ধির বিপরীত কথা নয় কি? যদি অবিশ্বাস করি, না মানি, কোন্ যুক্তিতে তিনি আমায় বুঝাইবেন? ভোগে মজিয়া আছি, যোগী আসিয়া বলিলেন, ও সব ছাড়—বাসনাক্ষয়ের মত তৃপ্তি আর কোথায়ও পাইবে না। এও তো বিপরীত কথা! যদি না শুনি, তিনি আমাকে শোনাইবেন কি করিয়া?

তবেই দেখিতেছি, প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দেওয়া মুখের কথা নয়—অদৃষ্টের প্রতি, পরলোকের প্রতি ঠিক ঠিক বিশ্বাস না জন্মাইয়া দিতে পারিলে, গুহাহিত বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধার উন্মেষ না করিতে পারিলে তর্ক দ্বারা কোনও লাভ হইবে না। ধর্ম্ম কর্ম্ম বল, ত্যাগ সংযম বল, সমস্তের মূল হইল শ্রদ্ধা। যেখানে শ্রদ্ধা

নাই, সেখানে কতকগুলি শুষ্ক আচারের বোঝা পিঠে চাপাইয়া দাও, কোনও লাভই হইবে না। আবার একটী কথা না বলিয়াও একটী যুক্তি না দেখাইয়াও যদি মন্ত্রপ্রেরণার বিশ্বাসের বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ কাহারও ভিতর জাগাইয়া তুলিতে পার, ব্রহ্ম করামলকবৎ তাহার কাছে সুত্য হইয়া উঠিবেন, ত্যাগ অনির্ব্বচনীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বিশ্বাসই সাধনার মেরুদণ্ড। আজ দেশবাসী হৃদয়ে বিশ্বাসের আলোকরেখা মুছিয়া গিয়াছে, সংসারের করালছায়া আসিয়া পথ জুড়িয়া বসিয়াছে—এরূপস্থলে উপস্থিত লাভ ছাড়া দূর দূরান্তরের কথা ভাবিবার বুঝিবার সাহস হইবে কার? শুধু পরকাল বা পরজন্ম বলিয়াই নয়, ইহকালেরই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়টা মানুষ জ্বলন্ত বিশ্বাস পোষণ করে? কে নিজের বলিষ্ঠ হৃদয়ের অসঙ্কোচ প্রত্যয়ের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, আমি জানি—এই আমার নিয়তি, এই আমাকে হইতে হইবে? এমন কথা বলিতে হইলে পুরুষকারের প্রয়োজন, সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রচুর সঞ্চয় পেছনে থাকা প্রয়োজন। বিশ্বাস যে শুধু দৈবের ভরসা, এ কথা যাহারা মনে করে, তাহারা মহাভ্রান্ত। ঠিক ঠিক পুরুষকার না জাগিলে যথার্থ বিশ্বাসও জন্মিতে পারে না। সে পুরুষকার দূরে থাকুক, দৈবের উপরও বুঝি মানুষ আর তেমন করিয়া ভরসা করিতে পারে না—ভবিষ্যৎ তার এমন করিয়াই অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় যদি ত্যাগ-সংযমের চোখে ধূলি দিয়া উপস্থিত ভোগের কদর্য্য পঙ্কে মানুষ ডুবিয়া মরিতে চায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

যে বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হইয়া জাতির প্রাণ আজ ভোগযোগের সমন্বয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার উপকরণ জুটাইয়া আনিতে চাহিতেছে, তাহা দূর করিতে হইলে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার অভিষেকে জাতিকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। কি উপায়ে তাহা সম্ভব, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তর্কদ্বারা বা যুক্তি দেখাইয়া শ্রদ্ধা উৎপাদন করা কখনও সম্ভবপর নয়—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। শ্রদ্ধা জাগাইতে হইলে মন্ত্রসংহত হৃদয়ের প্রচণ্ড প্রেরণা থাকা চাই। আজ সমাজের অবস্থা এতই বিশৃঙ্খল ও দুর্ব্বল, যে ইহার মাঝে দৃঢ়চেতা সমাজপতির আবির্ভাবের আশা সুদূরপরাহত। ক্ষেত্র কোথায় যে বীজ রোপণ করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইবে? দল পাকাইয়া একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার মতলবকে নিষ্ফল জানি বলিয়াই তাহাকে সমর্থন করিতে পারি না। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ কারবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত জীবনের উৎসর্গই আজ বিশেষ প্রয়োজন।

ভোগবাদের এ প্লাবনে যে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহারও কি প্রাণ কাঁদিতেছে না?—অনেকেরই কাঁদিতেছে। এই বন্যাবেগ রোধ করিবার শক্তি তাহাদের মাঝেই আছে। কিন্তু অবিশ্বাসের ছায়া আজ চারিদিকে এমন নিবিড় হইয়াই দেখা দিয়াছে যে ইহারাও বুঝি অন্তরপুরুষের এই করুণ আবেদন, আত্মশক্তিকে জাগ্রৎ করিবার এই সঙ্গোপন আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্ফল ভাবিয়াই দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। আমি বলি, দশের দিকে চাহিয়া দেখিবার তোমার কোনও প্রয়োজন নাই—তুমি তোমার অন্তরপুরুষের দিব্যপ্রেরণার অনুসরণ কর। দশজনের প্রত্যেকে যদি কিছু কিছু শক্তি থাকে, তেজ থাকে, তবেই দশের মিলনে মহাশক্তির আবি-

তাব সম্ভব। নতুবা ভস্মস্তূপের উপর ভস্মস্তূপ চাপাইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিলেই কি তাহা একটা জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের চেয়ে বড় হইয়া উঠিবে? দশের কথা দূরে থাকুক, দেশের কথাও ক্ষণকালের জন্য না হয় ভুলিয়া যাও—কেবল এই অমানিশায় বিপুল আঁধারে প্রদীপের মত আত্মচৈতন্যকে জাগ্রৎ করিয়া রাখ। তুমি তোমাকে বিশ্বাস করতে শিখ। তুমি দেশের দশের কি করিবে সে তো দূরের কথা, তুমি তোমার কি করিবে, সেই কথাই আগে ভাবিতে শেখ। সমে সমে আকর্ষণ প্রকৃতির রীতি। তোমার প্রাণে যদি শ্রদ্ধার আলো জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে যেখানে যত শুভশক্তি প্রকাশের আকুলতায় গুমরিয়া মরিতেছে, সমস্তই সেই আলোককে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। প্রাণের আকর্ষণে মানুষকে এক করা যায়—মুখের বুলিতে কাহাকেও বাঁধিয়া রাখা কি সম্ভব? সেই প্রাণ জাগে নীরব তপস্যায়।

একদিন এই নীরব তপঃসাধনায় ছিল এ দেশের সমাজের প্রাণ। আজও যে শক্তি এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে শাসন করিতেছে, তাহার মূল কোথায়, কাহার প্রাণ হইতে কবে উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারিবে কি? চিরকাল মানুষ এখানে নীরবে আত্মদান করিয়াছে এবং সেই উৎসৃষ্ট প্রাণের পুণ্যশক্তি জমাট বাঁধিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। আজ পুরুষসমাজ উচ্ছৃঙ্খল, সনাতন সাধনা হইতে ভ্রষ্ট, কিন্তু এখনও চাহিয়া দেখ, নারীসমাজের নীরব তপঃশক্তি কতখানি সন্তর্পণ মমতায় জাতিকে আগলাইয়া রহিয়াছে। কোথায়ও যে সংস্কার প্রয়োজন নাই, সে কথা বলিতেছি না, বলিতেছি সংস্কার করিবার পূর্ব্বে প্রাণের প্রকাশভঙ্গীটা আয়ত্ত কর—ভাব নষ্ট করিয়া কিছু করিতে যাইও না। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, পরের সংস্কারের চেয়ে নিজের সংস্কারের উপরেই এদেশের আগ্রহ বেশী। সেই সূত্র ধরিয়া নিজের উপর বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ কর—বাহির ভুলিয়া অন্তরের মাঝে সমাহিত হইতে শেখ, পারিপার্শ্বিক আপনা হইতে তোমার অনুকূল হইয়া উঠিবে—তোমার একাগ্রচিত্তের নিভৃত সাধনা একদিন বিশ্বের দেউলে ধূপগন্ধের মত ছড়াইয়া পড়িবে। যে নিদারুণ সমস্যা সম্মুখে উপস্থিত, তাহার আর তো কোনও মীমাংসা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আজ ডাকিয়া কাহারও সাড়া পাইবার ভরসা দুষ্কর—তবুও বলি—

এক মনে তোর একতারাতে একটী যে তার
সেইটী বাজা!

ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য

ইচ্ছাকে যত ব্যাপক করতে পারব জগতের সঙ্গে বিরোধ ততই কমে আসবে, আমাদের অধিকাংশ বিরোধের কারণই ইচ্ছার সঙ্কীর্ণতা।

কারো কারো ইচ্ছার এমন সঙ্কীর্ণতা রয়েছে, অন্ধ প্রবৃত্তি অনুযায়ী রুচির বাইরে আর কিছুই তারা দেখতে পায় না। দশের খাতিরে ন্যায়তঃ মানুষকে যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তার মাঝেও তাদের মন ঠিক থাকে না—উপস্থিত নিজের ক্ষতিটাকে অতিরিক্ত ভাবে মেনে নিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে তারা বেঁকে বসে।

এ থেকেই বিরোধ আসে। আমি এরকম না হলে পারি না, আমার এটা ভাল লাগে না, তবু জোর করে এ রকম করতে হচ্ছে—এই সব ভেবে সে নিজকে দুর্ভাগ্য মনে করে, কল্পনার জগৎ ময় সবি তখন তার কাছে বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। শক্তি থাকলে কোমর বেঁধে ঝগড়ায় লাগে, না থাকলে অভিমানে নিজের বুক নিজে খুঁড়ে মরে। এ সব শুধু সাধ করে বাঁধনে ধরা দিয়ে পরে আকুপাকু করা।

এর চেয়ে নিজের ইচ্ছাকে যদি রুচির চেয়ে বড় মনে করি—শুধু মনে করা নয়, নিজকেই যদি ইচ্ছার পরিচালক অনুভব করি, তবে আর ঝগড়াও করতে হয় না, নিজকে হতভাগ্যও মনে হয় না।

আমার ইচ্ছা সার্ব্বভৌম—সবার ইচ্ছাকেই অসঙ্কোচে আমি আমার বলে বরণ করে নিতে পারি। রুচি জাগল, সেইমত চললাম; যদি বিরোধ হয়, কেউ বাদী হয়, বা নূতন রুচি সৃষ্টি করতে যদি হয়, সে ক্ষমতা কি আমার নাই? আমি কি এতই ক্ষুদ্র? তাঁর ইচ্ছায় যখন যে দেশে যে আচার, যে ব্যবহার আমার উপর এসে পড়ছে, সকল অবস্থার জন্যই আমি তৈরী। ব্যবহার তো ইচ্ছামত গড়ে নেওয়া যায় না—যে যেমন দেয়, সে তেমনি পায়। এর মাঝে নিজের রুচি অনুযায়ী সামঞ্জস্য দাবী করা নেহাৎ বোকামী।

সর্ব্বাবস্থায় সকল পরিবর্ত্তনের জন্য যারা তৈরী, আকস্মিক বাধায় তাদের পিছু হটাতে পারে না; সহজে তারা প্রলুব্ধ হয় না; অতর্কিতে রিপু এসে তাদের চিত্তবৃত্তিকে এলোমেলো করে দিতে পারে না। তাদেরই "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" থাক্‌বার মত শান্তি লাভ হয়।

শক্তির উৎসমূল এই অটল ইচ্ছাকেন্দ্র। ইচ্ছাকেন্দ্রেই আত্মার অধিবাস। আত্মস্থ হয়ে নিজের ইচ্ছাকে যে বিরাট বলে উপলব্ধি করতে পারে, ক্ষুদ্র বিরোধকে গায়ে বাজিয়ে অল্পেই তাকে মুসড়ে পড়তে হয় না। এই শক্তিই চাই—আত্মার প্রসার, ইচ্ছার ব্যাপকতা, চিত্তের সার্ব্বভৌমিকতা। মোট কথা, নিজকে বিরোধের ঊর্দ্ধে উঠিয়ে নিলেই বিরোধে জয়ী হওয়া গেল।

ইন্দ্রিয়-সংযম

ইন্দ্রিয়কে কি করে বশে রাখ্‌তে হবে, সে সম্বন্ধে উপনিষদে সংক্ষেপ অথচ সুন্দর দু'তিনটী উপদেশ আছে। উপনিষদ্‌ বলছেন, ইন্দ্রিয়কে কে বশ করতে পারে?—"যস্তু বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি"—যার বিজ্ঞান আছে। জ্ঞান আর বিজ্ঞান দুটো কথা—জ্ঞানের পরেও বিজ্ঞান, কিনা বিশেষ জ্ঞান। ভাব্‌তে পার, বিজ্ঞান তো তাহলে চরম কথা হল। বিজ্ঞান হলে তবে ইন্দ্রিয়দমন হবে—আবার ইন্দ্রিয়দমন হলে তবে না বিজ্ঞান প্রকাশ পাবে। এ গোলক-ধাঁধার মীমাংসা কি?

মীমাংসা হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানের সহজ অর্থ নিয়ে। জ্ঞান বল্‌তে সোজাসুজি সাংসারিক অভিজ্ঞতাকেই ধরে নাও না কেন। যা নিয়ে সংসারে চল্‌ছি ফিরছি—তাকেই না হয় জ্ঞান বল্‌লাম। দার্শনিক হয়ত একটু হুঁশিয়ার হয়ে বলবেন, এ জ্ঞান ব্যবহারিক-জ্ঞান। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। জ্ঞান কথাটার যে সাদাসিধে একটা অর্থও আছে, তার প্রমাণ রয়েছে চণ্ডীতে। সেখানে ঋষি বলছেন, মানুষ জ্ঞানী বটে, কিন্তু কেবল তারাই জ্ঞানী নয়—যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।" এখানে জ্ঞান বল্‌তে ব্যবহারকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। আমরাও উপনিষদের তাৎপর্য্য অনুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভেদ ধরতে জ্ঞানকে এই সহজ অর্থেই গ্রহণ করছি। তা ছাড়া, আর একটা কথা। সাধনার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উন্মেষ হবে—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহলেই জ্ঞানের সিদ্ধরূপ আর সাধনরূপ—দুই-ই পাওয়া গেল। সিদ্ধরূপের কথাও উপনিষদে আছে—সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্তং ব্রহ্ম। কিন্তু সাধন অবস্থায় অনুভূতি যতই গাঢ়তর হতে থাকবে, ততই জ্ঞানের প্রকাশ অব্যাহত হবে এবং অনুভূতির প্রত্যেকটা ধাপকে জ্ঞান বলা দোষের হবে না। অবশ্য এটা জ্ঞানের আপেক্ষিক দিক।

মোট কথা জ্ঞান বল্‌তে যদি সংসারের অভিজ্ঞতা বুঝি, তাহলে বিজ্ঞান বল্‌তে বুঝবো তার চেয়েও উপরের কিছু। জ্ঞানকে যা নিয়মিত করছে, উপনিষদ্‌ তাকেই বলছেন বিজ্ঞান। এইখানে মনোজগতের একটা রহস্যের কথা বলি। আমরা সবাই জানি, আমাদের চিন্তাগুলো বড় এলোমেলো—আমরা এই এক কথা ভাবতে ভাবতে পরমুহূর্ত্তেই আর এক কথায় ছটকে পড়ি। এই যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভাঙ্গাচোরা অনুভূতি—এইগুলিকে বল্‌ছি জ্ঞান। কিন্তু রহস্য এই, মন যতই এলোমেলো হোক্‌ না কেন, তার পেছনে একটা মতলব কিন্তু বরাবরই লুকানো রয়েছে। একটা কিছুকে লক্ষ্য করে মন একবার এদিক একবার ওদিক করছে। ঘোর বিব্রত সংসারীরও একটা মতলব রয়েছে। কিন্তু তার ধারণা করবার ক্ষমতা অল্প বলেই সে সমস্ত মতলবকে এককেন্দ্রে এনে চিন্তাগুলোকে সাজিয়ে নিতে পারে না—একবার

ডাইনে, একবার বাঁয়ে, একবার সামনে, একবার পেছনে নানাদিক থেকে তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চায়। এইটাই হল মনের চঞ্চলতা বা জ্ঞান; আর ওই যে পেছনের মতলবীবুদ্ধিটুকু, ওইটাই হল জ্ঞানের নিয়ামক বা বিজ্ঞান। সাধারণ মানুষ শুধু জ্ঞানটাকেই দেখতে পায়, তাই তার ভারী অস্বস্তি। আর বুদ্ধিমান্ মানুষ তার পেছনে মতলবীবুদ্ধি বা বিজ্ঞানটুকু দেখতে পায়, তাই সে কাজকর্ম্মে ভারী হুঁসিয়ার।

তাহলে বুঝতেই পারছি, প্রবৃত্তি নিয়েই থাকি আর নিবৃত্তি নিয়েই থাকি, জ্ঞানের পেছনে বিজ্ঞান সর্ব্বদা লেগেই আছে। এখন নিজকে সামলে চলবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে বাইরে থেকে দৃষ্টিটাকে একটু ভিতরের দিকে ঠেলে দিতে হবে, জ্ঞানের পেছনে বিজ্ঞানকে ধরে থাকতে হবে। সোজা কথায়, যাই কর না কেন, কি মতলবে করছ, সেটা যেন সর্ব্বদা খেয়াল থাকে; আর হরঘড়ি মতলব বদলিও না একটা মতলব ঠিক রেখো। তাহলেই দেখবে, ইন্দ্রিয়গুলো সায়েস্তা হয়ে এসেছে। ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে হাতিয়ার, তাদের দিয়ে ভাল-মন্দ সব কাজই করা চলে। তবে কিনা সাধারণ হাতিয়ারগুলো মরা—সেগুলোকে যেখানে ফেলে রাখ, সেখানেই পড়ে থাকে, আর এই ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে যেন ভূতে পাওয়া জ্যান্ত হাতিয়ার—চোট্ দেবার বস্তু সামনে পেলেই চাঙা হয়ে ওঠে। এই জন্যই এদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। হয়ত তুমি এদের নিয়ে এক কাজ করবে ভেবেছ, তোমার অজ্ঞাতসারে কখন যে তারা তাদের মনের মত বিষয় পেয়ে ছুটে গিয়েছে। এই জায়গায় হুঁসিয়ার থাকাই হল বিজ্ঞানের কাজ। তোমার লক্ষ্য কি, বুদ্ধি কোন্ মুখী, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বুদ্ধির রাশ কসে ধর, দেখবে, ইন্দ্রিয় সায়েস্তা হয়ে এসেছে। লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, আর সেই লক্ষ্যপথের ধারার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের চালচলনগুলি মিলিয়ে নিতে হবে, তবেই ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ হবে।

এ থেকে বুঝতেই পারছ, এর দরুণ তোমায় কতখানি হুঁসিয়ার থাকা দরকার। উপনিষদ্ এর পরেই সে কথাটা বলছেন। "যুক্তেন মনসা সদা"—সব সময়ের জন্য মনটাকে লক্ষ্যে নিযুক্ত রাখতে হবে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানবান্ হওয়া চাই—অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই, তার পর সমনস্ক হওয়া চাই—অর্থাৎ মনটাকে হারিয়ে ফেল্‌লে চলবে না, লক্ষ্য ঠিক আছে কি না, সর্ব্বদা সেদিকে কড়া নজর রাখা চাই।

প্রথম প্রথম সর্ব্বদাই নিজের উপর কড়া নজর রাখা যে একরকম অসম্ভব, সে কথা জানি কিন্তু অভ্যাসে সবই হয়। অল্প অল্প করে অভ্যাস করতে হয়। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব ভারী সুন্দর একটা উপমা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "ঝোঁকের মাথায় চলা আমার অভ্যাস, এখন স্থির হই কি করে। ভেবে দেখলাম, যতটা ঝোঁক নিয়ে চলি, তার চেয়ে তাকে একটু কমাতে পারি না কি? দেখলাম, তা পারা যায়। প্রথম দশ পা গিয়ে একটু থম্‌কে দাঁড়ালাম, তার পর নয় পা, ছয় পা, দু পা, এক পা করে শেষে একেবারেই থেমে গেলাম। এমনি করে আমার মনকেও আমি বশে এনেছি।" সমনস্ক হবারও ঠিক এই উপায়। সারাদিন হুঁস থাকে না, আচ্ছা, দিনের মাঝে দু'চার বার শুধু নিজকে হুঁসিয়ার করবার জন্যই একটু সময় করে নাও না কেন।

হিন্দুর ত্রিসন্ধ্যা, মুসলমানের পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ—এর মূলে সেই অভ্যাসযোগ, হুঁসিয়ার হবার মৌতাত করা। সন্ধ্যাহ্নিক আজকাল লোকে ছেড়ে দিয়েছে—তার বদলে নিয়মিত চা পানের রেওয়াজ হয়েছে। সন্ধ্যাহ্নিকে আর কিছু না হোক, নিয়মিত চা খাওয়ার পিপাসার মত একটা খবরদারীর পিপাসাও তো জাগানো যেত। ইন্দ্রিয়সংযম করতে হলে হুঁসিয়ার হতে হবে, আর হুঁসিয়ার হতে হলে অন্ততঃ সকালে সন্ধ্যায় একবার নিজের দিন রাতের খবরদারী করতেই হবে। ক্রমে অভ্যাস পাকা হয়ে আসবে, তখন আর সারাক্ষণ পাহারা দিতে গেলেও ক্লান্তি আসবে না।

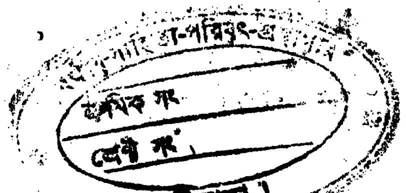
এর পর উপনিষদ্ বলছেন, মনটাকে যদি হুঁসিয়ার রাখতে চাও, তবে সর্ব্বদা শুচি থেকো। শৌচ দেহেরও প্রয়োজন, মনেরও প্রয়োজন। শুচিতা হচ্ছে একটা আর্ট, সত্যের প্রতি সুন্দরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা হতে তার জন্ম। যখন শিশুর মন নিতান্ত অপরিণত, বড় কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা মোটেই নাই, তখনও তাকে শুচিতার শিক্ষা দিয়ে চিত্তকে সজাগ করে তোলা যেতে পারে। সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে শিশুশিক্ষার প্রধান ভিত্তি করে মনু মহারাজ বলছেন, গুরুগৃহে ছোট ছেলে আসলেই আচার্য্য আগে তাকে শৌচ শিক্ষা দেবেন—"শিক্ষয়েৎ শৌচমাদিতঃ।" অপরিণত চিত্তে সত্য সংক্রামণের এই হচ্ছে গভীর মনস্তত্ত্বমূলক অমোঘ বিধান।

শুচিতা জিনিষটা বাইর থেকে শুরু হয়, কিন্তু তার নির্ম্মল প্রভাব শেষকালে অন্তরকেও অত্যন্ত সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন করে তোলে। শৌচ শেষকালে এমন একটা প্রচণ্ড প্রতিষেধক হয়ে দাঁড়ায়, যে অজ্ঞাতসারে অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ ঘটলেও দেহ হতে সবলে সে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। আসলে শৌচ হচ্ছে একটা বাছাই। ভাল মন্দ দুই জগতে আছে; তার মাঝে ভালটা তোমায় বেছে নিতে হবে। কোনটাকে তুমি ভাল বলবে? যা তোমার বিজ্ঞান বা লক্ষ্যের অনুকূল। শৌচ তোমাকে এই ভাল জিনিষগুলো বেছে নিতে শেখায়। প্রথম বাছবিচারটা দেখাদেখি করতে হয়। কিন্তু শেষে যখন তা সংস্কারে পরিণত হয়, তখন অপবিত্র সংস্পর্শে দেহ মন আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে—শুচিতা যেন সজাগ প্রহরীর মত মনের নিরালা থেকে হাঁকতে থাকে—"খবরদার!"

শুদ্ধ মাত্র বাহ্যশৌচেই দেহের শক্তিগুলি ঊর্দ্ধমুখী হয়ে যায়। মনকে তখন তারা আপনা থেকেই উপর পানে টেনে নেয়। মন সত্ত্বসম্পন্ন হলে তার প্রকাশী স্বভাব বা সদাজাগ্রৎভাব সহজেই ফুটে উঠে। তখন সমনস্ক বা একাগ্র চিত্ত হওয়া কঠিন হয় না।

সোজাসুজি উপনিষদের উপদেশগুলি এই—অশুচি জিনিষ খেয়ো না, দেখো না, ছুঁয়ো না, শুনো না; তবেই মন সজাগ থাকবে; লক্ষ্য স্থির থাকবে। ইন্দ্রিয়সংযমের এই পথ।





দেহ-ধর্ম্ম



"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"—খুব খাঁটী কথা। তবে দেখতে হবে, দেহে আসক্তি এসে না পড়ে। আসক্তিমাত্রেই অপবিত্রতা—তাতে দেহকে জড় করে, মনকে পঙ্গু করে, হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করে। দেহকে নিরুদ্বেগ, সুস্থ এবং স্বস্থ রাখতে হলে আসক্তি দূর না করে উপায় নাই। আসক্তিতে যতই চিত্ত পঙ্কিল হবে, রোগ অসুস্থতা ততই পেয়ে বসবে। শতকরা ৯৯জনের অসুস্থতা বোধের কারণ যে অসংযম বা আসক্তিপরতা, এতে আর ভুল নাই। অর্থাৎ প্রায় রোগই আমরা নিজেরা সৃষ্টি করি—একটু রাশ টেনে ধরলেই তার প্রতীকার আপনি হয়ে যায়।

দেহের প্রয়োজন যদি সংযমদ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে, তবেই দেহের সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য আমাদের সম্পন্ন হল। এর পর মনকে যে দিকেই পরিচালিত করি, সেদিকেই সে পুরাদমে খাটতে পারবে। এ পথেই ক্রমশঃ আত্মার সন্ধান মিলবে।

ঠিক কতটুকু ভোগ্য হলে দেহরক্ষা হয়, অপ্রয়োজনের বাহুল্যভার কতখানি বর্জ্জন করলে তবে নিজের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মসাধন অক্ষত রাখা যায়, ইত্যাদি বিচারের জিনিষ হয়েও এর মূল আশ্রয় হৃদয়ে। তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় বা সংযমে তারই চিত্ত অনুদ্বেগ থাকে, যার হৃদয়ে ধর্ম্মসাধনের প্রতীক কিংবা স্মৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ নিয়ত অঙ্কিত থাকে। লক্ষ্য হতে মন যদি না চ্যুত হয়, তবে কখনো অসংযম তাকে পীড়িত করতে আসে না।

তাঁর উপর নির্ভর চাই, স্বভাবের উপর শ্রদ্ধা চাই। এর পর নিজের দেহে ও অপরের দেহে সমদৃষ্টি। যিনি ন্যায়বান্, পরের জন্য তাঁর যতখানি মমতা, তার বেশী মমতা নিজের দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় না। এইটাই আমরা ভুলে যাই বলেই নিজের উপর আসক্ত হই, নিজের সম্বন্ধে পক্ষপাত করি। আসক্তিপরতন্ত্র নিজকে এত প্রবলভাবে বুঝে যে, ভুল বুঝে—যথার্থ স্বার্থ কি, তা সে জানেই না। ঠিক ঠিক স্বার্থটা যদি মানুষ বজায় রাখতে পারত তবে তার উন্নতিই হত; দেহের স্বার্থ, মনের স্বার্থের মায়ায় পড়েই তো সে গুলিয়ে যায়।

নিঃস্বার্থ হয়ে নিজের সম্বন্ধে ভাব। যা করবার, স্বভাবেই করাচ্ছে। তবে তার মাঝেও মোহের প্রভাবকে নির্জ্জিত করে নিজকে জেনে যে আনন্দলাভ, এটুকু অনুভব করবার শক্তিই মানুষের বিশেষত্ব।

শরীর যেখানে স্বভাবতঃ উদ্বেগযুক্ত হচ্ছে, সেখানকার কথা আলাদা—সে রোগ হচ্ছে তাঁর আশীর্ব্বাদ। কিন্তু যে উদ্বেগ নিজে সৃষ্টি করেছি, স্বেচ্ছায় অসংযমকে প্রশ্রয় দিয়ে যে অসুস্থতার আশ্রয় দৃঢ় করেছি, সে রকম উদ্বেগ হতে দেহকে মুক্ত করা ধর্ম্মসাধনেরই একটী অঙ্গ। দেহাভিমান ফলে, যে বন্ধন,

তা হতে মুক্ত না হলে চিত্ত কখনো প্রশান্ত হয় না।

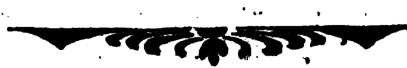
মোট কথা, জ্ঞান থাকতে অজ্ঞানীর অভিনয় করে অভিমানকে নিজের রাজা করে বসো না। আসক্তি, প্রলোভন, এগুলো সামনে এলেও গা ছেড়ে দিয়ে চলা নির্ভয়ের লক্ষণ নয়। যথার্থ নির্ভর এলে কুপ্রবৃত্তি কাছে ঘেঁসতেই পারে না। যদি না বুঝে না শুনে নিজকে ছেড়ে দেওয়ার নামই নির্ভর হত, তবে আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজন ছিল কি? আমি বলতে যেখানে সঙ্কীর্ণ দেহ-মন, সেখানে অসংযম-আসক্তির সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে তাকে যুক্ত করলে কেউ কারো সঙ্গে মিশবে না তো—তাতে বোঝা-ই বাড়বে শুধু, দ্বন্দ্বই বাড়বে।

যথার্থ মিলন সেইখানেই, যেখানে পরস্পরের স্বাধীনতা অব্যাহত—কেউ কারো দ্বারা অভিভূত নয়। আসক্তির সঙ্গে দেহের যে মিলন, তাতে তো দেহের স্বাধীনতা থাকে না—দেহ সেখানে জড়ীভূত, মন অভিভূত, আত্মার তো সন্ধানই নাই। এমন লোক খুব কমই আছে, প্রত্যেক কর্ম্মেই নিজকে যে দ্রষ্টাস্বরূপে রাখতে পারে। অযথার্থ মিলনের আশাই লোভ—তা-ই বন্ধন। দেহকে প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় কেউ বিপথ নিও না। প্রবৃত্তি তোমাকে চির-আশ্রয় দিতে পারবে না, তোমার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য মিলন ঘটবে না। একদিন না একদিন ঝগড়াবিবাদ ছাড়াছাড়ি হবেই। তবে কেন এমন অনিশ্চিত আশ্রয়ের ভরসা করা—অবিশ্বস্ত বন্ধুর আশ্রয় চাওয়া? এ বন্ধু যে বন্ধনেরই কারণ। বন্ধনই তো জ্বালা।

বাক্যের উচ্ছ্বাসকে বর্জ্জন করে যেমন যথার্থ সত্যটুকুকে গ্রহণ করতে হয়, তেমনি আড়ম্বর বর্জ্জন করে যথার্থ প্রয়োজনজ্ঞানে পরিমিত বিষয় ভোগ করতে হয়। সত্য গ্রহণে চিত্তের যেমন বোঝা বাড়ে না, প্রয়োজনমাত্রায় বিষয়গ্রহণেও দেহ তেমনি সুস্থ, স্বচ্ছ ও লঘু থাকে।

মাত্রাজ্ঞানহীন অস্বতন্ত্র অসংযত যারা, তারাই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে শক্তির অধিক আড়ম্বর করে, প্রয়োজনের অধিক সংযোজন করে—যে শক্তি অমৃত-রসায়ন, অজীর্ণদোষে তাকেই বিষরূপে বিসর্পিত করে—দেহে, মনে, বাক্যে এবং ফলে ক্রমশঃ সমাজে ও জগতে।

জীবনের যথার্থ সুষমা সংযমের ছন্দেই আত্মবান্ মহাপুরুষদের হৃদয়ে স্পন্দিত হয়ে এসেছে। তাঁদের বিশ্বাস কর, তাঁদের অনুগামী হও—অপরূপ ভাব-প্রভায় অন্তর আলোকিত হবে, ভোগের আসক্তি ত্যাগের মহাশক্তিতে পর্য্যবসিত হবে।



দিঙ্‌নির্দ্দেশ

ইচ্ছার সবলতা সিদ্ধির মূল, এ কথা সবাই জানি। কিন্তু ইচ্ছা কেন সবল দুর্ব্বল হয়, তাহার নিদান জানি না বলিয়াই আমরা দুঃখ পাই। সাধারণতঃ একটা বিশ্বাস আছে, ইচ্ছা অন্তরের একটা নিগূঢ় শক্তি, কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। এই জন্য ইচ্ছার খামখেয়ালীতে আমাদের সব পণ্ড হইতে বসিয়াছে দেখিয়াও তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার মত উৎসাহ আমরা অনুভব করি না। ইচ্ছার সঙ্গে প্রায়ই রুচির যোগ থাকে। ভাল কাজে প্রবৃত্তি লওয়াইয়াও দেখা যায়, মানুষ কিছুক্ষণ পরে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন? জবাব পাইবে—ইচ্ছা করিতেছে না। কেন ইচ্ছা করিতেছে না?—না, ভাল লাগিতেছে না। এই ভাল লাগা না লাগার খামখেয়ালীতে কত তরুণ প্রাণের শক্তির যে দুঃসহ অপচয় নিত্য হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ বেচারীদের ইহাতে সোয়াস্তিও নাই।

খামখেয়ালীর একটা নিদান অতি স্থূলে আছে। বোধ হয় আমরা অনেকেই সেটা খেয়ালই করি না। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক দুর্ব্বল ইচ্ছার জনক ও পরিপোষক, ইহা ধ্রুব সত্য। ইন্দ্রিয়সংযমের অভাবে এবং আহারশুদ্ধির ত্রুটীতে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—অল্পেই কাজে অবসাদ আসে, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। আহারশুদ্ধি কতকটা আমাদের হাতে, এমন কথা মনে করিলেও করিতে পারি; কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম বলিতে অনেকখানি বোঝায়, ইহার যে কোন্ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন দিকে নিয়া শেষ করিতে হইবে, তাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ছেলেমহলে এই বিষয়ে অপ্রতিপত্তির ভাবটা আমরা খুবই প্রবল দেখিতে পাই। এই সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

ইন্দ্রিয়কে বাগ মানাইবার পূর্ব্বে কর্ম্ম গুছাইয়া নেওয়া দরকার। কর্ম্ম শুধু গুছানো নয়, কর্ম্ম জোটানোও প্রয়োজন। ছেলেদের মাঝে লক্ষ্য করিয়াছি, অধিকাংশেরই কাজ নিতান্ত হাল্কা। ছেলেরা পড়ায় বেশী সময় খাটাইতে পারিবে, এই ভরসায় তাদের প্রচুর অবকাশ দেওয়া হয়। কিন্তু সে অবকাশের কোনও সদুপযোগ হয় কি না, তাহা কেহ আসিয়া দেখে না। আর দেখিবেই বা কে? নিজের ভাল মন্দ এখন নিজকেই সকলের বুঝিয়া নিতে হইবে, নতুবা আর উপায় নাই। যাক্ সে কথা। প্রথমতঃ বলিতেছিলাম, কর্ম্ম জোটানো চাই। সমস্তটা দিন কর্ম্মে নিরেট ভরাট চাই। শুধু লেখা পড়া নয়; একটু সেবার সুযোগ থাকিলেও খুব উপকার হয়। পরের জন্য খাটার মত ইন্দ্রিয়সংযমের অনুকূল উপায় বোধ হয় আর দুটী নাই। আজকালকার বিদ্যালয়ের সেবাচর্চ্চার ব্যবস্থা খুবই কম। তাহা হইলেও যাহাদের সৎ হইবার ইচ্ছা

আরণ্যক



"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা—১০।৭১।৩

কৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করতেন, রাখালদের মনে হত এই বুঝি গো বৎস নিয়ে মাঠে যাওয়ার সময় হল, গোপীদের মনে হত প্রাণ প্রিয়তম বুঝি আমাদের কথা স্মরণ করছে; আর নারদাদি ব্রহ্মর্ষিরা শুনতেন প্রাণারাম নাদধ্বনি। একই বাঁশীর সুর এক এক জনার কাণে এক এক রূপে বেজেছে। ভগবান্ ডাকছেন সবাইকে—কিন্তু শোনার গুণে কেউ বা দু'দিন আগে যাচ্ছে, আর কেউ বা দু'দিন পাছে। যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ। এতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কিছুই নেই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

*

প্রলোভনের মাঝে থেকেও যিনি প্রলুব্ধ নন, তিনিই বীর সাধক। তাই রাজর্ষি জনক সাধকাগ্রগণ্য। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই করে কিছুতেই টিকে উঠতে পারব না, এ ভয়ে কম্পিত হয়ে যারা সংসার ত্যাগ করে ভীরু, কাপুরুষ তারা। তাদের উপর ইন্দ্রিয়ের আধিপত্য আরও বেশী। তাদের বন জঙ্গলেও শান্তি নাই, বাড়ীঘরেও নাই। দুর্ব্বলতা কাকে আশ্রয় করে? অবিশ্বাসীর দুর্ব্বল চিত্তকে। বিশ্বাস যত দৃঢ় হবে, দুর্ব্বলতা আপনি খসে পড়বে। ফল হলে ফুল আপনি ঝরে পড়ে।

*

নিজের শক্তিতে চলতে গেলেই বিপদ। তোমার শক্তি যে খণ্ড। অংশ কি কখন পূর্ণের চালে সমান চলতে পারে? আমি কচ্ছি, আমি করব এ হল অভিমানের কথা। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি বিষয় তুমি বিষয়ী, এ ভাব হলেই জানবে আত্মসমর্পণ, সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন তুমিই করুণ স্বরে গাবে—"তোমার ইচ্ছা হউক হে পূর্ণ, আমার জীবন মাঝে।"

*

চিত্তশুদ্ধি হলে ভগবান্ আপনি ধরা দেবেন। তাই উত্তম অধিকারী ভগবানকে চাই; প্রভু তোমার চরণে যেন ভক্তি থাকে" এ সব কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁরা আগেই চিত্তটাকে মেজে ঘসে ঠিক করে রেখে দেন। ধূলিপড়া দিলে সাপ যেখানেই থাকুক, ছুটে আসবেই আসবে। চিত্তশুদ্ধিটাও হচ্ছে ভগবানের ধূলিপড়া। ভগবান তো তোমার মাঝেই রয়েছেন, শুধু বাসনা কামনাগুলো দূর করে দাও—অমনি তাঁর দর্শন পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে। এই হল সোজা সরল পথ, মানুষ চলে কিন্তু এর উল্টো।



নিবেদন

—*—

(প্র)ামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ (পর)মহংসদেব আগামী শারদীয় পূজার অবকাশে তাঁহার জন্মভূমি পরিদর্শন (উপ)লক্ষ্যে নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিবিসনের অন্তঃপাতী কুতুবপুর গ্রামে (পদা)র্পণ করিবেন এবং তাঁহার বহু শিষ্যভক্ত এই শুভ সুযোগে শ্রীশ্রীগুরুদেবের (জন্ম)ভূমি মহাপীঠ দর্শন করিতে তাঁহার অনুগামী হইবেন—এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব (...)ত ভক্তসম্মিলনীতে গৃহীত হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভক্তসহ জন্মভূমি দর্শন (...)টী চিরস্মরণীয় করিতে এবং তাঁহার বিরাট্ উদ্দেশ্যের আংশিক সফলতা- (...)র তাঁহারই শুভ নির্দ্দেশের অনুসরণ করিয়া ভক্তমণ্ডলী এই উপলক্ষ্যে (তাঁহ)ার জন্মভূমিতে একটি আশ্রম ও তৎসহ "ঋষি-বিদ্যালয়" স্থাপন করিতে উৎ- (সুক) হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের উপযোগী এক খণ্ড জমী খরিদ (করি)বার আয়োজন হইতেছে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের পিতৃপিতামহের ভিটায় একটী (...)ক মন্দির তুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের জন্য সম্প্রতি (...)খানা ঘর উঠানও প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বহু (অর্থে)র প্রয়োজন হইবে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমি তদীয় শিষ্যবর্গের (এক)টি সর্ব্বতীর্থের সারস্বরূপ; এই পুণ্য ভূমিতে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল (...)সমস্ত দেখিতে পাওয়া আমাদের মহা সৌভাগ্যের পরিচায়ক, ইহা বলাই বাহুল্য। (আম)রা বিশ্বাস করি, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অনুরাগী শিষ্যভক্ত মাত্রই এই শুভ (অনু)ষ্ঠানটীর সফলতা কল্পে সাগ্রহে অগ্রসর হইবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য (সাহা)য্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সাহায্যের পরিমাণ যত অল্পই হউক না কেন, (তা)হা দিতে কেহ কোনও সঙ্কোচ করিবেন না; মনে রাখিবেন—

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্ত্তিক হইতে (...) কার্ত্তিক পর্য্যন্ত একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে (সক)ল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক (যত) শীঘ্র সম্ভব তাঁহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক ব্যয়াদি নির্ব্বাহজন্য জন (প্র)তি ৫৲ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, সুতরাং

আছে, তাহারা নিজেরা দল বাঁধিয়া একটা সেৰাসঙ্ঘের পত্তন করিতে পারে বই কি! নিজের সমস্ত কাজ কর্ম্ম নিজের হাতে করিবার চেষ্টাতেও কিছু কাজ জোটে। এতেও যদি দিন ভরাট না হয়, বাকীটুকু অগত্যা বিদ্যাচর্চ্চা দিয়াই পুরিয়া নিতে হইবে। মোট কথা, কর্ম্ম দ্বারা দিনটী পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে কুচর্চ্চা, কুচিন্তার অবসর কম হইবে, সমস্ত দিনের খাটুনীতে শ্রান্ত হইয়া রাত্রের বিশ্রামটাও উপভোগ্য হইবে, কুৎসিৎ উত্তেজনার হাত হইতেও রক্ষা পাইবে।

দিনটী যদি কর্ম্মে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে পার, তার পর তোমার চিন্তা হইবে, কি করিয়া কর্ম্মগুলি গুছাইয়া নেওয়া যায়। এখানে দুইটী পথ আছে। কেউ কেউ কড়াকড়ি রুটীনের পক্ষপাতী, কেউ কেউ আবার বেপারোয়াভাবে চলিতেই ভালবাসে। আমরা দুটীর একটীও পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে করি না। ইংরেজী কেতাবে সময়ানুবর্ত্তিতার নানারকম আশ্চর্য্য উদাহরণ পাওয়া যায়; ছেলেবেলায় সেগুলো পড়িয়া অনেক ছেলের অনুকরণ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলা মন্দ বলিতেছি না। কিন্তু নানা কারণে তাহা সর্ব্বাংশে সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। প্রথমতঃ আমাদের দেশে সবাই ঘড়ি ধরিয়া চলে না; সুতরাং অপরের সহযোগ ব্যতীত সময়ানুবর্ত্তিতা সব সময় সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জীবনে কর্ম্মই একমাত্র লক্ষ্য নয়; ইংরাজ কর্ম্মের লাগাম মুখে করিয়া ছুটিতে ছুটিতে মরিতে চায়; আমরা একটু আয়েস করিয়া ছুটি নিয়া মরিতে চাই। সে দেশের প্রকৃতি বারোমাস এক রকম ঘোমটা টানিয়াই থাকে, সুতরাং ঘড়ি ধরা ছাড়া উপায় থাকে না। আমাদের সে ব[...] নাই। হিন্দুর এক রকম সময়ানুবর্ত্তিতা আ[...] সেটা প্রকৃতির অনুসরণে। ভোরবেলায় [...] যখন ম্লান হইয়া আসিল, দুপুর বেলায় [...] যখন মাথার উপর আসিল, সন্ধ্যায় যখন [...] তিনটী তারা ফুটিয়া উঠিল—এইগুলো [...] হিন্দুর সময়ের হিসাব। বিশ্বপ্রকৃতিই [...] কাছে ঘড়ি। আমাদের কাছে কিন্তু [...] রকমই ভাল লাগে। এতে ছটফটানি [...] হয়, একটু এদিক ওদিক হওয়ার দরুণ [...] র্থক উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হয় না, সময়ের তা[...] কাজের উপর জবরদস্তি করিয়া তাহার ব[...] বিস্বাদ করিয়া তুলিতে হয় না। একটী [...] সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যায়—সময়[...] ছেলেকে দুটা খাওয়ানো আর দশটার [...] ইস্কুলের ভাত রাঁধিয়া দেওয়া এই দু[...] মাঝে মা ও ছেলের উভয়ের তৃপ্তি কোন[...] বেশী, তা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে [...]

তবে দুইটী রীতিই মিলাইয়া নেওয়া য[...] পারে। দিনমানের কতকগুলি ছেদকে [...] সঙ্গে মিলাইয়া রাখ, আর তার ফাঁ[...] আলগা রাখ, অথচ সমস্তটা দিন কর্ম্ম[...] ভরাট করিয়া দাও। আমাদের বোধ[...] এই ব্যবস্থাই কালোপযোগী ও সহজ[...] হইবে।

কর্ম্মে অনাসক্তি, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন [...] কার বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব আছে। [...] বলি, সেগুলো আপাততঃ তোলা [...] যে দেশে মধ্যবিত্ত সমাজেও কর্ম্মে[...] বালাই নাই, সেখানে আসক্তি অনাসক্তি[...] বাজে। অন্নচিন্তায় যে কেউ খাটে না [...] কথা বলিতেছি না; খাটে সকলেই[...]

খাটার মত খাটে না, খাটার রীতি জানিয়া খাটে না। বিশেষতঃ যে সময়টায় খাটুনী শিখিতে হয়, সেই সময়টাতেই কেউ খাটে না। যাহারা শিক্ষার্থী, আমরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলিতেছি—শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও শিক্ষার এই দিকটা চাহিয়া দেখিবেন। ভাল হইবার ইচ্ছা অনেকের আছে, কিন্তু তাহারা পারিতেছে না কেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ছেলেরা অতিমাত্রায় নিষ্কর্ম্মা থাকে বলিয়াই অসৎ সঙ্গের প্রভাবে, যাহাদের আন্তরিক ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, তাহারাও উঠিবার সুযোগ পায় না। অনেক ছেলে উপদেশ চাহিয়া চিঠি লেখে। আমুলি অনেক উপদেশই ছাপার হরফে বাহির হইয়া গিয়াছে—সেগুলি যে তাহারা জানে না, তাহা নয়। তবে কিনা উপদেশ পালন করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কেন সে ক্ষমতা নাই, সেই কথাটাই তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি, সকল উপদেশের সেরা উপদেশ—সেবা কর—কর্ম্ম কর। প্রাচীন গুরুগৃহে এই উপদেশ মূর্ত্তিমান ছিল; শিক্ষাও তাই সফল হইত, মেধার সহিত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ দেখা যাইত। আজকালকার লোক বোধ হয় এদিকে এখন একটু নজর দিতে সুরু করিয়াছে। Boy-Scout Movement আরম্ভ হইয়াছে—ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাতারা শতমুখ, ঘরাটে ছেলেরাও নাকি ইহাতে শ্রী ফিরিয়া যায়। কিন্তু এর মূলেও সেই একই কথা—সেবা বা কর্ম্ম। নিজের হউক, পরের হউক, সকাম হউক, নিষ্কাম হউক, এখন কর্ম্ম চাই। দিনভর খাটিয়া যাও, ভাল হইবার পথ আপনিই দেখিতে পাইবে, ইচ্ছার দৃঢ়তা আপনি আসিবে।

আর একটা কথা ছিল, আহার শুদ্ধি। এ সম্বন্ধে আজকাল মাঝে মাঝে আলোচনা দেখিতে পাই। কাজ আর খাওয়া—দুটী ঠিক ঠিক হওয়া চাই, নতুবা শক্তি রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। রেলষ্টিমারে সকল দেশ এক করিয়া দিয়াছে, সকলের খাওয়াও একাকার করিয়া দিয়াছে। আগেরটা না হয় ভালই মানিলাম, কিন্তু শেষেরটাকেও ভাল বলিব কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালী যখন ঘরের খাইত ঘরের পরিত, তখন বোধ করি এমন বীর্য্যহীন ছিল না। আজ যখন ঘরের বাহির হইতে হইবে তখন আর উপায় কি? আহারে ব্যভিচার তো ঘটিবেই। কিন্তু সেই জন্যই বলি, হুঁসিয়ার হওয়া আরও প্রয়োজন।

এখনও এমন দুচারিটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখা যায়, যাঁহারা ব্রাহ্মণও অজ্ঞাতকুলশীল হইলে তাহার হাতে খান না, কিম্বা গৃহে তাঁহারা স্বপাকে আহার করেন। ঘরের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, ছাত্রদিগের পক্ষে বাহিরে অন্ততঃ এই আদর্শ পালন করিয়া চলা উচিত। সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইবে না জানি। সকলকে উদ্দেশ করিয়াও আমাদের এই লেখা নয়। যাহারা নানা অত্যাচারে-অনাচারে বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, প্রতীকারের কোনও পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, বাজে আড়ম্বর আর অনধৌতিক ঔষধের বিজ্ঞাপন খোঁজা ছাড়িয়া তাহারা এই গোড়ার কথাটী একবার আঁকড়িয়া ধরুক দেখি। আহারশুদ্ধিতে বীর্য্যরক্ষা হয়—ইহা বেদের কথা। যদি আহার শুদ্ধ করিবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে নিজের যোগাড় নিজে-হাতে করাই ভাল। অবশ্য আমিষ বর্জ্জন করিতে হইবে। আহারের পবিত্রতাই তাহার প্রধান পুষ্টিকরী শক্তি। ভুক্তভোগী ছাড়া অপরকে এ কথা বুঝাইবার সাধ্য নাই।

শ্রীইন্দ্রপদ সাধুখাঁ ঐ	৫৲
শ্রীপ্রাণজীবন চক্রবর্ত্তী হাওড়া	৫৲
শ্রীগোপীনাথ স্মৃতিভূষণ চট্টগ্রাম	৫৲
শ্রীবিন্দুচরণ দাস ধুবড়ী	৫৲
শ্রীমহেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ	৫৲
শ্রীসূর্য্যমোহন দাস ঐ	৩৲
শ্রীযোগেশ্বর গাঙ্গুলী ভাড়াস	৩৲
শ্রীধরণীধর মাইতি মেদিনীপুর	৩৲
শ্রীকালীপদ দাস নাটনা (২য় বার)	৩৲
শ্রীকানাইলাল কুণ্ড নবদ্বীপ	২৲
শ্রীগিরিজাবন্ধু কর	২৲
শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস	২৲
শ্রীরসিকচন্দ্র কর্ম্মকার সন্দীপ	২৲
শ্রীমতী সুষমাশোভা দেবী ঐ	২৲
শ্রীমতী বিজনবাসিনী গুহ ঐ	২৲
শ্রীমতী কিরণবালা দেবী ঐ	২৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী ঐ	২৲
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কুচবিহার	১৲
শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দাসী	১৲
শ্রীমতী হরসুন্দরী দাসী	১৲
শ্রীমতী চারুবালা নন্দী সন্দীপ	১৲
শ্রীমতী সরোজিনী কর ঐ	১৲
শ্রীমতী মনোমোহিনী ঘোষ ঐ	১৲
শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ঐ	১৲
শ্রীমতী বিজয়া দাসী ঐ	১৲
শ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা গুহ ঐ	১৲
শ্রীমতী শৈবলিনী দত্ত ঐ	১৲
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী নাগ ঐ	১৲
শ্রীমতী মনোরমা দাসী ঐ	১৲
শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবী ঐ	১৲
শ্রীমতী মনোহরা দাসী ঐ	১৲
শ্রীমতী সুমতিবালা দাস ঐ	১৲
শ্রীচন্দ্রমোহন দাস ঐ	১৲
শ্রীপ্রসন্নকুমার বল ঐ	১৲
শ্রীক্ষেত্রমোহন কর্ম্মকার ঐ	১৲
শ্রীকিশোরীমোহন কর্ম্মকার ঐ	১৲
শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস ঐ	১৲
শ্রীকরুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় ঐ	১৲
শ্রীবিপিনবিহারী কর ঐ	১৲
শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসী	৷৹
সন্দীপ খুচরা সংগৃহীত	১২৬৶৹

(ক্রমশঃ)

সারস্বত-মঠে

জমিদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	২৫৲
জমিদার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী	১০৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন বোকাখাতা…ম্যানেজার বিজনীরাজ অভয়াপুরী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্	১০৲
শ্রীযুক্ত উমানাথ দে	৭৲
মৌয়াটারী ভদ্রেশ্বর দাসের পাড়া	৭৲
চাপরবাজার ও ভকতপাড়ায় সংগৃহীত	৬৷৹
শ্রীযুক্ত শঙ্করাম সিংহ	৬৴৹
চাইটানতল গ্রামবাসী	৫৲
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস	৫৲
শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র রায় তালুকদার	৫৲
শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাস	৫৲
রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বরুয়া	৫৲
" গজেন্দ্রনারায়ণ দাস দিঃ	৫৲
মৌয়াটারী গ্রাম ঘোড়াবান্দা পাড়া	৪৶৹
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার তালুকদার	৪৲
" তিনকড়ি দাস	৪৲
" উপেন্দ্রচন্দ্র দাস	৪৲
" মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৲
" আনন্দ দাস	৩৲
" বসন্তকুমার সিংহ	৩৲
আড়িয়ার ঝাড়বালা গ্রামবাসী	৩৲
আবেয়াঝাড় ভলসরাপাড়া	৩৲
শ্রীযুক্ত ধর্ম্মেশ্বর দাস	৩৲
অতুলেশ্বর দাস গুপ্ত চাপড়বাজার,	২৲
" ভাতুরাম সিংহ ভকতপাড়া,	২৲
" প্রভারাম দাস আড়িয়ারঝাড়,	২৲
খোকাটিকর গ্রাম,	২৲
শ্রীশ্যামাচরণ সরকার মৌয়াটারীপাড়া,	২৲
খুচরা সংগৃহীত	২৲
শ্রীরূপচাঁদ দাস সত্যপুর,	২৲
" রমণীকান্ত দাস সত্যপুর,	২৲
" সূর্য্যনারায়ণ মেম্বর বহলপুর,	২৲
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব বহলপুর	২৲

*খিলাগা দাস কচুদলা ২৲
*কান্তিরাম দাস কচুদলা ২৲
*লক্ষ্মীনাথ মেম্বর ঔড়ুবি ২৲
*লালুদাস সেবায়েৎ ফলিমারি ২৲
ঢোলমারা নিবাসী শরেন্দ্র সরকার দিঃ ২৲
*প্রেমনাথ বড়ুয়া শালকচা ২৲
*ফরিঙ্গা বিশ্বাস দিঃ হাড়কাটি কমড়িগাঁও ২৲
*জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ডাক্তার দিঃ গৌরাঙ্গচারা ২৲
*হেমচন্দ্র তালুকদার কারষ্টার বিলাসীপাড়া ২৲
খুচরা সংগৃহীত ঐ. ১॥০
শ্রীরাজেশ্বর বর্ম্মন মৌয়াটারী, ১॥০
খুচরা আদায় বাণী তারা, ১॥০
কড়েয়া গ্রাম সংগৃহীত ১।৵০
বড়লপুর ও চৈলাড়ী গ্রাম হইতে সঃ ১॥৵০

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দত্ত ডাক্তার চাপরবাজার, শ্রীবিপিনবিহারী দাস চাপড়বাজার, শ্রীকৈলাসচন্দ্রনাথ চাপড়বাজার শ্রীঅভয়চরণ আগরওয়ালা চাপড়বাজার, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সুর চাপড়বাজার, শ্রীসুখমল রূপচাঁদ নাগাতা চাপড়বাজার, শ্রীঅতুলেশ্বর দাস গুপ্ত চাপড়বাজার, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী চাপড়বাজার, শ্রীঅর্জ্জুন সিংহ ভকতপাড়া, শ্রীগুরুপ্রসাদ সিংহ ভকতপাড়া, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সিংহ ভকতপাড়া, শ্রীরাজেশ্বর দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীউমাচরণ দাস আড়িয়ারঝাড় শ্রীকুমুদচন্দ্র দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীললিতচন্দ্র দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীগন্ধ দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীমদননাথ দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীথের দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীবিন্নিরাম দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীচন্দ্রমোহন দাস আড়িয়ারঝাড়, খুচরা সংগ্রহ আড়িয়ারঝাড়, শ্রীকদম বর্ম্মন ভকতপাড়া, শ্রীলালসিং বর্ম্মন শ্রীসেতরাম বর্ম্মন বড়বদল, শ্রীধুমারু বর্ম্মন মৌয়াটারী, শ্রীরামপ্রসাদ বর্ম্মন মৌয়াটারী ঘোড়াবান্দাপাড়া, শ্রীনবীনচন্দ্র বর্ম্মন মৌয়াটারী ঘোড়াবান্দাপাড়া, শ্রীগোলক সরকার মৌয়াটারী, শ্রীকীর্ত্তন বর্ম্মন মৌয়াটারী, শ্রীকন্দর্পনারায়ণ সিংহ মৌয়াটারী, শ্রীপদ্ম সূত্রধর সত্যপুর, শ্রীচতুর বর্ম্মন সত্যপুর, শ্রীগোবিন্দ বর্ম্মন সত্যপুর, শ্রীধরণীকান্ত দাস সত্যপুর, শ্রীতারাপদ দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীদেবীচরণ দাস সত্যপুর, শ্রীতিনকড়ি দাস সত্যপুর, শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ অধিকারী বনীতার, শ্রী... রামু পিয়ন কাজিপাড়া, শ্রীবন্মালি বর্ম্মন বারুণী তারা, শ্রীভোজন বর্ম্মন বারুণীতারা, শ্রীফটিক বর্ম্মন বারুণী তারা, শ্রীরামচরণ কোচ বারুণী তারা, শ্রীগোলকচন্দ্র অধিকারী বারুণীতারা, শ্রীকেদারনাথ দাস সত্যপুর, শ্রীরমানাথ দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীরামাশুচন্দ্র দাস আড়িয়ারঝাড়, শ্রীদেবেন্দ্র হালদার বড়লপুর, শ্রীফো... সর্দ্দার বড়লপুর, শ্রীপদ্মনাথ বর্ম্মন বড়লপুর, শ্রীপচানাথ বড়লপুর, শ্রীরজনীকান্ত ব... ভকতপাড়া, শ্রীসীতারাম দাস কচুদলা, শ্রীমধুধন পণ্ডিত কচুদলা, শ্রীচন্দ্রমোহন ... কচুদলা, শ্রীহরিচরণ দাস কচুদলা, শ্রী... মহাজন, শ্রীত্রৈলক্য দাস কচুদল, শ্রী... লোচন দাস কচুদলা, ঔমবড়ি সংগৃহীত শ্রীমঙ্গল বর্ম্মন কাজিপাড়া, শ্রীশচন্দ্র দাস ডাক্তার চাপড় চা বাগান, শ্রীকানাইলাল বর্ম্মন ফলিমারি, শ্রীবিজয়কান্ত সরকার ঝালগু... শ্রীউমেশচন্দ্র নিয়োগী শালকচা, শ্রীরসিকলাল দাস ইনসপেক্টর বিলাসীপাড়া শ্রীকৃপা... দাস বিলাসীপাড়া এপ্টেট। (ক্রমশঃ)

ঢাকা মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে—

ছাপরা—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শূর ১৲
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ ...
শ্রী বজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার ৪৲
শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ রায় ডাক্তার ২৲
শ্রীচারুবদন বসু ডাক্তার ২৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ডাক্তার ১৲
শ্রীবতীন্দ্রনাথ গুপ্ত উকীল ১৲
শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী ১৲
শ্রীসুদর্শন ভট্টাচার্য্য ১৲
শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী ১৲
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
সমস্তিপুর— জনৈক হিতৈষী ১৲

উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তগণের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হওয়া প্রয়োজন।

কুতুবপুরে যে আশ্রম ও ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহার সাহায্যার্থ যিনি যাহা দিতে চাহেন, তাহাও উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

কুতুবপুর আশ্রমে যাওয়ার পথের বিবরণ—

গোয়ালন্দ কলিকাতা লাইনে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া মোটরে ১৮ মাইল পথ মেহেরপুর যাইবে। মোটর ভাড়া জন প্রতি ১৲ এক টাকা, ১ ঘণ্টা সময়ে যাওয়া যায়। মেহেরপুর হইতে আশ্রম ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে, নৌকাতে ২ ঘণ্টা, কিম্বা মোটরে আধ ঘণ্টায় পৌঁছা যায়; মোটর ভাড়া জন প্রতি ৷৷০ আট আনা।

প্রধান প্রধান ট্রেনগুলি চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে পৌঁছিবার সময় নিম্নে লিখা হইল।

শিলিগুড়ী প্যাসেঞ্জার ও আসাম মেল	...	...	প্রাতে	৯—৫৮ মিনিট
চট্টগ্রাম মেল	...	...	বৈকালে	৩—৪১ মিনিট
ঢাকা মেল	...	...	রাত্রি	১—৪৯ মিনিট
দার্জ্জিলিং মেল	...	...	রাত্রি	২—৪৩ মিনিট
সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	...	...	রাত্রি	৩—৫ মিনিট
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	...	...	ভোর	৫—৫০ মিনিট

(কার্ত্তিক মাসে সময়ের সামান্য পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব)

দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের ভক্তগণ কলিকাতা হালিসহর নৈহাটী ও রাণাঘাট প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে অনেক ট্রেনেই চুয়াডাঙ্গা পৌঁছিতে পারিবেন। প্রধান প্রধান ট্রেনের সঙ্গে মোটর সার্ভিসের যোগ আছে।

চিঠিপত্র লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত এম্, এ, বি এল, সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
(অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

সংবাদ ও মন্তব্য

—:{*}:—

আগামী ৬ই ভাদ্র সোমবার ঝুলনপূর্ণিমা তিথিতে আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথি-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক পাঠকগণকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে কলিকাতা অঞ্চলে ভ্রমণে আছেন। শীঘ্রই তাঁহার পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা।

প্রেসসংক্রান্ত গোলযোগে বর্ত্তমান মাসের পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল। আগামী মাসের পত্রিকা যথানিয়মেই প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ স্মরণ রাখিবেন, আর্য্যদর্পণ প্রতি মাসের **তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে** প্রকাশিত হইয়া থাকে, মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা পৌঁছিবার কথা। সুতরাং মাসের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকার অপ্রাপ্তি সংবাদ আমাদিগকে জানাইলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা।



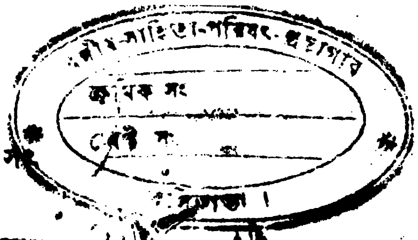
দানপ্রাপ্তি

নদীয়া—কুতুবপুর—আশ্রম স্থাপনোপলক্ষে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসচ্চিদানন্দ সাহা কালনা	১০০৲
শ্রীশালুক-মোহন রায় চৌধুরী দিনাজপুর	২০৲
শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আলীপুর	২০৲
শ্রীভবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুচবিহার	১০৲
বগুড়িভাণ্ড আশ্রমের সেবকবৃন্দ	১০৲
শ্রীনারায়ণদাস নন্দী শিলং	১০৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় রায়গঞ্জ	১০৲
শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ ২য় দফা আবুতরাপ	১০৲
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ারী ২য় দফা	১০৲
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দে কালীরবাজার	১০৲
শ্রীমুকুলচন্দ্র দত্ত শ্রীহট্ট	১০৲
শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তমলুক	১০৲
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার নবদ্বীপ	৫৲
শ্রীশ্রীনাথ বসু বারদী ঢাকা	৫৲
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মেদিনীপুর	৫৲
শ্রীপ্রাণেশ্বর লাহিড়ী তাড়াস	৫৲
শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী তাড়াস	৫৲
শ্রীকালীনাথ দত্ত বগুড়া	৫৲
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দাস বৈষ্ণব কালীরবাজার	৫৲
শ্রীহেমচন্দ্র দাস ঐ	৫৲
শ্রীগিরীশচন্দ্র সরকার ঐ	৫৲
শ্রীতারাপদ রায় কলিকাতা	৫৲

ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ



১৯শ বর্ষ | ভাদ্র | প্রথম খণ্ড
সমষ্টি সং ১৯৭ | | পঞ্চম সংখ্যা



ইন্দ্রায়

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৩।১]

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তং
অহস্তমিন্দ্র সং পিণক্ কুণারুং।
অভি বৃত্রং বর্দ্ধমানং পিয়ারুম
অপাদমিন্দ্র তবসা জঘন্থ॥

জননীরে নিয়ে যবে আসে বৃত্র করি আস্ফালন,
ছেদি বাহু, চূর্ণি কায়, স্তব্ধ তার কর গরজন।
স্পর্দ্ধা তার বাড়ে নিতি, হিংসা করি নাহি মিটে আশ,
পঙ্গু করি ইন্দ্র তারে বীর্য্যবলে করহে বিনাশ।

নি সামনামিষিরামিন্দ্র ভূমিং
মহীমপারাং সদনে সসত্থ।
অস্তভ্নাদ্দ্যাং বৃষভো অন্তরীক্ষম্
অর্ষন্ত্বাপস্ত্বয়েহ প্রসূতাঃ॥

এই ভূমি সুবিশাল ছিল যাহা সুষম চঞ্চল,
সীমাহীন তারে তুমি যথাঠাঁই করেছ অটল।
স্তব্ধ করি দ্যুলোকেরে অন্তরীক্ষে করিয়াছ স্থির,
তোমার প্রেরণা বশে হে বৃষভ, বহে হেথা নীর।

অলাতৃণো বল ইন্দ্র ব্রজো গোঃ
পুরা হন্তোর্ভয়মানো ব্যার।
সুগান্ পথো অকৃণোন্নিরজে গাঃ
প্রাবন্ বাণীঃ পুরুহূতং ধমন্তীঃ॥

বড় হিংস্র বলাসুর, জলরাশি ছিল আবরিয়া—
তুমি ছিলে শাস্তা তার, তাই ভয়ে গিয়েছে সরিয়া।
করেছ সুগম পথ, বহি যায় সলিলের ধারা
পিয়াসী ধরার বুকে কলকলি—পেয়ে তার সাড়া।

একো দ্বে বসুমতী সমীচীং
ইন্দ্র আ পপ্রৌ পৃথিবীমুত দ্যাম্।
উতান্তরীক্ষাদভি নঃ সমীক
ইষো রথো সযুজঃ শূর বাজান্॥

দ্যুলোক-ভূলোক দুই বন্ধু তারা, ধরে কত ধন,
একা ইন্দ্র আছ তুমি তাহাদের করি আপূরণ।
অন্তরীক্ষ হতে নামি একবার এস মর্ত্যপুর—
দিব্যরথে দিব্য হয় নিয়োজিয়া ওহে মহাশূর।

দিশঃ সূর্য্যো ন মিনাতি প্রদিষ্টা
দিবে দিবে হর্য্যশ্বপ্রসূতাঃ।
সং যদানড্‌ধ্বন আদিদশ্বৈ
বিমোচনং কৃণুতে তত্ত্বস্য॥

যে পথ দিয়াছ আঁকি নিজ হাতে, হে হরিবাহন,
সেই পথে চলে নিতি, ছাড়ি তারে যায় না তপন;
কিরণ-তুরঙ্গ তার ছায় ব্যোম অসীম-বিথার,
সংহরে যে রশ্মিজাল—জানি দেব, মহিমা তোমার॥

দিদৃক্ষন্ত উষসো যামন্নক্তো
বিবস্বত্যা মহি চিত্রমনীকম্।
বিশ্বে জানন্তি মহিনা যদাগাদ্
ইন্দ্রস্য কর্ম্ম সুকৃতা পুরূণি॥

বিশ্ব রহে পথ চাহি—আলোকের পরি চিত্র ভূষা,
নিশার সম্পুট ভেদি—হের ওই আসে বুঝি উষা।
জানি যবে তারপর প্রকাশিল উষার মহিমা,
তোমারি সুকৃতি সে যে, কেবা তার দিতে পারে সীমা।

মহি জ্যোতির্নিহিতং বক্ষণাসু
আমা পক্বং চরতি বিভ্রতী গৌঃ।
বিশ্বং স্বাদ্ম সম্ভৃতমুস্রিয়ায়াং
যৎ সীমিন্দ্রো অদধাদ্ভোজনায়॥

বহি যায় নদী যত, মহাজ্যোতিঃ ধরে গর্ভে তারা—
তরুণী ধেনুর মত চরি ফিরে, স্তনে ক্ষীরধারা।
বিশ্বে যাহা স্বাদুতম তারি মাঝে রয়েছে সঞ্চিত,
দিলেন বাসব যাহা, নিঃস্ব বলে নহি তো বঞ্চিত।



ভাব ও বস্তুর সমন্বয়

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

ভাববাদীরা তাঁদের মত সমর্থন করতে যে সমস্ত যুক্তি দেখান, তার দু'চারটী এই—প্রথমতঃ তুমি নিজে ক্রিয়াশীল না হয়ে কোনও কিছু জানতে বা অনুভব করতে পার না। বিষয়ীর ক্রিয়া বা স্পন্দনই জগৎকে তোমার চোখে ফুটিয়ে তুলছে। তুমি কিছু লিখছ হয়ত, লেখার মাঝে মন একেবারে ডুবে গিয়েছে, একটা সাপ তোমার সামনে দিয়ে চলে গেল, তুমি তাকে দেখতে পেলে না—কেননা সাপ তোমার কাছে তখন সাপ নয়—সর্প তখন অসৎ। ভাববাদীরা তাই বলেন, বিষয়ীর মনের স্পন্দনটা যদি না থাকতো, তাহলে কোনও বিষয়ও থাকত না। যখন ঘুমিয়ে আছ, বিষয়ী তখন নিষ্ক্রিয়, চারদিকে হট্টগোল করলেও শুনতে পাও না। কেউ কেউ ঘুমের সময় চোখ মেলে থাকে। তাদের চোখের মাঝে সব জিনিষেরই ছায়া পড়ে, সবি তাদের চোখের সামনে রয়েছে, কিন্তু তারা তো দেখতে পায় না। ভাববাদীরা বলবেন, মন তোমার নিষ্ক্রিয়, বিষয়ী তার স্পন্দনকে নিরুদ্ধ করে রয়েছে, তাই কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। মনের স্পন্দন ছাড়া কি এই জগতে কিছু দেখতে পার? না! মনকে বিন্দুমাত্র চঞ্চল না করে এই টেবিলটা বা দেওয়ালটা দেখতে চেষ্টা কর, রাস্তের কথাগুলো শুনতে ইচ্ছা কর কিম্বা যা হোক একটা কিছু অনুভব করতে গিয়ে দেখ দেখি, কোনও কিছুর সাড়া পাও কিনা। না ভেবে কি অনুভব চলে? তা চলে না। তাই ভাববাদীরা বলেন, সমস্তটা জগৎ কেবল একটা ভাবের প্রবাহমাত্র—এটা ভাবেরই বহির্ব্যক্তি।

জগৎ যে আছে, তা জানছ কি করে? ইন্দ্রিয় দিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো স্বয়ং তো আর অনুভব করতে পারে না। মন যখন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হয়, তখন তাদের অনুভব করবার ক্ষমতা জাগে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তো দেখে না - ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে দেখে মন। আপাততঃ মন বা বুদ্ধিকেই আমরা বলছি বিষয়ী। মনের স্পন্দন ছাড়া কিছু শুনতে পার না, দেখতে পার না বা করতে পার না। তাই ভাববাদীরা বলেন, "যাঁরা জগৎকে সত্য মান, বস্তুর স্বরূপ ঠিক এই সেই মান, তাদের পুনঃ পুনঃ বলছি, তোমরা আত্মবিস্মৃত হয়ো না, ভুল করো না। যা কিছু বাইরে, সব তোমার সৃষ্টি, তোমার ভাব হতে প্রতিফলিত—এক কথায় এ জগৎ তোমার নিজ হাতে গড়া।" এই হল ভাববাদীদের মূল বক্তব্য। দেখতেই পাচ্ছ, তারা কতকটা বৈদান্তিকের মত। কিন্তু রাম বলছেন কি, বার্কলে, প্লাটো, হেগেল, কাণ্ট, ফিকটে, শেলি সোপেনহাউর এরা বেদান্তের অনুসরণ করছেন বটে, কিন্তু বেদান্তীর প্রমাণশাস্ত্র এ সমস্ত মতকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরস্পর মতভেদ আছে, এঁ ওঁর প্রতি বক্রকটাক্ষ করছেন, কিন্তু বেদান্ত তাঁদের সকলকে

মিলিয়ে দিচ্ছে। এই সমস্ত দার্শনিকেরা অহংটাকে খুব বড় করে তোলেন, কিন্তু বেদান্তের সে পন্থা নয়; অন্যান্য দার্শনিকের সঙ্গে এই খানেই তার প্রভেদ। সত্যকে সত্যস্বরূপেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।'

ভাববাদীদের আর একটা যুক্তি এই—এই যে জগৎটাকে লোকে সাধারণতঃ সত্য বলে গ্রহণ করে, এটা তাদের মস্ত একটা ভুল। কেননা ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই আমরা জগৎটাকে এমনি দেখ্‌ছি বই তো নয়। কাজেই দৃশ্যতঃ জগৎটাকে সত্য বল্‌তে গেলে ইন্দ্রিয়ের দেখার উপর ভরসা করেই আমাদের রায় দিতে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দর্শন তো বিশ্বাস করতে পারি না। ধর চোখের কথা। পিঁপড়ের চোখের দৃষ্টি আর মানুষের চোখের দৃষ্টি আলাদা। মানুষের চোখে একটা জিনিষ যেমন দেখায়, হাতীর চোখে তার চেয়ে অনেক বড় দেখাবে। বেঙের চোখে জলের জিনিষ বেশ পরিষ্কার দেখায়, কিন্তু বাতাসের ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে গেলেই সেগুলোকে সে ঝাপ্‌সা কুয়াসায় ঢাকা দেখ্‌তে পায়। এখন বল দেখি, কার চোখকে বিশ্বাস করি? মানুষের চোখকে না পিঁপড়ের চোখকে? যদি গুণ্‌তি হিসাবে ছোট বড় বিচার করি, তাহলে পিঁপ্‌ড়ে একদিকে ছোট হলেও গুণ্‌তিতে বড় বই কি। অণুবীক্ষণের রীতিতে যদি চোখের গঠন হয়, চক্ষুর স্নায়ুর অবস্থান যদি একটু এদিক ওদিক হয়, তাহলে জগৎটা তোমার কাছে একেবারে আর এক রকম ঠেক্‌বে। যদি দূরবীক্ষণের ধরণে চোখের স্নায়ু গঠিত থাকে, তাহলে কিন্তু জগৎটা আবার আর এক রকম হয়ে যাবে। এক রকম খেলনা আছে, তার নাম "দেখন-হাসি।" দুখানা কাচের ফলক দিয়ে তা তৈরী। তার ভিতর দিয়ে তাকালে সব জিনিবই হাস্যকর ও অদ্ভুত দেখায়। অতি সুন্দর একখানা মুখও "দেখন-হাসি" আয়নার ভিতর দিয়ে দেখ্‌লে এমন বিশ্রী লম্বা দেখাবে যেন তার চিবুকটা ঠেকেছে মাটীতে আর মাথাটা উঠেছে আকাশে। আবার কাচটা একটু ঘুরিয়ে দেখ, দেখ্‌বে, মুখের খাড়াই ঠিক আছে, কিন্তু তার একটা কাণ গেছে কাশীতে আর একটা প্রয়াগে। তোমার চোখ দুটো যদি ওই ধরণে গড়া হত, তাহলে জগৎটা একেবারে বদ্‌লে যেত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। স্নায়ু বা মাংসপেশী যদি অন্যরকমে গড়া হয়, তাহলে জগৎ আর এক রকম হয়ে যাবে। বল্‌তে পার, ইন্দ্রিয়, পেশী ইত্যাদি যে ভাবে গড়া আছে, চিরকাল সেই ভাবেই থাকবে। কিন্তু তা হয় না। পরিণামবাদ বল্‌ছে, সব জিনিষই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লে যাচ্ছে। ভাববাদীরা এই জন্য বলেন, জগৎটা যা দেখ্‌ছ তা নয়; এখন যা দেখছি, তা মিথ্যা, মায়া বা মতিভ্রম মাত্র।

ভাববাদীদের পক্ষে আরও অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সে সমস্ত খুঁটিয়ে আলোচনা করতে গেলে এমন অনেক রাতই কেটে যাবে। এখন আমরা বস্তুবাদীদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বল্‌তে চাই। বস্তুবাদীরা বলেন, "ভাই ভাবুক, তোমার যে ভারী ভুল হচ্ছে। তুমি বল্‌তে চাও যে আমরা যা কিছু দেখি, সবই আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। তাই যদি হয়, আচ্ছা তাহলে এই যে সামনে দেওয়ালটা দেখ্‌ছ, এটাকে একটা ঘোড়া বানিয়ে দাও না ভাই। তোমার মত ক্ষুদ্র বিপরীত বুদ্ধি যা মন

থেকে যদি এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এই রুমালটাকে বাঘ করে দাও, না হয় এই পেন্সিলটাকে একটা ইমারত বানিয়ে দাও না! আসল কথাটা কি জান, এই জগৎটা একটা বাস্তব সত্য। এই দেওয়ালটা আসলে দেওয়ালই, সেইজন্য চিরকাল তোমার ইন্দ্রিয়ের কাছে দেওয়াল বলেই এটা ঠেকে, আজ দেওয়াল আর কাল হল ইমারত—এমন হয় না।"

বাস্তববাদীর এই আপত্তির খণ্ডন ভাববাদীরা করেছেন বটে, কিন্তু দুপক্ষের সওয়াল জবাব করবার সময় তো আমাদের হবে না। ভাববাদীরা বলেন, সৃষ্টি করাটা সময়সাপেক্ষ, নইলে ভাব দ্বারা সৃষ্টি অসম্ভব নয়। ভূতের কথা ভাবতে থাকলে ভূত দেখা যায়—যাই ভাববে তাই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তা ছাড়া স্বপ্নে আমরা সৃষ্টি করি না কি? আমাদের কল্পনাই তো সেখানে বাস্তব হয়ে ওঠে। এই জবাবের আবার পাল্টা জবাব বস্তুবাদীরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ সব সওয়াল জবাব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না।

বেদান্তও জগৎকে আমার ভাব, আমার সৃষ্টিরূপে দেখতে বলেন, কিন্তু জগৎকে যখন আমার ভাব বা সৃষ্টিরূপে বেদান্তী দেখেন, তখনও তাকে ভাববাদী বলা ঠিক হবে না। রাম এই কথা বলছেন শুনে তোমরা অবাক হচ্ছ হয়ত। কিন্তু এই কথাই আমি বারবার তোমাদের বলছি। ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা মনে করে, বেদান্ত বুঝি এক রকম ভাববাদ। এ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের যত লেখা রামের হাতে এসেছে, সবগুলিতেই বেদান্তকে ভাববাদ বলা হয়েছে—কিন্তু রাম স্পষ্টই বলছেন, এরা কেউ বেদান্ত বোঝেনি। বার্কলে বা প্লেটোর ভাববাদ বলতে যা বোঝ, বেদান্ত কিন্তু আসলে তা নয়। এ তার চেয়ে অনেক উঁচুদরের জিনিষ।

ভাববাদীর জগৎ দাঁড়াচ্ছে ক্ষুদ্র বিষয়ীর উপর, তার ক্ষুদ্র মনবুদ্ধির ওপর। কিন্তু বেদান্তী যখন বলছেন, আমার ভাব হতেই জগৎ সৃষ্ট, তখন সে আমি বলতে ক্ষুদ্র মনবুদ্ধিকে কিন্তু লক্ষ্য করছেন না। মনবুদ্ধি নিজেই তো চঞ্চল; তারা তো সৃষ্ট পদার্থ মাত্র। বার্কলে যখন বলেছিলেন যে স্বপ্ন বিষয়ীর সৃষ্টি মাত্র, তখন তাঁর বিষম ভুল হয়েছিল। তার ভুল এই যে, স্বপ্নের বিষয়ীকে তিনি জাগ্রতের বিষয়ীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। গত রাত্রে আমরা আলোচনায় বুঝেছিলাম যে স্বপ্নের বিষয়ী জাগ্রতের বিষয়ী হতে পৃথক। স্বপ্নের বিষয়ী অনেকটা স্বপ্নের বিষয়েরই মত। আবার জাগলে পর, জাগ্রতের বিষয়ীও অনেকটা জাগ্রতের বিষয়ের মত। অথচ বার্কলে এই দুটীকে ঘুলিয়ে ফেলেছেন। এ জগৎ স্বপ্ন জাগ্রতের বিষয়ীর সৃষ্টি নয়; কিন্তু এ আমার আত্মার সৃষ্টি—ব্রহ্মের বিবর্ত।

এতক্ষণ আমরা বেদান্তের প্রমাণবাদে এসে পড়লাম। (ক্রমশঃ)



বৰ্ত্তমান হিন্দুসমাজ

বিষম কাল উপস্থিত; হিন্দুসমাজৰ উপযুক্ত নেতাৰ অভাবত সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচাৰী হৈ পৰিছে। সমাজৰ সৰহভাগ মানুহেই উন্মাৰ্গগামী; অথচ সকলোৱেই শাস্ত্ৰজ্ঞ, ধৰ্ম্ম-বক্তা ও উপদেষ্টা। সিইঁতে আপোন আপোন শিক্ষা দীক্ষা অনুসৰি যাৰ যেনে সংস্কাৰ বা ধাৰণা জন্মিছে, সি সেই ভাবেই শাস্ত্ৰ ব্যাখ্যা কৰি শিক্ষা দিছে। ইয়াত নিজে যে প্ৰতাৰিত হৈছেই নে—আকৌ লগতে দশ জনকো বিপথ-গামী কৰিছে। কোনোৱে অবিদ্যাভিমানত উন্মত্ত হৈ, আত্মদৰ্শী ও সত্যদৰ্শী ঋষি সকলৰ ভুল দেখুৱাই নিজৰ বাহাদুৰী জাহিৰ কৰিছে। কোনোৱে বা আকৌ এক শাস্ত্ৰৰে এডোখৰ বাদ দি, এডোখৰ অতিৰঞ্জিত বুলি, এডোখৰ মিছা ভ্ৰম বুলি বাদ দি, নিজৰ মতলবসিদ্ধিৰ উপযোগী অংশ বাচি লৈ ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰক হৈ পৰিছে। কোনো কোনোৱে তন্ত্ৰ পুৰাণ-বিলাক লৰাক ভুৰা দিয়া উপকথা হেন ভাবি বৈদান্তিক ব্ৰহ্মবিৎ হৈ পৰিছে। কোনোৱে আকৌ কোনো শাস্ত্ৰক আধুনিক, কোনোক স্বাৰ্থপৰ ব্ৰাহ্মণৰ ৰচিত বুলি দাবিত টাও দি, অবজ্ঞা কৰি বিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে। কোনোৱে আকৌ দয়া পৰবশ হৈ ব্যাকৰণৰ তাপত পুৰাণআদিক গলাই তাৰ পৰা খাদ উলিয়াই খাটি অংশ বাহিৰ কৰিছে;—সেই তাপত ঐতিহাসিক সত্য পৰ্য্যন্ত উৰি গৈছে। কোনোৱে আকৌ নিয়ম সংযম, বিধিনিষেধ আদিক কুসংস্কাৰ বুলি স্বেচ্ছাচাৰৰ প্ৰশ্ৰয় দিছে। কিন্তু সকলোৱেই ধৰ্ম্মহীন, বিপথত ঘুৰি মৰিছে। ধৰ্ম্মৰ লক্ষ্য হেৰুৱাই কথো জপো, অথচ মুখত বড় বড় কথা; দৰ্শন উপনিষৎ যোগ জ্ঞান আদিৰ বাহিৰে অন্য সৰু কথাৰ ধাৰকে নেধাৰে। সিইঁতৰ ভিতৰত কোনো বেদান্তৰ মায়াবাদী, কোনো বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ শূন্য-বাদী, কোনো গীতোক্ত কৰ্ম্মযোগী, কোনো উপনিষদৰ ব্ৰহ্মবাদী আৰু কাৰো মুখত যোগ সমাধি।

এই তো গল শিক্ষিত নেতা, উপদেষ্টা ও চেলাৰ কথা। আৰু যি ধৰ্ম্মৰ নিম্নস্তৰত আছে, সিইঁতে কেবল মালা-ঝোলা, তিলকমাটি, চেনি-কল, বাহ্য শৌচাচাৰ লৈয়ে ব্যস্ত; তিনি সন্ধ্যাত সন্ধ্যাপূজাৰ ধুম, অথচ মিছা মোকদ্দমা, মিছা সাক্ষী, পৰনিন্দা, পৰস্বাপহৰণ ও পৰদাৰগমনত নিবৃত্তি নাই। এই শ্ৰেণীৰ মানুহে ধৰ্ম্মৰ প্ৰাণ এৰি দি সংস্কাৰবশতঃ হাৰ মাংস লৈ, চাউল পেলাই তুঁহ লৈয়ে ব্যস্ত। এটা কথাৰে উদাহৰণ দিও।—হিন্দুসমাজত ব্ৰত ও পৰ্ব্ব উপলক্ষ্যে উপবাস কৰাৰ বিধি আছে। উপ—ওচৰত বাস অৰ্থাৎ ভগবানৰ ওচৰত বসতি কৰাই হ'ল উপবাস। সেই কাৰণে আগদিনাৰ পৰা সংযমাদি দ্বাৰা চিত্ত শুদ্ধ ৰাখি পৰ্ব্বদিনত দিনে ৰাতিয়ে সংযতভাবে ভগবানৰ আৰাধনা ও ধ্যানধাৰণাত নিযুক্ত থকাৰ ব্যবস্থা। কিন্তু এই শ্ৰেণীৰ লোকে মিছা কথা কৈ পৰনিন্দা ও কাজিয়া কৰি দিনে ৰাতিয়ে এটোপা পানী পৰ্য্যন্ত নেখাই অনা-হাৰত থাকিব পাৰিলেই উপবাসৰ সাৰ্থকতা হ'ল বুলি বিবেচনা কৰে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মানুহে জ্ঞানগৰিষ্ঠ ঋষিশ্ৰেষ্ঠ সকলৰ প্ৰতিষ্ঠিত ধৰ্ম্মৰ সুদৃঢ় বান্ধোন চিঙিবৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু

দ্বিতীয় শ্রেণীৰ মানুহে বান্ধোনৰ ওপৰত বান্ধোন দি অন্তঃসাৰশূন্য হৈ পৰিছে।

আৰু এক শ্রেণীৰ মানুহ সৃষ্টি হৈছে, সিহঁত আৱজ ধর্ম্মাবলম্বী। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সকলৰ ব্যাখ্যাত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ কৰি ইহঁত অজ্ঞ সমাজৰ বিজ্ঞ হৈ পৰিছেহি। সিহঁতৰ মুখত কেৱল কুসংস্কাৰ, পৌত্তলিকতাৰ ব্যাখ্যা, কেৱল ধর্ম্মসভা ও বক্তৃতাৰ ধুম। যি গীতাৰ এটা শ্লোক অনুবাদ কৰোঁতে সাতোতা ভুল কৰে, তাৰে সমালোচিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র পাঠ কৰি, এই শ্রেণীৰ লোকে পণ্ডিত হৈ গুৰুত পৰিণত হৈছে। আৰু সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ বুলি নিজে শাস্ত্রৰ ভুল সংশোধন ও শ্লোকৰ অঙ্গকর্ত্তন কৰি নিজ মতত পুথি লেখি হিন্দুসমাজৰ নিঃস্বার্থ উপকাৰ সাধিছে। এই শ্রেণীৰ লোকৰ দ্বাৰা হিন্দুধর্ম্মৰূপ কল্পতৰুৰ ফল-ফুল, ডাল-পাত কৰ্ত্তিত হৈ স্থাণুবৎ শোভা ধাৰণ কৰিছে।

ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এক শ্রেণীৰ লোক আছে, সিহঁতে ভকত। সিহঁতে, কীর্ত্তনাদি শঙ্কৰ ৰচিত পুথিৰ পৰা নিজ মতৰ পক্ষপাতী কেই ফাকিমান শ্লোক ও ফকৰা আওৰাই ভকত সাজিছে। ইহঁতে বৈষ্ণৱ, শক্তিৰ বিদ্বেষী, তিলকমাতি মালাযোলা লৈয়ে ব্যস্ত। ইহঁতে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী। ইহঁতৰ দ্বাৰা সমাজত দলাদলি হবৰ উপক্রম হৈছে।

আৰু এক শ্রেণীৰ লোক আছে, সিহঁত অৱতাৰ। নিজে কিম্বা ভকতৰ দ্বাৰা সমাজত অৱতাৰৰূপে অৱতীর্ণ হৈছে। ভগবান গৌৰাঙ্গদেৱৰ পাচৰে পৰা অৱতাৰৰ আমদানী চলিছে। ইয়াৰ মাজত দুই চাৰি জন অৱতাৰে ফাতেক ও দ্বীপান্তৰবাসৰ লীলাভিনয় কৰাও দেখা যায়। তথাপি ধর্ম্ম-প্রাণ সৰল মানুহবোৰ দলে দলে গৈ অৱতাৰৰ দলপুষ্টি কৰিছে। এই শ্রেণীৰ লোকৰ দ্বাৰা হিন্দুসমাজ খণ্ড খণ্ড হৈ পৰিছে, আৰু প্রকৃত সাধুচৰিত্র অৱতাৰৰ অন্তৰালত পৰি লোক-দৃষ্টিৰ বহিভূ্র্ত হৈ পৰিছে। অৱতাৰৰ সংশয় জাল ছিন্ন কৰিব নোৱাৰি সাধু মহাত্মাৰ ত্যাগ বৈৰাগ্য বা জ্ঞান ভক্তিৰ আদর্শ সাধাৰণে গ্রহণ কৰিবলৈ অপাৰগ হৈছে।

এতিয়া সাধাৰণৰ উপায় কি?—সিহঁতে কৰিব কি, কোন পথ ধৰিব, আৰু কাৰ কথাত বিশ্বাস কৰিব? সেই কাৰণেই কৈছো, বিষম কাল উপস্থিত। আৰু বিষম কাল বুলিয়েই তো ভয় হয়। বিশ্বাস কৰো কাৰ কথাত? যেয়ে কৈছে "গৃহস্থ উঠা" আকৌ তেওঁৱেই কৈছে "সুঠিবি, ৰাতি আছে।" এতিয়া কি কৰা কর্ত্তব্য? এতিয়া কর্ত্তব্য এই যে আমাৰ ঈশ্বৰদত্ত যি মনুষ্যত্ব—তাৰেই আশ্রয় লোৱা। কিয়নো তেওঁ আমাক কর্ম্মক্ষেত্রত অৱতীর্ণ হবৰ কাৰণে, প্রত্যেককেই জ্ঞান দিছে, অলপ স্থিৰভাবে সেই জ্ঞানৰ আশ্রয় লৈ বিবেকৰ বশবর্ত্তী হৈ চলিব পাৰিলে কোনো গোলযোগ নহয়। আমাৰ দেহৰথৰ সাৰথি বিবেক শ্রীকৃষ্ণই সংশয়াকুলিত বিষাদমগ্ন শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনৰূপী মনক সদায় গীতামৃত পান কৰাইছে। অতএব বিবেকৰ শৰণাগত হৈ জ্ঞান লাভ কৰাই হল আমাৰ কর্ত্তব্য। কিন্তু যাৰ চিত্তশুদ্ধি হোৱা নাই, সিয়ো মায়াৰ সম্মোহন মন্ত্রত মুগ্ধ হৈ পৰিচালিত হৈছে, বিবেকৰ বশবর্ত্তী নহয়। সুতৰাং প্রথমে বিবেক জগাবৰ কাৰণে বিধিমতে চিত্তশুদ্ধি কৰা আৱশ্যক। আৰু চিত্তশুদ্ধিৰ ইচ্ছা থাকিলে ভগৱন্নির্দ্দিষ্ট নিয়মবোৰো সদাই পালনীয়। সেই কাৰণেই ঋষিসকলে মানুহ জীৱনৰ প্রথম সোপানত

ব্ৰহ্মচৰ্য্য আশ্ৰমৰ ব্যবস্থা কৰিছিল। ব্ৰহ্মচৰ্য্যাশ্ৰমত শাস্ত্ৰাদি পাঠত জ্ঞান লাভ আৰু আহাৰাদি ও শমদমাদিৰ অভ্যাসত চিত্তশুদ্ধি হয়; সেই কাৰণেই ধৰ্ম্মৰ ভেটিয়েই হ'ল ব্ৰহ্মচৰ্য্য। ব্ৰহ্মচৰ্য্যৰ অভাবতেই আমাৰ সমাজৰ এই দুৰৱস্থা। চিত্তশুদ্ধ নহলে কোনো ধৰ্ম্মতেই অগ্ৰসৰ হব নোৱাৰি। খৃষ্টান, মুছলমানৰ মতভেদ, শাক্ত বৈষ্ণবৰ মতভেদ, পৌৰাণিক দাৰ্শনিকৰ মতভেদ; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে কোনো সম্প্ৰদায়ৰে মতভেদ দেখা নেযায়। চৰিত্ৰ গঠনৰ লগে লগে চিত্তশুদ্ধিৰ আৱশ্যকতা খৃষ্টান, মুছলমান সকলো সম্প্ৰদায়ৰে অনুমোদিত। "চুৰ কৰা, মিছা ক," এনেকৈ কোনো সম্প্ৰদায়ৰেই অভিপ্ৰায় নহয়। সুতৰাং আমাৰ প্ৰথম জীৱনত সৰ্ব্বসম্মত চিত্তশুদ্ধিৰ সাধনা কৰিবলৈ কাৰো বাধা নাই। ইয়াত প্ৰতাৰিত হবৰ ভয় নাই কাৰো, আৰু ইয়াৰ অভ্যাস বিশেষৰূপে শিকিবৰও প্ৰয়োজন নাই। দেশ কাল পাত্ৰভেদে সাত্বিক আহাৰ ও সাত্বিক চিন্তাৰ অভ্যাস কৰিলেই সহজে চিত্ত শুদ্ধ হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা শৰীৰ নীৰোগ ও সুস্থ হয়, বিশ্বাস ও ভক্তি হৃদয়ত বৰ্দ্ধিত হয়।

চিত্তশুদ্ধ হলে যাৰ যি ভাব, যি মতত বিশ্বাস হয়, তাকে অবলম্বন কৰা কৰ্ত্তব্য। অন্য মত শ্ৰেষ্ঠ ও নিজৰ মত নিকৃষ্ট, মিছা ও কুসংস্কাৰপূৰ্ণ বুলি শুনিও বিচলিত নহবা। নিজ মত দৃঢ়ৰূপে ধাৰণ কৰি পৰিণতি ও পৰিপুষ্টিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা। কিয়নো কোনো মতেই কোনো সম্প্ৰদায়েই নিৰৰ্থক নহয়। অজ্ঞ লোকে সাম্প্ৰদায়িক মত বিলাকৰ সমালোচনা কৰি দুৰ্ব্বলাধিকাৰীৰ মন ভাঙ্গি দিয়ে, কিন্তু কোনো মতেই মিছা নহয়। সকলো মতেৰেই আশ্ৰিত লোক পূৰ্ণ সত্যত নিকথা সত্যৰ একদেশত গণিত' হব। যেতিয়া মানুহ মাত্ৰেই আকৃতি-প্ৰকৃতিত ভিন ভিন, তেতিয়া সিহঁতৰ মতবো বৈষম্য থকা অৱশ্যম্ভাৱী। কাজেই মতবোৰক পথ মাত্ৰ জানি কোনো মতৰ নিন্দা ন কৰি, সকলো মতৰ কাৰণ, কালী, কৃষ্ণ, খৃষ্টৰ শিচুৰীন পকাই সতী তিৰোতাৰ দৰে স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ হৈ থাকা। জন্মান্তৰৰ সংস্কাৰ, শিক্ষা ও কচিভেদে অধিকাৰানুৰূপ যি কোনো এটা মত অবলম্বন কৰা। লাহে লাহে বিশ্বাস দৃঢ় হৈ, ভাব পুষ্ট হলে, লক্ষ্য স্থিৰ হলে তদনুৰূপ সাধন প্ৰণালী অবলম্বন কৰিবা। সাধনাত লক্ষ্যবস্তু উপলব্ধি হলেই তৎপ্ৰাপ্ত ভক্তিৰ উদয় হব, তেওঁক পাবৰ কাৰণ প্ৰাণ ব্যাকুল হব। তেতিয়া সংসাৰৰ যাবতীয় বস্তুত বিৰাগ জন্মি অভীষ্ট বস্তুত চিত্তৰ অবিচ্ছিন্ন একমুখী গতি হব। কাজেই চিত্তবৃত্তি নিৰোধ হৈ তত্বজ্ঞান প্ৰকাশ হব। তেতিয়া আত্মস্বৰূপ লাভত কৃতাৰ্থ হৈ মুক্ত পদত থাকিব পাৰিবা।

কিন্তু মুক্তি লাভ কৰিবলৈ হলে এজন মুক্ত লোকৰ সাহায্য বিশেষ আৱশ্যক। হিন্দুশাস্ত্ৰ মতে তেওঁেই গুৰুনামে অভিহিত হয়। গুৰুৰ কৃপা বিনে মুক্তিপথত অগ্ৰসৰ হ'বৰ উপায় নাই। গুৰুৱে শিষ্যত আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চাৰ ন কৰিলে, অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ হব নোৱাৰে। কাজেই গুৰুৰ আৱশ্যকতা বিশেষৰূপে উপলব্ধি কৰিবা। যি আত্মস্বৰূপ লাভ কৰিছে তেঁৱেই গুৰু। নতুবা অন্যৰ ওচৰলৈ গলে গুৰুৰ অভাব পূৰণ ন হয়। এনেকুৱা গুৰু নেপালে সৰলভাৱে ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা। অকপটভাৱে সৰল প্ৰাৰ্থনা আমাৰ পক্ষে পৰম কাৰ্য্যকাৰী। যেতিয়া যি দুৰ্ব্বলতা অনুভৱ কৰা—তাৰ কাৰণ ভগবানক প্ৰাৰ্থনা কৰিবা,

হাতে হাতে ফল পাবা। কাজেই গুৰুৰ প্ৰয়োজন বুজি ব্যাকুল হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা—ভগৱানে পঠাই দিব। উপযুক্ত সময় হলে গুৰু আপোনা আপুনি লাভ হয়। গুৰু পালে আৰু ভয় কি? সৰ্ব্বস্ব তেওঁৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি, তেওঁৰ আদেশ পালন কৰি যোৱা, সৰ্ব্বাৰ্থ সিদ্ধ হব।

তেন্তে চেৰ্ প্ৰকৃত ধৰ্ম্মপিপাসু লোকৰ এই জগতত একেবাৰে অভাৱ নহয়। দূৰৰ পৰা হাটখোলাৰ হাট-কোঢ়াল শুনা যায়, কিন্তু হাটৰ মাজলৈ গোমোৱা, দেখিবা, কোনো গোলমাল নাই। ঠিক সেই দৰেই ধৰ্ম্মজগতৰ বাহিৰতেই বাগবিতণ্ডা, বিদ্বেষ কোলাহল, কিন্তু প্ৰকৃত ধাৰ্ম্মিকৰ ওচৰত কোনো বিসম্বাদ নাই। মুক্তাবস্থা আমাৰ স্বভাৱ, সুতৰাং তাক লাভ কৰা—সকলো কামতকৈ সহজ। ধৰ্ম্মলাভ কৰিবলৈ বিদ্যাবুদ্ধি, মূলধন, কিম্বা বলবীৰ্য্যৰ প্ৰয়োজন নাই, কেৱল প্ৰাণভৰা বিশ্বাস আৰু ভক্তি লাগে। মানুহৰ মনত স্বভাৱিক দুটা প্ৰশ্নৰ উদয় হয়,—ভগৱান আছে কিম্বা নাই। যদি নাই, তেন্তে তো কথাই নাই—চাৰ্ব্বাকৰ মতৰ অনুসৰণ কৰা; নতুবা "তুমি কোন" তাৰ অনুসন্ধান কৰা। আৰু যদি তেওঁ আছে, তেন্তে নিশ্চয় কোনোৱে দেখিছে, যি দেখিছে তেওঁৰ ওচৰত গৈ চাই লোৱা, নতুবা তেওঁ কিৰূপে দেখিছে তাৰ উপায় জানি লোৱা; তেনে হলেই কৃতাৰ্থ হবা। আৰু যাৰ ভগৱানত বিশ্বাস নাই, কালী, কৃষ্ণ আদি সংস্কাৰাবলীক পাহৰি সবলভাৱে সমাহিত চিত্তে বিচাৰ কৰক তাৰ অভাৱ কি? তাক লাগে কি? আমি সুখৰ কাঙ্গাল, চিৰদিনৰ কাৰণ নিৰৱচ্ছিন্ন পূৰ্ণসুখৰ ভিক্ষাৰী আমি। কিন্তু সুখ ক'ত? ধনত জনত, বিদ্যাত-বুদ্ধিত, খ্যাতি প্ৰতিপত্তিত, কিম্বা মান যশাদি অনিত্য পাৰ্থিব পদাৰ্থত কোনোৱে কেতিয়াবা সুখী হব পাৰিছে নে? নাই পৰা। কাজেই তাত তোমাৰো সুখী হোৱাৰ সম্ভাবনা নাই। তুমি যে নিজেই আনন্দময়; তুমি তোমাৰ স্বৰূপ জানিব পাৰিলেহে সুখী হবা। যি ভগৱানকে নেমানে, অথচ সুখ বিচাৰে, আৰু যি সুখ নিবিচাৰে, ভগৱান লাভত ব্যাকুল, এই উভয়েই প্ৰকাৰান্তৰে একে বস্তুৰেই ভিক্ষাৰী। কিয়নো, সুখ যে সুখস্বৰূপ ভগৱানৰ বাহিৰে কতো নাই, আৰু ভগৱান লাভতেহে যে পূৰ্ণ সুখ হয়, কাজেই উভয়েই এক পথৰ পথিক। কিন্তু অনভিজ্ঞ স্থূলদৰ্শী লোকে সিহঁতক নাস্তিক ও ভক্ত নাম দি আদি জগতত দলাদলি ও হিংসাদ্বেষৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰকৃত অভক্তই যদি শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিন্দা কৰে, তবু তাক নাস্তিক নুবুলিবা, কিয়নো সি শ্ৰীকৃষ্ণক ভগবান বুলি নেজানে বা বুজিব নোৱাৰে। সেই দৰে ধাৰ্ম্মিককো বৈষ্ণৱ কৃষ্ণভক্ত বুলি স্বীকাৰ কৰা কৰ্ত্তব্য। আমি সকলোৱেই সোতৰ পানী—অনন্তধামৰ যাত্ৰী, যদিও আপোন আপোন থকা ঠাইৰ পৰা যাত্ৰা কৰাত নানা পথৰ সৃষ্টি হৈছে, তথাপি সকলোৰে গতি একে কেন্দ্ৰলৈ ভগবচ্চৰণলৈ। তেন্তে আৰু হিংসা বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব কোলাহল কৰা কিয়? যদি সুখ লাগে সৰ্ব্বতোভাৱে ভগৱানৰ শৰণাগত হোৱা, তেওঁৰ কৃপাত অনন্ত সুখ শান্তিৰ অধিকাৰী হৈ নিত্যধাম প্ৰাপ্ত হবা।

অতএব ধৰ্ম্মলাভ কৰিবলৈ কাৰো কতো বাধা হব নোৱাৰে। যি কোনো মতৰ আশ্ৰয়ত পৰিচালিত হব পাৰিলেই কৃতাৰ্থ হব পৰা যায়। এটা আলপিনৰ দ্বাৰাই আত্মহত্যা

কৰা যায়, কিন্তু অন্তক মাৰিবলৈ হলে ঢাল তৰোৱাল ও যুদ্ধ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন, সেই দৰে নিজে ধৰ্ম্মলাভ কৰিবলৈ হলে কোনো কষ্ট নাই। পিছে যি অন্যক শিক্ষা দিয়ে, তেওঁ নানা শাস্ত্ৰ, নানা মত, নানা পথ, ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্ৰণালী জানিব লাগে। কিন্তু সত্যলাভ নকৰি যব হবৰ স্পৰ্দ্ধা কৰা ও শাস্ত্ৰলোচনা কৰিবলৈ যোৱা বিড়ম্বনা মাত্ৰ। এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ দ্বাৰাই সমাজ অধঃপাতে গৈছে। অনধিকাৰী হৈ যি শাস্ত্ৰব্যাখ্যা ও ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰ কৰে, সিহঁতে দেশৰ, দহৰ ও সমাজৰ ঘোৰ শত্ৰু। সত্যলাভ নকৰি শাস্ত্ৰপাঠ কৰিবলৈ গলে, শাস্ত্ৰৰ নিগূঢ়াৰ্থ বুজি তাৰ মৰ্ম্ম ৰহস্য ভেদ কৰিব নোৱাৰে। হিন্দুশাস্ত্ৰ অনন্ত; সৰ্ব্বাধিকাৰী লোকক ঠাই দিবৰ কাৰণে প্ৰবৃত্ত পথৰ শত শত শাখা প্ৰশাখাত বিভক্ত হৈ, নিবৃত্তিপথত স্তৰে স্তৰে অনন্ত দেশলৈ উঠি গৈছে। সুকুমাৰ লৰাৰ কোমল হৃদয়ত ধৰ্ম্মবীজ দিবৰ কাৰণ বৰ্ণাশ্ৰমোচিত ব্ৰত নিয়মৰ পৰা ব্ৰহ্মগতপ্ৰাণ নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মোপাসকৰ সন্ন্যাস পৰ্য্যন্ত হিন্দুধৰ্ম্মৰ দেহ। গুৰুকৃপাত প্ৰকৃত জ্ঞান নহলে শাস্ত্ৰপাঠ কৰি একোকে বুজা নেযায়। প্ৰকৃত পক্ষে সকলো শাস্ত্ৰ ও সকলো প্ৰকাৰ সাধনাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য ও ফল এক; পিছে উদ্দেশ্যপথত যোৱা পদ্ধতি বা প্ৰণালী বিভিন্ন হব পাৰে। শাস্ত্ৰবোৰ সত্যদৰ্শী ঋষিসকলৰ দ্বাৰা ৰচিত। সত্য এক, কাজেই শাস্ত্ৰবোৰ পৰস্পৰ কি বিভিন্ন ও বিসম্বাদী হব পাৰে? কিন্তু অনধিকাৰীয়ে স্থূলবুদ্ধিত শাস্ত্ৰলোচনা কৰি পৰস্পৰ বিভিন্ন দেখে। সেই কাৰণেই আজি একে শাস্ত্ৰকে পাঁচজনে পৰি পাচৰকমে নিজ নিজ সংস্কাৰ ও শিক্ষানুৰূপ ব্যাখ্যা কৰি হিংসাবিদ্বেষৰ তাপত সমাজ পুৰি চাই কৰিলে। এক অধিকাৰীৰ উপদেশ অন্য অধিকাৰীক, গৃহস্থৰ উপদেশ সন্ন্যাসীক, আকৌ সন্ন্যাসীৰ উপদেশ ব্ৰহ্মচাৰীক কৈ হিন্দুসমাজক উন্মাৰ্গগামী কৰি তুলিছে। সাধাৰণে এইবিলাক শাস্ত্ৰব্যাখ্যাতা, উপদেশদাতা, ও প্ৰচাৰকৰ্ত্তা সকলৰ বিভিন্ন মতবাদৰ পাকঘূৰনীত পৰি হাবুডুবু খাই মৰিছে। অতএব সত্যলাভ নকৰাকৈ, কেতিয়াও শাস্ত্ৰৰ গোলোকধাঁধাত প্ৰবেশ কৰা কৰ্ত্তব্য নহয়; সেয়ে হলে আৰু এই জীৱনত পাৰ হবৰ উপায় নেথাকিব। মানুহবোৰে ব্যৱহাৰিক বুদ্ধিত শাস্ত্ৰপাঠ কৰি অজ্ঞসমাজত বিজ্ঞ হৈ কেৱল বিৰাট তৰ্কজাল বিস্তাৰ কৰি হৈচৈ কৰি ফুৰে। এই সমাজদ্ৰোহীলোকে নিজেতো জ্ঞানলাভ কৰিব নোৱাৰেই, তদুপৰি আৰু পাঁচজনকো বিপথলৈ পৰিচালিত কৰি সমাজত দলাদলিৰ সৃষ্টি কৰে। কাজেই সাধক সকলে ভক্ত ও ভগৱানৰ লীলাগ্ৰন্থ ও নিজ নিজ সাধনপথৰ সাৰভূত কাৰ্য্যসাধনোপযোগী শাস্ত্ৰাংশ মাত্ৰ পাঠ কৰিব। তাৰ পাচত সত্যলাভ কৰি সাধাৰণক শিক্ষা দিবৰ কাৰণ সকলো হিন্দুশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবা। তেতিয়া দেখিবা, হিন্দুশাস্ত্ৰত কেনেকুৱা সুশৃঙ্খলেৰে কত অগণিততত্ত্ব স্তৰে স্তৰে সজ্জিত। কোনো শাস্ত্ৰই মিছা বা নিৰৰ্থক নহয়; কোনো নহয় কোনো এক অধিকাৰীৰ প্ৰয়োজন সিদ্ধি হবই। ৰাজনীতি, সমাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি, আদি এনে কোনো নতুন কথা কোনোবাই কি কব পাৰিব যি বিশাল হিন্দু শাস্ত্ৰৰ কোনো এখন পুথিত উল্লেখ হোৱা নাই। আজি উপযুক্ত গুৰুৰ অভাৱত উপযুক্ত শিক্ষালাভত বঞ্চিত হৈছো বুলিয়েই অসীম

জ্ঞানসম্পন্ন আৰ্য্যবংশত জন্মিও অকৰ্ম্মণ্য ও নগণ্য হৈ, সদাই ৰোগে শোকে আৰু সহস্ৰিত কৰ্ম্মনাশৰ অতলজলত পৰি হা হুতাশ কৰি মৰিছো।

অতএব সত্যপাৰ্থ কৰি যি কৃতাৰ্থ হৈছে, তেঁৱেই হিন্দুশাস্ত্ৰৰূপ কল্পভাণ্ডাৰৰ দুৱৰী হৈ সৰ্ব্বসাধাৰণৰ উচৰত অধিকাৰানুৰূপ তত্ত্বকথা প্ৰচাৰ কৰি সমাজৰ সুখ শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। ত্ৰিতাপদগ্ধ জীৱৰ শুকানকণ্ঠত ধৰ্ম্মৰ অমৃতধাৰা ঢালি সঞ্জীৱিত কৰি তুলিব।



প্রেম ও মহিমজ্ঞান

—ঃ{*}ঃ—

তদর্পিতাখিলাচারতা—তাঁহাতেই সমস্ত আচার বিচার অর্পণ কর, ইহাই হইল নারদীয়া ভক্তির আদর্শ। কথা হইয়াছিল, একজন কি আর একজনকে তাহার সব সঁপিয়া দিতে পারে? মহর্ষি বলিয়াছেন, ওঁ অস্তি এবম্ এবম্, যথা ব্রজ গোপিকানাং—হাঁ তা পারে, যেমন ব্রজগোপীরা।

তাহা হইলে মহর্ষিরও মতে গোপীপ্রেমই আদর্শ। কিন্তু এই প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু দ্বিধার কথা আছে। সচরাচর আমরা জানি, গোপীর প্রেমে মহিমজ্ঞান ছিল না। ইহাই গোপীপ্রেমের বিশেষত্ব। যেখানে মাহাত্ম্যজ্ঞান রহিয়াছে, সেখানে প্রেম সঙ্কুচিত। ঠিক ঠিক সমানে সমান না হইলে প্রেম হয় না—সমজাতীয়ে আকর্ষণই প্রীতির নিদান। মাহাত্ম্যজ্ঞান সত্ত্বে শ্রদ্ধা সম্ভব, কিন্তু প্রেম কি করিয়া সম্ভব? বিশেষতঃ গোপীর প্রেম প্রেমের আদর্শ সেখানে মাহাত্ম্যবোধ কোথায়? যশোদা গোপালকে ভগবান বলিয়া মানিতেন না আপনার নাড়ীছেঁড়া ধন বলিয়া জানিতেন? কানু শ্রীদামসুদামের সখা, তাহাদের মতই একজন, না ভগবান্? শ্রীরাধার প্রাণ উজাড়িয়া ভালবাসার পাত্রটীর কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। মহাজনেরা একবাক্যে বলিবেন, এই সমস্ত সম্বন্ধের মাঝে সহজভাবেই স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—মানুষ মানুষকে যেমন করিয়া ভালবাসে, ইহাদের ভালবাসাও তেমনি; তাই তাহা শ্রীকৃষ্ণে রস ও অপরে রতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। নতুবা ভগবদ্‌বোধ থাকিলে উহা রসাভাস বলিয়া পরিগণিত হইত, ইহা আলঙ্কারিকেরাও বলিতেন। মাধুর্য্যই প্রেমের প্রাণ। মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য পরস্পর বিরোধী; সামরস্য ভিন্ন মাধুর্য্য উদয় হইবে কোথা হইতে?

অথচ এই গোপীপ্রেমের কথাতেই মহর্ষি নারদ বলিতেছেন—**ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ ; তদ্বিহীনং জারাণামিব ; নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্**—গোপীও যে মাহাত্ম্যজ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছিল,

এমন অপবাদ দিতে পার না; মাহাত্ম্যজ্ঞান না থাকিলে সে প্রীতি জারের প্রতি প্রীতির তুল্য; তাহাতে প্রিয়জনের সুখে সুখী হওয়া চলে না।” পূর্ব্বে যে প্রীতির আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে—মহর্ষির এই উক্তির সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যাইতেছে। ইহার অবশ্য সামঞ্জস্য প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধেই আমরা দুই চারিটী কথা বলিব।

মহর্ষি নারদের পক্ষে ভাগবতের কোনও কোনও শ্লোক অনুকূল। রাসলীলাধ্যায়ে গোপী বলিতেছেন—“নৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসম্; ভবান্ তনুভৃতং কিল বন্ধুরাত্মা (তুমিই শরীরিগণের বন্ধু ও আত্মা); ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্...তুমি যে কেবল গোপীর ছেলে তা নয়, তুমি সমস্ত দেহীর অন্তরাত্মার সাক্ষী।” গোপীর এই সমস্ত উক্তিগুলিতে ভগবদ্বোধ সুস্পষ্ট। ইহার উত্তর কি? ভাগবত ভগবানেরই লীলানুবর্ণন, প্রারম্ভে এইরূপ প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। পরীক্ষিত যখন শ্রীকৃষ্ণে পরদারাভিমর্ষণের আরোপ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভগবত্তার কথা স্মরণ করাইয়াই শুকদেব সে আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন। “কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং”—এ ভাগবতেরই কথা এবং কৃষ্ণভক্ত ঋষিসমাজে এ কথা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। গীতাতেও দেখি, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সখ্যের মাঝে ভগবদ্বোধের অভাব উঁকি দিতেছে—বিশ্বরূপদর্শনের পর সে কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মা যশোদারও একবার বিশ্বরূপদর্শন হইয়াছিল।

মোট কথা, এই সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ সহজ মানুষ, এই কথাটী যদি শ্রীকৃষ্ণরসিকের চরম অনুভূতি হয়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্—এই অনুভূতিকেও প্রেমের সাধনরাজ্য হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে পারি না। এই উভয় অনুভূতির মাঝে একটা সামঞ্জস্য না হইলে নারদীয় ভক্তির আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের একটা খটকা থাকিয়া যায়। তাহার মীমাংসা কি?

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য ও পূর্ণ। নিত্য বলিতে এই বুঝি, ইহাকে কোনও নির্দ্দিষ্টকালের মাঝে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না; পূর্ব্বে যে রস বৃন্দাবনে উথলিয়া উঠিয়াছিল, আজও সে রসিকের চিত্তে তাহার তরঙ্গ উঠিতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। পূর্ণ বলিতে এই বুঝি উহা সর্ব্বপ্রকার অধিকারীরই উপযুক্ত; যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ যে যেমনভাবে চাহিয়াছে সে তেমনভাবেই তাঁহাকে পাইয়াছে। এইখানে বুঝিতে হইবে, লীলা আস্বাদনের এক কোটীতে নিত্যতত্ত্ব রসঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান, আর এক কোটীতে প্রমাণাশ্রয় সাধক বর্ত্তমান। সাধনার পরিণাম আছে, প্রমাণের প্রামাণ্যের তারতম্য আছে। বিশেষতঃ যাহারা সাধক, তাহারা এই জগতেরই রঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া, সুতরাং ইহার স্পন্দন ও পরিণামের সহিত তাহাদেরও স্পন্দন ও পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। আস্বাদন ব্যাপারটীকে যদি আমরা এইভাবে দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, একই তত্ত্ব প্রমাণভেদে সাধনার ক্রমিক উৎকর্ষবশতঃ যুগ যুগ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ইহাতে মূল সত্যের কোনও হানি হয় না, বরং সেই সত্যস্বরূপেরই অপরূপ লীলাবৈচিত্র্য

রসান্বেষিক সাধকের হৃদয়কে অভূতপূর্ব্ব উল্লাসে মাতাইয়া তোলে।

আমাদের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতী সত্তা হইতে মানুষী সত্তায় অবতীর্ণ হইয়া বৃন্দাবনে এককালে যে লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, যুগ হইতে যুগান্তরের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে সেই নিত্যলীলাই বিশ্ববৃন্দাবনে নিত্যকাল ধরিয়া পুনরভিনীত হইবে—সমস্ত বিশ্বই একদিন না একদিন বৃন্দাবনের রসমাধুরী আস্বাদন করিবে। এই আস্বাদনের পরিণতি থাকিবে। ভারতবর্ষের সাধনজগতের ইতিহাসে এই পরিণতি অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণ মানুষের মাধুর্য্যটুকু আবিষ্কার করিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। তাঁহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও তাঁহার পরে অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনগণও ভাগবতধর্ম্মের এই নিগূঢ়তম অন্তরঙ্গ অনুভূতির কথা বিচিত্র ছন্দে গাহিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির প্রতি শ্রীভগবানের ইহা অসীম করুণা। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা" এই অনুভূতিতে মাহাত্ম্যজ্ঞানের আভাসটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া রসিকেরা শ্রীকৃষ্ণকে সহজ মানুষরূপে পাইয়াছেন। বাঙ্গালীর বৈষ্ণবদর্শনের শ্রীকৃষ্ণ গুরুবাদে, অধুনা অবজ্ঞাত কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ে, নরের মাঝে নারায়ণের পূর্ণপ্রকাশের আশ্চর্য্য রহস্য স্ফুটিত রহিয়াছে শিক্ষাভিমানী তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

যদি নিত্যতত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাতীয় সাধনার ক্রমিক অভিব্যক্তির দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাকে আলোচনা করি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারি, ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ হইতে ক্রমে মানুষ হইয়াছেন। মূলে তিনি যাহা তাহাই আছেন, কিন্তু যুগান্তরব্যাপী সাধনার ফলে আমরা ক্রমে তাঁহাকে মানুষরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ভগবানের ক্রমে মানুষ হওয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। অন্যান্য অবতার মানুষ হইতে ক্রমে ভগবানরূপে পূজা পাইয়া থাকেন, অপ্রকট অবস্থা হইতে ক্রমে প্রকট অবস্থায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাম অবতারের কথা ধরা যাইতে পারে। যাঁহারা মূল রামায়ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না। এই কথা লইয়া অবতারের ভগবত্তা সম্বন্ধে শিক্ষাভিমানী সমাজ একটু কটাক্ষ করিয়া থাকেন, ইহা আমরা জানি। কিন্তু তথাপি অবতারেরা যে সাধারণতঃ নর হইতে নারায়ণের পদবীতে উন্নীত হইয়া জনসমাজের হৃদয়ে আসন পাইয়া থাকেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণলীলায় আমরা ইহার বিপরীত দেখি। প্রাচীনযুগের শ্রীকৃষ্ণ বহিরঙ্গ আস্বাদনকারীদের নিকট ভগবান্; যুগান্তরব্যাপী সাধনার বিবর্ত্তনে আজ তিনি মানুষ। তাঁহার বৃন্দাবনলীলার দিকেও চাহিয়া দেখ, কিশোর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার; যে দূরে হইতে উহা দেখিবে, তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া যাইবে, সে ইহাকে অলৌকিক বলিয়াই মনে করিবে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কাছে অমানুষ। ব্রহ্মার কথা স্মরণ কর—সেখানেও ভগবত্তারই পরীক্ষা। বৃন্দাবনলীলার মাঝে বহিরঙ্গদৃষ্টিতে অলৌকিকত্ব সুপরিস্ফুট। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই ধীরে ধীরে অলৌকিকত্ব সংবরণ করিয়া শেষকালে পুরাপুরি মানুষ হইয়াছেন। দ্বারকায় ছেলে-

পুলে নাতি-নাতনী নিয়া তাঁহার বিপুল সংসার। কে তখন বলিবে, এই মানুষটী কৈশোরে কুলললনার প্রাণ মজাইয়া রাসোৎসবে প্রাকৃত মদনলীলার বিপর্যায় ঘটাইয়াছিল? গোপীরা কচি খুকী, শ্রীকৃষ্ণ কচি খোকা, রাসলীলা একটা ছেলেমানুষী—এমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চুণকাম করিবার কোনও প্রয়োজনই আমরা দেখি না। কিশোর শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের প্রাণ মজাইয়াছিল, কিশোরীর মনোহরণ করিয়াছিল, যুবতী গোপাঙ্গনার কুল মজাইয়াছিল, সমস্ত বৃন্দাবন প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়াছিল—ভাগবতের এই সহজ বর্ণনাকে যদি বিশ্বাস না করিতে পার, তাহা হইলে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" কথাটায় সায় দাও কি শুধু পরের মুখে ঝাল খাইয়া? কিশোর শ্রীকৃষ্ণ বহিরঙ্গদৃষ্টিতে ভগবান্, আবার প্রৌঢ়াবস্থায় তিনিই সম্বৃত মানুষ, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ লীলার বিশেষত্ব। যাঁহারা সাধন রাজ্যের নিগূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভগবানের এইরূপ মনুষ্যের মাঝে মিশাইয়া যাওয়া একটা মর্ম্মাত্মক সত্য ও সাধনার চরম সিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের এই ধারাটী বাঙ্গালী আহার অভিনব গুরুবাদে সিদ্ধ করিয়া একদিন গুরু-গোবিন্দে অভেদ সিদ্ধান্তে সাধন-রাজ্যের এক নূতন তোরণ-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। বৈষ্ণব দর্শন যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন ও বৈষ্ণবের নিগূঢ় সাধনার সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারাই এই রহস্য অবগত আছেন। এই রহস্য দ্বারা সাধন রাজ্যে বাঙ্গালী উপনিষদের ব্রহ্মীভাব তত্ত্বকে আশ্চর্য্য সফলতা দান করিয়া জ্ঞানের সাধনাকে প্রেমের সাধনায় সহিত মিলাইয়া ধর্ম্মকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। অধঃপতিত বাঙ্গালী আজ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের এই কৃতিত্বের কথা বুঝিবে কি?"

মহর্ষি নারদ যে গোপীর প্রেমে মাহাত্ম্য-জ্ঞানের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, তাহার মূল শ্রীকৃষ্ণসাধনার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে, ইহা বোধ হয় পাঠক এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহার মাঝেও আরও একটু কথা আছে। গুরুবাদের সঙ্গে না মিলাইয়া লইলে তাহা বুঝা যাইবে না। আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, যুগান্তর-ব্যাপী সাধনার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে যে স্তর-গুলি জাতিকে পার হইয়া আসিতে হয়, ব্যক্তির সাধনাতেও অবিকল সেই স্তরগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জাতি ও ব্যক্তির পরিণামধারা মূলতঃ এক, ইহা আধুনিক পরিণামবাদীও স্বীকার করিবেন। এই কথাটুকু স্মরণে রাখিয়া আমরা বৈষ্ণবের গুরুতত্ত্বের সহায়ে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তাহার সহিত গোপীর প্রেমে মাহাত্ম্যজ্ঞানের সম্ভাবনার আলোচনা করিব।

রাগানুগা মার্গের ভক্তগণ সাধনভক্তির আশ্রয়ে সাধনা করিতে করিতে জন্মান্তরের সুকৃতি বশতঃ ব্রজভাবে লুব্ধ হইয়া যখন বুঝিতে পারেন, গুণময়ী সাধন ভক্তি দ্বারা প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না, তখন তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রেমিক গুরুর কৃপা ভিক্ষা ও তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। গুরু ভক্তের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সাক্ষাৎ ভজন ক্রিয়া প্রদান করিলে ভক্ত শ্রীগুরুকেই ভগবান মনে করিয়া আপন আপন ভাবানুসারে তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া

থাকেন, ভাবানুসারে প্রভু, পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, পুত্র অথবা স্বামী জ্ঞানে শ্রীগুরুরই সেবায় একান্ত অনুরক্ত হন। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রকট লীলায় ব্রজবাসীদিগের মনঃপ্রাণ অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপনাতে অনুরক্ত করিয়াছিলেন, প্রেমিক শিরোমণি রাগবর্ত্মোপদেশ গুরু ঠিক সেই ভাবে ভাবলুব্ধ শিষ্যের চিত্তবৃত্তি অধিকার করিয়া লন। শ্রীগুরু একাধারে ভক্ত ও ভগবান—তাঁহার অন্তরে ভগবান্, বাহিরে ভক্তভাব। তাই ভাবাশ্রিত ভক্তগণ গুরুদেবকেই ভগবদ্বুদ্ধিতে চিন্তা করেন, এইরূপ গুরুচিন্তা হইতে ভক্তের মনোময় সিদ্ধ দেহের ক্রমশঃ পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। ইহাই বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাধনসম্পদ।

শ্রীগুরুতে এই প্রকার ভগবদ্বুদ্ধির সহিত বৈদান্তিকের কথিত "নরাকারপরব্রহ্মরূপ গুরুর লক্ষণটী পাঠক এখানে মিলাইয়া লউন, "আচার্য্যদেবো ভব" এই উপনিষদের আদেশ স্মরণ করুন, "আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তিঃ" এই মনুর শাসনবাণী স্মরণ করুন, তাহা হইলে এই রহস্যের সঙ্কেত বুঝিতে পারিবেন। একই বিগ্রহে একাধারে নরত্ব ও ব্রহ্মত্বের আরোপ করিতে গিয়া গুণময় চিত্ত প্রথম অবস্থায় ঘড়ির দোলকের মত উভয় কোটীতে সঞ্চরণ করিতে থাকে। প্রাকৃত মানুষ প্রাকৃতদৃষ্টিতে গুরুকে যদি তাহারই মত আর একটী মানুষ মনে করে, তাহা হইলে গুরুতে স্বরূপজ্ঞান হয় না। কাজেই গুরুর আদর্শ সর্ব্বদা বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য, আমি যখন মানুষ, তখন গুরু পরব্রহ্ম গুরুতে এই প্রকার বুদ্ধি রাখাই সঙ্গত। এই বুদ্ধিতে সাধনায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া নিজের গুণময় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া গুরুর সান্নিধ্যলাভ করিতে হইবে। এই প্রকার গুণময় প্রকৃতত্যাগের দশাতেই ইষ্টে মাহাত্ম্যজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, নতুবা প্রাকৃতগুণসংস্পর্শে ভাবের মলিনতা ঘট বিচিত্র নহে। গোপীর নিত্যসিদ্ধ প্রেমে এই প্রকার সাধকাভিমানের আরোপ করিয়াই মহর্ষি নারদ বলিতেছেন, সেখানে মাহাত্ম্যজ্ঞান ছিল, নতুবা গোপীর প্রেম জারপ্রীতি মাত্র হইত।

কিন্তু ইহার পরেও আরো কথা আছে। গুণময় স্বভাব পরিত্যাগ করিলে সহজ মানুষভাবের স্ফূর্ত্তিও সাধনার চরম সিদ্ধি। সেই অবস্থাতেই যথার্থ গোপীভাবের বিকাশ। সেখানে গুরু শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ নরাকার পরব্রহ্ম; তিনি সহজ মানুষ। ভক্তও তৎস্বরূপতা লাভ করিয়া সেখানে সহজ মানুষ হইয়াছেন। সাধনজগতে এই সহজ নরনারীর সহজ লীলাতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে—কবি তাহা দেখিয়া বিগলিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন—

গোলক উপর মানুষ বসত
তাহার উপর নাই।
মানুষ ভাবেতে বসতি করিলে
তবে সে মানুষ পাই।



গৌরীবাঈ

—•:❀()❀:•—

সংবৎ ১৮১৫ সালে গুজরাতের অন্তঃপাতী ভুঙ্গবপুর সহরে ব্রাহ্মণকুলে গৌরীবাঈর জন্ম হয়। গৌরীবাঈর পিতা বাসুদেব শাস্ত্রী আচারনিষ্ঠ, ক্রিয়াবান, ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সাত নয়, পাঁচ নয়, একটীমাত্র মেয়ে, তাই ছেলেবেলায় গৌরীর আদর যত্নের সীমা ছিল না। বেশী আদর পাইয়া অনেক সময় ছেলেমেয়ে ভয়ানক আবদেরে ও দুরন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু গৌরীর স্বভাব সেরূপ ছিল না। শিশুসুলভ সরলতার সহিত তাহার মুখে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব মাখান ছিল, যাহা দেখিয়া মনে হইত এ যেন একটী বালিকার দেহে কোনও বর্ষীয়সী গম্ভীরবেদিনী ব্রহ্মবাদিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় সময় সময় কন্যার মুখের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন আর ভাবিতেন, "এ কি মেয়ে, না যথার্থই গৌরী? মায়ের আমার শিবের মত বর, পাইব কোথায়?"

কিন্তু মেয়ের বিবাহ কষ্টসাধ্য হইলেও এ দেশে কখনও বরের অভাব হইয়াছে, এমন কথা ইতিহাসে লেখে না। যথাসময়ে গৌরীরও বর জুটিয়া গেল। পাঁচ বৎসর বয়সে কুলপ্রথানুযায়ী গৌরীর বিবাহ হইয়া গেল। আধুনিক চরিতকার এইখানে হয়ত বাল্যবিবাহের দোষকীর্ত্তনে মুখর হইয়া উঠিবেন। কিন্তু উপায় কি? দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বাল্যবিবাহের দোষগুণ লইয়া মানুষ এত মাথা ঘামাইত না—আবহমানকাল সমাজে যাহা চলিয়া আসিয়াছে, বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাই মানিয়া লইত। ইহাতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের তারতম্য যাহাই হউক না কেন, সমষ্টিগত সমাজজীবনে যে তাহার কোনও সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যাইত, তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক, দেশাচার অনুযায়ীই শাস্ত্রী মহাশয় পাঁচবৎসরের মেয়ের বিবাহ দিলেন বটে, কিন্তু মনোপ্রাণে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা কাঁটার মত তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

আট দিন যাইতে না যাইতেই আশঙ্কার ফল দেখা দিল, গৌরী বিধবা হইল। গৌরী ছেলেমানুষ, বিবাহের অর্থও যেমন সে বুঝে নাই, বিধবা হওয়ার দুঃখও তেমনি বুঝিল না। কিন্তু গৌরীর মাতা এই আকস্মিক বিপৎপাতে একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ও কাতর হইলেন বটে, কিন্তু কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার দুঃখ অপেক্ষা চিন্তা গভীরতর হইল।

একটা লক্ষ্যে জীবন না বাঁধিয়া দিলে তাহাকে পরিচালনা করা অসম্ভব হয়। পুরুষের জীবনে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা আছে, তাই তাহার লক্ষ্য সে নিজেও বাছিয়া লইতে পারে, আশ্রয়ের অভাব সে তত গুরুতররূপে অনুভব করে না। কিন্তু নারীর জীবন আমাদের দেশে শৃঙ্খলিত; গোড়া হইতেই স্বতঃপর্য্যাপ্ত একটা অবলম্বন না দিলে তাহা দুর্ব্বহ ও অকল্যাণকর হইয়া উঠে। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্রের বিধান; কিন্তু সে বিধানকে সফল করিবার চেষ্টা সমাজে কোথায়? শুধু এই দিক দিয়া শাস্ত্রের

মর্য্যাদা যথার্থ ভাবে রক্ষা করিয়া চলিলে নারীর জীবনে মুক্তির হিল্লোল বহিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সে কথা চিন্তা করে কে?

শাস্ত্রী মহাশয় সুপণ্ডিত অধ্যাপক। পাঁচ বৎসরের কন্যাকে তিনি যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত করিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে ঘরে বাহিরে একটু গুঞ্জন উঠিল বটে, বিজ্ঞেরা এমন মন্তব্যও প্রকাশ করিলেন, "এ যেন একটু বাড়াবাড়ি; মেয়ে ঘরের কাজ করবে না পণ্ডিত হবে?"—কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় আপন সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন। তিনি বলিতেন, "কি ছেলে, কি মেয়ে, শিক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। শিক্ষা বলিতে দেহ, মন ও আত্মার সম্যক্ স্ফূর্ত্তিই বুঝি। বিশেষতঃ যে শিক্ষা কর্ম্মে সফল না হইল, তাহার মূল্য কি? ছেলেরা কেবল পড়িবে, কাজ শিখিবে না—এও যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, তেমনি মেয়েরা কেবল কাজই শিখিবে, মনের উৎকর্ষ করিবে না—ইহাই বা কেমন কথা? ছেলের উপনয়ন যেমন একটা সংস্কার, মেয়ের বিবাহও তেমনি একটা সংস্কার। গুরুগৃহ বাস পর্য্যন্ত অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা ও শাস্ত্রাভ্যাস যেমন বালকের অবশ্য কর্ত্তব্য, বিবাহবন্ধনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেয়েদের পক্ষেও ঠিক তেমনই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ছেলেদের আমরা যেমন আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা দিই—কুমারীজীবনে, বৈধব্য জীবনে, এমন কি বিবাহিত জীবনেও মেয়েদের তেমনি আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনই তাহার একমাত্র উপায়। তাহার জন্যই মনু বলিতেছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।'

গৌরীর অকালবৈধব্য যেমন তাহার সংসার সুখের সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া দিল, তেমনি তাহার আত্মমুক্তির পথও প্রশস্ত করিয়া দিল। গৌরীর পিতা এই কথা স্মরণ রাখিয়াই কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইহাতে সংসারের আর দশজনের সহিত গৌরীর তেমন মেলামেশার সুযোগ হইত না। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাহার চরিত্রে যে গাম্ভীর্য্য ও একান্তবাসপ্রিয়তা দেখা যাইত, তাহাতে পিতার এই আপাতকঠোর ব্যবস্থা তাহার নিকট কিছুমাত্র পীড়াদায়ক মনে হইল না। অধ্যয়নের প্রতি গৌরীর অসাধারণ অনুরাগ ছিল, পিতাও যত্ন করিয়া মেয়েকে সংস্কৃত শিখাইলেন এবং টীকাভাষ্যাদি সহ গীতা, বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি পাঠ করাইতে লাগিলেন। সাধারণতঃ আমাদের দেশের মেয়েদের নিকট ছোটবেলা হইতে সংসার চিত্রকেই খুব উজ্জ্বল করিয়া আঁকা হয়, নারীজীবনের যে অন্য কোনও মহিমা থাকিতে পারে, তাহা মোটেই ধারণা করিতে দেওয়া হয় না। গৌরীর পিতা এই প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কন্যাকে প্রাচীন যুগের ব্রহ্মবাদিনীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ফলে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী গৌরী চরিত্রের মাধুর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, শালীনতায়, পাণ্ডিত্যে ও তপশ্চর্য্যায় সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। গৌরীর খ্যাতির কথা শুনিয়া নগরের মহিলারা শুধু তাহাকে দেখিবার জন্য ও তাহার মুখের দুটী কথা শুনিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে আনাগোনা করিতে লাগিলেন।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শাস্ত্রী মহাশয় কন্যাকে যোগাভ্যাসে নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অনুকূল হওয়াতে, গৌরী তাহাতে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিলেন। গৌরী মাঈর নানা সদ্গুণের কথা দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। এই তপস্বিনীর অত্যাশ্চর্য্য তপস্যার কাহিনী ক্রমে দেশের রাজা শিবসিংহও শুনিতে পাইলেন। কৌতূহলবশতঃ তিনি গৌরীকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, সরল ব্যবহার ও মধুর উপদেশ দেখিয়া-শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গৌরীর প্রতি তিনি এতদূর আকৃষ্ট হইলেন যে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটী মন্দির ও পুষ্করিণী করাইয়া তাহা গৌরীর নামে উৎসর্গ করিলেন। ১৮৮৩ সংবৎ গৌরী এই মন্দিরে ইষ্টমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। তাঁহার উপদেশে রাজা শিবসিংহ মন্দিরের পাশে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া সাধু-সন্ন্যাসী ও অতিথি-অভ্যাগতের যথারীতি সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বহুদূর হইতে কত লোক গৌরীমাঈকে দর্শন করিতে তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত; তাহারা এই ধর্ম্মশালাতেই আশ্রয় লইত এবং গৌরীর মায়ের মধুর আচরণে মুগ্ধ হইয়া ও তাঁহার উপদেশ লাভে কৃতার্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত। গৌরীমাঈর উপদেশ এত সরল ও সহজ বোধ্য ছিল যে তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে অশিক্ষিত কৃষকের হৃদয়কে পর্য্যন্ত সমভাবে স্পর্শ করিত। অথচ এদিকে তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল। শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত সাধনের সমন্বয় হওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

এমনি করিয়া আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। গৌরীমাঈ সাধনার পথে ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষের শক্তি চেষ্টার একটা সীমা আছে। বিশেষতঃ সাধনরাজ্যে—যেখানে বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বন্দ্ব লইয়া সুরুতেই কারবার—সেখানে একজন দিশারীর বড়ই প্রয়োজন হয়, নতুবা কোন্‌টা সংস্কার আর কোন্‌টা সত্য, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চয় হওয়া যায় না। আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই বলিয়া থাকেন, সত্যের পথে ভিতরের আলোতে পথ চিনিয়া চলিব, সেখানে আর বাহির হইতে লণ্ঠন ধরিবার লোক লাগিবে কেন? শিষ্য সন্ধানী মানুষ জানেন, ওটা বুদ্ধিরই জবরদস্তীর কথা; যেটাকে সে ভিতরের আলোক বলিতেছে, সেটা বাহিরের আলোকের মতই কি না, তাই অন্তররাজ্যের হিসাবে সেটা বাস্তবিক আলোক না আঁধার, তাহার নির্ণয় করে কে? তাই তো একজন দিশারীর প্রয়োজন, যে শুধু বাহিরে লণ্ঠন ধরে না, ভিতরে আগুন ধরাইয়া দেয়। বুদ্ধি দিয়া মানুষ কি কখনো এই চতুরকে চিনিতে পারিয়াছে? বৈদিক যজ্ঞের কথা স্মরণ কর। দেবতার আবাহন, আপ্যায়ন, স্তুতি করিতেছেন তিন জন ঋত্বিক্; মাত্র স্মরণ করিয়া শুদ্ধমাত্র অন্তঃপ্রেরণাবশতঃ তাঁহারা কাজ করিয়া যাইতেছেন, বাহিরের কাহারও উপদেশের অপেক্ষা রাখিতেছেন না। কিন্তু চতুর্থ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা সাক্ষিস্বরূপে সমস্তই দেখিতেছেন। যখন যে কাজটী হাতে আসিতেছে, অপর ঋত্বিক্‌রা তাহা ধরিয়া একবার ব্রহ্মার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "অনুব্রূহি"। ব্রহ্মা বলিতেছেন, "ওম্।"—আর এই অনুমোদনের নিশ্চয়তায় অন্তঃপ্রেরণা

সুদৃঢ় প্রাচীরের আকার ধারণ করিয়া সমাজকে নির্ব্বাধে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। অধ্যাত্ম-জগতে অন্ততঃ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ব্যক্তিগণও বৈদিকযুগের মত এমনি একটা দিশারীর প্রয়োজন হয়, নতুবা "বেলাশেষের শেষ খেয়ার" গানে পর্য্যন্ত একটা সংশয়ের সুর থাকিয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা উঠিল বলিয়াই এতটা বলিলাম। নতুবা গৌরীর মনে যে চিন্তার ধারা এমন আকার ধরিয়াছিল, তা বলিতে পারি না—কেননা সে ছিল বিশ্বাসের যুগ, আর এখন অবিশ্বাসের যুগ। সে যাহা হউক, নিজের চেষ্টায় এবং পিতার যত্নে তিনি যতটুকু করিয়াছেন, ইহার পরেও যে আরও কিছু রহিয়াছে, তাহা তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু সেখানকার সন্ধান তাঁহাকে কে বলিয়া দিবে? গুরু খুঁজিয়া বাহির করা নানা কারণে তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁহার প্রাণের আকুলতা দেখিয়া ভগবান্ যে গুরুরূপে তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইবেন, বিবিধ শাস্ত্রালোচনায় ও নিজের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতায় একথা তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশালায় অনেক সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হইত, অধিকাংশই তাঁহার দর্শনার্থী। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সমাদরে পরিচর্য্যা করিতেন, কে জানে, ইহাদের মাঝে কে তাঁহার আপন গুরু, তাঁহাকে কে জানে?

একদিন সাধুদের একটি প্রকাণ্ড বাহিনী ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মাঝে একজন অতিশয় তেজঃপুঞ্জকায় সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার দিকে তাকাইবা মাত্র গৌরীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি আর সে দিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী গৌরীকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন, এখন তাঁহার তন্ময় অবস্থা দেখিয়া অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন। গৌরী বিগলিত হৃদয়ে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী সাদরে তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "গৌরী, আমি আসিয়াছি। তুমি কে তাহা জান না—তোমাকে তাহাই জানাইয়া দিতে আসিয়াছি। মীরার জীবনে জ্ঞানের দিক দিয়া যে অসম্পূর্ণতাটুকু ছিল, তাহা পূর্ণ করিবার জন্যই আবার তোমাকে আসিতে হইয়াছে। আমিই তোমার সাধনাকে পূর্ণ করিয়া দিব। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

গৌরী মন্ত্রমুগ্ধবৎ সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। উভয়ের মাঝে কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা কেহই জানিল না। বহুক্ষণ পরে কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া সকলে দ্বার খুলিয়া দেখিল, গৌরীমাঈ সমাহিত অবস্থায় উপবিষ্ট, তাঁহার কোলে একটী অতিসুন্দর বালগোপাল বিগ্রহ; কিন্তু মন্দির মধ্যে সন্ন্যাসীর কোনও নিদর্শন নাই। সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শঙ্কায়, সন্তর্পণে তেমনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলে বাহির হইয়া আসিল।

সেই দিন হইতে গৌরীমাঈ প্রায় আপন আসনে সমাহিত থাকিতেন। ক্রমে তাঁহার সমাধি এতখানি আয়ত্ত হইল যে তিনি এক পক্ষ কাল পর্য্যন্ত একাসনে সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। সেবকেরা এই সময়ে তাঁহার কুটীরের দ্বারে তালা লাগাইয়া রাখিত, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইত না।

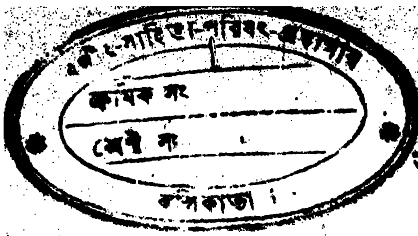
সংবৎ ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত গৌরীবাঈ এইরূপ প্রায়শঃ সমাহিত অবস্থায় তাঁহার স্বগ্রামেই কাটাইয়া দিলেন। গুরুপ্রদত্ত বালগোপালের সেবা তিনি স্বহস্তেই করিতেন। যখন অশক্ত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যা চতুরীবাই বিগ্রহের সেবা করিত। এই বালিকাটী ছোটবেলা হইতেই গৌরীর একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহাকে ধরিয়া রাখা যাইত না—মন্দিরের কাজ, ধর্ম্মশালার কাজ, গৌরীবাঈর সেবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠিত। গৌরীও তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া এই মেয়েটীকে আপনার মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

ক্রমে অধিক লোক সমাগমে গৌরীবাই বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চতুরীর হাতে সমস্ত ভার সঁপিয়া দিয়া ১৮৬০ সংবতে তিনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন। গৌরী জয়পুর সহরে উপস্থিত হইলে জয়পুরের মহারাজ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়া আপনার রাজ্যে তাঁহাকে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। গৌরী তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফিরাইয়া দিলেন। মহারাজ সেগুলি ব্রাহ্মণ-সজ্জনকে বিলাইয়া দিলেন।

জয়পুর হইতে মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া গৌরী কাশীতে উপস্থিত হইলেন। কাশীতে আসিয়া গৌরী নির্জ্জন-বাসের ইচ্ছায় গঙ্গার তীরে একখান ঘর বাঁধিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কাশীর রাজা সুন্দরসিংহ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া বিপুল সৎকার পূর্ব্বক পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা উঁহার দিলেন। গৌরী বিরক্ত হইয়া কাশী ছাড়িয়া শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে চলিয়া গেলেন। শ্রীক্ষেত্র হইতে রামেশ্বর ও তথা হইতে ভারতের অন্যান্য তীর্থ পরিক্রম করিয়া গৌরী আবার কাশীতে উপনীত হইলেন। কাশীতে কিছুদিন থাকিয়া আবার তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

গৌরীর অবর্ত্তমানে চতুরীবাঈ তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজ পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহাই হইল তাঁহার অগ্নিপরীক্ষা। একদিকে আত্মীয় স্বজনের নানা উৎপীড়ন, অপর দিকে সঙ্কল্পিত কর্ম্মে আত্মনিয়োগ —এই উভয়ের মাঝে পড়িয়া চতুরীকে বড় বিব্রত হইতে হইত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে গৌরীবাঈর আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৌরী চতুরীর শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ করিয়া মনোনিবেশ করিলেন। আধার উপযুক্ত ছিল, সুতরাং তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। গৌরী যখন বুঝিলেন চতুরী তাঁহার ভারবহন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছেন, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্দির, ধর্ম্মশালা, বালগোপালের সেবা ও লোকশিক্ষার ভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়া সংবৎ ১৮৬৫ সালে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করিলেন।

গৌরীবাঈর কবিপ্রতিভাও অসামান্য ছিল তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিপাদক, অথচ বর্ণন ভঙ্গীতে অতি সরল ও সুকুমার ছিল। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "আত্মা অখণ্ড আবে ন জাবে, জন্ম নহী তো ফির মরনা ক্যা?" বাস্তবিক এই ব্রহ্মবাদিনী তপস্বিনী স্বানুভূতির মহিমায় চিরকাল আমাদের মাঝে অমর হইয়া রহিয়াছেন। সুশিক্ষা ও সৎ আদর্শে পরিচালিত হইলে বৈধব্যজীবনও যে দুঃখের হয় না, গৌরীর জীবন কথা তাহার জলন্ত প্রমাণ।



সুখ-দুঃখ

সাংখ্যের চতুর্ব্যূহের প্রথম ব্যূহ হচ্ছে দুঃখ। অর্থাৎ দুঃখকেও জীবনের একটা সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে, দুঃখ কি, তাও চিন্‌তে হবে। সাধনার এই হচ্ছে প্রথম পাঠ। বাস্তবিক দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিপর্য্যস্ত। খাই দাই, রোজগার করি, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করি, মনে ভাবি, বেশ আরামে আছি। চিত্তের এই নিশ্চিন্ত অবস্থায় পরকালের কথা, জন্মান্তরের কথা, দুঃখের কথা বা মুক্তির কথা মানুষের মনে আসতেই পারে না। সাধনা কাকে বলে, সাধনলব্ধ আর্য্যসত্যই বা কি, আরাম শয়নে শুয়ে তা কখনো বোঝা সম্ভবপর নয়। তাই সাংখ্যকার বল্‌ছেন, বুদ্ধদেবও তাঁর প্রতিধ্বনি করে বলছেন, সত্য লাভ করতে হলে আগে দুঃখের তোরণদ্বার পার হয়ে আস্‌তে হবে। দুঃখ কাকে বলে, তা বিশেষ করে অনুভব করতে হবে; বন্ধনজ্বালায় প্রাণ ছট্‌ফট্ করলে তবে না তা হতে মুক্তির পিপাসা জাগবে। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে এই দুঃখবাদের দর্শন বিশেষ করেই বুঝিয়েছেন। দুঃখের স্বরূপবোধ সম্বন্ধে তাঁর একটী উপমা বড় সুন্দর। তিনি বলছেন, যেমন মানুষের চোখ এত সুকুমার স্পর্শপ্রবণ যন্ত্র যে তাতে একটী মাকড়সার তাঁত পর্য্যন্ত ছোঁয়ালে ব্যথা হয়, তেমনি বিষয়সংস্পর্শ হতে চিত্তকে নির্ম্মুক্ত রেখে তাকে এমনি সুকুমার করতে হবে, যাতে বিষয়ের বিন্দুমাত্র ছোঁয়াচেই দুঃখের অনুভূতি চিত্তে তীব্র হয়ে ওঠে।

দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের বিপর্য্যস্ত ভাব হচ্ছে চিত্তের চঞ্চলতায়। চঞ্চল চিত্ত বিষয়সংগ্রহের দরুণ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের উপরই নির্ভর করে রয়েছে। ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপূর্ণ, বিষয়ও অনিশ্চিত; সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যোগে চিত্তে ক্ষণিক তৃপ্তির মাত্র উদয় হচ্ছে। এই ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তর্পণকেই আমার সুখ বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত। এর বিপরীত সুখও আছে—চিত্তের নিশ্চল অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের নিরোধে। কিন্তু অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি তো তাতে স্বস্তি পাবে না। সে ছট্‌ফট্ করতেই ভালবাসে, যদিও সে জানে ছট্‌ফট্ করে যথার্থ সোয়াস্তি নাই। বিষয়ীর চপল চিত্তকে ধ্যানে তন্ময় হতে বল, তাতে সে হাঁপিয়ে উঠ্‌বে। অথচ নানা জ্বালাযন্ত্রণার হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য সে চিরকাল বিস্মৃতিরই আশ্রয় খুঁজে এসেছে। মনের জ্বালা মিটাবার জন্য সে ঘুমের বা নেশার কোলে ঢলে পড়তে রাজী, কিন্তু তবুও চিত্তের একাগ্রতায় বা ধ্যানতন্ময়তায় তার স্বস্তি নাই। ইন্দ্রিয়সেবার এই হচ্ছে বিপরীত শাস্তি। চপলতাতে সুখ নাই জানি, অথচ তার হাত হতে বাঁচবারও তো পথ নাই। এ অবস্থায় বিষয়সংস্পর্শই তার পক্ষে সুখ, বিষয়বিরক্তি দুঃখ। সংসারের পক্ষে সুখ-দুঃখের এই হচ্ছে মাপকাঠি।

কিন্তু বিবেকীর সুখ-দুঃখের সংজ্ঞা ঠিক এর বিপরীত। তিনি বলবেন, বাসনার ক্ষয় হতে, বিষয়বিরতি হতে, চিত্তের নিস্তরঙ্গ ভাব হতে যে অনুত্তম সুখ, সংসারে

তার শতাংশের একাংশও তো মিলতে পারে না। খুব ভাল 'ওস্তাদের কাণে' সুরের একটী পর্দ্দা ভুল হয়ে গেলে যেমন গানের সমস্তটা রসই মাটী হয়ে যায়, বিবেকীর কাছে বিন্দুমাত্র বিষয়সংস্পর্শজনিত চিত্তের ক্ষোভও তেমনি পরম দুঃখের নিদান। তিনি চান, নির্ব্বাত দীপশিখার মত চিত্তকে সমস্ত বিকার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে। এই নির্ব্বিকার অবস্থাই তাঁর পক্ষে সুখ, বিকারমাত্রই দুঃখ।

তা হলেই দেখি, সংসারী ও বিরাগীর সুখ-দুঃখের আদর্শ একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার এর মাঝে রহস্য এই, যে যে ভূমিতে আছে, সেই ভাবছে, আমি বেশ আছি। বিষয়ী বিষয়সংস্পর্শই বোঝে, বৈরাগ্য বোঝে না, বৈরাগী আবার বিষয়বিরতিই বোঝে, সংসার বোঝে না। বিষয়ীর সুখ চিত্তের একটা পরিণাম, আবার বৈরাগীর সুখও তাই—এই হিসাবে যদি বিচার করি, তাহলে উভয়ের সুখের পরিমাণগত কোনও তারতম্য ধরে আদর্শের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করা চলে না। কিন্তু শুধু সুখের পরিণাম ধরেই তারতম্য নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর হয় না; কেন না, বিষয়ী ও বিরাগী উভয়ের সুখের স্বরূপ আলোচনা করতে গেলেই বিচার এসে পড়ে। তখন প্রজ্ঞার সহায়তা ছাড়া উভয়কে বুঝবার আমাদের আর কোনও উপায় থাকে না। তাহলে এই দুটী আদর্শের যথার্থ বিচারক হচ্ছে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বলে, পরিমাণ যাই থাকুক না কেন, বিষয়ীর সুখ যে চিত্তের চপলতা হতে উৎপন্ন এবং এই চপলতা হতে মুক্তি পাবার জন্য বিষয়ীরও অন্তরের অন্তরে একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টা রয়েছে, এই হতেই তো প্রমাণ হয়, বিষয়ানুরক্তির সুখ অপেক্ষা বিষয়বিরতির সুখই উৎকৃষ্টতর। কেন না চরমে বিষয়বিরতির দিকেই সবার টান—সেইখানেই সবার বিশ্রাম। বিষয়ী নিদ্রার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করে যে বিশ্রাম পেতে চায়, সেই বিশ্রামই বিরাগী চান, চিরজাগৃতির পরম জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে।

তা হলে এই বিরামসুখের প্রতি বিষয়ী ও বিরাগী উভয়ের লোলুপতা হতেই উভয়ের আদর্শের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিরূপিত হবে। দেখতে হবে, কার বিশ্রান্তি শাশ্বত, কার বিশ্রান্তিতে ভোগের উৎকর্ষ। পূর্ব্বেই বলেছি, চপলতার বিশ্রান্তি অবসাদে, দৈনন্দিন নিদ্রা তার প্রমাণ, মৃত্যুর আবর্ত্তন তার সাক্ষী। কিন্তু চিত্তকে নিথর করে তাকে জাগ্রত রেখেই যদি তার বিশ্রাম সুখের আয়োজন করতে পারি, তা হলে সেই সুখই কি উৎকৃষ্টতর হবে না? অবসাদে যে বিশ্রান্তি আসে, তাতে বিষয়সংস্পর্শ হতে বিচ্ছেদ ঘটেই। সারাদিন বিষয় চর্চ্চা করে তারই অবসাদে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়, তখন তার বিষয় সংযোগ থাকে কোথায়? যে বিষয় তার এত প্রিয় ছিল, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে তার নিকট থেকেও তাকে ছুটী নিতে হয়। মৃত্যুরূপী জীবনান্তকর অবসাদেও ঠিক তাই ঘটে। কিন্তু চিত্তকে বিষয়বিরত অথচ সজাগ রেখে যে বিশ্রাম, তাতে বিষয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবার তো কোনও কারণ থাকে না। বিরাগীর চিত্ত তখন বিষয় চায় না, কিন্তু বিষয় তাকে চায়; দ্রষ্টার দৃষ্টি বিষয়ের উপর ন্যস্ত না থাকলে তার স্ফূর্ত্তি হবে কোথা থেকে? বিষয়ী বিষয়কে চায়, কিন্তু পায় না;

বিরাগী বিষয়কে চায় না, কিন্তু পায়। চিত্তের পরিণামদশায় উভয়ের সুখের আদর্শের তারতম্য ন বুঝ্তে পারলেও পরিপাকদশায় কিন্তু সে ভেদটুকু সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এরপরেও কি আর বুঝিয়ে বল্তে হবে, কার সুখের আদর্শ উৎকৃষ্টতর ?

সুখদুঃখের আদর্শ বিচারে বিষয়ীকেও একটা পক্ষ করার উদ্দেশ্য আছে। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মানুষ যেমন বিষয়কে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, দার্শনিক বুদ্ধিতেও তেমনি তার সত্তার একটা সার্থকতা পাওয়া যায়। প্রশ্ন হয়, বিষয়বুদ্ধিকে বৈরাগী নিন্দা করে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না; কেন না বিষয়সুখ যতই ক্ষণিক হোক্ না কেন, তা যে সুখ, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই; আর বিষয় ক্ষণিক হলেও তার সত্তাকেও অস্বীকার করবার উপায় নাই। ক্ষণিক সুখকে ক্ষণিক বলে নিন্দা করা যেতে পারে, তাকে হেয় বলা যেতে পারে, কিন্তু ক্ষণবৈচিত্র্য যখন প্রবাহের আকার ধারণ করে অপরূপ তরঙ্গভঙ্গে নৃত্য করে, তখন তার সুষমাকে তো প্রত্যাখ্যান করা চলে না। এই দর্শন হতেই লীলাবাদের উদ্ভব। নিত্যবাদী বলছেন, জগৎ উড়িয়ে দাও, ওর সবটাই চঞ্চল, নশ্বর; লীলাবাদী বলছেন, তা কেন, ও নিত্য চিন্ময়পুরুষেরই লীলা সুখ দুঃখ তাঁরই দান, সংসার তাঁরই অপরূপ মমতার নিদর্শন, একে ছেড়ে যাবে কেন, যাবেই বা কি করে ?

যদি চরমপরিণামের দিক দিয়ে দেখ, তা হলে বুঝতে পারি, দুই পক্ষের কথাতেই সত্য আছে। যদি দুটী মতই সত্য হয়, তা হলে বলতে হয়, এ হচ্ছে একই তত্ত্বের দুটী বিভাব; প্রকৃতির সহজ প্রেরণাবশতঃ কেউ চায় বিষয় বর্জ্জন করে সুখ পেতে, কেউ চায় বিষয় নিঙড়ে সুখ নিতে। তুমি দোষ দেবে কার ? কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, যদি চরম পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার করা হয়, তা হলে বল্তে হয়, বিষয়ীর শেষ দশার চেয়ে বৈরাগীর শেষ দশা উৎকৃষ্ট, অতএব বৈরাগীর আদর্শই শ্রেয়। কিন্তু তা হলেও এই প্রশ্ন থেকেই যায়, এই আপাতদৃশ্যমান সুখ-দুঃখে গড়া জগৎটার কি উপায় হবে ? এর সঙ্গে বৈরাগীরও তো একটা যোগ থাকা প্রয়োজন। যে প্রকৃতি আশ্রয় করে এই জগতের বুকে সে ফুটে উঠেছিল, তাকে নিরোধ করে নির্ব্বাসিত করে সে পরম সত্য লাভ করেছে—কিন্তু প্রকৃতির সত্তা বিলোপ তো তাতে হবার নয়। সাংখ্যকার জবাবে বলেছিলেন, প্রকৃতি একজনের সম্বন্ধে কৃতার্থা হল বটে, কিন্তু অপরের সম্মুখে তার মোহিনী মায়া বিকাশ করতে বাধা কি ? অর্থাৎ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা বহুত্ব আমাদের জীব জগতের বনিয়াদ, তাকে তিনি সাধনার শেষ সীমা পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। তাই আপাততঃ প্রকৃতির নিরসনে তিনি কৃতার্থতা লাভ করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু নিরোধ মানেই তো বিলোপ নয়; আজকে যাকে চেপে রেখেছি, সমগ্র সত্যের হিসাব যেদিন হবে, সেদিন তাকে তার ন্যায্য স্থান তো দিতেই হবে। তাই নিরোধটা আত্যন্তিক হতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় থেকেই যায়। বিশেষতঃ বহু আত্মাবাদী আত্মায় আত্মায় সমানুভূতির কথা সম্বন্ধে কি জবাব দিবেন ? অনুভূতির সাম্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আত্মার সংখ্যা করা কি সম্ভব ?

যদি বল, সংস্কারের তারতম্যে ভেদ হবে, তাও তো সম্ভব নয়, কেন না সংস্কারকে নিরোধ করা তোমার লক্ষ্য। যাকে তাড়িয়ে দিলে, তাকে দিয়ে সীমা আগলানো চলে কি করে?

নিরোধবাদ বা নাস্তিবাদের উপর এই আপত্তির মীমাংসা হয় বেদান্তে। বেদান্ত বলেন, হাঁ, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা পরিহার করা প্রয়োজন বটে; বিষয় বৈরাগ্যও অপরিহার্য্য। কিন্তু এ তার পথ নিজকে সঙ্কুচিত করে নয়—নিজকে বিস্তার করে। মনে কর, চোখের সামনে বিষয় উপস্থিত রয়েছে; তার বিকার হতে আত্মরক্ষা করতে হবে। তার দুটো পথ আছে;—হয় চোখ বুজে থাক্‌তে পারি, মনকে শূন্যবৎ করে রাখতে পারি, নয়ত চোখ মেলে থেকেই বিষয়ের অভিঘাত অটল হয়ে সইতে পারি। এর তত্ত্বটা এই - চিত্ত আর বিষয়, ঠিক এই দুটীর মাঝে বিচ্ছেদরেখা টান্‌তে হবে। এ শুধু মননশক্তি বলেই সম্ভব। তাতে বাইরের যোগাযোগ কিছু থাক্‌তে পারে বটে। নিরোধবাদী মনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেও রুদ্ধ করলেন; ভূমাবাদী ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন না, কিন্তু তার রসগ্রহণে বিরত থাকলেন মাত্র, তাঁকে মননশক্তিরই পূর্ণ সহায়তা নিতে হল। নিজকে সঙ্কুচিত করলে অ হবার নয়, কাজেই বিষয়ের অভিঘাত হতে আমি বড়—এই অনুভূতিতে প্রকৃতির মায়াজালের বিস্তারের সঙ্গে তাঁকেও বড় হতে হবে। এ-ও বন্ধন মুক্তি। এখানে বাহ্য সাধনার আশ্রয় নিলাম না—শুধু মননশক্তির উপর নির্ভর করে আমার চল্‌তে হল।

এই মননশক্তির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আজকাল সম্মোহন বিতার কথা আমরা সবই জানি। সম্মোহনের ফলে, যেখানে যা ছিল না, সেখানে তাও সৃষ্টি করা যায়। তার জন্য অন্য উপাদান প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় শুধু তীব্র ইচ্ছা ও সুস্পষ্ট কল্পনা। চিত্ত ও বিষয়ের সংযোগস্থলে নিজকে ধরে রেখে যদি বিষয়ের দিকে তাকানো যায় তাহলে এই সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে মনে জাগে, বিষয়ের রসে আপ্যায়িত হওয়া না হওয়া শুদ্ধ আমার ইচ্ছাশক্তির সূক্ষ্ম স্পন্দনের উপর নির্ভর করে। এই সূক্ষ্ম স্পন্দনটিকে যিনি ধরতে পারেন, তাঁর বাহ্য সাধনার প্রয়োজন হয় না—আত্মপ্রসারণ দ্বারাই প্রকৃতির জাল হতে তিনি মুক্ত হতে পারেন। কিন্তু যিনি এই স্পন্দনটী ধরতে পারেন না, তাঁকেই প্রকৃতির বিপরীত মুখে নিরোধশক্তি প্রয়োগ করতে হয়, সাধন তাঁরই প্রয়োজন। ভূমাবাদীরা বলবেন, ইচ্ছার স্পন্দনে কল্পনার সঙ্কোচে জীব হয়েছি। এর বিপরীত স্পন্দন ও কল্পনার প্রসারও ক্ষণে ক্ষণে আমার মাঝে হচ্ছে। সেই অনুকূল ক্ষণগুলিকে ধরে বিপরীত মুখে নিজকে প্রচোদিত করাই পুরুষের কর্ত্তব্য। যেমন দুঃস্বপ্নের হাত হতে বাঁচবার জন্য জাগৃতির অস্পষ্ট অনুভূতিকে তীব্র প্রচেষ্টায় সুস্পষ্ট করে তুললেই ঘুমের চটকা ভেঙ্গে গিয়ে স্বপ্ন কোথায় মিলে যায়, ঠিক তেমনি অন্তঃশক্তিবলেই দুঃখের, সঙ্কোচের দুঃস্বপ্ন হতে আমাদের বাঁচতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগকে অস্বীকার করাই জীবত্ব হতে নিজকে অপসম্মোহিত করা। কিন্তু নিরোধবাদী প্রকৃতির নিরোধ পরিণামের সহায়ে তার সঙ্গে লড়তে চান। প্রকৃতি তাঁর কাছে বাস্তব, মায়া নয়, অথচ শেষকালে

সেই প্রকৃতিরই বাস্তবতা তিনি অস্বীকার করেন। তাই তাঁর দর্শনে একটা বিরোধাভাস থেকেই যায়, সত্যের পূর্ণ দর্শন তাঁর হয় না। যিনি জগৎকে মায়া বলেন, তিনি তাঁর সত্তাকে আদিতে অন্তে একই রূপ দেখেন, বাস্তব বলে তত্ত্ব বলে স্বীকার করে শেষকালে নিরোধ দ্বারা সত্তাকে চেপে ফেল্‌তে চান না। আজকাল আমাদের দেশে অধিকাংশ দার্শনিকই মায়াবাদের এই রহস্যটুকু না জেনে নাস্তিবাদরূপ শূন্যবাদদর্শনের সঙ্গে তাকে ঘুলিয়ে ফেলেন।

বেদান্তের এই সম্যক্‌ দর্শনেই লীলা ও নিত্যের সমন্বয় হয়েছে, বিষয়ী ও বিরাগীর দ্বন্দ্ব মিটে গিয়েছে। বৈরাগীর দর্শনকে ঠিক এই ভাব থেকেই আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করেছি; তাই বলেছিলাম, জাগ্রৎ বিশ্রামে বিষয় লোপ পায় না, কিন্তু তার সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। নিরোধবাদী কিন্তু বিষয়লোপেরই পক্ষপাতী। লীলাবাদীর বিরোধ তাঁর সঙ্গেই—মায়াবাদীর বা ভূমাবাদীর সঙ্গে নয়। বৈরাগ্যের একটা ফল আর একটা সাধন আছে। ভূমাবাদীর কাছে বৈরাগ্যের ফলটাই বাস্তব, আর নিরোধবাদীর কাছে তার সাধনটাই বাস্তব। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু না ধরতে পেরে আমাদের দেশের লীলাবাদীরা বৈরাগ্যের সমস্তটা দোষ মায়াবাদীর ঘাড়ে চাপিয়ে মনের সুখে পয়ার ছন্দে তাঁকে গাল দিয়েছেন; এমন কি মায়াবাদীর শিরোমণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখ দিয়েও নানা ঢঙের কথা বলাতেও কসুর করেন নি।

তবে নিরোধের কি প্রয়োজন নাই? আমরা বলি, খুব আছে। সাধন হিসাবে তার খুবই প্রয়োজন আছে। বৈদিক শিক্ষার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রসারণের সহজ শিক্ষার ধারা আমাদের দেশ হতে লোপ পেয়েছে। গোটা দেশটা এখন সাংখ্যবাদের কবলে। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণের ভাব আমাদের এত অভ্যস্ত, প্রকৃতির পরিণামকে আমরা এত বাস্তব বলে জানি যে, তাহাতে বিরক্ত করে, তপস্যা দ্বারা, আত্মনিরোধ দ্বারা আত্মচৈতন্যকে জাগ্রৎ না করলে আত্মপ্রসারণের কোনও নিশানাই খুঁজে পাব না। এই জন্য এই যুগে নিরোধবাদীর তীব্র বৈরাগ্য, সাংখ্যকারের চতুর্ব্যূহের প্রথম ব্যূহের মনন এত প্রয়োজন। আমরা ভোগকাতর দেশকে পুনঃ পুনঃ বলব, বিষয় ছাড়, দেখ, জগৎ দুঃখময়। কিন্তু মনে জানি, এ কথা চরম কথা নয়। ভূমার মাঝে বিষয়েরও স্থান আছে, আনন্দেরও স্থান আছে। কিন্তু সে কথা আজ শোনায় কে? শোন্‌বার অধিকারী কোথায়?



ছাত্র রামতীর্থ

—:(*):—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তীর্থরামের ছাত্রজীবন সম্পর্কে একটী গুরুতর বিষয় আলোচনা করিতে বাকী রহিয়াছে। আজকাল দেশ উদ্ধার করিবার, দেশের উন্নত করিবার নানাপ্রকার কল্পনা জল্পনা চলিতেছে। ইহার সঙ্গে রাজনীতিরও যোগ রহিয়াছে। দেশ উদ্ধারের চেষ্টা নিশ্চয়ই ভাল কাজ, রাজনীতির চর্চ্চাও কিছু মন্দ নয়। কিন্তু কথা হইতেছে, রাজনীতির সহিত ছাত্র-জীবনের কোনও সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় কি না। এ সম্বন্ধে তীর্থরামের কি অভিমত, তাহা উল্লেখ করিয়া আমরা তাহারই সমালোচনা করিব।

তীর্থরাম ছাত্রজীবনে রাজনীতিচর্চ্চার প্রতিকূল ছিলেন। তাঁহার একদিনের দিন-লিপিতেই এ সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্ত তিনি সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"আজ কংগ্রেসে গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, দেশের বড় বড় বক্তার বক্তৃতা শুনিব, তাহাদের বলিবার ভঙ্গী কিরূপ, তাহা পরখ করিব। কিন্তু সেদিনকার বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইল, দাদাভাই নৌরজীর সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণ যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, আমি যে সেরূপ কিছু করি নাই, তাহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কংগ্রেসওয়ালাদের বক্তৃতাতে আমি বিন্দুমাত্র আনন্দ পাইলাম না—একটুও প্রেরণা পাইলাম না। দেখিলাম, ওসব কেবলই ফাঁকা বুলি।"

তীর্থরাম কোনও দলভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার এই কথাগুলি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অনুভূতি বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাদা কথায়, তাঁহার অভিমত এই, যে কোনও বিষয়ে ফাঁকা আড়ম্বরের কোনও সার্থকতা নাই। ইহাতে যোগ দিয়া চিত্তকে কেবল লঘু করিয়া তোলা ছাড়া আর কোনও লাভ হয় না। রাজা ও প্রজার সম্পর্কের মাঝে যেখানে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, সেখানেই রাজনীতি ফলপ্রসূ হইতে পারে। আমাদের দেশের রাজনীতি আজ সহস্র বৎসর হইল লোপ পাইয়াছে। এখন রাজনীতি বলিয়া যাহা চলিতি, তাহা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। যাঁহারা এই রাজনীতিচর্চ্চার পক্ষপাতী, তাঁহারা অধিকাংশ লোকেই বিদেশীয় সভ্যতার ভক্ত। উঠিতে বসিতে তাঁহারা দেশের লোককে খোঁটা দিয়া থাকেন, ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় তোমরা অশিক্ষিত, অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আবার তাঁহারাই মুখ ফিরাইয়া রাজার দুয়ারে ধরণা দিয়া সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ন্যাকা কান্না কাঁদিতে থাকেন। যেখানে মূলেই এত বড় একটা বৈষম্য রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করেন, সেখানে যে সাম্যের অধিকার কি করিয়া দাবী করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না।

দেশের হিত আর রাজনীতি, এই দুইটী

আজকাল জড়াইয়া গিয়াছে। রাজনীতিতে যোগ না দিলে দেশের হিত করা যাইতে পারে না, এই অজুহাতে নেতারা ছেলের দল ক্ষ্যাপাইয়া থাকেন। বেশী দিনের কথা নয়, গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় নেতারা ছেলেদের শিখাইলেন, স্কুলকলেজ গোলামখানা—উহা ছাড়িয়া এস। পড়ার খরচ অবশ্য ছেলেদের বাপখুড়ার গাঁঠ হইতেই দিতে হয়; সুতরাং গোলামখানায় থাকা না থাকা সম্বন্ধে ইঁহাদের মতামতেরও একটা মূল্য থাকা সম্ভবপর। কিন্তু দেশোদ্ধারের প্রবল বন্যায় অভিভাবকদের ক্ষীণ আপত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহার ফলে ছাত্রসমাজ যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিবেচনা, নৈতিক দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার জন্য কাহাদিগকে দায়ী করা উচিত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ছাত্রজীবনে রাজনীতি আওড়ায় দেশহিত করিবার চেষ্টায় যে কি সুফল ফলিবে, তাহা এই একটা দৃষ্টান্ত হইতেই সুস্পষ্ট হইবে।

দেশের হিত করাতে আপত্তি কিছুই নাই। কিন্তু তাহারও তো যোগ্যতা থাকা চাই। নিজের হিতের প্রতি যার খেয়াল নাই, সে পরের হিত করিবে কোন্ আদর্শের অনুসরণে? যে নিজের বোঝাই বহিতে পারে না, সে পরের বোঝা বহিতে যায় কোন্ সাহসে? যুবক চিত্তে আশার অসম্ভব প্রভাব; আশায় বুক বাঁধিয়া সে সাধ্যের চেয়েও বেশী করিবে বলিয়া আগাইয়া যায়। কিন্তু তাহার এই বিবেকহীন উৎসাহকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যও একটা বাধকশক্তি থাকা প্রয়োজন। ছেলেরা ঘুড়ি উড়াইবার সময় কখনও কখনও তাহাকে একটা ল্যাজ জুড়িয়া দেয়; ইহাতে ঘুড়ি ভারী হয় বটে, কিন্তু তাহার মাথা ঠিক থাকে। যুবকদের কল্পনার হাওয়ায় উড়িতে দেখিয়া যে বৃদ্ধেরা চিরকাল পেছন হইতে কেবল টিক্‌টিক্ করিতে থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল তার ঠিক রাখা। কিন্তু অনেক যুবকই হয়ত বৃদ্ধের এই বাজে বকুনীকে বরদাস্ত করিতে পারে না। অবশ্য জগতে নিত্য নূতন ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে, নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় কখনও কখনও বৃদ্ধের অভিজ্ঞতাও উলটিয়া যাইবে, কিন্তু তাই বলিয়া বৃদ্ধের বচনমাত্রই যে অগ্রাহ্য হইবে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু আজকালকার শিক্ষাদীক্ষার রীতিই হইতেছে—প্রাচীনের প্রতি অশ্রদ্ধা। রাজনীতিচর্চ্চায় এই অশ্রদ্ধাকে দিন দিন আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। এমন কি নেতাদিগকেও এই স্বহস্তে রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিতে হয়। নেতার পদ পাইয়া তিনটা বৎসরও কেহ টিকিয়া থাকিতে পারেন না; অথচ তিন বৎসরের মাঝেই যে তাঁহাদের মত ও অভিজ্ঞতা পালটিয়া যায়, তাহা বলা চলে না। ইহাতে প্রমাণ হয়, জনসাধারণের বিচারশক্তি নাই, দূরদর্শিতা নাই, একটা লোকের কথা সব দিক হইতে তলাইয়া দেখিবার ক্ষমতা নাই। হুজুগে পড়িয়া যখন যাহার সহিত একটা কথায় মিল হইতেছে, তখনই তাহাকে বাহবা দিয়া আকাশে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে—আবার পরমুহূর্ত্তেই আর এক কথায় চটিয়া গিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে এমনি অব্যাহিতচিত্ততার পরিচয় আজ কত বৎসর ধরিয়াই তো

দেখিতেছি। এই হট্টগোলের মাঝে বিদ্যার্থীর তরুণ চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়া তাহার যে কি মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে পারি না।

হুজুগে মাতিয়া দেশের হিত করার চেয়ে আত্মহিত করিবার চেষ্টায় বেশী জোর দেওয়া প্রয়োজন—এ কথা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান রাজনীতি শরতের মেঘগর্জ্জন মাত্র—উহাতে দেশের যথার্থ হিত সামান্যই হইয়া থাকে। উপরন্তু ইহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা, অপরিণামদর্শিতা ও অশ্রদ্ধার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই জন্য বিদ্যার্থীর জীবন হইতে এই পাঠটা তুলিয়া দিলে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। শ্রীকৃষ্ণ বা ভীষ্মের মত রাজনীতিজ্ঞ হইলে, তাঁহাদের পদতলে বসিয়া শিখিবার অনেক থাকে, কেননা, তাঁহারা রাজনীতিকে মনুষ্যনীতির সহিত একসূত্রে বাঁধিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সে আদর্শ কোথায়?

তীর্থরাম রাজনীতিচর্চ্চাকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। কিন্তু এ জন্য তাঁহার দেশপ্রীতি যে কোথাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিম্বা তিনি যে দেশের কোনও হিত করিতে পারেন নাই, এ কথা কি কেহ বলিতে পারে? তাঁহার An Appeal on behalf of India যে পড়িয়াছে, সেই জানে দেশের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কতখানি কাঁদিত। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা, ভক্তির তন্ময়তা, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সমগ্র গুণাবলীতে তিনি আজ উত্তর ভারতের তরুণ চিত্তকে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন—ইহাকে দেশের সত্য উপকার বলিব না তো কাহাকে বলিব? আর তিনি ভারতকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি কঠোর সাধনা দ্বারা তিল তিল করিয়া অর্জ্জন করিয়াছেন—পরের মুখের ফাঁকা কথা কাড়িয়া আনিয়া হাটের মাঝে ছড়াইয়া দেন নাই। যাহা আমার নিজের জিনিষ, তাহাই যথার্থভাবে পরকে দান করিতে পারি। ধার করিয়া দানে কোনও সার্থকতা আছে কি?

কেহ বলিতে পারেন, এই যদি তীর্থরামের দেশহিতের নমুনা হয়, তবে তাহার জন্য তাঁহার লেখাপড়া শিখিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তো সারাজীবন মালা টপকাইয়াই দেশের হিত করিয়া যাইতে পারিতেন। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই, তাঁহার অধ্যয়নপ্রীতি যে কোন্ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল, একবার তাহাই স্মরণ কর। অধ্যয়ন তাঁহার তপস্যা ছিল। ভাবকে আয়ত্ত করা, চিত্তকে উদ্বুদ্ধ ও একাগ্র করা, ইন্দ্রিয়কে শান্তদান্ত রাখিয়া প্রচণ্ড মানসিক শক্তি অর্জ্জন করা, পরমাত্মায় অবিচলিত নিষ্ঠা রাখা—এই ছিল তাঁহার অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, শুধু বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করা নয়। যে সাধনায় এইগুলিতে সিদ্ধ হয়, শিক্ষার্থীজীবনে তাহার চর্চ্চা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজনীতিচর্চ্চায় যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে রাজনীতিকে তিনি দূরে পরিহার করিয়া চলিতেন না। তিনিও শিক্ষার্থীর চিত্ত লইয়াই কংগ্রেসে গিয়াছিলেন, কিন্তু শিখিবার কিছু না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এক কথায় তিনি বর্ত্তমান রাজনীতির মর্ম্মভেদ করিয়াছেন—"ও সব ফাঁকা কথা—ওতে আনন্দ নাই, প্রেরণা নাই।" আমরাও ইহার সমর্থন করি এবং রাজনীতিচর্চ্চা পরিণত বয়সের জন্য তুলিয়া রাখিয়া ছাত্রদিগকে মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে অধিক মনোযোগী হইতে বলি। (ক্রমশঃ)

বেদান্তীর ধ্যান

—*:*()*:*—

শুধু চোখ বুজে ধ্যান নয়, চোখ মেলেও ধ্যান চলে। আমি দিয়ে সব ব্যাপ্ত দেখতে হবে। সব আমার মাঝে—আমি ছাড়া কিছুই নাই। ক্ষুদ্র পরিধিতে এই অনুভূতি সবারই হচ্ছে, কিন্তু বিচার করতে জানে না বলে, কেউ এটা টের পায় না। আমার এই অনুভূতিকে বিস্তার করবারও পথ রয়েছে। সে পথ যে সত্যের পথ, অনুভবই তার প্রমাণ। এই ধারণা করতে হবে—যতটুকু জগৎ আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য হচ্ছে, তার চেয়েও আমি ব্যাপক। আমার বাইরে যা কিছু মনে করি, তা বাস্তবিক আমার ভিতরে। আমি সকলকে ব্যাপে রয়েছি, কিন্তু আমাকে কেউ ব্যাপে থাকতে পারেনি।"

চেয়ে আছি—যতটুকু দেশে যতটুকু দৃশ্য চোখে পড়ল, ততটুকুই আমার দেহ। এই আমার অন্নময় স্বরূপ। শুধু একটা দেহই আমার নয়—এই দৃশ্যের মাঝে পঞ্চভূতের যত মূর্তি, সবই আমার দেহ। আর সেই সমস্ত দেহে যত গতি, যত স্পন্দন সব আমার প্রাণ। অন্নময় কোষের জ্ঞান নিতে হবে দেশের ব্যাপ্তি হতে। যতটুকু দেশের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয় দিয়ে আহরণ করা হচ্ছে, ততটুকু পর্য্যন্তই আমার দেহ। আমি দেশের অতীত, তাই অন্নময় শরীরের বাইরে। চুপ করে বসে আছি, দূরে শব্দ শুনলাম—মনে করব না যে শব্দটা আমার বাইরে হচ্ছে। এই শব্দ শোনার মাঝে একটা দূরত্বের অনুভব আছে, যে অভিঘাত হতে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে, সেই বিষয়ের সংস্কার আছে। এগুলো কিছু আমার বাইরে নয়। যতটুকু দূরত্বের অনুভূতি হল, ততটুকু ব্যাপ্ত করেই আমার দেহ—সুতরাং শব্দটা আমার মাঝেই হয়েছে। এই পরিব্যাপ্ত দেহের মাঝে প্রাণ বিচিত্র স্পন্দনে অহরহঃ স্পন্দিত হচ্ছে—শুধু একটা পিণ্ডে নয়—সর্ব্বত্র। দৃশ্য জগৎ আমার অন্নময় দেহ, তার সর্ব্বত্র প্রাণের অনুভূতি চাই—যেমন প্রাকৃত অবস্থায় এই অভিমানী দেহপিণ্ডের সর্ব্বত্র প্রাণের সাড়া পাই। দৃশ্য দেহ শুধু জড় নিস্তব্ধ দৃশ্য নয়—প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার এই পরিব্যাপ্ত দেহের রূপান্তর ঘটছে। বায়োস্কোপের সিনের মত দৃশ্য জগতের সংস্থান প্রতি মুহূর্ত্তেই বদলে যাচ্ছে। পাখী উড়ছে, পাতা নড়ছে, মানুষ চলছে, নূতন নূতন দৃশ্যের আবির্ভাব হচ্ছে—এই ছিল ঘরের দৃশ্য, খানিক পরেই তা মাঠের দৃশ্যে রূপান্তরিত হল—ইত্যাকার দৃশ্য বা শ্রব্য দেশ্য জগতের যত বিকার, সব অনুভব করতে হবে প্রাণের বিকাশ বলে। বাস্তবিক কোথাও না কোথাও প্রাণের স্পন্দন হচ্ছে বলেই তো এই সব রূপান্তর। প্রাকৃত দৃষ্টিতে হয় তুমি চলছ, নয় অপরে চলছে, তাইতে রূপান্তর ঘটছে। কিন্তু জ্ঞানের দৃষ্টিতে তো তুমি-আমির ভেদ নাই—সর্ব্বত্রই এক দেহ, এক প্রাণ—যতটুকু দেশের অনুভব, ততটুকু জুড়ে এক প্রাণময় আমির বিকাশ।

তারপর এস মনোজগতে। এক বিন্দু মন তোমার মাঝে, কিন্তু তার শক্তি কত

প্রচণ্ড। সেই মন দিয়েই তো অপরের মনেরও অনুমান করছ। নইলে নিজের মন ছাড়া অপরের মনকে প্রত্যক্ষ করবার শক্তি তোমার কোথায়? তাই সর্ব্বত্রই এক মন ছাড়া দ্বিতীয় মনের অস্তিত্ব নাই। এই মন বিচিত্র এবং কালে ব্যাপ্ত। মন ক্ষণিক; ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে কেন্দ্র করেই বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি হচ্ছে। সে সমস্তই যে অভিমানী "তুমি"র অভিমত মন থেকে আসছে তা নয়; প্রাকৃত দৃষ্টিতে যাকে অপরের মন বলতে, তা থেকেও আসছে বটে। কিন্তু অপরের মন বলেই সেটা বহিরঙ্গ আর তোমার অভিমত ক্ষুদ্র মনের চিন্তা অন্তরঙ্গ—এমন ধারণা ভুল। তোমার অভিমত ব্যষ্টি মনেও পরক্ষণের চিন্তা পূর্ব্বক্ষণের তুলনায় বহিরঙ্গ। প্রত্যেক ক্ষণ নূতন নূতন হয়ে জাগছে, আবার লয় হচ্ছে। সুতরাং কোনও ক্ষণের মনই কোনও ক্ষণের অপেক্ষা রাখছে না। নূতন ভাব, নূতন চিন্তা তোমার মাঝেই যা আসছে কোথা থেকে? কাজেই তোমার অভিমত প্রাকৃত মনও অপর মনের মতই বহিরঙ্গ। সাক্ষীই যথার্থ তুমি। ব্যষ্টিদশায় নিজের মনকেও এমনি বাইরে ফেলে দাও, দিয়ে সবার মনের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত কর, আবার অনুভূতির কোলে তাদের টেনে নিয়ে অন্তরঙ্গ করে নাও—তাহলে ব্যষ্টি মন ছাড়া একটা সমষ্টি মনের সন্ধান পাবে। তার স্বরূপ কি? যেমন তোমার দৃষ্ট প্রাকৃত জগতের সূক্ষ্ম রূপ তোমার প্রাকৃত মন, তেমনি সমষ্টিগত বা দেশ্য জগতের সূক্ষ্মরূপ এই সমষ্টি মন। এইরূপে ক্ষণচিন্তায় বা কালচিন্তায় মনকে পরিব্যাপ্ত বলে ধারণা করতে হবে। এই মন সমষ্টি মন—সমষ্টি ইন্দ্রিয়বোধ সহায়ে বিষয় আহরণ করে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। সকলের মনকে জড়িয়ে নিয়ে, অথবা দেশ্যজগতের অন্তরালে কালবিদ্ধ এই মনোময় কোষ।

তার পর এসো বিজ্ঞানময় কোষে। আগে বিজ্ঞান কি তাই বুঝতে হবে। বিজ্ঞান হচ্ছে, নিশ্চয়াত্মিকা প্রতীতি। দেশকালবিদ্ধ সমষ্টি দেহ মন-প্রাণ একটা লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। দেহের রূপে, প্রাণের স্ফুরণে, মনের প্রতিবিম্ব অফুরন্ত বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যই একটা উদ্দেশ্যকে আশ্রয় করে সংহত হচ্ছে। তোমার এই বিরাট দেহ-মন-প্রাণের ক্রিয়া অনুসন্ধান করে দেখ, সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা আছে, আইনের বন্ধন আছে—ভোগ বা অপবর্গমুখী একটা গতি আছে। বিজ্ঞান যেন স্প্রীঙের মত—একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে, আবার প্রসারিত হচ্ছে, তাতেই দেহ-মন-প্রাণের কাঁটা একবার বিষয়ের দিকে, একবার চৈতন্যের দিকে আবর্ত্তিত হচ্ছে। এই দুইটা গতির মাঝেই সৃষ্টির যত বৈচিত্র্যের উদ্ভব—আলো-আঁধার, ভাল-মন্দ, পাপ পুণ্যের যত খেলা। এই বৈচিত্র্য সমষ্টির উপর একের অভিমান এবং সেই একত্বের organic unityই বুদ্ধি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ তোমার অভিমানী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নয়—দেশকালবিদ্ধ দৃশ্য জগতের পরিচালিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—যা তোমার মাঝে মোক্ষাভিমানের সৃষ্টি করে, যা অপরের মাঝে সংসারাভিমান সৃষ্টি করে। সেই সেই দিক দিয়ে জগৎকে দেখতে শিখাচ্ছে। কিন্তু তোমাকে ব্যষ্টির অভিমান হতে মুক্ত হয়ে দুটাকেই ধারণা করতে

হবে—মোক্ষের পক্ষ বা প্রতিপক্ষ দুইই তোমার চৈতন্যের আশ্রিত, এই অনুভব নিয়ে বুদ্ধির স্বরূপ ধারণা করতে হবে। এই হল তোমার বিরাট্‌ বিজ্ঞানময় কোষ—এরও সাক্ষী তুমি। কেননা এ বিজ্ঞান এক হলেও রহস্তে প্রবিষ্ট—ভোগ আর অপবর্গ এই দুইটী ধারা ধরে সে চলছে। সুতরাং তার আগে পেছনে যাওয়া আছে। কিন্তু তুমি দুইটী ধারারই ধারক। তাই তুমি সাক্ষী—বিজ্ঞানাভিমানীও নও। তুমি দেখ্‌ছ সর্ব্বত্র বিজ্ঞানের বিকাশ—একটা Intellegent Force সর্ব্বত্র ক্রিয়া করছে—সুস্পষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে সকলকে চালনা করছে, সকলের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করছে। তোমার বিরাট্‌ দেহ মনে যখন এই ক্রিয়া হচ্ছে, তখন তা মোক্ষাভিমান আনছে। এই হল পক্ষ। কিন্তু প্রতিপক্ষের সংস্কারও তোমার মাঝে আছে; সেই হচ্ছে সমষ্টি বিজ্ঞানের বহিরঙ্গ ধারা। তুমি উভয়ের ঊর্দ্ধে।

তার পর এস আনন্দময় কোষে। বিজ্ঞানের মূলে কাম বা বাসনা বা আনন্দ। আনন্দ প্রাণেরও প্রাণ। এ আর বোঝাবার উপায় নাই। বলা চলে আনন্দ কারণশক্তি। আনন্দের প্রেরণাতেই বিজ্ঞান ফুট্‌ছে, মন ক্রিয়াশীল হচ্ছে, প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, দেহ রূপান্তর গ্রহণ করছে। এই যে এতগুলি শক্তির ক্রিয়া—এর যে সমষ্টি, তাই আনন্দ। এগুলিকে সমষ্টিভাবে ধারণা করতে গেলে আনন্দ স্বতঃই এসে পড়ে। বিচ্ছিন্নের সমষ্টিই আনন্দ। যা স্থূলে বিচ্ছিন্ন, তা যদি সূক্ষ্মে সংযুক্ত না থাকবে, তাহলে বিচ্ছেদ হওয়ারই যে অবকাশ থাকবে না। যেখানে বিচ্ছেদের পর মিলন, সেখানেই তো আনন্দ। এই আনন্দ শক্তিসমষ্ট্যভিমানীর প্রেরণাতেই ক্রিয়ার বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। তাই বলছিলাম, আনন্দ সমষ্টিরূপ কারণের অনুভূতি—তা হতে কার্য্যরূপে দ্বিমুখী বিজ্ঞান, বহুমুখী মন, স্পন্দনাত্মক প্রাণ, রূপান্তরী দেহ—এই সমস্ত হচ্ছে। কিন্তু তুমি আনন্দও নও শুধু—তুমি আনন্দের দ্রষ্টা, অনুভবিতা। আনন্দ আর তুমি যে যুক্ত হয়েও বিযুক্ত—তার প্রমাণ সুষুপ্তিতে। কিন্তু সুষুপ্তি চাই না—চাই জাগৃতি—সেখানেই দ্রষ্টার আনন্দ। এই আনন্দ যখন কার্য্যজগতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়—তখনও তুমি আছ জাগ্রতে—আবার যখন সমস্ত জগৎকে আপনার মাঝে টেনে নিয়ে সুষুপ্তিতে বিশ্রাম করে, তখনও তুমি আছ সাক্ষী জ্যোতিঃস্বরূপে। তুমি কার্য্য-কারণের অতীত।



দৈব ও পুরুষকার

—:{*}:—

[প্রবক্তা—ভগবান্ প্রজাপতি]

বীজ ছাড়া কিছুই উৎপন্ন হয় না। বীজ ছাড়া ফল হয় না—এমন কি বীজ হইতেই আবার বীজের উৎপত্তি। কৃষক ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করে, কর্ষণ ভালই হউক আর মন্দই হউক, বীজ অনুযায়ীই সে ফল পায়। আবার উপযুক্ত ক্ষেত্র না হইলে বীজও নিষ্ফল হয়। তেমনি পুরুষকার ছাড়া দৈবও ব্যর্থ। পুরুষকার ক্ষেত্র, আর দৈব বীজ; ক্ষেত্র ও বীজের যথাযথ সংযোগ হইলে তবে ফসল ভাল হয়। ভাল কাজ করুক আর মন্দ কাজই করুক, কর্মের ফল পরিপক্ব হইলে তাহা কর্ত্তাই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শুভ কাজের ফল সুখ, আবার অশুভ কর্ম্মের ফল দুঃখ; যাহা করা যায়, তাহাই ফলপ্রসূ হয়; কেহ কিছু না করিলে ফল পাইবে কোথা হইতে? যে কর্ম্মী, ভাগ্য তারই অনুকূল, প্রতিষ্ঠা তারই করায়ত্ত। যে কর্ম্মহীন সে তো ভ্রষ্ট, তার ভাগ্যে কেবল কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। তপস্যা, স্বর্গসুখ, ধনরত্ন, যা কিছু বল, সমস্তই পুরুষকার বলে লাভ করা যায়। মনুষ্য জন্ম হইতে যাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও পুরুষকারেই ঐশ্বর্য্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের শ্রীলাভ হয় শৌচে, ক্ষত্রিয়ের পরাক্রমে, বৈশ্যের পুরুষকারে আর শূদ্রের সেবা দ্বারা। যে পরকে দিতে জানে না, যে ক্লীবের মত উৎসাহহীন ও নির্ব্বীর্য্য, যে কর্ম্মময় স্বভাব গঠন করিয়া তুলিতে পারে নাই, যার তপস্যা নাই, ভোগ তাহার আয়ত্ত হইবে কি করিয়া? ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকেও সমুদ্র গর্ভে তপস্যা করিতে হইয়াছে। কর্ম্ম করিয়া যদি ফল পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে সমস্তই বৃথা হইত। লোকে তাহা হইলে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিত।

মানুষের যাহা করা উচিত, তাহা না করিয়া যে কেবল দৈবের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তাহার সমস্ত আশাই নিষ্ফল হয়; স্বামী ক্লীব হইলে স্ত্রী কি পুত্রভাগ্যে বঞ্চিতা হয় না? দৈব শুভ হউক কিম্বা অশুভ হউক, তাহার দরুণ ইহলোকে তোমার ততটা ভয়ের কারণ নাই; কিন্তু পুরুষকারে যদি কোনও ত্রুটী থাকে, তাহার দরুণ পরকালে ভয়ের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। পুরুষকার ধরিয়া তবে দৈবের অনুবর্ত্তন করা চলে; কিন্তু মোটেই কোন কর্ম্ম করিবে না: আর দৈব তোমায় ফল দিবে, এরূপ কখনও হয় না।

তুমিই তোমার বন্ধু, তুমিই তোমার শত্রু; তুমি কি করিতেছ না করিতেছ, তাহা তো তুমিই জান—তোমার সমস্ত কর্ম্মেই তো তোমার আত্মা সাক্ষী। পুণ্যদ্বারা পাপ প্রতিহত হয়, আবার পাপদ্বারা পুণ্যও প্রতিহত [illegible] এইরূপে কর্ম্মবশতঃ পাপপুণ্যের যথোদিষ্ট ফলেরও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হয়, সর্ব্বত্র কর্ম্মই বলবৎ। দৈবে

যাহা আছে, তাহা থাকুক ; তুমি যদি পুণ্যের অনুষ্ঠান করিতে পার, দেবত্ব তোমার আয়ত্ত হইবে—দৈব তখন তোমার কি করিবে ?

পুরুষকার কি করিয়া দৈবকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহার কাহিনী শোন। যযাতি স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মাটীতে পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার দৌহিত্রগণের পুণ্য কর্ম্মহেতু আবার তিনি স্বর্গলোক ফিরিয়া পাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা জোর করিয়া পাণ্ডবদিগের রাজ্য কাড়িয়া নিল ; কিন্তু তাহারা বাহুবলেই সেই রাজ্য পুনরধিকার করিল, দৈবের মুখ চাহিয়া রহিল না।

আগুন যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, বাতাস পাইলে তাহা যেমন প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের যোগ হইলেই দৈবের পুষ্টি হয়। তৈল ফুরাইয়া গেলে দীপশিখা যেমন ম্লান হইয়া আসে, তেমনি কর্ম্মের জোর না থাকিলে দৈবের প্রভুত্বও ক্ষয় হইয়া আসে। মানুষ জগতে বিপুল ধনসম্পত্তি হাতের কাছে পাইয়াও কর্ম্মহীন হওয়ায় তাহা ভোগ করিতে পারে না ; আবার যাহারা নিত্য উৎসাহশীল, তাহারা দৈবদ্বারা সযত্নরক্ষিত বিভব আবিষ্কার করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। এ জগতে যে কর্ম্মহীন, তাহার জীবনই ব্যর্থ ; ইচ্ছা করিয়া যদি কেহ বিপথে চলে, দৈব তাহাকে সুপথে টানিয়া আনে না ; দৈবের কোনও প্রভুত্বই নাই। শিষ্য যেমন গুরুর অনুসরণ করে, দৈবও তেমনি কৃতকর্ম্মেরই অনুসরণ করে। পুরুষকার দ্বারা সঞ্চিত শক্তি দৈবকে পরিচালিত করিয়া অভীষ্ট স্থানে লইয়া যায়। পুরুষকারের কি শক্তি, তাহা তুমি নিজেই বিচার করিয়া বোঝ ; তারপর আরব্ধ কর্ম্মে বিধিবৎ পুরুষকারের সংযোগ করিয়া তাহার অনুকূলে দৈবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। ইহাই সিদ্ধি।



আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

— ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।২।৮

আমিত্বে বা অহংতত্ত্বে যে কর্তৃত্ববুদ্ধি, তাই অহঙ্কার। এ অহঙ্কারকে সমূলে সংহার করা চাই। আমিত্বকে যত প্রসারিত করতে থাকব, ততই তার বিলোপ সাধন হবে। যেমন পুষ্প পূর্ণ বিকসিত হয়ে বিনষ্ট হয়, জীবের আমিত্বও পূর্ণ প্রসারিত হলে পরব্রহ্মে লীন হয়। আমিত্বের সঙ্কোচেই আমিত্বের আয়ুবৃদ্ধি—জন্মজন্মান্তরে ব্যাপ্তি। তাই সমস্ত অশান্তির মূল। আধুনিক, প্রাচীন, জাতীয় ও ব্যক্তিগত সমস্ত বিবাদের মূলই হচ্ছে আমিত্বের সঙ্কোচ। আমি তোমার ভালবাসি না, তোমার দুঃখ দেখলে আমার হৃদয় দ্রব হয় না। দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি এসে সহস্র সহস্র জীবন ধ্বংস করল, কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদল না। এর কারণ কি ? অন্যকে "আমি" হতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি বলে।

আমিত্বকে আমাতে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বব্যাপী করে দাও—সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কোচ, স্বাতন্ত্র্য সব কারামুক্ত করে অনন্তের সঙ্গে মিশিয়ে দাও, তুমিও সমদর্শী এবং জগতের আদর্শস্থানীয় হবে।

*

কর্ম্মের দ্বারাই মানবাত্মা আপনাকে আপনি মুক্ত করছে, তাই যদি না হত, তবে ইচ্ছা করে মানব কখনই কর্ম্ম করত না। মানুষ যতই কর্ম্ম করছে, ততই তার ভিতরকার অদৃশ্য ভাবগুলি আপনি ফুটে উঠছে। কর্ম্ম করা কারো ভয়ে কিম্বা দায়ে পড়ে নয়—আপনাকে সহজে ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য। যারা বাস্তবিক কর্ম্মের মধুর আস্বাদন জীবনে ভোগ করে নাই, কর্ম্মেই যে আত্মার মুক্তি এ কথা জানে না, তারাই দুর্ব্বল মুহ্যমানভাবে বলে, জীবন দুঃখময়, আর কর্ম্ম কেবলই বন্ধন।

*

আত্মাতে যাহা আছে, সময়ে তারই বিকাশ হয় মাত্র। জ্ঞান, শ্রদ্ধাভক্তি সবই আত্মাতে নিহিত; উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং সময় পেলে আপনি তারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যখন বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়, তখন তারাই রিপু। হস্তদ্বারা চক্ষুদ্বারা যখন কুকার্য্য করি, তখন তারাই রিপু, সুকর্ম্মের সময় আবার তারাই বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। আত্মসুখের নাম কাম—যখন ভগবৎসেবা করি, তখন উহার নামই প্রেম।

*

কর্ম্মই যাদের লক্ষ্য—কর্ত্তা নয়, তীর্থে যাওয়াই যাদের উদ্দেশ্য—পাওয়া নয়, তাদের নিকটই কর্ম্ম করা তীর্থ করা সব ভারী এবং অসার বলে বোধ হয়। কর্ম্ম করতে গিয়ে যিনি একবার কর্ত্তার খোঁজ পেয়েছেন, তার উপর হাজার কর্ম্মের বোঝা চাপিয়ে দাও, কিছুতেই তিনি উদ্বিগ্ন বা অস্থির হবেন না। কারবার করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই মূলধনটী হারিয়ে বসি, তাই আমাদের লাভে-মূলে সব বিনষ্ট হয়। সুখ-দুঃখ সম্পদ্-বিপদ্ যাই আসুক না কেন, যদি কর্ত্তার দিকে অচল লক্ষ্য থাকে, তবে কেন ভীত হব? মন যাদের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় একমুখী হয়েছে, তাদের ভাগ্যেই ভগবান্ লাভ।

*

রোগ হল ভিতরে; বাহিরে ঔষধ ব্যবহারে কি ফল হবে? কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব তোমার মনের বিচার। ইন্দ্রিয় বেচারীদের দোষ কি? ইন্দ্রিয়ে মনঃসংযোগ না হলে কি কখন কুকর্ম্ম করা যায়? আগে মনটী স্থির কর—তারপর দেখবে, সবাই ঘাড় নত করে এসেছে। মূলে জল না ঢেলে শাখায় জল দিলে কি বৃক্ষ বড় হয় বা সুস্বাদু ফল বিতরণ করে? যিনি মন জয় করেছেন, সমগ্র জগৎ তাঁর করতলগত।

*

কুঠার চন্দনবৃক্ষকে ছেদন করে নিজেই সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জগতের আদর্শস্থানীয় মুনি-ঋষিগণ শত নির্য্যাতন সহ্য করেও জীবের হিতকামনাই করে থাকেন, লাঞ্ছনা যাতনা পেয়েও প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেন না। পরশ মণি ছুঁলে লোহাও সোণা হয়ে যায়। যোগী-ঋষিরা হচ্ছেন পরশমণি—যতই পাপী তাপী হওনা কেন, একবার তাঁদের পরশ পেলে তুমিও সোণা হয়ে যাবে। রাবণ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুক্তিই লাভ করে-

ছিল, জগাইমাধাই গৌরাঙ্গদেবের কপালে কানা ছুঁড়েও কৃপাপাত্রই হয়েছিল। ভগবানের অহৈতুকী কৃপা। তাঁর কৃপা চলে অতি পাষণ্ডও ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।"

*

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করতে গিয়ে পাখীর চোখের পুতুলী এই আর কিছুই দেখতে পান নাই। আমরাও যখন ভগবানকে লাভ করতে গিয়ে সব ভুলে যাব—লক্ষ্যে কেবল ভগবান থাকবে, তখনই ভগবান লাভ হবে। অন্য কিছু চোখের সামনে কিম্বা স্মৃতিতে জাগলেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাব।

*

তাকে যদি ভালবেসে থাকি, তবে সে আমার অবগুণ নিয়েই সব সময়ে ব্যস্ত থাকে বলে মনে করব? তাতে যে তার ভালবাসাকে অপমান করা হয়। অপরাধেরও অমন ক্ষমা কোথায় কার কাছে পাব? তবে আর অপরাধ করে তার কাছে লুকোচুরি কেন? তার শাসনের ভয়? সে তো বাইরের দণ্ডধারী পুলিশ নয়—সে যে অন্তরের অন্তস্তলে ভালবাসার নিষ্পীড়নে পীড়ন করবে।

*

কৃত্রিম উপায়ে পা ছোট করতে গিয়ে চীনের মেয়েরা পায়ের বিকৃতি ঘটিয়েছে মাত্র। সাধন ক্ষেত্রেও যখন প্রকৃত পথ ছেড়ে কৃত্রিম উপায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ি, তখনই আমাদের বিকৃতি ও অবনতি ঘটে থাকে।

*

যার অধিকারে সেই বড়—দুঃখ করবার কিছু নাই। চন্দ্রসূর্য্য জগৎময় আলোক দিচ্ছে, কিন্তু প্রাচীরবেষ্টিত গৃহের মাঝে তাদের প্রবেশাধিকার নাই। সে এলাকায় রাজত্ব করছে ক্ষুদ্র প্রদীপ। তার অধিকারে সেই বড়।

*

বিশ্বাস হচ্ছে লক্ষ্য। বিশ্বাস যাতে হয়, তার জন্যই যত সাধন ভজন ও তপস্যা। বিশ্বাসের আধার যার আছে, তার নির্ভর আপনি আসবে। কিন্তু যার তা নাই, তার বিচার আসবেই। বিচার করলেই বিচার্য্য বস্তুকে ধারণা করবার জন্য আবার সেইরূপ মন বুদ্ধি চাই। কাজেই এখানেও দেখছি আধারশুদ্ধি নইলে বিচারে শুদ্ধি ফুটবে না—বিচারের লক্ষ্য ভুল হয়ে যাবে। কাজেই বিশ্বাস করি বা না করি, যাতে বিশ্বাস হয়, আপ্তজনের মুখ থেকে সে উপায় অবলম্বন করতেই হবে। এখন কোথায়ও বিভূতি দেখে বিস্ময়ে বা ভয়েই হোক্ কিম্বা ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়েই হোক্, একজনকে না একজনকে প্রথমতঃ মেনে নিতেই হবে। যে অপরকে না মেনে চল্‌তে চায়, সেও নিজকে মানে। কাজেই প্রথমতঃ নাস্তিক বা ভগবানে অবিশ্বাসী হলেও সে সকল রকমে বঞ্চিত হবে না।

*

আড়াল থেকে এক জন টানছে, মন কিন্তু তা দেখেও দেখছে না—বাইরের খেলনা নিয়েই মত্ত। কিন্তু একবার যদি সে মনচোরের দিকে নজর পড়ে, তবে কি আর অমন খেলনায় ধরে রাখতে পারে? তখন সব খেলনার মালিকের খোঁজ পেয়ে মন তাঁর দিকেই উধাও হবে।

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে সশিষ্যে তাঁহার পদার্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্ত্তিক হইতে ৩রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং যে সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক ব্যয়াদি নির্ব্বাহ জন্য জন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে; এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তগণের বাসস্থানের বন্দোবস্ত ও আহার্য্য সংগ্রহ পূর্ব্ব হইতেই করিতে হইবে। ৬ মাইলের ভিতরে উপযুক্ত কোন হাট বাজার নাই। বিশেষতঃ অন্যান্য আশ্রমে ভক্তসাম্মিলনী উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তদের বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবার ভার যেরূপ আশ্রম সংশ্লিষ্ট সদস্য ও ব্রহ্মচারিবর্গ লইয়া থাকেন, কুতুবপুরে সেরূপ ভার গ্রহণ করিবার কোন লোক নাই। এই সমস্ত কারণে পুনঃ ভক্তগণের নিকট নিবেদন যে যাঁহারা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক জন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে সত্বর পাঠাইয়া দিবেন; এই টাকা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার পর দিলে চালবে না। যাঁহারা পূর্ব্বে টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার কোন প্রকার দায়িত্ব আমাদের থাকিবে না। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পাকা মন্দির প্রস্তুত হইতেছে; কয়েকখানা ঘরও প্রস্তুত হইয়াছে; এই আশ্রমটী অন্য কোনও আশ্রম অন্তর্গত নহে, ইহা সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীর পীঠস্থানস্বরূপ। আশ্রমটী স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। তাই সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে মন্দিরাদি নির্ম্মাণকল্পে প্রত্যেকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্যদানে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

কুতুবপুর আশ্রমে যাওয়ার পথের বিবরণ—

গোয়ালন্দ কলিকাতা লাইনে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া মোটরে ১৮ মাইল পথ মেহেরপুর যাইবে। মোটর ভাড়া জন প্রতি ১৲ এক টাকা, ১ ঘণ্টা সময়ে যাওয়া যায়। মেহেরপুর হইতে আশ্রম ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে, নৌকাতে ২ ঘণ্টা, কিম্বা মোটরে আধ ঘণ্টায় পৌছা যায়; মোটর ভাড়া জন প্রতি ।৷০ আট আনা।

প্রধান প্রধান ট্রেনগুলি চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে পৌঁছিবার সময় নিম্নে লিখা হইল।

শিলিগুড়ী প্যাসেঞ্জার ও আসাম মেল	...	...	প্রাতে	৯—৫৮ মিনিট
চট্টগ্রাম মেল	...	... ...	বৈকালে	৪—৪১ মিনিট
ঢাকা মেল	...	... ...	রাত্রি	১—৪৯ মিনিট
দার্জ্জিলিং মেল	...	... ...	রাত্রি	২—৪৩ মিনিট
সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ...	...	...	রাত্রি	৩—৫ মিনিট
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার ...	...	...	ভোর	৫—৫০ মিনিট

(কার্ত্তিক মাসে সময়ের সামান্য পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব)

দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের ভক্তগণ কলিকাতা হালিসহর নৈহাটী ও রাণাঘাট প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে অনেক ট্রেনেই চুয়াডাঙ্গা পৌঁছিতে পারিবেন। প্রধান প্রধান ট্রেনের সঙ্গে মোটর সার্ভিসের যোগ আছে।

চিঠিপত্র লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত এম, এ, বি এল, সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
(অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

বিগত ৬ই ভাদ্র মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসব অত্র মঠে, মঠান্তর্গত শাখা আশ্রম সমূহে এবং উচালন, জগৎসী, বীরখেতি, প্রভৃতি স্থানে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত তিথিতে বগুড়া সহরে উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমের বার্ষিক উৎসবও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ৫০০ নরনারায়ণ খেচরান্ন প্রসাদ পাইয়াছে। অপরাহ্ণে সবজজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সাধারণ সভা হইয়াছিল। ইহাতে আশ্রমের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ ও "কৃষিবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

আশ্বিনের পত্রিকা আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে গ্রাহকগণ পূজাবকাশ উপলক্ষ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তন স্থানীয় ডাকঘরেই করিয়া লইবেন। পত্রিকার অপ্রাপ্তি সংবাদ মাসশেষে জানাইলেও প্রতীকার করা হইবে।

দামপ্রাপ্তি-স্বীকার

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানে আশ্রম-স্থাপন উপলক্ষ্যে—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহরিশ রাও (নাগাহিল আসাম) কর্ত্তৃক* সংগৃহীত ৫৯৲ শ্রীঅন্নদাচরণ মাইতি পড়াগোদা, মেদিনীপুর ৫০৲ শ্রীশম্ভুনাথ দালাল বড়-বাজার, কলিকাতা ২৫৲ শ্রীরাধাশ্যাম মিত্র টকনা, বর্দ্ধমান ২০৲ শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় দিতপুর, ময়মনসিংহ (২য় দফা) ১৫৲ শ্রী-সারদাচরণ দাস রাঁগাংগিরি, চট্টগ্রাম ১০৲ শ্রীসন্ন্যাসীচরণ আঢ্য হুগলী, (১ম দফা) ১০৲ শ্রীতারানাথ দাসমণ্ডল ধুবড়ী, ১০৲ শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর, (৩য় দফা) ১০৲ শ্রীফণীভূষণ মিত্র হাওড়া, (১ম দফা) ১০৲ শ্রীঅমৃতকুমার মজুমদার ধিতপুর ময়মনসিংহ ৫৲ শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন চৌধুরী ময়মনসিংহ, ৫৲ শ্রীশ্যামাচরণ সিংহ দত্তের-বাজার ময়মনসিংহ, ৩৲ শ্রীরাখালরাজ খাঁড়া রয়েন, মেদিনীপুর ২৲ শ্রীব্রহ্মপদ মণ্ডল ডায়মণ্ডহারবার, ২৲ শ্রীহরিমোহন পাল রায়সিদ্ধি, বরিশাল ২৲ শ্রীমাধবচন্দ্র বর্ম্ম চাঁদপুর, বগুড়া ১৲।

*(শ্রীযুক্ত হরিশ রাও সংগৃহীত)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার ॥৹ শ্রীকৃষ্ণলাল দাস ॥৹ জনাব আবিডজান দোকানদার ১৲ শ্রীকাজিমন থাপা ঠিকাদার ২৲ শ্রীমহেশ-চন্দ্র সঠিয়া ১৲ শ্রীপদ্মনাথ বরগোহাই ১৲ শ্রীলক্ষ্মীনাথ গগই ১৲ শ্রীমিনারাম গগই ১৲ শ্রীকমলচন্দ্র গগই, ১৲ শ্রীদিননাথ সইকীয়া শ্রীদুর্গেশ্বর বরগোহাই ॥৹ শ্রীনবীনচন্দ্র গগই ॥৹ শ্রীআইতসিংহ ঠিকাদার ২৲ শ্রীউমেশচন্দ্র পাল ৸৵৹ শ্রীখোকানাথ রাও ১৲ জনৈক শিষ্য ৭৲ শ্রীহরিকান্ত গগই ১৲ শ্রীগুনিজামন ঠিকাদার ১৲ ডাক্তার এস্ কে সরকার ৩৲ শ্রীকামেশ্বর কোঁওর ১৲ শ্রীমথুরামোহন পাল ॥৹ শ্রীরজনীকান্ত পাল ।৹ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার পাল ।৹ শ্রীপ্যারীমোহন মালাকর ১৲ শ্রীঅমর-চন্দ্র দে ১৲ শ্রীনীরোদচন্দ্র দাস ১৲ শ্রীমহেন্দ্র-চন্দ্র দাস ॥৹ শ্রীচন্দ্রমণি দাস ।৹ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার পাল ১৲ শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ ।৹ জনাব গুল নবাব সা ঠিকাদার ২৲ শ্রীআইতমন রায় ঠিকাদার ৫৲ শ্রীরামনিবাস ছবিলাল সিংহ দোকানদার ২৲ শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥৹ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার ১৲ শ্রীপ্রসন্নকুমার দে ॥৹ শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত ।৹ শ্রীদত্তকৃষ্ণ ত্রিপাঠী ॥৹ শ্রীনীরোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ১৲ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গগই ॥৹ শ্রীমুহিরাম বরগোহাই ১৲ শ্রীমদন-মোহন ঘোষ ॥৹ শ্রীশশধর বিশ্বাস ।৹ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ আচার্য্য ॥৹ শ্রীনরবাহাদুর থাপা ঠিকাদার ২৲ শ্রীদলবাহাদুর ছত্রি ঠিকাদার ২৲ শ্রীভৈরববাহাদুর ছত্রি দোকানদার ২৲ শ্রীদলবাহাদুর রায় দোকানদার ৩৲ শ্রীবিশ্বনাথ দাস দোকানদার ১৲ শ্রীকমলচন্দ্র দত্ত ॥৹।

সারস্বত-মঠে

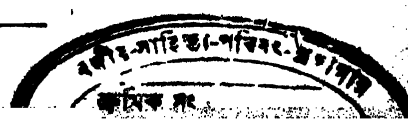
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল দাস হেড ড্রাফ্‌টস্‌-ম্যান মার্টিন এণ্ড কোং ১০৲, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত মিনিষ্টার আসামপ্রদেশ ৮৸৵১, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এক্‌জি-কিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার শিলং প্রবাসী ৬৸৵৹, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল ভূতপূর্ব্ব কনজারভেটার ফরেষ্ট বিভাগ ৪৲, শ্রীযুক্ত তরুণচন্দ্র বরুয়া শিলং প্রবাসী ৫৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস ডিঃ পিঃ এম্ জি আসাম ৩৲, শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র গাঙ্গুলী ডেপুটী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পুলীশ বিভাগ [illegible], শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন রায় ২৲, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু ২৲, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৲, শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র দাস ২৲,

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুস্তফী ২৲, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র দাস ২৲, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় ২৲, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ শর্ম্মা, ২৲, শ্রীযুক্ত গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফেসর ২৲, শ্রীযুক্ত কালীসদয় ভট্টাচার্য্য ২৲, শ্রীযুক্ত রমানাথ দত্ত ২৲, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গুহ ১৸৴৹, শ্রীযুক্ত মুক্তিনাথ দেব ওভারসিয়ার শিলঘাট শিলং প্রবাসী ১৷৹, শান্তি নিকেতন মেস ১৶৹, শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন রায় দেওয়ান বিলাসীপাড়া এ্ষ্টেট ২৷৹, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সিকদার সদর নায়েব বিলাসীপাড়া ২৲, শ্রীমতী সুকুমারী চৌধুরাণী পর্ব্বতজোয়ার পাঁচআনী এষ্টেট রূপসী ২৲, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে সরকার খাগড়াবাড়ী ২৲, শ্রীযুক্ত বলনাথ গোঁসাই সব ইন্‌স্পেক্টর বকো থানা ২৲ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বর্ম্মণ তহশিলদার বঞ্চণডাঙ্গা কাছারী ২৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র তামুলী হেড্‌ মাষ্টার পলাশবাড়ী ১৷৹, জনৈক ভদ্রলোক ১৷৹ ।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ আচার্য্য হিন্দু বোর্ডিং শিলং, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ফুকন, শ্রীযুক্ত দিবাকর গোস্বামী ও ভূষণ চন্দ্র শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত চক্রেশ্বর গগৈ, শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ভূতপূর্ব্ব হেড্‌ মাষ্টার শিলং, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত [illegible] দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত শ্রীমুনীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীবঙ্কুবিহারী দত্ত, শ্রীমুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌ ডি, শ্রীকালীপদ রায়, শ্রীইন্দ্রজিৎ দাস, শ্রীললিতলাল মিত্র, শ্রীদীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় শিলং প্রবাসী, শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীরমেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, ডাক্তার শ্রীপুলীনবিহারী দেব, ডাক্তার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পালিত, শ্রীজানকীনাথ চৌধুরী, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্র বিলাসীপাড়া, জনৈক ভদ্রলোক শ্রীপূর্ণচন্দ্র শশিভূষণ দত্ত, শ্রীসুকুলচন্দ্র বর্ম্মণ তহশিলদার মহামায়ার স্থান, শ্রীপ্রিয়কান্ত মিত্র বগড়ীবাড়ী তিনআনী, শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী উকিল ধুবড়ী, শ্রীশশিমোহন দত্ত উকিল ধুবড়ী, শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা হেড্‌ মাষ্টার ধুবড়ী হাইস্কুল, শ্রীভবানীকান্ত দাস উকিল ধুবড়ী, শ্রীঅপূর্ব্বকুমার ঘোষ উকিল ধুবড়ী, ৺ভূমিধর রায় উকিল ধুবড়ী, রায় বাহাদুর শ্রীব্রজমোহন দত্ত ধুবড়ী, শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ সেনগুপ্ত বাইস্কোপ কোং বগড়িবাড়ী, শ্রীমুকুন্দনারায়ণ বড়ুয়া গৌরীপুর, শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রাইভেট সেক্রেটারী গৌরীপুর ষ্টেট, ডাক্তার শ্রীরামলোচন দাস গৌরীপুর, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ নাজির গৌরীপুর ষ্টেট, শ্রীলালমোহন ঘোষ এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ঐ, " শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তহশিলদার খাগড়াবাড়ী ডিহি, " জানাথবন্ধু তরফদার তহশীলদার খাগড়াবাড়ী কাছারী পর্ব্বতজোয়ার ষ্টেট, " নীলকান্ত শর্ম্মা বড়ুয়া কন্‌ট্রাক্টার ফ্রেঞ্চাই, " গোবিন্দচন্দ্র দাস হেড্‌ পণ্ডিত কৃষ্ণাই উচ্চ প্রাইমারী স্কুল, " " গৌতানাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণাই বাজার, " দুর্গানাথ শর্ম্মা বড়ুয়া গৌহাটী উজানীবাজার।

সংগৃহীত—জেল রোড হইতে ৬৸৹, লাবণী পট্টীতে ১৯৷৹, কৃষ্ণাই ডিহিতে ২৷৹, পাঁচআনীর আমলাগণ ১৷৹, ধুবড়ীতে ১৷৹, তিনআনী কাছারীতে ।৶৹, পর্ব্বতজোয়ার ।৴৹ বগড়ীবাড়ী ৷৹ ।



ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

১২শ বর্ষ | আশ্বিন | প্রথম খণ্ড
সমষ্টি সং ১২৮ | | ষষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী

—*—

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য)

—*—

ত্বয়া হৃত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা,
শরীরার্দ্ধং শম্ভোরপরমপি শঙ্কে হৃতমভূৎ।
তথা হি ত্বদ্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং,
কুচাভ্যামানম্রং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্॥

হরের মা বাম-বপু হরি তব তৃপ্ত নহে হিয়া,
আধখানি ছিল বাকী, তাও বুঝি নিয়াছ হারিয়া;
তাই তোর ত্রিনয়ন, ছায় তনু অরুণ আভায়—
দুটী স্তনভারে নতা—বাঁকা শশী মুকুটে লুকায়।

জগৎ সুজে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে,
তিরস্কুর্ব্বন্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ স্থগয়তি।
সদাপূর্ব্বং সর্ব্বং তদিদমনুগৃহ্লাতি চ শিব-
স্তবাজ্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োর্ভ্রূলতিকয়োঃ

কোটায় ভুবন ধাতা, রাখে হরি, রুদ্র করে নাশ,
অচঞ্চল তনু ঈশ চেয়ে থাকে নয়ন উদাস;
নিখিলে জড়ায় শিব—এ সবার কোথা হতে সুরু?—
আজ্ঞাছলে যবে তোর কেঁপে ওঠে দুটী বাঁকা ভুরু।

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা।
তথা হি ত্বৎপাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে,
স্থিতা হেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ॥

আকুল হৃদয়ে যদি পূজি তোর ও রাঙা চরণ,
ত্রিগুণ ত্রিদেবতার পূজা তবে হবে অকারণ;—
তারা তো রয়েছে মাগো মণিময় তব পাদপীঠে
ঠেকায়ে মুকুটখানি চিরকাল কৃতাঞ্জলিপুটে!

বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্নোতি বিরতিং
বিনাশঙ্কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্।
বিতন্দ্রা মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্মীলতি দৃশাং,
মহাসংহারেঽস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ

বিরিঞ্চি পঞ্চেতে মিশে, হরি করে লীলাসম্বরণ,
অতলে কুবের ডুবে, মরণেরও ঘটে যে মরণ;—
তন্দ্রাহীন ইন্দ্র-আঁখি সারি সারি মুদে মহা ঘুমে
সে প্রলয়ে জাগে সতি পতি তব সুধামুখ চুমে!

সুধামপ্যাস্বাদ্য প্রতিভয়জরামৃত্যুহরণীং,
বিপদ্যন্তে বিশ্বে বিধিশতমখাদ্যা দিবিষদঃ।
করালং যৎ ক্ষ্বেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা
ন শম্ভোস্তন্মূলং জননি তব তাড়ঙ্কমহিমা॥

অরিভয়-জরা-মৃত্যু-বিনাশন অমীরস পিয়া,
বিধি বা বাসব হোন্—সুরেরও মা দুরু দুরু হিয়া!
গরাসি গরলে শম্ভু এড়ালো যে মরণ-পরশ,
তা'র মূলে আছে বুঝি মাগো তব সরস রভস।

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা,
সপর্য্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্॥

জল্পনা হবে মা জপ—শিল্পকলা মুদ্রাবিরচন,
গতি তোরে প্রদক্ষিণ—অশনে মা আহুতি-অর্পণ;
শয়নে প্রণাম তোর—সুখ যত আত্মনিবেদন—
যা কিছু আমার বলি, সকলি যে তোরি মা পূজন!

দদানে দীনেভ্যঃ শ্রিয়মনিশমাশানুসদৃশী-
মমন্দং সৌন্দর্য্যস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি।
তবাস্মিন্ মন্দারস্তবকসুভগে যাতু চরণে,
নিমজ্জন্ মজ্জীবঃ করণচরণৈঃ ষট্চরণতাম্

সৌন্দর্য্যস্তবক-চ্যুত-বিকিরিত-মকরন্দ-ধারা
মন্দারসুন্দর তোর চরণে মা লীন দীন যারা,—
অতুল সম্পদ্‌ভাগী তারা যদি হয়েছে অমর,
করণ-চরণ ছুয়ে হয়ে কেন থাকি না ভ্রমর!

—:※:—

মা!

—*:*()*:*—

মৃণ্ময়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা কল্পনা-কামনা ভূমিসাৎ হয়ে যায়—সে চিন্ময়ের আবেশ লাভ করবে বলে। আঘাতে হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে তবেই তো দিয়ে নূতন গঠন সুরু হয়। চিন্ময়ী মায়ের রাঙা পা দুখানি যে হৃদয়ে ধরে রয়েছে, তার আঁখি যত অশ্রুসজল হয়, ততই সে মাকে স্পষ্ট দেখতে পায়! বাইরের দৃষ্টিকে অন্ধ করে তবে মা ভিতর আলো করে দাঁড়ান। আজ জগৎ কি হয়ে আছে, কোথায় আছে, কেমন আছে—তা ঠিক ঠিক জানব, যদি একটীবার সকল দুয়ার রুদ্ধ করে হৃদয়ের যত কামনা, কল্পনা, ইচ্ছা, অহঙ্কার নিয়ে তাঁর পায়ে অঞ্জলি হই। আপনাকে যে দিয়ে রেখেছে, নিজত্ব যে ভুলে গেছে—তারই তরে মায়ের হৃদয় সর্ব্বদা ব্যাকুল। তাঁর আশীর্ব্বাল্য শিরে ধরে জগতে নেমে এসেছি, এ অনুভূতি যার নিরন্ত নাই, তার আমিত্বই বন্ধন। আমি থাকব—কিন্তু মায়ের আমি হয়ে। নিজকে ভোলা মানে নিজকে তাঁর বলে জানা।

*

তুমি প্রাণে যাই জাগিয়ে দাও মা, তাই বিশ্বাস করি—তোমাছাড়া আর কারো ত হতে চাই না আমি। তবে যে ভুলে যাই, তবু যে ব্যথা পাই, সে তুমি দাও বলে নয়—আমরা নিই বলে। তুমি তো মা হৃদয়ের সকল বেদনা ঢেলে দিয়েই রেখেছ—কত অত্যাচার কত নির্য্যাতন অবিরত বুক পেতে সইছ—এ অবোধ যে সে কথা জানে না। তোমার দিকে চাইবার অবসরও যে তার ছিল না—কেবল সে নিজকে নিয়ে মত্ত রয়েছে বলেই যা তোমার করুণা, তাই তার বুকে ব্যথা হয়ে বেজেছে। এ ব্যথার শেষ নাই—জগৎ জুড়ে কেউ না কেউ তোমার জন্য কাঁদছেই; শেষ হতে দিতেও চাই না—চিরকাল যেন এমনি করে কেঁদে কেঁদেই যেতে পারি—কেননা তোমায় পাবার যে আকুলতা, এ ব্যথা তারই মাতা।

ও-ও তো তোমারই এক মূর্ত্তি মা—হৃদয় জুড়ে যত বিক্ষোভ উঠছে, সবার মাঝেই যে তোমার নৃত্যের ছন্দই আমি পাই। অপরাধী সন্তানের বক্ষে যে আগুন জ্বলছে, সেই তো তাকে শুদ্ধ করবে, রিক্ত করবে—তবে না তোমায় মনে পড়বে। তবে আর তোমা ছাড়া কি আছে জগতে? যা আছে, আলো-আঁধার, ভাল-মন্দ, সুখ দুঃখ, সবার মাঝেই যে তুমি কি এক বাঁধন দিয়ে রেখেছ—যাকে ধরি, সেই যখন মিলিয়ে যায়, তখন তোমার কোলেই ফেলে দিয়ে যায়। এ বাঁধনে বাঁধা আছি জেনে কত বড় মুক্তি যে পেয়েছি, অনুতাপ আর ব্যর্থতার জগদ্দল পাথরটা কত হাল্কা যে হয়ে গেছে, ভাবলে অবাক্ হয়ে যাই। আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারি না—তোমার অধীন না হয়ে কেমন করে আবার স্বাধীন হওয়া যায়—আর সে স্বাধীনতায় সুখই বা কিসের?

*

যদি তুমি নাই দেবে, তবে এমন কাঁদাবে

কেন? কাঁদিয়ে দাও বলেই যা আমরা পাই শুধু তাকেই পাই না—তার চেয়ে এমন অনেক কিছু বেশী পাই, বাস্তবিক যার অভাবেই হৃদয় কাঁদ্‌ছিল; কল্পনায় যাকে নির্দ্ধারণ করেছিলাম, ভাষায় যাকে প্রকাশ করেছিলাম, সে তার চেয়ে অনেক ছোট, অনেক তুচ্ছ। জগতে আমাদের যা প্রকৃত অভাব, তার যে প্রকাশ হয় না এবং তা যে চিরন্তন সত্য—তা বুঝি তখনি। বাস্তবিক যা দিবার তা তুমি দিয়েই রেখেছ—তবে যে কেঁদে মরি, যা সত্য, তা সহজ হবে বলে।

※

কি দিয়ে তুমি কি কর, কিছুই জানি না—কেবল প্রাণের ব্যাকুলতাতেই তোমাকে বিশ্বাস করি। এই যে হৃদয় জুড়ে তোমার আকর্ষণ—তোমাকে দেখ্‌লে, তোমাকে ভাবলে এই যে প্রাণের অব্যক্ত আবেগ—এর চেয়ে সত্য হয়ে আর কখনো তো তুমি ধরা দাও না মা! দেখা দেবে কি না জানি না—জান্‌তেও চাই না—কেন না তা আমার কল্পনার অতীত। কেমন করে কোন্ বেশে এলে আমার ভাল লাগ্‌বে, তা তুমিই জান—সে ভাবনায় আকুল হওয়ার চেয়ে নিজের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। ভাল এই জন্যই বলি যে, চিরকাল তুমি ঐ রূপেই হৃদয়ে এসেছ—আমার শক্তির উপর বিশ্বাস আর তোমার উপর দাবী যখন এক হয়ে গিয়েছে, তখনি তোমায় পেয়েছি। কি আর বল্‌ব মা—বলে যে শেষ হয় না—প্রাণে শুধু এই ধ্বনিই উঠ্‌ছে—মা, মা! তুমি আছ—এত নিকটে আছ যে ধারণাই কর্‌তে পারিনি। যখন সব ভুলে গিয়ে চরণে মিশে যাব, তখনি পাব।

সে দিন কি আসেনি? তা জানি না—কিন্তু জানি আস্‌বে। এমন একদিন জীবনে হবে, যখন বুঝ্‌ব, চিরকাল তোমার চরণে লীন হয়েই আছি—লীন হয়েই থাক্‌ব। আমাকে তখন আর জগৎ থেকে আলাদা ভাব্‌ব না—জগতের সবার সুখেই আমার সুখ, সবার পাওয়াতেই আমার পাওয়া হবে।

※

কেবল তোমারি প্রতীক্ষায় নিয়ত ব্যাকুল কম্পিত হৃদয়—এ-ই তো আমার আনন্দময় জীবন। তোমার স্তন্যামৃতধারা যে চিরতরে সন্তানের অন্তরে অন্তরে প্রবহমান—যাকে তুমি জানিয়ে রেখেছ, সে-ই এ কথা জানে। যে যা আস্‌ছে, তাই মিলিয়ে যাচ্ছে, অটুট রয়েছে শুধু এই আনন্দের আবেশ—তোমার হৃদয়ে আমার হৃদয়ে যে নিবিড় রসের বন্ধন, তারই স্মৃতির উন্মাদনা—ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের মত্ততার চেয়ে, যার অনুভূতি কোটীগুণ তীব্র, অনুপম উজ্জ্বল। এ আনন্দ হতে জগতের কাউকে বঞ্চিত হতে হবে না—বঞ্চিত হবার পথও নাই। কেননা জানি, জগতে এ দুই-ই সত্য—এক তুমি, আর এক আমি; আমি যদি আমার বাধা না হই, নিজের মতলববাজীর চেয়ে আদর্শের আদর, তোমার আদেশের গৌরব যদি আমার কাছে বেশী সুখের হয় তবে তোমাকে আমি অবাধে পাব। এমন আপদ জীবনে আস্‌বে না, যা তোমা থেকে আমাকে চিরতরে বঞ্চিত করতে পারে।

※

আজ সে বুঝি, ব্যাকুলতার পরেও একটা স্থির অনুভূতি আছে। মায়ের আসন সেই খানে। তাঁর দিক থেকে যা আকর্ষণ, আমাদের প্রাণে তাই ব্যাকুলতা ব্যাকুল হয়ে

চাইতে চাইতে একদিন গিয়ে সেই অনুভূতির রাজ্যে মায়ের কোলে গিয়ে পড়ব—এই জীবনের যা কিছু সাধনা, তারই লক্ষ্য এই আত্মসমর্পণ। মায়ের কোল ছেড়ে এসে অসার আমোদে মেতে আছি—তাই শান্তি পাচ্ছি না। মা-ও যে আমার ভাবনাই ভাবছেন—তাই অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতার স্পন্দন উঠ্‌ছে। এই ব্যাকুলতাই পন্থা। এই পন্থা ধরে চল্‌তে চল্‌তে যতই স্বার্থ ভুলব, ততই অগ্রসর হব।

*

তিনি নির্ব্বিশেষরূপে জগদ্ব্যাপিনী হলেও বিশেষ বাসরে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। এই একটী দিনে একটী মুহূর্ত্তের তরে কত কোটী হৃদয়ের যে ভুল ভেঙ্গে যায়, কত কোটী কণ্ঠ যে একই মুহূর্ত্তে "মা মা" রবে ধ্বনিত হয়ে উঠে, কোটী হৃদয়ের আবেগ ঘনীভূত হয়ে যে অব্যক্ত ভাবের সৃষ্টি করে—এই অনুভূতিতেই মায়ের বিশেষ পূজা। সেদিন আমি আমারই হৃদয়কে জগন্ময় ব্যাপ্ত দেখতে পাচ্ছি—মা সেদিন যেমন আমার, যুগপৎ তেমনি আমাদের। একা ডেকে যখন তৃপ্তি পাই না, বিশ্বের যত ভক্ত, অনুভবে তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে তখন ডাকি। এই মিলনের আয়োজনই পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার।

*

না গো, এই তরুণ হৃদয়ের তৃষিত আবেগ কবে সার্থক হবে—কবে প্রাণের ব্যথা তোমার শান্তিময় পরশ পেয়ে ধন্য হবে! পলে পলে আত্মপরাজয়ের যে বেদনা প্রবর্ত্ত সাধকের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেই আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করে, তার পেছনে তোমার অমোঘ অঙ্গুলীসঙ্কেত, স্নেহমমতাময় দৃষ্টির কিরণ-সম্পাত করে আমি প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারব!

*

জোর করে, পেছনে আমি দাঁড় করিয়ে তোমার নাম মুখে আনব, তোমার পূজা করব—এতেই তো আমার জীবনের সার্থকতা নয়। তা যদি হত, তবে কেন প্রাণে এমন উদ্বেগ আসে? নাম করেও সে নামকে কেন হৃদয়ের বাণীরূপে পাই না—তোমার নামও তো কখন কখন বর্ণসমষ্টিমাত্র হয়ে ভাষা-ভারে চিত্তকে আক্রান্ত করে রাখে। এমন কেন হয়? কেন তোমার কথা ভুলে গিয়ে অবিশ্বাসের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়ি? তোমাকে ডাকা, তোমাকে ভাবা যদি আমার স্বভাব না হল, তোমায় পেয়ে আত্মহারা যদি না হলাম—সে শক্তি তুমি না দিলে তো আমাকে ধরে রাখতে আমি পারব না। আমার সকল অশক্তির মাঝেই তোমার মহাশক্তি সঞ্চারিত হবে—আমাকে আমি যতটুকু তোমার উপর ছেড়ে দেব, ততটুকুর ভারই তুমি নেবে—এ বিশ্বাস, এ ভরসা প্রাণে কেন দিয়েছ, যদি আশঙ্কায় চিরকাল তা কণ্টকিত হয়েই থাকবে? আর আমি আমি ভাল লাগে না—একবার তোমার বজ্রআঘাতে আমিটাকে চূর্ণ করে দাও মা।

*

জীবনের সাধ-আহ্লাদ, কল্পনা-জল্পনা সকলি বিসর্জ্জন দিয়ে আমি যেন শুধু তোমার হয়ে থাকতে পারি—এই আমার হৃদয়ের সাধ। কোন বাঞ্ছাই তো তুমি অপূর্ণ রাখনি মা—আমার প্রয়োজন আমি কতটুকু বুঝি—

যা না চেয়েছি, তাও তো তুমি আমার সময়ে সবি দিয়েছ। সন্তানের প্রাণে মঙ্গলময়ীরূপেই যে তুমি বিরাজিত আছ—তবে কেন এমন আশঙ্কা, নিজের জন্য নিজের কেন এমন ব্যস্ততা? আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরেও কি আর কোন ইচ্ছা ক্রিয়া করে না? যে ইচ্ছা যখন আমার মাঝে আমি ছিল না, তখনো তাকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে এনেছে? আমার এ অহঙ্কার কয় মুহূর্ত্তের জন্য? মুহূর্ত্তের আঘাতে যখন সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, গর্ব্বোদ্ধত উচ্চশির যখন তোমার আদেশের পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, তখন কোথায় থাকে এ আমির উচ্ছ্বাস, কোথায় থাকে কল্পনার অভিলাপ? মিথ্যা আমিটাকে এত বিশ্বাস করতে পারি, আর তুমিরূপ সত্য যে আমির অন্তরে ধ্যানস্তিমিত শান্ত সমাহিত হয়ে রয়েছে পলকে পলকে যার শক্তি মাতৃস্তন্যের মত নীরবে ক্রিয়া করে জীবনের ভিত্তি সংগঠন করে আসছে, তার উপর বিশ্বাস করতে পারি না? আমি যদি আমাকে ছেড়ে দিই, তবু তো তুমি বুকে করে রাখ—তাতেও তোমার মহিমা বুঝতে পারি না?

*

ঐ কেমন রহস্য? কেন নিজের উপর এমন আকর্ষণ? এ আকর্ষণকে যে আরো তলিয়ে নিজেরই ভিতরে তোমাতে সমর্পণ করতে হবে; এ নইলে তৃপ্তি নাই—তৃপ্তি থাক্ না থাক্, এ না করে যে আমি পারব না জানি। বারবার আঘাতের করুণ স্পর্শ দিয়ে তাই যে তুমি জানিয়েছ মা। দুঃখ যে আমার জীবনে তোমার দেওয়া কত বড় সুখ, এ থেকে তাই বুঝেছি। দিনের পর দিন তোমার কৃপা এই বোধের ভিতর দিয়েই চিত্তে উজল হয়ে উঠছে। দুঃখই জীবনকে সত্য এবং সহজ প্রশান্তির অধিকারী করে তুলছে। মাগো, তোমার কৃপা যে জীবনে কত রূপে লীলাময়, ভেবে অবাক্ হয়ে যাই, পুলকে মন-প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আমি কিছুই হারাইনি মা—শুধু হারিয়ে ছিলাম তোমাকে। আমার যা হারিয়েছে ভেবে মনের দুঃখে একদিন কাতর হয়েছি—আজ দেখছি, সে ক্ষতি আমার ক্ষতি নয়—পরম প্রাপ্তি; বঞ্চনা নয়—চরম তৃপ্তি। নিজে থেকে তোমার পূজা করিনি বলে জোর করে তুমি পূজা করিয়ে নিয়েছ;—সর্ব্বস্ব যদি আমার গিয়ে থাকে, তবে তোমার চরণোদ্দেশেই গিয়েছে, আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষার বলি অঞ্জলি হয়ে তোমার চরণেই শোভা পেয়েছে।

*

আমাকে আমার করে সুখ নহি মা—তোমার করেই সুখ। তোমার ভাবে অন্তর পূর্ণ করে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া, বিশ্ববাসী ভাইদের তোমার জ্ঞানে জানা, তোমার প্রেমে পাওয়া—এই মা তোমার পূজা। পূত একাগ্র চেষ্টার ইন্ধনে, অনির্ব্বাণ তপস্যার অনলে আত্ম-সংস্কার করে নেওয়া—এ শুধু সেই শক্তিই লাভ করবার জন্য, যে শক্তিতে যথার্থভাবে তোমার পূজা করা যায়। করুণাময়ি জননি, আমার এই স্বপ্ন—আত্মনিবেদনের আনন্দই যেন আমার জীবনের সর্ব্বস্ব হয়, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে অবিরত তোমার পূজাই যেন আমার জীবনে জীবনীশক্তিরূপে বিরাজ করে। ওঁ শান্তিঃ!

প্রেম ও কর্ম্ম

—:{*}:—

জগতে কর্ম্মও আছে, কর্ম্মবিরতিও আছে। যথার্থ সুখ কর্ম্মবিরতিতে না কর্ম্মের পরিপূর্ণতায়, এ কথা প্রচণ্ড কর্ম্মীও স্বীকার করবে। তবু লোক কর্ম্ম করে—করে হাঁপিয়ে মরে; এ শুধু কামের তাড়না। কামই কর্ম্মকে সঞ্জীবিত রেখেছে। ভোগ কামের অধীন নয়। কামের পরপারে কর্ম্মবিরতির উদার আশ্রয়েই ভোগের উন্মেষ। ভাবুকের মন সংসার কোলাহল হতে দূরে থেকে একান্ত বিবিক্ততার মাঝে আনন্দের আস্বাদ পেতে চায়; তার মূলে এই অনতিস্ফুট অপ্রাকৃত বেদনা। কর্ম্মগ্রস্ত তার মাধুর্য্য বুঝতে পারে না। কামের তাড়নায় কর্ম্মবিকারে যে উদ্ব্যস্ত, তার ভোগের অবসর কোথায়? অরুণোদয়ের সলাজ হাসি, সৌরকরোজ্জ্বল ধরণীর যৌবনদীপ্তি, সন্ধ্যার করুণ বৈরাগ্য—সব তার চোখের সামনে অপরূপ মায়া বিস্তার করে চলে যায়—কিন্তু সে যে অন্ধ; ভোগের উপকরণ থাকলেও কামুকের ভোগসামর্থ্য কোথায়?

কিন্তু কর্ম্মও তো জীবনের একটা সত্য; শুধু কর্ম্মবিরতিতে বিশ্রাম করা তো সম্ভব নয়। বিশ্রাম আর জড়তা—দুয়ের সীমা নির্দ্দেশ করবে কে? ভগবান্ সৌন্দর্য্যও সৃষ্টি করেছেন আবার কর্ম্মও সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ মানুষের কথাই বলছি—কত্ত ধাঁধার মাঝেই তাকে দিন কাটাতে হয়। যেমন শুধু কর্ম্ম নিয়ে থাকলেও চলে না, তেমনি শুধু সৌন্দর্য্য উপভোগ নিয়ে থাকলেও চলে না। দুয়ে সামঞ্জস্য হলে তবে জীবনে রসের সঞ্চার হয়। কি করে তা সম্ভব?

প্রথমতঃ কর্ম্মের বিষ নষ্ট করতে হবে। লক্ষ্য যখন ইন্দ্রিয়প্রীতি, আত্মা যখন দেহের আবরণে আবৃত, তখন কামের তাড়নায় কর্ম্ম —এ কথা সত্য। কিন্তু আত্মার উদ্বোধনে কর্ম্মের রূপান্তর হয়। লক্ষ্য যেখানে পরার্থপরতা, আত্মা যেখানে অনাবৃত মহিমায় ভাস্বর—কর্ম্ম সেখানে অভাবের তাড়না হতে প্রসূত নয়, কর্ম্ম তখন স্বভাবের প্রেরণায় উৎসারিত। এই কর্ম্ম সেবা; সেবা স্বভাব, অতএব মুক্তির সিংহদ্বার, বন্ধনডোর নয়। এমনি কামনাহীন নির্লিপ্ত কর্ম্মের জোয়ারে যে ভেসে চলেছে, তার ভোগের স্বরূপ ও উপায় কি? সেই কথাই এখন বিচার্য্য।

কাজের তাগিদ যখন জোরে আসছে, তখন সৌন্দর্য্যভোগের স্পৃহাকে যদি অন্তরের মাঝে তলিয়ে দেওয়া যায়, তবে একটা অনির্ব্বচনীয় রসের আস্বাদন পাওয়া যায়। একটা লৌকিক উদাহরণ দিই। ঘরের বউ ঘরকন্নার কাজ করছে, আবার তারই মাঝে এক ফাঁকে বরের সাথে চোরাচাউনীর বিনিময় হয়ে গেল, ঠোঁটের কোনে হাসির বিদ্যুৎ চমকে গেল। যাঁদের মাঝে হৃদয়ের বন্ধনই সত্য, অন্তরে অন্তরে যারা পরস্পরকে স্নেহের পাকে জড়াতে পেরেছে, অমন মিষ্টি হাসির সাথে চোরাচাউনী তারাই হানতে পারে। তখন শুধু মুখোমুখী একান্ত নির্জ্জনে পরস্পরকে পাওয়া নয়—এ পাওয়া তার

চেয়েও গভীর; তাই চোখের চাওয়া ক্ষণিকের হলেও সেই পুলকে সমস্ত প্রাণ কেঁপে ওঠে। কেননা পাওয়া তখন বাইরকে ছেড়ে অন্তরকে স্পর্শ করেছে। বুকের মাঝে এমনি করে পেলেই বাইরের পাওয়ার জন্য আর ব্যাকুলতা হয় না। তখন বাইরের একটুখানি ছোঁয়াচ অন্তরের স্পর্শমণির স্পর্শে সোণা হয়ে ওঠে।

কর্ম্মের মাঝেও ভাবের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে ঠিক এমনি করেই পেতে হবে—সংসারের ব্যস্ত কোলাহলের মাঝে রসিকযুগলের চোরা চাউনীর মত। তাই তো বলি, চোখের পাওয়ার চেয়ে বুকের পাওয়া বড়! এরই একটা প্রাকৃত দিক দেখ। নরনারীর মাঝে দৈহিক আসঙ্গলিপ্সা আছে এবং তার তাড়নাও নিতান্ত কম নয়। এই আসঙ্গলিপ্সাকে যতই হীন চোখে দেখি না কেন, স্বীকার করতেই হবে, এর মাঝেও দেহের অতীত একটা কিছু আছে। কামের পাংশুজালে প্রেম আচ্ছাদিত রয়েছে, সেই তো রসের যোগানদার। এ কথা সত্য, যারা কামুক, তারাও এই প্রেমকেই চায়; অমৃতের লোভী তারাও, তবে কিনা এঁটো শানকী পেতে তা পান করতে চায়। যারা দেহমুগ্ধ, তারা দেহ দিয়েই প্রেমের তীব্রমধুর আস্বাদন পেতে চায়; তাই সাধারণ নরনারী ভালবাসায় পরস্পরের দেহের নৈকট্য খোঁজে। অবশেষে এই নৈকট্য রমণ-সুখে পর্য্যবসিত হয়।

এ-ও প্রকৃতির খেলা। প্রেমের সাধনা করতে গিয়ে যখন আমরা তার কাম-পরিণতিটাই বড় নজরে দেখি, তখনি তো ভুল হয়ে যায়। তখনই বুকের ভাবকে চোখের পিপাসায় নামিয়ে আনি—আর সেই হতে জ্বালা সুরু হয়ে যায়। স্বচ্ছন্দ কর্ম্মের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাতও এইখানে। কর্ম্মস্রোত আর সহজভাবে তখন বইতে চায় না—সবার পেছনে একটা স্বার্থ, একটা লালসা প্রচ্ছন্ন থেকে কর্ম্মকে কেবলি বক্র করে তোলে। আত্মস্বার্থে মানুষ তখন নির্জ্জনতা খোঁজে—কোলাহল এড়িয়ে যেতে চায়। এ তো স্বার্থপরতা—আত্মঘাতেরই নামান্তর।

বাইরের পাওয়াটা বিকার, ভিতরের পাওয়াটা সত্য, এই বোধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জন্মাবে, ততক্ষণ শান্তি নাই, তৃপ্তিও নাই। কর্ম্মের বা কামের অধঃস্রোত বেয়ে প্রাকৃত মানুষ নেমে যায়। নরনারীর আসঙ্গেই দেখি, ভাব হতে রূপ—রূপ হতে হাব, লীলা, বিলাস এবং পরিশেষে অঙ্গসুখ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি—এই হল প্রাকৃত ভালবাসার পরিণতি। প্রেমে নববাসরের সুরু রমণে তার চিতারোহণ। কামতৃপ্তিতে এক পর্ব্ব শেষ হলে আবার গোড়া হতে প্রেম দিয়েই অভিনয় সুরু হল। কবীরের ভাষায় এমনি "কৌড়ীকে ফেকামে অনমূল জীবন" মাটী হয়ে যায়। আর যে পর্য্যন্ত সবটুকু নিঃশেষে ধ্বংস না হয়ে যায়, সে পর্য্যন্ত মানুষের কামনার শান্তি নাই।

কিন্তু রসিক সাধক চলে বিপরীত পথে, তাকে উজান বেয়ে যেতে হয়। শুধু রূপকের কথা নয়—সত্যি কথা এই যে রমণসুখ তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। একটু চাউনী, একটু স্পর্শ—এই তখন হয় বিলাসের চরম। অর্থাৎ ওটুকু উপলক্ষ্য মাত্র। বাইরের ওইটুকু সূত্র ধরে অন্তরে তখন রসের লীলা চলতে থাকে—আর সে লীলার সীমা পরিসীমা থাকে না। এই হল অধ্যাত্মরমণ বা রাসলীলা—এতে তাড়না নাই,

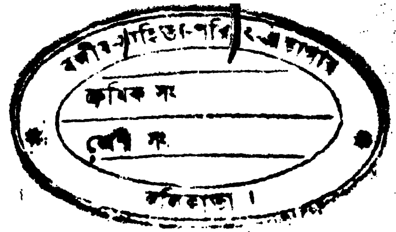
প্রেরণা আছে—এ স্বভাবের স্ফূর্ত্তি, অভাবের বিক্ষোভ নয়। আর কামের শেষ আছে, প্রেমের তো নাই। সেই চোরা চাউনীর কথাই মনে করে দেখ না কেন। একটী চাউনীতে বুকে যে ঢেউ উঠল, তার আর শেষ নাই; প্রিয়তমের বুকের কূলে আঘাত করে আবার তা তারই বুকে ফিরে আসবে—আর এমন করে অনন্তকাল ধরে দুকূল ছেপে ঢেউএর দোল খেলতে থাকবে—যদি এর মূলে কাম-গন্ধ বা দেহপ্রীতি না থাকে। যেখানে দেহগন্ধ মোটেই নাই, অথচ প্রেম আছে, সুখ আছে—সেখানেও দুয়ের শেষও নাই। ভালবাসা যদি দেহ আশ্রয় করে থাকত, তাহলে দেহের সঙ্গে সঙ্গে তারও শেষ হত। কিন্তু প্রেম নিরাশ্রয়, অতএব অমর। তবে সে যে দেহ আশ্রয় করে, কখনও বা দৃষ্টিতে, স্পর্শে চুম্বনে, আলিঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করে—এ তার বিলাস! প্রেম যেখানে আত্মার আশ্রিত, সেখানে এই চুম্বনে আলিঙ্গনে দেহ ধন্য হয়ে যায়—রাজার করুণাকটাক্ষে প্রজা যেমন ধন্য হয়। তা না হয়ে এই যে প্রাকৃত কামলীলায় দেহের হুকুমে রাজসিংহাসন ছেড়ে প্রেমকে নেমে আসতে হয়েছে, ভেবেছ কি এই অমর্য্যাদার কোনও শাস্তি নাই?

হে ভাবুক, এই ভাব তোমার কর্ম্মে আরোপ কর। প্রেমে যেমন দেহ আর আত্মার সন্ধি হয়েছে—তোমার ভাবে আর কর্ম্মে তেমনি সন্ধি হোক। তোমার আনন্দলোলুপ চিত্ত নিরন্তর ভাবোন্মুখ হয়ে থাক্—সেবার অন্তরালে মুহূর্ত্তের দৃষ্টি বিনিময়ে অনন্ত চিদাকাশ ব্যাপে সুখের হিল্লোর জ্যোতির লহরে লহরে কেঁপে যাক্—তুমি ধন্য হবে, জগৎ তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে।

যদি ভালবাসতে চাও, তবে দেহমনবুদ্ধির সংস্কার দিয়ে প্রিয়জনকে চেও না। আজ ওদের ভাষাই তোমার কাণে বাজছে, কিন্তু এই ভাষার আড়ালে আত্মার যে ভাব অব্যক্ত রয়েছে, তুমি তাকেই ব্যক্ত করতে চেষ্টা কর। আজ যদি রূপলালসা বা স্পর্শলালসার আকারে প্রেম তোমার মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তুমি তাই তার চরম দান মনে করো না—রূপ ও স্পর্শকে অতিক্রম করে তুমি ভাবে পৌঁছাবার চেষ্টা কর। বস্তুকে অর্থেও পর্য্যবসিত কর—ভাবের সন্ধান পাবে। ক্ষুদ্র সংস্কারে আবদ্ধ থেকো না—সমস্ত সংস্কারকেই ব্রহ্মের আনন্দচেতনা রূপে প্রত্যক্ষ কর।

জগতে যা কিছু সমস্তই ভাবের প্রতিমূর্ত্তি। দেহ ইন্দ্রিয় মনের সংস্কার নিরপেক্ষ থেকে শুদ্ধ ভাবকে ধারণা করতে শেখ, দেখবে একটুখানি চোরা চাউনীতে বুক কেঁপে ওঠে কিনা। এই হল সহজ জীবনের সিদ্ধি—কর্ম্মের মাঝেই কর্ম্মবিরতির অমৃত আস্বাদন—এই আধারেই প্রেমের পরম প্রকাশ।





ভক্তির শ্রেষ্ঠতা

সমস্ত সাধনপথের মধ্যে ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠ, এই কথা অবিসংবাদিত না হইলেও এক সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের কথা বটে। ধীরচিত্তে আমাদিগকে এই কথার যথার্থতা নিরূপণ করিতে হইবে।

আর্য্যসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মাঝে যথাক্রমে চারিটী সাধনার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে আমরা দেখিতে পাই—কর্ম্মের প্রাধান্য। যাগযজ্ঞ, মন্ত্র, দেবতা ইত্যাদি লইয়া সাধনার এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। তারপর কর্ম্মপন্থা মলিন হইলে কিম্বা তাহারই পরিপূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপন্থার উন্মেষ ও পরিপুষ্টি হইয়াছে। বেদনির্দ্দিষ্ট সনাতন পথ এই দুইটী লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড তাহার সাক্ষী। উপাসনাকাণ্ড নামে তৃতীয় কাণ্ডের অস্তিত্ব অনেকে প্রমাণ করেন বটে, কিন্তু নানা কারণে উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপরোক্ত দুই কাণ্ডেরই পোষক বলিয়া মনে করি। সে যাহা হউক, বেদনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানপন্থার বিশ্লেষণে অথবা বৈদিক জীবনযাপনপ্রণালীর শৈথিল্যে তৃতীয় যুগে এক অভিনব বিচারপন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বেদে ইহার বীজ থাকা সত্ত্বেও সাধনপ্রণালীতে উহা বৈদিক সনাতন রীতি হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। মহর্ষি কপিল উহার প্রবর্ত্তক। বৃত্তির অন্তঃসঙ্কোচদ্বারা আত্মতত্ত্ব নিরূপণই ইহার লক্ষ্য। এই দর্শনের যে অংশ বিচারের সহিত যুক্ত রহিয়াছে, তাহা সাংখ্য এবং যাহা সাধনার সহিত যুক্ত, তাহা যোগ নামে পরিচিত। লক্ষ্য হিসাবে উভয় পন্থার পার্থক্য বড় অল্প। তাই সংক্ষেপে আমরা উভয়কে যোগমার্গ বলিয়াই অভিহিত করিব। পৌরাণিক যুগের আদিভাগে এই যোগবিদ্যার বহুল প্রচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। কালে যোগবিদ্যা ম্লান হইয়া আসিলে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হয়।

বর্ত্তমান যুগে ভক্তিধর্ম্মেরই জয়জয়কার। কালিক পরিণতি অনুসারে উহাই আজ আমাদের জাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাণের আত্যন্তিক স্ফুরণ ব্যতীত কর্ম্মপথে সিদ্ধিলাভ সহজ নহে; বিশেষতঃ কর্ম্মপথের সফলতা সমস্ত সমাজের সার্ব্বভৌম একমুখী শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তন্ত্রের মাঝে কর্ম্মাদর্শের একটা অন্তঃসলিলা ক্ষীণধারা আমাদের দেশে আজও বহিতেছে বটে, কিন্তু বেদপন্থী সমাজের শাসন শ্লথ হইয়া যাওয়ায় জাতীয় ধর্ম্মরূপে কর্ম্মপন্থাকে আবার সঞ্জীবিত করিয়া তোলা একরূপ অসম্ভব। ঔপনিষদ জ্ঞানেরও আজকাল মৃদুমন্দ প্রচার আছে বলিতে পারি। কিন্তু মানুষের দেহ অশক্ত, মেধা নিস্তেজ, প্রতিভা ম্লান, বৃত্তি অসংযত ও বহির্ম্মুখী, তাই ঔপনিষদ জ্ঞানের সুতীব্র সোমরস এ যুগের ধাতে সহিবে না। যোগপন্থার দিকে লোকের আগ্রহ দেখা যায় বটে, কিন্তু সে শুধু অলৌকিকের প্রতি কৌতূহলবশতঃ। বস্তুতঃ

যোগের উপযোগী দেহসামর্থ্য, শ্রদ্ধা ও উৎসাহ প্রায় কাহারও নাই। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের পক্ষে যোগেরও তাদৃশ উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিশেষন্যায়ে অগত্যা ভক্তিধর্ম্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

• •

ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেকপ্রকার বাদবিতণ্ডা চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে। কিন্তু বস্তুগত্যা কোনও পথের শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা একটা আপেক্ষিক তথ্য মাত্র। সকল যুগে সকলের পক্ষে একই সাধন কখনও উপযোগী হইতে পারে না। সাধন জগতে অধিকারিভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। যে সাধনায় যাহার অধিকার, তাহা অবশ্যই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। এ কথা বুঝাইবার জন্য অধিক বাক্‌বিতণ্ডার কি প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা আমার পক্ষে উপযোগী, তাহা অপরের পক্ষে উপযোগী না-ও হইতে পারে। কিন্তু সে কথা না বুঝিয়া যদি আমার পথের সহিত অপরের পথের তুলনা করিয়া আমারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাই, তাহা হইলে তাহাতে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। তবে আমার পথ অধিকাংশের পথ, অতএব যুগোপযোগী, এবং সেই হিসাবে অন্যান্য কষ্টসাধ্য পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ যুক্তি চলিতে পারে বটে। যেখানে সাধনার ফল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ এবং উদাসীন, সেখানে একমাত্র সংখ্যাবাহুল্যের দাবী ছাড়া আর কোন্ দাবীতে যে জিতিয়া যাইব, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে; কেননা মীমাংসার সিদ্ধান্ত এই যে, যেখানে দৃষ্টফল রহিয়াছে, সেখানে অদৃষ্টের কল্পনা অনুচিত। আর এই যুগোপযোগিতার দাবী যে একটা কথার কথা মাত্র, ইহা ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইবারও তো কোনও কারণ নাই।

দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন, **সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপি অধিকতরা**—ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে অধিকতর। এই আধিক্যের তিনি তিনটী কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ **ফলরূপত্বাৎ**—ভক্তি স্বয়ং ফলস্বরূপ; দ্বিতীয়তঃ **ঈশ্বরস্য অভিমানদ্বেষিত্বাৎ**—ঈশ্বর অভিমান সহিতে পারেন না; তৃতীয়তঃ **দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ**—ঈশ্বর দৈন্য ভালবাসেন। এই তিনটী কারণ সম্বন্ধেই আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া রাখা ভাল। কোনও পথকে খাটো করা বা কোনও পথকে বাড়াইয়া তোলা সত্যান্বেষীর লক্ষ্য হইতে পারে না। অধিকারী দেখিয়া পথ নির্দ্দেশ করিতে হইবে ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কিন্তু আমরা যেরূপ অধিকারী, দেবর্ষি নারদকেও সেই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাঁহার উক্তিকে তাঁহারই পক্ষে প্রয়োগ করিতে গেলে একটু বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা আছে। আমরা জানি, সাধারণ্যে দেবর্ষি নারদের সম্বন্ধে—শুধু নারদই বা বলি কেন, অধিকাংশ ঋষি বা আচার্য্য সম্বন্ধে—একটা বিপর্য্যস্ত ধারণাই প্রচলিত আছে। আমরা ভুলিয়া যাই, ঋষিরা যুগপ্রবর্ত্তক, গুরু;—অধঃপতিত মানবসমাজের পক্ষে যে ব্যবস্থা কল্যাণকর, তাহারই বিধান তাঁহারা করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই বিধান উল্টাইয়া তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইলে তো বড় বিপদের কথা। নির্গুণপদে প্রতিষ্ঠিত আচার্য্য নিম্নাধিকারী শিষ্যকে গুণময়ী সাধনার উপদেশ

দিলেন, আর উপযুক্ত শিষ্য অমনি সন্ধান লইল, গুরুদেব স্বয়ং এখনও সেই সাধনা করেন কিনা! বর্ত্তমান সমাজে এরূপ হাস্যাস্পদ ব্যাপার মুহুর্মুহুঃ ঘটিতেছে। দেবর্ষি নারদের উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকেও আমাদের দলে টানিয়া না আনি—ইহা যেন লক্ষ্য থাকে। ভক্তির উৎকর্ষ যে যুগোপযোগিতায়, আমাদের পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত কারণ এবং দেবর্ষিও এই দৃষ্টিতেই ভক্তিধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ না রাখিলে বহু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উদ্ভব হইবে। দেবর্ষি ভক্তিধর্ম্মের আচার্য্য বা গুরু; তাঁহার স্বরূপের পরিচয় শিষ্যের অধিকার নির্দ্দেশ হইতে নয়। সে পরিচয় যদি কেহ পাইতে চাহেন, তবে তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের সমগ্র সপ্তম অধ্যায় জুড়িয়া সনৎকুমার ও নারদের যে কথোপকথন রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। দেবর্ষি নারদ যে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস সেখানে আছে। শ্রুতির প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ, ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন।

এক্ষণে বর্ত্তমান যুগে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দেবর্ষি যে তিনটী যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব। প্রথমতঃ তিনি বলিতেছেন, ভক্তি সমস্তেরই ফলস্বরূপ, অতএব শ্রেষ্ঠ। এই কথার একটী সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আছে, তাহা ফলের উৎকর্ষ বিচার করিয়া। অর্থাৎ কর্ম্মে, জ্ঞানে, যোগে যে ফল লাভ হয়, তাহাতেও মানবের পূর্ণতা হয় না, ভক্তি তাহারও পরবর্ত্তী ফল, অতএব শ্রেষ্ঠ।' এই ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ আমরা পরে করিব, কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কোনও সাধনার ফল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ ও উদাসীন, সুতরাং ফল নিয়া বিচার ও উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের বিচার অধিকার নিয়া—কেননা বর্ত্তমানে অধিকারের কথাটাই আমাদের গোড়ায় বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন। সেই হিসাবে বিচার করিলে দেখি, যুগানুক্রমিক সাধনার বিবর্ত্তনে অধুনা ভক্তিই আমাদিগের সুসাধ্য—কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ বা যোগপথ কোন পথেরই সর্ব্বাঙ্গীন যোগ্যতা আমাদের নাই। অথচ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী পূর্ব্বযুগানুষ্ঠিত সাধনসমূহের সংস্কার আমাদের মাঝে অবশ্য থাকিবে। উপযুক্ত গুরুর নির্দ্দেশানুযায়ী ভক্তির সাধনা করিলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সংস্কারসমূহ যথাকথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হইয়া পরিণামে তাহারা ভক্তিরই পরিপুষ্টি সাধন করিবে। অতএব সামান্যতঃ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের ফল যে ভক্তি, সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাই উপলব্ধ হইবে। এখন মতিবিপর্য্যয়ের যুগ; ভক্তিতে অধিকার নিরূপিত থাকিলেও কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির সংস্কার প্রবল হইয়া তাহাতে সাময়িক রুচি উৎপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং বর্ত্তমান সমাজে আমরা অহরহঃ তাহা দেখিতেও পাইতেছি। তাহাদের প্রতি দেবর্ষির এই অমৃতস্নিগ্ধ উপদেশ—

"বাছা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি বড় বড় সাধনার কথা শুনিয়া ভুলিয়া যাইও না; আমি জানি, ভক্তিতেই তোমার অধিকার, তাহাই তোমার সহজ পথ। তুমি ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া, জ্ঞান আওড়াইয়া, নাক টিপিয়া যাহা পাইবে, তাহার চেয়ে বেশী পাইবে ভক্তিদ্বারা—সমস্ত আচার তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার বিস্মরণে পরম ব্যাকুল হইয়া।"

এই কথার প্রতিধ্বনি স্বরূপ পরক্ষণেই

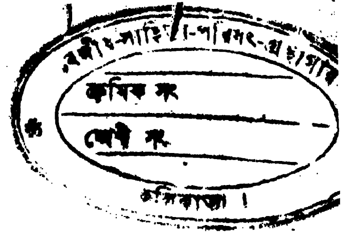
মহর্ষি আবার বলিতেছেন, "দেখ, ভগবান অভিমান সহিতে পারেন না। তুমি ক্রিয়াকাণ্ড করিবে—কোথায় তোমার বীর্য্যশুদ্ধি, ক্ষেত্রশুদ্ধি বা কায়শুদ্ধি? তুমি জ্ঞানের বুলি আওড়াইবে—কোথায় তোমার সাধনচতুষ্টয়, অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুগৃহবাস? তুমি যোগ করিবে—কোথায় তোমার দেহ-সামর্থ্য, উৎসাহ, শ্রদ্ধা, অনলসতা? তবুও যে তুমি বলিতেছ, আমি এ করিব, তা করিব—এ শুধু তোমার অভিমান। আর এই অভিমানেই তোমার অন্তরের ঠাকুর আড়াল হইয়া যাইতেছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সমস্তই পুরুষকারের পথ—ব্রহ্মীভাবের সাধনা। তুমি বীর্য্যহীন, পৌরুষের বড়াই করিলে চলিবে কেন? বামনে চাঁদের প্রতি হাত বাড়াইলে পাইবে কেন? পরম পুরুষ কখনও মিথ্যা পৌরুষের অভিমান সহিতে পারেন না। এই যুগে পুরুষত্ব প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বত্র প্রকৃতিরই প্রাবল্য। অতএব তুমিও তোমার জীবপ্রকৃতিরই অনুবর্ত্তন কর। তাহাই তোমার পক্ষে সহজ সাধনা। প্রকৃত পরম পুরুষকে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থক। তুমি প্রকৃতি ভাবাপন্ন, অতএব আত্মসমর্পণই তোমার ধর্ম্ম। অভিমান সে ধর্ম্মের বৈরী। যদি পুরুষ হইতে পারিতে, বাধা ছিল না। যাহা হওয়ার সাধ্য নাই, তাহার অভিনয় করাই তো অভিমান। সত্যস্বরূপ অভিমান সহিবেন কি করিয়া?

"স্বভাবতঃ তুমি দীন। তাহাই তোমার প্রকৃতির সত্য। সত্যস্বরূপ এই সত্যকেই ভালবাসেন। তুমি দীন হইয়া তাঁহার ভজনা কর, অভিমানে অন্ধ হইয়া প্রেমের কারবারে মেকী চালাইতে চেষ্টা করিও না—দীনের ঠাকুর তোমার এই দৈন্যের ডোরেই বাঁধা পড়িবেন।"

অন্তরে নিদারুণ দৈন্য আর মুখে প্রচণ্ড অভিমান—এই তো এ যুগের ধারা। এ হেন জীবের পক্ষে ভক্তির উপদেশ ছাড়া আর কি শ্রেয়স্কর হইতে পারে? ফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু অধিকার হিসাবে বিচার করিয়াই জীবকে বলিতে হয়, "তুমি দীনাতিদীন—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের বড়াই ছাড়—সব সঁপিয়া তাঁহার শরণ নাও, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হও, তাহা হইলে সব পাইবে। তোমার মত অধিকারী কর্ম্ম করিয়া, জ্ঞান যজিয়া, যোগ সাধিয়া আর কি পাইবে ছাই?"

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের যে সমস্ত সাধনা ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইল, সেই সমস্ত সাধনার ফলের সহিত মিলাইয়া একবার বিচার করাও প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব।





ভাব ও বস্তুর সমন্বয়

[স্বামী রামতীর্থ]

বেদান্ত ভাববাদীকে বল্‌ছেন, জগতের নামরূপ বা বস্তুর গুণ ধর্ম্ম যে বিষয়ীর স্পন্দন ভিন্ন সম্ভব নয় তোমরা বলছ, সে কথা ঠিক। কথাটা আবার বলছি। বিষয়টা ভারী গোল-মেলে, তোমরা মন দিয়ে শুনো। বেদান্ত বল্‌ছেন, "বিষয়ীর ক্রিয়া ছাড়া যে নামরূপ সম্ভব নয়, বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম যে মন বুদ্ধি বা বিষয়ীর স্পন্দনের উপর নির্ভর করে, সে কথা ঠিক। এ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ নাই। কিন্তু তুমি যে বলছ, তোমার এই ছোট্ট মনটীর বাইরে কিছুই নাই, সে কথা কিন্তু ঠিক নয়।" আবার বস্তুবাদীকেও বেদান্ত বল্‌ছেন, "ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কোনও বস্তুর ক্রিয়া মাত্র হতে যে প্রাতিভাসিক জগতের উৎপত্তি, তোমাদের এ কথাও ঠিক।" জানই তো, বস্তুবাদীরা বলেন, বাইরের কোনও বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে অভিহত করলে তবে প্রাতিভাসিক জগতের সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়ের উপর বস্তুর ক্রিয়া হয়, তাতেই আমরা দেখি। বেদান্ত বলেন, "হাঁ, সে তো ঠিক কথা; বাইরে থেকে কিছুর আঘাত না পেলে আমরা তো কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারি না। বস্তুবাদীর কথা এ পর্য্যন্ত খাঁটীই বটে। কিন্তু বস্তুবাদী, যখন বলে, বিষয়ীর স্পন্দন শূন্য বহিঃসত্তার অভিঘাত—একমাত্র এর উপরই আমাদের প্রত্যক্ষ নির্ভর করছে, তখন কিন্তু ভুল বলা হয়।" কথাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলি।

যে কোনও বিষয়ী বা বিষয়ের কথাই ধর না কেন; ধর এই পেন্সিলটা পেন্সিলটার রং এলো কোথা থেকে? হয়ত বলবে, বিষয়ীর ক্রিয়া আর বহির্বস্তুর প্রতিক্রিয়া দুয়ের সংযোগ হতে রঙের উৎপত্তি। যদি তুমি রং কাণা হও, তাহলে আর পেন্সিলের এই রঙটা দেখতে পাবে না। পেন্সিলের এই রঙটা একটা গুণ বা ধর্ম্ম। ধর পেন্সিলের ভাব আছে। তার ব্যতিক্রম হয়, রঙেরও ব্যতিক্রম হয়। চোখ যদি কামলারোগগ্রস্ত হয়, তবে পেন্সিলটার আর একটা রং দেখা যাবে। যদি এখানে এর ওজন না নিয়ে আরও উঁচুতে, কোনও গ্রহান্তরে বা খনির গর্ভে এর ওজন নিই, তাহলে সমান ওজন পাওয়া যাবে না। যে জিনিষটার ওজন লণ্ডনে নেওয়া হয়েছে, সেইটাকেই আবার ভারতবর্ষে ওজন করলে সমান ওজন পাওয়া যাবে না। ওজনের কম বেশী হয়, রঙের পরিবর্ত্তন হয়।

একই জল—শীতকালে ছুঁলে লাগে ঠাণ্ডা; আবার গ্রীষ্মকালে লাগে গরম। কেন? কারণ, অনুভবিতা বিভিন্ন তাপ-মণ্ডলে থেকে স্পর্শ করছে, অথচ এদিকে জলের তাপ প্রায় সমানই রয়েছে। তবে যে তাপের তারতম্য বোধ হচ্ছে, সে কেবল আমাদের হাতের তাপ কম-বেশী বলে। কাজেই দেখছি, বিষয়ীর প্রভেদ অনুযায়ী বিষয়ের ধর্ম্মেরও প্রভেদ হয়ে থাকে।

এখন বল দেখি, এই পেন্সিলটা কিসে তৈরী? বার্কলে প্রভৃতির মতে এটা শুধু কতকগুলি ধর্ম্মের সমষ্টিমাত্র। যদি এই ধর্ম্ম-

গুলি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে পেন্সিলের কোনও সত্তাই থাকে না। কাণ্টের মতে পেছনে বস্তুসত্তা বলে একটা কিছু আছে; প্লাটোর মতে এর পেছনে আছে একটা ভাবসত্তা। এতে ধর্ম্ম আছে। এই ধর্ম্মগুলি মূলে বিষয়ীর স্পন্দন মাত্র। কিন্তু আবার বলি, ঘাত প্রতিঘাতে এই ধর্ম্মগুলির বোধ হওয়ার পূর্ব্বেও তো কোনও বাস্তব সত্তা সেখানে ছিল। যদি বল তো কথাটা ভেঙ্গে আরও স্পষ্ট করে বলি। অবশ্য বেদান্তও বলেন যে বিষয়ীর স্পন্দনবশতঃ পেন্সিলে এই সমস্ত ধর্ম্মের উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু কথা এই, বিষয়ীর স্পন্দনই বা উদ্রিক্ত হল কেন? এই তো সমস্যা। ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত এমন কোনও সত্তা নিশ্চয়ই তা হলে ছিল, যা বিষয়ীর ইন্দ্রিয়ে প্রতিহত হয়ে তার মাঝে স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে এবং তাইতে এই সমস্ত ধর্ম্মের উদ্বোধ হয়েছে। বিষয়ীর স্পন্দনের পূর্ব্বে এই ধর্ম্মগুলি যে মনের উপর প্রতিহত হয়ে মনের কোনও ক্রিয়াকে উদ্রিক্ত করে তুলেছিল, এ কথা তো বলতে পারি না। এমন বলতে পারি যে, মনের ঘাত-প্রতিঘাতের পর যখন ধর্ম্মের উদ্বোধ হয়, তখন বাইরে এমন একটা কিছু আছে, পেন্সিলে এমন একটা বাস্তব সত্তা আছে যা তোমার চোখের উপর ক্রিয়া করে দৃষ্টির অনুভূতি এনেছে, কানের উপর ক্রিয়া করে শ্রুতির অনুভূতি এনেছে, জিহ্বার উপর ক্রিয়া করে স্বাদের অনুভূতি এনেছে বা হাতের উপর ক্রিয়া করে স্পর্শের অনুভূতি এনেছে। বাইরে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যা চোখ, কান বা নাকের উপর ক্রিয়া করছে। পেন্সিলটাকে যদি খাও, তাহলে তোমার অসুখ করবে। তবে কি করে বল যে বাইরে বাস্তব বলে কিছু নাই?

বাইরেও বাস্তব বলে একটা কিছু আছে; মানুষের ইন্দ্রিয়ে যখন তা আঘাত করে, তখন মনে তার খবর পৌছায়, মন আবার তার প্রতিঘাত দেয়। তখনি দৃশ্যপটের ওপর বস্তু-ধর্ম্মের ছায়া ভেসে ওঠে। ব্যাপারটা ঠিক এই রকম। এই একটা হাত, আর এই আর একটা হাত; এক হাতে কখনও তালি বাজে না। এই শোন, তালি বেজে উঠল (এই বলে স্বামিজী হাততালি দিলেন)। এই ব্যাপারের এক দিকে ছিল ঘাত, আর একদিকে প্রতিঘাত; ফলে হল শব্দ। একটা বেহালার তার রয়েছে; আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে, তারটা বেজে উঠল। তোমার আঙ্গুলে ছিল ঘাত, তারে ছিল প্রতিঘাত—দুয়ে শব্দ হল। এদিক থেকে একটা ঢেউ আসছে, আর একটা আসছে ওদিক থেকে—দুয়ে সংঘর্ষ হল—ফল হল ফেনা। দু'ধারের ঘাত প্রতিঘাতে ফেনার সৃষ্টি হল। এই একটা দিশলাইর কাঠি রয়েছে—আর এই একটুকরা বেলে-কাগজ; কাগজটার ওপর কাঠীটা ঘসে দাও—আগুন জলে উঠবে। এ ও তো দু'ধার থেকে ঘাত প্রতিঘাত মাত্র। বিদ্যুতের এই হল ধনাত্মক প্রান্ত, আর এই হল ঋণাত্মক প্রান্ত; দুটী যদি কাছাকাছি হল, অমনি বিদ্যুতের ফুলকী দেখা গেল—আওয়াজ হল। দু'ধারের ঘাত প্রতিঘাতে এই ব্যাপার ঘটে।

তাই বেদান্তের মতে বুদ্ধির অন্তরালে নিরপেক্ষ বস্তুসত্তা একটী আছে—তাই হচ্ছে আত্মা। তোমার মাঝে আত্মার বস্তুসত্তা—আর জগতের প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার বাস্তবসত্তা। এই পেন্সিলটাতেও সত্য আছে—যাকে তোমরা নিরপেক্ষ বাস্তবসত্তা বল, যা তোমাদের কাছে অজ্ঞেয়, যা গুণ-

ধর্ম্মের অতীত। বহির্দ্দেশে যে সত্য বা ব্রহ্মবস্তু সকলের মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, আর তোমার বুদ্ধির অন্তরালে যে ব্রহ্ম লুকিয়ে আছেন—এই দুটী যেন দুটী হাত। যে মুহূর্ত্তে তাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল, অমনি বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হল। একদিকের একটা ঢেউ আর একদিকের একটা ঢেউএ ধাকা পেল—আর অমনি গুণধর্ম্মের ফেনার সৃষ্টি হল। বল্‌তে পারি, বুদ্ধিতে আছে অস্তি-প্রান্ত, আর বস্তুতে আছে নাস্তি-প্রান্ত; দুটী প্রান্ত পরস্পর সম্মুখীন হলে গুণধর্ম্মের লীলাভূমি এই বিশ্বের রূপ ফুটে ওঠে। বেদান্তের ভাষায় দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগে বস্তুর দর্শন হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্য হচ্ছে—বুদ্ধির অধিষ্ঠিত আত্মা আর বস্তুর অধিষ্ঠিত আত্মা; দু'এর ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিভাসের সৃষ্টি।

ভাববাদীরা যে বলেন, বিষয়ীর স্পন্দন ছাড়া দর্শন হতে পারে না, সে কথা ঠিক; কিন্তু আবার এ কথাও যে বল্লেন, এই স্পন্দন স্বতঃই ফুটছে আর তাইতে প্রতিভাসের সৃষ্টি হচ্ছে, সে কথা কিন্তু ভুল। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে বিজ্ঞানের একটা অলঙ্ঘনীয় সত্যকে অস্বীকার করতে হয়। বিজ্ঞান বল্‌ছে, বিপরীত কেন্দ্রে তুল্যবল ক্রিয়া না হলে প্রতিক্রিয়াই যে অসম্ভব। তাই ভাববাদীরা যখন বলেন, বিষয়ীর স্পন্দন হতেই জগতের সৃষ্টি—তখন এ কথা তাঁরা ভুলে যান যে কোথাও প্রতিস্পন্দন না জাগ্‌লে স্পন্দনই যে হতে পারে না। কাজেই বস্তুবাদীরা যে বলেন, এই জগতের একটা বাস্তব সত্তা আছে শুধু বিষয়ীর খেয়ালের ওপর এর অস্তিত্ব নির্ভর কর্‌ছে না, সে কথাও খাঁটী। আবার তাঁদের এইটুকু কথাই শুধু খাঁটী। কিন্তু তাঁরা যখন বলেন যে এই প্রাতিভাসিক জগৎ স্বতঃই বাস্তব, এর আর অন্য কোনও আশ্রয় নাই, তখন কিন্তু ভুল করা হয়, কেননা এই যে জগতে মায়ার খেলা, ভেদের বৈচিত্র্য, গুণধর্ম্মের সমাবেশ—সমস্তই, যেমন বিষয়ীর স্পন্দনের উপর নির্ভর কর্‌ছে, তেমনি বিষয়ের বাস্তবতার উপরেও নির্ভর করছে।

এখানে একটা গুরুতর আপত্তি ওঠে। ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার কথা বল্‌ছ। কিন্তু অনন্তের মাঝে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া কি করে সম্ভব? লোকে যেমন কথায় কথায় বলে, আমরা তেমনি ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছি। কূটস্থ চৈতন্যকে যখন বুদ্ধি বা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে অনুভব কর্‌ছি, তখনই ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার কথা বল্‌ছি। যে বিষয় প্রতিক্রিয়া বা অভিঘাত সৃষ্টি কর্‌ছে, কূটস্থ সত্তা তাতেও যেমন যুক্ত, তেমনি বিষয়ীর বুদ্ধি, মন ইত্যাদিতেও যুক্ত। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝ। এই পাত্রটার মাঝেও আকাশ আছে, ওটাতেও আকাশ আছে। বাস্তবিক পক্ষে আকাশ সর্ব্বত্রই এক বস্তু, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুতে তার আবির্ভাব বলে তুমি তাকে ভিন্ন ভিন্ন বল্‌তে পার। এই রুমালটাকে নিয়ে যেমন নাড়াচাড়া কর, আকাশ নিয়ে কিন্তু তা পার না। আকাশ অবিভাজ্য, তা সর্ব্বত্রই এক; আকাশের মাঝে ভাগের কল্পনা করা চলে না। কাণ্টও বলেন, আকাশ বিষয়গত বা বিষয়িগত, তার ছেদ সম্ভব নয়। তেমনি ব্রহ্ম বা অনন্তস্বরূপকেও খণ্ডিত বা ছিন্ন করা যায় না; কিন্তু ধরুন এই জগতের বিষয়সম্পর্কে তাঁর কথা বলি, তখন তাঁকে বিষয় কিম্বা বিষয়ীর সহিত যুক্ত বলে ভাব্‌তে পারি এবং একই সত্যকে ক্রিয়া কিম্বা প্রতিক্রিয়ারূপে বিভিন্ন

বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত বল্‌তে পারি। যেমন আমার হাতের আকাশ এই পাত্রটার আকাশের দিকে এগিয়ে এক এবং দু'য়ে যোগ হল। তাতে হাতের আকাশ আর ঘটের আকাশ এক হয়ে গেল। যদিও মূলতঃ আকাশ একই ছিল, তথাপি তোমার দৃষ্টিতে ঘটের আকাশ আর হাতের আকাশ তো ভেদ হয়ে গেল।

তাই বেদান্ত বলছেন, যে ব্রহ্ম বিষয়ীতে অধিষ্ঠিত, তিনিই যখন বিষয়ে অধিষ্ঠিত জগত্তার সঙ্গে এক হয়ে যান, তখনই বিষয় আর বিষয়ীতে সংযোগ হয়।

বাস্তবিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আত্মাতে হয় না, অবচ্ছিন্ন আত্মাতেই তা সম্ভব। ধর, এই দিক হতে একটা জলের ঢেউ আসছে, আবার আর এক দিক থেকে আর একটা আস্‌ছে। এ ঢেউটাও যেমন জল, ও ঢেউটাও তেমনি জলই বটে, দুটো ঢেউএ যখন সংঘর্ষ হবে, তখনও তা জলই থাক্‌বে, কোনও পরিবর্ত্তন হবে না, অথচ তার মাঝেই একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া হবে। এই ঢেউএর অবচ্ছেদে যে জল ছিল, আবার ওই ঢেউএর অবচ্ছেদে যে জল, সেই একই জলের অবচ্ছেদক ভেদে সংঘর্ষ হওয়ায় ফেনার উৎপত্তি হল। তেমনি বুদ্ধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম যখন বিষয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হন, তখনই জগতের নাম, রূপ, গুণ ধর্ম্ম ইত্যাদি ফুটে ওঠে। একটা হাতের সঙ্গে যখন আর একটা হাতের ঠোকাঠুকি হয়, তখন দুটো হাতে একই শক্তি থাকে বটে, কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাতে ফল হয় শব্দ। দুটো হাতেই এক শক্তি, কিন্তু তবু দুয়ে সংঘর্ষ সম্ভব হচ্ছে। (ক্রমশঃ)



বৈরাগীর মন

—:{*}:—

জীবনকে আঁকড়ে ধরে যে পড়ে আছে, সে জীবনের স্বাদ পায়নি। জীবন বিকাশ, স্ফুরণ —চঞ্চলের সত্য; অচঞ্চল জড়তা নয়। মৃত্যু বিকাশের পথ; শক্তির স্ফুরণ মরণে। যে মরণের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, জীবনের অমৃত-আস্বাদ সেই পেয়েছে—সে-ই বীর্য্যলাভ করে শক্তিমন্ত হয়েছে। হলাহল পান করে তাই তো নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়; অ-শিবের কাছে কালকূট মরণ, শিবের তাই অলঙ্কার।

অশিবের জীবন কি? অবিরাম অন্ধ ধূমোদগার আর তারি মাঝে দু' একটা স্ফুলিঙ্গের ক্ষণিক দীপ্তি। তাকে উৎসাহ বল, বীর্য্য বল, সুখ বল—কিন্তু তার মূল্য কতটুকু? বৈরাগী দেখেন, কল্পনা জল্পনা কামনা-বাসনায় উদ্বেলিত এই তো জীবন; চরম তৃপ্তি তার

মাঝে কোথায়? অসংশয় প্রাপ্তি কোথায়? তবে কার ভয়ে, কিসের ভরসায় এর তোয়াজ করা? একটা ইন্দ্রিয় যদি আজ বিকল হয়ে যায়, তবে এই বহির্জ্জগতে একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়পথে আজ জ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাই জগতে নিরাশ্রয় নই, এই ইন্দ্রিয়ের সংস্কারকে পুঁজি করেই সুখ-দুঃখের হাটে নেমেছি। কিন্তু মহাযুমে যেদিন ইন্দ্রিয়ের নির্ব্বাণ হবে, সেদিন আশ্রয় পাব কোথায়? এই সুনিশ্চিত প্রলয়ের বিভীষিকা জীবনের লালসাকে সংযত করে না কি?

তাই বলি, খণ্ড আলোকের দীপ্তি চাই না—অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃর আশায় চাই অমানিশার অন্তহীন আঁধারে ঝাঁপ দিতে! তাই বলি, নাই—আমার কাছে এ জগৎ একান্তভাবেই নাই। নাই দেহ—নাই মন—নাই চিত্ত উত-রোল আশা-আকাঙ্ক্ষার নূপুর-নিক্কণ। রূপ নাই—অরূপও বুঝি নাই! কিন্তু আমি আছি। বিষয়ী মনের নির্ব্বাণে যে বিরাট আঁধার ফুটে উঠেছে, সেই পরম স্নিগ্ধ শ্যামলতাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ করে আছে অনির্ব্বাণ অহঙ্কার। তার সর্ব্বত্র শান্তি, সমাধি, নির্ব্বেদ।

একদিকে ফিরে বলেছিলাম নাই, আবার আর একদিকে ফিরে দেখ্‌ছি, নাই কেন—বুকভরা সবই তো আছে! এ যেন অমা-বস্যার বিপরীত পৃষ্ঠে পূর্ণচন্দ্রের রজতোচ্ছ্বাস। কিন্তু যা আছে তা কি শান্ত, কি নিথর! একটী অণুও সেখানে পরিপূর্ণতার মহিমায় জ্যোতির্ম্ময়। সবাই পূর্ণ সেখানে—কেননা দ্রষ্টার দৃষ্টি যে পূর্ণ। তাই সেখানে অস্ফুটন্ত কুঁড়ি সুন্দর, পূর্ণপ্রস্ফুটিত কুসুম সুন্দর, ঝরে পড়া পাপড়িও সুন্দর। সেখানে অপূর্ণ জানে, তার নিশ্চিত পরিণাম পূর্ণতায়; তাই তার মাঝে ব্যস্ততা নাই, কামনার বিক্ষোভ নাই—কিন্তু প্রাণের পরিপূর্ণ স্পন্দন আছে। তাই সেখানে বাধা নাই, বন্ধন নাই—সবই সেখানে সুন্দর।

সৌন্দর্য্যের পিপাসা তোমার প্রাণে নাই? আছে। তাই তো ভগবানের নিশানা। কিন্তু সে সুন্দরকে ভোগ করবে কি দিয়ে? এই দেহ-মন-বুদ্ধির ভঙ্গিমা দিয়ে? না, তা হবার নয়। পূর্ণতাকে গণ্ডী দিয়ে অবিকৃত রাখা চলে না। তাই বলি, দেহ মন বুদ্ধি ছাড়্‌তে হবে। একান্ত নিরসন দ্বারা নয়—পরিপূর্ণতা দ্বারা। তারা যা, তাই থাক্—অহংকে তার উর্দ্ধে তুলে নাও। হয়ত কিছু সংস্কার থেকে যাবে; তখন চাই নির্ম্মম আঘাত—অভিনবের সৃষ্টিবাসনায় তখন প্রলয়ের আবাহন করতে হবে। সংসারদৃষ্টিতে প্রলয় অন্ধকার—তাই প্রবর্ত্ত সাধকের কাছে বৈরা-গ্যের বিভীষিকা। কিন্তু অহংকে অটুট রাখ্‌তে পারলে আবার এই অন্ধকারের বুকেই সৃষ্টি ফুটে উঠ্‌বে। কিন্তু এবার বাইরে নয়—ভিতরে। সে দর্শন নিত্য দর্শন—কেননা কামনার স্পন্দন তখন নিরুদ্ধ; খণ্ডের প্রলয়ে অখণ্ডের জাগরণ সেখানে; তাই এক ব্যষ্টির বিলয়ে অনন্ত কোটী ব্যষ্টির উদয়—সবার মাঝে একই অহংএর অধিষ্ঠান। চঞ্চলের অফুরন্ত নৃত্য, অচঞ্চল তার রঙ্গপীঠ, সে এক। তাই বিশ্বরাস-এক কৃষ্ণ, সহস্র গোপিনী; তত্ত্ব-দৃষ্টিতে এক, কিন্তু লীলায় অনন্ত যুগল।

এই দৃষ্টি ফুটলে জগৎ আবার দেখা দেয়—অভিনব হয়ে। সে কেমন? তখন দেখি, সবই আছে; মেয়ের বাসর পিতৃবক্ষে স্নেহের সুধায় সঞ্জীবিত হয়ে যেমন করে থাকে।

কামনা নাই, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন আছে। মন বলে, সবাই সুখী হোক জগতে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানাভিমানের চাঞ্চল্যে—স্বল্পপরিসর প্রেমাভিনয়ের পুলকে—হর্ষে, লাজে, বেদনায়!—সবার মাঝে সবাই আনন্দে আজ প্রাণের হিল্লোল জাগিয়ে তুলুক!

আমি বসে আছি এই অপারসমুদ্রের তীরে উন্মনার মত। নরের ভোগা বিষামৃত ঢালা রসাধনে আমার স্পৃহা নাই—কিন্তু তবুও অনুভব করছি, সে বিষামৃতে যেন আমারি বক্ষ মথন করে উঠছে। আমার নাই কিছুই, অথচ আছে সবই। তাই অন্তরের ভাষা আজ মৌনে সুপ্ত—অটল শান্তিতে, পরিপূর্ণ প্রেমে নিস্তব্ধ আমি!

নাই বলে যে মুখ ফিরে দাঁড়িয়েছে, তারই দায়িত্ব বেশী। বৈরাগ্যের তুঙ্গশৃঙ্গে অটল হয়ে বসে থাকা চলে না—চলে না। নেমে আসতেই হয় এ জগতে, নইলে আনন্দ তো পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু আসতে হয়, বৈরাগীর মনটী নিয়ে—যে মনটী পেকেও নাই!

লোকে বলে বৈরাগী ভিখারী; জানে না—সে রাজা, কুবের তার ভাণ্ডারী। সে তো নিতে আসেনি—দিতেই এসেছে। সঞ্চয় করবে সে কার জন্য?—যার ঘর নাই, দোর নাই, আছে বলতে কিছুই নাই! আবার নাই বলেই যার সবই আছে—সেই বা সঞ্চয় করবে কি, সঞ্চয় করবে কার জন্য? সব আছে বলেই সে খুদকণাটুকু ছাড়া আর কিছুই নিতে জানে না। সে নেওয়া তার অভাবের পূর্ত্তির দরুণ নয়, তোমার দানকে সার্থক করবে বলে।

হে সাধক, এই বৈরাগ্যের সাধনাই তোমার জীবনে একান্ত হোক্। নাস্তিমন্ত্রের সাধনাতেই আজ নিজকে নিঃশেষ করে দাও—বাইরে হারিয়ে বুকের মাঝে সবাইকে ফিরে পাবে আবার। সেই সব নূপুরের রিণি ঝিণি আবার হয়ত শুনতে পাবে, কিন্তু সাবধান, মনে রেখো—চাইতে গেলেই পাবে না। যে রাগিণীর আলাপ সুরু হয়েছে, নিঃস্তব্ধ হয়ে তাই শুনে যাও—চীৎকার করে তার রসভঙ্গ করো না।

দাও আজ সবার দেনা-পাওনা চুকিয়ে—কারু ঋণ রেখো না আর। যে যা চায়—তাই তাকে দাও কল্পতরু হয়ে। সবার আশা পূর্ণ হোক্—তোমার আশার বিবোধে অতৃপ্তি ডেকে আনা কেন! সবার আশা পূর্ণ হলে যে পরমতৃপ্তি, সেই অমৃতেই তো তোমার রাজভোগ!—তাথৈ থৈ থৈ নৃত্য চলুক তোমার নিশ্চল বক্ষের উপর—নাচুক এবার শ্যামা উলঙ্গিনী—প্রতি রোমকূপ হতে অনন্ত মিলনের আনন্দ ধারা জগতে ছড়িয়ে পড়ুক—তুমি শুধু দেখে যাও!

এমনি করেই চলতে হবে—এই কথাটুকুও আজ মনে করিয়ে দিতে হয়, কেননা তুমি পথিক। তবে এসো পথিক কামনাহীন প্রশান্তির পথে, জগৎকে ভস্ম করে তার ভস্মমুষ্টি গায়ে মেখে এসো সন্ন্যাসী, এসো উদাসী, এসো যোগী অতএব এসো বিপুল ভোগী। শুধু এই এক ক্ষুদ্র আধারে ভোগ নয়—এই অনন্ত জগৎ ভোগ করে অনন্ত তৃপ্তিতে নিথর আবার অনন্ত অতৃপ্তিতে অনন্ত সৃষ্টির বাসনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠ—আবার অনন্ত মাঝে মহাসমাধিতে মগ্ন হয়ে যাও। জীবন আর মরণ রসের দুটী পানপাত্রই তোমার—কেন না মন যে বৈরাগী।

ছাত্র রামতীর্থ

আর দুইটী প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াই আমরা স্বামী রামতীর্থের ছাত্রজীবনের কাহিনী সমাপ্ত করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফুল যেমন অনাড়ম্বর সহজ ভাবে ফুটিয়া বায়ুমণ্ডলকে গন্ধভারে আক্রান্ত করিয়া রাখে, তীর্থরামের ছাত্রজীবনও তেমনি সহজ ও সরল মাধুর্য্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জীবনের এই সরল ও সুসঙ্গত উন্মেষই তাঁহার আদর্শকে সর্ব্বজন বরণীয় করিয়াছে। যেমন আর দশজনের জীবনে সুখদুঃখের ঢেউ খেলা করিয়া যায়, তীর্থরামেরও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিহ্বলতায় বা দুঃখের অভিঘাতে আর দশ জন যেমন চঞ্চল হইয়া নিজের অহংকেই বড় করিয়া তোলে, তীর্থরামের সম্বন্ধ কিন্তু তেমন ছিল না। গোড়া হইতেই তিনি একেবারে নির্ম্মম উদাসীন সন্ন্যাসী ছিলেন, এমন কথা বলা চলে না; সুখদুঃখের বেদনা তাঁহার চিত্তেও আলোড়ন তুলিত। কিন্তু কি সুখে, কি দুঃখে—অন্তরদেবতার কাছে আত্মসমর্পণই ছিল তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব। বিদ্যার্থি জীবনের সাফল্য তাঁহার একান্ত কামনার ধন ছিল। অটুট ব্রহ্মচর্য্য, অবিচল তপোনিষ্ঠা, আহারশুদ্ধি, একান্তবাস, অধ্যবসায় প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণে তাঁহার ছাত্রজীবন একদিকে যেমন মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি আত্মসমর্পণের সুকুমার স্নিগ্ধতায় তাঁহার চরিত্রে এক অনির্ব্বচনীয় নারীসুলভ কমনীয়তার উন্মেষ হইয়াছিল। সঙ্কল্পে বজ্রদৃঢ় অথচ বেদনায় কুসুমসুকোমল এই বিদ্যার্থীর চিত্তটী কাহার না বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে! একটী ঘটনাতে তীর্থরামের চরিত্রের এই বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সেবার তীর্থরামের বি এ পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কিছু গোলযোগ ছিল। তাহা ছাড়া সাংসারিক নানা অশান্তিতেও তাঁহার পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়। পরীক্ষার পূর্ব্বে তীর্থরাম তাঁহার আচার্য্য ধন্নামলকে লিখিলেন—"পরশু দিন পরীক্ষা সুরু হইবে—কিন্তু এবার যেন কেন আমার ভয় ভয় করিতেছে।" পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, তীর্থরামের আশঙ্কা সত্য হইয়াছে—পরীক্ষায় তিনি পাশ করিতে পারেন নাই। তীর্থরামের মত ছেলে পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন—তাও আবার তিন নম্বরের জন্য ইংরেজী পরীক্ষাতে—এ কথা যেই শুনিল, সেই আশ্চর্য্য হইল। ইংরেজীতে তাঁহার কিরূপ অসামান্য অধিকার ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অধ্যাপকদের ইহাতে বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া তাঁহারা ইংরেজীর কাগজ আবার পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। এই ব্যাপারে অধ্যাপকেরা এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে বিশেষ আন্দোলন করিয়া তাঁহারা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইবার হইতে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করাইলেন যে, কাহারও একটী পরীক্ষাপত্রে যদি পাঁচ নম্বর কম পড়ে এবং অন্যান্য পত্রে যদি

বেশী নম্বর না থাকে, তাহা হইলে সেই ছাত্রকে পাশ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতে বিদ্যার্থীদিগের উপকার হইল বটে, কিন্তু তীর্থরামের সম্বন্ধে কোনও প্রতীকার হইল না।

এই ব্যাপারে তীর্থরাম অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলেন। এতদিন যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, পরীক্ষায় ফেল হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। এখন আর এক বৎসরের দরুণ কলেজের বেতন, খাওয়ার খরচ, পরীক্ষার ফিস্ তিনি কোথায় পান? তাঁহার মেসো শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মল্ল পড়াশুনায় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। পিতা যে বিরূপ ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তীর্থরাম ভগ্নহৃদয়ে শ্রীযুত রঘুনাথজীকে লিখিলেন, "মেসোমহাশয়, যদি তীর্থরাম নিজের ইচ্ছামত আর পড়াশুনা করিতে না পারে, তাহা হইলে জানিবেন, সে শীঘ্রই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।" চিত্ত যখন এইরূপ দুর্নিবার চিন্তাস্রোতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখনও তিনি একান্তে চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য পরমাত্মার নিকট করুণ প্রার্থনা করিতে ভুলিতেন না। এই সময়ের অবস্থা তিনি নিজেই এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"ফেল্ হওয়ার কথা শুনিয়াই রামের মনের উপর যেন বজ্রাঘাত হইল—মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখন কি করিবেন, তাহার কোন দিশাই তিনি পাইলেন না। উদ্বেগ এত বাড়িয়া গেল যে অবশেষে তাঁহার মেসোমশায়কে এক চিঠি লিখিয়া বসিলেন যে রাম সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন। কোন দিক দিয়াই শান্তি পাইবার পথ রহিল না। পিতাঠাকুর তো গোড়া হইতেই নারাজ, তাঁহার কাছে যে কোনও সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ ভরসা মনে জাগিল না—অন্ততঃ তখন এরূপ কোনই সম্ভাবনাই দেখা গেল না। এখন একমাত্র আশ্বাসের স্থল ভগবান্—একান্তে যাইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়া মাথা কুটিয়া কাঁদা ও প্রার্থনা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? হৃদয়ে শোকের আগুণ জ্বলিতেছে—আর দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা গলিয়া পড়িতেছে। রামের হৃদয় ভেদ করিয়া করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

"ক্রমে কাঁদিতে কাঁদিতে দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, নয়নজলে বসন ভিজিয়া গেল। পরমাত্মার উদ্দেশে করুণ বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার বিগলিত চিত্ত হইতে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"কুন্দনকে হম্ ডলে হৈঁ
জব্ চাহে তু গলা লে,
বাবর ন হো তো হম্‌কো
লে আজ্ আজ্‌মা লে।
জৈসে তেরী খুশী হো
সব নাচ্ তু নচা লে,
সব ছান্‌বীন্ কর লে
হর তৌর্ দিল জমা লে।
রাজী হৈঁ হম্ উসীমেঁ
জিস্‌মেঁ তেরী রজা হৈ,

য়হাঁ য়ূঁভী বাহবাহ হৈ,
ঔর্ বূঁভী বাহবাহ হৈ!

য়া দিল্ মে অব খুশ হোকর্
কর্ হমকো প্যার্ প্যারে,
য়া তেগ খৈঁচ জালিম
টুকড়ে উড়া হমারে।

জীতা রখে হমকো
য়া তনসে সির উতারে
অব রাম তেরা আশিক
কহতা হৈ য়ূঁ পুকারে।

রাজী হৈঁ হম্ উসীমেঁ,
জিস্ মেঁ তেরী রজা হৈ,
য়হাঁ য়ূঁভী বাহবাহ হৈ,
ঔর্ বূঁভী বাহবাহ হৈ!

—আমি তো সোণার ডেলা মাত্র, তোমার যখন খুসী তুমি আমাকে গলাইয়া নাও না কেন! যদি একথা বিশ্বাস না হয় প্রভু, তবে নাও—আমাকে পরখ করিয়া দেখ। আমার সব তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লও, সব রকমে দেখিয়া তোমার মনের সন্দেহ মিটাইয়া লও।—যেমন করিয়া তোমার খুসী—সব নাচে নাচাইয়া লও। যা তোমার মরজী, তাতেই আমি খুসী। আমি 'এখানেও' বলি, বাহবা!—ওখানেও বলি বাহবা!

মন তোমার যদি খুসী হইয়া থাকে, তবে হে প্রিয়, প্রাণ ভরিয়া আমায় আদর কর; নইলে যদি ইচ্ছা হয়, হে নিষ্ঠুর, তলোয়ারের মুখে আমায় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেল। তুমি আমাকে বাঁচাইয়াই রাখ আর দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্নই কর—রাম যে এখন তোমার প্রেমের কাঙ্গাল, এই কথাই প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি। যা তোমার মরজী, তাতেই আমি খুসী। আমি এখানেও বলি বাহবা!—ওখানেও বলি বাহবা!"

আত্মসমর্পণের কি উজ্জ্বল, কি মধুর চিত্র! —একদিকে জ্ঞানার্জ্জনের আকুল-প্রয়াস, আবার অপর একদিকে হৃদয়নিঙারী ব্যাকুল বেদনা—দুয়ের মণি-কাঞ্চন সংযোগে ছাত্র-জীবনের কি অপরূপ আদর্শই না ফুটিয়া উঠিয়াছে!

তীর্থরামের ছাত্রজীবন—শুধু ছাত্রজীবনই বা বলি কেন, তাঁহার সমগ্র সাধন জীবনের একটী রহস্য সঙ্কেতের কথা বলিয়াই আমরা তাঁহার জীবনীর এই পর্ব্ব শেষ করিব।

আমরা এই কথা বার বার বলিয়াছি, তীর্থরামের জীবনের অভিব্যক্তির একটা সহজ ধারা আছে—ভারতবর্ষের সনাতন জীবনধারার সহিত পর্ব্বে পর্ব্বে তাহার মিল রহিয়াছে। ছাত্র তীর্থরাম যে অবশেষে বেদান্তকেশরী স্বামী রামতীর্থে পরিণত হইলেন, ইহার মূলে যে দিব্যপ্রেরণা রহিয়াছে, তাহার উৎস কোথায় এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। যখন এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি, তখন শ্রীযুক্ত পূরণসিংহের লিখিত জীবনচরিতখানাই আমাদের উপজীব্য ছিল। পূরণসিংজী তীর্থরামের জীবনের এই অধ্যায়টী কেন জানি না, আড়ালে আবডালে রাখিবারই চেষ্টা করিয়াছেন—এ কথা পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী ধন্নারামকেই তীর্থরামের উপদেষ্টারূপে লোকসমক্ষে চিত্রিত করিয়াছেন—এবং ধন্নারামের প্রতি তীর্থরামের তীব্র মনোবেগকে বালসুলভ ভাবের বিকার বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন—স্বয়ং ধন্নারামকেও that uncanny sort of person বলিয়া বিদ্রূপ

করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার এই প্রকার মনোভাব সম্ভবতঃ তাঁহার বিকৃত পাশ্চাত্যশিক্ষারই ফল। আমরা যথাস্থানে ইহার সমালোচনা করিয়া শ্রীমৎ ধন্নামলের সহিত শ্রীমৎ রামতীর্থের সম্বন্ধের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পূরণসিংহজী তীর্থরামের সাধনজীবন সম্বন্ধেও নানা অদ্ভুত ও অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি করিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

ধন্নামলের সহিত তীর্থরামের সম্বন্ধ নির্ণয়ে আমরা কেবলমাত্র শিষ্যহৃদয়ের ঐকান্তিকতার কথা বলিবারই অবসর পাইয়াছি—প্রমাণাভাবে গুরুশক্তি-সঞ্চারের কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। স্বামী রামতীর্থের মত যুগাদর্শ মহাপুরুষের জীবনের একটা দিক এইরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিল, ইহা ভাবিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। পূরণসিংজী রামতীর্থের জীবনের অভিব্যক্তিকে স্বতঃস্ফুরণবাদের সহায়তায় ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হইত, স্বামী রামতীর্থের সাধনলব্ধ সত্য যদি ভারতের সনাতন বাণী হইয়া থাকে, তবে তাহার অভিব্যক্তির ধারাও সর্ব্বতোভাবে জাতীয় সাধনার ধারারই অনুসরণ করিবে। অর্থাৎ রামতীর্থের বাণী যদি মহাপুরুষের বাণী হয়, তবে তাহার মূলে গুরুশক্তির লীলা বা মহতের কৃপা নিশ্চয়ই থাকিবে। আমরা ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু পূরণসিংজী লিখিত কাহিনীতে এ সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিতই পাই নাই। সম্প্রতি গুজরাতী ভাষায় স্বামিজীর একখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দী, উর্দ্দু, মরাঠী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় স্বামিজীর জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই সার সঙ্কলন করা হইয়াছে। এই গুজরাতী জীবনীতে আমরা তীর্থরামের জীবনকাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশটুকু পাইয়া পুলকিত ও চমৎকৃত হইয়াছি—মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণনায় যে ন্যূনতা ছিল, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাহার সম্পূরণ হইয়াছে। পূরণসিংজী তাঁহার লিখিত গ্রন্থে এ কাহিনী যে কেন গোপন করিয়া গেলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। বোধ হয়, আধুনিক রুচিসঙ্গত নয় বলিয়া তিনি এ কথা চাপিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার মনোমত না হইলেও অন্ততঃ প্রতিবাদ ছলেও তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিতে তো পারিতেন। তীর্থরামের সদ্‌গুরুর কৃপালাভের কাহিনীটী তাঁহার গুজরাতী জীবনচরিতে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ইচ্ছাসত্ত্বেও ব্যস্ততা প্রযুক্ত আমরা ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা কাহিনীটী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"এই সময় বালক তীর্থরাম যেমন অবিরাম পরিশ্রমসহকারে বিদ্যার্জ্জনে রত ছিলেন, তেমনি অপর দিকে গুরুভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা পূর্ব্বজন্মকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণকে একাগ্র করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তির অধিকারলাভেও যত্নশীল ছিলেন। যেমন অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনে দেখা যায়, তেমনি বালক তীর্থরামেরও বার বৎসর বয়সে ভবিষ্যজীবনের অপরূপ রূপরেখা স্পষ্ট হইয়া না উঠিতেই এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল।

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামতীর্থ যখন হিমালয়ে একান্তবাস করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার জনৈক ভক্তকে তিনি কৃপা করিয়া এই কাহিনী শুনাইয়াছিলেন।

"ভকত ধন্নারামজীর নিকট থাকিবার সময় এক দিক দিয়া তাঁহার চিত্ত যেমন নিরন্তর প্রভুভক্তিপরায়ণ ছিল তেমনি বাহ্য ব্যাপারে অনেকটা নিরুদ্বেগ ও অতর্কিতও ছিল। একবার এই প্রকার ধ্যান-তন্ময় অবস্থাতে তাঁহাকে বাজারে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে সহসা একটী সৌম্যকান্তি, উজ্জ্বলশ্রী ও দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সন্ন্যাসীও একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তীর্থরামের ইচ্ছা হইল, একবার তাঁহার কাছে গিয়া চরণস্পর্শ করিয়া তাঁহার সহিত দুই চারিটা কথা বলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, দুজনার কেহই কোনও কথা না বলিয়া শুধু পরস্পরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে একদিকে চলিয়া গেলেন।

"কিন্তু দৈবের গতি অচিন্তনীয়। তীর্থরাম সম্বন্ধে এই মহাপুরুষের যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা বাজারভরা লোকজনের মাঝে করিবার কোনও উপায় ছিল না—তাহার দরুণ অনুকূল দেশ ও কালের প্রতীক্ষা প্রয়োজন ছিল। বাজারের কাজ সারিয়া তীর্থরাম বাড়ী আসিয়া দেখেন, সেই সন্ন্যাসীটী আরও কয়েকজন সাধু-সজ্জনের সহিত পূর্ব্বেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সাধুরা তখন বেদান্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, শ্রোতারা শান্ত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, জিজ্ঞাসুরা আপন আপন জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিতেছেন। তীর্থরাম সাধুমণ্ডলীর দর্শন স্পর্শন করিয়া তাঁহার আন্তরিক জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি সাধুমণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া শ্রোতাদিগের সহিত বসিয়া গেলেন। তখন অবিরাম শাস্ত্র কথা চলিতেছে—বেদান্তের দুরূহ তত্ত্বসমূহ অতি প্রাঞ্জল ও রোচক ভাষায় ব্যাখ্যাত হইতেছে। বক্তা সেই সন্ন্যাসী। জিজ্ঞাসুদিগের সমস্ত চিত্ত তাঁহার উক্তিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। ততক্ষণে তীর্থরামের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। ভক্তিতে তাঁহার চিত্ত দ্রব হইয়া গেল। ভগবানের বিরহ, আত্মানুভবের অভাব ও আপনার দৈন্যভাবে পীড়িত তাঁহার চিত্ত এমনই এলাইয়া পড়িল যে তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার দেহ থাকিয়াও নাই। ক্রমে তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া মাটিতে ঢলিয়া পড়িলেন।

"এই ব্যাপারে শাস্ত্রালোচনা বন্ধ হইয়া গেল। সকলের দৃষ্টি তীর্থরামের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এবার বছরের বালকের সুকোমল চিত্তের উপর বেদান্তের মত গম্ভীর বিষয়ের এমন আশ্চর্য্য প্রভাব যে ভাবাবেশে সে মূর্চ্ছিত হইয়া যায়—এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিলেন। কেহ কেহ মনে করিল, এই কৃশকায় বালকটী বোধ হয় দেহের দুর্ব্বলতা হেতু অমন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সকলে জলের ছিটা দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে বালকের চৈতন্যসঞ্চার হইল। অস্ফুটস্বরে ওঁ—ওঁ—ওঁ— বলিতে বলিতে তীর্থরাম চোখ খোলিলেন। এমন সময় সেই মহাপুরুষ তীর্থরামের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় বরহস্ত স্থাপন করিয়া

ধীরে ধীরে তাঁহার কাণে কি জানি কি বলিলেন—আর অমনি তীর্থরাম বিদ্যুৎচকিতের ন্যায় অতি স্নিগ্ধ স্মিতহাস্যসহকারে একেবারে সেই মহাপুরুষের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

"পরবর্ত্তীকালে রামতীর্থ যখন বশিষ্ঠাশ্রমে অবস্থান করিতেন, তখন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ মূর্চ্ছাভঙ্গে তাঁহার কানে কানে "তত্ত্বমসি—তত্ত্বমসি—তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে এক অজ্ঞাতনামা মহাপুরুষের কাছে দ্বাদশবর্ষ বয়সে তীর্থরাম বেদান্তের দীক্ষা পাইয়াছিলেন।"

আমরা কাহিনীটী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম। অভিজ্ঞ পাঠকের নিকট ইহার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত



কর্ম্মযোগ

ভগবান্ গীতায় বলেছিলেন, "কর্ম্ম হোক্ অকর্ম্ম হোক্, আর বিকর্ম্মই হোক্—সবার মাঝেই তোমার বুঝ্বার মত কিছু না কিছু রয়েছে—কেননা কর্ম্মের গতি অতি গহন।"

কথাটার সহজ তাৎপর্য্য এই বুঝি, গুণের বিক্ষোভ ছাড়া যখন কর্ম্ম করা সম্ভবপর নয় এবং এক গুণের সঙ্গে আর এক গুণের সহচার যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন কোনও কর্ম্মই দোষবর্জ্জিত হতে পারে না। অথচ কর্ম্মের মাঝে কোনও দোষ না থাকে, এটা সবারই ইচ্ছা। কর্ম্মে দোষ আছে কি না আছে, তার বিচার হয় ফল দেখে। কর্ম্মের ফল চাইতে নাই—এটা বড় কথা। কিন্তু ফল তো শুধু বাইরেই নয়, ফল ভিতরেও যে আছে। আমার কর্ম্মে বাইরে বিক্ষোভ হতে পারে সেটা হল দৃষ্ট ফল; আবার সেই কর্ম্মেই আমার সংস্কারেরও কিছু অদল-বদল হয়—সেটা হল অদৃষ্ট ফল। দৃষ্ট ফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকাটা অনেক সোয়াস্তির কারণ; কেননা বাইরটা যখন আমার আয়ত্তে নয়, তখন তার ভালমন্দ ভেবে নিজে বিব্রত হয়ে লাভ কি? সাধারণতঃ কর্ম্মের ফলত্যাগ বলতে আমরা এইটুকুই বুঝি। কিন্তু এর পরেও কথা আছে।

বাইরের ভাবনা না হয় ছাড়্লাম, কিন্তু আমার নিজের ভাবনা? কর্ম্মের দরুণ যে সংস্কারের আলোড়ন আমার মাঝে হবে, তাকে ছাড়্তে হবে না কি?—আমরা বল্ছি—হাঁ, তাও ছাড়্তে হবে; আর কর্ম্মজনিত সংস্কার ত্যাগই তো হচ্ছে আসল ফলত্যাগ। এমন কি, এ কথাও বলা যেতে পারে, ভিতরে যদি কোথায়ও সংস্কার পুঁজি না হয়, তাহলে বাইরে যদি লোকদৃষ্টে কর্ম্মও করি, ফলের চিন্তাও আসে, তাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু সে হল বড় কথা, কর্ম্মের চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই

কি করে পৌঁছাতে হবে, তারই সঙ্কেত চাই।

প্রথম সঙ্কেত এই—খাটবে নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। কতকগুলি জিনিষে আমার বলে দাবী আছে। সেই দাবীগুলো ছাড়তে পারলে তবে যথার্থ আমির সন্ধান পাওয়া যায়। আমার দেহ যখন বলছি, ততক্ষণ বাস্তবিক আমি দেহই—তারই সুখদুঃখে কাতর, তারই তোয়াজে অহরহঃ ব্যস্ত। কিন্তু যদি দেহ হতে 'আমার' ছাপ তুলে নিয়ে ভাবি, দেহ আমার নয়—পরের বা জগতের, তখন আপাততঃ একটা ফাঁস হতে মুক্তি পাই—আমিত্ব তখন আরও একটু গুছাছিত ও স্বস্তিযুক্ত হয়। হয়ত তখন কল্পনাজল্পনাগুলো আমার, বাসনা-কামনাগুলো আমার—(হোক্ না সে জগতের কাজ করব বলেই।) আবার এগুলো হতে আমিত্বকে তাড়াতে পারলে, সে গিয়ে হয়ত সাধুবুদ্ধিকে আশ্রয় করবে। তখন কল্পনাজল্পনার বাড়াবাড়ি থাকবে না, অথচ অরুণাভাসের মত একটা স্নিগ্ধ প্রকাশে চিত্ত আলোকিত থাকবে। কিন্তু এতে বিষয়সম্পর্কের একদিক মাত্র জানা যাবে—কেমন করে উঠছি, তা জানব কিন্তু কি আনন্দে নেমে ছিলাম, তা তো জানি না। সুতরাং এই সাধুবুদ্ধিরও পরপারে আমিত্বকে ঠেলে দিতে হবে। সেখানে গেলে অটুট আশ্রয়, তরঙ্গদোলার আর ভয় নাই—এই হল আমার যথার্থ স্বরূপ।

কিন্তু এই অবস্থা পেতে হলে আগেই বলেছি পরার্থপর হতে হবে। আমিত্বকে যখন এক এক ধাপ তুলে আনব, তখন সেটা যে নিরুদ্ধ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, তা নয়—বরং সে স্তরে যে কাজ চলছিল, সে কাজ পুরাদমেই চলতে থাকবে। দেহ ছেড়ে আমি যখন মনকে আশ্রয় নিল, তখন কি দেহ জড় হয়ে যাবে? তা তো নয়—তার কর্ম্ম যেমন ছিল, তেমনি থাকবে, বরং সঙ্কীর্ণ আমিত্বের বাধা না থাকায় জগতের কর্ম্মশৃঙ্খলার সঙ্গে যোগ হয়ে তার বেগ আরও বাড়বে। আর এই বেগ বা শক্তির ক্রিয়াতেই দর্শক আমির আনন্দ। এমনি করে আমিত্ব এক এক স্তর পার হতে থাকবে, আর সেই স্তরের বিভূতি সমস্ত বাধা হতে মুক্ত হয়ে পূর্ণপ্রস্ফুটিত শত দলের মত বিকসিত হয়ে উঠবে। এতে দেহ-প্রাণ-মনেরও মুক্তি ও সোয়াস্তি—আমিত্বেরও তাই। পরার্থপরতা বা পরের জন্য খাটার মানে এই।

এমনি ভাবের মনন করবে—একটা নিঃশ্বাসও আমার ভোগের জন্য নয়—কেবল প্রদীপের মত পরকে আলো দিয়ে, তেল দিয়ে, প্রেম দিয়ে ত্যাগে সার্থক হওয়া। এইটুকু হল কর্ম্মের মর্ম্মসঙ্কেত। কর্ম্মের যে বাইরে ভিতরে দু'রকম গলদের কথা আগে বলেছিলাম—তা হতে মুক্তি পাবার পথ হল এই। যাকে কর্ম্ম বলি বা কর্ম্মবিরতি বলি বা অপকর্ম্ম বলি—তার মূল রহস্যই এই। এই কথাটাই ভগবান্ তলিয়ে দেখতে বলছেন। অকর্ম্মের বুঝতে হবে এইটুকু যে, যদি কর্ম্মবিরতি মানে আমার জন্য খাটা নয়—এই হয়, সে ভাল; যদি তার মানে জড়ত্ব হয়, তাহলে বিপদ আছে। আমার যা কিছু জগতের হয়ে তারা খাটছে, কিন্তু 'আমি' কিছুই করছি না—কোনও সংস্কার গ্রহণ করছি না। এই হল অকর্ম্মের সিদ্ধি। আবার আর এক দিয়ে ঠিক এইটাই কর্ম্মজা সিদ্ধি। ফলে আমার স্পৃহা নাই—তাই অকর্ম্ম; আর কর্ম্মের স্বভাবজ ফল বিশ্বেশ্বরীর ভাঁড়ারেই সঞ্চিত হচ্ছে, সবাই তার ভাগ

পাচ্ছে—এই হল যথার্থ কর্ম্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু—তা হচ্ছে বিকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম বা অহঙ্কারের গোলামী। সংক্ষেপে কর্ম্মরহস্য এই।

এখন এই সঙ্কেতকেই কি করে সিদ্ধ করা যায়, তাহার দরুণ আরও কিছু সঙ্কেতের প্রয়োজন। যেখানে পরের জন্য খাটা, সেখানে অভিমানের অতর্কিত আবির্ভাব খুবই সম্ভবপর। আত্মস্বার্থে খাটবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অহংকে ভুলে থাকি, কিন্তু পরার্থে সামান্য খাটলেও যে সুনির্ম্মল আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, অহঙ্কারের স্পর্শে তা সহজেই কলুষিত হয়ে ওঠে। এই অভিমানকে রুদ্ধ করতে হলে আপনাকে স্তব্ধ করতে হবে। বুঝতে হবে, ভাবতে হবে—আত্মা একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ, আর দেহ-মন-বুদ্ধি জড় মাত্র। আমরা জানি, এ কথাটা সাংখ্য বেদান্তের সিদ্ধান্ত, অম্লান বদনে তা মেনেও নিই—কিন্তু সিদ্ধভাবে তা মনন করি না। অভিমান যখন আত্মপ্রকাশ করবে, তখন সে দেহ মন-বুদ্ধিরই আশ্রয় নেবে অর্থাৎ দার্শনিক বিচারে যারা জড় বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, তাদের মাঝে চৈতন্যের অবভাস এনে দেবে। চৈতন্যের সংস্পর্শে দেহ-মনের মিথ্যা সঞ্জীবনই তো অভিমান। যদি ভাবি—শুধু আমি আছি—সুবিশুদ্ধ অহং মাত্র বর্ত্তমান—আর সেই আলোতে দেহ জড়, মন জড়, বুদ্ধি জড়, এই সত্য হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে যায়, তবে সংক্ষোভের কোন কারণই থাকতে পারে না। একেই বলি দেহ-মনের নিঃস্পন্দ অবস্থা বা সমাধি। আত্মচৈতন্যকে সদাজাগ্রৎ রেখে কর্ম্মক্ষেত্রে এমনি নিঃস্তব্ধ নিঃস্পন্দ হবার অভ্যাস করতে হবে। পূর্ণবেগে যখন কাজ চলছে, তখন হঠাৎ একেবারে নিজকে সবলে তা হতে বিচ্ছিন্ন করে নাও। ফলাফলের ভালমন্দের চিন্তা মোটেই করো না—একটা আনন্দের সর্ব্বাবগাহী প্লাবনে অন্তর এলিয়ে পড়বে—আত্মার অনাবিল আনন্দশিহরণের একটু রেশ পাবে। এমনি করে স্তব্ধতায় নিজকে অভ্যস্ত করতে হবে।

এ হল ভিতরের কথা। বাইরের জগতে আবার এই ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কতকগুলি আচরণে সিদ্ধ হতে হবে। এ সবারি মূলে থাকবে সেই বিবিক্ত নিষ্কিঞ্চনভাব, তুমি সব কিছুতে থেকেও যেন নাই। এমন কি যা আজ তোমার একান্ত কাম্য, কাল তার একান্ত পরাভব দেখেও তুমি ক্ষুব্ধ হচ্ছ না। আচারের বন্ধনে চিত্তকে নামিয়ে আনলে সকলরকম বিরোধী অবস্থার দরুণই মনকে তৈরী রাখতে হবে, এ কথাটা যেন স্মরণ থাকে।

পরার্থে উৎসৃষ্টপ্রাণ আদর্শ কর্ম্মীর আচার এই—

(ক) আচরণে তুমি আদর্শ হবার চেষ্টা করবে। জগতে সবাই আদর্শ জানে না—তুমি তাদের সামনে চলে দেখাও, শেখাও!—অহংকার নিয়ে নয়, বুকভরা প্রেম নিয়ে। যদি বল, আমি অধম, সে তোমার মহাভ্রম। নিজের প্রতি যার শ্রদ্ধা নাই, সে কখনো পরের আদর্শ অনুকরণ করবারও যোগ্যতা অর্জ্জন করেনি। বড় হবার মুখে চললে তবে যথার্থ বড়কে চেনা যায়—কেননা নজর তখন উঁচু হয়। সুতরাং "আত্মনি শ্রদ্ধা"—চরিত্রসাধনের এই মূলমন্ত্র করতে হবে। এই শ্রদ্ধার তোমার মাঝে জীবন্ত আদর্শ গড়ে তুলুক—তুমি জান,

তোমার একটী মুখের কথা, একটু চোখের ইঙ্গিত—জগতে তারও মূল্য আছে। তাকে ভাল না করুক, মন্দ যে করতে পারে, তা কে স্বীকার কর? তবে আর ভালও যে করতে পারবে না—এ অশ্রদ্ধাটাই বা পোষণ কর কেন!

(খ) স্মরণে রেখো,—স্থূল জগতে কোনও পরিবর্ত্তন আনবার চেষ্টা বৃথা! তার দরুণ জগতে কোনও বিক্ষোভ সৃষ্টি করো না—নিজকেও অধঃপতিত করো না। প্রেম সূক্ষ্ম শক্তি—সেই শক্তির মহিমায় অসত্যকে জয় কর—দেহের জোরে নয়, তর্কের তোড়ে নয়।

(গ) যে অন্যায় করছে, তার কল্যাণ কামনা কর। যদি তার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন চাও—তবে বলপ্রয়োগ করো না, যুক্তি জাহির করো না—বল ওঁ শিবম্! সমস্ত প্রাণের শক্তি নিয়ে সেই অনন্ত করুণাময়ী বিশ্বজননীর কল্যাণী মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর শক্তিতে শক্তিমন্ত হয়ে বল—ওঁ শান্তিঃ! বাহুবলের চেয়ে আত্মবল শ্রেষ্ঠ।

(ঘ) দেহদ্বারা জিত কর—চিন্তাদ্বারা জিত কর। এমন কাজ বা চিন্তা করবে না, যাতে জগতে অবিশ্বাসশক্তির প্রচার হয়। তুমি সত্যের প্রচারক—জগদম্বা তোমার সহায়।



মায়ের দেখা

মায়ের দেখা চাও তুমি, তবে পাও না কেন?—শুধু তোমার অবিশ্বাসের দরুণ। অহরহ তাঁর দেখা পাইতেছ, পাইয়াও বুঝিতে পারিতেছ না—এই তো তোমার দুর্দ্দৈব। অভিমান করিয়া কেহ বল, মা নিষ্ঠুর তাই এমন করিয়া কাঁদায়। সন্তানের কান্না শুনিয়া মায়ের প্রাণ স্থির রহিয়াছে—এ কি কোথাও দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ? তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে, জগন্মাতারই স্নেহের এক কণিকা লইয়া জীবজগতে অগণিত মাতৃমূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে—পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত অসহায় সন্তান মায়ের স্নেহসুধারসে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট হইতেছে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে এই জীবধাত্রী মাতার অপরিসীম মমতার কথা স্মরণ করিয়া একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই মা যদি এমন হয়, তবে সেই মা কেমন! যাঁর ছায়াতে অমন করিয়া মমতার সুধা ঝরিয়া পড়ে, আঁখিকোণে অশ্রুজল ব্যাকুলতা ক্ষরিয়া পড়ে, সেই মায়ের চিন্ময়ী কায়া কেমন! ওরে অবোধ, ওরে অভিমানী, তবু তুই বলিবি, মা নিষ্ঠুর!

হাঁ, জগতে দুঃখ পাও তুমি, সে কথা স্বীকার করি। হয়ত ব্যথার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছ একটু সান্ত্বনা করিবারও তোমার কেহ নাই। তখন কাঁদিয়া দেখা না পাইলে অভিমান করিয়া বল, "থাকলে পরে কি দেখা সর্ব্বনাশী দিচে নাই।" কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করি, এই মর্ম্মন্তুদ যাতনার

মাঝেও সেই অভিমানভরা মাতৃসম্বোধনেই না তোমার তৃপ্তি! সংসার যখন বিমুখ, তখন সেই নামসুধারসই না তোমার তৃষিত প্রাণের একমাত্র রসায়ন! আমি সোজা কথায় বলি, মা যদি নাই থাকিবে, সন্তানের জন্য তার প্রাণ, যদি নিরন্তর সন্তাপিত নাই হইবে, তবে মা নামে এত মধু কেন? তবে কেন অবোধ সন্তান আকুল হইয়া আকাশের পানে দু'হাত বাড়াইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া বিগলিত কণ্ঠে ফুকারিয়া মরে—মা—মা—মা! কে এই ডাক তাহাকে শিখাইয়াছিল? কোথায় সে এই সঞ্জীবন মন্ত্র পাইয়াছিল? জীব যখন মাতৃগর্ভ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রথম সৃষ্টির আলো দেখিতে পায়, তখন অনাহত প্রেরণায় ওঙ্কারের অবভাস লইয়া কে তার আকুল কণ্ঠে এই সুধামাখা নাম ফুটাইয়া তোলে, মা—ওমা! দুঃখে পীড়িত হইয়া ডাকি—মা! ভয়ে চকিত হইয়া ডাকি—মা! শ্রান্ত দেহে বিশ্রামশয়নে ঢলিয়া পড়িতে ডাকি—মা! বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হইয়া ডাকি—ওমা! মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল—জানি, অজপার শেষ জপে সেই নামেই এই জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে। এই তো আমার সিদ্ধ মন্ত্র—জীবত্বের প্রথম উন্মেষে জগদ্গুরু মহাদেব এই নামের সঙ্গেই তো আমার চেতনার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর সারা জীবন ধরিয়া সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে এই নামকে আশ্রয় করিয়াই অজ্ঞাতসারেও মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি—অবশেষে একদিন এই নামেই চিরবিশ্রাম লাভ করিব। এমনি করিয়া মাতৃমন্ত্রে জীবনের প্রত্যেকটী সন্ধি গাঁথা যাঁর—সে বলিবে, মা নাই!

ভাই, যদি নাম থাকে, আর সেই নামে যদি তৃপ্তি পাও, প্রাণের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিবার সিদ্ধমন্ত্র যদি সেই নামই হয়—তবে অকপটে বিশ্বাস করিও, নামী আছেন; আর সেই নামীই নামের সহায়ে তোমার মাঝে ফুটিয়া উঠিবার জন্য নামে এত মধু ঢালিয়া দিয়াছেন। মা যে আছেন, পরমস্নেহে যে আমায় জড়াইয়া রহিয়াছেন, তার একমাত্র প্রমাণ মায়ের নাম। যে নামে জীবের জন্মগত অধিকার, যে নামে পশুপক্ষীর পর্য্যন্ত সহজ সিদ্ধি! মাতৃনামের মহিমা যদি বুঝিয়া থাক, তবে সহজেই মাকে দেখিতে পাইবে—মুখের ভাষা, বুকের ভাষা, চোখের ভাষা এক সুরে বাজিয়া উঠিবে। যদি দর্শন চাও, তবে নামে শ্রদ্ধা রাখ। যত বাজে সংস্কার মন হইতে মুছিয়া ফেল, শুদ্ধমাত্র নামের আশ্রয়ে চিত্ত সমর্পণ কর; দার্শনিক বিচার ভুলিয়া, লৌকিক বুদ্ধির বালাই ছাড়িয়া কেবল তারস্বরে, অতন্দ্রিতচিত্তে, প্রাণ মন একতান করিয়া ডাক—মা—মা মা! ঘর্ষণে যেমন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অরূপ সত্তা রূপরেখায় ফুটিয়া উঠে, তেমনি নাদের অভিঘাতে মায়ের চিন্ময় রূপ হৃদয়ের অন্ধকার আলো করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। মাকে দেখার উপায় এতই সহজ।

সহজ উপায় বলিয়াই হয়ত সংশয় আসিবে। কিন্তু সে সব সংশয়ের সহিত কি করিয়া লড়িতে হয়, জান? যুক্তি দিয়া কখনও সংশয় খণ্ডন করিতে যাইও না, ঠকিবে; নিজের যুক্তির গোলোকধাঁধায় নিজেই ফাঁপর হইয়া আরও সংশয়ের জালে জড়াইয়া পড়িবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—সংশয়কে সংহার করিবার অমোঘ বজ্র এই

মায়ের নাম! শুনিয়াছি, মায়ের নাম করিলেই মা ছুটিয়া আসেন; সঙ্কল্প করিয়াছি, মায়ের নাম করিবে; এর মাঝে সংশয় আসিয়া উঁকি দিয়া বলিয়া গেল—তাও কি হয়? আমি বলি, ওর কথায় মোটেই কাণ দিও না—কোন যুক্তি শুনাইও না, শুনিতে চাহিও না—বজ্র-স্ফোটনে শিশু যেমন দুই কাণ চাপিয়া ধরে, তেমনি সংশয়ের একটু রেশ কাণে বাজিয়া উঠিতেই কর্ণকুহর রুদ্ধ করিয়া তারস্বরে বলিয়া ওঠ—মা—মা—মা! এক একটা একগুঁয়ে ছেলে থাকে—চকিতের মত সে মাকে যদি একবার দেখতে পাইল, অমনি সর্ব্বনেশে কান্না জুড়িয়া দিল; মা যতই দূরে সরিয়া যাইবেন, কান্নার বেগ ততই দ্বিগুণিত করিয়া তুলিবে, খেলায় ভুলিবে না, কাজের ওজর বুঝিবে না, ধমক মানিবে না—কেবল প্রাণপণ জেদ ধরিয়া মাটীতে গড়াইয়া গড়াইয়া কাঁদিবে—মা—ও মা—া—া! সে ছেলের মা কি না আসিয়া পারে? সাধ্য কি তার! ছেলের আর্ত্তকণ্ঠের এক একটী ধ্বনিতে মায়ের বুকে যে মুষলের ঘায়ের মত বাজিতে থাকে! চিন্ময়ীর সুধমাখা পরশ যদি চাও, তবে ওই জেদী ছেলের মত হও, সুবোধ ছেলেটীর মত পরের যুক্তি শুনিয়া, পরের উক্তি মানিয়া সব খোয়াইও না।

*

মানুষের বুদ্ধি হইয়াছে এক বালাই। অবিশ্বাসের এই তো গোড়া। যার যত বুদ্ধি বেশী, সে তত অবিশ্বাসী। বুদ্ধিতে দর্শন-শক্তিকে অন্ধ করিয়া দেয়। কচি শিশু আপন মনে হাসে, চোখ টিপে—লোকে বলে দেবতার সঙ্গে খেলা করিতেছে। কথাটা মিথ্যা নয়। শিশুর বুদ্ধির বড়াই নাই, তাই দেবদর্শন তার পক্ষে সহজ। ছেলেভুলানো কত গল্প আছে—আমরা বয়স্ক হইয়া তাহা অবিশ্বাস করি, আর ভাবি, ছেলেগুলো কি বোকা! সাত সমুদ্র, তের নদী, সোণার পাতা, হীরার ফুল—সব তার চোখে সত্য হইয়া ভাসিয়া উঠে, অচিনদেশের রাজপুরীতে যাইতে কোথাও তাহার বাধে না। আমরা বলি, ও সব ফাঁকি। হয়ত তাই। কিন্তু ছেলে যে সরল বিশ্বাসে তা দেখিতে চায় এবং দেখিতে পায়, আমি তাহাকেই বলিহারি যাই। কই, গুরুর বাক্যে আমার অচিনদেশের সাতমহল্লা রাজপুরী তো অমন করিয়া সত্য হইয়া উঠে না। গুরু বলিয়া দিলেন, জ্যোতিঃসমুদ্রে, জ্যোতির্ম্ময়দ্বীপ তাতে জ্যোতির্ম্ময় পুরীতে জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে ওই দেখ জ্যোতির্ম্ময়ী তোর মা! আমি কিন্তু চোখ বুজিয়া কেবল অন্ধকারই দেখিতে পাই। কখনও বা ভাবি, ও সব কবি কল্পনা। মনের আঁধার তাতে আরও ঘনাইয়া আসে। ভাবি, চিরকালই কি এমন ছিলাম? আজ যে চোখ বুজিলেই আঁধার দেখি, কই ছেলেবেলায় মার কোলে শুইয়া যখন রূপকথা বিচিত্র কাহিনী শুনিতাম, তখন তো চোখ বুজিয়া সবই দেখিতে পাইতাম। তখন চোখ মেলিলে দেখিতে পাইতাম সাতরঙা আলোর মায়ার রচা এক জগৎ, আবার চোখ বুজিলেও দেখিতে পাইতাম কল্পনার জীবন্ত প্রতিভাসে গড়া আর এক জগৎ। আজ, বুদ্ধি পাকিয়া আমার এ কি দুর্দ্দশা হইল! বাইরে আমার কাণ খাড়া, চোখে পলক নাই, হিসাবের কড়ির একটী এধার ওধার হইতে পারে না, আর ভিতরের দিকে তাকাইলেই আমি অন্ধ, বধির। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসশূন্য এক বিরাট নাস্তির গহ্বরে তলাইয়া যাই;—এত বুদ্ধি থাকিতে শেষে আমি হইলাম নাস্তিক!

এই বুদ্ধির ফেরেই মাকে দেখিতে পাই না। নইলে শাস্ত্রবাক্য তো মিথ্যা হইবার নয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।" তবে চক্ষু বুজিয়াও তাহাকে পাই না কেন? শাস্ত্র বলিয়াছেন, নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ"—তবে বাইরে চোখ মেলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? আমার ভিতরেও যেমন আঁধার, বাহিরেও তেমনি আঁধার। এ কি বুদ্ধির ফের নয়?

আজ সহজ দৃষ্টি হারাইয়াছি, তাই আমি চাই কিস্তূত-কিমাকার দর্শন। আবার সে চাওয়ার একটা ধারা আছে কি? মায়ের নাম নিয়া কত বড়াই করি, কিন্তু এখনও কি আমি স্থির করিয়াছি, মায়ের কোন্ রূপটী আমি চাই? ভগবান্ বলিয়াছিলেন, যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের কিছু হইবার নয়, তাহাদেরই বুদ্ধির কূল-কিনারা নাই, বুদ্ধির ডালপালারও অন্ত নাই। আমারও তো ঠিক সেই দশা। মুখে বলি, মা-টী চাই মনের মত, কিন্তু মন কি আমার মায়ের দিকে আছে যে তার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী অরূপাকে সে রূপে ফুটাইয়া তুলিবে! একমুখী বুদ্ধি নাই বলিয়াই অবিশ্বাসে আর মন ছাইয়া গিয়াছে। গুরু যাহা বলেন, তাহাতেই একটা খট্‌কা থাকিয়া যায়, অথচ নিজেও স্থির করিয়া একটা কিছু ধরিতে পারি না। মা গো, আমার এ দুর্গতি কবে দূর হইবে মা!

লোকে বলে, সাধন কর,—তবে পাইবে। এই তো আমার অবস্থা; সবই খুলিয়া বলিলাম। এই সম্বল নিয়া সাধন করিব? আমি কি বুঝিয়াছি, কি পাইয়াছি, যে তাহাই ধরিয়া সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিব। সাধনার কথা শুনিয়া একদিন গুরু হাসিয়া বলিলেন, "তুই ধরবি শশী হয়ে বামন!" ভাবিয়া দেখিলাম, তাই তো। সাধন তো কর্ম্ম! যে কর্ম্মের সঞ্চয় লইয়া জগতে আসিয়াছি, তাহারই ঠেলা সামলাইতে পারিতেছি না, আবার নূতন করিয়া কর্ম্ম জুটাইব? কে জানে, তাহার পরিণাম হইবে কি? কর্ম্মপাশ এড়াইতে হইবে, তাই যদি সত্য হয়, তবে সাধনপাশ এড়াইতে হইবে না কি? গুরুকে গিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক, সে বেটী কত গণ্ডা প্রাণায়ামের বশ, তার কোনও চুক্তিনামা তোকে লিখিয়া দিয়াছে কি? গুণাতীতা, কর্ম্মাতীতা যে, সে তোর কর্ম্মে বাঁধা পড়িবে—এত বড় অভিমান তোর?" তবে উপায়? "উপায় শুধু তার নাম! যুক্তিতর্কের ধার ধারিস্ না, অতিবুদ্ধদের কথা শুনিস্ না, কেবল শিশুর মত সরল বিশ্বাসে অনুভব কর—সে আছে, তোকে বুকে করিয়া, স্নেহের শত পাকে জড়াইয়া আছে। নিজের বুকের স্পন্দনে তারই বুকের স্পন্দন শুনিতে পাইব, নিজের নিঃশ্বাসে তারই সুরভিশ্বাসের অনুভব পাইব, প্রতি রোমকূপে তারই সুতনুর আনন্দপরশ পাইবি! তুই শুধু আকুল কণ্ঠে ডাক—মা—মা—মা! জানিস্ ওই নামে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীরও বুকে তোলপাড় ওঠে, স্তনে ক্ষীরের ধারা আপনি ছুটে! ওরে ও অভাগা—তুই-ই শুধু মাকে চাস্—এই তোর বড়াই। সে কি তোরে চায় না রে! ছেলে মাকে ভুলতে পারে—মা কি কখনও ছেলেকে ভুলে!"

এ কথা যে দিন শুনিয়াছি, সেই দিন হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছি—আর কারুরও কথায় ভুলিব না। মায়ের তত্ত্ববিচার যে করে, সে ছেলে তো ভারী জ্যাঠা। আমি জানি পাওয়ার একমাত্র পথ—শিশুর মত কণ্ঠে মধুর মমতা ঢালিয়া মায়ের পরাণ গলাইয়া ডাকা—মা—ওমা—মা!



আরণ্যক



"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

— ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।২।৮

যে গুণগুলি আমার ভাল লাগে, সেগুলি যার মাঝে দেখি, তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। যেখানে আমি মুগ্ধ হচ্ছি, বাস্তবিক পক্ষে মোহের বস্তু সেখানেই আবদ্ধ নয়—তা আমার মাঝেই। সৃষ্টিকর্তা প্রথমে নিজের মাঝেই জগৎ কল্পনা করেন, তার পর বাইরে তা রূপ ধরে ফুটে ওঠে। শিব চোখ বুজে যে সৌন্দর্য্য ধ্যান করলেন, বাইরে তাই পার্ব্বতীরূপে তাঁর কাছে প্রকাশিত হলেন। সৌন্দর্য্য বাইরে নয়—ভিতরে। কস্তুরী তো মৃগের নাভিতেই থাকে, কিন্তু সে তার গন্ধে আকুল হয়ে সারা বন খুঁজে বেড়ায়—মানুষের দশাও অমনি।

*

মানুষ সেই, যাঁর মানের হুঁশ রয়েছে অর্থাৎ যার আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত সচেতন। এই আত্মসম্মানজ্ঞান আসে আত্মার মহিমা-জ্ঞান থেকে। এক দিন যে ভূমা ছিল, আজ সে নিজকে মনে করছে ক্ষুদ্র, কিন্তু তবুও বৃহত্তের সংস্কার তার মাঝে রয়ে গিয়েছে। তাই সে অপরের কাছে মাথা নোয়াতে চায় না। যার মাঝে এই সংস্কার যত প্রবলভাবে জাগ্রত হবে, তার মাঝেই আত্মসম্মানজ্ঞান বেশী ফুটবে। তাই মানুষ অপর জীবের তুলনায় নিজের মান নিয়ে বেশী ব্যস্ত। যাঁর মাঝে চৈতন্য-পুরুষ যত জাগ্রত, তাঁর কাছে সুপ্ত চৈতন্য মানুষ মাথা হেঁট করবেই। তাই এই আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ করাই হল বড় হওয়ার প্রধান উপায়। আত্মার মহিমজ্ঞান সেদিন সুস্পষ্ট হবে, আত্মসম্মানের গৌরব যেদিন আপনি আসবে। তার আগে কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির গোলামী করা।

*

বিনয় হচ্ছে অপর সকল মনের চাবি। এ চাবি থাকলে সকলের ঘরে প্রবেশ করা সহজ হয়। বিনয়ের উৎপত্তি নিরভিমান থেকে। অভিমানই মানুষকে ছোট করে। একমাত্র বিনয় দিয়ে মহাশক্তিমানের সকল শক্তি আয়ত্ত করা যায়। মানুষ ভাবে যে মাথা নোয়ালেই বুঝি সে খাটো হবে, কিন্তু দেখেও দেখে না যে ধনুকের দণ্ডটার প্রান্ত দুটা নোয়াতেই তার জোর বাড়ে।

*

দলের যিনি নেতা, অপরের কাছে তাঁকে আনন্দঘনবিগ্রহ মূর্ত্তি হতে হবে। অতি ব্যথাতুরও তাঁর সান্নিধ্যে এসে প্রাণ জুড়িয়ে আনন্দ পেয়ে যাবে। তিনি যেমন দুর্ব্বলের আশ্রয়, অত্যাচারীর দণ্ডদাতা, তেমনি

আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর কাছে অপরাধ করে লুকোবার ইচ্ছা হবে কেন? বরং তাঁর হস্তে নিজকে সমর্পণ করে অপরাধ স্বীকারের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌বে। প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে অপরকে তিনি এমনি নিশ্চিন্ত নির্ভয় করবেন।

*

এক দিকে আমরা নিতান্ত ছোট, আর এক দিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটাতে সবাইকে বাদ দিয়ে, স্বতন্ত্র হয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখ্‌তে চাই—সে দিকটাতেই আমি বিন্দু মাত্র, সেখানে আমি সঙ্কুচিত, আমার মত ছোট আর তখন কেউ নাই। আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে ধরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, সেই ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বড় আর কে?

*

নিজকে যতই দীন বলে জান্‌তে পারব, তাঁর প্রেমকে ততই বড় করে বুঝ্‌ব। জ্ঞান পেলে মানুষ নিজকে জ্ঞানী বলে গর্ব্ব করে থাকে, কিন্তু প্রেম পেলে নিজকে অতি তুচ্ছ, অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। তাঁর কাছে ভিখারী সাজতে হবে, চিরদিনের জন্য ভিখারী। একটুখানি প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা পেয়েই যদি নিজকে ধন্য মানি এবং অহঙ্কারে ফেঁপে উঠি, তবে ত নিজের দোষেই অল্প ভিক্ষা নিয়ে ফিরে আসতে হবে। তাঁর কাছে যে অনন্ত ভাণ্ডার। অভাব পূরণ না হতেই, ফিরে আসলে নিজের ভাণ্ডারটি অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই অথৈ সলিলে ডুবে যেন আকুলি বিকুলি করে প্রাণ বিসর্জ্জন না দিই। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হবে, সুধারসে ততই তা ভরে উঠ্‌বে। চাই শুধু দীনতা, আর হীনতা।

*

যে চিন্তা এসে ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়, তারই নাম কুচিন্তা। যে কর্ম্মে মানব নিজকে হারিয়ে বসে, হৃদয় দেবতার কথা স্মৃতি পথে ক্ষণেকের তরেও উদিত হয় না, তারই নাম কুকর্ম্ম। ঠিক ঠিক কর্ম্ম করা হবে কখন? যখন অনর্গল অবিশ্রান্ত কার্য্যস্রোতে পড়েও নিজকে স্বতন্ত্র রেখে প্রবর্ত্তয়িতার দিকে অচল লক্ষ্য থাকবে। নিরাসক্ত না হলে ঠিক ঠিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না। কাজ কর্ম্মে জড়িয়ে পড়া কাজের উদ্দেশ্য নয়, কাজের উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ করা। তাই মানব এক দিকে কর্ম্ম কচ্ছে, আর এক দিকে মুক্ত হচ্ছে। মানবের কর্ম্ম এবং লক্ষ্য দুই ই আছে অন্য প্রাণীর তা নাই। গাছ ফল দিচ্ছে, পথিককে ছায়া দিচ্ছে, কিন্তু জানে না কেন দিচ্ছে। কেবল কর্ম্ম তাতে বর্ত্তমান—লক্ষ্য নয়। মানুষ জানে কর্ম্মে ফল আছে, মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, তাই আরাম নাই, বিরাম নাই—প্রাতঃ হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল কর্ম্মেরই সাধনা।

*

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়জালে আবদ্ধ করে রাখে, কিন্তু চিত্ত যদি একটিবার কোনমতে বিষয়ের ভিতর থেকে বিষয়াতীত ভগবানের পরশ পায়, তবে গুটিপোকা যেমন গুটি কেটে বের হয়, তেমনি আসক্তিও আপনি কেটে যায়।

*

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানিচ।" সুখ-দুঃখের চাকা কেবলই ঘুরছে, এর মাঝে এক জন ধ্রুব হয়ে বসে আছেন। তাঁকেই বল্‌ব ভগবান। লক্ষ্য স্থির করতে হবে সেই ধ্রুবের দিকে মন দিয়ে—চলার দিকে নয়, তাহলে মন কেবল চল্‌তেই থাকবে। চক্রের অহরহঃ ঘূর্ণিপাকের মাঝে লক্ষ্য দেখা বড় শক্ত, কিন্তু সিদ্ধ যদি চাই, প্রথমে স্থির করতে হবে লক্ষ্যটিকেই।

*

জগতে ধ্বংস নাই কারো, সবই লীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় মাত্র। ছোট আর বড় দুটো জিনিষের যখন মিল হয়, তখন ছোটটি বড়টির মাঝে ডুবে যায়, তাতে ধ্বংস কিম্বা বিলোপ সাধন হয় না। একের যেখানে আধিপত্য, অপরের পরাজয় সেখানে অবশ্যম্ভাবী। এক বিন্দু জল যখন সাগরে মিশে, তখন তাকে আলাদা করে জল বলা হয় না, সাগরের জলই বলা হয়। আমি যখন বড় "আমির" সঙ্গে মিশে যাই, তখন "আমি" যে হারিয়ে যাই তা নয়, তারই আমি হয়ে থাকি। আমার সঙ্কীর্ণ আমি নিমেষে অপসারিত হয়ে যায়, তখনই আমি মুক্ত।

*

"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে—আসক্তি দ্বারা নয়। ত্যাগ মানে, কামকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, দুঃখকে ত্যাগ সুখের জন্য, এমনি ছোটকে ত্যাগ বৃহৎএর জন্য। নিজকে রিক্ত করবার জন্য ত্যাগ নয়, পূর্ণ করবার জন্যই। কাম কেবল খণ্ডের প্রতি আসক্ত, সঙ্কীর্ণ জায়গায় আবদ্ধ; আর প্রেমের বাঁধন জগৎজোড়া। তাই প্রেমিক পাপী পুণ্যবানকে এক দৃষ্টিতে দেখ্‌ছেন। পূর্ণ হওয়া মানে, সামঞ্জস্য রেখে চলা।

*

বোধই হচ্ছে তপস্যার মূল, আর তার বাধা হচ্ছে রিপু। প্রবৃত্তি যখন অসংযত হয়ে উঠে, তখন চিত্তের সাম্যও থাকে না—বোধ হয়ে যায় বিকৃত। এজন্যই ব্রহ্মচর্য্যের সংযম দ্বারা বোধ শক্তিকে বাধা মুক্ত করা। সাময়িক উত্তেজনা এসে লোকের চিত্তকে, বুদ্ধিকে সামঞ্জস্য ভ্রষ্ট করে দেয়, তা হতে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সোজা পথে চল্‌তে দিতে হবে। সত্যের প্রতি আন্তরিক টান, প্রবৃত্তি দমন করবার প্রবল ইচ্ছা, এ দুটো যেথানে বর্ত্তমান, সিদ্ধি সেখানে অনায়াসলভ্য।

*

যেখানে অনেক মানবের সম্মিলন, সেখানে বিচিত্রবুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত আপনি জেগে ওঠে। ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের অন্তরের নিগূঢ়তম শক্তির বিকাশ হয়—চিত্ত নির্ম্মল হয়ে যায়। শক্তি জেগে উঠ্‌লে ক্ষেত্রও তার জন্য তৈরী হয়ে আসে।

*

জীবন চল্‌ছেই দোটানায়, এক দিকে আকর্ষণ অন্য দিকে বিকর্ষণ। তেমনি সুখ দুঃখ সম্পদ-বিপদ। একটিকে ছেড়ে যেন অন্যটি বাঁচে না। সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা মহাপুরুষেরও আছে, তবে তাদের প্রতাপে তাঁরা উদ্বিগ্ন

হয়ে পড়েন না। শত্রু এসে যদি প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে ত তাদেরই পরাজয়। যাকে আমরা অমঙ্গল বলে থাকি, সে এক হিসাবে আমাদের মঙ্গলের জন্যই। কেননা ওতে আমাদের সাহসের বৃদ্ধি হয়, সতর্কতার শিক্ষা হয়। ঔষধ খেতে হয়ত নিতান্ত কটুতিক্ত কিন্তু ওতেই রোগ আরাম হয়। আগুনে পুড়েই আগুন হতে অব্যাহতি পাই, জলে ডুবেই ডুব শিখি। দুঃখ আসে জাগাতে, অভিভূত করতে নয়। তাই প্রেমিকের নিকট দুঃখের দারুণ জ্বালাও প্রিয়তমের সোহাগের মত মধুর। বিরহ এলেই ভগবানের কথা হৃদয় তন্ত্রে বেজে উঠে।

*

বিধি-নিষেধের ভয় থাকলে, জ্ঞান, ভক্তি কর্ম্ম কিছুই ঠিক ঠিক ভাবে ফুটে উঠে না। বিধি নাই নিষেধ নাই প্রাণে যে প্রেরণা আসছে তদনুযায়ী কর্ম্ম করে যাব, সহজ স্রোতে জীবনতরী চালাব, এ হল প্রাণখোলা মানুষের কথা। ভয় থাকলে সঙ্কোচ আপনি আসবে। সঙ্কোচ থাকলেই ঠিক ঠিক ভালবাসা, অনুরাগ সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই মহাপুরুষেরা বলেছেন, "ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। প্রকৃত প্রেম প্রীতি হলে, বিধি-নিষেধের সাধ্য কি যে কাউকে বেঁধে রাখতে পারে। ধরলাম হাতে পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে, শরীরের উপর নানা নির্য্যাতন করা হল, এতে তার হবে কি, মনকে ত আর বাঁধা যায় না। প্রেমের যোগ যে মনে মনে, তাই প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে পড়েও নিশ্চিন্ত। আইন বিধি কার জন্য? যারা সহজ পথে চলতে চায় না। আপনি ধরা দিলে তার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হবে কেন? বিধি নিষেধ হচ্ছে জগৎকর্ত্তার ওয়ারেণ্ট। ধরা দেই না বলেই প্যাদা পুলিশকে পাঠিয়ে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যায়। ছলে বলে কৌশলে, ভগবান যাকে যেভাবে পারেন, সেই ভাবে টেনে আনেন। তবে অনুকূল স্রোতে চললে, তরী সহজে উজিয়ে যায়, আর প্রতিকূলে গেলে বেগ পেতে হয়। 'বেগ পেয়েই আবার অনুকূলে ফিরতে হয়।



নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে সশিষ্যে তাঁহার পদার্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্ত্তিক হইতে ৩রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং যে সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক ব্যায়াদি নির্ব্বাহ জন্য জন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে; এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম. উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তগণের বাসস্থানের বন্দোবস্ত ও আহার্য্য সংগ্রহ পূর্ব্ব হইতেই করিতে হইবে। ৬ মাইলের ভিতরে উপযুক্ত কোন হাট বাজার নাই। বিশেষতঃ অন্যান্য আশ্রমে ভক্তসম্মিলনী উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তদের বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবার ভার যেরূপ আশ্রম সংশ্লিষ্ট সদস্য ও ব্রহ্মচারিবর্গ লইয়া থাকেন, কুতুবপুরে সেরূপ ভার গ্রহণ করিবার কোন লোক নাই। এই সমস্ত কারণে পুনঃ ভক্তগণের নিকট নিবেদন যে যাঁহারা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক জন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে সত্বর পাঠাইয়া দিবেন; এই টাকা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার পর দিলে চালবে না। যাঁহারা পূর্ব্বে টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার কোন প্রকার দায়িত্ব আমাদের থাকিবে না। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পাকা মন্দির প্রস্তুত হইতেছে; কয়েকখানা ঘরও প্রস্তুত হইয়াছে; এই আশ্রমটী অন্য কোনও আশ্রম অন্তর্গত নহে. ইহা সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীর পীঠস্থানস্বরূপ। আশ্রমটী স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। তাই সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে মন্দিরাদি নির্ম্মাণকল্পে প্রত্যেকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্যদানে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

যাঁহারা উৎসবে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা সঙ্গে বিছানা বিশেষতঃ মশারি আনিবেন। সম্ভবপর হইলে নিজ ব্যবহারের জন্য কেহ কেহ লণ্ঠন ও ঘটী আনিলে ভাল হয়।

কুতুবপুর আশ্রমে যাওয়ার পথের বিবরণ—

গোয়ালন্দ কলিকাতা লাইনে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া মোটরে ১৮ মাইল পথ মেহেরপুর যাইবে। মোটর ভাড়া জন প্রতি ১৲ এক টাকা, ১ ঘণ্টা সময়ে যাওয়া যায়। মেহেরপুর হইতে আশ্রম ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে, নৌকাতে ২ ঘণ্টা, কিম্বা মোটরে আধ ঘণ্টায় পৌঁছা যায়; মোটর ভাড়া জন প্রতি ॥০ আট আনা।

প্রধান প্রধান ট্রেনগুলি চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে পৌঁছিবার সময় নিম্নে লিখা হইল।

শিলিগুড়ী প্যাসেঞ্জার ও আসাম মেল	... ...	প্রাতে ৯—৫৮ মিনিট
চট্টগ্রাম মেল	... ...	বৈকালে ৪—৪১ মিনিট
ঢাকা মেল	... ...	রাত্রি ১—৪৯ মিনিট
দার্জ্জিলিং মেল	... ...	রাত্রি ২—৪৩ মিনিট
সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	... ...	রাত্রি ৩—৫ মিনিট
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	... ...	ভোর ৫—৫০ মিনিট

(কার্ত্তিক মাসে সময়ের সামান্য পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব)

দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের ভক্তগণ কলিকাতা হালিসহর নৈহাটী ও রাণাঘাট প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে অনেক ট্রেনেই চুয়াডাঙ্গা পৌঁছিতে পারিবেন। প্রধান প্রধান ট্রেনের সঙ্গে মোটর সার্ভিসের যোগ আছে।

চিঠিপত্র লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত এম, এ, বি এল, সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

(অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

সংবাদ ও মন্তব্য

—*()*—

আশ্রম-সংবাদ

শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীতেই আছেন। তদীয় জন্মভূমিতে উৎসব ও আশ্রমস্থাপন-অন্তে মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম (জয়দেবপুর, ঢাকা) ও পূর্ব্ববাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম (ময়নামতী, কুমিল্লা) পরিদর্শন করিতে যাইবেন, এরূপ কথা আছে।

গ্রন্থপরিচয়

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—অতি ক্ষুদ্র পকেট সংস্করণ।—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ঘোষ দ্বারা কলিকাতা ৭নং গৌর-মোহন মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৶০। অতি পরিষ্কার বাঙ্গালা অক্ষরে গীতার মূল মাত্র ছাপা হইয়াছে। নিত্য গীতাপাঠীর সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"চট্টগ্রাম জেলার উত্তর ব্রাহ্মণডেঙ্গা নিবাসী শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী নামে একটী যুবক কিছুদিন যাবৎ আসাম সারস্বত মঠে সেবকভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। ইদানীং অত্র আশ্রমে প্রেরিত হইয়াছিল। মাঘমাসে আমি তাহাকে আশ্রমের ভার দিয়া প্রচারার্থ পশ্চিমোত্তর ভারতে গমন করি। সম্প্রতি আশ্রমে আসিয়া যোগেনের বিরুদ্ধে গ্রামবাসী গুরুভাইদিগের নিকট নানা কথা শুনিয়া এবং অর্থাদি সম্বন্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রমাণ পাইয়া তাহাকে বাধ্য হইয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি। আমাদের মঠ ও আশ্রমগুলির সঙ্গে তাহার আর কোনও সম্বন্ধ রহিল না। তাহার কৃতকার্য্যের জন্য অতঃপর আর আমরা দায়ী নহি।

(স্বাক্ষর) স্বামী শুদ্ধানন্দ

অধ্যক্ষ, দক্ষিণবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম (হালিসহর)



দানপ্রাপ্তি-স্বীকার

—:{*}:—

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানে আশ্রম-স্থাপন উপলক্ষ্যে—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র রায়	খিতপুর (২য় দফা)	৫০৲
শ্রীঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী	মুজাটা	৫০৲
শ্রীক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী	হাওড়া	৫০৲
শ্রীউমেশচন্দ্র গোস্বামী	তাড়াস	৩০৲
শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	আকিয়াব	২৫৲
শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস	চট্টগ্রাম	২৫৲
শ্রীনর্ম্মদাকুমার দাস	মৌলবীবাজার	২৫৲
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী কুলদাসুন্দরী ঘোষ	তুরা	২০৲
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য	চট্টগ্রাম	২০৲
শ্রীশিবদয়াল পাল	আলীপুরদুয়ার	১০৲
শ্রীহরিচৈতন্য দাস	ময়মনসিংহ	১০৲
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গোয়াড়ী ৪র্থদফা	১০৲

শ্রীরসিক চন্দ্র শীল	চট্টগ্রাম	১০৲
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১০৲
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	সমস্তীপুর	১০৲
শ্রীহরপ্রসাদ রায়	বগুড়া (১ম দফা)	১০৲
শ্রীগগনচন্দ্র দাস	শিলং	১০৲
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় জানা	মেদিনীপুর	৫৲
শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার	আলীপুর	৫৲
শ্রীবসন্তকুমারী রায়	জগৎসী	৫৲
শ্রীননীলাল চট্টোপাধ্যায়	হুগলী	৫৲
শ্রীকরুণাসিন্ধু প্রামাণিক	সাঁওতালপরগণা	৫৲
শ্রীঈশানচন্দ্র দেব	জগৎসী	৫৲
শ্রীনৃসিংহপদ পাল	গোয়াড়ী	৫৲
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত	বগুড়া	৫৲
শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী	ঐ	৫৲
শ্রীতারানাথ দাস মণ্ডল	ধুবড়ী (২য় দফা)	৫৲
শ্রীযমুনাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	হুগলী	৫৲
শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	৫৲
শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	পাবনা	৫৲
শ্রীসতীশচন্দ্র চাটার্জ্জী	কলিকাতা	৪৲
শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	চট্টগ্রাম	৩৲
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৪ পরগণা	২৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়	ফরিদপুর	২৲
শ্রীবিহারীমোহন শর্ম্মা	জগৎসী	২৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার	পুটীয়া	২৲
শ্রীঅমলেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা	চট্টগ্রাম	২৲
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পূততুণ্ড	বগুড়া	২৲
শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ দাস	ঐ	২৲
শ্রীহরিনাথ কর	ঐ	২৲
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	ঐ	২৲
শ্রীশশীকুমার দাসগুপ্ত	ঐ	২৲
শ্রীললিতচন্দ্র গুহ	ঐ	২৲
শ্রীমতী শরৎশশী গুপ্তা	ঐ	২৲
শ্রীমতী শঙ্করী দেবী	ফরিদপুর	২৲
শ্রীদ্বারকানাথ সিংহ	কুচবিহার	১৲
শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী গুহ	বগুড়া	১৲
শ্রীমতিলাল বিশ্বাস	ফরিদপুর	১৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল	ফরিদপুর	১৲
শ্রীনাগরচন্দ্র পোদ্দার	ঐ	১৲
শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়	চক্রধরপুর	১৲
জনৈক সেবিকা		।৵৹

মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে—

শ্রীরুক্মিণী সিং		৫৲
কে, এল বরুয়া		৫৲
এস্. এন্ দাসগুপ্ত		২৲
শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল		২৲
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		১৲
শান্তিনিকেতন মেছ		১৲
শ্রীললিতলাল মিত্র		১৲
শ্রীতপোনাথ সোম		১৲
শ্রীমনোরঞ্জন গোস্বামী		১৲
শ্রীযদুনাথ বটব্যাল ও দক্ষিণাচরণ তফাদার		১৲
ঢাকা মেস		১।০
লাবান ডাক্তার		॥০
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	লাবান	॥০
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত		॥০
শ্রীশশধর মজুমদার		॥০
শ্রীরোহিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য		॥০
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী		॥০
জনৈক আশ্রম হিতৈষী		॥০
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		॥০
শ্রীনিতাইচাঁদ দাস		।০
শ্রীহরিদাস দত্ত		।০
শ্রীযামিনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী		।০
শ্রীমৃণালবন্ধু রায়	স্বাস্থ্যনিবাস	।০





ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ | কার্ত্তিক | দ্বিতীয় খণ্ড
সমষ্টি সং ১৯৮ | | প্রথম সংখ্যা

ইন্দ্রায়

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৩।১]

—*()*—

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

——*——

ইন্দ্র দৃহ্য যামকোশা অভূবন্
যজ্ঞায় শিক্ষ গৃণতে সখিভ্যঃ।
দুর্ম্মায়বো দুরেবা মর্ত্ত্যাসো
নিষঙ্গিনো রিপবো হন্ত্বাসঃ॥

দৃঢ় হও হে বাসব, আছে অরি আগুলিয়া পথ;
বন্ধু যারা, স্তুতি গায়, তাহাদের 'পূর মনোরথ;
হিংস্র অতি দুষ্টগতি রিপু যত—নিকট মরণ
তুমি মৃত্যু সে সবার—তবু তূণ করিছে ধারণ!

স ঘোষঃ শৃণ্বেবমৈরমিত্রৈর্
জহী ন্যেষশনিং তপিষ্ঠাম্।
বৃশ্চেমধস্তাদ্বিরুজা সহস্ব
জহি রক্ষো মঘবন্ রন্ধয়স্ব॥

ঐ এল রিপু যত, শুনি তাই ভীম গরজন,
বহ্নিজ্বালা বজ্র তব, হে বাসব, কর প্রহরণ;—
মরমে পীড়িয়া মার, খণ্ড কর, চূর্ণ কর কায়,
ধ্বংস কর রক্ষঃকুলে--যজ্ঞে যেন বাধা না ঘটায়!

উদ্বৃহ রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র
বৃশ্চা মধ্যং প্রত্যগ্রং শৃণীহি।
আ কীবতঃ সললূকং চকর্থ
ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য॥

আসে ইন্দ্র রক্ষঃ যত, মুল সহ ফেল উপাড়িয়া,
ছিন্ন কর মধ্যভাগ— অগ্রভাগও দাও না ছিঁড়িয়া!
আসে যত ব্রহ্মদ্বেষী, দূর হতে নাও খেদাড়িয়া,
মর্ম্মদাহী প্রহরণ শত্রু পরে দাও না ছুঁড়িয়া!

স্বস্তয়ে বাজিভিশ্চ প্রণেতঃ সং
যন্মহীরিষ আসৎসি পূর্ব্বীঃ।
রায়ো বন্তারো বৃহতঃ স্যামা-
স্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান্॥

সবার নায়ক তুমি, হে বাসব, আসিয়াছ কাছে,
স্বস্তি হোক, অশ্ব সহ অন্নভার আসিতেছে পাছে!
তোমারি করুণাবলে বিত্তরাশি করি যেন ভোগ,
পুত্র পাই মনোমত— আজি ইন্দ্র হোক শুভযোগ!

আ নো ভর ভগামন্দ্র দ্যুমন্তং
নি তে দেষ্ণস্য ধীমহি প্ররেকে।
ঊর্ব ইব পপ্রথে কামো অস্মে
তমা পৃণ বসুপতে বসূনাম্॥

দাতা তুমি হে বাসব, দীপ্ত কর ভাগ্য সবাকার,
নিত্য ক্ষরে তব দান, আমাদেরো কর না আঁধার!
বাড়ব অনল সব কামনা যে দিনে দিনে বাড়ে—
তুমি তো গো সম্পদের অধিপতি—পূর্ণ কর তারে!

ইমং কামং মঘবা গোভিরশ্বৈ-
শ্চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ।
স্বর্যবো মতিভিস্তুভ্যং বিপ্রা
ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্॥

গোধনে তুরঙ্গে আর ধনধান্যে পূর মনস্কাম,
দীপ্ত হোক্ গৃহখানি, বিশ্বমাঝে রটে যাক্ নাম—
কুশিকের কুলে যত আছে বিপ্র স্বর্গ-অভিলাষী,
কুশাগ্রমতিতে তারা তব তরে রচে স্তবরাশি!

আ নো গোত্রা দর্দৃহি গোপতে গাঃ
সমস্মভ্যং সনয়ো যন্তু বাজাঃ।
দিবক্ষা অসি বৃষভ সত্যশুষ্মো-
ঽস্মভ্যং সু মঘবন বোধি গোদাঃ॥

গোপতি বাসব তুমি, গোত্র ভেদি বহাও গো-ধার,
আসুক মোদের তরে স্বাদু অতি অন্ন ভারে ভার!
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, সত্যবীর্য্য, ছেয়েছ দ্যুলোক,
জাগো দেব মঘবন্, আঁখিপাতে বিতর আলোক!

———:*:———

প্রকৃতি-পূজা

—:(*):—

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ' মায়ের মূর্ত্তি এই নিত্য জগন্মূর্ত্তি। এই জগৎকে স্থূল অচেতন ভাবিয়াই তো আমরা দুঃখ পাই, বিরহের সন্তাপে পুড়িয়া মরি। এই সাক্ষাৎদৃষ্ট রূপ তাঁহারই রূপ, এই অনুভূতিতে যাহার অন্তর উজ্জ্বল হইয়া আছে, মায়ের দেখা পাইতে তাহাকে আতি-পাঁতি করিয়া খুঁজিতে হয় না। বিশ্বপ্রকৃতিই তাহার কাছে মায়ের প্রতীক, নিরন্তর প্রবহমান কালই তাহার পূজার প্রকৃষ্ট সময়। পণ্ডিতম্মন্যেরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রাচীনকালে আর্য্যেরা প্রকৃতির পূজা করিত; আমরা তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্য—তাই লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভাবিয়াছিলাম, "ও মা, তাই তো, কি ঘেন্না!" কিন্তু এখন মনে হয়, প্রকৃতির পূজা করিব না তো কার পূজা করিব? নিজের অহংকারের? প্রকৃতির বিচিত্র আবর্ত্তনের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, তাঁহার পূজা আমরা করিব আর কি—তিনিই যে পূজিতার বেশে নিত্য চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া প্রাণে অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছেন! প্রকৃতির শিশু এই মানব—বিশেষ বিশেষ ঋতুতে প্রকৃতির প্রেরণায় প্রাণে যে উন্মাদনা অনুভব করে, তাহারই স্বাভাবিক রূপ দেয় সে পূজার আয়োজনে। এ পূজা তো তাহার মনঃকল্পিত পূজা নয়—এ যে মা-ই করুণা করিয়া তাহার নিকট হইতে পূজা আদায় করিয়া লইতেছেন—সন্তানের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা আমরা কি তাঁহাকে চিনি, না জানি, যে পূজা করিব! অবোধ সন্তানকে পূজা করিতে না শিখাইলে সে কি করিয়া বুঝিবে, কখন কি করিলে তাহার কল্যাণ হইবে?

শরতের পরিপূর্ণতার মাঝে শরৎবাণীর অর্চ্চনা হইয়া গিয়াছে। কে এই পূজার প্রেরণা প্রথম অনুভব করিয়াছিল, তাহা লইয়া ইতিহাস বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে থাকুক। আমরা দেখি, এই পূজায় বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতির কি অপরূপ সামঞ্জস্য—বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে। বর্ষার অবসানে দুর্দ্দিনের ঘনঘটা ঘুচিয়া গিয়া শরতের নির্ম্মল আলোক যখন দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া শ্যামায়মান শস্যক্ষেত্রে লুটাইয়া পড়ে, তখন বাস্তবিকই যে কবির ভাষায়—"মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে!" পুরাণকার বলেন, এই সময় দেবীর অকালবোধন, নইলে প্রকৃতির জাগরণ বসন্তের স্পর্শে। হাঁ, কথাটা ঠিক। কিন্তু জীবনে অকালবোধনের কি প্রয়োজন নাই? বর্ষাবিধৌত এই বাংলাদেশে বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতির সহসা পরিপূর্ণ নির্ম্মল মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশ—এই সহসা জাগরণের একটা অপূর্ব্ব মহিমা প্রাণে অপরূপ পুলকের সঞ্চার করে না কি? আরও একটু রহস্য এই, এই পুলকচঞ্চলতা শুধু বাংলায় নয়—আর্য্যাবর্ত্ত জুড়িয়া। অকালবোধনের উদ্‌গাপক ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র; উৎসবের দিনে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু উত্তরাখণ্ড ভুলিতে পারে নাই। তাই এই অকালবোধনের উপলক্ষ্যে তাহারা শৌর্য্যাবতার শ্রীরামচন্দ্রের

বিজয়োৎসবে মাতিয়া উঠে। পূর্ব্বকালে রাজা রাও নাকি এই শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন—সুপ্ত ক্ষাত্রশক্তি শরতের স্পর্শ সহসা জাগিয়া উঠিত। উত্তরাখণ্ডে রুক্ষ প্রকৃতি—সেখানে পৌরুষের জাগরণ স্বাভাবিক, শক্তি মদে মত্ত হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া দশপ্রহরণ ধারিণীর অকালবোধনও কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এই সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা দেশে মাকে ভিন্ন রূপে দেখা দিতে হইয়াছে। আমাদের বোধন—শৌর্য্যবীর্য্যের নয়, স্নেহ-মমতার। শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া আমরা মায়ের হাতে দশপ্রহরণ দিই বটে, কিন্তু সত্য বলিতে কি, বাঙ্গালী জানে, ওগুলা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আগমনীর সানাইয়ে যে সুর বাজিয়া উঠে, মহিষাসুরমর্দ্দিনীর আগমনসূচক ভেরীনিনাদের সহিত তাহার মোটেই মিল নাই—সে সুর যে মেনকামায়ের সেই প্রবাসী মেয়েটীর জন্য কেবল আকুল হইয়া আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া কাঁদিয়া ফিরে! বিজয়ার দিন শত্রুজয়ের প্রচণ্ড উল্লাসে বাঙ্গালী মাতিয়া উঠিবার কল্পনা করে না—ভোর না হইতেই অঙ্গনতলে বিরহী শঙ্করের শিঙাধ্বনি শুনিয়া বিদায়ব্যথায় তাহার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠে! থাক্ না মায়ের হাতে দশ প্রহরণ, আমরা কিন্তু পূজা করি—একটী মিলনাকুলা বিরহবিধুরা সম্বৎসর ধরিয়া প্রবাসী, আদরিণী মেয়ের!

এইখানে বুঝিতে পারি, প্রকৃতিপূজার কি পরম সার্থকতা। হে ভাবুক, একবার শরতের বাংলায় শ্যামলভূমিতে ফেনায়মান কাশকুসুমের উচ্ছ্বাসের মাঝে দাঁড়াইয়া ভাবিয়া দেখ দেখি, কাহাকে তোমার মনে পড়ে? দিগ্বিজয়ের অভিযানে এই শ্যামসম্ভার পদদলিত করিয়া যাইতে কাহারও ইচ্ছা হয়—না প্রবাসী তনয়াকে দুদিনের জন্য ঘরে আনিয়া বুকে চাপিয়া চোখের জলে স্নান করাইতে ইচ্ছা হয়! বাস্তবিক শরতের বাংলা মেয়েরই রূপ বটে।

প্রকৃতিপূজার আর এক পর্ব্ব তাহার পরের পূর্ণিমাতে। সে তিথিতে লক্ষ্মীর আবাহন। ভাবিয়া দেখ দেখি, ঠিক উপযুক্ত সময়টীতে শ্রীর আবাহন হয় নাই কি? মায়ের পূজা আধ জ্যোৎস্নায় সপ্তমীতে, আর লক্ষ্মীর পূজা পূর্ণিমাতে—দুয়ের তাৎপর্য্য আছে। সপ্তমীর জ্যোৎস্না কিশোরী জ্যোৎস্না—মায়ের নব যৌবনের রূপ। যাঁহারা বৈষ্ণব রসসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকে কেন অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের লীলাভূমি বলা হয়, কেন রসিকেরা বলেন, "বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্!" অপ্রাকৃত প্রেমলীলার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিবার এই উপযুক্ত কাল। স্থানাভাববশতঃ ইহার বিস্তার এখানে করিলাম না, মরমী পাঠক অনুভবে তাহা বুঝিয়া লইবেন। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাবিতানের বয়ঃসন্ধিতে নিত্য রসময়ী মূর্ত্তিতে মায়ের আবাহন, চিন্ময়ী মহাশক্তির আরাধনা—কোন্ কবি, কোন্ ভাবুক ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত কাল কল্পনা করিতে পারিত? আর শ্রীর আবাহন, লক্ষ্মী সম্পদের অর্চ্চনা—পূর্ণিমার পরিপূর্ণ রজতোচ্ছ্বাসে, ইহাও ঠিক হয় নাই কি? নিত্যপালনীশক্তি সত্ত্বমূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছ সপ্তমীতে, ইহার পর শ্রীলাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সাবধান, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবনে ভাসিয়া যাইও না, আরাম শয়নে ঢলিয়া পড়িও না—মনে রাখিও আজ

পূর্ণিমা, কিন্তু কাল হইতে কৃষ্ণপক্ষের সুরু। এ সপ্তমীর চাঁদ নয় যে কলায় কলায় বাড়িয়া উঠিবে, এ পূর্ণিমার চাঁদ, ক্ষয়ের নিশানা তাহার বুকে অতি সুস্পষ্ট। অবোধ, কোজাগরী পূর্ণিমাতে জাগিয়া থাকিতে হয়, সে কি শুধু ধন রত্নের লোভে? কিছু হারাইবার ভয়েও কি জাগিয়া থাকিতে নাই? অকালবোধনে মাকে জাগাইয়াছ, তাঁহার আবাহন বৃথা হইবার নয়—পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের সাক্ষাৎ তোমার মিলিবেই। কিন্তু এই পার্থিব সম্পদের মোহে ভুলিলে চলিবে না যে, ঠিক আজিকার কনক-কান্তামোদের প্লাবনের পরেই কৃষ্ণপক্ষের মৃত্যুকরাল ভ্রুকুটী উদ্যত হইয়া রহিয়াছে! আজিকার রাত্র সতর্ক থাকিতে হইবে, ঐশ্বর্য্যের মাঝে জাগিয়া থাকিতে হইবে—নতুবা তোমার কপালে শ্রীর 'চঞ্চলা' নাম নিদারুণভাবে সার্থক হইয়া উঠিবে।

পার্থিব সম্পদভোগের চরমে যে উঠিয়াছে, বৈরাগ্য তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। চন্দ্র পরিপূর্ণ হইয়াই ক্ষয়ের মাঝে ঢলিয়া পড়ে। চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কামনার প্রতিরূপ–ইহা বেদের কথা। কামনা পূর্ণ হইয়াছে—এইবার ক্ষয়ের পালা। প্রাণের আকুলতায় মাকে নামাইয়া আনিয়াছিলে, অকালবোধনে চকিতের মত একবার তাঁহার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি দেখাইয়া তিনি লুকাইয়া পড়িয়াছেন—এইবার কামনাক্ষয়ের সাধনা দ্বারা চিত্তকে রিক্ত করিয়া চিরন্তনীরূপে বুকের মাঝে তাঁহাকে পাইতে হইবে যে! তাই ঋষি বলিতেছেন, পূর্ণিমার অফুরন্ত চন্দ্রিকা-সম্পাতের মাঝে বসিয়াই অমাবস্যার সর্ব্বগ্রাসী আঁধারের কল্পনায় নিজকে অভ্যস্ত কর—ঘুমাইও না। কামনার পরিপূর্ত্তিতে যে আনন্দ, সেও মায়েরই রূপ, কিন্তু সে রূপ অনিত্য। নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে কামনাবর্জ্জনের মাঝে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে জ্যোৎস্নায় জগৎ প্লাবিত দেখিয়া নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছ, কিন্তু একবার ঊর্দ্ধাকাশে চাহিয়া দেখ দেখি, তারকাকুল সেখানে ম্লান। এই জ্যোৎস্না কেবলমাত্র তোমার এই ক্ষুদ্র জগৎটীকে প্লাবিত করিয়াছে—কিন্তু নীলাকাশে অনন্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতিকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। এই জগৎ তোমার কাছে প্রকাশিত, কিন্তু অনন্তের অনুভূতি যে অস্পষ্ট। ইহার পাশে অমাবস্যার বিরাট আঁধারের পরিকল্পনা কর—দেখিবে তোমার এই ক্ষুদ্র জগৎ আঁধারের পরিপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে; কিন্তু মাথার উপর চাহিয়া দেখ, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের আভাস আকাশ ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তুলনা কর, করিয়া বল, কোন্‌টী চাও? সুধার প্লাবনে তোমার সান্ত জগৎ ছাপাইয়া যাক্, এই চাও, না এ জগতের সকল আলো নিভাইয়া দিয়া অনন্তের অপরিসীম রহস্যময় সত্তার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাও? মনে রাখিও পূর্ণিমার পিছনেই ক্ষয়—কিন্তু এই অমাবস্যার আঁধারের পরেই এক এক কলা করিয়া জ্যোৎস্নার বিকাশ। তুমি কি চাও? আপাতসুখকর কিন্তু পরিণামে বিষময় কিছু, না আপাতদুঃখময় কিন্তু পরিণামে অমৃতোপম কিছু?

শ্যামাপূজায় প্রকৃতিপূজার আর এক মূর্ত্তি প্রকটিত। বলিয়াছি, কামনার ক্ষয় চাই, এই জগৎ ভোলা চাই—তবে অনন্ত জগতের আভাস মিলিবে। অনন্ত আঁধারে যে ভয় পায় না, চেতনাকে সেখানে অবিচল রাখিতে

পারে, সেই প্রকৃতির রহস্যকে বুকের মাঝে বন্দী করিতে পারে। শ্যামা ঘনকৃষ্ণা, বিগলিত-চিকুরা, দিগ্‌বসনা; কিন্তু আধাররূপী চৈতন্যের দিকে চাহিয়া দেখ—কি শুভ্র, সংযত, তপস্যার মূর্ত্তি! অমাবস্যার আঁধারে শুধু তো মিলাইয়া যাওয়া নয়—সাক্ষি-চৈতন্যের মহিমায় ফুটিয়া থাকা—এই তো সিদ্ধি। অমাবস্যার আঁধার বটে, কিন্তু জ্ঞান সেখানে সমুজ্জ্বল। প্রলয়ঙ্করীর উপাসনা বটে, কিন্তু দ্রষ্টা যে মৃত্যুঞ্জয়।

ইহার পরেই জগদ্ধাত্রীপূজা—প্রকৃতিপূজার আর এক মূর্ত্তি। আঁধার হইতে, অব্যক্ত হইতে জগতের নিত্য বিকাশ যদি দেখিতে চাও, তবে মায়ের জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখ—নবমীর অনতিস্ফুট আলোকে রজোমূর্ত্তি মায়ের রাগরক্ত প্রতিমা!

হেমন্তকাল প্রকৃতির পরিপূর্ণতা। ইহার পর শীতে প্রকৃতি আত্মশক্তি সংহৃত করিয়া অব্যক্ত হইয়া অবস্থান করিবে—আবার বসন্তের স্পর্শে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিবে। সেই নবজাগরণে প্রকৃতিপূজার আর এক পর্ব্ব আরম্ভ হইবে। কিন্তু সে পর্ব্ব সিদ্ধজীবনের বিলাস। সময় হইলে বারান্তরে তাহার কথা বলিব।

প্রকৃতির দুইটী কাল সমস্ত জগৎ জুড়িয়াই অতি স্নিগ্ধ ও অতি মনোরম। একটী শরৎ—আর একটী বসন্ত। এই দুইটীতেই হিন্দুর দুই প্রস্থ প্রকৃতিপূজার ব্যবস্থা রহিয়াছে। শরতের পূজার কথা এবার বলিলাম। ইহা সাধকের পূজা—তাই অকালবোধনে ইহার সুরু। আমাদের সাধনামাত্রই অকালবোধন নয় কি? দুর্গোৎসবে, শ্যামাপূজায়, জগদ্ধাত্রীপূজায় যথাক্রমে সত্ত্ব, তমঃ ও রজোগুণের পূজা সমাপ্ত হইল। গুণের পূজায় গুণ আয়ত্ত হয়। ইহার পর বসন্তে প্রকৃতির নবজাগরণে গুণাতীতের আনন্দ-বিলাস। শরতে প্রকৃতি পরিপূর্ণা—অতএব মাতৃস্বরূপিণী, সাধক তাহার কুক্ষিগত। বসন্তে প্রকৃতি নবযৌবনা—সিদ্ধজীবনের পরমানন্দস্বরূপিণী। শরতের পূজা জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায়; বসন্তের পূজা জ্ঞানীর বিলাস।

বাঙ্গালী মাতৃসাধক। তাই শরতের পূজায় তাহার এত আকুলতা।



বৈরাগ্যমেবাভয়ম্

—*❀()❀*—

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। আমরা ঋষির বংশধর, সেই সুবাদে ক্ষীণ কণ্ঠ হলেও যথাসাধ্য চেঁচিয়ে ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করে এসেছি এতকাল। কিন্তু আজকাল বৈরাগ্যসাধনার বিরুদ্ধে নানাযুক্তি দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। যাঁরা অতি বিজ্ঞ, তাঁরা মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলছেন, "অতিরিক্ত বৈরাগ্য সাধনাতেই দেশটা মাটী হতে বসেছে। এ দেশের জলবায়ু মোলায়েম, খোরাক সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয় না, কাজেই তত্ত্বচিন্তা আর তার সঙ্গে বৈরাগ্য সাধনাটা বয়স না পাকতেই এসে জুটে পড়ে। ওই তো হচ্ছে আদত মরণের লক্ষণ।" মনে হয়, এমনধারা অপূর্ব্ব যুক্তি ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থে পর্য্যাপ্ত স্থান পেয়েছে। এতে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে কি কমে, তা স্কুল-মাষ্টাররাই বলতে পারেন।

কিন্তু এই কথাটা হজম করতে একটা জায়গায় আমাদের খট্‌কা লাগে। যাঁদের মুখে বৈরাগ্যমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, তাঁরা বোধ হয় ম্যালেরিয়াজীর্ণ ধাতুক্ষীণ বংশধরদের কথা মোটেই ভাবতে পারেন নি। নইলে আধুনিক ঐতিহাসিকরাই যেমন সাক্ষ্য দেন, সেকালে দেশের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে প্রাচীনদের পক্ষে বৈরাগ্যের ধুয়া ধরা কোনও রকমেই নিরাপদ হত না। কিন্তু আমরা দেখছি আর এক দিক দিয়ে। যখন দেশে স্বাস্থ্য, সম্পদ, বিদ্যার অভাব ছিল না, জাতির সংহতি ছিল, নিত্য নূতন শিল্প ও কলার আবিষ্কার ও উন্নতিসাধন চলছিল, ক্ষাত্রিয়ের শৌর্য্য দেশ হতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হচ্ছিল, তখনকার পূর্ণ প্রাচুর্য্যের মাঝে দাঁড়িয়েই যে ঋষি প্রচার করলেন—"বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—এটা কি সংসারের সঙ্গে একটা বিরোধের সূচনা, না সত্যানুভূতির অমোঘ প্রেরণা? জীর্ণ দেহ, ক্ষীণ ইন্দ্রিয়, সংশয়াতুর মন নিয়ে সংসারক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবার পূর্ব্বে যদি কেউ উপদেশ দিয়ে যায়, "ভায়া—বৈরাগ্যমেবাভয়ং", তাহলে তার বৈরাগ্যসাধনাকে কাপুরুষতা বলে গাল দিতে পারি। হয়ত আজকাল আমাদের মুখে বৈরাগ্যের বুলির মর্য্যাদাও কতকটা তাই দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সুস্থ সবল দেহ-মন-প্রাণ নিয়েও যদি কেউ ঠিক ওই বুলিই আওড়ায়, সংসারের বুকে দাঁড়িয়ে বজ্রনির্ঘোষে ওই বাণীই প্রচার করে, তবে তার উক্তিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; অতি সংশয়বাদীরও মনে হয়, ভোগসামর্থ্য থাকতেও যে ভোগ হতে বিমুখ হয়ে দাঁড়ায়, তার দর্শন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাসের পাতা উল্‌টিয়ে দেখ, বৈরাগ্যের বাণী যারা প্রথম উচ্চারণ করেছিল, তারা কি ধাতের মানুষ ছিল। ভেবে দেখ, এ বাণী অক্ষমের বাণী না সক্ষমের বাণী। তার পর এ সিদ্ধান্তকে গাল দিতে হয় দিও, কোনও আপত্তি করব না।

কতকগুলি সত্য আছে, যা চিরন্তন। মানুষের অবস্থার রকমফের হতে পারে, কিন্তু তার জন্য সত্যের রূপ বদলায় না। আমরা বলি, প্রবল আর্য্যজাতির সবলকণ্ঠে উচ্চারিত বৈরাগ্যের বাণী এমনিতর একটা মহাসত্য।

জগতে এখনো এ বাণীর অপেক্ষা আছে। দুর্ব্বলের কণ্ঠে এ বাণীর ভ্যাঙ্গানো শুনে গাল দিতে পার, কিন্তু এ সত্য তো দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য নয়। সবলের কণ্ঠে এ বাণী শুনলে বলতেই হবে, মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তিতে এই মহাসত্যের বিকাশ—মানবজাতির পরম নিয়তি এই অভয় বৈরাগ্য। ভোগী কাপুরুষ, মৃত্যু-লাঞ্ছিত—যথার্থ পুরুষ বৈরাগী, সে মৃত্যুঞ্জয়।

ভোগ করবার একটা লালসা সবার মাঝেই আছে; ভোগে আনন্দও আছে। তাই সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে ভাবে, ভোগ যদি ছাড়তে হল, জীবনে তাহলে থাকল কি? এইখানেই বৈরাগীর সঙ্গে তার বিরোধ। কিন্তু আনন্দই যদি সমস্ত জীবনযোনি প্রযত্নের মূল নিদান হয়, তাহলে বৈরাগীও কি এই আনন্দের রসায়ন পান করেই বেঁচে থাকে না? বিষয়সংস্পর্শজনিত কষায় আনন্দ ভোগীর, আর নির্ম্মল আনন্দ বৈরাগীর—দু'য়ে এই প্রভেদ।

অনাসক্তিরও একটা আনন্দ আছে, তা আপ্তকামেরই নামান্তর। ভোগের মূলে আছে চেষ্টা—প্রাণ তাতে স্ফূর্ত্তি লাভ করে, কিন্তু মন সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে। অথচ প্রাণ প্রাণন চেষ্টায় ভোগী তা খেয়ালে আনতে পারে না। এই জন্য ভোগে দুঃখের উদয় কোথা হতে হয়, তা সে বুঝতে পারে না—তাই শেষে সিদ্ধান্ত করে, মাছের সঙ্গে কাঁটা থাকবেই, ওটুকু অনিবার্য। কিন্তু বৈরাগী হেসে বলেন, তাই বা থাকবে কেন?

কোনও একটা বস্তু যদি পূর্ণরূপে অধিগত করতে না পারি, তবে তার প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করি, তারই নাম আসক্তি; আসক্তি অম্ল মধুর, কেননা আত্মশক্তি সেখানে বস্তুশক্তির কাছে পরাজিত। আর, কাউকে পূর্ণভাবে নিজের মাঝে পেলে, সমস্ত ন্যূনতার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে, সেই বস্তুর উপর থেকে আপনা হতে সমস্ত আসক্তি চলে যায়, অথচ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অন্তর হিল্লোলিত হয়ে ওঠে; একেই বলি প্রেম,—এ রস শুধুই মধুর, অম্লের লেশমাত্র এর মাঝে নাই। এখানে বস্তুশক্তি আত্মশক্তিরই কুক্ষিগত—তাই বস্তু আর বৈরাগীকে আকর্ষণ করতে পারে না, পাওয়ার জন্য উগ্র চেষ্টাও দেখা যায় না। কিন্তু এই চেষ্টার বিরতি প্রাণের দৈন্য হতে নয়, প্রাণের পূর্ণতা হতে—মনের অপ্রতিভান হতে নয়, তার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হতে।

যদি দেখি, বৈরাগ্যের প্রেরণায় কেউ আসক্তিকে পরিহার করেছে, কিন্তু প্রেম তার শূন্য স্থানকে পূর্ণ করেনি, তবে তার সাধনাকে পথভ্রষ্ট মনে করব। বৈরাগ্য দুর্ব্বল নয়, নিরানন্দ নয়; প্রেম আনন্দের নিদান।

বৈরাগ্যসাধনা আপাততঃ স্থগিত রাখা প্রয়োজন কি না—এ প্রশ্ন মূর্খতার পরিচায়ক। তাহলে এমন কথাও বলতে পার, বর্ত্তমানে আমাদের অবসর কম, সুতরাং ভগবানও যদি কিছু কালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন! চিরন্তন সত্যের বিনাশ নাই; আধারকে শুদ্ধ কর, আধেয়ের রঙ আপনি নির্ম্মল দেখতে পাবে। আধারশুদ্ধি পূর্ব্বেও প্রয়োজন ছিল, বর্ত্তমান হুজুগের যুগেও নিতান্তই প্রয়োজন।

অভয় কে?—যে রাজরাজেশ্বর। যথার্থ প্রেমিক কে?—যে রাজরাজেশ্বর হয়েও দীন ভিখারীর সঙ্গে মৈত্রী করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। অভয় ও প্রেম সম্মিলিত হয়েছে বৈরাগীর মাঝে। হিন্দুর বৈরাগীর আদর্শ শিব—যিনি রাজরাজেশ্বর অথচ ভূতনাথ, সংহর্ত্তা অথচ মঙ্গলময়—যাঁর অনাসক্তিতে বিশ্বেশ্বরী তাঁর কণ্ঠলগ্না।

সাংখ্যের প্রমাণ-বিচার

[সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী]

[সাংখ্যবাদীরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম - এই তিনটী প্রমাণ মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। (সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী—১৮শ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ও তৎপূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য বাদীরা কেহ ইহা অপেক্ষা কম, কেহ বা ইহা অপেক্ষা বেশী প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পরপক্ষের খণ্ডন প্রয়োজন। এক্ষণে আচার্য্য তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।]

[প্রমাণকারিকার শেষে "আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনং তু" এই বলিয়া] যে "তু" শব্দটী উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা আগম প্রমাণকে অনুমান হইতে পৃথক করা হইয়াছে। [বৈশেষিককার প্রত্যক্ষ ও অনুমান নামক দুইটী মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন; তাঁহার মতে আগম প্রমাণ অনুমানেরই অন্তর্গত, উহাকে পৃথক বলিয়া স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, বাক্য উচ্চারিত হইলে] বাক্যের যাহা অর্থ, তাহাই প্রমেয় বা যথার্থ বোধের বিষয় হইয়া থাকে। [এক্ষণে, আগম অনুমানেরই অন্তর্ভূত, এই যুক্তি স্বীকার করিলে বলিতে হয়, উচ্চারিত বাক্যকে লিঙ্গ বা হেতু স্বীকার করিয়া তাহা হইতে বাক্যার্থরূপ লিঙ্গী বা সাধ্যের অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক, তাহা যুক্তিসহ কি না, তাহা বিচার করিতে হইবে।]

বাক্য বাক্যার্থের ধর্ম্ম নয় যে বাক্যার্থের অনুমানে বাক্যকে লিঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এমন কথাও বলা যাইতে পারে না যে বাক্য বাক্যার্থ প্রতিপাদন করিতে গিয়া কোনও নিশ্চিত সম্বন্ধবোধের অপেক্ষা রাখে, কেন না কোনও অভিনব কবি [যদি] অদৃষ্টপূর্ব্ব বাক্যসমূহ দ্বারা অননুভূতপূর্ব্ব কোনও বাক্যার্থ প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলে [নিরূপিত সম্বন্ধ না থাকায়] কোনও অদৃষ্টপূর্ব্ব বাক্য হইতে অননুভূতির অর্থের বোধ সম্ভবপর হইত না।

[আচার্য্যের এই কথার তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, বাক্য হইতে বাক্যার্থের অনুমান হয়। লিঙ্গ বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট চিহ্ন দ্বারা অজ্ঞাতবস্তুর বোধ অনুমান প্রমাণ দ্বারা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, বাক্যকে এইরূপ লিঙ্গ ধরা যাইতে পারে, কেননা বাক্য বাক্যার্থবোধের কারণ। যেমন ধূমদর্শন অগ্নিবোধের কারণ, তেমন বাক্যও বাক্যার্থবোধের কারণ। কিন্তু ইহার উত্তরে, আমাদের বক্তব্য এই যে ধূম যে বহ্নির লিঙ্গ, তাহা ধর্ম্মধর্ম্মিভাবকে আশ্রয় করিয়া; ধূম বহ্নির ধর্ম্ম, তাই ধূম বহ্নির পরিচায়ক। কিন্তু বাক্য বাক্যার্থের ধর্ম্ম, এমন কথা কি বলা যায়? তাহা হইলে বাক্যকে বাক্যার্থের অনুমাপক বা পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করি কিরূপে?

[প্রতিবাদী ইহার উত্তরে বলিতে পারেন, না হয় স্বীকার করিলাম, বাক্য ও বাক্যার্থের

মধ্যে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বিদ্যমান নাই। কিন্তু উভয়ের মাঝে একটা সম্বন্ধ তো আছে ? যেমন ধূম অগ্নির সহিত সম্বদ্ধ, অতএব ধূম হইতে অগ্নির অনুমান হইয়া থাকে, সেইরূপ শব্দও তো অর্থের সহিত সম্বদ্ধ, তবে শব্দ হইতে অর্থের অনুমান হইবে না কেন ? বিশেষতঃ জৈমিনি তাঁহার মীমাংসাদর্শনে শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ তো সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, শব্দ ও অর্থের মাঝে যে নিত্য সম্বন্ধের কথা জৈমিনি বলিয়াছেন, তাহার অনুভব সুক্ষ্ম-প্রত্যয় সাপেক্ষ। স্থূলতঃ আমরা দেখি, শব্দ ও অর্থের মাঝে সম্বন্ধ নিত্য হউক না হউক, অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহার ছাড়া সে সম্বন্ধ বুঝিবার কোনও উপায় নাই। বালক শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া ভাষা শেখে না, বুঝে না ; যে ভাষা শিখে বয়স্কব্যক্তিদের মুখে প্রয়োগ শুনিয়া, ব্যবহার দেখিয়া। সুতরাং শব্দার্থের নিত্য-সম্বন্ধ থাকিয়াও তো শব্দার্থবোধে তাহা আমাদের কাজে আসিতেছে না। তার পর বাক্যের অর্থ পদের অর্থের অপেক্ষা করিতেছে। এখানে যে সম্বন্ধবোধের কোনও অপেক্ষাই নাই, তাহা তো সুস্পষ্ট। কেননা, কোন্ পদগুলি কি ভাবে সাজাইতে হইবে, এ বিষয়ে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম কেহ করিয়া দিতে পারে কি ? যেখানে নিয়ম নাই, সেখানে নিরূপিত সম্বন্ধও নাই। পদগুলি যেমন তেমন করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া একটা বিশিষ্ট অর্থ বোঝানই 'বাক্যের কাজ। ইহার মাঝে নিরূপিত সম্বন্ধের অপেক্ষা কোথায় ? ভাষা জীবন্ত ; নূতন অর্থ বুঝাইবার জন্ত নূতনবাক্যের সৃষ্টি হইতেছে। নিরূপিত সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই যদি শব্দার্থের বোধ সম্ভব হইত, তাহা হইলে এরূপস্থলে তো অর্থজ্ঞানের কোনও সম্ভাবনাই থাকিত না। এই সমস্ত আলোচনা হইতেই প্রমাণ হয়, শব্দার্থবোধ অনুমান বলে সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে।]

প্রমাণের সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ দুই ই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া উপমান প্রভৃতি যে সমস্ত প্রমাণের কথা প্রতিবাদীরা বলিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-সমূহেরই অন্তর্ভূত।

[নৈয়ায়িক উপমান নামে একটা পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার উদাহরণ এই—কোনও ব্যক্তি অপর এক জন অভিজ্ঞব্যক্তির নিকট শুনিল, বনে গরুর মত এক রকম জন্তু আছে, তাহাকে গবয় বলে। দৈবাৎ বনে এক দিন এই রূপ একটা প্রাণী দেখিতে পাইয়া পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞবচন তাহার মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধারণা হইল - এই যে গোরুর মত জানোয়ারটা ছুটিয়া গেল, এই তো গবয়। এইরূপ অভিজ্ঞের নির্দেশ স্মরণ করিয়া সাদৃশ্যজ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক যে বস্তুজ্ঞান, তাহাই উপমান প্রমাণ সাপেক্ষ।

[সাংখ্যবাদী বলেন, উপমান বলিয়া পৃথক একটা প্রমাণ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব, উহার সমস্তগুলি অঙ্গই পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-সমূহের অন্তর্ভূত।] যেমন ধর, উপমানের একটা অঙ্গ "যেমন গো, তেমনি গবয়"—এই অভিজ্ঞ-বচন। এই বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞান 'আগম' প্রমাণ সহায়ে পাইয়া থাকি। তার পর আছে, গবয় শব্দ গো-সদৃশের বাচক, এই জ্ঞান ; ইহা অনুমানের অন্তর্গত। অনুমানের প্রকার এই—অভিজ্ঞেরা যে বিষয়ে

যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; অন্য কোনও তাৎপর্য্য না থাকিলে তাহা সেই বিষয়েরই বাচক হইয়া থাকে; যেমন, 'গো' শব্দ গোত্বের বাচক। এইরূপে অভিজ্ঞেরা গোসদৃশে গবয় শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন, সুতরাং উহা তাহারই বাচক।' [এইরূপ সংজ্ঞাসংজ্ঞি-জ্ঞান, যাহা নৈয়ায়িকের মতে উপমানের ফল] তাহা বাস্তবিকপক্ষে অনুমান মাত্র। তার পর গবয়টা চোখের সামনে আসিয়া পড়িলে যে গো-সাদৃশ্যের জ্ঞান হয়, তাহা তো প্রত্যক্ষ। ঠিক এইরূপ যুক্তিতে স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ গোপিণ্ডে যে গবয়সাদৃশ্য জ্ঞান, তাহাও প্রত্যক্ষ নহে কি। কেননা, সাদৃশ্য যে গোতে এক প্রকার, আবার গবয়ে আর এক প্রকার, তাহা বলা চলে না। সাদৃশ্য কি? এক জাতীয় বস্তুতে সাধারণ ভাবে যে অবয়ব সংযোগ রহিয়াছে, অপর জাতীয় বস্তুতে যদি তাহাই প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবে তাহাকে সাদৃশ্য বলা যায়। উভয়তঃ সাধারণ সংযোগ কখনও এক বই দুই হইতে পারে না। গবয়ে যদি ঐই সাধারণ সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে গোতেও তাহা প্রত্যক্ষ হইল বলিতে হইবে। সুতরাং উপমানকে পৃথক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজন নাই।

[আচার্য্যের মতে উপমানকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটী প্রত্যয় পাওয়া যাইবে—অভিজ্ঞের উক্তিবোধ, সংজ্ঞাসংজ্ঞি জ্ঞান, সাদৃশ্য জ্ঞান। এই তিনটী প্রত্যয়ই যথাক্রমে আগম, অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহায়ে অধিগত হইয়া থাকে। উপমান তিনটী প্রমাণের মিশ্রণ মাত্র—নূতন কিছু নহে। কিন্তু এই মিশ্রণের অপূর্ব্বতাকে লক্ষ্য করিয়াই নৈয়ায়িক ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন, ইহাও বিবেচ্য।]

[মীমাংসক অর্থাপত্তি নামে একটী প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্যবাদী বলেন,] অর্থাপত্তিকেও পৃথক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। আচার্য্যেরা অর্থাপত্তির এইরূপ উদাহরণ দিয়া থাকেন। "চৈত্র ঘরে নাই, অথচ বাঁচিয়া আছে; ইহা হইতে সে যে বাহিরে আছে, ইহা না দেখিয়াও আমরা কল্পনা করিতে পারি।" এইরূপ কল্পনাই অর্থাপত্তি। [নৈয়ায়িক ব্যতিরেকী অনুমান দ্বারা অর্থাপত্তির কাজ চালাইয়া নিতে চান। কিন্তু মীমাংসক বলেন, অর্থাপত্তির প্রামাণ্য অনুমান অপেক্ষা দুর্ব্বল, উহা বিষয়ের উপপত্তি বা সঙ্গতিরক্ষার জন্য বিষয়ান্তরের কল্পনা মাত্র—ইংরেজী ন্যায়ে যাহাকে Hypothesis বলে। সুতরাং উহাকে অনুমানের অন্তর্ভূত করা চলে না।]

সাংখ্যবাদী বলেন, অর্থাপত্তি অনুমানেরই অন্তর্ভূত। [অনুমানের জন্য ব্যাপ্তিগ্রহ প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও তাহার অভাব নাই।] চৈত্র যখন অব্যাপক বা পরিচ্ছিন্ন, তখন সে এখানে না থাকিলে অন্যত্র আছে; আবার অব্যাপক বলিয়াই সে যদি এখানে থাকে, তাহা হইলে অন্যত্র নাই। [ইহাই হইল "গৃহে না থাকা ও বাহিরে থাকার মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রকার।] দৃষ্টান্ত আমাদের নিজেদের শরীর। [যখন ব্যাপ্তিও পাইলাম, উভয়বাদি-সিদ্ধ দৃষ্টান্তেরও অভাব রহিল না, তখন] "দেখিতেছি, চৈত্র গৃহে নাই" এই লিঙ্গ হইতে, "দেখিতেছি, সে বাহিরে আছে" এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। [পাঠক "দেখিতেছি"

কথাটা লক্ষ্য করিবেন। মীমাংসক দুইটী দর্শনই যে তুল্যার্থক, তাহা স্বীকার করিবেন না।—সুতরাং অর্থাপত্তিকে অনুমান বলিতে চাহিবেন না। সাংখ্যবাদী কিন্তু দুইটী দেখাই এক বলিতেছেন।]

সাংখ্যবাদীর এই অনুমানকে খণ্ডন করিবার জন্য—প্রতিবাদী বলিতেছেন, চৈত্রের বহির্ভাব অনুমান করিতে গিয়া তুমি তাহার গৃহাভাবকে হেতু বলিতেছ। কিন্তু গৃহাভাব অসিদ্ধ; হেতু অসিদ্ধ হইলে অনুমান হয় না। কিরূপে অসিদ্ধ, তাহা বলিতেছি। বাহিরে আছে কথার অর্থে কোথাও না কোথাও আছে। কোথায়ও বলিতে তো গৃহ কেও বুঝাইতে পারে! সুতরাং কোথা-য়ও আছে বলিতে ঘরেও আছে, বলিতে পারি। তাহা হইলে ঘরে নাই, এই কথা তো কাটা যায়। ইহার উত্তরে সাংখ্যবাদী বলিতেছেন।] চৈত্রের কচিৎ সত্তা দ্বারা তাহার গৃহাভাবের অপলাপ হয় না, যাহাতে গৃহাভাব অসিদ্ধ হইয়া বহির্ভাবের হেতু না হইতে পারে; এমন কি চৈত্র ঘরে নাই, ইহাতে তাহার সত্তারও অপলাপ করা হয় না, যে সত্ত্ব অসিদ্ধ হইয়া বহির্ভাবকেও খণ্ডিত করিবে [অর্থাৎ যে মোটেই নাই, সে বাহিরেই বা থাকে কি করিয়া?—সে ঘরে নাই এই কথার উপর নির্ভর করিয়া এমন কথাও বলা যাইতে পারে না।]　　ক্রমশঃ



শ্রুতি-স্মৃতি

—❋—

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন, এই তিনটীর মধ্যে কেবল মৈথুনত্যাগ করলেই যে হবে, তা নয়। মৈথুন বালক ও বৃদ্ধেরও নাই, তাহলে তারাও তো যোগী হত। পশুতেও আহার করে, পাখীতেও পেট ভরে খায়, ঘুমায়। মানুষও যদি এই নিয়েই থাকে, তবে তার আর কি হবে?

❋

বাসনাই জন্মমৃত্যুর কারণ। যার যত কামনা-বাসনা, সে তত বন্ধনের জোগাড় করছে। কাজেই কিছু বাসনা করতে বিশেষ সতর্ক হতে হবে, নইলে নিজের কাজেই নিজে বদ্ধ হতে হবে। যে যখন যা কিছু বাসনা করবে, ভগবান্ ক্রমে তা পূর্ণ করবেন, কেননা তিনি কল্পতরু। কিন্তু বাসনার পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞান হবে না। এমন কি আধ্যাত্মিক বিষয়েও, যোগ করব, কি সাধন করব, এমন কোনও সঙ্কল্প কখনও করবে না। তাহলে সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গুরু কৃপা উপলব্ধি হবে না। উপনিষদেও ঠিক এই কথা আছে—"না-শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" শঙ্করাচার্য্য বলছেন, অশান্তমানস মানে যার সাধনসঙ্কল্প রয়েছে।

নিজের চিত্তে ঢেউ থাকলে জগতের সকল ঢেউ এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। আর নিজের চিত্ত স্থির হয়ে গেলে জগৎ রহস্য আপনা থেকে প্রকাশ হয়। চিত্ত উদার কর, আপন চিত্তকে বোঝ; তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

*

উপযুক্ত অধিকারী না হলে গুরুসকাশে বাস করার বিপদ আছে। যারা কাছে থাকে, তারা অনেকেই আপন লক্ষ্য ভুলে গিয়ে কেবল বড় বড় বচন শেখে, আর অবশেষে তাদের হৃদয় মরুভূমি হয়ে যায়। তখন তারা একূল-ওকূল দুকূল হারায়। সংসারের কিছুতেও তাদের মন বসে না, এদিকেও মন যায় না, মাঝখান থেকে পতন হয়ে যায়। অতএব সাবধান।

*

সঙ্গীতের রাগিণী অমূর্ত্ত, কিন্তু ভাবলোকে তারা মূর্ত্তিমতী। এখানে কোন রাগিণীর গান শুনলে যে আনন্দ হয়, সেখানে সে রাগিণীকে দেখলে তাই হয়। এখানে যার মূর্ত্তি আছে, সেখানে তা অমূর্ত্ত, আর এখানে যা অমূর্ত্ত সেখানে তার মূর্ত্তি আছে। ভাবলোকে দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবগুলি মূর্ত্তিমান। শিব সম্বন্ধেই ধর — নন্দী ও ভৃঙ্গী, বিবেক ও বৈরাগ্য — জয়া ও বিজয়া শান্তি ও প্রীতি ইত্যাদি। ভাবলোক কোনও গুণের অধীন নয়; এক মাত্র প্রেমিক সেখানে যেতে পারেন। যোগ দ্বারা বা অন্য কোনও তত্ত্ব দ্বারা ভাবলোক জানা যায় না—এ'লোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে। জগৎ রহস্য আয়ত্ত হলেও ভাবলোকের সন্ধান পাওয়া যায় না—এমন কি সমাধিস্থ যোগীও সে লোকের খবর পান না। কেবলমাত্র ভাবগ্রাহী প্রেমিকভক্তের সে লোকে অধিকার।

*

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ফানুষের মত। ফানুষ যেমন ছেড়ে দিলে তার সমানশ্রেণীর বায়ুস্তর পর্য্যন্ত উঠেই স্থির হয়ে যায়, এ-ও তেমনি। যার ময়লামাটী যতটুকু কেটেছে, সে ততটুকু ওপরে উঠেই স্থির হয়ে যায় এবং ক্রমে আবার ওপরে উঠতে থাকে। এমনি করে ক্রমে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক প্রভৃতির তত্ত্ব জানতে পারে। যোগীরও তেমনি যার যতটুকু সামর্থ্য, সে সেই চক্র পর্য্যন্ত উঠতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করলে আর তাকে ফিরতে হয় না।

*

যাঁরা ঈশ্বরকোটী, তাঁরা নির্দ্দিষ্ট কতক গুলি কাজ করবার জন্য অবতরণ করেন। সে কাজ তাঁকে করতেই হয়। কাজেই এক দিক দিয়ে তিনি প্রকৃতির অধীন। যিনি অবতার, তিনি স্বেচ্ছাধীন। নির্দ্দিষ্ট কোনও কার্য্যে তিনি বাধ্য নন। প্রকৃতি তাঁর অধীন। ইচ্ছামত তাকে খেলিয়ে তিনি কাজ করে যান।

*

সংসারে কর্ম্ম কামনাময়, তাই কর্ম্মে সেখানে বন্ধন ঘটে। আর গুরুগৃহে কর্ম্মের কামনা না থাকায় কোনও বন্ধনই নাই। গুরুগৃহের কর্ম্মে কেবল গুণক্ষয় হয়; সাধনভজনও তো গুণক্ষয়ের জন্য। গুরুগৃহের কর্ম্ম ব্যষ্টি ভাবে ধরলে জগতের, আর সমষ্টিভাবে ধরলে তাঁর। সুতরাং গুরুর কাছ থেকে সাধন

ভজন নিয়ে করলে যা হত, তাঁর সেবা করলেও ঠিক সেই ফলই পাওয়া যাবে।

*

সন্ন্যাসী কাকে বলি? ঘর ছেড়ে যার কুটীরে আসক্তি, গরদ ছেড়ে যার নেংটীতে আর কম্বলে আসক্তি, সে তো গৃহীর চেয়েও অধম। সকল রকম আসক্তি ত্যাগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। যিনি পরকে অমৃত বিলিয়ে নিজে হলাহল পান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী। যিনি পরের গলায় মণিহার ঝুলিয়ে দিয়ে নিজের গলায় ফণিহার ধারণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী। যিনি জানেন, আমি এই রক্ত-মাংসের খাঁচা আশ্রয় করে চল্‌ছি, একে সোণা দিয়েই মোড়াও আর কাঁথা দিয়েই জড়াও, দুই-ই সমান, তিনিই সন্ন্যাসী।

*

শিষ্য মনের ভুলে গুরুকে ছেড়ে যায়, কিন্তু জানে না, গুরু বৎসহারা গাভীর মত তার পথ চেয়ে থাকেন। নিজের ব্রহ্মাস্ত্র শিষ্যকে বিলিয়ে দিয়ে তার কর্ম্মফল নিয়ে জন্মগ্রহণ করতেও সে গুরু প্রস্তুত!

*

ভগবানকে যোগে সূক্ষ্মভাবে দেখা যায়, আবার তন্ত্রসাধনায় স্থূলভাবে দেখা যায়। তবে যে ভাবেই হোক, একবার তাঁর দর্শন পেলে নিজের ইচ্ছামত তাঁর কাছে আবদার করা চলে। সূক্ষ্মদর্শনে নিজকে সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন করে নিতে হয়, আর স্থূলদর্শনে তাঁকেই স্থূলভাব গ্রহণ করাতে হয়। তবে তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না।

*

সেবক হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হয়ো না। তোমার কতটুকুই বা প্রাণ—আর সেই প্রাণের ছট্‌ফটানিতে অস্থির! সেবকের সেবক, দীনের দীন হয়ে থাক, তবে আর তার ওপর কোনও পরীক্ষা আসবে না, নইলে ঘাড়ে এমন বোঝা চাপ্‌বে যে ঘাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে।

*

ভগবান বিশ্বপতি হলেও ডাকলে আসেন। কেন আসেন? জীবকে সুখ দিতে। কেন না জীব অতি দুঃখী, অতি দীন, তাই তিনি দয়া করতে আসেন। নচেৎ তিনি যদি দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে, নির্ব্বিকার হয়ে আস্‌তেন, তবে তাঁর জন্য জীবের প্রাণ কেন ব্যাকুল হবে?

*

ধর্ম্মলাভের জন্য যে সন্ন্যাসী হয়, সে ভণ্ড। সন্ন্যাস পরহিতের জন্য। আপনাকে ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যকে মহাকর্ত্তব্যের কাছে বলি দেওয়াই সন্ন্যাস।

*

ভগবানের উপাসনা মানে ভগবানের মত হয়ে যাওয়া। যে যার উপাসনা করে, সে তাতেই পরিণত হয়। যিনি দেবতার উপাসনা করেন, তাঁকে দেবতার মত থাকতে হয়। যে পিশাচ সাধনা করে, তাকে নিজেও পিশাচের মত আচার করতে হয়।

*

সাধুদের সময় সময় যে ক্রোধ দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে ক্রোধ নয়। কারণ পরের অনিষ্ট ইচ্ছায় ক্রোধের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সাধু কারও মন্দ ইচ্ছা করেন না। তাঁর ক্রোধ সাময়িক বিরক্তিমাত্র এবং তা জীবের মঙ্গলের জন্যও হতে পারে।　　(ক্রমশঃ)



ভাব ও বস্তুর সমন্বয়

[স্বামী রামতীর্থ]

নির্ব্বিশেষ সত্তা বুদ্ধিতেও যা, বিষয়েও তাই বটে, কিন্তু বুদ্ধি বা বিষয়ী যখন বিষয়ের সংস্পর্শে আসে, তখন দু'য়ের পেছনেই থাকে এক মহাসত্য—সে সত্তা আত্মা। জগতে যা কিছু আছে, তার পেছনে যে একই সত্য নিহিত রয়েছে, এ কথাটা ভাল করে বোঝান হয় না। ধর, একটা কলম রয়েছে। কলমে কতগুলি গুণ বা ধর্ম্ম আছে, আবার তার অধিষ্ঠানরূপে একটা বাস্তব সত্তাও আছে। একটা বস্তুসত্তা যে অধিষ্ঠানরূপে রয়েছে, এ কথা কোনক্রমেই অযৌক্তিক নয়, কারণ তা না হলে এই গুণগুলি তো আপনা আপনি এসে জোটেনি; নিশ্চয়ই বুদ্ধির ওপর কোনও একটা ক্রিয়া হয়েছে এবং সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে বুদ্ধিতে গুণের স্ফুরণ হয়েছে। কলমটার গুণগুলির নাম দিলাম মনে কর ক আর তার অধিষ্ঠান সত্তার নাম দিলাম খ। কলমটা হচ্ছে তার গুণগুলির সমষ্টিমাত্র। এই ধর, একটা টেবিল আছে। টেবিলের গুণগুলির সমষ্টিতে টেবিল হয়েছে; তাহলে টেবিলটা হল যেন কগ+খ;—খ হচ্ছে নির্ব্বিশেষ বস্তু সত্তা। জিজ্ঞাসা করতে পার, কলমের বেলায় যে খ, টেবিলের বেলাতেও যে সেই খ, তার প্রমাণ কি? হয়ত এমনও হতে পারে, যা কলমটার গুণগুলির অধিষ্ঠান, তা টেবিলের গুণের অধিষ্ঠান নয়। যখন কলমের গুণ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়েছিল, তখন যে অধিষ্ঠানের প্রেরণায় ক্রিয়া হয়েছিল, টেবিলের গুণ প্রতিফলিত হওয়ার সময় সে অধিষ্ঠানের প্রেরণায় ক্রিয়া হয়নি। ধর এই দ্বিতীয় অধিষ্ঠানের নাম দেওয়া গেল খ'। এই একটা পিয়ানো রয়েছে; এর অধিষ্ঠানকে অন্যান্য অধিষ্ঠান হতে পৃথক্ করবার জন্য নাম দিলাম খ''; হয়ত এর বস্তুসত্তা কলম বা টেবিলের বস্তু সত্তা হতে পৃথক্। একটা মানুষ রয়েছে; তার অধিষ্ঠানকে বললাম খ্।

এখন হয়ত বুঝতে পারবে, প্লাটোর কোথায় ভুল হয়েছিল। এই যে অধিষ্ঠানসত্তার কথা বলা হল, প্লাটো একে প্রত্যেক বস্তুতে বিভিন্ন বলে ধরে নিয়েছেন, তুমিও তাকে বিভিন্নই বলছ। এই ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণ করা যেতে পারে। এর মাঝে একটা হেত্বাভাস রয়েছে। এ কলমটার বর্ণ, আকৃতি, কাঠিন্য—প্রভৃতি ধর্ম্ম তোমার বুদ্ধিরই প্রতিক্রিয়ার ফল। তাহলে প্রমাণ হল বুদ্ধির প্রতিঘাত হওয়ার পর এই সমস্ত গুণের উদ্ভব হয়েছে। তাহলে অধিষ্ঠান সত্তা এই সমস্ত গুণের পূর্ব্বভাবী অর্থাৎ তাদের অতীত: খ' বা খ'' এরাও তাহলে গুণাতীত।

তাহলে ভেদ আসে কোথা থেকে? একটু স্থির হয়ে ভাব দেখি। জগতে যত কিছু ভেদ, সব গুণের ভেদ। এই খড়িটা আর এই পেন্সিলটার গুণের কোনও উল্লেখ না করে কি তুমি এদের পার্থক্য নিরূপণ করতে পার? খড়ির টুকরাটা যে কলম হতে পৃথক, তা জান কি করে? শুধু গুণের আলোচনায়। খড়িটা

শাদা ; এ একটা গুণ। খড়িটা ভঙ্গুর, এ-ও একটা গুণ। সমস্ত ভেদ তাহলে গুণের ভেদ। এখন অধিষ্ঠান খ'-কে যদি তুমি খ'' হতে পৃথক বল, তাহলে উভয়ের মাঝে গুণের ভেদ স্বীকার করেই পৃথক্ বলছ। তাহলে যা গুণাতীত বা নির্ব্বিশেষ ছিল, তাকে আবার তুমি বলছ গুণের অধীন। যদি অধিষ্ঠান-সত্তাতে ভেদই সম্ভব হয়, তাহলে একটা অধিষ্ঠান হতে আর একটা অধিষ্ঠানকে পৃথক করতে গিয়ে তাদের গুণের অধীন বলে কল্পনা করতে হয়। ঠিক এইখানেই ভুল হয়। গোড়ায় তুমি বলে এসেছ, অধিষ্ঠান গুণের পূর্ব্বভাবী অতএব গুণাতীত ; আর এখন বলছ কি না অধিষ্ঠান গুণাধীন। তাই বলছিলাম, অধিষ্ঠানকে যদি বিভিন্ন বলে মনে কর, তাহলে সেটা তোমাদের মতিভ্রম। প্রথমে বল্‌লে, অধিষ্ঠান গুণের অতীত ; শেষকালে কি না নিজেই নিজের কথা কেটে আবার তাকে গুণের এলাকায় নামিয়ে আনছ। ভুল তো এইখানেই।

যা এই খড়িটার অধিষ্ঠান, তাই যে ওই পেন্সিলটার অধিষ্ঠান নয়, এ কথা বলবার তোমার উপায় নাই। তোমার মন-বুদ্ধির পেছনে যে অধিষ্ঠান-তত্ত্ব, সেই তত্ত্বই যে ওই গরুটা বা ভেড়াটার অধিষ্ঠান নয়, এ কথা তুমি বল কি করে ? এই টেবিলটার অধিষ্ঠান যে আত্মা, সে যে তোমার আত্মা হতে পৃথক, তা বল্‌তে পার না। সবার মূলে সেই এক, অদ্বিতীয় অনন্ত, অপরিণামী, নির্ব্বিশেষ সত্তা।

একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে বলি। সামনে দেখ্‌ছি, ধব্‌ধবে সাদা একটা দেওয়াল। তোমরা তো সবাই বসে আছ ; কেউ উঠে গিয়ে দেওয়ালটার ওপর বৃত্ত, ত্রিভুজ, বৃত্তাভাস প্রভৃতি জ্যামিতিক ক্ষেত্র আঁকতে আরম্ভ করলে। কেউ হয়ত গিয়ে একটা মহাযুদ্ধের চিত্র আঁকতে সুরু করলে ; কেউ হয়ত আত্মীয় স্বজন স্ত্রী-পুত্রের ছবি আঁক্‌ছ ; কেউ আর কিছু আঁকছ। কিন্তু সমস্ত ছবিগুলির পেছনে তো একই অধিষ্ঠান। তেমনি এই জগতে যা কিছু দেখ্‌ছ, তার পেছনে একই অধিষ্ঠান। এই ছবিতে দেখ্‌ছ একটা ঘোড়া, একটা গরু, একটা হাতী, একটা মানুষ। কিন্তু সব ছবি আঁকা হয়েছে ওই শাদা দেওয়ালটার ওপরেই। তেমনি এক আত্মা, এক অবিনাশী ব্রহ্ম সবার পেছনে। স্বপ্নে একটা গরু দেখ্‌লে, কি একটা ঘোড়া বা মানুষ বা স্ত্রীলোক দেখ্‌লে ; কিন্তু জানছ, এ সমস্তই আত্মার পটে আঁকা ছবি মাত্র। যখনি জাগ্‌লে, তখন দেখ্‌লে, স্বপ্নের গরু, ঘোড়া, মানুষ তো কোথায়ও নাই !

যে সমস্ত গুণের সমবায়ে এই জগৎ, তাদের তত্ত্ব কি ? এই প্রাতিভাসিক জগৎ এই সমস্ত গুণের সমবায় মাত্র, কিন্তু নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বের ওপর তার প্রতিষ্ঠা। এর পর একটা খুব সূক্ষ্ম তর্ক উপস্থিত হবে ; তোমরা হয়ত সেটা এখন বুঝ্‌তে পারবে না,—আরও কয়েকটা বক্তৃতা শুন্‌লে বুঝ্‌বে। সমস্ত গুণই নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঠিক এই গুণের অনুসরণ করেই বলা যায়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বেরও তো তাহলে ধারণাগুণ একটা আছে। তাহলে নির্ব্বিশেষকে তো আর নির্ব্বিশেষ বলা চলে না, কেন না সবিশেষকে ধারণ করা রূপ বিশেষগুণ তো তাতে আছে। তাহলে নির্ব্বিশেষ আর নির্ব্বিশেষ রইল না। এ কথা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর

দাঁড়িয়ে বল্‌ছি। যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে তোমরা বল্‌ছ যে, এই দৃশ্য জগৎ তাত্ত্বিক, তেমনি আমরাও উৎকৃষ্টতর বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে বল্‌ছি, চরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার' পেলে দেশ কাল গুণ সব লীন হয়ে যায়। নির্ব্বিশেষতত্ত্বের দিক থেকে দেখ্‌লে এই সমস্ত গুণ তো কোনও কালেই ছিল না; আবার গুণের দিক দিয়ে দেখ্‌লে, তাদের সত্তা নির্ভর করছে নির্ব্বিশেষ অধিষ্ঠানের ওপর। এই হল একটা বড় রহস্য, তার উদ্ভেদ প্রয়োজন। এই রহস্যকেই বলা হয় **মায়া।** তত্ত্বদৃষ্টিতে যা নির্ব্বিশেষ, তা নির্ব্বিশেষই, তা গুণাতীত; কিন্তু গুণগুলি তো নির্ভর করছে নির্ব্বিশেষের ওপর। এই সমস্যার সমাধান হলে জগতের সকল সমস্যারই সমাধান হবে।

এগুলো শুধু তর্কের কথা নয়। ইউরোপীয় দার্শনিক এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে শুধু তর্কই করে থাকেন; কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকের সে পন্থা নয়। তাঁদের মতে শুধু তর্ক দ্বারা যা নিরূপিত হয়, তার সত্যতা অর্দ্ধেক প্রমাণিত হয় মাত্র, বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তার যাচাই না হলে তার সত্যতা পূর্ণ হয় না। এই যে নির্ব্বিশেষ অনুভূতির কথা বল্‌লাম, শুধু বুদ্ধি সহায়ে বুঝ্‌তে গেলেই দেখি, এ তত্ত্ব কত কত মধুর। আর এ যদি একবার অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে পারি, তাহলে এ যে হবে, সকল মাধুর্য্যের খনি! এর উপলব্ধি বাস্তবিকই প্রয়োজন। যদি এই অনুভূতিতে প্রাণবন্ত হতে পার, অর্থাৎ অনুভব করতে পার যে একই তত্ত্ব সবার অধিষ্ঠান, তুমিই সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তাহলে তুমি দেহ মনের অতীত। এ দেহ তো **বিস্ময়ী** নয়—দুদিক থেকে দুটা ঢেউয়ের সংঘর্ষে এই দেহরূপ **বিস্ময়ের** উদ্ভব হয়েছে মাত্র। তুমি তো এই ফেণপুঞ্জ নও। তুমি সেই নির্ব্বিশেষ সত্তা—যার মাঝে সমস্ত জগৎ, নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গায়মান। এই অনুভূতিতে সকল বন্ধন হতে মুক্ত হও। এ কি পরমাশ্চর্য্য নয় যে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ হয়েও নিজকে জান্‌তে পারছ না? তুমিই যে নির্ব্বিশেষ পরমতত্ত্ব, তুমিই যে সবার অধিষ্ঠান—এ তোমার পক্ষে সুসংবাদ নয় কি ভাই? এখন এই অনুভূতিতে তোমরা সিদ্ধ হও—মুক্ত হও!

এই হোক্ তোমার নিয়তি!—দেহ রেণু রেণু হয়ে পবনে মিশে যাক্, আর অনন্ত মরণ আমায় সম্পুটিত করে রাখুক! সবার চক্ষু আমার চক্ষু—সবার শ্রুতি আমার শ্রুতি—সবার হাত আমার হাত—সবার মন আমার মন! আমি মৃত্যুকে গ্রাস করেছি—সমস্ত ভেদ শোষণ করে নিয়েছি!—আহা কি মধুর, কি তেজস্কর, কি শিবময় আস্বাদ এই মরণের! **ওঁ ওঁ ওঁ।**



কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ইহাদের ফল বিচার করিয়া সাধন-জগতে ইহাদের আপেক্ষিক স্থান নিরূপণ করিবার একটা চেষ্টা অনেকস্থলেই দেখা যায়। এই চেষ্টার স্বরূপ ও সার্থকতা বিচার করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই একটা কথা মনে রাখা ভাল, সাধনজগতে অধিকারি-ভেদ সর্ব্বত্র; সুতরাং নিরপেক্ষভাবে কোনও পন্থার উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করার চেষ্টা বৃথা। পূর্ব্বেও এ কথা বলিয়াছি, আবারও এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, কেন না সাম্প্রদায়িক সংস্কারের উত্তাপে এই তত্ত্বটী সহজেই আমাদের মন হইতে উবিয়া যায়।

কর্ম্মপন্থার ফল স্বর্গ। স্বর্গ বলিতে কি বুঝিব, মীমাংসকেরা তাহার একটা মোটামুটী সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, স্বর্গ অমৃতত্ব এবং বিচার ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, উহা প্রলয়পর্য্যন্ত স্থায়ী। প্রলয়ান্তে আবার নূতন সৃষ্টির উদ্বোধনে পুনর্ব্বার দুঃখালয় ও অশাশ্বত এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসা অনিবার্য্য। উপনিষদও বলিতেছেন, কর্ম্ম দ্বারা যে লোক পাওয়া যায়, তাহার ক্ষয় আছে, কেননা, তাহার মূল নিদান কর্ম্মই যে ক্ষয়িষ্ণু। অনিত্য দ্বারা নিত্যবস্তুকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানী বলিবেন, কর্ম্মের মূল অজ্ঞান, সুতরাং উহা উত্তরোত্তর বন্ধনেরই কারণ হইবে; চাই জ্ঞান—উহাই মোক্ষ; অজ্ঞান হইতে উহা মিলিতে পারে না। যোগী বলিবেন, অবিবেক ভিন্ন কর্ম্ম হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম্ম করিলেই তাহার সংস্কার থাকিয়া যাইবে; সমস্ত কর্ম্মের যুগপৎ পরিপাকও সম্ভবপর নয়, সুতরাং কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে পুনঃ পুনঃ জাতি, আয়ু ও ভোগের বিধান হইতেই থাকিবে; তাহাতে সুখদুঃখও অনিবার্য্য, কেননা নির্দ্দোষ কর্ম্ম অসম্ভব। অতএব কর্ম্ম হতে কৈবল্য অসম্ভব। ভক্ত বলিবেন, কর্ম্মের মূলে কামনা, সে তো আত্ম-সুখবাঞ্ছারই নামান্তর; আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার সুখেই সুখী; ফলাভিসন্ধি রাখিয়া কি পরের সুখসাধনে কৃতকার্য্য হওয়া যায়? কাজেই কর্ম্ম আমার পন্থা নয়, কর্ম্ম-লভ্য ফলকেও আমি একটা খুব বড় লাভ মনে করি না।

এই সমস্ত যুক্তিতে কর্ম্মপন্থার অপকর্ষ সহজেই প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক শুধু প্রকৃতির সহজাত প্রেরণায় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া অভিমানবশতঃ ফল কামনাপূর্ব্বক আমরা যদি কর্ম্ম করি, তাহা হইলে সংসারচক্র হইতে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায়ই থাকে না। এরূপ কর্ম্মই তো সকলে করিতেছে। মূলে এই ভাব বজায় রাখিয়া কর্ম্মে যত আড়ম্বরই করি না কেন, তাহা বন্ধনের কারণ তো হইবেই। সুতরাং কর্ম্মপথ যে দুষ্ট, ইহা অযৌক্তিক নহে।

অথচ প্রশ্ন হয়, কর্ম্ম যদি অশেষ দোষ-দুষ্ট হইল, তাহা হইলে ইহার সার্থকতা কোথায়? বিশ্বের বনিয়াদই এই কর্ম্ম দিয়া গড়া হইল কেন? মুক্তির যত বড় পাত-

নামাই করি না কেন, তাহার গোড়াতেই এই বন্ধনের ব্যবস্থা কেন? সমস্ত জগদ্ব্যাপারটাকে যদি একটা অখণ্ডিত সত্তারূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলে কর্ম্ম দোষের আকর হইলেও তো তাহাকে সেখানে একটা স্থান দিতে হয়। আর এক কথা। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম স্বতোবিরুদ্ধ ইহা আমাদের বুদ্ধির কথা। কিন্তু ঐশ্বরিকবিধানে স্বতোবিরুদ্ধের স্থান হইতে পারে না—কেননা সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য-রূপেই তাঁহার অধিষ্ঠান। আমরা বুদ্ধির খণ্ডতা দ্বারা যেখানে বিচ্ছেদ দেখি, বাস্তবিক সেখানে রহিয়াছে একটা একটানা পরিণতি। আলো হইতে আঁধার, জন্ম হইতে মৃত্যু, সৃষ্টি হইতে প্রলয়, কর্ম্ম হইতে অকর্ম্ম—সমস্তই একটা সংহতি ও পরিণতির প্রান্তকোটী মাত্র; সুতরাং ইহাদের মাঝে বিরোধ কোথায়?

এই বিচারে আমরা কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারি না—তবে তাহার রূপান্তর ঘটাইতে পারি। মোক্ষপন্থীরা সকলেই তাহা করিয়াছেন; জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত কেহই কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, করা সম্ভবপরও হয় নাই। তবে বিরূপ কর্ম্মের তাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন; ইহা কর্ম্মদর্শনের পক্ষেও বিরুদ্ধ ব্যাপার হয় নাই, কেন না কর্ম্মসম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য আছেই, ইহাই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব। কিন্তু তাঁহাদের বিবেক-বুদ্ধিকে অপ্রবুদ্ধচিত্ত, জড়স্বভাব আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা সম্যক গ্রহণ করিতে না পারিয়া একেবারে কর্ম্মত্যাগের ফতোয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে এবং জড়ত্বই ধর্ম্ম, ইহা প্রচার করিয়া নিজের ও দশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আমরা জানি, কর্ম্ম সাধকের সাধন সহায়, সিদ্ধের বিলাস। জ্ঞানপন্থী অজ্ঞান নিরসনে, যোগপন্থী অভ্যাসের সাধনায়, ভক্তিপথিক সেবাব্রতের উদ্‌যাপনে সর্ব্বত্রই কর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ করিতেছেন। আর সিদ্ধের তো কথাই নাই। অবশ্য ভগবানের চেয়ে বড় সিদ্ধ বা মুক্ত কেহ সম্ভবতঃ নাই। তিনিই শ্রীমুখে বলিতেছেন "ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, তবুও আমি কর্ম্ম লইয়াই আছি। আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এরা উচ্ছন্ন যাইবে।" বাস্তবিক ভগবানের কর্ম্মই তো এই বিরাট্ সংসার—এই বিচিত্র লীলা।

এই বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যদি কোনও ফলকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে তাহা বাস্তবিকই অপকৃষ্ট সকাম কর্ম্ম ফলদৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, অতএব ভক্তি-সাধকের পক্ষে তাহা হেয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের কোনও ফল না থাকায়, তাহা বিশ্বেশ্বরেরই তৃপ্তির নিদান, কেননা উহা তাঁহারই আনন্দের ব্যঞ্জনা। সুতরাং এই দিক দিয়া নিষ্কামকর্ম্ম বা সেবা ভক্তির তো বিরোধীই নহে, বরং উহাই তাহার প্রাণ।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে কর্ম্মের পরেই জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ নিরূপণ করা উচিত। কিন্তু বিষয়ের সাদৃশ্য হেতু আমরা তাহার পূর্ব্বে যোগের সহিত ভক্তির কি সম্পর্ক, তাহাই আলোচনা করিব। শাস্ত্রাদিতে বহুস্থলে যোগকেও কর্ম্ম বলিয়া ধরা হইয়াছে। এমন কি কর্ম্মপন্থা বলিতে যোগপন্থা বুঝায়, ইহাও বহুস্থলে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য আছে। বাস্তবিক যোগ আন্তর কর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। সাধন বলিতে একমাত্র যোগ ও তন্ত্রকেই বুঝায়; উভয়েই

কর্ম্মপথ। একটা অন্তর্দ্দর্শন, অপরটা বহির্দর্শন। কিন্তু উভয়ত্রই নিমিত্ত, উপকরণ, প্রচেষ্টা ইত্যাদি কর্ম্মলক্ষণ বর্ত্তমান। এই পন্থার সহিত ঔপনিষদ জ্ঞান বা ভক্তির পন্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট। যোগ বা তন্ত্রে যেমন একটা বাঁধাধরা পথ ধরিয়া একটা নিশ্চিত লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হইবার জন্য রীতিমত জোড়জোড় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, ঔপনিষদ জ্ঞান বা ভক্তিতে সেরূপ কোনও প্রকটিত সাধন পন্থা নাই। অবশ্য সমস্ত সাধনপন্থাতেই গুরু-কৃপার অপেক্ষা আছে, কিন্তু তথাপি এই দুটী পন্থাতে কৃপার উপর যতখানি নির্ভর করিতে হয়—সহজভাবে অনায়াসে সাধনাভিমান বিবর্জ্জিত হইয়া স্বতঃস্ফুরণের আবেগে অগ্রসর হইতে হয়, অপর দুটীতে সেরূপ গা ভাসান দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিবার উপায় নাই। এই জন্য যোগেরও সাধনাপেক্ষা আছে বলিয়া তন্ত্রের ন্যায় উহাও শাস্ত্রাদিতে কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"

যোগের ফল আত্মদর্শন—নামান্তর কৈবল্য। উহার উপায় বিবেক, বুদ্ধিনিরোধ। আত্মা সচ্চিদানন্দ-ঘনস্বরূপ। সামান্যতঃ আমিত্ব সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের অনুভূতি সকলেরই আছে। আমিত্বের লোপ কেহ করিতে চাহে-সে এখন যেমন আমিত্বই হউক না কেন। অহংস্ফুরণের অভাবও, কোথায়ও হয় না—সুষুপ্তিরও জ্ঞান হয়। নিজের প্রতি সকলের প্রীতি অবিসম্বাদী। সুতরাং অস্তি, ভাতি, প্রীতি এই তিনটী ভাব সর্ব্বাবগাহী। নিজকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাই পাই; বস্তুসত্তা আমার সত্তার অপেক্ষা রাখে, এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত বস্তুর মূলতত্ত্বও ইহাই নিরূপিত হইবে। তাহা হইলে অস্তি, ভাতি ও প্রীতি, অথবা সৎ, চিৎ, আনন্দ—ইহাই পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্ব যেন সূর্য্যকিরণের মত বিরলীকৃত হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে—এই প্রকার অনুভূতিও জ্ঞান। কিন্তু সূর্য্যকিরণ যেমন এক জায়গায় ঘনীভূত হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই কিরণমালা বিসর্পিত হইয়াছে, সেইরূপ সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত অবস্থাই পরমাত্মা। শুধু তত্ত্বে বিশ্লেষণ করিলেই সমগ্র জগতের একটা ব্যাখ্যা হয় না. বিশ্লিষ্ট তত্ত্ব কিরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া লোকব্যবহারের বিষয়ীভূত হইল, ইহাও দর্শন করা প্রয়োজন। একই সূর্য্যকিরণ সমস্ত জায়গায় সমভাবে ছড়াইয়া গেলেও শিশিরবিন্দুতে পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে, আলো যেন জমাট বাঁধিয়া সমষ্টির মাঝে ব্যষ্টির সূচনা করে। ইহাই আত্মার বিশেষত্ব। অবশ্য এ দৃষ্টান্ত লৌকিক। বুঝিতে হইবে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আপনাকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য আপনিই আধার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জমাট বাঁধিয়া যান। এই লোকসম্ভেদ বা ব্যষ্টিস্ফুরণেচ্ছাই আত্মশক্তি। আত্মাই সর্ব্বত্র আপনার উপযোগী দেহ গড়িয়া লইতেছেন, ইন্দ্রিয় গড়িতেছেন, মন-বুদ্ধির স্ফুরণ করিতেছেন। দেহ-মন-বুদ্ধি বিকার; যাহারা অবিবেকী, তাহারা মনে করে এই বিকারের খাঁচায় আত্মা বন্দী হইয়া ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া রহিয়াছে। তাই পাশ্চাত্য ধুরন্ধর দার্শনিকেরা পর্য্যন্ত মনে করেন, প্রাকৃত সংহতিই আত্মত্ব। কিন্তু যোগী বলেন, দেহের দিক দিয়া দেখিতেছ কেন, বিপরীত দিক হইতে দেখ। দেহের প্রয়োজনে আত্মার অধিষ্ঠান, তা নয়; আত্মার প্রয়োজনে দেহের

উদ্ভব। তুমি বল, কথাটা বুঝিতে পারিতেছ না; তোমার এই আত্মা বস্তুটা কি? যোগী বলেন, বুঝিতে হইলে দেহ, প্রাণ, মন ইহাদের তরঙ্গ রোধ করিয়া দাও—কেবল হইয়া যাও, একা হইয়া যাও, আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারিবে। বৃত্তিতরঙ্গ স্বাভাবিক; একা হইতে গেলেই তাহার নিরোধ আবশ্যক। তাই আত্মদর্শনের পক্ষে বিবেক, বৈরাগ্য অপরিহার্য্য। সমস্ত স্পন্দন রোধ করিয়া স্থির হইতে হইবে, ইহাই যোগীর লক্ষ্য। জগতের স্পন্দন রোধ করিতে পারি না, কাজেই আমার স্পন্দনই রোধ করি; এই পিণ্ডেই তো ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি রহিয়াছে। এই ভাবিয়া যোগী ক্রমে ভিতরের দিকে ঢুকিয়া গেলেন। মোটামুটী যোগপন্থায় ইহাই সাধন ও ফল।

ভক্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? যোগে দেখিতেছি, নিরোধ দ্বারা একটা দিক চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতেও সত্যের সব দিক ধরা হইল না। বুঝিলাম আত্মা জমাট হইয়া লোকসৃষ্টির পত্তন করিলেন। লোকে লোকে, জীবে জীবে আত্মতত্ত্বের দিক দিয়া সাজাত্যের স্ফুরণ। কিন্তু লোক সৃষ্টি হইলেও সম্বন্ধতত্ত্বের আস্বাদন তো ইহাতে পাইলাম না। এই জীবে জীবে লোকে লোকে আকর্ষণ কিসের? প্রেম, প্রীতি, মমতা—এগুলি কোথা হইতে আসে? জর্ম্মাণ দার্শনিক হিকেলের (Haeckel) মত বলিব কি, ভালবাসা আর কিছুই নয়—দুইটা কোষের সম্মেলক সাজাত্য মাত্র (Affinity between two cells)? তাহা হইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, একটা কোষ আর একটাকে চায় কেন? সাজাত্য নিরূপণ এক কথা, আর মাধুর্য্যের আস্বাদন আর এক কথা। এই দিক দিয়া বিবেক-দর্শনের নিকট কোনও জবাব পাইবার উপায় নাই।

ভক্তির দর্শন অনুভূতির এই ন্যূনতা পরিপূর্ণ করিয়াছে। ভক্ত বলিলেন, শুধু সাজাত্য নিরূপণ করিলেও হইল না—বিগ্রহও যে সত্য। আর বিগ্রহ কি? ভাবের ব্যঞ্জনা, প্রেম প্রীতি আনন্দের প্রস্রবণ। উহা আছে, উহা স্ফূর্ত্তি, উহা আনন্দময়। অতএব জগতের মর্ম্মসত্তা শুধু সংহতি ঘটাইয়া আনন্দিত হন নাই, সেই সংহতিকে রূপ দিয়া এবং রূপে রূপে আকর্ষণ দিয়া প্রীতিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে আমি বলি সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ। তোমার আমিত্বকে অতি প্রিয় বল; আর বল, আমিত্বকে কেহ বিনষ্ট দেখিতে চায় না। এই আমিত্ব যদি বিশ্লেষণের আমিত্ব হয়, তাহা হইলে কথাটা খাঁটী। তবে বিচারশক্তিকে অটুট ভাবে ধরিয়া না থাকিলে এই তত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রৎ থাকে না। কিন্তু সহজ জীবনে দেখিতেছি, লোকে পরের জন্য আপনাকে পীড়িত করিয়া, আত্মবিসর্জ্জন দিয়া, নিজকে মুছিয়া ফেলিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়। আমরা তাহাকেই বলি ভালবাসা। শুদ্ধ অহং-এর তীব্র অনুভূতিতে সে আনন্দ কোথায়? জানি, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তুমি বলিবে, বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়াই বৃহৎ আমি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমি তো সে লাভ খতাইয়া আপনাকে বিসর্জ্জন করিতে যাই নাই। কিসের আকুলতায় অতি প্রিয় দেহ-মন প্রাণ সব বিলাইয়া দিই? এই মহাসত্যের একটা স্থান তো চরম অনুভূতিতে থাকা চাই। তাই বলি, শুধু সংহতির নিদান খুঁজিলে হইবে না, আত্ম-

বিসর্জ্জনের নিদানও খুঁজিতে হইবে। তবেই না তোমার দর্শন পূর্ণ হইবে।

ফল হিসাবে এখানে আমরা ভক্তের দর্শনের উৎকর্ষ বা পূর্ণতা দেখিতে পাইতেছি। যোগী যাহা ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, ভক্ত আবার তাহা কুড়াইয়া আনিয়া প্রীতির সূত্রে মালা গাঁথিয়াছেন। কিন্তু এইখানেই সতর্ক হইতে হইবে। সব জুটাইতে গিয়া আবার সংসার সাজাইয়া না বসি। আজকাল আমাদের ঠিক এই বিপদ হইয়াছে। সংশ্লেষণপন্থী বলিয়া ভক্তির নজীরে সংসারকেই পাকা করিবার জন্য আমরা বিধিমত চেষ্টা করিতেছি। ভক্তের সংসার মায়িক সংসার নয়, উহা চিন্ময়ের আনন্দ নিকেতন, ভাবরাজ্যে তিনি সংসারী। এই দেহ, এই রূপ নিয়া বিলাস নয়—চিন্ময়দেহ, চিন্ময়রূপ চাই। তাই দেখিতেছি, আত্মচৈতন্যকে বিবিক্ত করিবার প্রয়োজন আছে, বিবেক বৈরাগ্যের প্রয়োজন আছে। গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শঙ্করের অবতার প্রয়োজন ছিল। এই হিসাবে চিন্ময়ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আত্মস্বরূপ অবধারণ উদ্দেশ্যে বিবেকের প্রয়োজন ভক্তিসাধকেরও আছে। প্রাকৃত জনের বিবেক-বৈরাগ্যহীন ভক্তি ভণ্ডামী মাত্র।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধনাপেক্ষা আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তের সাধনাতেও কর্ম্ম ও যোগের স্থান রাখিতে হইবে। তখন ফলের তারতম্য স্মরণ করিয়া বিজ্ঞের মত নাসিকাকুঞ্চন করিলে চলিবে না—কেননা ফল সম্বন্ধে আমরা সকলেই অনভিজ্ঞ, সুতরাং আমাদের পক্ষে সে নজীর আনিয়া বিচার করা মূর্খতা মাত্র—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতঃপর জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্পর্ক নিরূপণ করিতে হইবে।

শিক্ষা-সংস্কার

মানুষ বড়াই করে বলে, নিজের চোখে না দেখলে সে কিছুই বিশ্বাস করবে না, কিন্তু রহস্য এই, জগতের বারো আনা কাজই বোধ হয় কেবল পরের কাছে শোনা কথার ওপর বিশ্বাস করে চলছে—ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা তা বিবেচনা করবার দরুণ মাথা ঘামাতে বড় কেউ রাজী নয়। শিক্ষা-সম্বন্ধে এমনিধারা সংস্কারান্ধতার প্রাবল্য কতখানি, সেই সম্বন্ধেই একটু দিগ্দর্শন করাতে চাই।

শিক্ষাকে খুব ব্যাপক অর্থে নিলে তাকে অপরিণত জীবনের উৎকর্ষসাধন বলতে পারি। দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা—এই নিয়েই তো জীবন। শিক্ষার ফলে এরা পরস্পরের অবিরোধে সুসমঞ্জসভাবে কাজ করুক, এই আমরা চাই। এখন দেখা যাক্, তার দরুণ আমরা কি ব্যবস্থা করেছি।

প্রথমতঃ দেহের কথাই ধরা যাক্। খুব স্থূলভাবে দেখ্তে গেলেও বলতে পারা যায়,

দেহের পোষণ ও ক্ষয় নিবারণ দৈহিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। তার জন্য মানুষকে বড় বিশেষ কিছু করতে হয় না—প্রকৃতি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধার তাড়না দিয়ে দিয়েছেন. সুতরাং তার তাগিদে সেদিককার শিক্ষাটা আমরা বেপরোয়া ভাবেই আয়ত্ত করে নিই। অন্ততঃ আমাদের মনে হয়, ভদ্রসমাজের মাঝে অধিকাংশ স্থলেই ক্ষিদে পেলেই এবং অনেক সময় না পেলেও খাওয়া—এই হচ্ছে দৈহিক উৎকর্ষের সব চেয়ে সরস উপায়। আহার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাব্‌বার বিষয় যে আছে, সে ধারণাই অনেক বাপ-মায়ের নাই। আহারে সংযম, পর্ব্ব, তিথি, ইত্যাদিতে বাছবিচার করা ইত্যাকার সেকেলে কুসংস্কারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; আজকাল ডাক্তারী মতে যে উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে নানা নজীর ও পুস্তিকা প্রচারিত হচ্ছে, তাও শুধু সাময়িক কৌতূহল উদ্দীপন করা ছাড়া আমাদের আর কোনও কাজে লাগে না। তবে ইদানীন্তন উপবাসের ফলে বোধ হয় রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হচ্ছে।

'এনার্জ্জী' বাড়াবার জন্য আমিষাহার প্রয়োজন, না সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধির জন্য নিরামিষ আহার প্রয়োজন, সে তর্ক না হয় যাক্। আহার সম্বন্ধে একটা বৈষম্যের কথাই আজ ইঙ্গিতে জানাব। বোধ হয়, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন, শিশুর পাকস্থলী আর বয়স্কের পাকস্থলী সমান শক্তিসম্পন্ন নয়। আহারের দরুণ যে গুণের ক্রিয়া হয়, ডাক্তারী হিসাবে বলা যেতে পারে, উভয়ের পক্ষে তা সমান ফল প্রসব করতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে বাবা যখন ছেলেকে পাতের কাছে নিয়ে খেতে বসে তুল্যপরিমাণে—এমন কি আবদার রাখবার দরুণ মাত্রা ছাড়িয়েও—মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, ঝাল, লবণ ইত্যাদি গেলাতে থাকেন, তখন কি সেটা বাপ-মায়ের কর্ত্তব্য পালন করা হয়? খুব নীচু জাতের মাঝে দেখেছি, বাবা হুঁকোয় দু'দশ টান দিয়ে সেটা ছেলের দিকে আগিয়ে দেয়, ছেলেও পিতৃভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ বিধিমত তাতে দম লাগায়। ভদ্রলোকেরা এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, ছেলের বাপকে অশিক্ষিত বর্ব্বর বলে গাল দেন, তাও জানি। কিন্তু ওই কৃষকের আচরণের সঙ্গে তাঁদের আচরণের মূলতঃ পার্থক্য কোথায়, সেটা জানতে ইচ্ছা করে। আহার সংযম বড়দের না ও প্রয়োজন হতে পারে, কেননা তারা শক্তিসম্পন্ন; (বাস্তবিক তাই কি?); কিন্তু কচি ছেলে-মেয়েরও সংযম প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করা চলে কি?

দেহের উৎকর্ষের দরুণ দৈহিক পরিশ্রম প্রয়োজন—এ নীতিবাক্য আমরা সবাই জানি। ইস্কুল-কলেজে জিমনেসিয়াম আখড়ার অভাব নাই, তাও দেখেছি। কিন্তু পরিশ্রম যে ভদ্রলোকের ইজ্জত নষ্ট করে না, এ কথা কি আমাদের মাথায় ঢুকেছে? মুখ দিয়েছেন, যিনি আহার দেবেন তিনি—খুব নির্ভরশীলের কথা। কিন্তু আহারের গ্রাসটা ভগবান্ একেবারে মুখের কাছে এনে তুলে ধরলেও বোধ হয় একটু কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক হাঁ করে সেটা গিল্‌তে হয়। এতে প্রমাণ হয়, নিছক বেঁচে থাকবার জন্যও পরিশ্রম দরকার। সমাজের শ্রমবিভাগ হয়ে সে পরিশ্রমটা যদি হাতে ও মাথায় ভাগাভাগি হয়ে যায়, অর্থাৎ হাতে খাটে তো মাথা খাটে না, মাথা খাটে তো হাত খাটে না, এমনি হয়, তাহলে

সেটাকে কখনও স্বাস্থ্যকর বলা চলে না।' বর্ত্তমান সমাজে অর্থাৎ সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রমবিভাগ হয়ে আসছে দেখ্‌ছি। কিন্তু তাতে অশান্তি বাড়ছে বই কমছে না। ভারত-সম্রাটের মন্ত্রিত্ব করে এসেও চাণক্য তাঁর ক্ষুদ্র কুটীরের গৃহস্থালীর কাজ নিজ হাতে করছেন, এ চিত্রের মাঝে একটা মহিমা ও কল্যাণশক্তি রয়েছে। ঘরে ভাত থাকলেই তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে থাকৃতে হবে, এমন তামসিক বিলাস ধনীর সেরা ইংরেজদেরও নয়। তারা খেতেও পারে যেমন, আবার তেমনি অন্ততঃ নেচে-কুঁদেও সেটা হজম করতে পারে। আর আমাদের বিলাসিতা হচ্ছে -অরুচির আহার, অজীর্ণ, অম্লোদ্গার ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না।

ইকনমিক্সের দিক থেকে খেটে খাওয়ার নীতিটা সর্ব্বত্র বাহাল হওয়া সম্ভব না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এটাকে আমরা অপরিহার্য্য মনে করি। এই ধরিত্রীকে সুজলা-সুফলা করতে পরিশ্রমের দরকার হচ্ছে। সমষ্টিভাবে ভাব্‌তে গেলে সে পরিশ্রমের গৌরব আছে, তাতে মনুষ্যত্বের পরিচয় মেলে। এই গৌরবময় কর্ম্মভার হতে শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা কেন? কেন আমাদের মাঝে এই বিসদৃশ ধারণার সৃষ্টি হয় যে লেখাপড়া শিখ্‌তে পারলে আর হাতে পায়ে খাটতে হবে না? গরীব চাষী কেন এই সর্ব্বনেশে ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ছেলেটাকে জাত ব্যবসা ছাড়িয়ে লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে ইস্কুলে পাঠায়? আমরা যে শ্রমবিমুখ শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ কর্‌ছি, তার এই বিপরীত পরিণাম দেখে কি নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার দরুণ লজ্জায় মাথা হেঁট হয় না?'

যৌবনে দেহে স্বভাবতঃই শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। আমাদের দেশে ছেলেদের সে সময়টা কাটে ঘরের কোণে কেতাব নিয়ে মুখ গুঁজড়ে বসে। ছেলেদের মাঝে যারা একটু মিলিটারী মেজাজের, তারা স্পোর্টের দিকে হয়ত ঝুঁকে পড়ে। অঙ্গচালনার দৌড় আমাদের ঐ পর্য্যন্ত। তাও আবার দেখি, খেলার মাঠে ক্রীড়কের শতগুণ দর্শক—দেখাটাই তাদের অভ্যাস। শিক্ষাজীবন পার হয়ে গেলে হয়ত এইটুকুও অনেকের থাকে না। একটা জাতির শক্তি-সংগঠন হিসাবে এইটুকু চর্চ্চা নিতান্তই নৈরাশ্য-কর। তা ছাড়া স্পোর্টের চর্চ্চাতে যে ব্যয়বাহুল্য ও চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে বর্ত্তমান নিঃস্ব ও শক্তিহীন সমাজের পক্ষে এমনিতর রাজোচিত ব্যসন ধাতসহ হবে কি না, সেটাও বিবেচ্য। আমাদের আসল ক্ষোভ এই জায়গায় যে, যে শক্তির চর্চ্চা ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে উপযোগী, সমাজের উদ্‌গতির কারণ, তার সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চারিত না করে শুধু অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদর্শে শ্বেতহস্তী পোষণের লোভ আমাদের হয় কেন? নিতান্ত দুর্ব্বলকায়, আলস্যপরায়ণ, পরমুখাপেক্ষী জাতির পক্ষে শ্রমবিমুখীনতা বা জীবনসমস্যার সমাধানশূন্য ব্যসনচর্চ্চাই কি সমধিক উপযোগী? সেবা-বৃত্তির উন্মেষ আজকালকার ছাত্রসমাজে দেখা যায়। কিন্তু সেটুকু অধিকাংশস্থলেই শুধু বাইরের চেষ্টায়; শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন ও সাহায্য তার মাঝে কতটুকু?

তার পর আর একটা কথা আছে শক্তি-রক্ষা। সে সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বাস্থ্যপরীক্ষার কমিশন বসে ছেলেদের দাঁত দেখা হল, জিভ পরীক্ষা করা হল, চোখের

পাতা উল্টান হল—মস্ত বড় একটা তালিকাও হয়ে গেল। খুব ভাল কথা। স্থির হল বারো আনা ছেলেরই স্বাস্থ্য খারাপ। নিশ্চয়ই ভয়ের কথা। কিন্তু হেতু কি, তা নিরূপিত হয়েছে? দোষটা গড়াচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার কুব্যবস্থা, ব্যায়ামের অভাব, ছোট হরফের বই ইত্যাদির ওপর। এরা সহকারী বটে, কিন্তু আসল অপরাধী যে, তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছেন না, বা ইচ্ছে করেই চোখ বুজে আছেন। আপন ঘরের খবর সবারই জানা আছে, আর সব ঘরেই যে একই হাল, তাও কিছু অজানা নাই। কিন্তু তবু কেউ হাটে হাঁড়ি ভাঙছে না। গলদ কোন্‌খানে, তার খবর হয়ত কবিরাজমশায়েরা কিছু জানেন; আমরাও দিনের পর দিন তার করুণ কাহিনী শুনছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে খোলাখুলি দুটো কথা বলবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে হবার কি যো আছে, না তেমন একখানা বই ইস্কুলকম্পাউণ্ডে ঢোকবার যো আছে? অমনি অশ্লীলতার দায়ে বাঁধা পড়তে হবে! এমন সভ্যতার বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছা হয়।

দৈহিক উন্নতি তো এই পর্য্যন্ত, তার পর এলো মানসিক উন্নতি। সেখানেও দেখি, সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, সর্ব্বত্রই পরের অনুকরণ, আর সে অনুকরণ অপর জাত যেটা হয়ত পঞ্চাশ বছর আগে ছেড়ে এসেছে, তারই। প্রথমতঃ দেখছি, যা জীবনে কোনও দিন কাজে আসবে না, এমন কত গণ্ডা বাজে বিষয় ছেলেদের পড়ান হচ্ছে। কোনও জায়গায় হয়ত কাজের জিনিষটাকেও মিথ্যা সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে এমনভাবে শেখানো হচ্ছে, যাতে সেটা অকেজো হয়ে যাচ্ছে। নিজের দেশে যেটা ভাল ছিল, সেটাকে ছেড়ে পরের ভালোর অনুকরণ করতে গিয়েই আজ জাতও যাচ্ছে, পেটও ভরছে না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, অঙ্কশিক্ষা। বিদ্যাটা খুব বড়, অতি দরকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তারও এক অঙ্গ শুধু বিদ্যা হিসাবেই অনুশীলনযোগ্য, কতক অংশ মাত্র ফলিত। আজ কাল যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে এই ফলিত অংশটুকুকে ছেঁটে বিশুদ্ধ বিদ্যার অংশটুকু অযথা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠশালার শুভঙ্কর নির্ব্বাসিত হয়েছেন, তাঁর জায়গায় Todhunter, Hall & Stevens এঁরা আসর জমিয়ে তুলছেন। এঁরা অনেক নূতন জ্ঞান দিতে পারেন স্বীকার করি, কিন্তু সে জ্ঞান যদি আমার কাজে না এল, তাহলে তার দরুণ সময় ব্যয় করে লাভ? অবশ্য শুভঙ্করের মাঝেও যে বাহুল্য নাই, তা বলছি না, আমাদের মতে তারও সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ এই যে নিত্যকার জীবনযাত্রার পক্ষে তা একান্ত উপযোগী। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত অঙ্ক কষে এর পর আর তার বিন্দুমাত্র অনুশীলন না করেও বিদ্যা-ধুরন্ধর হওয়া চলে। তাই যদি হয়, তাহলে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্তও বা অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে কি লাভ হয়? যদি এর পরে অঙ্কশাস্ত্রেরই আলোচনা করতে কারু ইচ্ছা যায়, তাহলে ওই বকেয়া বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করতে তার তো বেশী বেগ পেতে হবে না। অঙ্কটা নির্ভর করে theoryর ওপর; মাথা একটু পাকলে সেগুলি আয়ত্ত করতে বেগও পেতে হয় না, আমোদও লাগে। অথচ কচি মাথায় কঠিন

কসরত করাতে গিয়ে অধিকাংশ ছেলের পক্ষেই অঙ্ককে বিভীষিকা করে তোলা হয়। ঘরকন্না করতে ক'জনার Complex Fraction, Surd আর Simultaneous Equation-এর দরকার হয়? বিদ্যা হিসাবে এগুলো চর্চ্চা করবার অবসর পরে খুব মিল্‌তে পারত। অথচ ছোটদের পক্ষে এই সমস্ত বোঝা হাল্কা করলে তারা আরও দুটো কাজের কথা শিখতে পারত।

ভূগোলের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশের জেলাগুলোর বিশিষ্ট খবর, এমন কি তার অবস্থান পর্য্যন্ত অনেক ছেলের জানা নাই, অথচ মাডাগাস্কার আর কামস্কাট্‌কায় কয়টা নদী আছে, সে কথা তারা মুখস্থ রাখ্‌তে বাধ্য। হয়ত এতে জ্ঞানের প্রসার হয়, চিত্ত মার্জ্জিত হয়, কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়! —আমরা বলি, সব বাজে কথা। ভূগোলকে একেবারে বৈচিত্র্য ধরিণীর ছবি রূপে ফুটিয়ে তুলেছে ওদেশের লোকেরা; তেমনি বই লিখেছে, ছবি এঁকেছে, প্লান করেছে; তাদের ছেলেরা শেখে, আমোদ পায়, অথচ জানতেও পারে না যে এতখানি শিখেছে। আর আমরা তাদের পাঠ্যতালিকার সঙ্গে আমাদের পাঠ্যতালিকার মিল রেখে যা পড়াচ্ছি, তাতে ভূগোলের নাম শুনে ছেলের গায়ে জ্বর আসে! এ পর্য্যন্ত একটা দেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানা ভূগোল-বৃত্তান্ত বাংলায় বেরিয়েছে? ভূগোলপাঠ নামে যে বইগুলি ছেলেদের পাঠ্য, তার এমন বিচিত্র ছাপা, এমন বিচিত্র ছবি, যে অক্ষর-গুলো যেন পিঁপড়ের সার হয়ে ছেলেদের চোখ কামড়ে ধরে—বেচারীরা পড়বে কখন?

ইতিহাসেরও এই দুর্দ্দশা। নীচের দিকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য। কিন্তু সেখানে ভারতবর্ষকে চিত্রিত করা হয়েছে, মানুষ যেমন সিংহের ছবি এঁকেছিল। বক্তিয়ারের বঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে আক্ষেপ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলে-ছিলেন, সিংহ যদি মানুষের ছবি আঁকত, তাহলে বোধ হয় সেটা অন্য রকম হত। শুধু এই ব্যাপার নয়, কত ব্যাপার সম্বন্ধেই অমনি অপূর্ব্ব চিত্র ইতিহাসে আঁকা আছে। Marsdenর ইতিহাসের পাতা উল্‌টিয়ে আর্য্য-দের উপাসনার আর দ্রাবিড়দের সর্পপূজার যে দু'খানি নোংরা ছবি ছোটবেলায় দেখেছিলাম, তার ছাপ মন থেকে মুছে ফেল্‌তে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। আর্য্য বল্‌তেই ওই চোয়াড়ের মত চেহারা মনে পড়ে যেত; আর যে দ্রবিড় দেশ ভারতীয় সভ্যতার বিশুদ্ধ আদর্শকে এখনো সঞ্জীবিত রেখেছে বলে গৌরব অনুভব করি, ওই সর্পপূজার ছবিখানায় সে গৌরববোধকে যে কতকাল কুণ্ঠিত করে রেখেছিল, তা বলবার নয়। ভারতের ইতি-হাস সম্বন্ধে নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে, অতীতের কত গৌরবময় অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, —ঠিক তার সঙ্গে সমানে তাল রেখে আমাদের বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানো হয় কি? এই যে সেদিন মহেঞ্জোদারোতে এক অত্যদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়াতে সমগ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ওলট-পালট হয়ে যেতে বসেছে—এর খবর আমাদের ছেলেরা পেয়েছে কি? আমাদের বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসের লক্ষ্য প্রতীচ্যসভ্যতার প্রশংসা—মাত্র সে সম্বন্ধে একখানা পুঁথি পর্য্যন্ত প্রবেশিকার পাঠ্য। এই মূল্যবান্ তথ্যটা ছেলেদের মনে মুদ্রিত করবার জন্য ইতিহাসে হিন্দুকে চিত্রিত করা হয়েছে অর্দ্ধসভ্যরূপে,

আর মুসলমানকে অত্যাচারীরূপে! এ যে মন্দ ব্যবস্থা তা কি বল্‌বার যো আছে!

তার পর যে দেশের যে ধাত, ইতিহাসে তাই ফুটে উঠ্‌বে। ইংলণ্ডের খণ্ড ইতিহাস আছে, আবার তার মর্ম্মসত্যটী উদ্ঘাটিত করে গবেষণাও করা হয়েছে; কলেজে দুই-ই পড়তে হয়। কিন্তু দুর্ভাগিনী ভারতমাতার মর্ম্ম কথা ব্যক্ত করবার কেউ নাই, কেউ করলেও সেটা ইতিহাস নয় বা বিদ্যালয়ের পাঠ্য নয়। ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে গণ-প্রাধান্যের কথা মনে জ্বল্ জ্বল্ হয়ে রয়েছে; ইতিহাসের সবগুলি ঘটনা ঐ তথ্যটীকে সুস্পষ্ট করবার জন্য সাজান হয়েছে। আর ভারত-বর্ষের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়ে মনে জেগেছিল, আলেক্‌জাণ্ডারের সময় হতে আরম্ভ করে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত আমরা কেবল গুঁতো খেয়েই এসেছি; এতে যদি গৌরববোধ করবার থাকে করতে পার! আলেক্‌জাণ্ডারের শৌর্য্যকাহিনী মনে উজ্জ্বল হয়ে জাগে, কিন্তু তার জবাবে চন্দ্রগুপ্ত যে সেলুকসকে নাকানী-চুবানী খাইয়েছিলেন, সে কথা তো মনের মাঝে তেমন হয়ে বাজে না। যে দাক্ষিণাত্য প্রকৃত হিন্দুগৌরবের লীলাভূমি, আর্য্যাবর্ত্তের সংঘর্ষের চিত্রের কাছে তার চিত্র নিতান্তই ফিকে! তার পর মনে পড়ে, পাঠান রাজ-ত্বের বিস্তৃত বিবরণ শেষ করে এসে দু'পৃষ্ঠার এক অধ্যায়ে পড়েছিলাম—শ্রীচৈতন্য, নানক, রামানন্দের কথা। শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল সম্বন্ধে তেমনি দু'চার ছত্র; পরীক্ষায় প্রশ্ন হত—Write short notes on.... তখন থেকে মনে হল, ভারতবর্ষের ইতিহাস বল্‌তে পাঠান, মোগল, তাতার, ইংরেজের ইতিহাস। তার মাঝে হিন্দুর কথা, আর্য্যসভ্যতার কথা Short notesএর উপযোগী মাত্র। এই ধারণা নিয়ে হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করতে হত। আজ পাঠান মোগলের শাসনকাহিনী কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, বুদ্ধ-শঙ্কর-গৌরাঙ্গ-নানকের মহিমায় হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, দেশের সত্যকার ইতিহাস কোথায় তা জান্‌তে পেরে জীবনে সেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। ছোটবেলায় এ ইতিহাস জানতে দিলে না কে? Greater Indiaর যে গৌরবময় বিচিত্র কাহিনী দিনের পর দিন আবিষ্কৃত হচ্ছে, তার জ্ঞান থেকে ছেলেদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে কেন? গবেষণার বিষয় ইতিহাসের অন্তর্গত হতে পারে না, এই ভয়ে কি? কিন্তু অধুনা পাঠ্য ইতিহাসে 'কতটুকু সত্য, আর কতটুকু নিছক্ কল্পনা ও নির্জ্জলা মিথ্যা কথা, তার হিসাব কি জানা নাই?

তার পর আর একটা কথা, ভাষা শিক্ষা। মনে পড়ে, ইস্কুলের পাঠ্য তালিকায় Second Language বলে একটা ঘর থাক্‌ত। কোন্ ভাষা সহজে আয়ত্ত হয়, সেই হিসাবে যদি তাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় কর্‌তে হয়, তাহলে বাঙ্গালী ছেলের পক্ষে অবশ্যশিক্ষণীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে সংস্কৃত হত First Language, আর ইংরেজী হত Second Language। অন্ততঃ কোনও আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন বিদেশী হয়ত তাই মনে কর্‌ত। কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃত হচ্ছে Second Language। সংস্কৃত শিক্ষা কঠিন—এ আনাড়ীর কথা; আমরা জানি, ইংরেজীর চেয়ে সংস্কৃত শেখা সোজা। না পড়ে শুধু শুনে মোটামুটী সংস্কৃতের অর্থ-বোধ ভারতবর্ষের যে কোনও লোকের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু না পড়ে শুধু শুনে ইংরেজী

বোঝা যায় না। দেশীভাষার বার আনা রকম শব্দ মূলে সংস্কৃত; আর ইংরেজী একটা শব্দও মাতৃভাষার সঙ্গে মেলে না। তবুও ইংরেজী শেখা সহজ হয়, আর সংস্কৃত শেখা কঠিন! 8th Class থেকে 1st Class পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্য, ব্যাকরণ, অনুবাদ, অনুশীলনী ইত্যাদিতে রোজ ৩ ঘণ্টা, তা ছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, মায় সংস্কৃত পর্য্যন্ত—(কোনও কোনও কলেজে বাংলা পড়ানো হয় ইংরেজী ভাষায়, এ ও দেখেছি!) ইংরেজী ভাষায় শিখিয়েও কুলায় না। আর তার তুলনায় 5th Class থেকে এক ঘণ্টা করে সংস্কৃত পড়ানো হয়—তাও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে। তবুও বলতে হবে ইংরেজী সোজা, সংস্কৃত কঠিন! Herbert Spencer বলেন, বারো বছরের আগে ছেলেদের কোনও বিদেশী ভাষা শেখানোই উচিত নয়, তাতে মেধার হানি হয়। কিন্তু আমাদের ছেলেরা আর দুদিন পরে বোধ হয় বর্ণপরিচয় পড়বার আগে Spelling Book নিয়ে বসবে।

অন্য ইউরোপীয় জাতির কথা ছেড়ে দিলাম, জাপানীরা Second Language হিসাবে ইংরেজী পড়ে; কোনও ইউরোপীয় জাতির চেয়ে ইংরেজী তাদের কাছে নিশ্চয়ই বেশী কঠিন, কেন না ভাষাটা নিঃসম্পর্কীয়। কিন্তু তবু তাদের চলে যায়, ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে তারা আমাদের চেয়ে উন্নত। অথচ তাদের ইংরেজী শেখার বরাদ্দ সপ্তাহে ২ ঘণ্টা। আর আমাদের ছেলেদের Spelling Book ঠোঁটে নিয়ে মায়ের পেট থেকে পড়েও নিস্তার নাই। কাগজে পড়েছিলাম, একটী জাপানী ছেলে নাকি আমাদের দেশের কোনও মহামহোপাধ্যায়ের কাছে ভুল ইংরেজী বলেছিল। তিনি বল্লেন, তুমি শিক্ষিত ছেলে, ইংরেজীতে ভুল করলে? সে অমনি ছাতি ফুলিয়ে বলেছিল, "What do I care?" কিন্তু অমন "ডোণ্ট কেয়ার" কি আমাদের করবার সাধ্য আছে? তাহলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপই বা হয়ে যায়!

ছেলের যতটুকু হজম হবে, ততটুকু শিখতে দিতে হবে—এটা সার্ব্বভৌম রীতি। সেই হিসাবে আগে বাংলা, তার পর সংস্কৃত, তার পর ইংরেজী, এই আমাদের ভাষা শিক্ষার ক্রম নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা একেবারে বিপরীত।

তার পর আর একটা ভাববার বিষয়, মৌলিক চিন্তার উন্মেষ। একটা বিষয় পেলে তার সম্বন্ধে আলোচনা করে একটা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা ইংরেজের স্বভাব; আর তার পেছনে ফেউ ধরা আমাদের স্বভাব। অথচ এই অতিমাত্রায় শাস্ত্রশাসিত দেশেও একটা বিষয় নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় যতখানি তন্ন তন্ন আলোচনা হয়েছে, তা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষার ফলে দিন দিন চিন্তাশক্তি আমাদের লোপ পাচ্ছে, তার কারণ কি? কেউ কি ভাবে না? ভাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই ভাবকে ব্যক্ত করবার সঙ্কেত ছেলেদের শেখানো হয় না। একে তো মাতৃভাষার সঙ্গে যোগ সামান্য, তাতে ইংরেজী বলবার কায়দা দুরস্ত করতেই দিন গুজরাণ। ছেলেরা ভাবকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলেই বা কখন? তার পর প্রাণের মাঝে একটা ধাক্কা পেলে তবে ভাব জাগে; সে ধাক্কা পাওয়ার মত উত্তেজনা বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে কোথায়?

বিদ্যালয় তো নয়, যেন কারাগার। দেশে যে ব্যাপারটা সব চেয়ে তুমুল, তারই হাওয়া বিদ্যালয়ের মাঝে সার্কুলারের ভয়ে ঢুকতে পারে না। ছেলেদের চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবারণের উদ্দেশ্যেই যে এ ব্যবস্থা হয়েছে, তা নয়; তাহলে এর কুফলের প্রতিষেধক কোনও বীর্য্যবত্তর রসায়নেরও ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাই বা কোথায়? বিদ্যালয়ে দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান সীমাবদ্ধ, ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কোনও উন্নত কল্পনার অবকাশ নাই, এমন কি জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতাটুকু মুখ ফুটে বলে একটু সোয়াস্তি বা আশার আলোক পাওয়ার দরুণ আচার্য্যের সঙ্গটুকু পর্য্যন্ত নাই;—এমনস্থলে ভাব কি ভুঁই ফুঁড়ে গজাবে?

তা ছাড়া শিক্ষা হিসাবেই এ বিষয়ে কত গলদ। ভাষা শেখানো ভাবকে মূর্ত্ত করবার জন্য; শুধু ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করালে তা হবে? পরীক্ষায় Essay Paper আছে; শুধু সেগুলো সঙ্কলন করে একখানা বই ছাপালে মন্দ হত না। তাহলে Young Bengalএর মনের চেহারাটা স্পষ্ট বোঝা যেত। চিন্তাকে পঙ্গু রেখে ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা—এই হচ্ছে বর্ত্তমান শিক্ষানীতিতে সব চেয়ে মারাত্মক গলদ। শিক্ষায় তো মুখ ফোটাচ্ছে না—অতি সুকৌশলে ফুটন্ত মনকে বোবা করা হচ্ছে। অথচ কত স্বল্প চেষ্টায়, কচি মনে ভাবের ঢেউ তোলা যায়, সে তো অজানা নয়। শক্তির এই নিদারুণ বন্ধ্যাত্ব দেখে কি করে চুপ করে থাকা যায়?



কামনার সিদ্ধি

কামনা করা জীবের স্বভাব। আমরা চাই কত কিছু, কিন্তু সব পাই না; পাই না বলিয়াই দুঃখ পাই। একটা কথা আছে, যদি কামনার পরিপূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে মোটেই কিছু কামনা করিও না। কথাটা একটা হেঁয়ালীর মত। কিন্তু এই হেঁয়ালীর তাৎপর্য্য আছে। জীব তাহার স্বভাব পাইয়াছে শিব হইতে। জীবে যে কামনা রহিয়াছে, তাহার বীজ ভগবানেও নিশ্চয়ই আছে। ভগবানের কামনার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারিলে, জীবের কামনাকেও অখণ্ডিত করা যায়।

দুইটা কথা আছে, কামনা আর সঙ্কল্প। মূলে একই বস্তু অর্থাৎ বাসনা, কিন্তু আধারভেদে কাহারও কাছে কামনা, কাহারও কাছে সঙ্কল্প। কামনাতে পরমুখাপেক্ষিতা আছে; সঙ্কল্প বলিতে কিন্তু আত্মশক্তিরই স্ফুরণেরই ইঙ্গিত পাই। যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা কামনা করে, আবদার করে; আর যাহারা সবল, তাহারা সঙ্কল্প করে। বাসনার আগুন যখন সকলের বুকেই পোরা রহিয়াছে, তখন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, চিত্তে যেগুলি কামনার আকারে লালন করিতেছি, সেগুলিকে সঙ্কল্পের

আকার দেওয়া। এই তত্ত্বটা প্রাচীন যজ্ঞবিধির মূলে ছিল। এখনও পূজার্চ্চনার মূলে সঙ্কল্প করা হয়। দেবতার কাছে শুধু ক্যাঙলার মত আবদার করা নয়, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দাবী করা, তবেই সিদ্ধি। সকাম যজ্ঞের মূল কথা এই। আজকাল আমরা কেবল কামনা করিতেই জানি; পৃথিবীতে যে সব জাতি কাম্যজগতে সিদ্ধিলাভ করিতেছে, তাহারাও সঙ্কল্পী।

কামনাকে সঙ্কল্পে পরিণত করা কামনাপূরণের প্রথম উপায়। এ উপায়কে নির্দ্দোষ বলা যায় না। সঙ্কল্পেও বাধা আছে, কেননা ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। চেষ্টা হয়ত আমার আয়ত্ত, তবুও ফল তো আমার হিসাবের বাইরে। তাই ঈপ্সিত ফল না পাইলে সঙ্কল্পী পুরুষেরও দুঃখ হয়। তবে কামুকের দুঃখ তাহার চেয়েও বেশী, কেননা কামুক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কেবল লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে; সঙ্কল্পী অন্ততঃ পুরুষকারের তীব্র আনন্দটুকু ভোগ করে। তবুও ফলদৃষ্টি থাকায় তাহারে দুঃখ আছে। এই জন্য বলিতে হয়, সঙ্কল্পও সদোষ। এর চেয়েও যদি সঙ্কল্পসিদ্ধির কোনও উন্নততর উপায় থাকে, তাহা হইলে তাহারই সন্ধান প্রয়োজন। মানুষ পুরুষকার পর্য্যন্ত উঠিলেই তাহার যথেষ্ট হইল। এর পরেও কিছু পাইতে হইলে ভগবানের মাঝে তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

উপনিষদে ভগবানকে বলা হইয়াছে সত্যসঙ্কল্প, অর্থাৎ তাঁহার সঙ্কল্প ও ফলে অবিনাভাব সম্পর্ক। কথাটা আমরা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হই এবং সত্যসঙ্কল্প পুরুষের উদ্দেশ্যে কামনার কাঁদুনী গাহিতে থাকি। ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প জানিয়াও তাঁহার কাছে আবদার করা মূর্খতা বই কি? যিনি সত্যসঙ্কল্প তিনি খোষখেয়ালী নন; হয়ত তাঁর খেয়াল আছে, কিন্তু সেটা যে আমার কামনার সঙ্গে মিলিবে, তা নাও হইতে পারে। না মিলিলে মিলাইবার কোনও উপায়ও নাই, কেননা সত্যসঙ্কল্পীর সঙ্কল্প ও ফলে অবিনাভাব সম্বন্ধ। তাইতে বুঝি, সত্যসঙ্কল্পী পুরুষের কাছে কামনা করিয়া বড় বিশেষ লাভ নাই। তাঁর মনে যা আছে, তিনি তাই করিবেন; তাহা হইলে আমার হাত পাতাটাই তো বৃথা। লোকে না বুঝিয়া মানসিক করে, ঘুষ দিয়া ভগবান্‌কে খুসী করিবার চেষ্টা করে। যাঁরা কর্ম্মাধীন, সকাম উপহারে তাঁহাদের মন টলিতে পারে। কিন্তু তাঁহারা ভগবানের কর্ম্মচারী মাত্র। আমরা লোভী, স্বার্থপর, তাই কর্ম্মচারীদের ফুসলাইয়া কাজ হাঁসিল করিতে চাই, তোষামোদ করিয়া বলি, "হে ঠাকুর, তুমিই ভগবান্, আমার এইটুকু করিয়া দাও।" বিধান বজায় রাখিয়া তাঁহারা যদি পারেন, তো কিছু উপকার করিয়া দেন; কিন্তু সেটাও অনিশ্চিত। এরূপস্থলে নিশ্চিন্ত ফলের আশা করা যায়, যদি কর্ম্মসূত্রের গতি জানা যায়। তখন দাবী করা চলে, বলা চলে, এই তো আইনে রহিয়াছে, তবে তুমি দিবে না কেন? বৈদিক যজ্ঞ এমনি আইন কানুনের জ্ঞানের উপর, আপন হক্‌দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তখনকার চাওয়ার ধরণটাই ছিল বীরের মত। তাহার ফলও হইত। এখন শুধু নিষ্ফল কামনা—আর বৃথা মানসিক।

ভগবানের কাছে যদি চাহিয়া কিছু পাওয়ার না থাকে, তাহা হইলে কি করা যাইতে পারে, সেটাই সমস্যা। একটা ভরসা আছে,

তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। শুধু তোষামোদ করিয়া তাঁহাকে তাই বলি না, যেমন ভিখারী যাহাকে তাহাকে বলে, "এ মালীক, এ রাজা বাবু!" বাস্তবিক তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। কিন্তু কামুকের তাঁহাতেও বড় সুবিধা হইবে না। কল্পতরুর কাছে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তারও একটা হিসাব আছে। আমাদের চাওয়া তো পাঁক জলে ভুড়্‌ভুড়ি উঠার মত, একবার একটু চাপ পড়িলে আর বিরাম নাই, কেবল ভুড়্‌ভুড়ি উঠিতেই থাকিবে। বাঞ্ছাকল্পতরু সবগুলিরই হিসাব রাখেন, তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে সবগুলিরই জোগান দিবেন। কিন্তু তুমি এতগুলি নিয়া রাখিবে কোথায়? তাই তোমার চাওয়ার দোষেই ঠিক সময় মত জিনিষটা পাও না, মাঘ মাসে কম্বল চাহিয়া সেটা পাও আষাঢ় মাসে।"

তাঁহাকে বাঞ্ছাকল্পতরু বলি এই জন্য যে আমার ভিতর যে বাসনা জাগে, তাহা তো তাঁহারই অনাদিসিদ্ধ বাসনার তির্য্যকরূপ। তাঁর বাসনা আর ফলে অবিনাভাব, আমার বেলায় দুয়ে বিচ্ছেদ, তাই দুঃখ। আর তাঁর হইতেই আমারও বাসনার উদ্ভব, তাই তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। বলিতে পার, তাঁর হইতেই যদি সব, তবে দুঃখ কেন? আমি বলি, জীবে আর শিবে তবে প্রভেদ কেন? সেই প্রভেদ নিয়াই তো সংসার। আবার সংসারটা কি? সেটা সর্ব্বদাই সরিতেছে। তাহা হইলে আজ যাহা দুঃখ, তাহাও থাকিবে না; কেননা দুঃখটাও সরিতেছে। বাস্তবিক এইটাই হইল তত্ত্ব। এত কামনা-বাসনার দাহ, এত প্রাণপাতী প্রচেষ্টা, এই শোক দুঃখ মৃত্যু—এ সবই কেবল সেই আনন্দলোকের দিকে, সঙ্কল্পসিদ্ধের পরমতৃপ্তির দিকে সরিতেছে—তাই একে বলি সংসার।

পরিণামে কল্যাণ নিশ্চিত, এই ধারণা যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল, আশাভঙ্গের মনস্তাপ তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না। সে জানে, ছেলে যাহাই আবদার করে, বুদ্ধিমান পিতা সব সময় তাহাই দেন না। ছেলে কখনও কখনও কাঁদিয়া কাঁদিয়াও ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এই জন্য অসার কামনার পেছনে ভগবান শাস্তির ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছেন। খুসী মত চাহিয়া না পাইলে আপনিই কামনার বন্ধন ঢিলা হইয়া যায়, তাঁহার উপর নির্ভরতা আসে।

কিন্তু বলিতেছিলাম, আমাদের কামনা আর ভগবানের ইচ্ছা, দুয়ের মাঝে কোথায়ও একটা যোগ আছে। কেননা আমাদের যাহা কিছু, সকলই তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছে। তাই শুধু সঙ্কল্প দ্বারা আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া অথবা নির্ভরতা ও সন্তোষ দ্বারা কামনাকে নির্জ্জিত করা ছাড়াও তৃতীয় পন্থা একটা থাকা সম্ভব। কামনা না করিলেই কামনার সিদ্ধি—এই হেঁয়ালীর সমাধান সেখানেই আছে। ঠিক এই রীতিতে বাক্‌সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার কথাও এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, ঋষিরা শাপ বা বর যাহা দিতেছেন, তাহাই ফলিতেছে। এটাকে একটা আজগুবি ক্ষমতা ভাবিয়া অনেকেই মনে করে, ঋষিরা বুঝি ক্রোধ বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐরূপে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু আসল কথা

তাহা নয়। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাঁহাদের ইষ্টানিষ্ট বলিয়া তো কিছু নাই। তবে তাঁহারা এরূপ বলেন কেন? তাঁহারা যাহা সত্য অনুভব করেন, তাহাই বলিয়া যান মাত্র, অবিবেকীর ভাগ্যেই তাহা শাপ বা বর রূপে ফলিয়া যায়। বাক্য চিন্তারই বহির্বিকাশ মাত্র। চিন্তা সকলেই করে। কিন্তু একটু নিজের মাঝে তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যায়, অসার বাজে চিন্তায় আমাদের ভিতরটা একেবারে পোরা। একটুখানি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আশা বা আশঙ্কার উত্তেজনায় কল্পনা-দ্বারা তাহাকে আমরা পল্লবিত করিয়া তুলি। জলে তরঙ্গ থাকিলে যেমন জলাশয়ের তলদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি মনের এই আন্দোলনে একটা ঘটনার পরিণতি কি হইবে, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পরিণাম-চিন্তাহীন ব্যাপার বাক্যে প্রকাশ করিলে কাকতালীয় ন্যায়ে তাহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। এই জন্য যাহারা বহু-ভাষী, তাহারা প্রায়ই মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। শুধু অতীত ঘটনাকে যথাযথ প্রকাশ না করাই মিথ্যাভাষণ নয়, ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে অসার কল্পনাও মিথ্যাভাষণ।

যদি কেহ আশা-আশঙ্কারূপ বৃত্তি নিরোধ করিয়া সমাহিত চিত্তে একটা ব্যাপারকে দর্শন করে, তবে তাহার কার্য্যকারণ পরম্পরা তাহার বিশারদবুদ্ধিতে স্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে—ইহা অবৈজ্ঞানিক কথা নহে। এই আত্মসমাধানের অবস্থা আয়ত্ত হইলে, চিত্ত নিশ্চিন্ত হইলে যে চিত্তে কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা ইষ্টানিষ্টের ভাবনা উদিত হইতেই পারে না। যাহা যথাভূত, তাহাই সমাহিত চিত্তে জাগিয়া থাকে এবং তাহাই বাক্যে প্রকাশিত হইয়া অমোঘফলের সূচনা করে। এইরূপে বাক্‌সংযম বা চিন্তা সংযম হইতেই বাক্‌সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ঠিক এই রীতিতে সঙ্কল্পসিদ্ধিও হয়। মানবের খণ্ড ইচ্ছা আর ঈশ্বরের অখণ্ড ইচ্ছা, দুইয়ে সামঞ্জস্য হইলেই ইচ্ছাপূরণ সম্ভবপর হয়। অদৃষ্ট বা ভবিতব্য আমরা সকলেই মানি। অদৃষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সূক্ষ্ম শক্তি, সমস্ত জীবের কর্ম্মের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। সেই কর্ম্মসূত্রের টানা-পড়েন না জানা থাকিলে অদৃষ্টকে আয়ত্ত করা যায় না, সুতরাং অদৃষ্ট শক্তির বিপরীত কোনও প্রচ্ছন্ন কর্ম্মবীজকে অঙ্কুরিত করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা সত্বঃ সত্বঃ সার্থক হয় না। এই জন্য কামনা করিয়াও কামনার পরিপূরণ হয় না। কিন্তু চিত্তকে নিস্তরঙ্গ করিলে, নিজের অল্পদৃষ্টির দ্বারা কর্ম্মপরিচ্ছেদকে আয়ত্ত করিবার দুশ্চেষ্টা ছাড়িয়া দিলে, ঠিক যখন যে বাসনা করিবার, সেইটীই সঙ্কল্পের আকারে চিত্তে ভাসিয়া উঠিবে এবং তাহা সফলও হইবে। সঙ্কল্পসিদ্ধির ইহাই রহস্য। এই জন্যই বলা হয়, কামনায় সিদ্ধি পাইতে হইলে কামনা ছাড়।

সাধারণ লোক একটা বিশেষ কামনাকে জড়াইয়া তাহারই সিদ্ধি খোঁজে, সুতরাং কামনা ছাড়িলে সেই কামনার সিদ্ধি হইবে, এই অযুক্ত আশার উপর চিত্তকে ফেলিয়া রাখে বলিয়া কামনাত্যাগে কামনাসিদ্ধির যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারে না। যদি কামনা ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহাও সম্পূর্ণ ফলবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত হইয়া ছাড়িতে হইবে, সিদ্ধি কামনাকেও দূর করিয়া সহজ প্রজ্ঞা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। অবিবেকী

এই অবস্থাকে বড় ভয় করে। কামনার পরিতৃপ্তিতে সে সুখ মনে করে, সুতরাং কামনা ত্যাগ তাহার কাছে পরিপূর্ণ দুঃখের খনি বলিয়া মনে হয়। এই স্থানেই সংসারমায়ার বীজ। কামনা ত্যাগে যে কি অপার আনন্দ, যাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই, মহতের কৃপায় বা ভগবানের কৃপায় জ্ঞানের উন্মেষ না হইলে এই আনন্দের সন্ধান কেহ পায় না, বুঝাইতে গেলেও বুঝিতে পারে না। ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন, "জগতে কামনার তৃপ্তিতে যে সুখ, কিম্বা স্বর্গাদিতে কামতৃপ্তিতে যে মহৎ সুখ, কামনাত্যাগের সুখের তাহারা ষোলভাগেরও এক ভাগ নয়!"



আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥".

—ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।২।৮

যত কিছু সাধনা, সব চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য। নইলে অসাধনের ধনকে কখনও কোনও সাধনা দিয়ে ধরা যায় না। যোগ কর, চিত্তনিরোধ হবে; তাঁকে ভালবাস, তাতেও এক দিন তাঁতেই চিত্ত সমাহিত হবে। দু'য়ের মাঝে প্রথমটী আয়াস-সাপেক্ষ, দ্বিতীয়টী স্বাভাবিক ভাব-প্রবণ চিত্তের স্ফুরণ। অথচ পৌঁছে দেয় সেই অসীমের কাছে। কিন্তু কেমন করে যে কোন্ পথ দিয়ে তিনি টেনে নিলেন, তা টেরও পাওয়া যায় না। ভালবাসার এমনি মহিমা।

*

ভাল না বেসে মানুষের দিন চলে না। কোনও মানুষ বা ভাবের কাছে সে আত্মবলি দিয়ে নিজকে কতকটা না ভুলে সে থাকতে পারে না। অথচ এই অপরিহার্য্য আত্মবিস্মৃতি যদি তার জেনে শুনে, প্রথম থেকে ভগবানের জন্য হয়, তাহলে কিন্তু সে অনেকটা এগিয়ে যায়; ভগবানও তার জন্য আরও দশ পা এগিয়ে এসে কোলে টেনে নেন। কিন্তু মানুষ তো সে দিকে যাবে না—মহামায়ার বাঁধন যে তাহলে কেটে যায়!

*

সাধনার অবশ্য ছোট বড় ভেদ কল্পনা করা যায় না। অধিকারীভেদে সোজা বা কঠিন হয় বলেই ছোট বড় আখ্যা দিই। কিন্তু দেশকালের অবস্থানুসারে স্বভাবতঃ অধিকাংশ মানুষের মাঝে যে ভাবটা প্রবল দেখা যায়, তখনকার যুগে সেই ভাবের সাধনাই সহজ, সুগম বা বড় বলে মনে হয়। আসল কথা হচ্ছে সাধনার লক্ষ্য নিয়ে—সাধনার ছোট বড় নিয়ে নয়। সেই দিকে যেতে পথের বিচার যখন করি, তখনই কোন্টা সোজা রাস্তা, তাই খুঁজতে যাস। কিন্তু যাঁর প্রাণে সেই লক্ষ্যের জন্য আকুলতা জেগেছে, তার পথ আর

নিজে বেছে নেবার অবসর থাকে না। এক জন কোথা থেকে ছুটে এসে আপন হাত ধরে নিয়ে যায়। কাজেই যতক্ষণ পথের বিচার করছ, ততক্ষণ তাঁকে ভাবলে কাজ হবে বেশী। ভোলামন আসল ফেলে নকল নিয়ে মজতে চাইছে বলে সঙ্গে সঙ্গে তুমিও মজবে?

*

মায়া বলতে এক অপরিজ্ঞাত রহস্য। কেন যে কি হল, তা বোঝার যো নাই; অথচ হচ্ছে যে, তা স্পষ্ট অনুভব করছি। ভক্ত বল, যোগী বল, বৈদান্তিক বল, কেউ একে স্বীকার না করে পারেন না। কেউ নিজের শক্তিতে এর হাত থেকে নিস্তার পান না। এর কাছে রেহাই পেতে হলে, যিনি একে চিনেছেন তাঁকে, বা যাঁর মায়া তাঁকেই ধরতে হবে। একজনের কাছে এমনি আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ না করে গত্যন্তর নাই। যদি সব দিতেই হয়, যাঁকেই দাও, একমাত্র ভালবেসে দিও, তবে সেই হবে সব চেয়ে সরল ও শ্রেষ্ঠ সাধনা।

*

সবাই কাজ করছি বটে, কিন্তু দিশেহারা হয়ে। কিসের প্রেরণায় কার জন্য অমন সব ভুলে খেটে মরছি, তা তো একবার ভাবছি না—সে তত্ত্ব জেনে নিয়ে যদি ঠিক ঠিক কাজ করতে পারি, তাহলে কিন্তু ওই কাজেই অমন ভূতের বেগার খাটা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। তখন কাজের মূলে ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষার দারুণ মোহ টুটে যাবে। এক দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরলস কর্ম্মে তখন দেহ-মন নৃত্য করবে, তাতে ছন্দ থাকবে, কিন্তু পুরস্কারের লোভ থাকবে না—হার-জিৎ থাকবে, কিন্তু শিশুর ক্রীড়ার মত তাতে বুকে কোন ছাপ বসবে না।

মনের চারধারে কত কথা, কত ভাবনাই এসে জোটে; আবার সমুদ্রে জোয়ারের পর ভাটার মতন যেমন এসেছিল, তেমনি চলে যায়। কিন্তু এ সমস্তের মাঝে ঠিক একটী সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ধরে থাকতে পারলে কোনও ধাক্কা এসে মুসড়ে দিতে পারবে না। সুখ-দুঃখের ছাঁকনি দিয়ে যাচাই হয়ে সব ধুয়ে মুছে যখন শুধু একটী লক্ষ্যে চিত্ত তন্ময় হবে, তখনি প্রকৃত আনন্দের স্বাদ মিলবে। দুঃখের কবলে পড়েও তখন আর বিচলিত হবার ভয় থাকবে না। তা বলে দুঃখ যে আসবে না, তা কিন্তু নয়; এসে সে আলোর কাছে আপন আঁধার-সত্তা হারিয়ে যাবে।

*

দুঃখ আসবে, সাংসারিক ঘটনাচক্রে মায়ার প্রভাবে সুখ-দুঃখে নিষ্পেষিত করতে চাইবেই। এ চিরন্তন আইন মুছবার নয়। কিন্তু গুরু বলেন, তোমাকে তার মাঝে পড়ে 'হাহতোস্মি' করতে হবে কেন? ওর চাকা ঘুরছে আর তুমি মনে করছ যে তুমিও ওই চাকার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা। এইখানেই তো ভুল। কীলকে বসে দেখ না, কেমন সুন্দর ঘুরছে। না—সংস্কার নিয়ে বসে আছ যে তুমি শুদ্ধ ঘুরছ; পিছনে ফিরে দেখ না—তুমি স্থিরই রয়েছ, ঘুরছে শুধু ওই চাকাটা, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংস্কার নিয়ে তোমার মন বুদ্ধি ইত্যাদি। এখন থেকে বিপরীত দিকে ভাবতে শেখ দেখি। মুখে বলছ আমার দেহ, মন, বুদ্ধি—আর কাজের বেলায় আবার তাদেরই "আমি" বলে ভুল হচ্ছে। কাজেই দেখছ, ভয়টা বা আঘাতটা আসল নয়; আসল হচ্ছে তোমার ভুলটা। সংশোধন করতে হলে তাকেই কর।

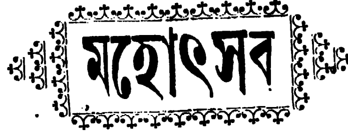


সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব শীঘ্রই মঠে পদার্পণ করিবেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাস তাঁহার মঠেই অবস্থান করার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমিতে আশ্রম স্থাপনোলক্ষ্যে মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণী অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমিতে





আসাম সারস্বত মঠ ও বাঙ্গালার সারস্বত আশ্রমগুলির প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজ তদীয় জন্মভূমি নদীয়া জেলা মেহেরপুর মহকুমার কুতবপুর গ্রামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় তিন শত ভক্ত শিষ্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে হাকিম, উকিল, ডাক্তার, জমিদার, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তদুপলক্ষে কুতবপুর গ্রামে ১লা, ২রা ও ৩রা কার্ত্তিক মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই কয়দিন গ্রামটী মহা পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। কুতবপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী ১০।১২ মাইল দূরের শত শত লোক মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সে বিরাট্ লোক সমাগম না দেখিলে অনুভব করা যায় না। তাঁহার ভক্তশিষ্যগণ অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রায় 'সহস্রাধিক লোক' প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের নেতা ও যুবকগণ সর্ব্বান্তঃকরণে শিষ্যগণের কার্য্যে যোগদান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। গ্রামবাসিগণ পাকের তৈজসপত্রাদি, সামিয়ানা, সতরঞ্চী প্রভৃতি যোগাইয়াছেন। সমাগত শিষ্য, ভক্ত ও দর্শনার্থীগণকে আপন আপন বাটীতে স্থান দান করতঃ কয়দিন নিজের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহাদের সেবা-যত্ন ও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহ কোন কারণে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিমুখে কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল বি, এ, ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ পাল ডাক্তার মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে ১৯ জন স্বেচ্ছাসেবক দিবারাত্র প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন ও বিরাট্ মহোৎসবের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন। মহাপুরুষের জন্মভূমি-অধিবাসীবৃন্দের সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। জীবনে এরূপ দৃশ্য দেখিবার আর সুযোগ হয় নাই।

মহাপুরুষের জন্মভূমি দর্শনের স্মৃতির স্থায়িত্ব-বিধানের জন্য তাঁহার পৈত্রিক ভিটাতে ভক্ত শিষ্যগণ একটী পাকা মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। ৩রা কার্ত্তিক পূজা, হোম, পাঠাদি পূর্ব্বক মন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ঐদিন সমগ্র গ্রামবাসীদের প্রসাদ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বেলা ১০টার সময় একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নদীয়া জেলার অবসরপ্রাপ্ত সব জজ্ শ্রীযুক্ত উমানাথ ঘোষাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেহেরপুর হইতেও বহু ভদ্রলোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার রায় শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র মল্লিক বাহাদুর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র,

সেন গুপ্ত, প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও আরও কয়েকটী উকিলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশবাসীও মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার্থ স্থানীয় বিদ্যালয়টীকে "শ্রীনিগমানন্দ মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়" নামে অভিহিত করিয়াছেন। জেলা বোর্ড হইতেও মহাপুরুষের নামে কুতবপুরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই মহোৎসবে মহাপুরুষের ভক্তশিষ্যগণ সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গ্রামবাসিগণ যে সকল সঙ্গীত ও কবিতায় তাঁহাকে আবাহন ও অভিনন্দিত করিয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

(১)

জয় জয় নিগমানন্দ !
শ্রীশ্রীমৎ স্বামী, এলেন জন্মভূমি,
সঙ্গে লয়ে ভক্তবৃন্দ।
দরশন আশে, দলে দলে মিশে,
পুরুষ রমণী কুতবপুর আসে ;
আজি এ নগরী যেন ব্রজপুরী,
সবে পাবে ব্রজানন্দ ॥
নামাদি কীর্ত্তনে নগর ভ্রমণ,
মধ্যে ভক্ত ঘেরি যত ভক্তগণ,
কেহ নাচে গায়, কেহ বা বাজায়,
প্রেমেতে হইয়ে অন্ধ ॥
ষড়্‌রিপু জিনি ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ,
ভক্তভাবে প্রভু হলেন অবতীর্ণ,
প্রেমরসে মাখা ভক্ত প্রাণ সখা,
নদীয়ার পূর্ণচন্দ্র ॥
এ হৃদয়ানন্দ মহানন্দে ভাসে,
ভক্তগণ সঙ্গে ভাব-প্রেমরসে,
রাজরাজেশ্বরে বসায়ে অন্তরে
পূজি ও চরণারবিন্দ ॥

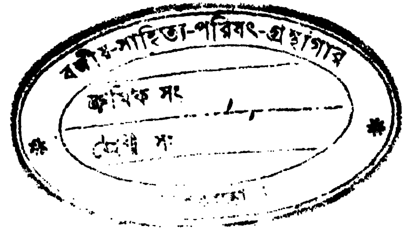
(২)

প্রেমের আকর এসেছ ঠাকুর !
কাঙ্গালে করুণা করিতে হে,
প্রেম বিতরিতে মরু সম চিতে
পতিতে তাপিতে তারিতে হে।

"জয়গুরু" নামে অমিয় ঢালা
হেরিলে সে রূপ জুড়াবে জ্বালা
(তাঁর) রাতুল চরণে পরাণ সঁপিলে
ভাবনা পলায় দূরেতে হে।

করি "তাঁর" কথা অমৃত-পান
জাগিয়া উঠিছে অবশ পরাণ,
হতাশ হৃদয়ে তীব্র আশা জাগে
"তাঁহারি' মধুর নামেতে হে।

সবে মিলে আজি কর জয়গান
আনন্দে মাতিবে সবার পরাণ
চির শান্তি পাবে, হৃদয় জুড়াবে,
ভবেরি ভাবনা রবে না হে ॥



ওঁ তৎ-সৎ

আর্য্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ
সমষ্টি সং ২০০

অগ্রহায়ণ

দ্বিতীয় খণ্ড
দ্বিতীয় সংখ্যা

ইন্দ্রঃ সোমপঃ

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।২।১-১০]

—*()*—

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

——*——

ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবেমং
মাধ্যন্দিনং সবনং চারু যত্তে।
প্র প্রুথ্যা শিপ্রে মঘবন্নৃজীষিন্
বিমুচ্যা হরী ইহ মাদয়স্ব॥

হে বাসব সোমপতি, এই দেখ রাখিয়াছি, সোম—
নিঙারিয়া মধ্য দিনে তব তরে করি চারু হোম
পূরিয়া কবল দুটী, মঘবন্, শুষে নাও রস,
বাঁধ হোথা তুরঙ্গমে, এস হেথা—জাগাও হরষ!

গবাশিরং মন্থিনামিন্দ্র শুক্রং
পিবা সোমং ররিমা তে মদায়।
ব্রহ্মকৃতা মারুতেন গণেন
সজোষা রুদ্রৈস্তৃপদা বৃষস্ব॥

মন্থযুত তাজা সোম—গব্যরস মিশায়েছি তায়,
মত্ত হও করি পান—দিই ঢেলে যত প্রাণ চায়?
সাথী যত মরুতেরা—নিয়ে এসো রুদ্রগণে আরো—
বসে যাক্—স্তুতি গা'ক্—ঢালো কণ্ঠে ঢালো যত পারো!

যে তে শুষ্মং যে তবিষীমবর্দ্ধন্-
নর্চন্ত ইন্দ্র মরুতস্ত ওজঃ।
মাধ্যন্দিনে সবনে বজ্রহস্ত
পিবা রুদ্রেভিঃ সগণঃ সুশিপ্র॥

শুনিয়া বীর্য্য তব বাড়ায়েছে বাহুবল যারা,
ওই সব মরুতেরা এলো বুঝি পেয়ে তব সাড়া!
দুপুরে নিঙারি সোম; রুদ্রগণে দাও না গো ডাক্—
বজ্র হাতে সাথী-সাথে পিও রস—রাঙা হোক্ নাক!

মনুষ্মদিন্দ্র সবনং জুষাণোঃ
পিবা সোমং শশ্বতে বীর্য্যায়।
স আ ববৃৎস্ব হর্য্যশ্ব যজ্ঞৈঃ
সরণ্যুভিরপো অর্ণা সিসর্ষি॥

এই যে নিঙারি রস, এসো ইন্দ্র যজ্ঞে যথা আস,
হোক্ চিরবীর্য্য লাভ, পিও সোম,—বড় ভালবাস!
নিয়ো এসো মরুতেরে—পূজ্য তাঁরা, হে হরিবাহন!
প্রচণ্ড গর্জ্জনে ধারা শূন্য হতে কর বরিষণ।

ইন্দ্রস্য কর্ম্ম সুকৃতা পুরাণি
ব্রতানি দেবা ন মিনন্তি বিশ্বে।
দাধার যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
জজান সূর্য্যমুষসং সুদংসাঃ ॥

করেছে যে কত কর্ম্ম ইন্দ্র, বল কে করে গণন,
বাধা দিবে ব্রতে তার দেবতারা ভাবে না কখন।
এই পৃথ্বী, ওই ব্যোম—একা তারে ধরে রেখেছিলো—
অপরূপ কীর্ত্তি তার—উষা আর রবিরে সৃজিলো!

ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র
মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্।
যদ্ধ দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশী-
রথাভবঃ পূর্ব্ব্যঃ কারুধায়াঃ ॥

আবেশিয়া রয়েছ যে হে বাসব দ্যাবা আর ভূমি!
তুমি কর্ম্মবিধাতা যে নিখিলের, চিরন্তন তুমি—
কোথা হতে এ মহিমা?—জানি তাহা;—সদ্য জনমিয়া
মহাব্যোমতলে তুমি মত্ত হলে সোমরস পিয়া!

আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা
সেক্তেব কোশং সিসিচে পিবধ্যৈ।
সমু প্রিয়া আববৃত্রন্ মদায়
প্রদক্ষিণিদভি সোমাস ইন্দ্রং ॥

এই দেখ পূরেছি কলশ, ইন্দ্র, নিবেদি তোমায়—
উগারি' মষক হেন ঢেলে দিই, পান কর তায়।
উন্মাদক সুধা এ যে, ইন্দ্র তারে বড় ভালবাসে—
প্রদক্ষিণ করি তাঁয় পাত্র যেন ঘুরে ঘুরে আসে।

—:*:—

অসাধনের ধন

—:{*}:—

সাধিয়া কাহাকেও মা পাইতে হয় না, বাপ পাইতে হয় না। মুখে যাঁহাকে বলি বাপ-মায়ের চেয়েও আপন, তাঁহাকে পাইতে হইল কেন যে সাধন প্রয়োজন হয়, এই একটা রহস্য। তবে সংসারে এমনও দেখিয়াছি, কাহারও বাপ মা থাকিতেও যেন নাই; সেটা বাপ-মায়ের দোষ নয়—দোষ সন্তানের। যে স্নেহের মান রাখিল না, বাপ-মায়ের মর্য্যাদা রাখিতে জানিল না, সন্তানের গৌরবে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিল না, তাহার তো বাপ-মা থাকিয়াও নাই। কিন্তু তবুও দেখি, অমন হতভাগা ছেলের জন্যও বাপ-মায়ের প্রাণ কাঁদে! এই যদি সংসারের সত্য হয়, তবে জানিও, সারাৎসারের তত্ত্বও এই; কেননা এখানে যাহা ছায়া, সেখানে তাহা কায়া।

বেদ বলিতেছেন, স্বয়ম্ভু জীবের বুদ্ধি-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-মন সব উল্টামুখী বসাইয়া দিয়াছেন; তাই জগতে সে নিজের চোখ দিয়া সকলের মুখ দেখে, কেবল আপনার মুখটাই দেখিতে পায় না। এ যে শুধু সংসারীরই উল্টা বুদ্ধি, তা নয়, দেখিতেছি, সাধকেরও সেই উল্টাবুদ্ধি। দিনান্তে একবারও ভগবানের নাম লইল না, সংসারের একটা কাণাকড়ির হিসাব মিলাইতে সাত সের তেল পুড়াইল—এমন লোক আছে; তাহাদের উপর রাগ হয় না, কেননা ধর্ম্মিষ্ঠেরাও বলিবেন, তাহারা বোকা। কিন্তু যে নাকি তাঁহার নাম লইতে শিখিয়াছে, অন্ততঃ শিখিবার চেষ্টায় আছে, তাহার আড়ম্বর দেখিয়া গায়ে জ্বালা ধরিয়া যায়। কেননা, এরা নিজেদের কাছেই কবুল করিয়াছে, যে এরা সংসারীর চেয়েও সেয়ানা; মহাজনের বাণীও তাহার সায় দিতেছে—"যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর!" কিন্তু বাপ্‌রে, সে ভজনের কি বেজায় আড়ম্বর! ছেলে যেন বায়না ধরিয়া বসিয়াছে, সে মনের মতন মা গড়িয়া তুলিবে!

বাস্তবিক সাধ্য যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি নিজে; আগে নিজের চরকায় তেল দাও। তুমি যাঁহাকে চাহিতেছ, তিনি যে অনাদিসিদ্ধ গো! তাঁহাকে আবার তোমার মতলবমত গড়িয়া তুলিবে কি? হাঁ, মনের মতনটী হইয়া আসিলে প্রাণ খুসীতে নাচিয়া উঠে, তা জানি; কিন্তু এও জানি, সেটাও একটা কামনা। কাম যেমন সৌন্দর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া, আত্মার বুভুক্ষাকে অতৃপ্ত রাখিয়া কেবল একটা স্থূল পিণ্ড মাত্র হাতের কাছে আনিয়া দেয়, এই মনের-মত পাওয়ার কামনাও তেমনি হাতের লক্ষ্মী দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে শিখায় শুধু। নইলে যিনি এত কাছে যে তাঁহাকে আপনার হইতে আপনার বল, অন্তর্য্যামী বলিয়া গলিয়া পড়, তাঁহাকে ধরিবার জন্য এত বড় ফাঁদ পাতিতেছ কেন? পরমহংসদেব বলিতেন, অজ্ঞানীর ঈশ্বর হোথা হোথা, আর জ্ঞানীর ঈশ্বর হেথা-হেথা।

মা-টী যদি আজ মেয়েটী হইয়া আসিত, তাহা হইলে বুঝি, তোমার বুকের জ্বালা জুড়াইত, তাই তাঁহাকে মেয়ের রূপে পাইতে আজ তোমার এত আকিঞ্চন। কিন্তু এই যে

মেয়েটী তোমার কোলে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছে, সুধামাখা ডাকে পরাণ গলাইয়া সোহাগ কাড়িয়া নিতেছে, এইটীই যে সেই মা-টী নয়, তাই বা কি করিয়া বুঝিলে! আরে অবোধ, এই যে সে—তোর চোখের সামনে, বুকের মাঝে! তবু তুই চোখ বুজিয়া বুক চাপড়াইয়া মরিতেছিস্, বলিতেছিস্, সে কোথায়—সে কোথায়!—দেখা দাও—প্রাণ যায়! পাগল!—সে কি আড়াল হইয়া রহিয়াছে, যে সাধ্যসাধনা করিয়া ডাকিয়া আনিতে হইবে?

এত কাছে সে রহিয়াছে, তবুও তাহাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না—এই তো মায়া। লোকে বলে, মায়াতে নাকে দড়ি দিয়া জীবকে সংসারচক্রে ঘুরাইয়া মারিতেছে। আমি দেখিতেছি মায়া যে নাকে ডবল দড়ি দিয়া সাধককে সাধনচক্রে ঘুরাইয়া মারিতেছে! জ্ঞানের অভিমানে, সাধনার অভিমানে দিন দিন সে দূরে সরিয়া যাইতেছে—আর ভাবিতেছে, এই বুঝি ঘাটে আসিলাম। জানি, ভগবান্ যে অতি সহজ, অতি কাছে, সে কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বাস করিলে তো মায়ার আবরণ খসিয়াই যাইত। কেহ হয়ত আবদার করিবে, এত কাছে যখন, তখন দেখাইয়া দাও না কেন! তুমি নিজে যদি চোখ বুজিয়া থাক, তাহা হইলে দেখাইতে পারে কার বাপের সাধ্য! সূর্য্য দেখাইতে প্রদীপের প্রয়োজন হয় অন্ধের। যার চোখ আছে, সে ভোরের আলো ঘরে পড়িতেই প্রদীপ নিবাইয়া দেয়।

কি সংসারক্ষেত্রে, কি অধ্যাত্মরাজ্যে, সর্ব্বত্র দেখিতেছি কর্ম্ম বলবৎ। সংসারে এমন লোক আছে যাহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দু'মুঠা অন্নের জোগাড় করিতে হয়; কারু বা জন্মিয়া অবধি ক্ষীর সর খাইয়া অরুচি ধরিয়া যায়। এক জন প্রাণপণে খাটিয়া প্রাণটা টিকাইয়া রাখে, আর এক জন বিনা খাটুনীতে ফাঁপিয়া উঠে। অধ্যাত্মরাজ্যেও তাই। কেউ বা সেখানে ফকির হইয়া জন্মায়; তার খাটুনীর আর অন্ত নাই; কেউ বা সেখানে রাজার ছেলে—না চাহিতেও তার সব আসিয়া জোটে। তবে সংসারে আর অধ্যাত্মরাজ্যের প্রভেদ এই যে, সংসারে রাজা হইতে গেলে অনেকখানি কাঠ-খড় পোড়াইতে হয়; আর এখানে রাজার ছেলে হইতে গেলে রাজরাজেশ্বরকে শুধু বাবা ডাকিলেই হয়। কিন্তু সেই সহজ ডাকটাই যে কারু মুখে আসে না—এই তো গেরো।

শুনিয়াছি, কোনও এক মহাপুরুষের এক শিষ্য ছিল, সে জেদ ধরিয়াছিল, মালা জপিয়া ভগবান্ পাইবে। মহাপুরুষ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, তোর অত-শতয় দরকার কি বাপু—আমি বলিতেছি, অমনি তোর সব হইবে। সে বিশ্বাস করিল না, লুকাইয়া মালা জপ করিতে বসিয়া গেল। মহাপুরুষ দেখিতে পাইয়া একদিন মালা কাড়িয়া লইয়া গঙ্গার চরে ফেলিয়া দিলেন। আর একদিন গঙ্গার ধার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখেন, লোকটা মালাগাছি কুড়াইয়া আনিয়া এক ঝোপের আড়ালে বসিয়া জপ করিতেছে; সেই দিন তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গের সকলকে বলিলেন, মহামায়া এখন জপের মালা হইয়া উহার কাঁধে ভর করিয়াছেন, ওর আর কিছু হইবে না।

ভগবান্ খুঁজিতে গিয়া মানুষ গুরু করে। গুরু করার অর্থ তো এই বুঝি যে, আমি ভগবান্‌কে জানি না, চিনি না, পাওয়ার পথই বা কি বলিতে পারি না; তাই যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার কাছে আসিয়াছি, তিনি যাহা বলিবেন, তাই অকপটে বিশ্বাস করিব। (নতুবা তাঁহার কাছেই বা আসা কেন?) কিন্তু দেখিয়াছি, মানুষের কর্ম্ম এত প্রবল যে গুরুর কাছে আসিয়াও নিজের মতলবী বুদ্ধি ছাড়িতে পারে না। গুরু যদি বলিলেন, তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, শুধু এইটী জপ কর গিয়া। শিষ্য ভাবিল, অত বড় হোম্‌রা-চোম্‌রা ভগবান্, তাঁকে বশ করিব এইটুকু মন্ত্র দিয়া? নিশ্চয়ই আসল জিনিষটী উনি আমায় দিলেন না—আমায় ঠকাইলেন! যেন লোককে ঠকাইয়া বিপথে নিয়া যাওয়াই গুরুর ধর্ম্ম। কেহ বা বলিল, কই ধ্যান তো দিলেন না, শিবপূজা তো দিলেন না। সেয়ানার বুদ্ধি কি না, গুরু যে ফাঁকি দিয়া সহজে কাজ সারিবেন, সেটী হইবার যো নাই!

০

কেহ হয়ত চোখ দুটী কপালে তুলিয়া বলিবে, ওমা, বিনা সাধনে কি কিছু হইবার যো আছে? তাই যদি হইত, তাহা হইলে উঁকে এত সাধন ভজন করিতে হইল কিসের জন্য? আমি বলি, তাঁহাকে এত সাধন-ভজন করিতে হইয়াছে আমাদের মত অসহায়, পঙ্গুর জন্য। তাঁহাকে করিতে হইয়াছে বলিয়াই তো আর আমাকে করিতে হইবে না—ভরসা শুধু তাঁর অহেতুক ভালবাসা। এক জন লণ্ঠন জ্বালে, পাঁচ জন লণ্ঠনধারীর পেছনে পেছনে সেই আলোতে পথ দেখিয়া চলে। রেলের ইঞ্জিনটাই হাঁসফাঁস করিয়া ছোটে; পেছনের গাড়ীগুলিকে কয়লাও চিবাইতে হয় না, জলও গিলিতে হয় না। তবে শিকলে শিকলে যোগ থাকা চাই, চাকায় তেল থাকা চাই।

যদি নিতান্তই কর্ম্মপাশ না কাটাইতে পার, তবে সেই কর্ম্ম দিয়া তোমার নিজের চাকায় তেল দাও—নিজে ভাল হইবার চেষ্টা কর। কর্ম্ম দিয়া সাধন দিয়া ভগবানকে বশ করা যায় না, তাহা হইলে তিনিও জীবের সামিল হইয়া পড়িতেন। সাধনা শুধু আমার মনের ময়লামাটী ঘুচাইবার জন্য, ভগবানের মন পরিষ্কার করিবার জন্য নয়। সব সাধনশাস্ত্রেরই মূল কথাটা এই। জ্ঞানীর কাছে যাও, তিনি বলিবেন, জ্ঞানই মোক্ষ, জ্ঞানই ব্রহ্ম; কিন্তু সে জ্ঞানের সঙ্গে তো কর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই; তবে তোমার মনের ময়লা ঘুচাইবার জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন হইতে পারে বটে। ভক্তের কাছে যাও, তিনি বলিবেন, যে ভক্তি নিত্য-সিদ্ধ, তাহার আবার সাধনা কি? "নিত্যসিদ্ধস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।" তোমার হৃদয়কে তাহার প্রকটনের উপযোগী করিতে যদি কিছু দরকার হয় করিতে পার। সদ্‌গুরু বলিবেন, "অয়মেব হি তে বন্ধো যৎ সমাধিমনুতিষ্ঠসি" —এই যে মুক্তির জন্য সমাধি সমাধি করিয়া অস্থির হইয়াছ—এইটাই তোমার বন্ধন। একটা কথা মনে পড়ে। কেউ কেউ অভিযোগ করেন, জপ করিব কি করিয়া—মোটেই যে মন স্থির হয় না বলি, মনই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে জপ করিবার প্রয়োজন? মন স্থির করিবার জন্যই না জপ। স্থির মনই তো ভগবান্। তাঁহাতে আমাতে ব্যবধান অন্য কোথাও নাই—শুধু ব্যবধান এই মনের। মনটী মরিয়া গেলেই

আলোতে যেমন করিয়া আলো মিশাইয়া যায়, তেমনি করিয়া তিনি আর আমি মিশিয়া যাইব। এই মর্ম্মরহস্য দুইজনকে আগুলিয়া রহিয়াছে বলিয়াই না তাঁহাকে এত আপনার ভাবি।

তার পর আর একটা কথা। হঠাৎ পাওয়ার কোনও মূল্য নাই—পাইতে হয় তিল তিল করিয়া তবেই দখল পাকা হয়। এই হইল প্রকৃতির আইন। শুধু বহিঃপ্রকৃতির আইন নয়, আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিও এই কথাই বলে। অথচ আমরা সংস্কার নিয়া বসিয়া আছি, খুব খানিকটা কসরৎ করিয়া হঠাৎ একদিন তাঁহাকে পাইব। বীজ হঠাৎ ফলবন্ত গাছ হইয়া উঠে না; উষার সূর্য্য এক লাফে মধ্যাকাশে চড়িয়া বসে না; ভ্রূণ সহসা পূর্ণাবয়ব মানুষ হইয়া যায় না। কিন্তু যে দিন যে বীজে যে সঙ্কল্পের স্ফুরণ সুরু হয়, সেই দিন হইতে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে জয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য একটা অদম্য প্রেরণা তাহার মাঝে জাগিয়া উঠে। তাহাকেই বলি প্রাণ। ভগবানকে পাইবার জন্য যাহার প্রাণে এই ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, সে জানে তিলে তিলে পাইবার রহস্য কত মধুর। সে বোঝে, যে দিন হইতে পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সেইদিন হইতে পাওয়ার সুরু হইয়াছে। যে সাধন হিসাবে যম নিয়মের ব্রত গ্রহণ করিল, মনে করিয়াছ কি, সে কিছু পাইল না? প্রতিদিনের তপস্যায় মন যত মরিয়া আসিতে থাকিবে, ততই যে রাজরাজেশ্বর সে শূন্য স্থান জুড়িয়া বসিবেন—এ যে জ্যামিতিক সত্যের ন্যায় অকাট্য। কিন্তু সাধারণ সাধক, মনে করে এ আমার বৃথা সাধনা—তাঁহাকে পাইলাম না। এ তো সত্য নয়—এ হচ্ছে সংশয়। এই সংশয়ই তোমাকে বুঝিতে দেয় না যে তাঁহাকে পাইতে হইলে এতটুকু সাধনারও প্রয়োজন থাকিতে পারে না—শুধু চাইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

কৃষক বীজ পুঁতিয়া অঙ্কুরের অপেক্ষা করে; অঙ্কুর বাহির হইলে সযত্নে বড় করিয়া তোলে। তার পর যে দিন তার ফুল ঝরিয়া ফল ধরে, ফল পাকে, সেই দিন সে মনে করে—এতদিনে যাহা চাহিয়াছি, তাহা পাইয়াছি। সে ফল কি, তাহা জানে, তাই বীজরোপণের দিন হইতে এত দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসর তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু তুমি কি এমনি করিয়া ভগবানকে ফলের মত পাইতে চাও? তিনি তো ফলের মত সুজ্ঞেয়ও নন, যে পাইয়াছ কি না পাইয়াছ, তাহা যাচাই করিয়া লইবে। আবার তিনি ফলের মত অজ্ঞেয় নন যে বীজদশায় তাঁহার সত্তা নাই বলিয়া নিজকে অকৃতার্থ মনে করিবে। তিনি এমন কোনও পৃথক্ বস্তুও নন যে বীজ হইতে তাঁহাকে একেবারে আলাদা কোঠায় ঠেলিয়া রাখিবে। তিনি বীজ, তিনি অঙ্কুর, তিনি ফুল, তিনি ফল—অনাদি অনন্ত আনন্দের প্রবাহ তিনি! তাঁর সুতারের একপ্রান্ত জড়াইতে পারিলে যে সবটাই বুকের মাঝে জড়াইয়া যায়!

তাই বলিতেছিলাম—পাওয়া কঠিন নয়, পাওয়া খুবই সহজ; পাইয়াই আছি। কিন্তু জানি না—জানিতে চাই না। তাই অসাধনের ধনকেও সাধনার ফাঁসে বন্দী করিতে চাই। ওপারের আলো অঞ্জলি পূরিয়া আনিয়া অন্ধকারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া তুমি এ পারে ঢালিয়া দিবে—তাই এত সাধ্যসাধনা? মিথ্যা পরিশ্রম! অন্ধকারের আড়াল ভাঙ্গিয়া দাও—আলোর বুকে আলো গলিয়া মিশিয়া যাইবে—সব সহজ হইবে।



শ্রুতি-স্মৃতি

সাধন-ভজন করে নানা স্থানে ঘুরে পুরুষকারের চূড়ান্ত করে যখন হতাশ হয়ে পড়ে, তখনকার নির্ভরই প্রকৃত নির্ভর। তখন গুরুকৃপার জন্য আকুলতা হয়। অনেকে সাধনাবস্থাতে এমন জায়গায় এসে ঠেকে, যেখান থেকে বহু চেষ্টাতেও আর উঠতে পারে না; সেখানে গুরু ধাক্কা দিয়ে তুলে দেন। নির্ভর করতে চাই বললেই নির্ভর হয় না; নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়ে নির্ভর করতে হয়।

*

ভাবের সাধন খুব উচ্চ বটে, কিন্তু ভাব ঠিক রাখ্‌তে হলে অনুগত হয়ে সাধন করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না, তাহলে তুমিই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ পেতে হলে রাধার ভাব নিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে পেতে হলে শ্রীদাম সুদামের অনুগত হয়ে সাধন করতে হবে। বাৎসল্যভাবে তাঁকে পেতে হলে যশোদার ভাব নিতে হবে —এমনি।

*

বৈষ্ণবের ভাবের সাধনা অতি মধুর ও বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু সাধন করতে হলে উপযুক্ত অধিকারী হওয়া চাই। শুধু ভগবানকে বাবা বল্‌লে কি ভাব হয়? আপন বাবাকে যে ভক্তি করতে শিখেনি, ভগবানকে বাবা বলে সে আর কি পাবে?

*

আত্মসত্তা বিশ্বসত্তাতে মিশানোর নাম নির্ব্বাণ। নিজের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অনুভব করাই নির্ব্বাণ—উহা আপন অস্তিত্বের বিনাশ নয়।

*

আমিত্বের সঙ্কোচ ও প্রসারই জাতিভেদের কারণ। যার আমিত্ব একেবারে সঙ্কুচিত ও আচার ব্যবহার অনার্য্যের মত, সেই শূদ্র—ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হলেও সে শূদ্র। আর যাঁর আমিত্ব জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে, তিনি নীচ-কুলোদ্ভব হলেও ব্রাহ্মণ। পুরাণে লোমশমুনির আখ্যান আছে। তাঁর একটী করে লোম খস্‌লে একটী ইন্দ্রপাত হয়। এমনি করে কত ইন্দ্রপাত হলে তবে তাঁর দেহপতন হবে, বুঝ্‌তেই পার। কিন্তু তাঁর দেহে থাকবার ইচ্ছা নাই। তাই তাঁর প্রতি আদেশ হল, তুমি চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ কর, তাহলে তোমার লোম ঝরে যাবে। তিনি এক সদাচারী চণ্ডালের বাড়ী অন্নগ্রহণ করলেন, কিন্তু তাতে তাঁর কিছুই হল না। তার পর তিনি এক কদাচারী ব্রাহ্মণের ঘরে অন্নগ্রহণ করতেই তাঁর শরীরের সব লোম ঝরে পড়্‌ল। তখন বোঝা গেল, ব্রাহ্মণ হলেও বাস্তবিক সেই চণ্ডাল।

*

প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনেও শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ হয়ে থাকে। মানুষ যখন প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢেলে দেয়, নিজের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, তখন সে শূদ্র। যখন

সে এটা চায়, ওটা চায়, মুক্তির জন্য প্রাণে পিপাসা জাগে, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি আসে না, তখন সে বৈশ্য। যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করে তাকে দমন করতে চেষ্টা করে, তখন সে ক্ষত্রিয়। আর যখন প্রবৃত্তি দমন করে নিজে স্বাধীনভাবে চলতে পারে, তখন সে ব্রাহ্মণ।

❋

যে আত্মবলি দিয়েছে সেই শিষ্য, আর যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ, তিনিই গুরু।

❋

যখন যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তন ছিল, তখন সূক্ষ্মজগতের সঙ্গে স্থূলজগতের সম্বন্ধ হয়েছিল। তাই কাম্যকর্ম্ম দ্বারা দেবতাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা যেত। তার পর বুদ্ধদেব কর্ম্ম হতে আরও উন্নত আদর্শ স্থাপন করেন, তখন কারণ জগতের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। এ অবস্থা সুষুপ্তির মত; এ ছাড়াও যে আরও কিছু আছে, লোকে তার সন্ধান পায়নি। তুরীয়ানন্দের কথা সাধারণের তখন অজ্ঞাত ছিল। তার পর শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হলে তিনি জীবের সম্মুখে আরও উচ্চ আদর্শ স্থাপন করলেন, তখন তুরীয় লোকের কথা সাধারণে প্রচার হল। প্রত্যেক অবতারের কাজ ঠিক সিঁড়ির ধাপের মত, কেউ কারু থেকে আলাদা নয়।

❋

অদ্বৈতবাদীকে সব ছাড়তে হবে, কেবল গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছাড়া। কারণ গুরুই যথার্থ অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী, আর শিষ্য অজ্ঞানী। যত দিন শিষ্য গুরুরূপে পরিণত না হবে, ততদিন এই সম্বন্ধ থাকবে। আর গুরুর অবস্থা লাভ করলে আর কোনও ভেদ থাকবে না, সব একাকার হয়ে যাবে।

❋

গুরু যেন কাঁচপোকা আর শিষ্য তেলা পোকা। যতদিন শিষ্য কাঁচপোকাতে না পরিণত হবে, ততদিন গুরু কিছুতেই তাকে ছাড়বেন না।

❋

ঠিক কামনা শূন্য হওয়া যায় না। তবে যে কর্ম্ম নিজ স্বার্থের জন্য করা যায়, তা সকাম আর যা প্রেমের সঙ্গে পরের জন্য করা যায়, তাই নিষ্কাম।

❋

সাংখ্যের টীকাকার বলেন, দ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই, কেননা আত্মা সর্ব্বব্যাপী—সুতরাং আত্মা আত্মাকে কিরূপে দর্শন করবে? আত্মা সাক্ষিস্বরূপ যদি বলা হয়, তাহলেই তো দ্বৈত আনা হল। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে মন স্বপ্নাবস্থায় নিজেই নানারূপ সৃষ্টি করে—নিজেই বাঘ হয়ে নিজকে ভয় দেখায়। এমনি করে একই মন যদি দ্রষ্টা ও দৃশ্য হতে পারে, তবে আত্মাও কি আত্মার সাক্ষিস্বরূপ হতে পারে না?

❋

মানুষকে ভগবান বলে না চিনার পূর্ব্বে সংসার করা বৃথা।

❋

ঘুম মহা তামসী-বৃত্তি। ঘুম মানুষের সংজ্ঞ অবস্থা নষ্ট করিয়া তাকে অধিকার করে নেয়। ঘুমের মাঝে জাগ্রৎ থাকলে তাকেই বলে যোগনিদ্রা, উহাই সমাধি। প্রলয়কালে মহানিদ্রা এসে জগৎকে গ্রাস করে ফেলে;

নিদ্রাও তেমনি প্রতিদিন জীবকে গ্রাস করছে। আহার আর নিদ্রা, এই দুইটি সাধনপথের বিশেষ কণ্টক। দিবানিদ্রা বিশেষ অনিষ্টকারক।

*

একমাত্র তুমিই জীব; আর সকলকেই ভগবান বলে জানবে এবং ভাববে।

*

যে চিত্তশুদ্ধির পয়াসী, তার সংবাদপত্র পাঠ করা উচিত নয়, কারণ চিত্তকে যত বাজে জিনিষ দেবে, ততই সে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, শেষে তাকে স্থির করা কঠিন হবে। বেশী শাস্ত্র পড়াও এই জন্য দোষের। একজন নিরক্ষর চাষাকে নির্জ্জনে কিছু দিন রাখলে তার ক্ষুদ্র মন শীঘ্রই সাম্য হয়ে আসবে কিন্তু একজন শিক্ষিত লোকের তা হবে না, তার মনে নানা বাজে কথাই জাগবে।

*

মন ভাবে। তাকে যদি বাজে জিনিষ দাও, তাহলে সে চঞ্চল হয়ে বেড়াবে, তার তৃপ্ত হবে না। কিন্তু জিনিষের মত জিনিষ একবার দিলে সে আর তা ছেড়ে উঠতে চাইবে না।

*

নিম্নাধিকারীর কাছেই ভগবান্ বিরাট্; ক্রমে তিনি ছোট হয়ে আসেন।

*

গুরু কাউকে বেশী, কাউকে কম কৃপা করতে পারেন না, তাহলে তিনি সদ্গুরু নন। তাঁর কৃপা অহেতুক বলেই সকলের প্রতি সমান। জলের মত তিনি কৃপা ঢেলে দেন, যেখানে যতটুকু গর্ত্ত আছে, সেখানে ততটুকু জল দাঁড়ায়। যে যেমন অধিকারী, সে তেমনি গুরুকৃপা পায়। সাধন-ভজন দ্বারা মন তৈরী হতে পারে, কিন্তু গুরুকৃপা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

*

জগতের সমস্ত জীবই ভগবান্। তাদের জন্য প্রাণ ঢেলে দিতে পারলে তাদের সেবায় বড় হতে পারলে ভগবান্ নিজেই তোমার কাজ করবেন, তোমায় কিছুই করতে হবে না।

*

কালী নেংটা কেন? তাঁকে কাপড় পরাতে হলে তাঁর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু দিয়ে তাঁকে আচ্ছাদন করতে হবে। তাও তিনি; সুতরাং কালী নেংটা। তিনি কাল কেন? প্রলয়ে সমস্ত তাঁতে লয় হয়, তাই তিনি কাল; কালতে সমস্ত রং লয় হয়। কালীতারা ইত্যাদি তত্ত্বময়ী অর্থাৎ জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি; আর রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি ভাবময়ী অর্থাৎ মনোময়ী মূর্ত্তি।

*

আধ্যাত্মিক উন্নত হচ্ছে কি না, তা কি করে বোঝা যাবে? ভক্তের যতই ভক্তি হতে থাকবে, ততই সে নিজকে ভক্তিহীন, দীনাতিদীন মনে করবে। জ্ঞান হচ্ছে কি না, তা নিজে বিচার করে দেখতে হয়। আগে আমি জগৎটাকে কি ভাবে দেখতাম, এখনই বা কি ভাবে দেখছি, এই সব তুলনা করে বুঝতে হয়।

*

গুরু মহাজন, শিষ্য নিঃসম্বল খাতক। সুতরাং গুরুই দাতা, শিষ্য কিছুই দিতে পারে না। তবে শিষ্য উপযুক্ত হলে গুরুকে মূলধন ফিরিয়ে দিতে হয়।

*

অদ্বৈতজ্ঞানে পরিণতি না হলে মুক্তি হয় না। এ জগতের অণুপরমাণুও ব্রহ্ম। সুতরাং জগতের একটী পরমাণুও বাদ পড়লে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না।

*

ভগবানের একটা বিশেষ মূর্ত্তি দেখ্‌লেই কি হবে, বা শুধু জ্যোতিঃ দেখ্‌লেও বা কি হবে? জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত না হলে ও সমস্ত দেখায় কিছু লাভ নাই।

*

তত্ত্ব জেনে কাজ করলে অতি সহজেই ফল লাভ করা যায়; শুধু জড়ের মত কাজ করে গেলে তেমন ফল পাওয়া যায় না। সাধারণ-ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়, ভগবান্‌, তোমার কৃপা হলেও হতে পারে, সে তোমার ইচ্ছা। আর জ্ঞানমিশ্রা প্রার্থনায় জোর থাকে—কেন তাঁর কৃপা হবে না, নিশ্চয়ই হবে!

*

জলের নীচে কলসী ডুবিয়ে রাখ্‌লে যেমন হয়, আমরাও তেমনি ভগবানের মাঝে ডুবে আছি। কিন্তু পাত্রের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজকে জড়িয়ে বদ্ধ হয়ে আছি। বাস্তবিক আমাদের উপাদান তো ভগবান্‌ হতে ভিন্ন নয়। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান, আমাদের নিরানন্দ কেন আস্‌বে? আমরা যে আনন্দের উৎস!

*

হর-গৌরী জ্ঞানময়, রাধাকৃষ্ণ ভাবময়। হর রাধা, গৌরী কৃষ্ণ। হরা সম্বোধনে হরে। শিব নির্গুণ, শক্তি কর্ম্মময়ী; রাধা নির্গুণ, কৃষ্ণ কর্ম্মময়। তাই শিবের নিকট গৌরী যোড়হস্ত, আবার রাধার নিকট কৃষ্ণ যোড়হস্ত। রাধা শুধু প্রেমময়ী, শক্তিময়ী নন। বৈষ্ণবী মায়া—লক্ষ্মী ও সরস্বতী, যথাক্রমে বিক্ষেপশক্তি ও আবরণ শক্তি। ব্রহ্মা লোক সৃষ্টির কর্ত্তা; শিব মঙ্গলস্বরূপ লয়কর্ত্তা। মরণেই মঙ্গল। মরণের কোলেই মা আছেন।

*

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বা বৌদ্ধ, আর মহাকারণ যেমন জগতের, তেমনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আর তুরীয় জীবের নিত্যানুভূত। স্থূল শরীরের সঙ্গেও এই প্লান মিলে। মানুষের দেহের কটিদেশ পর্য্যন্ত স্থূলজগতের প্রতীক, ওর মাঝে বিশেষ কোনও যন্ত্রাদি নাই, শুধু আহার, নিদ্রা, মৈথুনরূপ জীবভাবের কেন্দ্র; কটি হতে গলদেশ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মাবস্থার সঙ্গে মেলে; মস্তক কারণ; তার উর্দ্ধে মহা-কারণ।

*

নাট্যাভিনয় জ্ঞান নিয়ে করা হয়; আর সাংসারাভিনয় অজ্ঞানভাবেই করে, তাই না এত জমে। মতিরায় অভিনয়ের কর্ত্তা, রচয়িতা দুই-ই; ভগবানও তাই। মতিরায় আবার কখনও নিজে সাজ নিয়ে আসরে নামে; এই হল অবতার। রাম সীতার জন্য কেঁদে, আর শ্রীকৃষ্ণ আসরে নেমে কত কীর্ত্তি করে খুব অভিনয় জমিয়েছিলেন। অভিনয় করছি জ্ঞান রেখে আসর মাতানোই মজা।

*

স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহের মাতৃগর্ভস্বরূপ। যেমন মাতৃগর্ভে জীবের পুষ্টি সম্পূর্ণ হলে দেহ গর্ভ হতে বের হয়, তেমনি সূক্ষ্মদেহীও উপযুক্ত সময় হলে দেহরূপ গর্ভ হতে বের হয়ে পড়ে।

জীবের জন্ম হলে যেমন মায়ের নাভীনাড়ীর সঙ্গে একটা সংযোগ থাকে আর সেটা কেটে দিতে হয়, সূক্ষ্মদেহীও তেমনি শরীর হতে বেরুলে ঘুড়ীর সূতার মত একটা সংযোগ থাকে, ওটা না ছেঁড়া পর্য্যন্ত আবার দেহে ফিরতে পারে। সূক্ষ্মদেহও আবার কারণ দেহের গর্ভস্বরূপ। এমনি করে ক্রমে ওপরের দিকে উঠে গেছে। দেহের মাঝেও এমনি বিভাগ আছে—আপাদমস্তক সবটাই স্থূল; আবার মূলাধার হতে মস্তক পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম; আবার মস্তক হল কারণ।

*

মা আছেন, আর তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায়, এই দুটী কথা বিশ্বাস করতে পারলেই হয়। তিনি অনন্ত শক্তিস্বরূপিণী—নিরাকার হলেও ভক্তের মনোময়ী মূর্ত্তিতে আসেন। সবাইকে তিনি সমান কৃপা করেন, তবে আধারভেদে সেই কৃপা বিভিন্ন লক্ষিত হয়। যেমন শুক্‌না কাঠে আগুন দিবা মাত্র জ্বলে ওঠে, তেমনি সত্ত্বশুদ্ধ ভক্তের ভিতরে মা সহজেই জাগ্রৎ হন। ভিজাকাঠে আগুণ দিলে ক্রমে তার রস মরে গেলে তবে আগুণ ধরে। বিশ্বাস করতে পারলে একদিন অবশ্য মায়ের কৃপা উপলব্ধ হবে। মায়ের কৃপা হলেই মাকে পাওয়া যায়। নইলে সাধন-ভজনরূপ ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা কি অনন্তশক্তিকে বশ করা যায়? জোনাকী কখনও সূর্য্যকে প্রকাশ করতে পারে?

*

প্রাণে ভাব জাগলে ভাবের বস্তু যে ভাবেই আসুক্ না কেন, শুধুই আনন্দ দিয়ে যায়। (ক্রমশঃ)



গুরু কেন?

এ প্রশ্ন আমাদের দেশে সাধারণ লোকে করে না, কেননা তাহাদের আজন্মপোষিত সংস্কার রহিয়াছে, গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইতেই হইবে, নতুবা হাতের জল শুদ্ধ হইবে না। এই সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া একটা গুরুগিরির ব্যবসায় পর্য্যন্ত সমাজে চলিত রহিয়াছে। সেটা যে সর্ব্বাংশে খাঁটী ও সপ্রয়োজন, সে কথা বলা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক সমাজসংস্কারের মত না বুঝিয়া না শুনিয়া ইহার উপর খড়্গহস্ত হওয়াও সাজে না। বনিয়াদী বংশের মানুষ গরীব হইয়া পড়িলে আর সকলে তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিতে পারে, কিন্তু সে বংশের রক্ত-ধারা যাহার ধমনীতে বহিতেছে, সে পারে না।

গুরু কেন—এ প্রশ্ন যাঁহারা গুরুকে আকুল হইয়া খুঁজিয়াছেন, খুঁজিয়া পাইয়াছেন এবং পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও করেন না। গুণ্‌তি হিসাবে বা মানমর্য্যাদা হিসাবে, এমন লোকও এদেশে নিতান্ত কম নয়।

তবে এ প্রশ্ন কারা করেন ?—যাঁরা মিথ্যা সংস্কার নিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতেও রাজী নন, আবার সত্যের তীব্র আলোককে নিজের চোখে যাচাই করিয়া লইবার শক্তি বা সাহসও যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই মাঝখান হইতে এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। এ তর্ক শুনিয়া সংস্কারান্ধ ক্ষেপিয়া উঠে, জ্ঞানী শুধু হাসেন। বুদ্ধির পরিণতি না হইলে শুধু তর্ক করিয়া সব তত্ত্ব বোঝা যায় না। তবুও সংশয়ীর সংশয় নিরসনের জন্য কখনও তর্ক করিতে হয়, ইহা সভ্য সমাজের রীতি।

কবি মনের আনন্দে গাহিয়াছিলেন, "শুধাবো না পথ কোনও পথিকে!" কথা, টার অর্থ সুস্পষ্ট—অর্থাৎ সেই একই প্রশ্ন "গুরু কেন ?", কিন্তু আমরা অরসিক, বুঝিতে পারি না ভজনগানের মাঝে হঠাৎ এই খোঁচাটা কার প্রতি এবং কিসেরই বা প্রয়োজন! দুধের হাঁড়িতে এই গোমূত্রবিন্দু প্রক্ষেপ কেন ? বাস্তবিক যে পথিক, যার চলার এখনও বিরাম হয় নাই, চলার শেষে কি আছে, তাহাও যে জানে না, তাহাকে তো কেহ গুরু বলে না, বা তাহার কাছে পথ জিজ্ঞাসা না করিলেও তো কিছু আসে যায় না। তবে যদি বল, আমরা কেবল চলি, কেবলি চলি— তাই আনন্দ, চলার শেষ কি কোথাও আছে ? আর কোনও মানুষ কি চলার শেষ করিতে পারে ? এমন কথা শুনিলে বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হয়। মানুষের প্রগতি সম্বন্ধে এত হীন ধারণা এ দেশের লোক করে না। তাহারা মানুষকে ভগবান্ আর ভগবানকে মানুষ করিতে ভয় পায় না। "সেই তিনি এই হইয়াছেন"—এই পরমানন্দময় বার্ত্তনের কথাই তাহাদের বেদগুহ্য উপনিষদ্—শুধু বৈজ্ঞানিকের জড় বিবর্ত্তন শুনিয়া বা চর্চ্চের ঈশ্বর কাদার তাল ছানিয়া জগৎ গড়িয়াছেন জানিয়া তাহারা খুসী হইতে পারে না। নর-নারায়ণকে যাহারা এক সমাসে আবদ্ধ করিতে পারে, তাহারা বলিতেও পারে নরের চলার সীমা আছে, নারায়ণে তার সমাপ্তি; এ কথা নরের সীমার দিক দিয়া। কিন্তু নারায়ণের চলার সীমা নাই, অগণিত নরের বিগ্রহে আনন্দে চলিয়া চলিয়া চলিয়াছেন, এই অসীমের ছোঁয়াচে নরও বুঝি অসীম হইয়া উঠে, বুঝি বা সীমাহীন নারায়ণকে বুকের সীমায় বন্দী করিয়াই রাখে! এই তো ভেদাভেদ তত্ত্ব যাকে বৈষ্ণব বলেন অচিন্ত্য, কিন্তু অনাস্বাদ্য বলেন না। যে নর-নারায়ণের এই রহস্য জানিয়াছে, সে জানে পথিককে পথ শুধাইবার কোনও প্রয়োজন নাই—তবে মানুষকে শুধানোর প্রয়োজন আছে। না শুধাইলেও এমন মানুষ আছে, যাহারা যাচিয়া পথ বলিয়া দেয়। 'গরজ বড় বালাই'!

গুরু কেন ?—এই প্রশ্নের একটা কবিত্বময় ভঙ্গী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, দেখ শচীশ, আমার বোধহয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার যার উপর ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

"শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ কর, বিশ্রী, চুপ কর—সহজকে কিসের দরকার। ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

"আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই ত পথ দেখাইবার—

"শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো এ

তোমার ভূগোল বিবরণের সত্তা নয়—আমার অন্তর্য্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন। গুরুর পথ গুরুর অঙ্গিনাতেই যাওয়ার পথ।

"শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কি। আর সব জিনিষ পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্ম যদি নিজের না হয়, তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান্ অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নইলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

"তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই; আমি বলিলাম, যে কবি, সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয়, সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

"শচীশ অম্লানমুখে বলিল, আমি কবি।"

শ্রীবিলাস শচীশের সঙ্গে তর্ক করিয়াছিল, বন্ধু বিপন্ন ভাবিয়া অযাচিতভাবে তাহাকে হিতোপদেশ দিতে গিয়াছিল; তাহার দরুণ সে যতখানি না নাকাল হইয়াছে, গুরু যে শচীশের মুখে মার খাইয়া তার চেয়ে বেশী নাকাল হইলেন, এইটুকু কল্পনা করিয়াই অনেকে খুসী। বৃদ্ধ ভারতবর্ষের এই এক আফিঙের মৌতাত—গুরুবাদ; 'কবিত্বের চাবুকে যদি এ নেশা ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে বেচারা রক্ষা পায়!

শচীশকে আমি দোষ দিই না। সে তাহার প্রাণের অনুভূতিকে ব্যক্ত করিয়াছে বই তো নয়। কিন্তু ভাবি, শ্রীবিলাস কি বোকা, স্বচ্ছন্দে আপন মতটা পরের ঘাড়ে চাপাইতে গেল। একটু আক্কেল থাকিলে বুঝিতে পারিত, শচীশের যখন গুরুর দরকার হইবে, তখন আপনি সে খুঁজিয়া নিবে, মাঝখান হইতে আমি কেন ফোড়ন দিতে যাই। শেষ পর্য্যন্ত শচীশের কি হইল, খুঁজিয়া পাইলাম না। তার শেষ কথা এই—"যাঁকে আমি খুঁজিতেছি, তাঁকে আমার বড় দরকার, আর কিছুতে আমার দরকার নাই।"

ঠিক এই কথাতেই গুরুর বাজী মাৎ হইয়া গিয়াছে। কবি হুঁসিয়ার, তাই খোঁচা দিয়াই থামিয়া গিয়াছেন, বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই। শচীশ এখনও সন্ধানী, আসল বস্তু এখনও পায় নাই—সে যদি গুরুকে প্রত্যাখ্যান করে, তাতে গুরুতত্ত্ব অপ্রমাণ হইয়া যায় না। কবির কল্পনাও সত্যের সন্ধান করিতেছে মাত্র, তাই পাত্রের মুখ দিয়া শুধু মনের সংশয়টা ব্যক্ত করিয়াই সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ দেশে এমন নির্ব্বোধও আছে, যাহারা এই কল্পনার সংশয়কেও বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া নিতে দ্বিধা করিবে না। তাহাদেরই বলি, সত্যের পথে শচীশের মত "ডোন্ট কেয়ার" করিয়া চল, তাহাতে আপত্তি নাই, বরং এই অতিমাত্র পরমুখাপেক্ষীর দেশে একটু আধটু স্বাধীন-চিত্ততাকে প্রশংসার চোখেই দেখি; কিন্তু শেষ ফলটা কি হয়, দয়া করিয়া সেইটাও বলিয়া যাইও।

কবি শচীশের মুখ দিয়া যত কথা বলাইয়াছেন, তাহার সকলের জবাব এক কথায় হইয়া যাইত, শচীশ যদি মানুষ চিনিত, মানুষের মান বুঝিত। "এই মানুষে সে মানুষ আছে"—এ কথা বিশ্বাস করা কি সোজা! আর বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়াই তো প্রাণের ঠাকুরটী কাছে থাকিয়াও এত দূরে!

একটা কথা এ যুগের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে—সে দাক্ষিণেশ্বরের কথা। মানুষ আসিয়া সেখানে মানুষকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?" উত্তর হইয়াছিল, "হাঁ, দেখিয়াছি—যেমন তোমাকে দেখিতেছি, তার চেয়েও স্পষ্ট দেখিয়াছি।" "আমাকে দেখাইতে পার?" "হুঁ, পারি!" তার পর একবার অন্তিম মুহূর্ত্তে সেই মানুষই আবার মানুষকে বলিয়াছিল, "দেখিতে চাও তো দেখ—আমারই মাঝে!" এই চরম স্পর্দ্ধাযুক্ত পরম আনন্দের বারতা—"হাঁ, আমার মাঝেই তোমাকে আমি তাঁহাকে দেখাইব"—যিনি বলিতে পারেন, তিনি গুরু। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছিলেন, যুগে যুগে সকল গুরুই শিষ্যকে এই কথা বলিয়া আসিয়াছেন, এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরে তিনি এই কথা বলিয়াছেন, আরও বলিতেছেন এবং বলিবেন।

তার পর শচীশের এক একটী কথাই ধরি। পরের উপর ভর দিয়া সাধনাকে সহজ করাতে তার আপত্তি আছে, কেননা সেটা ফাঁকি, সত্য কঠিন। তাহার কথাতেই বলি, নির্ভর করার সত্যটা যে কত কঠিন, তাহা শচীশ জানে না; অন্ততঃ তাহার পক্ষে যে কঠিন তা তো স্পষ্টই দেখিতেছি। দক্ষিণেশ্বরেই ইহার একবার পরখ হইয়াছিল। শিষ্য বলিল, "আমি দুবার নাম নিতেও রাজী নই।" গুরু বলিলেন, "দরকার কি, তুই আমায় বকলম্ দে, তোর সব ভার আমার।" শিষ্য বলিল, "আচ্ছা, তোমায় সব ভারই দিলাম।" এর পর সেই শিষ্যের মুখেই শুনি, "মেয়েটা মরিয়া গেল, কিন্তু কাঁদিতে পারি না; কেবলই মনে হয়, কাঁদিবার ভারও তো আমার নয়, তাও যে আর একজনকে দিয়া দিয়াছি; অথচ মায়ার খেলা, বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে চায়, কিন্তু পারি না!" একেই বলে পরের উপর ভর দেওয়া। খুব সোজা, নয় কি? তাই তো শ্রীকৃষ্ণ আঠারো অধ্যায় গীতা পড়াইয়া অর্জ্জুনকে শেষকালে বলিয়াছিলেন, "আমার উপর সব ছাড়িয়া দাও—তবেই মুক্তি।" আর এইটী হইল গুহ্য হইতে গুহ্যতম কথা—অভক্ত অতপস্বীকে এই সঙ্কেত শুনাইও না, তাহারা বুঝিতে পারিবে না।"

তার পর অন্তর্যামীর পথ আর গুরুর পথে শচীশ তাল গোল পাকাইয়া গুরুর উপর অভিমান করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু গুরুর পথ আর অন্তর্যামীর পথ যে এক, তাহার খেয়াল নাই। যে এখনও নিজের আঙিনাটুকু ডিঙ্গাইতে পারে নাই, তাহাকে তো কেহ গুরু বলে না। উপনিষদ্ যে "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" বলিয়া আঙিনাসেবীদের নিন্দা করিয়াছেন, শচীশের কি তাহাও জানা ছিল না? বেশী কথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই—গুরু কেমন করিয়া পথ দেখান, তাহা হিন্দুরা যাঁহাকে জগদ্গুরু বলিয়া থাকেন, সেই শঙ্করাচার্য্যের একটী মাত্র শ্লোক উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি। দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুর স্তব করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

—"আশ্চর্য্য ব্যাপার! বট গাছের নীচে গুরু বসিয়া আছেন। শিষ্যেরা বৃদ্ধ—আর গুরু হইলেন যুবা। গুরু চুপ করিয়া আছেন—

উহাই তাঁহার উপদেশ ; কিন্তু শিষ্যদের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে !"

গুরুর মৌন কি করিয়া শিষ্যের সংশয় ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাহাকেও তো বুঝান যায় না। দক্ষিণেশ্বরের গুরু নরেন্দ্রদের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ বিতরণ করিতেন, আর তাঁহার দ্বাদশ গোপালকে লইয়া কেবল ছেলেমানুষী করিতেন—আঙিনার কথাটা তখন নেহাৎ ঢাকা পড়িয়া থাকিত। অথচ শেষকালে পথ না দেখাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহারাই দেখি আঙিনা পার হইয়া গেল। এটা কি অন্তর্যামীর পথ নয় ?

শচীশ মুষ্টি ভিক্ষার কথা তুলিয়াছিল। এ-ও সেই একই ধরণের ছেঁদো কথা। গুরু মুষ্টি ভিক্ষা দেন না, পুরুষসূক্তের পুরুষের মত আপনাকে দান করেন—আর শিষ্যকে নিঃশব্দে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। নরেন্দ্রনাথ একবার পওহারী বাবার ধর্ম্ম নিতে গিয়াছিলেন। পওহারী বাবা কিছু মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহাকে স্বীকার করিলে নরেন্দ্রনাথের স্থূলতঃ কিছু অধর্ম্ম হইত না ; কিন্তু নিষ্ঠার ক্ষতি হইত, একটু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুর্ব্বলতায় তাঁহাকে বিকল করিয়া দিত। গুরু তাঁহাকে সে সময় বাঁচাইলেন, বলিলেন, "তোমার পথে তুমি চল, পরধর্ম্ম আশ্রয় করিতেছ কেন ?" বোধ হয় শচীশের মতে এই উপদেশ শোনাও পরধর্ম্মাশ্রয়ের সামিল, অতএব ভয়াবহ ! যাহারা সদ্‌গুরু পাইয়াছে, তাহারা জানে, গুরুর মাঝে জুলুমবাজীর এক রতি মাত্র নাই—তিনি সহজ মানুষ, সহজ তাঁর আকর্ষণ। তিনি স্পষ্টই বলেন, "জানি সব, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলি না, বলিলে সাধুত্ব থাকে না।" ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে সেই শঙ্করাচার্য্যের এক কথা— "বয়ং ন বিবদামহে আমরা কারু সহিত বিবাদ না।" এই তো গুরুর কথা। শিষ্যের সঙ্গেই না তাঁর বিবাদ কোথায় যে সে বেচারা স্বধর্ম্মনাশের ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল !

অন্যের কাছ থেকে কবিত্ব ধার করিয়া কবি হওয়া যায় না। কোনও গুরুই গুরুত্ব ধার দেন না। তবে তাঁরা লঘুকে গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন—সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা রাখেন না। কবি কখনও কবির অসম্মান করেন না। সুতরাং একজন কবি হইলেই যে আর সকল কবির সঙ্গ পরিহার করিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। শচীশ কবি এই বোধটুকু তাহার পৌরুষের পরিচায় ; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইহার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইলে খুসী হইতাম। কিন্তু কবি আমাদিগকে সে সুযোগ দেন নাই ; ভালই করিয়াছেন। নতুবা অসত্যকে হয়ত আরও পল্লবিত করিয়া তোলা হইত।

শেষকালে একটা কথা বলিতে চাই। যাঁহারা আপন খুসীতে চলিয়া ভগবান্ পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই বস্তুটী পাইয়া কি করেন, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করে ; অর্থাৎ যে আনন্দ তাঁহারা পাইলেন, তাহা পরকে দিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় কিনা ; কিম্বা তেমন সুস্পষ্ট কোনও ইচ্ছা মনের মাঝে না থাকিলেও সেই আনন্দ তাঁহাদের দেহ মনের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাইরে ছড়াইয়া পড়ে কি না ! পড়ে নিশ্চয়ই। প্রমাণ কবির নিজের কথা— "পথের পথিক সেও দেখে যাবে, তোমার বারতা মোর মুখ ভাবে।" হয়ত ডাক

ছাড়িয়া বলিতেও ইচ্ছা করে, "ওরে তোরা দেখে যা, আমি কি অপরূপ বস্তু পেয়েছি!" হয়ত সেই ডাক শুনিয়া কেহ আসিয়া জোটে, সেবা করে, লুটাইয়া পড়ে।—

যদি তাই হয়, তাহা হইলে কবি যাহার ভয় করিতেছিলেন, ঠিক সেইটাই তাঁর ভাগ্যে ফলিয়া যায়; অর্থাৎ নিজে গুরু না মানিয়াও তিনি পরের গুরু হইয়া বসেন। এতে প্রমাণ হয়, গুরুগিরিও মানুষের স্বভাব, চেলাগিরিও স্বভাব। সুতরাং হাজার আধ্যাত্মিক সংস্কার কর না কেন, ও দু'টা থাকিয়াই যাইবে। উপনিষদেও দেখিয়াছি আছে; অথচ সেখানে অদ্বৈতবাদের ভরা আসর। কবির শচীশ যদি শেষকালে শ্রীবিলাসের গুরু না বনিয়া যাইত, তাহা হইলে কি বলিয়াছি; তখনই গুরু কেন—এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইত।



বীজমন্ত্র ও ভগবদ্ভাব

বীজ অগ্রে, কি বৃক্ষ অগ্রে—এই প্রশ্নের সমাধান তোমার আমার কাছে না হইলেও যোগিগণ ইহার শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছেন। যাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে, তাঁহারা বীজ ও বৃক্ষকে স্বতন্ত্রভাবে দেখেন না। কারণ বীজ ও বৃক্ষ স্বরূপতঃ এক—স্থূলদৃষ্টিতে প্রভেদ প্রতীতি মাত্র। যাহা কখনও ছিল না, তাহা কখনও আসিতে পারে না। যদি একটী ক্ষুদ্র বট বীজের ভিতর বিশাল বট বৃক্ষ তাহার প্রকাণ্ড কাণ্ড প্রভৃতি লইয়া সুপ্ত না থাকিত, তবে স্থূলে উহা কখনও প্রকাশিত হইতে পারিত না। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের প্রকাশ; সূক্ষ্ম অব্যক্ত—স্থূল ব্যক্ত। যদি কোন যোগী স্বীয় যোগবলে ঐ বৃক্ষকে সঙ্কোচ করেন, তবে ঐ বিশাল বটবৃক্ষ পুনরায় বীজাকার ধারণ করিবে। তুমি আমি এ রহস্য ভেদ করিতে পারিব না; কারণ আমরা স্থূলেই নিত্য বাস করিতেছি। তোমার হাতে যে ছাতাটা আছে, যখন ইচ্ছা গুটাও, উহা ভ্রমণের ছড়ির কার্য্য করিবে; আবার সম্প্রসারণ কর, উহা রৌদ্রতাপ নিবারণ করিবে। এই বীজ ও বৃক্ষের ভেদবুদ্ধি যখন অপগত হইয়া উভয়কে একই বলিয়া দৃঢ় ধারণা জন্মিবে, তখনই মাত্র বীজ মন্ত্র ও তৎপ্রতিপাদ্য দেবতাকে অভিন্ন ভাবিতে পারিবে এবং তখনই মাত্র মন্ত্রজপে দেবতার প্রকৃত আরাধনা হইবে। বলিতে পার, বীজ জড় বস্তু, ইহার সহিত দেবতার তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু এ জগতে সজীব বস্তু একেবারে জড় নহে। যদি একেবারে জড় হইত তবে সে বীজ কখনও অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারিত না। যেখানেই প্রাণের স্পন্দন আছে, সেখানেই চৈতন্য ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কার্য্য করিতেছে।

কিন্তু বীজ একেবারে জড় না হউক—মন্ত্র ত শব্দমাত্র; শব্দ জড়। দেবতার সহিত শব্দের সম্বন্ধ কি? শব্দ ভাবের প্রতীক মাত্র।

আর দেবতা তদ্‌ভাবাত্মক ঘনীভূত ভাবের প্রকাশ মাত্র। তবে তাহার প্রকাশক শব্দ ও শব্দ তাহার আনুষঙ্গিক ভাব ব্যতীত থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাবের ভেদ অচিন্তনীয়। এই ভাব জগতের যাবতীয় জীবের ভিতরই অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। গাভী হাম্বারব করিলে বৎস তাহার সমীপস্থ হয়। কপোত কপোতীকে ভালবাসা দেখাইবার সময় তাহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশক শব্দ করে। শব্দই ভাবের প্রতীক বলিয়া বারদীর ব্রহ্মচারী বাঘিনীর সহিত ভাববিনিময় করিয়া সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাহার শাবকগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। ভাব বাহিরে আসিলেই শব্দরূপে প্রকাশ পায়। একটু প্রণিধান করিলে জগৎটাই যে কাহারও ভাবের উৎস বা ভাবের স্থূল প্রকাশ, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মন্ত্র ভাবসংহতি-মাত্র হইলেও তাহা তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের মুখ হইতে নিঃসৃত না হইলে সাধকের নিকট সম্পূর্ণ নির্জীব। এই নির্জীব মন্ত্র তুমি যত ভাবে যত বৎসরই জপ কর না কেন, উহা কখনই সজীবতা প্রাপ্ত হইবে না। বটবীজ কাকের উদর হইতে প্রস্তরে পড়িলেও অঙ্কুর উদ্গত হয়—তৎপূর্ব্বে হয় না।

দেবতারা সমস্তই ভাবের প্রতীক, তজ্জন্য প্রতি দেবতার বীজ পৃথক্। অবশ্য দেবতারা বিভিন্ন ভাবের প্রতীক হইলেও যে কোন দেবতাকে শ্রীভগবানের সহিত অভেদ ভাবে উপাসনা করিলেই ভগবানের উপাসনা হয়। একমাত্র প্রণবই ভগবানের বাচক। ভগবত্তাবের বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে বীজ বিভিন্ন। এই সমস্ত বীজ কেহ সৃষ্টি করে নাই। যদি কেহ বলেন, এই সমস্ত বীজ কোন ঋষি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে সমস্ত তত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায়—কারণ শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "মন্ত্রোঽহং।" সুতরাং মন্ত্রের কেহ স্রষ্টা নাই। ঋষিগণ যখন ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তখন সেই সমস্ত ভাবের প্রতীক মন্ত্র তদবস্থায় দৃষ্ট হইয়াছিল; ঋষিরা দ্রষ্টা মাত্র। তাঁহারা এই সমস্ত মন্ত্র উদ্‌যাপন করতঃ তাহাদিগের সজীবতা আনয়ন করিয়া জগতে এক এক সময় লুপ্তপ্রায় ভাবধারা প্রবহমান রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে বীজমন্ত্র অনাদি ও নিত্য এবং ভাবভেদে বীজ অনন্ত। কিন্তু যে বীজই তুমি জপ কর না কেন, দৃঢ়তার জন্য পুনরায় বলিতে হইতেছে যে তাহা গুরুবক্ত্রলব্ধ হওয়া চাই। "গুরুবক্ত্রলব্ধ" শুনিয়া অনেকে আবার ভগবান ও জীবের ভিতর ঘটক নিয়োগের কথা ভাবিয়া নাসিকাকুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক মুসলমান ধর্ম্ম—যাহা পৌরোহিত্যকে আদৌ স্থান দেয় নাই—সেই ধর্ম্ম আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই যে তাঁহারাও গুরুপদ্ধতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা আল্লার সহিত সাক্ষাৎ যোগ রাখিতে চান, তাঁহাদিগকে মহম্মদ হাদিসে যে যৌগিকপন্থার সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করিতে গেলে "মুর্শিদ" স্বীকার করিতে হইবে। সে মুর্শিদ ও মুরীদের সম্বন্ধ হিন্দুর গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধ মাত্র। মুরীদ মুর্শিদের হাত ধরিয়া কোরাণ পাঠান্তে তাঁহাকে মুর্শিদ বলিয়া স্বীকার করিলে মুর্শিদ "মোরাকাবা" অর্থাৎ ধ্যানে বসিয়া মুরীদের হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা ও মালিন্য অধিকারী হিসাবে যোগবলে ধুইয়া দিয়া মুদ্রিতচক্ষু মুরীদের

হৃদয় হইতে স্বতঃ উখিত "আল্লা" রূপ মহা পবিত্র শব্দ শুনাইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদানান্তে ছাড়িয়া দেন। ইহাই ঐ সম্বন্ধের শেষ নহে, আরম্ভ মাত্র। মুরীদ যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করুক না কেন, মুর্শিদ মাঝে মাঝে "কাশফ্" করিয়া অর্থাৎ যোগবলে দেখিবেন যে মুরীদ কি করিতেছে; প্রয়োজনবোধে দূরে থাকিয়া শক্তিসঞ্চার করিবেন।

সদ্গুরু বীজমন্ত্র শিষ্যে নিষেকন করিলে বুঝিতে হইবে যে পুঁথিগত জড় বীজ শিষ্যের পক্ষে সজীবতা লাভ করিয়াছে। গুরু মন্ত্রদান করিয়া কি উপায়ে সেই সজীব বীজে অচিরে অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহার কৌশল শিখাইয়া দেন ও সাধনায় শক্তিসঞ্চার করেন। কিন্তু যে উপায়ে বীজ অচিরে মহামহীরুহ হইয়া বহু বহু জীবকে নিদাঘতাপ হইতে সুশীতল ছায়া দানে সঞ্জীবিত ও তৃপ্ত করিতে পারে, সে উপায়টা কি? আচার্য্য বলিয়াছেন, "মন্ত্র জপকালে মন, পরমশিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক পৃথক স্থানে থাকিলে অর্থাৎ ইহাদের একত্র সংযোগ না হইলে শতকল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।". এক্ষণে এই কথার তাৎপর্য্য কি? শিব বলিলে সাম্প্রদায়িকতা আইসে; কিন্তু পরমশিব বলিলে আমরা চিন্মাত্র বুঝি। সেই চিন্মাত্রকে তুমি হরি বল, রাম বল, শিব বল ক্ষতি নাই। গুরূপদিষ্ট কোন মুদ্রাযোগে শ্বাসের তালে তালে অর্থাৎ প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জপ করিতে হইবে। প্রশ্বাসের সঙ্গে জপে কোন ফল হয় না, কারণ বায়ু বাহিরে চলিয়া যায় এবং বায়ুর সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সুতরাং মন বহির্মুখীন হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে শ্বাসের তালে তালে মন্ত্রজপের ভিতর প্রাণায়াম ব্যাপারটা খুব প্রচ্ছন্নভাবে সুসংরক্ষিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ এইরূপ তালে তালে জপে শ্বাসের একটা, পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায় ও ক্রমে শ্বাস ছোট হইয়া ভিতরেই বহমান হওয়ায় প্রাণবায়ুর আয়াম বা বিস্তার লাভ হয়। কিন্তু শক্তিকে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীকে মূলাধারে রাখিয়া বায়ুকে ও পরমশিবকে একত্র করিয়া জপ করিলে সে জপ নিস্ফল হয়। শ্বাসের তালে তালে যেমন জপ করিবে, তেমনি গুরূপদিষ্ট মুদ্রাবিশেষযোগে কুণ্ডলিনীশক্তিকেও শিবসমন্বিত করিয়া জপ করিতে হইবে। পরমশিব, শক্তি ও বায়ু—এই তিনকে একত্র করিয়া জপ করিলেও কিছু হইবে না, যদি মন অন্যত্র বিরাজ করে। তজ্জন্যই আচার্য্য সর্ব্বাগ্রেই "মন" উল্লেখ করিয়াছেন। মন শিব, শক্তি, বায়ুকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে।

সভক্তি মন্ত্রজপ ভাবের সাধনা মাত্র এবং ভগবদ্ভাব মাত্রই অপ্রাকৃত। যেখানেই ভাবে ভগবানকে অঞ্জলি দেওয়া যায়, সেইখানেই তাঁহার অঙ্গদ্যুতি সাধকের হৃদয়ের মালিন্য নাশ করে। ভক্তিযোগে মন্ত্রজাপক হও, বাহ্যজগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাক, সাধন সময়ে সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য সমবায়ে তোমার ইষ্টদেব-দেবীকে কল্পনার দ্বারা ফুটাইয়া তুলিয়া মন ব্যাপৃত রাখ। যদি তুমি সগুণের ভাবে বিভোর হইয়া কোন অন্ধ খঞ্জ ক্ষুধাগ্রস্ত সন্তানের ক্রন্দনে মাতার করুণা দেখিয়া থাক, যদি হুতাশনের জ্বালার ভিতর পুত্রের কল্যাণে কোন মাতাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থাক, তবে সেই স্নেহ নিংড়াইয়া জমাট করিয়া তোমার মায়ের মূর্ত্তি গড়িয়া তোল—তবেই না তুমি বাৎসল্যরসে পুষ্ট

হইবে। এইরূপ ভাবে ভাবিত হইয়াই মন্ত্র জপে জগন্ময় মনোময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। কিন্তু দৃঢ়তার অভাবে সাধকের সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে। সাধক যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, সে সাধক গৃহীই হউন বা বনবাসীই হউন—মনের বল, সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অভাবে কেহই অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হন না। সিদ্ধি লাভ লক্ষ্য থাকিলে সাধকমাত্রেরই বুদ্ধদেবের দৃঢ়তার অনুকরণ করিতে হইবে; তবেই না তিনি সাধন ফল বুঝিতে পারিবেন। যেমন নির্জ্জন মনোরম স্থান চাই, তদ্রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া রাখিতে হইবে যে সিদ্ধি লাভ না করিয়া আসনত্যাগ করিব না। বুদ্ধদেব যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

তদ্রূপ প্রত্যেক সাধকের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যে এইরূপ দৃঢ়তা সহকারে সংযতবাক্ হইয়া নিজের ভিতর ভাব জমাট রাখিয়া অনৃতভাষণ একেবারে বর্জ্জন করিয়া মন্ত্রকে সত্য করিয়া তুলিতে চায় ও পুষ্টিকর সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিয়া শরীরকে সাধনতৎপর করিয়া তুলে, সেই সাধকে প্রথমতঃ সাত্ত্বিক-ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে দেখা যায়। সাধন সময় তাহার শরীর মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত হয়, নেত্রে অশ্রুধারা গড়াইয়া যায়। মাঝে মাঝে মন্ত্রধ্বনি—নূপুরধ্বনিতে তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে ভাবিত হওয়ায় এক প্রকার নেশাগ্রস্তের ন্যায় মাঝে মাঝে তাহার নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইষ্টদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়া ভ্রম হয়। তার পর এই জন্মে এক দিন না এক দিনে এই স্থূল জগৎটা একটা প্রহেলিকার মত ধীরে ধীরে তার সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া এক অভিনব ভাবরাজ্যের আবির্ভাব হয় ও "তস্মিন্ দৃষ্টে" সেই সাধকের ভববন্ধন ঘুচিয়া যায়।

কিন্তু মন্ত্র না হইলে কি সিদ্ধিলাভ বা আত্ম সাক্ষাৎকার হয় না? —হয়। তোমার আমার না হইতে পারে। উচ্চতম অধিকারীর মন্ত্রের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ মহম্মদ ইহাঁরা কি কোন মন্ত্রের উপাসক ছিলেন? উচ্চতম অধিকারী ধ্যানস্থ হইয়া যে চিন্তাতরঙ্গগুলি তাহার মনকে ঝালাপালা করে, একে একে তাহাদিগকে দূর করিয়া মনকে শূন্যগত করে। এ পন্থাটী গীতায় উক্ত আছে—

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥"

তার পর এমন দিন উপস্থিত হয়, যে দিন চিত্তে আর কোন চিন্তাতরঙ্গ উপস্থিত হয় এবং যে ক্ষণে চিত্ত নিস্তরঙ্গ হয়, তৎক্ষণাৎ সত্য প্রতিফলিত হয়।



জ্ঞান ও ভক্তি



জ্ঞানের সহিত ভক্তির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, ইহাই বিচার্য্য। বিচার করিতে গিয়া দেবর্ষি নারদ তিনটী পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, কাহারও মতে জ্ঞানই ভক্তির সাধন, কাহারও বা মতে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের আশ্রিত; কিন্তু আমরা বলি, ভক্তি স্বয়ং ফলস্বরূপ, উহাতে অপর কিছুর অপেক্ষা নাই। এই তিনটী পক্ষ দ্বারা কোন্ কোন্ অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই এখন আমাদের বিবেচ্য।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে প্রথম দুইটী পক্ষে ভক্তিকে সাধনরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। ভক্তি জীবপ্রকৃতির স্বয়ংসিদ্ধ স্বভাব, এই মতের সহিত ইহার আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাহা স্বরূপ, গুণের আবরণে তাহাও আবরিত হইয়া বৈরূপ্যের সৃষ্টি হয়, জগদ্ব্যাপারে ইহা একটী মৌলিক তত্ত্ব। অর্থাৎ জ্ঞান বা ভক্তি, যাহাই আমার স্বরূপ হউক না কেন, বর্ত্তমানাবস্থায় আমাতে তাহার সামান্যতঃ অসদ্ভাব দেখিতেছি—ইহা ব্যবহারিক ভাবে সত্য। আবার সিদ্ধজীবনে স্বরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ বর্ত্তমান বৈরূপ্য অপেক্ষাও তীব্রতররূপে প্রস্ফুট এ তত্ত্বও পারমার্থিক-দৃষ্টিতে সত্য। এই দুইটী আপাতবিরোধী তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিতে হইলে হয় দ্বৈতবাদসম্মত পরিণামবাদ অথবা অদ্বৈতবাদসম্মত মায়াবাদ ছাড়া আর কোনও মীমাংসা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—ইহা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সকলেই জানেন, এক দিক দিয়া জীবের জীবত্ব যেমন অকাট্য, অপরদিক দিয়া তাহার শিবত্বও তেমনি অকাট্য। ইহার মীমাংসা এই হইতে পারে যে জীব ক্রমে শিবে পরিণত হয় এবং এই পরিণামই প্রকৃতি। ইহা দ্বৈত সিদ্ধান্ত। আবার এ-ও বলিতে পারি পরিণামের যে ব্যক্তাবস্থাকে তত্ত্ব মনে করিতেছি, উহা ভ্রান্তি মাত্র; ভাব ভিন্ন বস্তুর অন্য সত্তা কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা হইলে সর্ব্ববিধ পরিণামের অতীত তত্ত্বই একমাত্র সত্য এবং অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থায় পরিণাম সেই অদ্বয়তত্ত্বেরই মায়াবিজৃম্ভণ মাত্র। ইহা অদ্বৈত মত। এই দৃষ্টিতে অপরিণামী তত্ত্বকে স্বয়ংসিদ্ধ স্বীকার করা হইতেছে; ইহার বিরোধী যে কোনও পরিণামসম্বন্ধী সংস্কার ভ্রান্তিমাত্র। যিনি এই পথে চলিবেন, তাঁহাকে সিদ্ধভাবের মনন করিতে হইবে, সাধকভাবের নয়—দ্বৈত সাধনা হইতে ইহার এই পার্থক্য।

মৌলিক দুইটী পন্থার এই তারতম্য হইতে জ্ঞান ও ভক্তির ফলরূপতা এবং সাধনাপেক্ষায় কি প্রভেদ, তাহা বুঝিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত বিচারে প্রমাণিত হয় যে ভক্তিকে দেবর্ষি ফলরূপ বলিয়া সাধনাপেক্ষাহীন বলিতেছেন, তাহাও অদ্বৈততত্ত্বেরই একটী ভঙ্গী মাত্র। ইহার কথা আমরা পরে বলিব। যে ভক্তিতে জ্ঞান সাধন অথবা অন্যোন্যাশ্রয়রূপে জড়িত রহিয়াছে, উহা দ্বৈতঘটিত বা প্রাকৃত পরিণামী অবস্থা মাত্র; সিদ্ধস্বরূপের সহিত উহার সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে হয় উহাকে পরিণামের

অধম স্তর অথবা মায়াবিজৃম্ভণ বলা ছাড়া অন্য কোনও রূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না। ভক্তিপন্থীর অনেকে জগদ্‌রহস্যের এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু ধরিতে না পারিয়া মায়াবাদ জ্ঞানীরই একচেটিয়া সম্পত্তি ভাবিয়া মায়ার নামে ক্ষেপিয়া উঠেন। কে জানে উহাও মায়ারই প্রভাব কি না!

তাহা হইলে দেখিতেছি, আমাদের বিচার এই দ্বৈতাবস্থা হইতে; অদ্বৈততত্ত্বে বিচারের অবকাশই নাই। এই দ্বৈতাবস্থায় জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে কি না ইহাই বিবেচ্য। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, পরমতত্ত্বের তিনটী স্ফূর্ত্তি জীবের নিত্যানুভূত—অস্তি, ভাতি, প্রীতি বা সৎ, চিৎ, আনন্দ। কথায় আমরা তিনটীকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করিলাম বটে, কিন্তু অনুভূতিতে উহারা পরস্পর নিবিড় হইয়া জড়াইয়া রহিয়াছে, ইহা যিনিই অন্তর্মুখী হইতে চেষ্টা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ যাহা অনুভবসিদ্ধ, তাহার অবান্তর প্রমাণ সংগ্রহ বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও স্থূল দুইটী সঙ্কেত উল্লেখ করিতেছি। প্রথম কথা, সত্তার বিলোপ আমাদের কল্পনাতীত। বস্তুবিশেষের সত্তাকে বিলুপ্ত ভাবিতে পারি, কিন্তু নির্ব্বিশেষে সমস্ত সত্তার বিলোপ অচিন্ত্য। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শূন্যেরও একটা স্বাত্মিকী সত্তা রহিয়াছে। আস্তর প্রমাণে সর্ব্বশূন্য সুষুপ্তিতেও সত্তা বিলোপ হয় না। এই এক কথা। দ্বিতীয় কথা—জ্ঞান আছে, কিন্তু আনন্দ নাই, অথবা আনন্দ আছে কিন্তু তাহা অজ্ঞাত, এরূপ কল্পনাও কেহ করিতে পারে না। অবশ্য এই তথ্যের পূর্ব্বকোটিতে কেহ সংশয় করিতে পারে, দুঃখের জ্ঞান কি আনন্দময়? কিন্তু তর্কের ঝোঁকে ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না, যে আমরা অনুভূতির স্বরূপ নিয়া আলোচনা করিতেছি, উহার অধিকার (Scope) নিয়া নয়। আনন্দকে বিষয়রূপে দর্শন করিতেছি না—বিষয়ীরূপেই উহারে আলোচনা করিতেছি। বর্ত্তমান বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আনন্দকে বিষয়রূপে প্রত্যক্ষ করা কঠিন, তাহা মানি; কিন্তু এইরূপে জ্ঞানকেও মোহ হইতে বিযুক্ত করিয়া বিষয়রূপে প্রত্যক্ষ করা সহজ নয়। দুইটী কথা একত্র জুড়িলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় স্বরূপ চেনা কঠিন। ইহা আমাদের পূর্ব্ব স্বীকার্য্য। সুতরাং এই অচেনা অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া যে স্বরূপের বিচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

সৎ, চিৎ ও আনন্দে অবিনাভাব হইলে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। জ্ঞান চিৎ, ভক্তি আনন্দ। সুতরাং ভক্তিতে জ্ঞান নাই, জ্ঞানে ভক্তি নাই, ইহা হইতে পারে না। তবে আমাদের এই ভ্রান্তি উপস্থিত হয় কোথা হইতে? জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নাই বলিয়া। জ্ঞানাভিমানী ভক্তিকে দূরে খেদাইয়া দেয়, বলে আমি সেই সুতরাং ভালবাসিব কাহাকে? কিন্তু এ-ও তো একপেশে কথা হইল, পূর্ণ জ্ঞানীর কথা হইল না। এই অহংটাকে উঁচাইয়া তৎ-স্বরূপে পৌঁছাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতেছি, সব জানিলাম; কিন্তু তৎস্বরূপ যে অগণিত অহং-এ আনন্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন, তিনি যে এই অহং-এর মেলাকে ভালবাসেন, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? তুমি যদি তিনি, তবে তুমিও প্রেমিক,

কেননা তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসেন, মায়া তাঁহার বড় ভাল লাগে, তাহাকে তিনি বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভালবাসাও ভক্তির এক বিভাব, পরম পুরুষের আনন্দ। হয়ত আধুনিক ভক্তিবাদী সে কথাটা ভুলিয়া যান, তাই ঔপনিষদ জ্ঞানের সহিত বিরোধের আশঙ্কায় কুটিল ভাব অবলম্বন করেন; ভুলিয়া যান যে ভক্তি ভালবাসা ইত্যাদি দ্বিষ্ঠ সম্বন্ধ; শুধু ভক্তই ভালবাসেন না, ভগবানও ভালবাসেন; আর যে জ্ঞানী ভগবান হইয়া যান, তিনও ভালবাসিতে জানেন। তারপর প্রকৃতির পরম ব্যাকুলতা যে-ভক্তির পরিচয়, সে-ভক্তি যে জ্ঞানসম্পর্কশূন্য, একথা বাতুল ভিন্ন অন্য কেহ বলিবে না। প্রকৃতির প্রেম জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই ছুটিয়াছে—জ্ঞানের আলোকেই তাহার পথ সমুজ্জ্বল। এ ব্যাপার যে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি—তবুও বলি ভক্তিতে জ্ঞানের স্থান নাই!

এই যে দ্বন্দ্বগুলি উপস্থিত হয়, এগুলি সাধক-রাজ্যের গণ্ডগোল। এই সমস্ত বিরোধ শুধু আমাদের বুদ্ধির দোষ। আমাদের বুদ্ধি খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত—কেননা পরমপুরুষের বহুত্বাভিমানে তাহার প্রতিষ্ঠা। যদি বুদ্ধিকে তাহার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি জোড়া দিয়া ধারণা করিতে বলা হয়, তাহা হইলে তাহার আর থই মিলে না, সে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া যায়। উহাই জ্ঞান বা ভক্তি—মনোবচনের অতীত, বুদ্ধির পরপার। যেমন পরমতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া বলিলাম, সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। তার পর বাটখারা লইয়া ওজন করিতে বসিলাম, কোন্ বস্তুতে কতটুকু সত্তা, কতটুকু চৈতন্য, আর কতটুকু আনন্দ; তার পর তাহার গণন, হরণ, পূরণ ইত্যাদি করিলাম; ক্রমেই হিসাব বাড়িয়া চলিল, আর তত্ত্বকথা স্তূপাকার হইতে লাগিল। কেহ কেহ এমন বোকা যে এই বিচারগুলিকেই জ্ঞান বলিয়া ভক্তির সহিত তাহার বিরোধ কল্পনা করিয়া বসে। কিন্তু জানে না যে জ্ঞানও ফলস্বরূপ উহাও বুদ্ধির অতীত, উহা সংশ্লেষণরূপ আন্তরানুভূতি। সচ্চিদানন্দকে জড়াইয়া বুকে তুলিয়া নাও দেখি—কোথায় থাকিবে সংখ্যা, পরিণাম আর পরিমাণ! সব তখন একরস হইয়া যাইবে। ইহাই জ্ঞানের অদ্বৈত, ভক্তির অদ্বৈত—ইহাই স্বরূপতত্ত্ব, অনাদিসিদ্ধ বস্তু।

সাংখ্যের ত্রিগুণের কথা স্মরণ কর। আচার্য্যেরা বলেন, তিনটী গুণ বহু ব্যক্তির সমষ্টি; উহারা ন্যূনাধিকভাবে মিশ্রিত। এইগুলি হইল সৃষ্টির তত্ত্ব। আবার ত্রিগুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নয়, স্বরূপ; ত্রিগুণের সমপরিণামে প্রলয়—অব্যক্তাবস্থা; উহাই প্রকৃতি। ব্যক্তাবস্থা বিশ্লিষ্ট বুদ্ধি দিয়া দেখি, কিন্তু অব্যক্ত প্রকৃতিকে দর্শন করিতে হইলে বুদ্ধিকে একমুখী করিয়া সমাহিত (Focussed) করিতে হইবে। ইহাই সাংখ্য মত। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ঠিক অনুরূপ যুক্তি ও চিন্তাপ্রণালী ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণেও প্রযুক্ত হইয়াছে। পরমতত্ত্বের সংশ্লিষ্ট ধারণা (Synthetic conception) শঙ্করের অদ্বৈতবাদ; আর উহার বিশ্লিষ্ট ধারণা (Analytic conception) রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ। সাংখ্যে যে রীতিতে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, বেদান্তে সেই রীতিতে পুরুষের বিশ্লেষণ। বিশ্লিষ্ট তথ্যই স্বরূপ তত্ত্ব হইতে পারে না—উহা জ্ঞানও

নহে, ভক্তিও নহে। সংশ্লিষ্টধারণাই যথার্থ তত্ত্বাববোধ—উহাই অদ্বৈত। দ্বৈত উহাতে গর্ভিত। এই অনুভবে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হয়—সাধনায় নয়, সিদ্ধের অনুভূতিতে।

সাধনায় ন্যূনাধিক্য থাকিবেই। দেবর্ষি তাহারই দুইটী পক্ষ উদাহৃত করিয়াছেন। "জ্ঞানকে ভক্তির সাধন মনে করা." এই কথার ব্যবহারিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, কেন-না ইহা দ্বৈতভূমির কথা; এখানে জ্ঞান বা ভক্তির সিদ্ধস্বরূপের প্রতি ইঙ্গিত নাই। জ্ঞান বলিতে এখানে বুঝি বিচার, তত্ত্বনিরূপণের ইচ্ছা, ভক্তি বলিতে বুঝি ব্যাকুলতা, প্রাপ্তির ইচ্ছা। পাইতে হইলে জানিতে হয়—এ তো সহজ বুদ্ধির কথা। অবশ্য জানি চরমে পাওয়া এবং জানা একই কথা; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা কি তাহা বুঝিতে পারি? পারি না বলিয়াই পাইবার চেষ্টা করি, যদিও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত মতে আমরা তাঁহাকে পাইয়াই আছি। সে সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ জীবকে স্ফুরিত হয় না বলিয়াই প্রাপ্তি থাকে আমাদের লক্ষ্য এবং সেই প্রাপ্তির উপায়কেই বলি সাধন।

এই হিসাবে সামান্যতঃ জ্ঞানকেও প্রাপ্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করা অযৌক্তিক নহে। ভগবান্ সম্বন্ধে আমাদের সামান্যতঃ একটা ধারণা পর্য্যন্ত নাই, একটা উন্নত সংস্কার পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে পোষণ করিতে শিক্ষা করি নাই। এরূপ অবস্থায় ভক্তির উন্মেষ যে কোথা হইতে হয়, কিম্বা জ্ঞান কি করিয়া যে ভক্তির বিরোধী হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভগবানের সম্বন্ধে মানব কতদূর অজ্ঞ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কয়লার খাদের সেই কুলির কথা মনে পড়ে, যাহাকে ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিল, "তার নম্বর কত?" বলা বাহুল্য, এরূপ লোক সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই সম্ভব। আমরা যে এত শিক্ষার অভিমান করি, আমাদের ধারণা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ঐ কুলির ধারণার চেয়ে বিশেষ উন্নত বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে জ্ঞান বিশেষ করিয়াই তো ভক্তির সাধক, পোষক, উন্মেষক। মহর্ষি গর্গ যে "তৎকথায় অনুরাগকে" ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহাতেও আমরা জ্ঞান সাধনেরই সূচনা পাইতেছি না কি? তাঁহার কীর্ত্তন, মনন, আলোচন দ্বারা সাক্ষাৎভাবে তাঁহারই জ্ঞান অর্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে এবং উহাই আলোচনা এবং আলোচ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জড়াইয়া দেয়। এই অনুরাগই যদি ভক্তির বীজ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে তাহার সাধন বলা চলে না কি?

ফল কথা, কোনও একটা মতবাদের যৌক্তিকতা নিরূপণ করিতে হইলে আপাতদৃষ্ট অবস্থা দ্বারাই তাহার বিচার করিতে হইবে; দুর্লভ বা সুলভ চরমফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কেবল মতের সঙ্গে মতের সংঘর্ষ আনিয়া উপস্থিত করিলেই কিছু অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া যাইবে না। বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা, তাহাতে জ্ঞানশূন্য ভক্তির অধিকারী কয় জন, বিশুদ্ধ ভাবাবেশ পরিপাক করিবার শক্তি বা কয়জনার আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। কি জ্ঞান, কি ভক্তি সিদ্ধির কোঠায় পৌঁছাইলেই বিচারের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধনদশায় উভয়ত্র বিচার না থাকিয়াই পারে না—ইহা

মনোরাজ্যের অলঙ্ঘ্য আইন। ইহাই লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানকে যিনি ভক্তির অঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তিনি সাধকের অহিত করেন নাই; তাঁহার বাণীও সাধনার একস্তরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তার পর সাধনার কথাই বলি। পাইতে হইলে জানিতে হইবে, ইহা প্রথম অধিকারীর কথা। অধ্যাত্মরাজ্যেও শিশু আছে, ভগবানের প্রতি লোভ জন্মাইয়া দিতে হইলে তাহাদিগকেও ভগবানের কথা জানাইয়া দিতে হয়। শিশুর মত অধ্যাত্মরাজ্যে প্রথম প্রবেশে সাধকের হৃদয়ে জিজ্ঞাসাই জাগে। উপযুক্ত গুরুর পরিচালনে এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়া যখন বুদ্ধির কণ্ডূয়ন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়, তখন সাধকের এই বোধ জন্মায় যে জানিতে জানিতে একদিন তাঁহাকে পাইব, এ তো নয়; জানার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহাকে পাইতেছি। এই ভাবই হইল জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ। জানিলে পাইব—এই মনোভাবে প্রাপ্ত সাধ্যরূপে দূরে থাকে, জানার চেষ্টাটাই একান্ত হইয়া দেখা দেয়। ইহার কথাতেই দেবর্ষি বলিতেছেন—"তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে।" এই ভাবের পরিণতি দেবর্ষির পরবর্তী উক্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে—"অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে।" এখানে জানা ও পাওয়া—জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের হাত ধরিয়া চলিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটাকে এখানে পরিণাম দৃষ্টি দিয়া দেখা হইতেছে। যেমন দেহ বাড়ে, মনের পরিণতি হয়, তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যের শিশুরও পরিপুষ্টি হইতেছে—তাহার জ্ঞানের পুষ্টি প্রেমকে পুষ্ট করিতেছে, প্রেম পুষ্ট হইয়া নূতন জ্ঞানের তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে। এইরূপ একটা অঙ্গাঙ্গিভাব আশ্রয় করিয়া পরিণাম ঘটা সাধকের অনুভূত সত্য; কিন্তু এ অবস্থা দ্বৈত-গর্ভিত; পরিণামমাত্রেই তাই।

ইহার পরের অবস্থাই ভক্তির অদ্বয়াবস্থা; তখন জানিতে জানিতে পাইতেছি, এরূপ চিত্তপরিণামেরও ইঙ্গিত নাই—একেবারে সুস্পষ্ট অনুভূতি পাইয়াছি—পাইয়াই আছি! এ অবস্থায় সাধ্যও নাই, সাধনাও নাই—কোনও দ্বৈতের তরঙ্গভঙ্গ নাই। এই নিশ্চল সমাহিত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই দেবর্ষি বলিতেছেন—স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ—ব্রহ্মকুমারেরা বলেন, ভক্তি স্বয়ং ফলস্বরূপ অর্থাৎ তাহা পরমপ্রাপ্তি। সেখানে আর বলিবার কহিবার কিছু নাই। জ্ঞানও ঠিক এইরূপ স্বয়ং-ফলরূপ। এই সিদ্ধাবস্থা। এখানে জ্ঞান ও ভক্তি একই কথা—উভয়ে বিরোধ কোথায়? দুইটী দলে একটী চণকের উৎপত্তি, ইহাকে বিরোধ বলিবে? সাধকাবস্থাতেও যে উভয়ের বিরোধ কল্পনা শুধু অধিকারিভেদ বিস্মৃতির ফল মাত্র, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সোঽহম্

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—*—

একটা ভারী কেজো মন্ত্র আছে—সবারই সেটা জানা থাকা দরকার। মন্ত্রটী হচ্ছে, সোঽহম্ (Soham)। ইংরেজীতে So মানে এমনি, কিন্তু সংস্কৃতে So অর্থে সেই। আর সেই বল্‌তে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হয়। ভারতবর্ষে স্ত্রী কখনও স্বামীর নাম ধরে ডাকে না। সে জানে, জগতে একটীমাত্র পুরুষ আছে, আর সে হচ্ছে তার স্বামী। তাই স্বামীকে সে বলে "সেই" বা উনি যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার কাছে আর কেউ নাই। কাজেই স্বামীই তার ভগবান্, আর তাই দিনরাত ভগবানের চিন্তাতেই সে বিভোর। তেমনি বেদান্তীর কাছেও "সঃ" বল্‌তে একমাত্র ব্রহ্মকে বুঝায়, আর ব্রহ্ম তার সব জুড়ে রয়েছেন। একমাত্র সত্য আছে জগতে সে হচ্ছে আমার আত্মস্বরূপ। এই ভাবটী সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে।

"হম্" বল্‌তে ফারসীতে 'আমি'কে বোঝায়। ইংরেজী Soham কথাটার H অক্ষরটী বাদ দিয়ে একটা I শেষে জুড়ে দাও কথাটা দাঁড়াবে, So-am-I—সেই আমি, আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আমার ভিতর দিয়ে সদাস্ফূর্ত্ত, কেননা যা কিছু আছে, সব তিনি। এই মন্ত্রে ওম্ লুকানো আছে। S আর H ছেড়ে দাও, থাকবে OM। শ্বাসের সঙ্গে স্বভাবতঃই সোঽহম্ মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, সুতরাং মন্ত্রের অর্থটা সর্ব্বক্ষণের জন্য আমাদের মন জাগরূক রাখা উচিত। শ্বাসের ওপর নজর রেখে সোঽহম্ মন্ত্রে তাকে নিয়মিত করে নাও। এটা একাধারে শরীর, মন ও আত্মার রসায়ন। শ্বাসের সঙ্গে দুটা ক্রিয়া চলে, একটা প্রবেশ আর একটা নির্গমন। নিঃশ্বাসের সময় বলি সোঽ, আর প্রশ্বাসের সময় বলি হম্। শিক্ষার্থীর পক্ষে কখনও কখনও ওঙ্কারজপের চেয়ে সোঽহম্ মন্ত্র জপ করা সুবিধা—কেননা সোঽহমে ওঙ্কারও গাঁথা আছে। যখন স্পষ্ট উচ্চারণ করছি না, তখনও মন্ত্রার্থ ভাবনা করতে হয়, অন্তরে অন্তরে তার চিন্তা করতে হয় আর স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস ফেল্‌তে হয়।

এটা সবার পক্ষেই একটা মহতী প্রেরণা। ইন্দ্রিয়ের মোহ হতে মুক্ত করে এই মন্ত্র মানুষকে ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। সোঽহম্—সোঽহম্। বিশ্বের সর্ব্বত্রই ছন্দোবদ্ধ গতির প্রকাশ। সংস্কৃতে সবিতাকেও তাই বলে; সোঽহম্—আমি সূর্য্যস্বরূপ! আমিই আলো দিচ্ছি—আমি দাতা, গ্রহীতা নই দিই শুধু, বিনিময়ে কিছু নিই না। হয়ত কারু কাছ থেকে কড়া চিঠি পেলাম, কিম্বা কোনও ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকের বিদ্বেষপূর্ণ চিঠি পেলাম। তার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠব, দুঃখ করব, মাথা ঘামাতে বস্‌ব?—না। তোমার ব্রহ্মত্বে সুপ্রতিষ্ঠ থাক তখন অটল থাক। যে তোমার সব চেয়ে ক্ষতি করছে, মৈত্রী ও

করুণার সঙ্গে তাঁরই মনন কর। তাঁরাও তোমার তুমি—আর তুমি কখনও তোমার অশুভ কামনা করতে পার না। আমি সবি তার সবিতা—জ্যোতিঃ আমি, শক্তি আমি, মহিমা আমি। কে আমার অনিষ্ট করবে? আমি তো আমার অনিষ্ট করতে পারি না—সে যে অসম্ভব। পরের মিথ্যা ধারণাকে অতিক্রম করে ওঠ—ও সব তুচ্ছ! ভগবান্ তোমার বুকে থেকে কথা কন্, ভাবেন, কাজ করেন! ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে পরা শান্তির অধিকারী হও! আমিই যে সবিতা—জগতের আলো আমি।

পূর্ণ শক্তিশালী তুমি, এই অনুভবে সিদ্ধ হও। ঠিক জেনো, যত কিছু বাধাবিপত্তি, সবার মূল কারণ হচ্ছে দেশের সীমাদ্বারা বেষ্টিত ক্ষুদ্র-অহং এর তোয়াজ। এই চিন্তাতেই আমরা দুর্ব্বল হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ি। এই রোগ দূর করতে হলে নির্জ্জন ঘরে বসে ভগবানের কাছে আকুল হয়ে কাঁদতে হবে আর বুক ঠুকে প্রবৃত্তিকে বলতে হবে—দূর হ সয়তান—দূর হ! এমন অবস্থায় নিজকে ভাবিত করতে হবে যেন এই দেহ তোমার কোনও কালেই ছিল না—তুমি ব্রহ্মস্বরূপ তুমি দেহ নও! যদি নিজে দেশকালের সীমায় আবদ্ধ থাক, তাহলে অপরের ফন্দীবাজী বা চিন্তায় তোমায় ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। এই যে দেহটাকে তোমরা এত সাধ্য সাধনা করছ—এ যে একটা মরীচিকা মাত্র। আমিই ব্রহ্ম। জান এই কথা? মিথ্যা ধারণায় আস্থা রেখো না—সত্যে বিশ্বাস কর। তত্ত্বমসি—কুচিন্তা বা প্রলোভন তোমার পুণ্য সংস্পর্শ হতে শত যোজন দূরে থাকবে। তোমার সামনে এসে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কি তাদের! তুমি পুণ্য, তুমি পূত—এইটী ভাব দেখি। রোগ কোথায়? আশা রেখো না, ভয় রেখো না, দায় মাথায় নিও না। কর্ত্তব্যের দড়িতে বাঁধা হয়ে কাজে হাত দিও না। কর্ম্ম আবার কি? সে তো তোমারই সৃষ্টি! রাজাধিরাজের মত কর্ম্ম কর। সব তোমার কাছে হবে ছেলে-খেলা। তাই মুক্ত হয়ে আনন্দ নিয়ে কর্ম্ম কর।

ব্যাধি দু'রকম। আমাদের ভাষায় তাকে বলি আধ্যাত্মিক বা আভ্যন্তরীণ, আর আধিভৌতিক বা বাহ্যিক। সোজাসুজি এ দুটো হচ্ছে পিশাচব্যাধি আর গান্ধর্ব্বব্যাধি, পুরুষব্যাধি আর স্ত্রীব্যাধি। কথাটার অর্থ কি জান? স্ত্রীব্যাধি বল্‌ছি সেইগুলোকে, যেগুলো আমাদের ভিতর থেকে হয়। বাসনা-কামনা আসক্তি এইগুলো হচ্ছে স্ত্রীরোগ। আর পুরুষব্যাধি হচ্ছে যে সব দৈব-আপৎ পরের কর্ম্মে বা প্রভাবের দরুণ আমাদের ওপর এসে চাপে। মানুষকে কেমন করে আরাম করতে হয়, বল দেখি? পুংরোগের জন্য তোমার তত ভাবনা নেই, আধিভৌতিক বিকারের দরুণ ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। বাসনাতেই তোমায় খুঁড়ে খাচ্ছে; যে মুহূর্ত্তে ওদের হাত হতে পরিত্রাণ পাবে, সেই মুহূর্ত্ত হতে আধিভৌতিক ব্যাধিও দূরে পালাবে। কিন্তু মানুষের ভুল হয় এইখানে যে, সে নিজের কাজের হিসাব রাখে না। নিজের বাসনা কামনার দরুণ যে বিপত্তির সৃষ্টি হয়, তার দিকে তার বড় খেয়াল নাই। বাইরের ভয়টাই লোকে আগে দূর করতে চায়, তাই গোড়াতেই বে-হিসাবে কাজ সুরু হয়। মানুষ চায় আগে অবস্থার সঙ্গে লড়তে। যে পুংব্যাধি পরের সংস্পর্শে জন্মেছে, তাই তারা আগে দূর করতে চায়।

বেদান্ত বলেন, বাসনা-কামনা তো তোমারই দুর্ব্বলতা।

তোমাতে যে প্রকৃতির অংশ একটা আছে, বাইরের প্রভাবকে সেই ধরে টেনে আনে। একটা কুকুরের মুখে এক টুকরা মাংস আছে, তা দেখে আর সব কুকুর ছুটে আসে তা কেড়ে খেতে। স্ত্রীরোগ আগে আরাম কর, পুংব্যাধি আপনা হতেই দূর হয়ে যাবে। স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবার আরও কিছু আছে। তোমরা সবাই এখানে আছ। কেউ যদি সর্ব্বতোভাবে পবিত্র থেকে থাক, সমস্ত প্রলোভনকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে থাক, অন্তর্নিহিত ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি পেয়ে বলতে পেরে থাক—"দূর হ সয়তান, তোর দান আমি চাই না"—তাহলে তার কাছে আমার একটা কথা বলবার আছে। আমি জানি, এ জগতে কারু কামনা বাসনা বা কারু প্রলোভনে কোনও দিন তার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। কোনও শক্তি তাকে উৎপীড়িত বা পদদলিত করতে পারবে না—কেননা আসুর ব্যাধি হতে সে যে মুক্ত। যখনই আমরা দুর্ব্বলচেতা হয়ে কেবল চর্ম্মসুখ খুঁজি, তখন কি হয়? শত্রুপক্ষের যত কুচিন্তা, সব প্রলোভনের আকার ধরে আমাদের গ্রাস করে ফেলে। যদি সুখ-শান্তি চাও, ব্রহ্মানন্দ ভোগ করতে চাও, তাহলে প্রবৃত্তিকে মেরে ফেলতে হবে। এই মৃত্যুই জীবন, এই মৃত্যুই জীবন। অনুভব কর যে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ—এখনি—এখানেই! ভারতবর্ষে গিয়ে ব্রহ্ম হবে, এমন মুলতুবী বুদ্ধি ফেঁদো না। কাটো বাঁধন; আর বাঁধন যখন কাটতেই হবে, তখন ঠাণ্ডা মাথা, আর প্রশান্ত মেজাজ নিয়ে লেগে যাও কাজে!

কোনও কামনা আমার নাই! আমার অভাব নাই, ভয় নাই, আশা নাই, দায় নাই!

একটা বৃত্ত আঁকলাম ক। এটা যেন একটা কপিকল আর তাতে সূক্ষ্ম একটী রেশমী সূতা ঝোলান আছে। সূতাটীর দুই প্রান্তে দুটী ভার বাঁধা একটা ১০ ছটাক আর একটা ৬ ছটাক। ধর, ছয় ছটাকের সঙ্গে আর চার ছটাক ভার বেঁধে দিলাম। ছয় আর চারে হল দশ, দুদিকেই দশ। কপিকলটা সোজা করে ধর, কোনও ভারই নড়বে না। তার চার ছটাকীটা সরিয়ে নাও, একধারে থাকল দশ, আর একধারে ছয়। এখন দুধারের ভার সমান থাকবে না? ফলে কি হবে? দশছটাকী নেমে যাবে, ছয়ছটাকী উঠতে থাকবে এক মুহূর্ত্ত পরে আবার ছয় ছটাকের সঙ্গে চার ছটাক জুড়ে দিলাম, আবার দুদিক সমান হল। ফল কি হবে? সবাই বলবে, ভারকেন্দ্র সমান থাকবে, কোনটা ভারই নড়বে না। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না, ভার দুটী ওঠা-নামা করতেই থাকবে। প্রথম প্রথম মনে হয়, এক মুহূর্ত্ত পরে যদি ভার দুটো সমান করে দেওয়া হয়, তখন তাদের ঝোঁকও সামলে যাবে। রাম যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বক্তৃতা করছিলেন, তখন ছেলেরা সবাই বলেছিল, ভার দুটো থেমে যাবে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখানো হল, তা হয় না। ছেলেরা দেখল। ভার দুটো সমান হয়েও ওঠা নামা করছে, নেমে যাচ্ছে না।

এ থেকে বুঝতে পারছি, প্রথমেই যদি ভার দুটো সমান হত, তাহলে তারা নড়ত না—আদিম স্থাণুত্ব শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকত।

কিন্তু একবার গতি সুরু হলে পর দুধারের ভার সমান করে দিলেও গতিরোধ হবে না।

তারপর ছয় ছটাকী আর দশ ছটাকী ভার দুটোকে দুধারে ঝুলিয়ে রেখে দুই সেকেণ্ড কাল সুতাটা চলতে দিই, আবার দুই সেকেণ্ড পরেই একটা চার ছটাকী জুড়ে দিয়ে ভার দুটোকে সমান করি, তাহলেও কিন্তু সুতার গতি রোধ হবে না। এমনি করে তিন সেকেণ্ড পরেও যদি ভার দুটো সমান করি, সুতার গতি রোধ হবে না।

কিন্তু এর মাঝে একটা কথা আছে। হিসাবে দেখা যাবে, এক সেকেণ্ড পরে ভার দুটার বেগ হয়েছে সেকেণ্ডে চার ফিট করে। দুধারের সমান ভার যদি এমনি করে বজায় রাখা যায়, তা হলে দুসেকেণ্ডের গড় বেগ দাঁড়াবে সেকেণ্ডে আট ফিট করে। তিন সেকেণ্ড ধরে সমান ভার থাকলে বেগ হবে সেকেণ্ডে বার ফিট করে; চার সেকেণ্ডে হবে ষোল ফিট করে ইত্যাদি কাজেই দেখা যাচ্ছে, অসমান ভার থাকাতে প্রত্যেক সেকেণ্ডের অন্তর বেগে তারতম্য হচ্ছে আর সে তারতম্যের পরিমাণ হচ্ছে আদিম বেগ+৪। এমনি করে সেকেণ্ডে চার ফিট করে বেগ বেড়েই চলেছে। কিন্তু আদি-বেগ একই থেকে যাচ্ছে।

আবার দেখি, বেগ সঞ্চার করবার পূর্ব্বে যদি ভার দুটোকে সমান করে বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে সুতাটা আর চলে না। কিন্তু চার ফিট বেগ সঞ্চার করবার পর যদি ভার দুটোকে সমান করে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে সুতাটা চলবে, কিন্তু আর বেগ সঞ্চয় হবে না। তেমনি দুই সেকেণ্ড পরে ভার দুটো সমান করলে প্রারব্ধ বেগ হবে আট ফিট, কিন্তু আর তা বাড়বে না। তিন সেকেণ্ড পরে প্রারব্ধ বেগ হবে বার ফিট, কিন্তু তাও আর বাড়বে না। এক সেকেণ্ড পরেই যে বেগ বৃদ্ধি হয়, তাকে গণিতে বলে Acceleration.

এইখানে একটা মজা দেখ। দুধারে ভার দুটো সমান করে দিলে পর আর তাদের ওপর কোনও শক্তির ক্রিয়া থাকে না। যদি ভার দুটোর ওপর কোনও শক্তি ক্রিয়া না করে, তাহলে নিশ্চল নির্ব্বিকার হয়ে যাওয়ার পর আর তাদের মাঝে কোনও পরিবর্ত্তন হওয়াও তো সম্ভব হয় না। নিশ্চলতা যদি আদি অবস্থা হয়, তাহলে দুধারের ভার সমান হওয়াতে আর চলবার উপায় থাকে না। যদি এক সেকেণ্ড চলার পর ভার দুটো সমান করা হয়, তাহলে এই নিয়মানুযায়ী প্রারব্ধ বেগটা থেকে যাবে। ভার দুটো সমান করাতে আদিম নিশ্চলতা বা প্রারব্ধ বেগ বাধিত হয় না, কিন্তু বেগেরও আর আতিরিক্ত কোনও তারতম্য হয় না। দুই সেকেণ্ড পরে ভার দুটো সমান করলে পর প্রারব্ধ বেগ থেকেই যাবে। তিন সেকেণ্ড পরেও তাই হবে, অর্থাৎ প্রারব্ধ বেগ থেকেই যাবে, কিন্তু তার আর কোনও তারতম্য হবে না।

এখন সিদ্ধপুরুষের কথা ধর। সিদ্ধি অর্থে দুধারের ভারকে সমান করা। তোমার মাঝে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করে দিয়ে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সিদ্ধি। বাইরের শক্তির প্রভাব হতে মুক্ত হওয়াই সিদ্ধি। তুমি আর তখন ঝড়ঝাপটার খেলানা নও। তুমি স্বপ্রতিষ্ঠ। তাই যদি হয়, তাহলে বেগের

ক্রমবৃদ্ধি (acceleration) নিবারিত হল; কিন্তু প্রারব্ধ যে বেগ, তা থেকেই গেল। এই প্রারব্ধ বেগকেই আমরা বলি পূর্ব্বাধ্যাস। সে থাকেই—তাকে কেউ নড়াতে পারবে না। সিদ্ধপুরুষদের মাঝে কারও প্রারব্ধ বেগ হয়ত খুব কম থাকে, তাঁদের দেহ দিয়ে জগতে মহৎ কোনও কাজ হয় না। আবার কারও প্রারব্ধ বেগ হয়ত প্রভূত পরিমাণ থাকে, তাঁরা মুক্ত, কিন্তু তাঁদের দেহের সূত্র চল্‌তেই থাকে; আর সেই দেহ দিয়ে জগতে কত আশ্চর্য্য ও মহৎ কাজ নিষ্পন্ন হয়।

তুমি ব্রহ্ম! এই অনুভূতিতে সিদ্ধ হও—সব হবে।

ওঁ ওঁ—ওঁ

সাংখ্যের প্রমাণ বিচার

এখন প্রশ্ন এই, চৈত্র গৃহে নাই, অথবা দার্শনিকের ভাষায়, চৈত্রের গৃহাসত্ত্ব তাহার সত্তামাত্রের বিরোধী, না কেবলমাত্র তাহার গৃহে সত্তার বিরোধী? [বিরোধ কোথায় সম্ভব? যেখানে বিষয় অথবা অধিকার এক, অথচ বিপরীত বৃত্তির সমাবেশ, সেখানেই বিরোধ হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কি তাহাই হইয়াছে? প্রতিপক্ষ বলিতেছেন, হাঁ, হইয়াছে; কেনন, চৈত্রের সত্তা গৃহ ও গৃহের বাহির উভয়ত্র সামান্যতঃ প্রবৃত্ত, সুতরাং সেই সত্তার সহিত বিশেষভাবে গৃহে অসত্তার বিরোধ কেন না হইবে? কোথায়ও আছে—এই কথা বলিলে যখন বিশেষ কোনও স্থল নির্দ্দেশ করা চলে না, তখন "কোথায়ও" বলিতে তো গৃহকেও বুঝাইতে পারে এবং তাহাকে "গৃহে নাই," এ কথাও তো বাধিত হইতে পারে।] কিন্তু ঠিক এই কথার উত্তরে আমরা বলি, যেখানে হোক, একখানে আছে এ উক্তির সহিত "গৃহে নাই" এ উক্তির বিরোধ হইতে পারে না, কেননা উভয়ের বিষয় ভিন্ন। [যেখানে হোক আছে বলিলেই ঘরেও আছে, এরূপ সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় না।] প্রতিপক্ষ বলেন, দেশসামান্য জ্ঞান দ্বারা (অর্থাৎ চৈত্র যেখানে হোক আছে এই জ্ঞান দ্বারা) তাহার গৃহাত্মক বিশেষ সম্বন্ধ সংশয়াপন্ন হয়, অতএব দেশবিচারে বিষয় সমান বলিয়া কচিৎসত্তার সহিত গৃহাসত্ত্বের বিরোধ রহিয়াছে। আমরা বলি, এ ধারণা ভুল; কেননা, চৈত্র যে গৃহে নাই, ইহা প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে; অধুনা তাহার গৃহে সত্তা পাক্ষিক মাত্র অর্থাৎ তাহার সামান্য সত্তা দ্বারা গৃহে সত্তা সম্ভাবিত হয় মাত্র, তাহার নিশ্চয়তা অবধারিত হয় না। অতএব দেশসামান্য জ্ঞান হইতে তাহার গৃহসত্ত্বজ্ঞান সাংশয়িক-জ্ঞান মাত্র। প্রমাণজ্ঞানের সহিত সাংশয়িকজ্ঞানের বিরোধ কি করিয়া সম্ভব? [কেননা উভয়ের অধিকার যে ভিন্ন। দুইটী জ্ঞানই প্রমাণ-নিশ্চিত হইলে সত্তা এবং অসত্তায় বিরোধ সঙ্গত হইত। কিন্তু প্রমাণে

অসত্তার সহিত সংশয়িত-সত্তার বিরোধ কোথায় ?]

আবার চৈত্রের প্রমাণনিশ্চিত গৃহাভাব কি করিয়া পাক্ষিক গৃহসত্তাকে বাধিত করিয়া তাহার সামান্যসত্তাকেই বাধিত করিবে এবং গৃহসত্তার সাংশয়িকত্বই বা দূর করিবে ? গৃহাবচ্ছেদে চৈত্রের অসত্তা উক্ত গৃহাবচ্ছেদেই তাহার সত্তার বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু তাহার সামান্য সত্তার বিরোধী হইবে কি করিয়া ? কেননা অবচ্ছেদক বিভিন্ন হওয়াতে উক্ত প্রকার অসত্তা সামান্য-সত্তার পক্ষে উদাসীন মাত্র, বিরোধী ত নয়। অতএব চৈত্রের গৃহে অসত্তা সিদ্ধ লিঙ্গ ; তাহা হইতে তাহার বহির্ভাব অনুমান করা কিছু মাত্র অযৌক্তিক নয়

কেহ কেহ অর্থাপত্তির এই লক্ষণ করিয়া থাকেন যে উহা বিরুদ্ধ দুইটী প্রমাণের বিষয় বা অধিকার ব্যবস্থিত করিয়া দিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকে। [যেমন চৈত্রের সত্তা এবং তাহার গৃহে অসত্তা দুইটী বিরুদ্ধ প্রমাণ বিষয়। চৈত্রের বহিঃসত্তা দ্বারা উভয়ের বিরোধ প্রশমিত হয়। অতএব চৈত্রের বহিঃসত্তা অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য।] আমরা বলি এ মত টিকিতে পারে না, কেননা এত উদাহরণের সম্পর্কে পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, অবচ্ছিন্ন এবং অনবচ্ছিন্নে বিরোধ হয় না। অর্থাপত্তির যদি অন্য কোনও উদাহরণ থাকে, তাহাও অনুমানেরই অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। অতএব, অর্থাপত্তি যে অনুমান প্রমাণেরই ভেদ মাত্র, তাহা সিদ্ধ হইল।

[মীমাংসক ও বৈদান্তিক অভাব বা অনুপলব্ধি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ভাবপদার্থ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ দ্বারা জানা যাইতে পারে ; কিন্তু অভাব জানা যাইবে কি করিয়া ? ভূতলে ঘট আছে—এখানে ঘট বিষয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় ; সুতরাং ঘট প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু "ভূতলে ঘট নাই"—এই নাস্তি জ্ঞান হয় কি করিয়া ? নাস্তিজ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে এরূপ ইন্দ্রিয়সংযোগও তো সম্ভবপর নয়। অতএব অভাববোধের জন্য অনুপলব্ধিরূপ বিশেষ একটী প্রমাণ বৃত্তি স্বীকার করা আবশ্যক। অভাব প্রমাণের পক্ষে ইহাঁদের মোটামুটী যুক্তি এই।]

সাংখ্যকার বলেন, অভাবও প্রত্যক্ষ হয়। [কেননা অভাব তো একটা পরিণাম বই আর কিছু নয়। এ কথা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, যাহা আছে, তাহার অসত্তা এবং যাহা নাই তাহার সত্তা কখনও প্রমাণিত হইতে পারে না। তবে জগতে কোথায়ও একটা কিছু আছে, আবার নাই—এই ভাব আসে কোথা হইতে ? আমরা বলি উহা পরিণামেরই প্রকার বিশেষ। আলোক এবং অন্ধকার, জীবন ও মরণ, সত্তা ও অসত্তা, ইহাদের মাঝে একান্ত বিরোধ দেখিতেছ কেন ? সমগ্র দৃশ্যকে এক অখণ্ড সত্তা দ্বারা অনুবিদ্ধ করিয়া দেখ। উহাই আমাদের শাস্ত্রে কথিত প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সর্ব্বদা স্বতঃ পরিণমিতা হইতেছে। পরিণামের একদেশে চক্ষু রাখিয়া ক্ষণান্তরে আবার তাহার আর একদেশে চক্ষু স্থাপন করিয়া আমরা বলি—এই ছিল—এই নাই। কিন্তু বাস্তবিক যাহা এখন তোমার কাছে নাই, তাহা সত্তারই সূক্ষ্ম অব্যক্ত পরিণাম মাত্র। যাহা স্থূল,

তাহাই ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে হইতে অবশেষে নাস্তিরূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং একচ বস্তুর অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব তাহার পরিণাম ছাড়া আর কি হইবে? এই হইল সাংখ্যদর্শনের পরিণামবাদ।]

ইহা হইতেই আমরা বলিতে পারি, ভূতলে ঘটাভাব, ভূতলেরই পরিণাম মাত্র উহা উহার কৈবল্যলক্ষণ পরিণাম। [কথাটা এই—ধর তুমি অচঞ্চল হইয়া বসিয়া রহিয়াছ, সম্মুখস্থ ভূতল তোমার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এতক্ষণ তোমার চিত্তসত্তা বৃত্তিরূপে ওই ভূতলাকারেই পরিণত হইয়াছে। এই সময়ে ভূতলে একটা ঘট আনীত হইল। বাহ্যদৃষ্টিতে ঘট একটা নূতন বিষয়। কিন্তু সাংখ্যদৃষ্টিতে ঘট ওই ভূতলেরই একটা বিশেষণ মাত্র, অর্থাৎ তোমার চিত্তকেও এখন ঘটরূপ বিশেষণ দ্বারা অনুরঞ্জিত হইল। এখন তোমার চিত্ত=ঘটবদ্ ভূতল। চিত্তের দিক হইতে উহা একটা পরিণাম ছাড়া আর নূতন কোনও বিষয় নহে। ক্ষণকাল পরে ঘট অপনীত হইল। তখন তোমার চিত্ত আবার রিক্ত ভূতলাকার গ্রহণ করিল। বহির্দৃষ্টিতে ঘটাভাবরূপ নূতন একটা বিষয় উৎপন্ন হইল। কিন্তু সাংখ্যদৃষ্টিতে চিত্তসত্ত্ব আবার কেবল ভূতলে পরিণত হইল। এইরূপ ভূতলের ভূমিকায় যত বিষয়ই আসুক যাউক না কেন, তোমার চিত্তেরই উহাতে ক্ষণে ক্ষণে বৃত্তিভেদ হইতে থাকিবে। ইহাকে চিত্তেরও পরিণাম বলিতে পার, অথবা ভূতলরূপ ভূমিকারও পরিণাম বলিতে পার। ঘট কিম্বা ঘটাভাব উভয়ই উক্ত ভূমিকার বিশেষণ বা পরিণামের ভেদ মাত্র। যখন ঘট ছিল, তখন বৈশিষ্ট্যলক্ষণ পরিণাম, যখন ছিল না, তখন কৈবল্যলক্ষণ পরিণাম। এইমাত্র প্রভেদ।

এইরূপে সমস্ত ভাবই ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, কেবল মাত্র চিৎশক্তি বা দৃক্‌শক্তি অপরিণামিনী। পরিণামের ভেদগুলি এক এক ইন্দ্রিয় দিয়া আমরা ধরিয়া রাখিতেছি মাত্র। সুতরাং প্রকৃতির সর্ব্ববিধ পরিণামই মূলতঃ প্রত্যক্ষগোচর। অভাবও একটা পরিণাম অতএব অভাবও প্রত্যক্ষ গোচর। অতএব অনুপলব্ধি নামে পৃথক প্রমাণ স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নাই।

[সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষের Psychological analysisর উপর গঠিত। মোট কথা এই, বিষয়ের ভূমিকা প্রয়োজন। নির্ভূমিক বিষয় হইতে পারে না, তেমনি নির্ভূমিক বৃত্তির সম্ভবপর নয়। ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত কথা। এই ভূমিকাতেই আমরা প্রকৃতির আভাস পাই। যাহা কিছু দেখি, তাহা এক অনবচ্ছিন্ন ভূমিকারই পরিণামভেদ। সুতরাং ভাব ও অভাব একই ভূমিকার বিষয়ের ব্যক্ত ও অব্যক্তাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব যাহা ভাব-গ্রাহক, তাহাই অভাব-গ্রাহক—ইহাই সাংখ্যসিদ্ধান্তের সার কথা। বৈদান্তিক ও মীমাংসক অবচ্ছিন্ন বিষয়ের দিক দিয়া প্রমাণগুলিকে যাচাই করিতে চাহেন। এই জন্য অনুপলব্ধিকে পৃথক বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। তা ছাড়া সর্ব্বশূন্যেরও একটা অনুভূতি আছে; উহাকে দৃশ্যরূপে সম্মুখে রাখিতে গেলে কোন্ প্রমাণের আশ্রয় লইব, ইহাও একটা সমস্যা। বৌদ্ধ শূন্যবাদ সত্তার এই দিকটা উপস্থিত করিয়া দর্শনের এক নূতন ধারা খুলিয়া দিয়াছিল। তাহার

সমাধানের জন্যও বেদান্তকে অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইয়াছে।]

আর একটা প্রমাণ স্বীকার করা হয়, সম্ভব। যেমন খারীতে (পরিমাণবিশেষ)' দ্রোণ বা আঢ়কের (স্বল্পতর পরিমাণ) সম্ভাবনা। উহাও অনুমান মাত্র। খারীত্ব দ্রোণত্ব ছাড়া থাকিতে পারে না বলিয়াই খারীতে দ্রোণাদির সত্তা জানিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

সর্ব্বশেষ প্রমাণ ঐতিহ্য বা কিম্বদন্তী। কে বলিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু পরম্পরা-ক্রমে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, যেমন "প্রাচীনেরা বলেন শুনি" "এই বট গাছে ভূত আছে" ইত্যাদি। একে তো ইহাকে প্রমাণই বলা যাইতে পারে না, কেননা যখন ইহার বক্তার নিশ্চয়তা নাই, তখন উহা সাংশয়িক জ্ঞান মাত্র। যদি কোনও আপ্তব্যক্তি প্রবক্তা হন, তাহা হইলে তো উহা আগম। সুতরাং ঐতিহ্যও একটা অতিরিক্ত প্রমাণ নয়।

ইহাতে সিদ্ধ হয় যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ছাড়া আর কোনও প্রমাণ হইতে পারে না।

আরণ্যক



"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

— ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।২।৮

এ জগতকে দুটো কাচের ফুটো দিয়ে দেখেই মনে কাব্যের লহর উথলে উঠে, আর যদি নিজকে বিশ্বতশ্চক্ষুঃ রূপে অনুভব করে লৌকিক ও অলৌকিক সমস্তই দেখতে শেখা যায়, তবে যে কি অসীম আনন্দ, তা কল্পনা হয় কি? এখন কল্পনাও হয় না বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের স্বরূপ ঐ সর্ব্বোত্তম আনন্দময় অবস্থা। আর আমরা কি না চোখ বুজে জগৎটাকে অন্ধকার, দুঃখময় বলে ভাব্‌ছি।

*

ইন্দ্রিয়ের মাঝ থেকে যে সুখ আমরা পাব, তাই তাঁর রসে ভরপুর হয়ে উঠ্‌বে—নইলে আমার সুখ যে তাঁর মিলনপথকে শুধু কণ্টক-গহনই করে তোলে!

*

তুমি যখন দারুণ দুঃখে বিমনা হয়ে জগতের দিক থেকে মুখ বিকৃত করে ফিরে রয়েছ, তখন হয়ত আর এক জন আনন্দে জগতের প্রত্যেকটী বস্তুর রসিয়ে রসিয়ে স্বাদ নিচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জগতের কোনও দোষ নয়। সে যেমন, তেমনই রয়েছে। তোমরা দুজনে দুদিক থেকে তাকে যেমন দেখছ, ভেবেছ সে দেখতে এমনি। আসলে তা নয়। যে যেমন চশমা দিয়ে একে দেখে, সে তেমনি দেখতে পায়। কাজেই সুন্দর দেখতে হলে

নিজের চশ্‌মা বা চোখ আগে সুন্দর কর। পৃথিবীকে চর্ম্মাবৃত করার প্রয়োজন নাই। নিজের পায়ে জুতা পরে দাঁড়ালেই পৃথিবী চর্ম্মাবৃত বলে বোধ হবে। আপনি ভাল তো জগৎ ভাল। কাজেই কারও কথা বা ব্যবহারের কটুতা নিয়ে নিজের মনে শুধু দুঃখ না করে, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দিয়ে হৃদয়টী সুন্দর কর, দেখবে সবাই ভাল, মিষ্ট ভাষী, সবাই সুন্দর!

*

জগতে যা কিছু পাবার আছে, তা দিয়ে বোঝাই হলেই যে পূর্ণ হব, তা তো নয়--যখন আর কিছু চাইবার থাক্‌বে না, তখনি না আনন্দ!

*

কামনা করবে কতটুকু? তোমার কল্পনায় যতটুকু আসে, ততটুকু বৈ ত নয়। তাই পাওয়ার জন্য না হয় আপ্রাণ চেষ্টা করলে, প্রার্থনা করলে। ফলে যদি পেলেও, তবু ঐ অতটুকু; আর সেও নির্দ্দিষ্ট কতকটা সময়ের জন্য। নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরালে আবার সেই সেই। আর যদি তাঁতে সব কামনা সমর্পণ করে দিতে পারি, তবে যে তিনি অভাবনীয়রূপে আমাদের পাত্র পূর্ণ করে দেন। আমরা কতটুকু বা চাইতে জানি, আর কতটুকুই বা ধারণা করতে পারি? তিনি যে নিজে অসীম সুন্দর, তাই তাঁর রাজ্যে গিয়ে পড়লে সবই অসীম সুন্দর, মহান্ করে তোলেন। তাই সাবধান, নিজের বুদ্ধির দোষে দুঃখে পড়ে কখনও প্রার্থনা করো না যে ঠাকুর, আমার এ দুঃখ দূর করে দাও, আমায় অমুকটা দাও--বরং বলো, ঠাকুর, আমার এ দুঃখ যেন তোমার হাতকেই পিছনে দেখিয়ে দেয়। আমি যেন সমস্তের পিছনে ঐ মঙ্গলহস্তকেই আমার জীবনসর্ব্বস্ব, সুখ-দুঃখে পরিচালক বলে হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে পারি। আমায় তোমার তত্ত্ব জানিয়ে দাও, তোমার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়ে দাও।

*

আলেক্‌জাণ্ডারের কাছে দণ্ডী বলেছিলেন--"মাতৃগর্ভ থেকে আমি যে সম্পদ্ নিয়ে এসেছিলাম—সেই সরল প্রাণ, লজ্জাহীন তনু, শঙ্কাহীন হৃদয়—সবি আমি অটুট রেখেছি।"

*

যার ভিতরে যে বীজ রয়েছে, সে তাই নিয়ে তদনুকূল কুলে জন্মগ্রহণ করেছে। সারাটা জীবনে তার কিছু না কিছু ছাপ থাকবেই। তা বলে হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। আজীবনই যে সংস্কার নিয়ে, রিপু নিয়ে তাড়না ভোগ করতে হবেই, এমন না-ও হতে পারে। প্রথমতঃ একবার আপ্রাণ চেষ্টা কর। যদি সিদ্ধ না হলে তবে "যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?" কিন্তু তখন কর্ত্তব্য তাঁর ঐ অভয়চরণে সমস্ত সমর্পণ করে দেওয়া। তা হলে তিনিই তখন যেমন খুসী, তেমনি করে গড়ে নিবেন। শুধু তাঁর পায়ের নীচে কাদার তাল হয়ে পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু প্রথমে আপ্রাণ চেষ্টা না করলে সমর্পণ ঠিক হয় না। তিনিও এসে গ্রহণ করতে পারেন না। না দিলে তিনি নেন কি করে?

*

দেহের পীড়া, মনের পীড়া--তাতে ভাবছ তুমি (বা আত্মা যিনি, তিনি শুদ্ধ) পীড়িত। আর অমনি আর্ত্তনাদে কণ্ঠ বিদীর্ণ করছ।

এ ভুল এখন থেকে ভাঙ্গতে চেষ্টা কর, শ্রীগুরু তোমার সহায় হবেন। আর যদি অমন ভাবে ভুলতে না পার, যাতে তুমি বা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হয়, এমন মনো-মোহনকে ভাবতে ভাবতে সব ভুলে যেতে চেষ্টা কর। দুই উপায়েই ভুল ভাঙ্গতে পারে। যেমনটী ভাল লাগে, তাই কর। এ ভিন্ন বৃথা আর্ত্তনাদে কোনও লাভ নাই।

*

প্রেমকে ছেড়ে জগতে কে বেঁচেছে জানি না—মানুষ আপনাকে বিসর্জ্জন না দিয়ে শান্তি পায় না—কেননা তিনিই যে এ লীলার স্রোতের মাঝে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে এর আনন্দরসধারা পান ক'চ্ছেন!

*

যতই চেষ্টা কর না কেন, "আমি" বোধ যায় না। একে নিঃশেষে দূর করতেও হবে না—শুদ্ধ বা বৃহৎ করতে হবে মাত্র। তাঁর "আমি" হয়ে থাকলেই শুদ্ধ "আমি" হল। ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে যত দূর চিন্তা করতে পার, সমস্তটা ব্যাপে "আমি"র ধারণা কর। এমনি করতে করতে আসল "আমি"র খোঁজ মিলবে। জিনিষ যদি পেতেই হয়, তবে আসল জিনিষই তো ভাল। নকল নিয়ে ভুলে থাক্‌লে একদিন তো ঠকে গিয়েছ বলে পস্তাতে হবেই। তবে এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভাল।

*

জগতের সবাই বলেছে—"ওরে মানুষ, তুই অতি হীন, তুই কীটের কীট—তোর আর উপায় নাই!" আর শুধু আমার ভারত বলেছে—"মানুষ, তুমিই সেই—তুমিই সচ্চিদানন্দময়!" মানুষের এত বড় পূজা, এত বড় সম্মান আর কোন জাতি করেনি।

*

প্রেমের তিনটী রূপ। তার প্রথমটীর অভিব্যক্তি হচ্ছে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এ কথা ভেবে শুধু আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া—সব রকমে!

তার পর হচ্ছে "তত্তু সমন্বয়াৎ"—এখানেই আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। এখানে—

"হৃদয় আমার চায় যে দিতে
কেবল নিতে নয়—
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা কিছু সঞ্চয়!"

তৃতীয় হচ্ছে সংশ্লেষণের পথে—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—তাঁর বাহুকে অবলম্বন করে, আবার নিজের ভিতর মাতৃত্বের বিকাশ করা। এই হচ্ছে জীবন্মুক্তি।

ব্যষ্টিতে তিনটীই বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু সীমার মাঝেই তাঁকে পেলে তো হবে না—অসীমের মাঝেও পেতে হবে, দেখ্‌তে হবে সেই—

"অরূপ তোমার রূপের আলো
জাগায় হৃদয়পুর!!"

*

পথে চলেছ একজনের আহ্বান শুনে। যেতে যেতে যাঁকে পাচ্ছ, ডাক দিয়ে যাচ্ছ; কেউ এলো ত ভাল, নইলে একাই চল। যাদের সময় হয় নাই, তারা ডাক শুনবে কেন? আর তোমার সঙ্গে তো সেই আহ্বানকারী এক জন রয়েছেনই, তবে আর চিন্তা কেন? আপশোষ কেন? ডাক দিতে হয় দাও, কিন্তু কারও কামনা রেখে ডাক দিও না।

ঠিক জেনো তোমার চেয়েও শতগুণে ওস্তাদ এক জন সকলকে টানছেন। তোমার কামনা হবে শুধু তাঁর জন্য, যাঁর কাছে যাচ্ছ।

*

আমরা 'সৎ'রূপেই বা দেখ্‌তে পাই কবে? আমরা "আছে" বলি, শুধু থাক্‌বে না জেনেই। অনন্তের ব্যঞ্জনার মাঝ দিয়ে সৎস্বরূপকে না দেখ্‌লে কি সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়?

*

ভগবানের চিন্তাও পরশমণি। সে পাথরে ছোঁয়ালে তোমার এতদিনকার এত চেষ্টাসত্ত্বেও যে রিপুর তাড়নায় তুমি মলিন হয়ে পাথর হয়ে রয়েছ, সে রূপ বদ্‌লে যাবে। তখন সোণা হয়ে গিয়ে জগৎটাই সোণা দিয়ে গড়া বলে মনে হবে। তাই যত সব দুষ্ট বাসনা রয়েছে, সব তাঁতে সমর্পণ কর; তিনি নিজেই বলেছেন যে, শত দুরাচার করেও তাঁকে এক-মনে ভজ্‌তে পারলে, সেই হবে সাধু ও সম্যক্ ব্যবসায়ী।

*

উপনিষদ্ তাঁকে বলেছেন—"মহদ্ভয়ং বজ্র-মুদ্যতম্!" কিন্তু সে উদ্যত বজ্রও শান্ত হয়ে আসে—যদি আমার প্রিয়তমের হাতে আমার হাত থাকে; মানুষের দুর্ব্বলতার জয় এখানে—ভোগের তৃপ্তি এখানে—ত্যাগের ঔদাসীন্য এখানে—এই প্রেমের রাজ্যে!

*

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"—কিন্তু তা কর্‌তে হলেই "ত্যক্তেন";—নিজকে ছেড়ে না গেলে তাঁকে দিয়ে আচ্ছাদন কর্‌ব কেমন করে?



বিশেষ দ্রষ্টব্য.

গত ১৯শে কার্ত্তিকের "হিতবাদী"র ক্রোড়পত্রে "অবতার" নামে একটী গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটী সর্ব্বশ্রেণীর সাধুদিগের কুৎসায় পরিপূর্ণ। দুঃখের বিষয়, উহাতে আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত-মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের পবিত্র নাম সংযোজিত হওয়ায়, পরছিদ্রান্বেষী একশ্রেণীর নির্ব্বোধ পাঠক উক্ত গল্পকে সত্য ঘটনা মনে করিয়া নানা অলীক জল্পনাদ্বারা রসনা কণ্ডূয়ন করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। আমাদের গৃহস্থ গুরুভাইদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ অসম্বদ্ধ অলীক রটনার কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য "হিতবাদী"র সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে চিঠি লেখেন। সম্পাদক মহাশয় সকলকেই প্রকৃত ব্যাপার জানাইয়াছেন। তাঁহার লিখিত চিঠিসমূহের মধ্যে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখিত চিঠিখানি অবিকল মুদ্রিত হইল।—

হিতবাদী-কার্যালয়
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সাল

সসম্মান-নিবেদনমিদং

আপনার ১৬।১১।২৬ তারিখের পত্র পাইয়া বড় দুঃখিত হইলাম। "অবতার" একটী গল্প ; গল্প হিসাবেই উহা লিখিত। ব্যক্তিবিশেষকে ইঙ্গিত করিয়া উহা লিখিত হয় নাই। এই গল্প প্রকাশিত হইলে একজনেরও মনে দারুণ ব্যথা লাগিবে এ সন্দেহ যদি একবারও আমাদের হইত, তাহা হইলে উহা আমরা প্রকাশই করিতাম না। অধুনা ভণ্ড সন্ন্যাসী নানা দিকেই দেখা যায়—অনেক স্থলে এই শ্রেণীর সাধু-নামধেয় ব্যক্তির অনাচারের বিষয়ও জানা গিয়াছে। লেখক ইহারই ছায়া লইয়া গল্পটী লিখিয়া থাকিবেন। কাহারও মনে ব্যথা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—বিশ্বাসপ্রবণ সরল হিন্দুকে সাবধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে পারে। এ সপ্তাহের হিতবাদী ছাপা হইতেছে, সুতরাং প্রকৃত বিষয় পাঠকবর্গের গোচর করিবার সুযোগ এ সপ্তাহে ঘটিল না। এই গল্প পাঠে কোন মহৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা কাহারও জন্মিতে পারে ইহা ভাবিতেও এখন আমরা লজ্জা বোধ করিতেছি। যাহা হউক, অজ্ঞাতসারে কৃত ক্রটীর জন্য আমরা আপনার নিকটে পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছি জানিবেন। ইতি। বশংবদ

শ্রীপাঁচুলাল মল্লিক ম্যানেজার

পুঃ—আপনি যে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের নাম করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এই গল্পের লিখিত নিগমানন্দের কোন সংস্রব নাই। গল্পের নাম কল্পিত নাম মাত্র।

ইহা ছাড়া বিগত ১০ই অগ্রহায়ণের "হিতবাদী"তেও তাঁহারা এজন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"* * স্বামী নিগমানন্দ শত শত ব্যক্তির গুরু, তিনি বাঙ্গালায় বহুজনমান্য ; কোনও প্রকার আকার-ইঙ্গিতে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার দুষ্প্রবৃত্তি 'হিতবাদী'র ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংবাদপত্রের থাকিতে পারে না। সকলের মনে রাখা উচিত যে গল্প গল্পমাত্র, কল্পিত কথা—উহার কোন অংশ সত্য নহে।"

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ "হিতবাদী"-সম্পাদক আশুবাবুকে পুনরায় যে চিঠি দিয়াছেন, তাহাতে এই কথাই বিশদভাবে বুঝাইয়া পুনরায় লিখিয়াছেন, "গল্পলেখকও

* * আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে কাহাকেও ইঙ্গিত করিয়া বা কাহাকেও অপদস্থ করিবার জন্য তিনি এই গল্প লিখেন নাই। * * আমাদের সরলতায় ও কথায় যদি আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন, তবে তাঁহার গল্পটী আপনাদের গুরুদেবকে ইঙ্গিত করিয়া লিখিত হয় নাই, এই কথাও বিশ্বাস করিয়া লইতে পারেন। গুরুনিন্দা কেহই সহিতে পারে না— আমরাও পারি না। এ জন্য কেবল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আপনারা বিচলিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতেছি। যাহা হউক, আমাদের কাছে প্রকৃত কথা শুনিয়া আপনারা এই অপ্রিয় বিষয়ের আলোচনায় ক্ষান্ত হইবেন বলিয়া আশা করি। * * * দৈবদুর্বিপাকে আপনাদের যে মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে, তাহা অতঃপর বিস্মৃত হইলে এবং আপনার গুরুভ্রাতৃগণকে এই বিষয় লইয়া পুনরায় আলোচনা করিতে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলে আমরা সুখী হইব।"

১৭ই অগ্রহায়ণের "হিতবাদী"তেও তাঁহারা ঐ বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর গৃহস্থ গুরুভাইগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই বিষয় লইয়া আর অধিক পীড়াপীড়ি না করেন। যদিও এই ব্যাপারে আমাদের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী গুরুভাইগণ ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, তথাপি গৃহস্থ গুরুভাইদিগের পক্ষে ইহা যে মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমরা তাঁহাদিগকেও এ কথা স্মরণ রাখিতে বলি যে,—"হস্তী চলে বাজারমেঁ, কুত্তা ভূকে হাজার!"

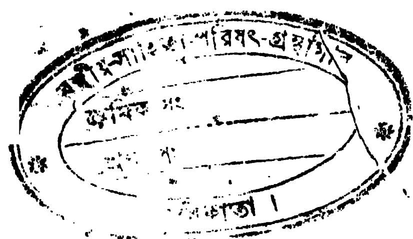
ভক্ত-সম্মিলনী

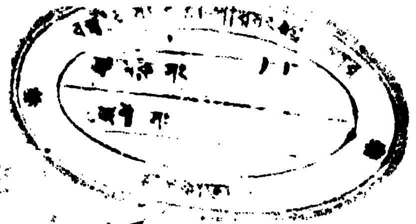
—ঃ*ঃ—

আগামী পৌষ মাসের ১১ই, ১২ই ও ১৩ই তারিখে পশ্চিম বাঙ্গালা বিভাগীয় খড়কুশমা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত সম্মিলনীর ১২শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আমরা আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও তাহার শাখা আশ্রম সমূহের পৃষ্ঠপোষক, পরিচালক ও ভক্তগণকে, সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। কাহাকেও পৃথক পত্র দেওয়া হইল না। সকলেই বিছানা পত্র সঙ্গে আনিবেন। মঠাধিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীমৎ পরমহংসদেব ঐ সময় খড়কুশমা আশ্রমে উপস্থিত থাকিবেন। খড়কুশমা গ্রাম মেদিনীপুর জেলায় এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গড়বেতা ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত ষ্টেশন হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত বেশ বাঁধা রাস্তা আছে। ষ্টেশন হইতে আশ্রমে যাইবার জন্য ছৈ-দেওয়া গরুর গাড়ী ষ্টেশনে পাওয়া যাইবে এবং মটর-বাসের বন্দোবস্ত করা হইবে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা, উত্তর বাঙ্গালা ও দক্ষিণ বাঙ্গালা বিভাগের ভক্তগণ হাওড়া ষ্টেশন হইতে গড়বেতা যাত্রা করিবেন। হাওড়া হইতে গড়বেতা ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া—প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ২৻১০ দুই টাকা দুই পয়সা ও এক্সপ্রেস্ ট্রেনে ২৷৶০ দুই টাকা দশ আনা। হাওড়া হইতে গড়বেতা যাইবার দুইখানি থ্রু ট্রেন আছে—একটি গোমো প্যাসেঞ্জার হাওড়া হইতে সকালে (কলিকাতার সময়) ৭-৩৪ মিনিটের সময় ছাড়ে ও বেলা ৩টার সময় গড়বেতা পৌছায় এবং অপর ট্রেন রাঁচি এক্সপ্রেস্ রাত্রি ৯—৪৪ মিনিটের সময় ছাড়ে এবং রাত্রি ৩টার সময় গড়বেতা পৌছায়। ১০ই পৌষ হইতে এই দুই ট্রেনে সমাগত ভক্তগণকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য গরুর গাড়ী ও মটরবাস ষ্টেশনে প্রস্তুত রাখা হইবে। উক্ত ট্রেনে গমনেচ্ছু ভক্তগণের মধ্যে কেহ অসময়ে কলিকাতায় পৌছিলে বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটির মোড়ে ধর্ম্মশালায় এবং তাহার সম্মুখস্থ ১৫০ নং হ্যারিসন রোড শ্যামাদত্ত ভুটিয়ার ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিয়া যথাসময় ট্রেন ধরিতে পারেন। আশ্রমে যাইবার গরু গাড়ীর ভাড়া ৷৶০ দশ আনা। একখানি গাড়ীতে ২ দুই জন বেশ যাইতে পারিবেন এবং মটরবাসের ভাড়া জন প্রতি ৷০ আট আনা হইতে পারে। পশ্চিম বাঙ্গালার ভক্তগণ নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তসম্মিলনীর আহ্বান করিয়াছেন। আশা করি, সমুদয় বিভাগীয় ভক্তগণ তাঁহাদের সহানুভূতি ও উপস্থিতির দ্বারায় আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিবেন। ইতি

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—বিনীত

সেবকবৃন্দ





আর্য্য-দর্পণ

[illegible]শ বর্ষ | পৌষ | দ্বিতীয় খণ্ড
সমষ্টি সং ২০ | | তৃতীয় সংখ্যা

হরিবাহনঃ

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।২।১৭-১৮]

—*()*—

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

—*—

তিষ্ঠা হরী রথ আ যুজ্যমানা
যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছ।
পিবাস্যন্ধো অভিসৃষ্টো অস্মে
ইন্দ্র স্বাহা ররিমা তে মদায় ॥

রথে ঘোড়া দুটী হয়, হে বাসব, থামাও ক্ষণিক,
তারপর বায়ু হেন এস ছুটে আমাদের দিক ;—
রাখিয়াছি সোমরস, তাই কিগো করিবে না পান ?
পিও, ইন্দ্র !—দিই ঢেলে !—বয়ে যাক আনন্দ-তুফান !

উপাজিরা পুরুহূতায় সপ্তী
হরী রথস্য ধূর্ষ্বা যুনজ্মি।
দ্রবদ্ যথা সংভৃতং বিশ্বতশ্চিদ্
উপেমং যজ্ঞমা বহাত ইন্দ্রম্ ॥

তোমারে যে ডাকে সবে, তাই হের সাজায়েছি রথ,
ধুরায় যুড়েছি ঘোড়া—ছুটে যাবে কত দীর্ঘ পথ ;
নিখিল ছানিয়া যথা করিয়াছি যজ্ঞ আয়োজন—
আসুক ছুটিয়া তারা ইন্দ্রে তথা করিয়া বহন।

উপো নয়স্ব বৃষণা তপুষ্পা
উতেমব ত্বং বৃষভঃ স্বধাবঃ।
গ্রসেতামশ্বা বিমুচেহ শোণা
দিবে দিবে সদৃশীরদ্ধি ধানাঃ ॥

অবিজয়ী যুবা অশ্ব—নিয়ে এসো আমাদের হেথা ;
ঋদ্ধ তুমি, কল্পতরু—হরি নাও ভক্ত-মনোব্যথা।
লাল ঘোড়া দুটি হেথা খাক্ ঘাস—দাও ছেড়ে দাও ;—
আছে ভালো ভাজা যব, তাই তুমি দিনে দিনে খাও !

ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি
হরী সখায়া সধমাদ আশূ।
স্থিরং রথং সুখমিন্দ্রাধিতিষ্ঠন্
প্রজানন্ বিদ্বাঁ উপযাহি সোমম্।

রণভূমে সাথী তব ওরা দুটী জানি হে বাসব ;
যুড়িলাম রথে তাই গাহি গাথা বাড়ায়ে গরব।
টলিবে না রথখানি; সুখে দেব তায় আসি চড়—
জান তো সকলি, গুণী, এই সোম—ধর পাত্র ধর।

মা তে হরী বৃষণা বীতপৃষ্ঠা
নি রীরমন্ যজমানাসো অন্যে।
অত্যায়াহি শশ্বতো বয়ং তে
অরং সুতেভিঃ কৃণবাম সোমৈঃ॥

ঠিকরে কিরণ পিঠে—সোমত্ত এ দুটী তব হয়—
তুষিবে এদের আর কেহ, বল এ-ও প্রাণে সয়?
আর সবে থাক পড়ে, এস ইন্দ্র আমাদের কাছে—
নিঙারিয়া দিব সোম—কত পিবে?—এত রস আছে!

তবায়ং সোমস্ত্বমেহ্যর্বাঙ্
শশ্বত্তমং সুমনা অস্য পাহি।
অস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্যা
দধিষ্বেমং জঠর ইন্দুমিন্দ্রম্॥

এ সোম তোমারি তরে; এসো হেথা, নাও না আসন!—
যতকাল চায় প্রাণ, কর পান—খুসী হোক মন।
বিছায়ে দিয়েছি কুশ যজ্ঞভূমে—বস এই ঠাঁই—
চোঁয়ানো রয়েছে সোম—ভর পেট, আর কিবা চাই?

স্তীর্ণং তে বর্হিঃ সুত ইন্দ্র সোমঃ
কৃতা ধানা অত্তবে তে হরিভ্যাম্।
তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে
মরুত্বতে তুভ্যং রাতা হবীংষি॥

ছেঁচা, আছে সোমরস, কুশাসন রেখেছি সাজিয়া;
ঘোড়া দুটি খাবে তাই সব ক'টা রেখেছি ভাজিয়া।
বস হোথা, কল্পতরু! ভাবি শুধু, কত শক্তি তব—
মরুতেরা হল সাথী!—ধর এই হবি অভিনব!

———*———

সহজ স্থিতি ও ভূতহিত

আলোক আর আঁধারকে আমরা পরস্পরের বিরোধী বলি; কিন্তু বিজ্ঞান আবার এ-ও প্রমাণ করিয়াছে যে, যেখানে আলোক দুঃসহ তীব্র, সেখানে আমাদের চক্ষু অন্ধ। তাহা হইলেই দেখি, জগতের আপাতবিরোধী তত্ত্বগুলির মূলেও এমন কিছু নিহিত আছে, যাহার মহিমায় সকল বিরোধের সামঞ্জস্য এক নিমিষে হইয়া যায়। এই সর্ব্বসমঞ্জস তত্ত্বে অবগাহিত থাকাই জীবনের যথার্থ সার্থকতা।

আধ্যাত্মিক জীবনেও এমন অনেক আপাত-বিরোধী তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; বাহ্যদৃষ্টিতে তাহাদের স্বরূপ অবধারণ করা বড়ই কঠিন। একটা কথা আছে, যে নিতান্ত অজ্ঞান আর যিনি পরমজ্ঞানী, দুইয়ের আচরণে কোনও তফাৎ দেখা যায় না; উভয়ের আচরণকেই আমরা সহজ-স্থিতি বলিতে পারি। সাধারণ লোকের চক্ষে এই সহজ স্থিতির কোনও মূল্যই নাই—যদিও জগতের সাড়ে পনর আনা লোকই সহজভাবেই জীবন কাটাইতেছে। নিতান্ত অভ্যস্ত বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য থাকে না, তাই সহজ জীবনকে বিকৃত করিবার উত্তেজনায় অস্থির না হইতে পারিলে মানুষ যেন আর কিছুতেই স্বস্তি পায় না। এই জন্যই দেখি, অজ্ঞানীর কাছে সিদ্ধের চেয়ে সাধকের মান বেশী। যে সাধু হইয়া সাধুত্বের বিজ্ঞাপন সর্ব্বাঙ্গে ফুটাইয়া তুলিতে না পারিল, তাহার সাধুত্ব সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ অতি প্রবল। তুমি-আমি খাই-দাই-ঘুমাই, সাধু-ও তাই করেন, তবে আর উভয়ে পার্থক্য কোথায়—অজ্ঞানীর কাছে এই এক মহাসমস্যা। সমস্যা থাকাতে সাধুরও গা-ঢাকা দিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, সুতরাং এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁহার তো বলিবার কিছুই নাই।

তা ছাড়াও কথা আছে। সাধুদের মাঝে একটা আইনই আছে, পারত-পক্ষে তাঁহারা কোনও বিক্ষোভ ঘটাইবেন না। যেমন পরমহংসদেব বলিতেন, কারু ভাব নষ্ট করো না। মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখ, তাঁহারা লোকের ভাবের দিকের কথাটাই বলিয়া গিয়াছেন, অভাবের দিকটায় নজর দেন নাই। একদিন ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া অভাবের ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া অভাবের বিরুদ্ধে অভিযান করাটাই তাঁহাদের দস্তুর নয়। শঙ্করাচার্য্য আসিয়া গোটা ভারতবর্ষ ওলটপালট করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক বিধি নিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই; সেজন্য আধুনিক সংস্কারপন্থীদিগের কাছে এখনও তাঁহাকে গঞ্জনা সহিতে হইতেছে। শ্রীচৈতন্য ভাবের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু কন্যাদায়ের প্রতীকার নিয়া মাথা ঘামাইতে বসেন নাই। অথচ এই সমস্ত ভাবপ্লাবনের পর সমাজ আবার শুদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ভাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া মানুষ জীবনকে অভিনব ব্যঞ্জনার পথে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছে।

ভূতহিত বলিয়া একটা কথা আছে, তাহা

সাধুত্বের সঙ্গে একেবারে মাখামাখি। সন্ন্যাস ধর্ম্মের শাসন, এই ধর্ম্ম "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"; বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে জগতে ছড়াইয়া পড়িতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "চরত ভিক্খবে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ।" কিন্তু এই ভূতহিতৈষণা হইতে অভিমানকে আলাদা রাখা বড়ই শক্ত। যখন ঠিক ঠিক সাধুত্ব জন্মায় নাই, অঙ্কুরিত হইতেছে মাত্র, তখন ভূতহিতের বাতিকটাই বোধ হয় ভূতের মতন ঘাড়ে চাপিয়া বসে; তার তাড়নায় আত্মহিতের দিকে তখন আর লক্ষ্য থাকে না। সাধুর সংস্কারে আর অসাধুর সংস্কারে তফাৎ এইখানে। গীতাতে দুইটী কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একবার বলিতেছেন, দেখ, তোমার যদি আর কোনও কাজ না থাকে, তবুও একটা কাজ আছে—পরের কাজ করা; আমার কিছু করিবার নাই, তবুও দেখ, আমি পরের কাজ লইয়াই আছি। আবার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, তোমাকে এই কথাও বলিয়া রাখি, যারা বোকা, শুধু নিজের কাজ নিয়া আছে, তাহাদের বুদ্ধি ফাঁক করিয়া দিও না। দুইটী কথায় সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। পরের কাজ করিতে হইবে, অথচ পরের বুদ্ধি ঘাঁটিলে চলিবে না—এটা একটা সমস্যা নয় কি? যাঁহারা দেশহিত, সমাজহিত ইত্যাকার হিত-সাধন-ব্রত নিয়া মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহারা গীতার এই উপদেশের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া দেখেন কি? সাধুত্ব-অসাধুত্বের পরখ তাহা হইলে এইখানেই হইয়া যাইত।

পরের বুদ্ধিকে না ঘাঁটিয়া পরের হিত করিতে, হইলে নিজের হিতটী পাকা হওয়া চাই। গীতাও এই কথাই বলিতেছেন। গীতাতে আছে স্থিতপ্রজ্ঞের কথা। পরের বুদ্ধিকে অবিচলিত রাখিয়া, হিত করিবার সাধ্য যদি কাহারও থাকে, তবে সে একমাত্র স্থিত-প্রজ্ঞেরই আছে। তিনি কিছু না করিয়াও সব করেন, এ যেমন সত্য, সব করিয়াও কিছু করেন না, এও তেমনি সত্য। এই ভাবে জীবন সিদ্ধ হইলে তাহা মহাশক্তির আধার হয়; কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে তো তার মাঝে বিশেষত্ব কিছু ফোটে না। তাই সাধারণ লোকের সন্দেহ থাকিয়াই যায়, এমন সাধুত্বে নিজেরই বা কি লাভ, আর পরেরই বা কি?

পরের বুদ্ধি না ঘাঁটিয়া পরের কাজ করা—সাধকজীবনের এই হইল আদর্শ এবং সমস্যাও বটে। বলিয়াছি, হিত করিবার লোলুপতাটাই আমাদের বেশী; তাই যেন-তেন-প্রকারেণ হিত করাই চাই, ইহাতে যদি বুদ্ধি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, হউক, সত্য দ্বারা তাহাকে জয় করিব—এই হইল এক শ্রেণীর সাধকের মনোভাব। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়েই এই যুযুৎসু ভাবটা বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। স্বদেশী আন্দোলনে, অসহযোগ আন্দোলনে বিলাতী কাপড় পুড়িল, জাতিভেদ উঠিয়া গেল, হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া গেল—সমস্তই কেবল গায়ের জোরে পরের হিত করিবার অছিলায়। ফল কি হইল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেন যে "চকিতে ফল ফলল না", তাহার কারণ রহিয়াছে কিন্তু ওই গীতার উপদেশে। তবে প্রথম যৌবনে লড়ায়ে-ঘোড়ার মত অসহিষ্ণুতা বেশী হয়, এটা যৌবনের ধর্ম্ম—যদিও যৌবনের শিক্ষাও এটা, এমন কথা বলিতে পারি না।

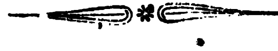
দুঃখের বিষয় আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এই যুযুৎসু ভাবটাকেই পৌরুষ বলিয়া বাহবা দিয়া শক্তির অযথা অপব্যয়ের সমর্থন করা হইতেছে। কাগজে-পত্রে কেবলই দর্প, পরের হিত করিবার উগ্র-বাসনা, আর তার পেছনেই পরের উপর নির্ব্বিচার আঘাত!

এই মনোবৃত্তিতে আমরা কিসের পরিচয় পাই?—দেখি, মানুষের শুভেচ্ছা থাকিলেও সে অসহিষ্ণু, উচ্ছৃঙ্খল, আত্মশক্তিতে অপ্রতিষ্ঠ এবং উদারদৃষ্টি-হীন। একটা কথাই সাধককে গোড়া হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখিতে হইবে—তাহার নিজস্ব সম্পত্তি কিছুই নাই, নিজের বলিয়া যাহার বড়াই করিতেছে, সে কল্পতরুর ভাণ্ডারের দান, তাহার স্বোপার্জ্জিত কিছু নয়। বরং আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, যেটুকু সে কল্যাণ শক্তি বলিয়া মনে করে, সেটুকু পরাৎপরের প্রেরণা—আর যত অকল্যাণ সমস্তই তাহার বিকৃতবুদ্ধির অপচার। পরহিতের শুভেচ্ছা তোমার মাঝে জাগিয়াছে, খুবই ভাল কথা; কিন্তু মনে রাখিও, এ তোমার বাহাদুরী নয়। মায়ের মতন যিনি জগৎকে বুকে জড়াইয়া রাহিয়াছেন, তাঁহার সুরভি অনুধ্যানের একটু আভাস তোমাকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র। প্রথম দৃষ্টিতেই এই পরের শুভেচ্ছাকে বিশ্বজননীর ইচ্ছার প্রতীকরূপে গ্রহণ কর। তাহা হইলে ইচ্ছাকে যেমন অনুত্তেজিত রাখা চলিবে, তেমনি আবার তাহাকে অমোঘ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অটল বিশ্বাসও জন্মিবে। যে জগৎকে মঙ্গলময়ীর মঙ্গলবিধান বলিয়া জানে, নিজকে তাঁহার যন্ত্র বলিয়া মানে, সে অপরকে আঘাত করিয়া ভাল করিতে যায় না, বা রাতারাতি জগৎটা ভাল করিবার জেদে উত্তেজিত হইয়া উঠে না।

একটা কথা না হয় ভাবিয়া দেখ, মূঢ়বুদ্ধি বলিয়া যাহাদের উপর তোমার করুণা হইতেছে, তাহাদের বুদ্ধি যে নিজস্ব নয়, এ কথা তো তুমিই স্বীকার কর? যে পর্য্যন্ত বিবিক্ত অহঙ্কারের উন্মেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব পরাধীন, অপরের হাত ধরা। তাই যদি হয়, তাহা হইলে কি মূঢ় বুদ্ধির উপর কাহারও ক্ষোভ হয়, না এ কথা মনে হয় যে সে কেবল মন্দের দিকেই চলিয়াছে? সে যখন অপরের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে, তখন বোঝা-পড়া করিতে হইলে তাহার পরিচালকের সহিতই করা উচিত। কিন্তু অভিমানে অন্ধ সংস্কারেচ্ছু কি তাই করে? ঈশ্বরেচ্ছা আর নিজের ব্যষ্টি ইচ্ছা, দুইয়ে সংঘর্ষ হইলেই এমনি উগ্র পরহিতৈষণা জাগিয়া উঠে। তাই বলিয়া তোমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিতেছি না। তোমার ইচ্ছাও যে ঈশ্বরেচ্ছা, তাহাও স্বীকার করি; আবার সংস্কার্য্যের মূঢ়ত্বও যে ঈশ্বরেচ্ছা-প্রসূত, তাই বা স্বীকার না করিব কেন? এই দুইটী তত্ত্বকে সমঞ্জসভাবে সম্পুটিত করিয়া ধারণা করিতে গেলেই আর কোথাও অভিমানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যদি তোমার শুভেচ্ছাকেই বড় করিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি যুযুৎসু পরোপকারী হইয়া উঠিবে, ইহা একেবারে অবধারিত, এবং পরিণামে কুফল ফলাও অবধারিত। আবার সংস্কার্য্য ব্যক্তির মূঢ়ত্বকেই যদি অটল সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মহীনতা ও জড়ত্ব অবধারিত—ইহাও পতনের মূল। কিন্তু এই উভয়

কোটিকে যদি যুগপৎ ধারণা করিতে শেখ, তাহা হইলে মনে হইবে, কোথায়ও তো তোমার অহমিকার অস্তিত্ব নাই—অজ্ঞানও তাঁরই সৃষ্টি, আবার তার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ জ্ঞানও তাঁরই সৃষ্টি—তিনিই মূঢ়, তিনিই জ্ঞানদাতা—তুমিও তাঁর! তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তো কিছুই নাই!

ইহার সহজ স্থিতি। এই অবস্থায় আসিলেই পরের বুদ্ধি না খাঁটিয়া পরের জন্য খাটা যায়। লোকে দুঃখ করিয়া বলে, আহা, শঙ্করাচার্য্য মোটে বত্রিশ বছর বাঁচিলেন, তাইতে এত; আর বেশী বাঁচিলে না জানি কি হইত। এই যে ক্ষোভ, এটা কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের নয়—লোকার ক্ষোভ। শঙ্করাচার্য্যের বত্রিশ বছরও যেমন পূর্ণ, বত্রিশ লক্ষ বছরও তেমনি পূর্ণ। আত্মকর্ম্মে এমনি পূর্ণত্ববোধ না আসিলে ভূতহিত করা চলে না; আর ভূতনাথের সঙ্গে যোগ না হইলেও এই পূর্ণত্ব বোধ আসিতে পারে না। আবার স্বয়ং পূর্ণ হইলে ক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া উপকার করিবার বার্ত্তিকও জন্মে না। সাধুর আর সাধকের ভূতহিতে এই তফাৎ।



শ্রুতি-স্মৃতি

—ঃ{*}ঃ—

ভগবানের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ, তার বিচার করলেই ভক্তির উদয় স্বাভাবিক। প্রাথমিক প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি, তার ফলে ক্রমে বিশ্বাস।

*

সংসারে সবাই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যভাবের সাধনা করছে, কেবল মোড় ফিরিয়ে দিলেই হল। ছেলেবেলায় সবারই দাস্যভাব—কেবল দেহি দেহি রব; যুবাতে সখ্যের উন্মেষ, স্ত্রীতে সখ্যের পুষ্টি; তার পর সন্তানের বাপ-মা হলে বাৎসল্যের বিকাশ। সংসারীদের এই সব ভাব তো সহজেই হয়; তবে জ্ঞানের সঙ্গে তার অনুশীলন করতে পারলেই এ আর বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির কারণ হয়।

*

বৈষয়িক আসক্তি যখন ভগবৎমুখী হয়, তখনই তা ভক্তি।

*

চৈতন্য অন্নময় কোষ ত্যাগ করলেই তন্দ্রা হয়; প্রাণময় কোষ ত্যাগ করে মনোময় কোষে এলে স্বপ্ন; তার পর বিজ্ঞানময় কোষে সূক্ষ্মদর্শন, স্বপ্নের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে; তার পর আনন্দময় কোষে সুষুপ্তি। এ অবস্থায় খুবই আনন্দ, কিন্তু মনের অভাব হেতু জাগলে পর আর কিছু স্মরণ থাকে না। সারাদিন পরিশ্রমের পর আধঘণ্টা সুষুপ্তি হলেই শরীরের সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে যায়, তার কারণ ঐ আনন্দ। আনন্দই সবার রসায়ন।

ঘুম তামসীবৃত্তি; চিত্ত যত উন্নত হবে, ঘুম তত কমে যাবে। যোগীর প্রায় নিদ্রা থাকে না।

※

প্রকৃতির অনুকূলে চল্‌লে যে জীব তিন জন্মে মুক্ত হত, সেই জীব নিজ কর্ম্ম দ্বারা একজন্মেই তার বাঁধন ছিঁড়তে পারে; আবার যার এক জন্মে মুক্ত হবার সম্ভাবনা, কর্ম্মফলে তার সাতজন্মও লাগ্‌তে পারে। এই জন্য কর্ম্মকে বিধির চেয়েও বড় বলে।

※

ব্রহ্মচর্য্য সাঁতার শেখা, গার্হস্থ্য সাঁতার দেওয়া; ব্রহ্মচর্য্য যুদ্ধ শেখা আর গার্হস্থ্য যুদ্ধ করা। তাই ব্রহ্মচর্য্যে বিধিবিধানের কড়াকড়ি। গার্হস্থ্যে শুধু ব্রহ্মচর্য্যের বিধি নিয়ে থাক্‌লে হবে না—কর্ম্ম করা চাই।

※

ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়-প্রাপ্তির নাম সুখ, আর তার বিপরীতই দুঃখ। সাংসারিক সুখ বিষয়-সাপেক্ষ। বিষয় অনিত্য, সুতরাং সুখও অনিত্য। তাহলে বিষয় নিরপেক্ষ সুখই প্রকৃত সুখ। সে সুখ কোথায়? তুমিই সুখস্বরূপ, এই অনুভূতিতে। আত্মবিকাশেই সুখস্বরূপের উপলব্ধি হয়। কখনও অকারণ আনন্দে মন উছ্‌লে উঠে, ওই হচ্ছে আত্মানন্দের আভাস।

※

ভগবানকে চার রকমে আরাধনা করা যায়; শূদ্রভাবে বাহ্য পূজা দ্বারা, বৈশ্যভাবে জীবসেবা দ্বারা, ক্ষাত্রভাবে ধর্ম্মরক্ষা দ্বারা, আর ব্রাহ্মণভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান দ্বারা।

※

শ্রদ্ধার সহিত যা দান করা যায়, তাই শ্রাদ্ধ। দশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিই দশপূরক। ইচ্ছা-শক্তির বলে সৃষ্টি হতে পারে, মূলে রয়েছে প্রেম। তাই পুত্রের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে পিতামাতার উন্নতি হয়ে থাকে। পুত্রই পিতা-মাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এই জন্যই পুত্র শ্রাদ্ধের প্রথম অধিকারী; এই বিচারে ক্রমে শ্রাদ্ধাধিকার নিরূপণ হয়ে থাকে। ভুবর্লোকের অহোরাত্র ভূলোকের এক মাস—শুক্লপক্ষ দিন, কৃষ্ণপক্ষ রাত্র; তাই মাসিক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা। স্বর্লোকের অহোরাত্র ভূলোকের এক বৎসর—উত্তরায়ণ দিন, দক্ষিণায়ণ রাত্র; তাই সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা।

※

যখন সাধকের প্রতি অনুপরমাণুতে ইষ্ট-স্ফুর্ত্তি হয়, তখনই মধুর ভাব। গোপীভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—উহাই বেদান্তের সাক্ষিভাব; উহাতে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই ভাব আস্বাদন হয়।

※

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; তিনি গুণময় কৃষ্ণদেহে আবিষ্ট হতেন মাত্র। ব্রজলীলায় তাঁর পূর্ণ আবেশ; মথুরায় গুণময় দেহের ক্রিয়া। যেমন জড় জগতের বিকাশ করবার জন্য সূর্য্যের আসা প্রয়োজন হয় না, শুধু তার কিরণ এলেই হয়, তেমনি বৃন্দাবনলীলায় তাঁর কিরণ মাত্র এসেছিল। নিত্যজগৎ নষ্ট কিম্বা শূন্য করে তিনি ভূবৃন্দাবনে আস্‌তে পারেন না, তাহলে নিত্য-বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য থাকে না।

※

যে রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি গুণের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে, সেই শাক্তাধম বদ্ধজীব।

যিনি ঐ গুণকে বশীভূত করবার জন্য যুদ্ধ করছেন, তিনিই শাক্ত; আর যিনি বশীভূত করেছেন, তিনি বৈষ্ণব।

*

উত্তম অধিকারীর ব্রহ্মভাব, ইনি জ্ঞানী; মধ্যম অধিকারীর ধ্যান, ইনি যোগী; অধম অধিকারীর পূজা, ইনি কর্ম্মী; অধমাধম অধিকারীর বাহ্য অনুষ্ঠান—তাই সাধারণের ধর্ম্ম।

*

গৃহস্থের ভক্তিমার্গ, বিষ্ণু তার আদর্শ; সন্ন্যাসীর জ্ঞানমার্গ, তাঁর আদর্শ শিব। গুরু বল্‌তে শিবকেই বোঝায়, যিনি সন্ন্যাসী হয়েও বিশ্বপ্রকৃতিকে বুকে করে রেখেছেন।

*

"গৃহী হোকর বতায় জ্ঞান"—সাধুদের দোঁহাতে এর নিন্দা আছে। জ্ঞানভাব ধরে কখনও সংসার করা যায় না বা হাজার জ্ঞানের অনুশীলন করলেও ঠিক সংস্কার ছাড়া যায় না। তবে ভক্তিভাব নিয়ে পঞ্চভাবের সঙ্গে ভাব মিশিয়ে আত্মোন্নতি করা যায়। জ্ঞানী ভাববে, আমি দেহ নই, মন নই ইত্যাদি; এই ভাব ধরে তাকে গুণের অতীত হতে হবে। কিন্তু গৃহীর সংস্কারে এ ভাবের সাধন তো হতে পারে না।

*

স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান থাক্‌তে প্রেম হয় না।

*

এ জগতে সমস্তই ভগবানের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। মেথর তার নিজ কাজ করছে, তাতে ঘৃণার কিছু নাই; আবার সাধু উপদেশ দিচ্ছেন কি ধর্ম্মাচরণ করছেন, তাতেও গরবের কিছু নাই। মূলে সব এক, প্রভেদ শুধু ব্যবহারে। ভালমন্দ বিচারও ব্যবহারে।

*

গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে সমস্ত সাধন বিফল। গুরু বিন্দুনাদ-কলাতীত। কলা ব্রহ্মশক্তি; বিন্দুনাদ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, জগতের সৃষ্টির কারণ। গুরু তারও উপর; এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ গুরুর বিকাশ হলেও গুরু তার ঊর্দ্ধে।

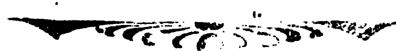
*

জগৎবিচারে অদ্বৈতভাবের পুষ্টি হয়। আমার দেহ, পশুর দেহ, বৃক্ষলতা সবই এক অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি মাত্র, সুতরাং ভেদ কোথায়? তেমনি মন-বুদ্ধিও তো মূলে এক, শুধু কতকগুলি তরঙ্গের বাহ্য ক্রিয়া হয়ে বিভিন্ন বোধ হচ্ছে। যদি নিস্তরঙ্গ হয়, তাহলে মূলে সবই এক বস্তু। সুতরাং আমি স্থূলসূক্ষ্মকারণে এক, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত।

*

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্থূল-সূক্ষ্ম কারণের অবস্থা—প্রত্যেকেই খণ্ড মহাশক্তির আধার মাত্র। এই শক্তি-ত্রিতয়ের সমষ্টি মহাশক্তি—আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান, সবাই ব্রহ্মস্বরূপ; কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন আছি বলে ঐ ত্রিশক্তি বড় লোকের বাড়ীর আয়ার মত আমাদের নিয়ে খেলা করছে, ধমকাচ্ছে, শাসন করছে ইত্যাদি। ছেলে বড় হলে, কি মায়ের কোলে বা কাছে থাক্‌লে দাসীর আর তার ওপর কোনও হাত থাকে না। তেমনি আমাদের জ্ঞান হলে কিম্বা মায়ের কৃপা হলে ওই সব শক্তি দাসীর মত আমাদের আজ্ঞাধীন হবে।

চোর চুরি করে, তাতেও ভগবানের তৃপ্তি, আর ধার্ম্মিক দান করে, তাতেও তাঁর সমান তৃপ্তি। কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক সত্ত্ব কোথায়? লম্পট লাম্পট্য করছে আর সাধু পতিব্রতা স্ত্রী ত্যাগ করছে উভয়েই সেই অনন্ত পথের পথিক। এই সাধুও কোনও জন্মে ঐ সব বিষয় ভোগ করে এখন বীতশ্রদ্ধ হয়েছে; ওই লম্পটও একদিন কামিনী কাঞ্চনের মোহ ছেড়ে সাধু হবে। সবই ব্রহ্মের পরিণতির স্তর। নিম্নস্তরের ভাবগুলিকে অধর্ম্ম, পাপ ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার উচ্চ স্তরগুলিকে পুণ্য, সৎ, ধর্ম্ম ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানীর নিকট সবই সমান, তিনি সাক্ষি-স্বরূপ। যাত্রাগানে যেমন রাজাও সাজে, ভৃত্যও সাজে—মূলে কিন্তু কোনটাই সত্য নয়। (ক্রমশঃ)



অরূপে স্বরূপ

মনে হয়, এখনই যদি মাকে পাইতাম! চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, আর মুহূর্ত্তকালের জন্যও যেন বিলম্ব সহিতেছে না—অরুন্তুদ বেদনায় বিদীর্ণপ্রায় বুকখানি দুই হাতে চাপিয়া ডাকিতেছি—মা, মা! এই আকুলতায় যদি সাড়া না পাওয়া যায়, তবেই অভিমানে বুক ভরিয়া উঠে—অশ্রু-ছলছল চক্ষু দুটী ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলি—পাষাণী!

কে না বলিবে বিরহ বিষ, অপ্রাপ্তির বেদনা সহিয়া বাঁচিয়া থাকা মরারই সমান! আবার কে না বলিবে, এই বিরহই অমৃত, যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে বুকের কাছে পাই না বলিয়া যে ঝুরিয়া মরি, তাহাতেই দূর নিকট হয়, অরূপের অন্তরাল, কালের ব্যবধান সব ঘুচিয়া যায়। কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনভরা সঞ্চিত সকল অশ্রু যখন নিঃশেষ হইয়া যায়, তখনই মনে হয় কান্নার সমুদ্র পার হইয়া এই তো মিলনমন্দিরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলাম!

এই যে পাই না বলিয়া দুঃখ করি, আবার সেই দুঃখের রসায়নেই অন্তর রসিয়া উঠিল অনুভব করি—এ দুটী উপলব্ধিকে মিলাইয়া যে কি বলিব, তাহা বলিতে পারি না। বিরহে, যে রূপে নাই, সে অরূপে মর্ম্মান্তিক সত্য হইয়া দেখা দেয়, স্মৃতি ও কল্পনার স্বপ্নাবরণ ঘুচিয়া গিয়া জাগ্রতের জীবন্ত প্রকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—এই তথ্যকে কি বলিব? এই কি মায়া নয় যাহা আছে, অথচ নাই? এই কি করুণা নয়—যাহা দুঃখের মাঝেও অমৃত ঢালিয়া দেয়, ব্যথা একেবারে দূর করে না, কিন্তু তাহাকে স্নিগ্ধ ও সরস করিয়া তোলে? তখন দীর্ঘ-

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলি, "মা-গো ! এমনি কাঁদিয়া জন্ম জন্ম ধরিয়া তুমি আমাকে কাঁদাইও, তবেই বুকের মাঝে তোমাকে পাব !"

রূপ যে পাইতে চায়, দুঃখ তাহারই—সেই অজ্ঞান দ্বারা বিরহের মাধুর্য্য ঢাকিয়া রাখে। রূপে তৃপ্তি হয় না কেন, তাহা বোঝ কি ? তুমি নিজে যে অরূপ, তাই রূপের পাগল হইয়াও তোমার স্বস্তি নাই। যে দেহের কীট, তাহার কথা বলিতেছি না—সে অভাগা রূপও আস্বাদন করিতে জানে না, শুধু উত্তেজনার আবেগে ধসিয়া পড়ে। যে দেহ হইতে নিজকে আরও গভীরে অনুভব করিয়াছ, কল্প-জগতের শিল্পী যে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তাহার কোনও রূপ আছে কি না। ভাবুক বলিবে, তাই ত, অরূপই যে আমার স্বারসিকী সত্তা—আমার কাছে যে রূপহীন বলিয়াই আমি উদার, সর্ব্বমর্ম্ম-বগাহী, আনন্দের প্রস্রবণ ! কিন্তু মায়ার বিচিত্র লীলায় এই অরূপের মাঝে অনুরাগের রাঙা আভাস রূপের সম্ভাব্যতা ফুটাইয়া তোলে—তখন নিজে অরূপ হইয়াও চাই অরূপা রূপিণী হইয়া দেখা দিক্ না কেন ! আমার দুটী চোখ দিয়া তারই নীলোৎপল-নয়নের মধুরিমা পান করি—আমারও যে আঁখি রহিয়াছে, সে অনুভূতি নাই বা থাকিল ! এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়াই অন্তরের ভাবরাশিকে মূর্ত্তি দিতে চাই ; ভালবাসি বলিয়াই আবদার করি, মা টী আমার মাটীর মেয়ে হইয়া আসুক !

যে প্রতিমা চায়, তাকে পৌত্তলিক বলিয়া তোমরা গালি দাও। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কার হৃদয়ে প্রতিমার সিসৃক্ষা নাই ?—অথচ রহস্য এই, যার বুকে এই রূপের আকুলতা, নিজের কাছে সে অরূপ। অরূপ রূপকে যাজ্ঞা করে, তাই মায়া এত মধুর লাগে ; রূপ যদি রূপকে চাহিত, দেহ যদি দেহের আসঙ্গলিপ্সায় তপ্ত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সে কামনার ক্লেদ দিয়া কি ভাবের মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত ?—

তাহা হইলে কথা এই, অরূপ রূপের ভিখারী, এই বিরহ ব্যাকুলতা হইতেই প্রতিমার সিসৃক্ষা ; এইটুকু সেই সৃষ্টির সত্যও। আর যে রূপাভিমান নিয়া রূপের সৃষ্টি করিতে যায়, সেই যথার্থ পৌত্তলিক। তাই বলি, প্রতিমার ভাবুক ভক্তই মায়ার সত্য জানিয়াছেন ; তোমরা যাহারা রূপাভিমানে মত্ত হইয়া বাহির হইতে কলরব করিতেছ, তাহারা মিথ্যা দ্বারা আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছ শুধু !

কিন্তু বলিয়াছি, এই রূপাকাঙ্ক্ষাও মায়া। মায়া বলিয়া যে তাহা মিথ্যা, তাহা বলিতেছি না। রসিক জানেন, মায়া সত্য, অতি অপরূপ অনির্ব্বচনীয় সত্য ; সে সত্য না হইলে মিথ্যার সৃষ্টি করিত কে ?

তবে কি সত্য দুইটা ? ভয়ে ভয়ে বলি, হবেও বা ! তুমি মিথ্যা অহং নিয়া যে সত্য-মিথ্যায় মিথুন সৃষ্টি করিতেছ, ভগবান্ শঙ্কর বলিবেন, ইহাও অনন্ত, অতএব সত্য। আবার যেদিন মিথ্যা-অহং মুছিয়া ফেলিয়া নিখিল সত্য-মিথ্যাকে আপনার মাঝেই সমঞ্জসরূপে অনুভব করিবে, সেই দিনই পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎ পাইবে। তবে কি মূলে দুই ?—তা ছাড়া আর উপায় কি ! এক বলিলেই কি তুমি বুঝিতে পারিবে ? যখন এক বুঝিবার যোগ্যতা জন্মিবে, তখন আর বুদ্ধির বালাই থাকিবে না।

এইখানে আসিয়াই দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। রূপ অরূপের আলোকে মিশিয়া যায়—ভাবের সঙ্গে ভাবের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বিদ্যুন্ময় স্পর্শ-শিহরণে অদ্বৈতের অনুভূতি জাগে।

রসিক বলেন, এই অনুভূতিই সত্য, আর এই জন্য রূপ চাহিয়াও তোমার তৃপ্তি নাই, তাহাকে অরূপে পরাবর্ত্তিত না করিতে পারিলে তোমার মিলন যে সম্পূর্ণ হইবে না। বৈষ্ণব যে বলেন, "যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ তাহাঁ ইষ্ট স্ফুরে"—সে রূপ দ্বারা রূপের আচ্ছাদন নয়, অরূপ দ্বারা রূপের সম্পুটীকরণ। বিরহকে গভীরভাবে যে অনুভব করিতে পারে, সেই রূপকে অরূপে নিমজ্জিত করিয়া মিলনানন্দে সমাহিত হইতে পারে। তাই রাধার শতবর্ষের বিরহ বৃন্দাবনলীলার চরম পরিণতি, প্রেমের অদ্বৈত ভঙ্গিমা। রূপান্বেষী বৈষ্ণবপন্থীর তাই চরম বিশ্রান্তি বেদান্তে।

বিরহের ব্যাকুলতাকে জড়ের মত আস্বাদন করিয়া উহাকে দুঃখময় করিয়া তুলিও না; চিন্ময় প্রভায় আপনাকে প্রভাসিত করিয়া তোল—ব্যাকুলতা সুখের হইবে। আপনার অরূপ প্রতিষ্ঠায় অটল থাক, কামনার দংশন আর পীড়া দিবে না। রূপে রূপে কামের অতৃপ্তি, রূপে অরূপে তৃপ্তি-অতৃপ্তির দ্বৈত-মিশ্রণ; আর অরূপে অরূপে অদ্বৈতের পূর্ণ তৃপ্তি। সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্ব এই রহস্যের সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে।

অরূপে রূপের ব্যঞ্জনা আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা কোথায়? অরূপ রূপাশ্রিত, না রূপই অরূপের আশ্রিত? নিজের অন্তরের মাঝে তলাইয়া বুঝিয়া তারপর জবাব দিও।

হউন আমার ইষ্ট, হই আমি স্বয়ং—সবার চরম পরিণতি অরূপে, এই সত্যটী তাহা হইলে পাইলাম। কিন্তু রূপে যে আমি আটকা পড়িয়াছি'—ইহার মোহ কাটাই কি করিয়া?

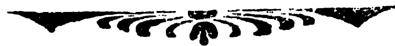
আধুনিক সমাজে কেহ কেহ বলেন, অরূপে তোমার ভাবনাকে নিবিষ্ট কর, পৌত্তলিকতা ছাড়। কিন্তু কথা এই, নিজে পুতুল হইয়া পৌত্তলিকতা কেহ ছাড়িতে পারে কি? মাতৃস্তন্য যে শিশুর জীবন, সে মাতৃস্নেহে তার আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ পাইলেই কি বাঁচিয়া থাকিতে পারে? তার যে স্নেহও চাই, স্তন্যও চাই! তাই প্রতিমাভাবিত বুদ্ধিকে প্রতিমা ছাড়িতে বলা মানবচরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের পরিণতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যাহার নাই, সেই এমন কথা বলিতে পারে। রূপমূঢ়ের এই বিপরীত প্রয়াসকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিতেছেন, অব্যক্তং হি গতির্দুঃখম্।

তবে রূপের মায়া কাটাইবার উপায়?—আগে আপনাকে কেন্দ্র করিয়া অরূপের সাধনা আরম্ভ কর। নিজকে অরূপে ভাবিত করিতে পারিলে ইষ্টরূপেও আর মোহ থাকে না—সে ইষ্ট তোমার যাহাই হউক না কেন। তোমার প্রাথমিক রূপ দেহ। আগে দেহ দূর করিতে হইবে—দেহের বিনাশে নয়, তাহার বিকাশে।

প্রকৃতির একটি আইন রহিয়াছে, পূর্ণতা অরূপের সিদ্ধি। দেহকেই উদাহরণ ধর। দেহের স্বাস্থ্য যখন অটুট, দেহের অনুভূতি তোমার তখন অতি ক্ষীণ। তাপসী রাবেয়া শিরঃপীড়াগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে মাথায় পটী বাঁধিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এত দিন তো তোমার মাথার খোঁজ ছিল না, আজ এক

খেলার অসুখেই ওটার অস্তিত্বের নিশান উড়াইতে হইল ?" তবেই দেখি, অস্বাস্থ্যই আত্মবিরোধী সত্তার উদ্ভাবক। তাহা হইলে এই সূত্র পাই, দেহরূপ দূর করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার অমোঘ উপায় ঋষি-প্রদর্শিত ব্রহ্মচর্য্য। প্রাকৃত পদার্থ স্বচ্ছ থাকে তোষণে নয়, পোষণ এবং পেষণ উভয়ের সমন্বয়ে। এই বৈজ্ঞানিক সঙ্কেতই ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মবিহার।

কিন্তু শুধু দেহেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। দেহরূপ দূর হইলে প্রাণ জাগিবে। সুস্থদেহ পশুর উদ্দামতা তাহার প্রাণের অস্বস্থ পরিচয়—প্রমাণ মনের অবনতি। তাই প্রাণের উত্তেজনাকেও সুস্থ করিতে হইবে, ইহাও ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত। ফলে ফুটিবে মনের আধিপত্য। আপনাকে ডিঙ্গাইয়া যাইবার একটা প্রয়াস তাহাতে জাগে—নিজের মানস রূপের কাছে কত সাধক কাবু হইয়া রহিয়াছে। ইহাও মনের অস্বাস্থ্য। ফল অগভীর ব্যাপ্তি, যাহাকে অজ্ঞেরা প্রতিভা বলিয়া ভ্রম করে। মনকে সুস্থ করিতে বিজ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। সাধারণ মানুষের গতি এই পর্য্যন্তই। বিজ্ঞানের অন্তর্ব্বাহ্যঃ পরিণামকে আনন্দদ্বারা সুস্থ রাখিতে হইবে এবং আনন্দকে সুস্থ রাখিতে হইবে চেতনা দ্বারা। ইহা অন্তরের সঙ্কেত। দেহ, প্রাণ, মনকে সুস্থ অতএব রূপাভিমান-বর্জ্জিত কর—এই সঙ্কেত আপনা হইতে বুঝিতে পারিবে; তখন অনুভূতি হইবে, অরূপ সচ্চিদানন্দই তোমার স্বরূপ। তোমার ইষ্টও তাই। সমে সমেই প্রীতি। রূপের বিরহেই অরূপ-মিলন বা স্বরূপসিদ্ধি।



সিদ্ধির সঙ্কেত

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—※—

ভগবানকে এখন এই দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করছি, শোন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করে আছে এক দুধের সমুদ্র—তার মাঝে অতি সুকুমার ও সুশোভন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, তার কয়েকটা প্যাঁচে একখানা পালঙ্ক হয়েছে। হাজারটী তার ফণা, তাই হল যেন ছাতা। এই সমুদ্রশয্যায় এক অতি কমনীয়কান্তি পরমাসুন্দরী দেবী— ভগবানেরই প্রিয়া তিনি। তনুখানি তাঁর স্বচ্ছ, নয়ন অর্দ্ধ মুদ্রিত, ওষ্ঠে মৃদুস্মিত। অতিসন্তর্পণে তিনি ভগবানের পদ-সম্বাহন করছেন। এই দেবী প্রতিমা এক অতি আশ্চর্য্য পদ্মের ওপর আসীনা—কমলাসনা হয়েই তিনি ভগবানের সেবা করছেন। দু'জনার চোখে চোখে মিলন

হল— পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা বিভোর হয়ে আছেন।

জান এই যুগলরূপের অর্থ কি? এই দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী— উনি দেবী তাঁরই শ্রী, মহিমা তিনি। তাহলে এর অর্থ হল এই, মুক্তপুরুষ চিরকাল ধরে অনিমেষ নয়নে আপনার মহিমার পানে, লাবণ্যের পানে তাকিয়ে আছেন; আর জগৎ যখন তাঁর কাছে নিমজ্জিত, তখনই তিনি মুক্ত। তিনি সমস্ত সম্বন্ধ ও বন্ধনের অতীত, সর্ব্বপাশমুক্ত তিনি— জগতে তাঁর আর কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই।

সমুদ্র হল অনন্তের প্রতীক। তবে একে দুধের সমুদ্র বলা হল কেন? দুধের তিনটী গুণ আছে। দুধ লঘু (সুতরাং তমের বিপরীত, কেননা তমঃ গুরু), দুধ শাদা অর্থাৎ আনন্দময়, আবার দুধ পুষ্টিকর অর্থাৎ শক্তিস্বরূপ। তাহলে দুধের সমুদ্র অর্থে অনন্ত জ্যোতিঃ, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তি। যুগলের প্রতিষ্ঠা এর উপরেই।

সাপের অর্থ কি? সাপ অর্থে সব গেলেও যে থাকে। সাপিনীর শত শত ডিম হয়, কিন্তু হওয়ামাত্রেই সে না কি সেগুলো খেয়ে ফেলতে থাকে। সব যায়, শেষকালে এক থাকে। এই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় আনন্দঘন শক্তির সমুদ্রে অমৃতস্বরূপ **এক** মাত্র বিরাজিত রয়েছেন। সেই এক দ্বিধা বিভক্ত— দুইয়ে, স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ, সুস্নিগ্ধ, সুশান্ত, সুন্দর। ওম্!

রাম দুটো কথার প্রতি তোমাদের বিশেষ লক্ষ্য করতে বলছেন—

(১) ক্ষুদ্র অহংএর পরিহার (২) সত্য অহংএর যথার্থ প্রতিষ্ঠা।

প্রথমতঃ— পরিহার বা ত্যাগকে বেদান্ত বলেন সম্পূর্ণ বন্ধ-শৈথিল্য যা নাকি আয়েস, বিশ্রাম। যখনই সময় পাবে, চেয়ারে বা খাটে দেহটাকে সটান ছুঁড়ে ফেলে দাও —যেন এ বোঝা কোনও দিনই তোমার বইতে হয়নি; একটা পাথরের নুড়ি যেমন তোমার কাছে অচেনা— অনাত্মীয়, এ-ও যেন তাই। দেহটা জড়পিণ্ডের মত কিছু কাল পড়ে থাকুক, তোমার চিন্তা বা বাসনার খিঁচুনীতে যেন তাকে খাড়া রাখতে না হয়— কোথায়ও যেন বিন্দুমাত্র টান না ধরে। দেহ আঁকড়ে পড়ে থাকবার বাসনাকে একেবারে সম্পূর্ণ বর্জ্জন কর। মনের মাঝেও যেন কোনও ভাবনাচিন্তা না থাকে, এমন কি দেহের বাসনাও না। সব বাসনা ছেড়ে দাও একেবারে! এমনি বাঁধন আলগা করাকেই বলে ত্যাগ।

দ্বিতীয়তঃ— ব্রহ্মসদ্ভাব। তাঁর ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা হোক্। যা তাঁর অভিপ্রায় বলে বুঝেছ, তাকে তোমার অভিপ্রায় ভেবে জয়ী করতে চেষ্টা কর— তাতে আসুক সুখ, আসুক দুঃখ। নিজেকে দেহ আর তার পারিপার্শ্বিক হতে ঊর্দ্ধে ভাব— মনের ঊর্দ্ধে, সঙ্কল্পের ঊর্দ্ধে, সিদ্ধি-অসিদ্ধির আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্দ্ধে। নিজকেই সর্ব্বাবগাহী অনন্তশক্তি বলে অনুভব কর— স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের অতীত, অধ্যাসের অতীত, লোকলোকান্তরের আত্মভূত পরমানন্দ বন্ধহীন রাম তুমি! যে সুর স্বতঃই কণ্ঠে ফুটে ওঠে, সেই সুরে প্রণব গান কর— আর ভাব তুমি আনন্দ— আনন্দ— আনন্দ শুধু! তাহলেই সর্ব্বব্যাধি, সর্ব্ব অভিযোগ দূর হয়ে যাবে তোমার। জগৎটা বোঝা হয়ে বুকের

ওপর চেপে থাকে না যেন। জগতে লৌকিক বা সামাজিক যত কিছু ভাবের অভিব্যক্তি, সমস্ত তোমার ভাবেরই ছায়া মাত্র—যে শক্তির নিঃশ্বাসে বা আভাসে এই জগতের সৃষ্টি, সে শক্তি তুমিই—এই ভাব দিনরাত ভাবনা কর। তুমি যা ভাবছ, জগৎ ঠিক তাই।

তোমার উদ্দেশ্য সফল হয় না কেন, জান? যে তোমার অতি আপন, তার কথায় তোমার আস্থা নাই; আর পরের কথা যত অস্থির আর ধোঁয়া-ধোঁয়াই হোক না কেন, তুমি সশ্রদ্ধ বিনয়ের সহিত সেগুলো গলাধঃকরণ কর। আত্মাই যে তোমার সব চেয়ে আপন। রামের এই উপদেশ, তোমার গরজে তুমি বাঁচ, পরের মতের ওপর নির্ভর করে নয়। স্বাধীন হও। যিনি মহাপ্রভু, আত্মস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অন্তর্যামী, শুধু তাঁরই সেবায় জীবন উৎসর্গ কর। হাজার মানুষকে, জগৎকে খুসী করা কখনো তোমার সাধ্যে কুলাবে না—আর শতস্কন্ধ রাবণকে খুসী রাখবার গরজই বা তোমার কি? তার কাছ থেকে কি কোনও ধার খেয়েছ তুমি? তা তো নয়। তুমিই তো তোমার বিধাতা। তাই আপনমনে তান ধর—কে শুনতে এলো না এল, তার তোয়াক্কা মোটেই রেখো না। তোমার অন্তরাত্মা যদি খুসী হল, তাহলে সংসারও খুসী হবে—হতে বাধ্য সে! এ যে আইন। পরের খাতিরে নিজের জীবনে মেকী চালাবার কি প্রয়োজন বল ত?

রাজার ছেলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলছিল। ছেলেদের খুঁজে বার করতে তাকে ভারী বেগ পেতে হচ্ছিল। এক জন কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল, সে বল্লে, "ছেলেগুলোকে খুঁজে তুমি হয়রাণ হচ্ছ কেন? তুমি রাজার ছেলে, হুকুম করলেই তো সব এক জায়গায় এসে জড় হয়।" তার জবাব হচ্ছে, তা করলে আর খেলায় মজা থাকে না। তাই রাম বলছেন, তুমিই দীনদুনিয়ার মালিক, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বময়; কিন্তু পণ করে যখন চোর হয়ে তোমার প্রজাদের খুঁজে বের করতে নেমেছ (জাগতিক যত ভাব আর জ্ঞান তো তোমার প্রজা বই আর কিছু নয়), গোটা জগৎটাই যখন তোমার লুকোচুরী খেলার আসর, তাহলে খেলার ঝোঁক ছেড়ে দিয়ে রাজার হুকুম জারী করে সব পণ্ড করে দেওয়া তো ন্যায়বিচার হবে না। যে ভূমিতে গেলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একাকার হয়ে যায়, সহস্র সহস্র সূর্য্য নক্ষত্র তোমারই আত্ম প্রতিবিম্বরূপে প্রতিভাত হয়, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ বলে বোধ হয়, সে ভূমিতে গিয়ে বি, এল পাশ করে ওকালতী করা আর টাকা রোজগারের ফন্দী বার করার কথা মনে থাকে কি? যদি ভাগবত দিব্যদৃষ্টি চাও, তবে যে ভূমিতে থেকে দিব্যদৃষ্টির আবদার ধরেছিলে, তা ছাড়িয়ে উঠতে হবে।

মাছ ধরতে জাল ফেলা হল। জালে মাছ পড়ল বটে, কিন্তু টানের চোটে জাল নিয়ে চল্ল হাবা। খোদার ওপর খোদকারী করতে যেও না—তোমার মতলবটা কি, কেমন করে কি করলে কি হত, এ উপদেশ তাঁকে দিতে যেও না। তাঁর পায় সব ভার সঁপে দাও, নিজের অহংটী বিসর্জ্জন দাও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনার অভিঘাতকে দলিত কর, তাতেই তোমার দেহ-মন আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে, ব্রহ্মত্ববিকাশের যোগ্য আধার হবে। খাঁটী শিক্ষা বা খাঁটী জ্ঞান হয় ভিতর

থেকে, বাইরের বই পড়ে নয় বা পরের মনের সংযোগ থেকে নয়। যাঁরা প্রতিভাশালী, যাঁরা নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়েছেন, তাঁরা যখন একাগ্র ভাবনায় সমাহিত হয়েছিলেন, তখনই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তখন তাঁরা ছিলেন ইন্দ্রিয়বোধের অতীত, তাঁদের মাঝে কামনা বা তাড়না ছিল না, মনের আনাচে-কানাচেও তাঁদের তখন একটু স্বার্থের রেশ ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি যেন স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, জ্ঞানের আলো তাঁদের অন্তর হতে স্ফুরিত হয়েই গ্রন্থরাজিকে আলোকিত করেছে ঝুড়ি ঝুড়ি কাগজ-পত্র তাঁদের এক কণিকা জ্ঞানও বাড়ায়নি।

একেই বলে কাজ। কাজ বলতে রাম গোলামের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী বোঝেন না। বেদান্ত বলে, আত্মার সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গৎ রেখে স্পন্দিত হওয়াই যথার্থ কাজ। সত্যের সঙ্গে এই স্বার্থসম্পর্কহীন মিলনানন্দকেই বেদান্ত বলেন কর্ম্ম; আর অজ্ঞেরা একেই অকর্ম্ম বা কুঁড়েমির ছাপে দাগী করতে চায়। আমার "সিদ্ধির পথ" নামের বক্তৃতাটা আবার ভাল করে পড়ে দেখো। ঠিক বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি নিতান্ত শ্রমসাধ্য একটা কাজ নিয়েও পড়, তাহলে তাতেও যেন খেলার মত আমোদ। এক দিক দিয়ে যাকে বলা হচ্ছে ঘোর কর্ম্ম, আর এক দিক দিয়ে তা কিন্তু কিছুই না। এই হচ্ছে বেদান্তের শিক্ষা।

হিন্দুর পুরাণে ভগবান্ দুরকমে চিত্রিত হয়েছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই তিনটা স্তর থাকে—একটা দর্শন, একটা আচার, আর একটা পুরাণ। দর্শন হচ্ছে পণ্ডিতের জন্য; আচার হচ্ছে দেহের জন্য, বালকদের জন্য; আর পুরাণ হচ্ছে ভাবুকের জন্য। তিনটী পাশাপাশি থাকবে। একটি যদি পিছিয়ে পড়ে, তাহলে ধর্ম্ম পঙ্গু হয়ে যাবে। হিন্দুর শাস্ত্রে এই তিনের সমন্বয় আছে বলে এখনও হিন্দুধর্ম্ম বিশকোটী লোকের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে এর এক অঙ্গ হীন, সে ধর্ম্ম খাঁটি হতে পারে না। হিন্দুতে এই তিন অঙ্গেরই পূর্ণ বিকাশ। হিন্দুর পুরাণ হতে রাম তোমাদের পুরুষোত্তমের কথা শোনাবেন। তাঁর কথা সর্ব্বদা চিন্তা করতে হবে।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মসত্তার দুটী বিভাব দেখানো হয়েছে। একরূপে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে যেন তিনি অতি শুভ্র, অনিন্দ্যসুন্দর, পরম গম্ভীর যুবা পুরুষ—হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে সমাধিমগ্ন, মুদ্রিত নয়ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, চিদানন্দঘনবিগ্রহস্বরূপ। তাঁর ক্ষোভ নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই। শুভ্র হিমাচল অর্থে প্রশান্ত, অটল মন।

এই দেবতার পাশেই তাঁর প্রিয়া, আপাদমস্তক অরুণরাগ-রঞ্জিতা পরমা সুন্দরী এক প্রতিমা। তিনি পরম পুরুষের জানু অবলম্বন করে একান্ত মনে তাঁর জন্য সিদ্ধি ঘোঁটছেন। পরম পুরুষ একবার চক্ষু মেললেন, আর অমনি সেই দেবী দিব্যমাদকতাপূর্ণ সিদ্ধিপাত্র তাঁর মুখের কাছে ধরলেন—তাই পান করে যেন তিনি আবার সমাধির কোলে ঢলে পড়েন। এই দেবতার কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে দেবী জগৎ-রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন, আর তিনি তার ব্যাখ্যা করছেন। ইনি ছিলেন রাজার মেয়ে, কিন্তু এই মুক্ত পুরুষের সঙ্গ পাবার দরুণ সব ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। এই পরম পুরুষ হিন্দুর শিব, তাঁর প্রিয়া গিরিজা। ওম্ ওম্!

———— * ————

ভোগ ও যোগ

—ঃ{*}ঃ—

ভোগ আর যোগ নিয়া দ্বন্দ্ব বহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে - প্রমাণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত সাধনপথ। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, হৃদয় দেবাসুর-সংগ্রামের রঙ্গভূমি হইয়া উঠে; ইহাও জানা কথা। সৃষ্টির গোড়াতে দেবতা ও অসুর, দুই-ই ছিল; এক পক্ষ অপর পক্ষের আন্তরিক সর্বনাশ কামনা করা সত্ত্বেও এখনও দুই-ই জগতে সমান প্রতাপে টিকিয়া আছে। মাথাগুনতি হিসাবে অসুরের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়, কিন্তু দেবতার নামে যে তাহারা আঁতে কাঁপিয়া ওঠে, এ খবরটা দেবতাদের কাণেও পৌঁছিয়াছে। তাই দেবভক্তেরা আশা করেন, এক দিন অসুরের চিহ্ন নিঃশেষ হইয়া ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। বিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্য হইতে মুখ টিপিয়া হাসেন শুধু!

অসুরের রাজা বিরোচন, আর দেবতার রাজা ইন্দ্র দুইজনই প্রজাপতির কাছে গিয়াছিলেন তত্ত্ব জানিতে। পুরাণকার বলেন, প্রজাপতি সকলেরই ঠাকুরদাদা, সুতরাং সৃষ্ট জীবমাত্রের প্রতিই তাঁহার চিত্ত একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয়শীল। আপনার বদখেয়ালটা তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিতেও কেহ ডরায় না, তিনিও কাহারও কথায় রাগ করেন না, বা নাতিদের আবদার পূরণ করিতে বিশেষ কৃপণতা করেন না। সে যাহা হউক, বেদের প্রজাপতিও কিন্তু অসুরকে খেদাইয়া দিলেন না বা দেবাসুরের মাঝে কোনও পক্ষপাতযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ। কিন্তু তত্ত্ব শিক্ষা তো অমনি হইবে না, ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। সাধনা চাই, নহিলে জ্ঞান হইবে না।" বত্রিশ বছর ধরিয়া দুইজনেই ব্রহ্মচর্য্য করিলেন, ততদিনে চুল দাড়ি নখ সব বড় বড় হইয়া গেল, চেহারা পরুষ ও রুক্ষ হইয়া উঠিল। বত্রিশ বছর পূর্ণ হইতে প্রজাপতি এক দিন তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন, "আজ তোমরা কে, তাহা চিনাইয়া দিব, দুইটী সরায় করিয়া জল লইয়া আইস।" জল আনা হইলে বলিলেন, "সরার জলে চাহিয়া দেখ দেখি।" ইন্দ্র বিরোচন নিজেদের অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, "আচ্ছা যাও, এখন চুল দাড়ি কামাইয়া স্নানটান করিয়া পরিষ্কার হইয়া আইস।" দুইজনে স্নান করিয়া আসিলে বলিলেন, "এইবার দেখ দেখি!" ইন্দ্র আর বিরোচন ছায়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ!" প্রজাপতি হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছ?" বিরোচন বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "হুঁ, হুঁ, বুঝিয়াছি।" ইন্দ্রও তাহার কথায় সায় দিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, "তবে আর কি! এখন ঘরে যাও।" দুইজনেই বিদায় হইয়া চলিয়া আসিলেন। খানিক পরে ইন্দ্রের মনে কি খটকা হইল, ফিরিয়া আসিয়া প্রজাপতিকে বলিলেন, "না, এ তো সব হইল না।" প্রজাপতি আবার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে।" এইরূপে ইন্দ্র তিনবার

বিদায় নিয়া তিনবার ফিরিয়া আসিলেন। বিরোচন দেশে গিয়া প্রচার করিল, "দেখ, আত্মাকে শুদ্ধ রাখা প্রয়োজন, নহিলে সুখ নাই। তোমরা সকলে ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, সর্ব্বদা নিজকে আরামে রাখিতে চেষ্টা করিবে। প্রজাপতির নিকট হইতে আমি এই সঙ্কেত শিখিয়া আসিয়াছি।" উপসংহারে বেদ বলিলেন, "বিরোচনের কথা শুনিয়া অসুরেরা শেষকালে দেবতাদের হাতে মারা পড়িল।"

এই কাহিনীতে ভোগ আর যোগ সম্বন্ধে দুই তরফের কথাই বেশ কৌশলে গুছাইয়া বলা হইয়াছে। প্রথম কথা এই যাহ, ভোগই বল আর যোগই বল, দুই-ই প্রজাপতির বিধান। ভোগপন্থী অসুর, আর যোগপন্থী দেবতা, দুইয়ের কাছেই তাঁহার দুয়ার খোলা। তিনি এমন কিছু বলিলেন না যে তোমাকে এই পথ ধরিতে হইবে, কি ঐ পথ ছাড়িতে হইবে। যাহার যেমন রুচি, যেমন বুদ্ধি, সে তেমন পথ বাছিয়া লইবে। দেবতা আর অসুরে পরস্পর লড়াই চলিতে পারে, কিন্তু প্রজাপতির সহিত তো কাহারও লড়াই নাই। সুতরাং জগৎটা বিচার করিতে হইলে নিরপেক্ষ থাকিয়া করিতে হইবে, কোনও মতলবসিদ্ধির জন্য একপক্ষ টানিয়া বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা, ভোগই বল, আর যোগই বল, সাধনা দুয়েই প্রয়োজন। বিরোচনকেও সাধনা করিয়া ভোগসামর্থ্য সংগ্রহ করিতে হয়। ভোগের মজা লুটিব, অথচ তাহার কড়ি দিব না, প্রজাপতির আইনে তাহা বলে না। কর্ম্ম সবার জন্যই--ভোগীর জন্যও, যোগীর জন্যও। সংযম সকলেরই প্রয়োজন, ভোগীরও প্রয়োজন। ভোগ নিবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দাও, ভোগে প্রবৃত্তি বজায় রাখিবার জন্যই যে সংযম প্রয়োজন। পশুজগতে প্রকৃতি সংযম শিক্ষার ভার নিজের হাতে রাখিয়াছেন, তাই ভোগে পশু অকালে বিধ্বস্ত হইয়া যায় না। মানুষ পশুবৃত্তি বলিয়া যাহাকে গাল দেয়, অসংযত ব্যবহারে তাহার দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ পশুকে অপবাদ দিয়া তাহার প্রতি অবিচার করে। সিদ্ধপুরুষেরা বলেন, "প্রথম জীবনে সংযম সকলেরই প্রয়োজন, নতুবা পরবর্ত্তী জীবনে ভোগও দুঃসহ হইয়া উঠে।" গুরুগৃহে দশটা ছেলে রহিয়াছে; তাহার মাঝে দশটাই যে সাধু হইবে, এমন ভরসা করা চলে না। গুরু বলেন, "যে ইহাদের মাঝে সাধু হইবে, সে পাকা সাধু হইবে, আর যে চোর হইবে, সে পাকা চোরই হইবে।" মূল কথাটা হইতেছে সংযমের শক্তি। জোর করিয়া কাহাকেও সাধু বানানো যায় না। যে ভোগী হইবে, তাহাকে ধরিয়া-বাঁধিয়া যোগী করিতে গেলে সে ভ্রষ্টাচারে যোগপন্থা কলুষিত করিবে। কিন্তু তাহার ভোগের জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও সংযমের সাধনা অতি প্রয়োজন। এই জন্য প্রাচীনকালে সার্ব্বভৌম ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। তাই বলিয়া ব্রহ্মচারী মাত্রেই শঙ্করাচার্য্য বনিয়া যাইত না। ভোগ হইতে যোগে গুণক্ষয়ের পথ ধরিয়া প্রকৃতি সকলকেই টানিয়া নিবেন। এই পথেরও একটা শাসন আছে; উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে নিজেরও কষ্ট, পরেরও কষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য সেই পথের পাথেয় সংগ্রহ করিতে শিক্ষা দেয়।

প্রজাপতি লক্ষ্য নিরূপণ সম্বন্ধে ইন্দ্র আর বিরোচনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন, কিন্তু সংযম শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও শৈথিল্য ঘটিতে দিলেন না। বেদপন্থী হিন্দুসমাজের ইহাই বিশেষত্ব, সদ্‌গুরুর আচারও এইরূপ। সে দিন কাগজে পড়িলাম, "গুরুর দশা" (উত্তরা, আশ্বিন, ১৩৩৩)—দুর্দ্দশা বলিলে আরও শোভন হইত। লেখক প্রমাণ করিতে চাহেন, হিন্দুর গুরু ভাবের ওপর জুলুমবাজী করে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করে; এই অপরাধে গুরুকে নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঠিক গুরুর পাল্লায় তিনি পড়েন নাই, পড়িলে অন্য রকম সুর বাহির হইত। শাস্ত্র বল, গুরু বল, আমরা তো জানি, ভাবের রাজ্যে সবাই আমাদের পার-পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন—যা সাময়িক বন্ধন, শুধু আচারের। তাও আচার ভাবেরই অনুবর্ত্তী। তবে তুমি নিজে যদি জড় বনিয়া যাও, বন্ধনমুক্তির জন্য যথাযথ চেষ্টা না কর, তাহা হইলে শাস্ত্রই বা তোমার কি করিবে, গুরুই বা কি করিবেন ?

সে যাহা হউক, আমাদের মূল বক্তব্য এই, পরিণাম তোমার যাহাই থাক না কেন, গোড়ায় কিন্তু সংযম চাই—এটা প্রজাপতির বিধান। ভোগীকে এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এই কাহিনীতে আর এক শিক্ষা পাইলাম, পরিণাম সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে নাই—জিজ্ঞাসাকে সদাজাগ্রৎ রাখিতে হইবে। বিরোচন মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া বসিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি"; ফলে মরণ হইল তারই। ইন্দ্র এত লোলুপ নন, একটা সমাধান পাইয়াও তাঁহার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হইল না, তাই তিনি ক্রমে আরও আগাইয়া গিয়া সোনার খনি, হীরার খনি, শেষে পরশমণিই পাইয়া গেলেন। সাধারণ লোকে আর বৈজ্ঞানিকে তফাৎ কি? সাধারণ লোকে চটপট একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক শেষ না দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তকেই পাকা করিতে চাহেন না। সাধারণ ভোগীরও ঠিক এই দশা; তার আর তর সহে না। যোগী বৈজ্ঞানিকের মত হিসাব করিয়া চলেন। সংযমী না হইলে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। ভোগেরও বিজ্ঞান আছে; একদিন এ দেশে বৈজ্ঞানিকেরা তাহা নিয়াও কম ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই। যাঁহারা এ সমস্ত নিয়া নাড়া-চাড়া করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে অসংযমী ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। অসংযম তো শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন লোকই করিতেছে। তাঁহারাও যদি সেই পথেরই পথিক হইতেন, তবে আর তাঁহাদের নূতন কথা শোনাইবার দাবী টিকে কি করিয়া? এখন মানুষের সংযম নাই, বিজ্ঞান জানিবার মত জিজ্ঞাসা নাই—আছে শুধু মূঢ়ের মত ভোগে আসক্তি; তাই কোথায়ও একটু বাধার কল্পনাতেই কলরব জুড়িয়া দেয়। ভোগীর প্রতি প্রজাপতির এই আর এক ইঙ্গিত—ভোগ কর, কিন্তু বিজ্ঞান জানিয়া করিও; তাহা হইলে ভোগের ভিতর দিয়াই যোগের সন্ধান পাইবে।

এখন শেষের কথাটা বলি। শ্রুতি বলিতেছেন, বিরোচনের বুদ্ধিতে চলিয়া অসুরেরা শেষকালে দেবতাদের কাছে হটিয়া গেল। এখন স্মরণ করিতে হইবে, দেবাসুরের মাঝে

লড়াইটা কি নিয়া। দু'জনাতেই চায় স্বর্গের দখল। স্বর্গ জিনিষটা কি? স্বর্গের যে সব দার্শনিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলাম। পুরাণাদিতে স্বর্গের যে সব স্থূল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা শুনিয়া ভোগীর রসনা রসসিক্ত হইয়া উঠে নিশ্চয়ই। দান টান করিয়া কিছু পুণ্যের পুঁজি যাগাইয়া নিয়া একবার সেখানে আড্ডা গাড়িতে পারিলে হয়! কিন্তু এই স্বর্গ নিয়া এত মারামারি করিয়াও শেষকালে কিনা সেখানে দেবতাদের দখলই কায়েম হইয়া গেল! এ কি অসুরদের পক্ষে কম আপশোষের কথা?

এইখানে ভোগ-যোগের দ্বন্দ্ব মিটিয়া গিয়াছে। অনাদি অনন্ত ভোগভূমির আধিপত্য তোমারই, যদি তুমি দেবতা হইতে পার, যোগী হইতে পার। সংযমের শুষ্কতাকেই জীবনের চরম পরিণতি মনে করাও মূঢ়তা। ভোগ তোমার চরম সিদ্ধি; কিন্তু অসুরের মত অর্জ্জিত হইলেই তাহা তোমার বিনাশের কারণ হইবে। ভোগ ও যোগে সমন্বয়-সূত্রই হইল সংযম সংযমের সাধনা পরিণামে আনে নির্লেপ। চিত্ত নির্লিপ্ত হইলে ভোগায়তন আপনা হইতেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে—চতুর্ব্বর্গ করামলকবৎ প্রতিভাত হইবে। ভাগবত ভোগই আদর্শ—উহার মর্ম্মরহস্য নির্লিপ্ততা। এই রূপ রসের ডালা সাজাইয়া প্রকৃতি অনাদিকাল হইতে কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন?—সেই পরম পুরুষের। ভোলানাথের স্তিমিত লোচন হইতে অনুরাগের সুষমা একবার যদি তাঁহার পদ্মপলাশলোচনের উপর ঝরিয়া পড়ে, তবেই তাঁহার বসন্ত-পুষ্পাভরণের সজ্জা সার্থক হইয়া উঠিবে যে।—যাচিয়া তিনি সেখানে ধরা দিবেন। আর ভোগমত্ত অসুরের প্রতি তাঁহার শ্লেষোক্তি—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

অসুর রুখিয়া বলে, "সেই দুর্ব্বিনীতাকে কেশাকর্ষণ-বিহ্বলা করিয়া লইয়া আয়!"—কিন্তু দেবীর রোষদীপ্ত নয়নের বজ্রবহ্নিতে নিমেষে সে ভস্মমুষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়।



প্রেমের অদ্বৈত

এ কথা বার বার বলিয়াছি, প্রেম বা ভক্তি দ্বিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু তাহার সহিত এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই দ্বৈত অদ্বৈতেরই লীলাভঙ্গী। স্থূল মিলনই বল, আর বিরহের আকারে সূক্ষ্ম মিলনই বল, দুইয়ে এক হয়, অদ্বৈতের এই অপরূপ ও অচিন্ত্য বিলাসই হইল আনন্দের প্রস্রবণ। অদ্বৈত শুধু জ্ঞানের একচেটিয়া নহে, তাহা ভক্তিরও পরমোৎকর্ষ; অথবা জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই অদ্বৈত-সম্পুটিত দ্বৈতদলের দুইটী বিভাগমাত্র। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

ভক্তির লক্ষণ করিতে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।" এখানে সম্বন্ধের জৈব দিকটা নিয়াই পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহার শৈব দিকও একটা আছে। তন্ত্রে পুরাণে তাহার বিবৃতি আছে—বেদে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। গোড়ার সেই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে জ্ঞান-ভক্তির বিরোধ নিয়া আর এত মাথা ঘামাইতে হয় না।

একটা কথা আছে, ভক্তি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সমর্থন করি। সম্বন্ধই জীবের প্রাণ, শুধু জীব বলি কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উহাই মর্ম্ম-সত্তা। বৈশেষিক জগৎকে ভাঙ্গিয়া অণুপরমাণুতে পরিণত করিলেন। ভাঙ্গিবার সময় তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই, কেন না বিশ্লেষণবুদ্ধি দ্বৈতভূমিকার জিনিষ, তাহাকে নিয়া কারবার করা সহজ। কিন্তু ভাঙ্গিবার পর আর জোড়া দিবার মশলা পান না। অণুতে অণুতে জোড়া লাগিলে তবে তো সৃষ্টি হইবে। তাহার জন্য কর্ম্ম প্রয়োজন। কিন্তু প্রাণ না থাকিলে কর্ম্মে প্রেরণা দিবে কে? তাই বৈশেষিককে অদৃষ্ট, ঈশ্বরেচ্ছা ইত্যাদি প্রেরক তত্ত্ব স্বীকার করিতে হইল। বৈশেষিকের এই অদৃষ্টই সাংখ্যের প্রকৃতিবিচারে পারার্থ্য বা পরার্থা প্রবৃত্তি; বেদান্তে তাহারই পৌরুষ প্রতিরূপ সিসৃক্ষা, বাসনা বা মায়া। তন্ত্রে পুরাণে তাহাই শক্তি। বৈষ্ণবদর্শনে তাহাই ভক্তি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঔপনিষদ আদর্শ ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই ভক্তির একটা দিক মাত্র ফুটিয়াছে; তাই অদৃষ্ট, পারার্থ্য, ভক্তি প্রভৃতিতে কেবল প্রকৃতির মমতার পরিচয় পাই এবং তাহা ধরিয়াই বলি, ভক্তি জীবমাত্রেরই স্বভাব। এই মমতারই বিপরীত কোটিতে যে অহন্তার প্রতিষ্ঠা, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় শুধু বেদান্তে বা গুরুতত্ত্বে। বৈষ্ণবদর্শনের গুরুতত্ত্ববিচারে এ দিকেরও আভাস আছে।

জীব পরিমিত বলিয়া পরার্থপ্রবৃত্তা ভক্তি তাহার স্বভাব না হইয়াই পারে না। যাহা পরিমিত, তাহা অবশ্যই পরাশ্রিত; বিভুত্ব ব্যতীত কাহারও একান্ত সত্তা সম্ভবপর হইতে পারে না। জীব, অংশ বা কণা; অতএব ভক্তি তাহার স্বধর্ম্ম।

কিন্তু বেদান্ত বলেন, জীব ব্রহ্ম হইয়া যান—"ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি।" শুধু আত্মবিসর্জ্জনের দিক দিয়া নয়, আত্মপ্রসারণের দিক দিয়াও যে এই ব্রহ্মীভাবের একটা তাৎপর্য্য আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—উপনিষদে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহি-

যাছে। এই প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জগতের যে পরিধি বাড়িয়া যাইবে, তাহার সহিত জীবের কোনও সম্পর্ক না থাকুক, শবের যে সম্পর্ক থাকিবেই, তাহা তো সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়। যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনি কিসের সাক্ষী? এই প্রশ্নের উত্তরেই সম্বন্ধ তত্ত্বের আর এক দিক ফুটিয়া উঠে। বৈষ্ণবপন্থী গোঁড়ামী করিয়া তাহা দেখেন না বলিয়া বেদান্তকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চান।

এই সাক্ষি-চৈতন্য যে সর্ব্বত্র সিদ্ধ, তাহার একটা প্রমাণ দিতেছি। বিচারে নিরূপণ করিলাম, ভগবত্তত্ত্ব চরম সাধ্যাবধি। সচ্চিদানন্দ—সচ্চিদানন্দঘন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ—অনুভূতি ইহা অপেক্ষা গভীরে যাইতে পারে না। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহই ভগবান্, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানেও কথা হয়, এই ভগবান আস্বাদ্য কি না। ভক্তের সত্তা অবশ্যই ভগবানের স্বরূপ সত্তা নহে। ভগবান্ যদি আস্বাদ্য হন, তাহা হইলে যিনি তাঁহাকে আস্বাদন করেন, তিনিই তো ব্রহ্ম-স্বরূপ-সাক্ষিচৈতন্য। অনুভূতির এই পরিণতি সহজ ও স্বাভাবিক। বৈষ্ণবপন্থী মুখে এই কথা স্বীকার না করিলেও তাঁহার শাস্ত্র এই কথাই বলিতেছে। প্রেমের উৎকর্ষে ভগবান্ ক্রমে ছোট হইয়া আসেন—শেষে ভক্ত তাঁহার কাণ চাপিয়া ধরেন। এই যে লৌকিক দৃষ্টান্তের মূলে যে অলৌকিক ভাব রহিয়াছে, সংস্কারবিমুক্ত চিত্তে কেহ তাহার ধারণা করিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিবেন, প্রেমের বিকাশ অদ্বৈতে পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাৎসল্য-স্বভাব ভক্ত যেমন ভগবানকে স্বচ্ছন্দে গ্রাস করেন, বৈদান্তিকও তাহাই করেন। মধুর ভাবে বা পূর্ণ আত্ম সংমিশ্রণে ইহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয়—সেখানে জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বকে পৃথক করিবার আর কোনও উপায় থাকে না।

প্রেমের ধর্ম্মই এই, উহা শুধু একাঙ্গী আকর্ষণ নিয়া থাকিতে পারে না। যে অপরের সুখের অনুধ্যান করে, তাহার মাঝে আত্ম-পরের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। অপরত্বের অনুধ্যানে অপরত্ব প্রাপ্তি স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে শঙ্কা থাকে, অপরের তাহাতে সুখোৎপত্তি হইবে কি না। এই শঙ্কা স্বভাবতঃই আমিত্বকে জাগাইয়া রাখে। এইরূপে একের মাঝেই দুইয়ের খেলা সুরু হয়। গোপিকা কৃষ্ণসুখে সুখী। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণসুখের অনুধ্যানে তাহার তৃপ্তি হইতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের আপ্যায়ন। তাহা হইলেই গোপিকাকেও জাগ্রত থাকিতে হইবে। অথচ অহন্তার সমর্পণে কৃষ্ণসেবার আয়োজন করিতে হইবে। এই মিশ্রভাবোৎপত্তিই প্রেমের অদ্বৈত-ভূমিকা।

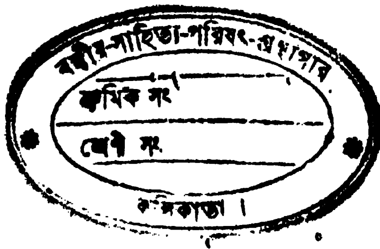
বিষয়ী অহং বিসর্জ্জন করিয়া প্রেম অর্জ্জন করিতে চাহে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অহং-এর বিনিময়ে সে পায় বিরাট্ অহং; বিষয়ের সহিত তাহার বিপরীত সম্পর্ক অর্থাৎ নির্লিপ্ততার সম্পর্ক। তাই স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয়, অহং বুঝি লয় পাইল; কিন্তু অহং লয় পায় না, বড় হইয়া মিশিয়া যায়। এই বড় হইয়া মিশিয়া যাওয়াকে জ্ঞানও বলে, প্রেমও বলে। বিশ্লিষ্টবুদ্ধিতে উহাকে আমরা চিরিয়া চিরিয়া দেখি, তাই বলি অদ্বৈতের এই জ্ঞান-বিভাব, এই প্রেম-বিভাব। কিন্তু সংশ্লেষণে এই ভেদ-জ্ঞান থাকে না অথচ তাহার আভাস বুঝি থাকিয়া যায়। তাই মর্ম্ম ব্যক্ত

করিতে না পারিয়া রসিক বলেন, অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব। ইহা বৈদান্তিকের "সদসদ্ভ্যা-মনির্ব্বচনীয়া"র প্রতিধ্বনি নয় কি? যাঁহারা এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন তাঁহারাই সখী বা বেদান্তের সাক্ষী।

প্রেমে তাঁহাকে পাইতে হইলে আত্ম সংমিশ্রণ করিতে হইবে; নতুবা শুধু বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া তাঁহাকে মাপিলে চলিবে না। তাই দেবর্ষি বলিয়াছিলেন, ভক্তি স্বয়ং ফলস্বরূপ অর্থাৎ উহা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বভাব, অন্তরের নিবিড়তম অনুভূতি—উহা স্বয়ং হেতু, স্বয়ংই ফল—কোনও পরিণামী তত্ত্ব নয়। যাহারা পরমতত্ত্বকে জানিতে গিয়া প্রাণ দিয়া বোঝে না, শুধু বুদ্ধির কালোয়াতী দেখায়, তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন, "রাজগৃহভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ—ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্ব্বা"—কেউ যদি রাজার বাড়ীর সকল খবর রাখে, তাহাতেই কি তাহার রাজার সহিত ভাব হয়? আর রাজার সহিত ভাব না হইলে কি রাজার মাঝে ভাব উদ্রিক্ত হয়? ভোজনের উপকরণ জানিলেই কি ক্ষুধা শান্তি হয়? রাজার হাতীঘোড়ার খবর রাখিলেই রাজাকে জানা যায় না। জানিতে হইলে নির্ভয়ে রাজার স্বভাবে অনুপ্রবেশ করিতে হইবে। রাজার অবোধ ছাওয়ালও তাঁহার পিতৃমর্ম্মে আঘাত দিয়া অমৃতপ্রস্রবণ বহাইতে পারে, তুমি সভাপণ্ডিত হইয়াও কিছু পাবে না। ভোজ্যের আস্বাদনে বা আত্মসংমিশ্রণে ক্ষুধা শান্তি হয়, পুষ্টি হয়—উপকরণের তালিকা জানিলে কিছু হয় না।

দেবর্ষি যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে একটী সাধ্য চেতন, অপরটী অচেতন। রাজা চেতন, তাঁহার প্রীতি উৎপাদন আমার সাধ্য; ভোজ্যও অচেতন, তদ্দ্বারা আত্মতৃপ্তি সাধন আমার সাধ্য। উভয়ত্র এক যোগ—মর্ম্মাবগাহন করা চাই। কিন্তু দুইটী দৃষ্টান্তে দুইটী স্বতন্ত্র বিভাব। প্রেমের দুইটী ভঙ্গী ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়।

দেবর্ষির চরম সিদ্ধান্ত—"তস্মাৎ সৈবা গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ"—যদি মুক্তি চাও, তাহা হইলে ভক্তিকেই আশ্রয় কর। বুদ্ধি ছাড়, মর্ম্মে পশিয়া যাও।



অভিভাষণ*

—:{*}:—

ভ্রাতৃবৃন্দ,

অদ্য শুভদিনে শুভক্ষণে এই আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্তসম্মিলনীর দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা, সৎশিক্ষা ও সত্য ধর্ম্ম-প্রচার-রূপ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার উদ্‌যাপনের জন্য আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অন্তর্গত বাঙ্গালার পাঁচ বিভাগে পাঁচটী শাখাশ্রম ও তদন্তর্গত ঋষিবিদ্যালয় ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বঙ্গের অপর চারিটী বিভাগে ক্রমশঃ চারিটী শাখাশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালায় কোন শাখাশ্রম ছিল না। আমাদের স্থানীয় গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও স্বর্গীয় প্রভাকর চৌধুরী এবং তাঁহাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চৌধুরী এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে তাঁহাদের এক খণ্ড জমি শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের নামে উৎসর্গ করিয়া তথায় আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। বর্ত্তমান আশ্রমের অনতিদূরে আর একখণ্ড জমিও ঐ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে উহা দেখান হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ভূমি বর্ত্তমান আশ্রমক্ষেত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ত্তমান ভূমিখণ্ড আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য উঁহারা রেজেষ্টারি কৃত দলিলের দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে উঁহাদের ও স্থানীয় অপরাপর ভক্তগণের উদ্‌যোগে ও চেষ্টায় এই স্থা আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম হইতেই শ্রীমৎ কুমার চিদানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। অন্য কোনও জেলার ভক্তবৃন্দের মধ্য হইতে পশ্চিম বাঙ্গালা বিভাগে আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব না হওয়ায় এবং স্থানীয় ভক্তগণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া জমি দিতে স্বীকৃত হওয়ায় এই স্থান দূরবর্ত্তী হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ এইখানে বিভাগীয় আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। দূরবর্ত্তী হইলেও এইস্থান আশ্রম প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত বটে। স্থানটী অতিশয় উন্মুক্ত ও উচ্চ; এখান হইতে পল্লী অনেক দূরে, তজ্জন্য ঋষিবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের ও ব্রহ্মচারিগণের কুসংসর্গে দূষিত হইবার সম্ভাবনা খুব কম। অধিকন্তু পশ্চিম বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় ভক্তের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকায় ঐ জেলার অন্তর্গত এইস্থানে বিভাগীয় আশ্রম-প্রতিষ্ঠা হইবার দাবীও অনেক। এই আশ্রমপ্রতিষ্ঠার কার্য্যে স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, স্বর্গীয় প্রভাকর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পাল, শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ পাল ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ খাঁড়া অর্থে ও সামর্থ্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ও

---

* পশ্চিম-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ১২শ বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল্ কর্ত্তৃক পঠিত।

করিতেছেন। এই জন্য তাঁহাদের সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। প্রভাকর চৌধুরী আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। তিনি গত চৈত্র মাসে আমাদিগকে ছাড়িয়া ইহলোক পরিত্যাগ করায় আমরা সকলে বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়াছি; তাঁহার অকাল মৃত্যুতে এই আশ্রমের উন্নতির পক্ষে অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

গত মাঘ মাসে হাওড়া হইতে হাওড়া জেলার সদস্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দাস ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র এবং তমোলুক হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ বসু ও আমি এখানে আসিয়া সাধারণের নিকট আশ্রমের উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য স্থানীয় জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত রাম-নারায়ণ তেওয়ারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা আহ্বান করিয়া আশ্রমের উদ্দেশ্য সাধারণের নিকট প্রচার করি। সেই অবধি স্থানীয় জনসাধারণ এই আশ্রমের দিকে অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

ভক্তগণের নিকট হইতে ও সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই আশ্র-মের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। স্থানীয় ভক্তগণ অনেক অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন —তন্মধ্যে স্বর্গীয় প্রভাকর চৌধুরীর সাহা-য্যের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অর্থ-সংগ্রহ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ শ্রীমৎ কুমার চিদানন্দ ও স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পাল, তমোলুকের ভক্ত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মাইতি ও শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ বসু, হাওড়ার ভক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ফণি-ভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান জেলার সদস্য শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বীরভূম জেলার সদস্য শ্রীযুক্ত করুণাসিন্ধু পরামাণিক অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য ইঁহারা সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। হুগলি জেলার সদস্য শ্রীযুক্ত .... অপরের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ না করি-লেও নিজে ১০০৲ টাকা দিয়াছেন ও আরও ৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। বাঁকুড়া জেলার সদস্য নানারূপ সাংসারিক বিষয়ে বিব্রত থাকায় এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা কার্য্যে কোন সহায়তা করিতে পারেন নাই। আমরা আশা করি এই আশ্রমের উন্নতির জন্য তিনি ভবিষ্যতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

এই আশ্রমের কার্য্য এখনও আমাদের সঙ্কল্প অনুযায়ী সম্পন্ন হয় নাই। ঋষি বিদ্যা-লয়ের ঘর, সেবাশ্রমের ঘর, একটি উপযুক্ত পাকের ঘর ও একটী বৃহৎ কূপ খনন করিয়া এইখানে ঋষি-বিদ্যালয় ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইবে। অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীর থাকিবার জন্য একটী ভাল গৃহের আবশ্যক। এই সমুদয় কার্য্য সমাধা করিতে অনেক চেষ্টা ও অর্থের প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের কৃপা এবং ভক্তবৃন্দের চেষ্টা ও সাধারণের সহানুভূতি আমাদের ভরসা।

ভ্রাতৃবৃন্দ! কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা এই শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের চরণতলে এখানে সমবেত হইয়াছি, এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই, ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তি দেখাইতে হইলে আমাদের প্রত্যেককে বাহ্যতঃ তাঁহার সেবায়

যত্নবান্ হইতে হইবে, কিন্তু উহা গুরুভক্তির একাঙ্গ মাত্র; তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই সম্পূর্ণরূপে গুরুভক্তি প্রদর্শিত হয়। তাঁহার উপদেশ অনুসারে আমাদিগকে চতুর্ব্বিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং উহা সমাধা করিতে পারিলেই প্রকৃত গুরুভক্তি দেখান হইবে। এ চারিটী কার্য্য এই—

(১) সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা।
(২) আত্ম-গঠন।
(৩) গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।
(৪) জগতের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান।

আমরা শ্রীগুরুর এই চতুর্ব্বিধ উপদেশ পালন ও তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছি। ময়নামতী আশ্রমের ভক্তসম্মিলনীর প্রস্তাব অনুসারে আমরা সমুদয় শিষ্যবর্গ শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসঙ্ঘ এই সমষ্টি নামে অভিহিত। শিষ্যগণের বাসস্থান বা কর্ম্মস্থান অনুসারে উক্ত শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসঙ্ঘ পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা—

পূর্ব্ববঙ্গ বা চট্টগ্রামবিভাগের অধিবাসী শিষ্যগণ পূর্ব্ববাঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসঙ্ঘ নামে, মধ্যবঙ্গ বা ঢাকা বিভাগের শিষ্যগণ মধ্যবাঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসঙ্ঘ নামে, উত্তর বাঙ্গালা বা রাজসাহী বিভাগের শিষ্যগণ উত্তর বাঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসঙ্ঘ নামে, দক্ষিণ বাঙ্গালা বা প্রেসিডেন্সি বিভাগের শিষ্যগণ দক্ষিণ বাঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসঙ্ঘ নামে এবং পশ্চিম বাঙ্গালা বা বর্দ্ধমান বিভাগের শিষ্যগণ পশ্চিম বাঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসঙ্ঘ নামে অভিহিত।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ উপদেশ পালনের জন্য আমরা উক্তরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছি। এখন কিরূপে প্রথম উপদেশ অর্থাৎ সঙ্ঘশক্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। মুখে সঙ্ঘবদ্ধ হও বলিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, কার্য্যতঃ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই সঙ্ঘ শক্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র মূল মন্ত্র ভক্তগণের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম প্রতিষ্ঠা। আমরা এক গুরু-পিতার সন্তান, আমাদের প্রতি উপদেশ এক, শিক্ষা এক, আমাদের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আমাদের গতি এক—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিংসা দ্বেষ পরিহার করতঃ অদোষদর্শী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃজ্ঞানে যদি ভালবাসিতে শিখি, তাহা হইলে আমাদের সঙ্ঘশক্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। "সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে" অর্থাৎ এই কলিযুগে অল্প বীর্য্যবান্ ব্যক্তিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য না করিলে কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবপর নহে। সকলের ভিতর সকল শক্তি, সকল সদ্গুণ, সকল স্বভাব থাকে না। সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে যাহার যাহা অভাব আছে, অপরের নিকট হইতে তাহা পাওয়া যায়। কাজেই আমাদিগের নিজের কল্যাণের জন্য গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সংঘবদ্ধ হইতে কৃত-সঙ্কল্প হইতেই হইবে।

দ্বিতীয় কার্য্য—আত্ম-গঠন। মানুষ আপনাকে গঠন না করিলে তাহার দ্বারা অপরের হিতসাধন ত দূরের কথা, তাহাঁর নিজের হিতসাধনেরও কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা প্রকৃতিবশে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও রিপুগণের দাস হইয়া আছি। ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতার কথা ধরিলে মনুষ্যের সহিত পশুর কোন পার্থক্য

নাই। তবে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়?—শম, দম, অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও রিপুগণের দমনই মানুষের মনুষ্যত্ব। ঐ সমুদয় দমন করিয়া করুণা, মুদিতা, মৈত্রী, উপেক্ষা, এই চারি গুণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ হয়। অদোষদর্শী হইয়া সকলের প্রতি সাধ্যমত দয়া প্রকাশ করার নাম করুণা, সর্ব্বাবস্থায় হৃষ্টচিত্ত থাকার নাম মুদিতা, হিংসা দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক সকলের প্রতি বন্ধুত্ব স্থাপনের নাম মৈত্রী এবং ক্ষমা অভ্যাসের নামই উপেক্ষা। এই চারি গুণ প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই আত্মগঠনের ভিত্তি স্থাপন হইবে। আমরা আত্মগঠনে যত্নবান না হইলে আমাদের শ্রীগুরুর চরণ আশ্রয় করা বৃথা এবং আমাদের দ্বারা আমাদের নিজ কল্যাণসাধনের বা জগতের হিতসাধনের কোন আশা নাই। সেই জন্য আমাদের এই সারস্বত-সংঘের প্রত্যেককে আত্ম গঠন সম্বন্ধে বিশেষরূপে যত্নবান্ হইতে হইবে।

তৃতীয় কার্য্য—গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা। গৃহস্থ শিষ্যবর্গকে গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যত্নবান্ হইবে। গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠার অর্থ কি?—আমরা যে পরিবারবর্গের মধ্যে আছি, সেই পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ ও পুত্র-কন্যায় পূর্ব্বের উল্লিখিত মত চরিত্র গঠিত হইলে গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিবারের প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে যদি ভগবদ্ভক্তি, স্বার্থত্যাগ, উদারতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা ও কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ বিরাজ করে, তাহা হইলে সেই সংসার শান্তির আলয় এবং তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল করায়ত্ত।

চতুর্থ কার্য্য—জীবহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান।

ভগবান্ জগৎরূপে বিরাজিত আছেন। সুতরাং জগতের হিত ও জীবের হিতসাধন করা তাঁহার অতি প্রিয় কার্য্য। এ বিষয়ে সকল ধর্ম্ম একমত। জগতের হিত ও জীবের হিতসাধনই সেবাধর্ম্ম নামে অভিহিত। জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। সেই জন্য মানবের হিতসাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবাধর্ম্ম। এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কি প্রকারে মানবের হিতসাধন করা যাইতে পারে। শ্রীগুরুর আদেশে আমরা বেশ বুঝিয়াছি, মানুষকে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করাই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকর কার্য্য। ক্লিষ্ট ও রুগ্নের সেবা করাও সেবাধর্ম্ম বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা ব্যক্তিগত উপকার সাধিত হয় মাত্র—কিন্তু মানুষকে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে তাহার নিজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় এবং তিনি যে সংসারের, যে দেশের ও যে সমাজের লোক, তাঁহার উচ্চ আদর্শে ও সৎচেষ্টায় সেই সংসারের, সেই দেশের, সেই সমাজের লোকসকল সংশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সংসার, দেশ ও সমাজকে পবিত্র করিয়া তোলে এবং জগতের মহামঙ্গল সাধিত হয়। এই জন্য মানুষকে সংশিক্ষায় শিক্ষিত করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবাধর্ম্ম। সেই জন্যই পরমারাধ্য পূজ্যপাদ গুরুদেব সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য "ঋষি-বিদ্যালয়" স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন এবং আমাদিগকে এই কার্য্যে উদ্‌যোগী হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। সেই সঙ্গে আর্ত্ত-ক্লিষ্টের সেবার জন্য সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করাও আমাদিগের অপর লক্ষ্য। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত

চতুর্ব্বিধ উপদেশ শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে ও জগতে প্রচারিত হইয়া যাহাতে তদনুসারে কার্য্য হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার অন্তর্গত বঙ্গের পাঁচটী বিভাগে পাঁচটী শাখাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহাতে পূর্ব্বোক্ত মঠ ও শাখাশ্রমগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ যত্নশীল ~~হইতে~~ হইবে। এখনও সকল শাখাশ্রমে ঋষি বিদ্যালয় বা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কোন কোন শাখাশ্রমে হইয়াছে। যাহাতে অচিরে প্রত্যেক শাখাশ্রমে ঋষি বিদ্যালয় ও সেবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়া শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আদেশ মত সৎশিক্ষা বিস্তার ও আর্ত্ত-ক্লিষ্ট ও রুগ্নের সেবা হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের সকলকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এখানে একটী বিষয় আমাদের অত্যন্ত লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। যদিও ভক্তগণের কার্য্যের সুবিধার জন্য পাঁচটী বিভাগে পাঁচটী শাখাশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে, তাই বলিয়া আমরা পৃথক নহি। আমরা এক, এ কথা সকলকে অনুক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। যদি আমরা বিপরীত ভাব পোষণ করি, তাহা হইলে আমাদের শ্রীগুরুর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ তাঁহার মঠ ও শাখাশ্রম পরিচালন-ভার তাঁহার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের এবং গৃহী শিষ্যগণের উপর দিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহীর সম্মিলনে এক অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহীর কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহারা পরস্পর পরস্পরের রক্ষক ও সহায়কারী। আশ্রমের সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ ও ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ তাঁহাদের উচ্চ চরিত্র স্বার্থত্যাগ ও সদুপদেশের দ্বারা সৎপথে ও গুরুর ভাবে টানিয়া রাখিবেন এবং গৃহিগণ অর্থে ও সামর্থ্যে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবর্গের সেবা করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইলে তাহা নিবারণের জন্য ভালভাবে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। ভ্রাতৃগণ! একবার কল্পনার চক্ষে দেখ দেখি যখন শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের পূর্ব্বকথিত ভাব জগতে ও সমাজে প্রচারিত হইয়া সকলে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহীর সংমিশ্রণে পূর্ব্বের লিখিত মত সমাজ গঠিত হইবে, তখন কি আনন্দের কি শান্তির দিন আসিবে।

পরিচালক সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ ও ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ এবং গৃহী সদস্যবর্গকে একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। সে কথা এই, যদ্যপি উঁহাদের মধ্যে কাহারো হৃদয়ে যোগ্যতা বা প্রাধান্যের অভিমান প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা শ্রীগুরুর কার্য্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইবে। দাস্যভাবে এবং শিষ্যবর্গের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিমান হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধ্যমত কার্য্য করিলে শ্রীগুরুর দেওয়া ভার প্রতিপালন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভের উপায় কি? সকল সাধু সঙ্কল্পের সিদ্ধিদাতা, জগতের ও জীবের একমাত্র সুহৃদ ও রক্ষাকর্ত্তারূপে যিনি বিরাজিত আছেন সেই ভগবানের কৃপা ও তাঁহার নিকট হইতে শক্তি লাভ

ব্যতীত সিদ্ধির আশা নাই এবং তাঁহার কৃপা লাভ করিতে হইলে তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে যত্নশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ আমাদের হিতার্থে আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ ভগবানরূপে বিরাজিত। যদি আমরা তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি রাখিয়া তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ প্রতিপালনে কৃতসঙ্কল্প হই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই গুরুশক্তি ও ভগবৎশক্তি লাভ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্তমত সকল কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আমাদের চাই, শ্রীগুরুর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি ও তাঁহার আদেশ পালনে ব্যগ্রতা ও তৎপরতা। ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ডাকে এই শুভদিনে শুভক্ষণে এই শুভ আনন্দ সম্মিলনীতে সমবেত হইয়াছি। আমরা কি লইয়া বাটী ফিরিব? "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব,ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব"—শ্রীগুরুর প্রতি এই ভাব লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তিনি যাহাতে আমাদের ভিতর শক্তি সঞ্চার করেন এবং তাঁহার শক্তিতে তাঁহার প্রদর্শিত কার্য্যে আমরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতে করিতে স্বীয়ভবনে প্রত্যাগমন করিব এবং তাঁহার আদেশমত কত দূর কার্য্য করিলাম তদ্বিষয়ে মাঝে মাঝে হিসাব-নিকাশ করিব ও আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিব।

ভ্রাতৃগণ! আমরা অর্থের অসাচ্ছল্য-প্রযুক্ত এবং স্থানাভাববশতঃ আপনাদের সকল সুবিধার বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই, সে জন্য আপনাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে, কিন্তু আপনারা ভ্রাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আপনাদের নিকট এই সানুনয় প্রার্থনা।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ওঁ শান্তিঃ



অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি

[সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী]

প্রমেয় সিদ্ধ করিবার জন্যই প্রমাণের লক্ষণ করা প্রয়োজন। ["মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ" অথবা প্রমেয়ের সিদ্ধি প্রমাণের সিদ্ধির উপর নির্ভর করে, ইহা ন্যায়ের একটী মূল তত্ত্ব। ন্যায়দর্শনকে যদি তত্ত্বাবধারণের প্রাথমিক বা গৌণ প্রয়াস বলা যায়, তাহা হইলে প্রমাণ সিদ্ধির অত্যাবশ্যকতা শুধু ন্যায়ে কেন, যে কোনও দর্শনে সমভাবে আদরণীয়। প্রমেয়ের সত্তা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও প্রমাতার প্রমাণ-প্রয়োগের উপর তাহার উপলব্ধি নির্ভর করে, ইহা শুধু দর্শনের নয়, কার্য্যসাধনারও একটী মূল নীতি। এই নীতি অনুসরণ করিয়া দর্শনকে ফলিত করিবার উদ্দেশ্যেই আচার্য্য বিস্তৃতভাবে প্রমাণের বিচার করিয়াছেন। অধ্যাত্ম সাধনাতেও আমাদিগকে প্রমেয়-সিদ্ধি অপেক্ষা প্রমাণশুদ্ধির দিকেই প্রথমে বিশেষ জোর দিতে হইবে।]

প্রমেয় দুই প্রকার—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। [ইহা পরিণামবাদের কথা এবং সাংখ্যের বিশেষত্ব। সাংখ্যের মতে সত্ত্বাদানের বিনাশ অসম্ভব, তবে তাহার তিরোভাব বা অদর্শন সম্ভব বটে। সেইজন্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়কেই তুল্যভাবে বাস্তবকোটীতে স্থাপন করিয়া আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।] পৃথিবী প্রভৃতি প্রমেয় ব্যক্ত, কেন না ধূলিলাঞ্ছিতচরণ কৃষকও স্বরূপতঃই তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে যে পূর্ব্ববৎ অনুমানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সহায়ে ধূমদর্শন দ্বারা বহ্নির অনুমান করাই বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। [বহ্নি ও ধূমের সহচার পূর্ব্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সেই পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানকে যে অনুমানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বিষয়ের অনুমিতি করিতে হয়, তাহাকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলা যায়। এই পূর্ব্ববৎ অনুমান ও প্রত্যক্ষ, দুইটী প্রমাণই আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য।] যে সমস্ত প্রমেয় ইহাদের সাহায্যে অধিগত হইতে পারে, তাহাদিগকে বুঝাইতে শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। যে বিষয় লোকে সহজে বুঝিতে পারে না, তাহাকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্র। সুতরাং শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য প্রমেয় বুঝাইবার জন্য কোন্ প্রমাণ সমর্থ, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-সমূহ হইতে আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। কারিকাকার নিম্নলিখিত কারিকায় তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং-
প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষ-
মাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

—সামান্যতোদৃষ্ট (এবং শেষবৎ) অনুমান হইতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতীতি হইয়া থাকে। তাহাতেও যে বিষয় সিদ্ধ হয় না, পরোক্ষ থাকিয়া যায়—আগম হইতে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কারিকাতে যে "তু" শব্দ রহিয়াছে (সামান্যতস্তু), তাহা দ্বারা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানকে প্রত্যক্ষ ও পূর্ববৎ অনুমান হইতে পৃথক করা হইল। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষ প্রভৃতি সাংখ্যোল্লিখিত অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রতীতি বলিতে অধ্যবসায়কে বুঝায়—আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, চৈতন্য বুদ্ধির ছায়াপাতই প্রতীতি।

[অধ্যবসায়, প্রতীতি বা জ্ঞানের এই ধারণাটী সাংখ্যের বিশেষত্ব। চৈতন্য প্রকাশক, অতএব নিষ্ক্রিয়। চৈতন্য নিত্যও বটে। যাহা নিষ্ক্রিয় অথচ নিত্য, তাহা অবশ্যই বিভু অর্থাৎ দেশ দ্বারা অনির্দ্দেশ্য। তাহা হইলে জীবমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ হয় না কেন? তাহার কারণ বুদ্ধির পরিচ্ছেদ। বুদ্ধি শুদ্ধসত্ত্ব—চৈতন্যবৎ প্রোজ্জ্বল। কিন্তু আত্মব্যক্তিত্বের আভাস তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট। আত্মব্যক্তিত্বের মূলে কর্ম্ম ও তজ্জনিত অদৃষ্ট সংস্কার। এই অদৃষ্ট-সংস্কারযুক্ত যে শুদ্ধ সাত্ত্বিক স্ফুরণ, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। কিন্তু বুদ্ধিও পরিণামিনী, অতএব চৈতন্যের অপেক্ষা রাখে; নিরপেক্ষ হইলে পরিণাম সম্ভবপর হইত না। বুদ্ধির পরিণামও স্বতঃ অনুভূত। বুদ্ধির পরিণাম তাত্ত্বিক; কিন্তু অপেক্ষিত চৈতন্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি প্রকার? বুদ্ধি চৈতন্যেরই আভাস, অতএব তাহার তাত্ত্বিকতা চৈতন্যে প্রাতিভাসিক মাত্র। অর্থাৎ বৌদ্ধদৃষ্টিতে যাহা তাত্ত্বিক, চৈতন্যের দিক হইতে তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র—দর্শনের ইহাই মূল কথা। প্রতিবিম্বও তত্ত্ব বলিয়া প্রাতিভাসিত হইতে পারে না, যদি তাহার পশ্চাতে বিম্বের সত্তা না থাকে। পুরুষসিদ্ধি এই জন্যই সপ্রয়োজন ব্যষ্টি অনুভূতিতেও উহা সিদ্ধ। পুরুষতত্ত্বে আমরা ইহার বিস্তার করিব। আপাততঃ আমাদিগকে এইটুকু বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, আমাদের প্রতীতি মাত্রেই চৈতন্য দ্বারা উদ্ভাসিত বুদ্ধির পরিণাম মাত্র।

[এই যে অতীন্দ্রিয় পদার্থ শাস্ত্র আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন বলিতেছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? বুদ্ধির কারণ প্রকৃতি, পুরুষ তদূর্দ্ধে। সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতেই দেখিতে পাইতেছি, প্রকৃতি কিম্বা পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে হইলে বুদ্ধির বিসদৃশ পরিণাম থাকিতে তাহা সম্ভবপর নয়। সমাহিতবুদ্ধি স্বকারণে লীন, সুতরাং তত্ত্বদর্শন করাইবে কে? এই জন্যই প্রকৃতি অব্যক্ত, পুরুষ দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু শাস্ত্র এইটুকু করিতে পারেন যে আমাদিগের বুদ্ধিকে তিনি প্রকৃত্যভিমুখী বা পুরুষাভিমুখী করিয়া দিয়া সমাধিসংস্কারযুক্ত বা বিবেক-সংস্কারযুক্ত করিয়া দিতে পারেন। তাহাতে প্রকৃতি পুরুষের অবিসম্বাদী বুদ্ধির পরিণাম উৎপন্ন হইয়া চৈতন্যে প্রতিফলিত হইবে। উহাদের সামান্যতঃ জ্ঞান জন্মাইতে পারে। অতীন্দ্রিয়ের প্রতীতি দ্বারা ইহাকেই আচার্য্য লক্ষিত করিতে চাহেন। বাস্তবিক শাস্ত্র বা উপদেশের সীমাও এই পর্য্যন্ত। অবাঙ্মানস গোচর তত্ত্ব বাক্য ও মন দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, কিন্তু সাধু-শাস্ত্রের উপদেশে বুদ্ধিকে তদুন্মুখী করিয়া তাহার আভাস অনুভব করা যাইতে পারে।]

এখানে যে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের কথা বলা হইল, ইহা উপলক্ষণ মাত্র—বস্তুতঃ সামান্যতোদৃষ্টের ন্যায় শেষবৎ অনুমানকেও

অব্যক্ত তত্ত্ব-প্রতীতির অনুকূল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যা কিছু অতীন্দ্রিয়, তাই কি সামান্যতো-দৃষ্ট বা শেষবৎ অনুমান দ্বারা প্রতীত হয়? এমনও তো অতীন্দ্রিয় বিষয় রহিয়াছে, যেখানে কোনও অনুমানেরই প্রবৃত্তি হইতে পারে না—যেমন মহদাদির আরম্ভক্রম, স্বর্গ, অপূর্ব্ব, দেবতা ইত্যাদি। [মহদাদি ক্রমে সৃষ্টি ব্যবস্থা হইয়া থাকিলে পাই আদিতে বুদ্ধি, অন্ত্য ভূত; এখন প্রশ্ন এই, শুদ্ধসত্ত্ব ক্রমে ঘনীভূত হইয়া জড় উৎপত্তি হইল, না জড় ক্রমে সমুজ্জ্বল হইয়া বুদ্ধির উদ্ভব হইল? কোনটাকে আদি ধরিব, ইহা একটা সমস্যা বটে। আমাদের পরিণামবাদ বলে, বুদ্ধি হইতে জড়ভূত, এই ক্রমই শাস্ত্রসম্মত। পাশ্চাত্য Evolution-বাদ ইহার বিপরীত পক্ষ সমর্থন করে। অনুমান দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা হয় না, কেননা, এখানে নিরূপিত লিঙ্গ কোথায় যে অনুমান করিব?

[যজ্ঞ করিতে হয়, উদ্দেশ্য স্বর্গ লাভ। স্বর্গ যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? কর্ম্ম করিলাম, অমনি তাহা নষ্ট হইয়া গেল; সময়ান্তরে তাহার কার্য্য-জননশক্তি কোথায় থাকে? না থাকিলেও বা কর্ম্মভোগ কি করিয়া উৎপন্ন হয়? এই জন্য মীমাংসক অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট (Potentiality) স্বীকার করেন। কিন্তু তাহার প্রমাণ কি?, অনুমান করিব, এমন লিঙ্গ এখানেও নাই। দেবতা আছে, কি করিয়া বুঝিব? এই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা মানবীয় ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি দ্বারা হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই এখানে ব্যর্থ। এই জন্যই কারিকাকার বলিলেন, সামান্যতো-দৃষ্ট বা শেষবৎ অনুমান দ্বারা যেখানে বস্তুসিদ্ধি হয় না, সেখানে আগমবলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। খাঁহুরা প্রজ্ঞা ছাড়া আগমের স্ফূর্ত্তি হয় না। সুতরাং সাধারণ ভূমিকার মানুষের কাছে উহা অত্যাশ্চর্য্য ছাড়া কিছুই নয়। তাই কেহ তাহাতে অবিশ্বাস করে, কেহ বা গাঁজাখুরী বলিয়া উড়াইয়া দেয়। শুধু হিন্দুর ধর্ম্ম নয়, জগতের সকল ধর্ম্মেরই এই অবস্থা।]

উক্ত কারিকাতে "তস্মাদ্" এইটুকু বলিলেই হইত। কিন্তু "চ"কারের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায় যে অনুল্লিখিত শেষবৎ অনুমানের সমুচ্চয়ও কারিকাকারের অভিপ্রেত।

[পূর্ব্বপক্ষী সমস্ত কথা মানিয়া লইয়াও বলিতেছেন, | "আচ্ছা, না হয় তাহাই হইল, [অর্থাৎ যেখানে প্রত্যক্ষ ও পূর্ব্ববৎ অনুমান খাটে না, সেখানে সামান্যতোদৃষ্ট বা শেষবৎ অথবা আগম প্রমাণই না হয় খাটিল।] কিন্তু আকাশের ফুল, কাছিমের লোম, খরগোষের শিং—এগুলি কখনও প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া, বুঝিতে পারি, আসলেই জিনিষগুলি নাই। তোমার প্রকৃতি পুরুষাদি তত্ত্বও যদি আসলেই না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সামান্যতো-দৃষ্টাদি প্রমাণ দ্বারাই বা কি করিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধ করিবে?

[ইহার উত্তরে উত্তরপক্ষী বলিতেছেন, নাই বলিয়াই যে দেখা যায় না, তাহা নয়; অন্যান্য-কারণেও তো দেখা না যাইতে পারে।]

অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতা-
ন্মনোহনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদ্ অভিভবাৎ
সমানাভিহারাচ্চ ॥ ৭ ॥

—অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, মনের অনবধান, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, পরস্পর সম্মেলনহেতুও (বিষয়ের অনুপলব্ধি হইতে পারে।)

"অনুপলব্ধ হইতে পারে" এই কথাটুকু পরের কারিকাতে আছে—সিংহাবলোকিত ন্যায়ানুসারে বর্তমান কারিকায় তাহাকে জুড়িয়া অন্বয় করিতে হইবে। [সিংহ যেমন কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার পেছনে ফিরিয়া তাকায়, সেইরূপ যে কথাটা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলা হইয়াছে, তাহাকে পূর্ববর্তী শব্দের সহিত অন্বিত করাকে সিংহাবলোকিত ন্যায় বলে।

[কারিকার উল্লিখিত অপ্রত্যয়ের হেতুগুলি একটী একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।] আকাশে পাখী উড়িয়া যাইতেছে। পাখীটা আছে, কিন্তু তথাপি **অতি দূরত্ব** হেতু প্রত্যক্ষ হইল না। চোখে কাজল দেওয়া হইল, কিন্তু **অতি নিকটে** বলিয়া তাহা দেখা গেল না। কারিকাতে শুধু সামীপ্য আছে—কিন্তু তাহার সহিত "অতি" যোগ করিয়া লইতে হইবে। **ইন্দ্রিয়ের অভাব,** যেমন অন্ধত্ব, বধিরত্ব—অন্ধ যেমন আলো দেখে না, বধির শব্দ শোনে না। প্রবল চিত্তবিকার দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে বলিয়া, অতি উজ্জ্বল আলোকস্থ বস্তুও কেহ কেহ দেখিতে পায় না, বুঝিতে হইবে **মনঃসংযমের অভাবই** অপ্রত্যয়ের হেতু। পরমাণু ইন্দ্রিয়ের নিকটে রহিয়াছে, তুমি মনঃসংযোগ করিয়াও তাহা দেখিতে পাও না, কেননা উহা **অতি সূক্ষ্ম**। রাজবাড়ীতে গিয়া রাণীকে দেখিতে পাওয়া গেল না, কেননা তিনি দেওয়ালের **আড়ালে** রহিয়াছেন। দিনের বেলায় গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কেন না সূর্য্যের আলোতে তাহাদের আলোক **অভিভূত** থাকে। বৃষ্টির জল পুকুরে পড়িলে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেন না উহা এক সা হইয়া **মিশিয়া যায়**।

এখানেও একটা "চ" আছে। তাহাতে বুঝিতে হইবে, কারিকাকার যাহার উল্লেখ করেন নাই এমন হেতুও সম্ভব হইলে সমুচ্চয় করিতে হইবে। তাহা হইলে অনুৎপত্তি হেতুও প্রত্যয়ের অভাব স্বীকার করা যাইতে পারে। যেমন দুধের অবস্থায় দধির **অনুৎপত্তি** হেতু দুধে দধি দেখা যায় না। (সাংখ্যের পরিণামবাদ।)

আসল কথাটা হইল এই। প্রত্যয়ের অভাব হইলেই বস্তুর অভাব হয়, এ কথা বলিলে বাড়াইয়া বলা হয়। তাহা হইলে একজন লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া আর যখন ঘরের লোকদের দেখিতে পায় না, তখন কি সে ধারণা করিবে যে ঘরে লোক নাই? তাহা তো হয় না। যেখানে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা ছিল, সেখানে যদি প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলেই অভাব নিশ্চয় হয়। অর্থাৎ থাকিলে দেখা যাইত, কিন্তু দেখা যাইতেছে না, অতএব নাই—এ যুক্তি খাটে। প্রকৃতি পুরুষ তো প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, অর্থাৎ থাকিয়াও তোমার লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না; সুতরাং লৌকিকদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া যে নাই সিদ্ধান্ত করিতেছ—ইহা তো প্রামাণিকের মত যুক্তি করা হইল না।

——✻——



ভক্তসম্মিলনী

—:*:—

গত ১১ই পৌষ রবিবার হইতে ১৩ই পৌষ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিনত্রয় পশ্চিম বাঙ্গালা (মেদিনীপুর—খড়কুশমা) সারস্বত আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ১২শবার্ষিক অধিবেশন যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থান হইতে জমিদার, পণ্ডিত, হাকিম, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণ সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বিহার প্রদেশ হইতেও অনেকগুলি ভক্ত আসিয়াছিলেন। তবে পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তগণ অধিকাংশ আসিতে না পারায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার ভক্তসংখ্যা কিছু অল্প হইয়াছিল।

১ম দিবস শ্রীভগবান্ জগদ্গুরুকে সভাপতি রূপে আহ্বান করিয়া বন্দনা সঙ্গীত ও স্তোত্রাদি পাঠান্তে বেলা ১২টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর ভক্তসম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠান্তে মঠ ও আশ্রমগুলির আয় ব্যয় প্রদর্শিত হয়। তৎপরে সেবকগণের এবং বিভাগীয় ও জেলার সদস্যগণের মধ্যে কাহার দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে এবং অর্থ সামর্থ্যে কে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া বেলা সাড়ে চারিটার সময় সভাভঙ্গ হয়।

২য় দিবস যথারীতি বন্দনা সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠান্তে সাড়ে ১২টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ প্রথমতঃ অনুপস্থিত সদস্য ভক্তগণের কয়েকখানি পত্র পাঠ করিয়া উপস্থিত ভক্তগণের পরিচয়াদি প্রদান করেন। অনন্তর তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ এবং মঠ ও আশ্রমগুলির ভার সেবকগণ ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের উপর অর্পণ করিয়া সেবক ও সদস্যগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল মঠ ও আশ্রম পরিচালন এবং সারস্বত ভাণ্ডার সম্বন্ধে বক্তৃতান্তে কয়েকটী প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অনন্তর আত্মগঠন, আদর্শ গৃহস্থাশ্রম স্থাপন ও সঙ্ঘশক্তি সম্বন্ধে আলোচনান্তে ৪টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

৩য় দিবস বেলা ২টায় একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তমলুকের উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার মাইতি, এম, এল, সির প্রস্তাবে ও হাওড়ার উকিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস বি, এল-এর অনুমোদনে, এবং সর্ব্বসাধারণের সমর্থনে মেদিনীপুরের প্রবীণ উকিল, গড়বেতার বিখ্যাত অগস্তি বংশের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ অগস্তি বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় মঙ্গলপোতার রাজা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ, গড়বেতার কয়েকজন উকিল, শিক্ষক, দুইজন ডাক্তার, একজন সবরেজিষ্ট্রার—এক কথায় গড়বেতা অঞ্চলের যাবতীয় গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং ৫।৬ হাজার সাধারণ ভদ্রলোক যোগদান করিয়া-

ছিলেন। প্রথমতঃ মঙ্গলপোতা বালক সম্প্রদায় কর্তৃক একটী আবাহন সঙ্গীত ও স্তোত্রাদি পাঠান্তে সভাপতি মহাশয় অভিভাষণস্বরূপে হিন্দুধর্ম্ম ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিবৃত করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল. শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এল, টী. শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী এম. এ. বি, এল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ খাঁড়া প্রভৃতি সত্যধর্ম্ম ও সংশিক্ষা প্রচার কল্পে মঠ ও আশ্রমাদর্শে ঋষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, বর্ত্তমান শিক্ষার ফল, সারস্বত মঠ ও আশ্রমগুলির উদ্দেশ্য ও অভাব এবং সাহায্যাদি প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আততায়ী কর্তৃক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় উকিল মহাশয় কর্তৃক শোক প্রকাশক প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তদনন্তর স্থানীয় জমিদার ও গড়বেতার উকিল শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চৌধুরী কর্তৃক সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সন্ধ্যার পর সভাভঙ্গ হয়।

এবারের সম্মিলনীর বিশেষত্ব এই যে পশ্চিমবাঙ্গালার ভক্তগণ বাঙ্গালার অন্যান্য বিভাগের গুরুভাইদের নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। অথচ তাঁহারা ৩।৪ দিন প্রত্যহ উপস্থিত সাধারণকেও প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সাধারণ সভার দিন ১৫ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। আর কয় দিন নহবতে ঢোল কাঁসীর সঙ্গে সানাই-এর সময়োপযোগী রাগরাগিণীর আলাপ বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। কয় দিন আশ্রমটী যেন পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। স্থানীয় ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ও বিভাগীয় ভক্তগণ মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া ভক্তসম্মিলনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। গড়বেতার উকিল স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বাবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আমরা এ পর্য্যন্ত কোন আশ্রমে এরূপ সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই নাই। আগামী বর্ষে আসাম সারস্বত মঠে ভক্তসম্মিলনীর ১৩শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আগমনী

(১)

জয় নিগমানন্দ জগৎবন্দ্য এস এস তুমি হে।
কর চির পবিত্র পুণ্যতীর্থ তোমার এ জন্মভূমি হে।
তব জ্ঞান ও ভক্তি পুত্র-কন্যা,
নাশুক ধরার কলুষ বন্যা,
আজি ধন্য হউক এ সারা ধরণী তব পদধূলি চুমি হে।

(২)

পল্লী জননি মোর,
চেয়ে দেখ্ ওই বিশ্ববিজয়ী পুত্র ফিরেছে তোর;—
দীন হীন তোর শূন্যভবনে
বিনা আয়োজনে, বিনা আবাহনে,
এত দিন পরে আজি পুন তব মুছাতে নেত্রলোর।

ভরা ভৈরব কূলে,
জীবনের যত সুখের কামনা চিতা পরে দিয়ে তুলে,
যে পুত্র তোরে তেয়াগি জননি
গেছিল, সে আজ এসেছে আপনি
বিশ্বভুবন জয় করি মাগো তোরই ও চরণমূলে।

দীর্ঘ দ্বিযুগ ধরি
যে পুত্র লাগি তপ্ত অশ্রু নীরবে মোচন করি,
অহরহ শুধু চাহি আশাপথ
ছিলি মাগো তুই—সেই মনোরথ
কর্ মা পূর্ণ, কর্ মা আজিকে সে তনয়ে বুকে ধরি।

দে মা ওঁর শিরে তুলি
আশিষ্ মাখান শিশিরসিক্ত শুভ্র শেফালিগুলি;
স্নেহে সকরুণ অঞ্চল দিয়ে,
মুখখানি ওঁর নে মা মুছাইয়ে;—
দেখুক্ দেবতা এ দৃশ্য আজি স্বর্গদুয়ার খুলি।*

---

* পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেবের জন্মভূমিতে আগমন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল দ্বারা রচিত। ১নং গানটী গাহিতে গাহিতে গ্রামবাসিগণ খোল-করতাল বাজাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভৈরব নদীর তীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন। আর ২য়টী শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরে আসন গ্রহণ করিলে তথায় আবৃত্তি করা হইয়াছিল।

বন্দনা

—*—

জয় বঙ্গ-গগন গৌরবরবি সুধীজন হৃদিরঞ্জন ॥
জয় স্বদেশ-সেবক দীন-পালক দুখিজন দুঃখভঞ্জন ॥
জয় শ্যামল অমল কমলকান্তি অখিল ভ্রান্তিভঞ্জন।
জয় ভুবনমোহন পাপবিনাশন ভকত মনোরঞ্জন ॥

বঙ্গ গগনে বিমল ইন্দু আমরা মিলিত সকল হিন্দু।
লভিতে তোমার করুণাবিন্দু যাচিছে সতত ভকতগণ ॥
সমীরণ গায় যশের বারতা সাথীগণ তব গায় গুণগাথা।
ঈশ্বর সদনে মহিমার কথা গাইছে সতত বন্দীগণ ।*

* মুর্শিদাবাদের জনৈক ভক্ত কর্তৃক রচিত ও ভক্তসম্মিলনীতে গীত হইয়াছিল।

সাম্বৎসরিক হিসাব

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও অন্যান্য শাখা সারস্বত আশ্রমগুলতে গত বৎসর মোট ১৫৩৪৯৵২॥ ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৫৮০২॥৵৲॥০, মঠের আয় ৩৪৪৮॥৵১০ এবং হাওলাতি ১১৫০৸০ বাদে বাকী আশ্রমের আয় হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। আর সমগ্র প্রচার বিভাগে ১০৯৬৲১৫ আয়, তন্মধ্যে ২৮৫০।৵১৫ ব্যয় বাদে ৬২৪৫॥৵০ লাভ হইয়াছে। এই লাভের টাকা হইতে ৪৫৭৩/৫ ব্যয়ে সাজসরঞ্জাম সহ মঠে একটী মোশনপ্রেস স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে মোট ব্যয় ৩৮৬২৲৫

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত—৬৬১।/০)

১	মঠ বিভাগে	২৫৯॥/১০
২	খোরাকী মোট	১৯৭৫৸৵৫
	আশ্রমবিভাগে	১৮৯৫৸৵৫
	অতিথি-অভ্যাগতের জন্য	৮০৲
৩	পরিধেয় ও শীতবস্ত্রে	২৯৯॥৵০
৪	সেবাবিভাগে মোট	৩৭৮৸১০
	ঔষধ-পথ্যাদিতে	৩৫৬।/০
	বাহিরের রোগীদের জন্য	—
	বিপন্নকে সাহায্য	২১৸৵০
৫	শিক্ষাবিভাগে	১৩৫/০
৬	গৃহনির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে	২৫৭৸৵৫
৭	সেবকগণের সেবা ও ভিক্ষার্থ-যাতায়াতের খরচ	১৪৩৵৫
৮	তৈজসপত্রাদিতে	২৩॥/০
৯	ছাপা খরচ ও ষ্টাম্পাদিতে	৪৬৲/১০

১০ জমি-জমাতে ১১/১০
১১ উৎসবাদিতে ২৫৭॥৵৫

মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত
আশ্রমে— ১১৩৩১৫
(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ১২৪২৸১৫)

পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত
আশ্রমে— ২৩৫৪॥১০
(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৭৫৬।০)

উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত
আশ্রমে— ১৪৬১৫
(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৯১২৸৵১০)

দক্ষিণবাঙ্গালা সারস্বত
আশ্রমে— ১১৫৭॥৵১৭॥০
(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ১১৭০।৶৭॥০)

পশ্চিমবাঙ্গালা সারস্বত
আশ্রমে ৪৫১৮॥৵১০

মোট ১৫৪৪৯।৶২॥

কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে

দানপ্রাপ্তি

—:*:—

ময়মনসিংহ কালীবাড়ী—শ্রীযোগেশ চন্দ্র দে ৫৲, শ্রীবিশ্বম্ভর ধর ২৲, শ্রীমনোমোহন দাস ২৲, নিত্যসুন্দরী দে ২৲, সুশীলাবালা দাস ২৲, শৈলবালা ধর ২৲, নগেন্দ্রসুন্দরী দে ১৲, ব্রজবালা ধর ১৲, চট্টগ্রাম দমদমা নিবাসী শ্রীবিধুভূষণ কর্ম্মকার ৫৲, শ্রীদুর্গাকুমার কর্ম্মকার ১৲, শ্রীঅখিলচন্দ্র কর্ম্মকার ২৲, শ্রীকালীশঙ্কর কর্ম্মকার ১৲, শ্রীকালীকুমার কর্ম্মকার ২৲, দ্রৌপদী কর্ম্মকার ১৲, শ্রীপ্রসন্নকুমার কর্ম্মকার ১৲, জগদীশ্বরী কর্ম্মকার ॥০, শ্রীকুঞ্জভূষণ কর্ম্মকার ১৲, মহাদিয়া নিবাসী অর্পণাকুমারী কর্ম্মকার ১৲, শ্রীজানকীনাথ কর্ম্মকার ১৲, ওয়াহেদ-পুর নিবাসী—শ্রীবাণীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীনবীনচন্দ্র দে ১৲, শ্রীবগলাকুমার পাল ১৲, শ্রীশশীভূষণ দে ॥০, শ্রীশরৎচন্দ্র পাল ১৲, রামনাথ পালের স্ত্রী ১৲, রোশাংগিরি নিবাসী—শ্রীমহিমচন্দ্র দেব ১০৲, শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীনন্দচরণ দাস (২য় দফা) ৫৲, ছোট কমলদহ নিবাসী শ্রীশশীকুমার নন্দী ১৲, শ্রীনৃত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় পাহাড়তলী ২৲, শ্রীচন্দ্রনাথ ভৌমিক করের হাট ৩৲, সরোজিনী কর্ম্মকার মসজিদিয়া ১৲, শ্রীগগনচন্দ্র জলদাস সারোয়াতলী ১৲, শ্রীঅম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য আমিলাইস ২৲, শ্রীললিতকুমার চৌধুরী ১০৲, শ্রীঅনঙ্গমোহন চৌধুরী ৫৲, শ্রীভবরঞ্জন গুহ সন্দ্বীপ ৫০৲, শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় ঢাকা ২০৲, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মোদক ঝগড়ার চর ময়মনসিংহ ১০৲, শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া, হুগলী ১০৲, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মণ্ডল বনাবড়িয়া ১০৲, রাজবালা ঘোষ কলিকাতা ৫৲, শ্রীহারাধন চট্টোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীহৃদয়নাথ

চক্রবর্ত্তী তাড়াস, পাবনা ১৲. শ্রীকালীপদ দাস নাটনা, নদীয়া (৩য় দফা) ১৲ শ্রীনারায়ণ দাস নন্দী কালিসহর (২য় দফা) ১০৲. শ্রীঅক্ষয় কুমার সাহা নারায়ণগঞ্জ ২৲. শ্রীশশিচন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দ্বীপ (২য় দফা) ২৫৲. শ্রী-অপ্রদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মপুর, ঢাকা ২৫৲ শ্রীকুমুদিনীকান্ত সাহা ফরিদপুর ৫০৲. শ্রীগগন চন্দ্র দেব জগৎপী, ১০৲. শ্রীভবেশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় কুচবিহার (২য় দফা) ৫৲. শ্রীনরেশ চন্দ্র পাকড়াশী স্কুল, পাবনা ১০১৲. শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উচালন, বৰ্দ্ধমান ১০৲. শ্রীভৈরবচন্দ্র চাকবা ঐ ৪৲, শ্রীপরেশ মুখো-পাধ্যায় ঐ ১৲. শ্রীপশুপতি দত্ত ঐ ৫৲, শ্রীঈশ্বর চন্দ্র জানা ছাতিশালা, মেদিনীপুর ২৲. শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় মুঙ্গের, ১৲. শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমনপুর, মেদিনীপুর ৫৲. শ্রীসারদা-চরণ মজুমদার ফুলগাজী নোয়াখালী ২৲. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী খড়কুসুমা ৫৲. শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী রাধানগর, বৰ্দ্ধমান ৫৲ শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তমলুক, ২৫৲. শ্রীপ্রসন্ননাথ মেথিয়া বৈষ্ণবচক, মেদিনীপুর ১৲, শ্রীসত্যপদ দে তালিত, বৰ্দ্ধমান ৫৲. শ্রীগোপালচন্দ্র রায় চৌধুরী মাদারীপুর ১০৲, সুধালতা দেবী ঐ ১৲, শ্রীব্রজকিশোর বন্দ্যো পাধ্যায় জামসেদপুর ৪৲, শ্রীনীহাররঞ্জন নন্দী আসানসোল ৫৲, শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস কল্যাণদী, নোয়াখালী ৫৲. শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় রাইগঞ্জ, দিনাজপুর (২য় দফা) ৫৲, শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী কোতাইগড়, মেদিনীপুর ২৲. শ্রীতারকদাস চক্রবর্ত্তী হাওড়া ২৲, শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত সেল্লাপাড়া, ঢাকা ৫৲. শ্রীনগেন্দ্রদেব রায় চৌধুরী শ্রীরামপুর ৩৲, শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল গোয়াড়ী, নদীয়া ২৲.

শ্রীনৃসিংহপদ পাল ঐ (২য় দফা) ৫৲. রাধা-নাথ রায়ের স্ত্রী ঐ ২৲. রামেশ্বর বাবুর ভগ্নী ১৲, শ্রীবদনীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া ৫১৲ শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত ৫১৲, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ধুবড়ী ১০৲, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কুতপুর ২৫৲. খড়কুসুমা আশ্রম ৭৲. ভাওয়াল আশ্রম ৯৲, শ্রীরাধানাথ দে কুমিল্লা ৫৲, শ্রীচুনিলাল ঘোষ কেঠিয়া, ২৪ পরগণা ২৲. গাড়ুদহ হইতে সংগৃহীত মাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী ৩৮৹. শ্রীউমেশচন্দ্র গোস্বামী তাড়াস পাবনা (২য় দফা) ২০৲. শ্রীমন্মথনাথ বসু তমলুক ১০৲. শ্রীভীমাচরণ বসু ঐ ১০৲. শ্রীসারদাচরণ পট্টনায়েক কাক-দ্বীপ, ২৪ পরগণা ৫৲, শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহা লাকশাম, ত্রিপুরা, ১৲ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাহা ঐ ১৲, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বণিক ১৲. ময়মনসিংহের জনৈক ভদ্রলোক ২৲, শ্রীআশুতোষ বন্দ্যো-পাধ্যায় সন্দ্বীপ ১০৲ সুষমাশোভা দেবী ঐ ৫৲, শ্রীশচীনাথ মজুমদার ঐ ১৲, শ্রীজিতেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালিসহর ২৲, শ্রীনবীনচন্দ্র রায় গোঁসাইমারি, কুচবিহার ২৲, নিশারাণী বর্ম্মাণী ঐ ১৲. টুলটুলি বর্ম্মাণী ১৲, শ্রীনাথ বসু বারদী, ঢাকা ১০৲, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখটী বগুড়িগুড়ি আশ্রম, আসাম ১৲, শ্রীরাখালদাস বৈষ্ণব ঐ ১৲, শ্রীরামচরণ ময়রা ঐ ১৲, শ্রীচন্দ্র মাইন পানিপ্রাচী দিগরা, মেদিনীপুর ১৲, ঐ (ছোট) মেদিনীপুর ২৲. শ্রীচন্দ্রমোহন মাইতি ঐ ১৲, শ্রীঅধরচন্দ্র পাল কোতাইগড়, মেদিনীপুর ১৫৲, শ্রীহরপ্রসাদ রায় বগুড়া (২য় দফা) ১৫৲, শ্রীনলিনীকান্ত দে পিরোজ-পুর, শ্রীহট্ট ৫৲, শ্রীশ্রীজগদ্গুরু সেবাসঙ্ঘ ঐ ১০৲, পিরোজপুর সেবাসঙ্ঘের সেবকগণ ঐ ৪৲, শ্রীবিন্দুচরণ দাস, ধুবড়ী ২৫৲, শ্রীনাথ

মাতা বলাখাল, ত্রিপুরা ১৲, শরৎসুন্দরী দাসী বগুড়া ২৲, নন্দমতী মজুমদার ঐ ॥০, শ্রীরুক্মিণী কান্ত সাহা ঐ ১৲, শ্রীকৈলাসচন্দ্র দাস পড়গোদা, মেদিনীপুর ১৲, শ্রীগুরুচরণ দাস ঐ ১৲, শ্রীঅমরনাথ মণ্ডল বাবুলপুর মেদিনীপুর ২৲, শ্রীকেনারাম মণ্ডল ঐ ১৲, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ তমলুক ২৲, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘলকান্দী পাবনা ১০৲, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ২৲, শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী যোগনালা পাবনা ১৲, শ্রীসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী তাড়াস পাবনা ১৲, শ্রীউমানাথ ঘোষাল পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ নল্লগর, নদীয়া শ্রীক্ষৌশচন্দ্র চৌধুরী ২৫৲, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সাম পুটিয়া, রাজসাহী ২৫৲, শ্রীবেণীমাধব সরকার চন্দমারী, রঙ্গপুর ১৲ শ্রীললিতকুমার মিশ্র লক্ষ্মণকাঠি, বরিশাল ১৲, শ্রীগোপীনাথ সিংহ ৫৲, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ৫৲, শ্রীতারকচন্দ্র চন্দ ৫৲, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দে ৫৲, শ্রীবিনোদচন্দ্র দাস ২৲, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র কুড়ি ১৲, শ্রীহরলাল কুডি ২৲, মহারাণী দাসী ১৲, প্রীতিবালা দী ২৲, শ্রীজগবন্ধু দাস ১৲, শ্রীদ্বারিকানাথ দাস ২৲, D. N. S. ২॥০ M. L. ০B. ৩৲, N. C. P. ২॥০ নাম ছাড়া ২৲, হাওড়া বাগনান নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক ২৲, নাম ছাড়া ১৲, ঐ ১৪৲, উৎসবের সময় জনৈক ভদ্রলোক ৫৲, **কুচবিহার নিবাসী**—শ্রীশ্যামপ্রসাদ বর্ম্মণ ২৲, শ্রী নৃপেন্দ্রনারায়ণ বসুনিয়া ৫৲, শ্রীরামেশ্বর সরকার ১৲, শ্রীকমলাকান্ত দলই ৫৲, শ্রীখুড় পাইকার ২৲, শ্রী কশোরীমোহন বসুনিয়া ১৲, শ্রীকমলেশ্বর সানিয়া ৫৲, **শ্রীহট্ট পুকুরপার হইতে** শ্রীবনবাসী কুডি ২৲, শ্রীপ্রাণবন্ধু কুডি ১৲, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কুড ২৲, শ্রীমদনমোহন কাড ১৲, শ্রীরামচন্দ্র কুড ১৲, শ্রীসুরেন্দ্র কুড ১৲, শ্রীনবাবচাঁদ কুড ১৲, শ্রীরূপচরণ কুড ১৲, শ্রীনন্দলাল কুড়ি ১৲, শ্রীকৃষ্ণধন কুড় ১৲, শ্রীঈশানচন্দ্র কুড়ি ১৲, নন্দরাণী কুড়ি ॥০, শ্রীযোগেন্দ্র কুড় ১৲, পদ্মময়ী কুড়ি শ্রীনন্দন কুড ১৲, শ্রীসত্যচরণ সরকার ২৲, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীগণেশ সর্দ্দার ৫৲

সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

—

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে নবান্ন উপলক্ষে কুতুবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে গুরুব্রহ্মের পূজা ও ভোগ ইত্যাদি হইয়াছিল। তদন্তে প্রায় দেড় শত লোককে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

—

আগামী ফাল্গুন মাসে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইবে। হরিদ্বারে অমৃত কুম্ভযোগের কালনিরূপণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেদ্‌যোগঃ কুম্ভো নাম তদোত্তমঃ॥
—স্কন্দ পুরাণ

আমরা হরিদ্বারের সংবাদে অবগত হইলাম, এবার ১৮ই ফাল্গুন বুধবার শিবরাত্রির দিন হরিদ্বারে প্রথম স্নান হইবে। ১৯শে চৈত্র শনিবার অমাবস্যায় কুম্ভস্নান হইবে। সাধুগণ ২৮শে চৈত্র সোমবার বাসন্তী-বিজয়া-দশমীতে শেষ স্নান করিয়া বিদায় হইবেন।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ | মাঘ | দ্বিতীয় খণ্ড
সমষ্টি সং ২০২ | | চতুর্থ সংখ্যা

হরিবাহনঃ

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।২।৩-২৪]

[বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

অভি তষ্টেব দীধয়া মনীষা-
মত্যো ন বাজী সুধুরো জিহানঃ।
অভি প্রিয়াণি মর্ম্মৃশৎ পরাণি
কবীঁরিচ্ছামি সংদৃশে সুমেধাঃ॥

গুণগানে তক্ষা হেন মনীষারে উজলিয়া তোলো—
স্তুতিভার বহি নিতি অশ্ব হেন চলো ছুটে চলো।
অতি প্রিয় যাহা কিছু দেবতার খুঁজি-পাতি আনি—
কবি পানে বিথারিব মেধাদীপ্ত শুভ দৃষ্টিখানি।

ইনোত পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং
মনোধৃতঃ সুকৃতস্তক্ষত দ্যাম্।
ইমা উ তে প্রণ্যো বর্ধমানা
মনোবাতা অধ নু ধর্মণি গ্মন্॥

গুরুরে শুধাতে পারি, কবিগণ কোথা হতে এলো—
কল্পনা-কুশলী যাঁরা বিচিত্র এ দ্যুলোক রচিল।
তোমারি প্রণয়গাথা, হে দেবতা, নিতি বেড়ে চলে—
মনের সমীরে দু'লে পাবি নাকি ঠাঁই পদতলে?

নিষ্ষীমিদত্র গুহ্যা দধানা
উত ক্ষত্রায় রোদসী সমঞ্জন্।
সংমাত্রাভিম মিরে যেমুরুর্বী
অন্তর্মহী সমৃতে ধায়সেধুঃ॥

কি গোপন মায়া তারা চারিদিকে আজিকে বিছালো!
অপরূপ কীর্ত্তি এই—দ্যুলোকেরে ভূলোকে মিলালো।
অণু দিয়ে ভরি ব্যোম, পৃথিবীরে করেছে অটল—
অন্তরীক্ষে রচিয়াছে এ দোঁহার মহাসন্ধিস্থল।

আ তিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্
শ্রিয়ো বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ।
মহত্তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নামা
বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ॥

আসীন আছেন ইন্দ্র, সবে মিলে তাঁহারে সাজালো—
স্বরূপ বসন হলো—তাঁর ভূষা, হলো তাঁরি আলো।
কল্পতরু তিনি দেব, বীর্য্যশালী, সুবিপুলযশ—
বিশ্বরূপে অধিষ্ঠান—স্পর্শ তাঁর অমিয়সরস।

অস্মৃত পূর্ব্বো বৃষভো জ্যায়ানিমা
অস্য শুরুধঃ সন্তি পূর্ব্বীঃ ॥
দিবো ন পাতা বিদথস্য ধীভিঃ
ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাতে ॥

চিরন্তন, কল্পতরু, সুমহান্, এই সৃষ্টি তাঁর—
ছিল পূর্ব্বে, আছে এবে, এই তাঁর আনন্দবিথার
আছে দুই দেব, জানি, দীপ্তকায়, দ্যুলোকবিহারী—
শুভমতি যজমানে ধনদানে নিত্য-কৃপাকারী।

তদিন্বস্য বৃষভস্য ধেনোরা
নামভির্মমিরে সক্ম্যং গোঃ।
অন্যদন্যদসুর্য্যং বসানা
নি মায়িনো মমিরে রূপমস্মিন্ ॥

বিচিত্র নামেতে খ্যাত কত মত সুপেয় গোরস—
কল্পতরু ইন্দ্র তরে রাখিয়াছে বাড়াতে হরষ।
রয়েছে মায়াবী যত, মায়া কত জানে অপরূপ—
ইঁহারি শরণ নিয়ে ধরে তারা কত মত রূপ।

তদিন্বস্য সবিতুর্নকির্মে
হিরণ্ময়ীমমতিং যামশিশ্রেৎ।
আ সুষ্টুতী রোদসী বিশ্বমিন্বে
অপীব যোষা জনিমানি বব্রে ॥

বিশ্ব চলে আজ্ঞাবলে, যে দেবের এমনি মহিমা,
হিরণ্ময়ী দ্যুতি তাঁরে আছে ছেয়ে—কোথা তার সীমা।
শোভন-রোদসী এই—বিশ্ব যথা আছে অতি সুখে,
রয়েছে আঁকড়ি তারে—শিশু যথা জননীর বুকে।

—•—

সঙ্কট-মোচন

কর্ম্মকে বন্ধন বলে কেন?—কর্ম্মের আবিলতায় মনের ভিতর ময়লা জমিতে থাকে, তাই। সংস্কার বলিয়া একটা মনের ধর্ম্ম আছে, তাহাতেই স্মৃতিকে সজাগ রাখে। এইটাই বড় ভয়ের কথা। আজ যাহা করিলাম, তাহা যদি আজই চুকিয়া না যায়, কালও যদি তাহার জের টানিতে হয়, তাহা হইলে ভয় তো হইবেই। বেশীর ভাগ লোকেরই জীবনে সুকৃতির চেয়ে দুষ্কৃতির পরিমাণ বেশী। কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী দুষ্কৃতির সংস্কার থাকিয়া যায়। পাপ করিয়াই হাত-পা ধুইয়া খালাস হইবার উপায় নাই; পাপের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেও ভূত হইয়া সে পেছনে পেছনে তাড়া করে, মানুষের জীবন্তে নরকভোগ সুরু হইয়া যায়। এই দুষ্কৃতির বোঝা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মানুষ একটা কিছু নেশা চায়, যাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও সে সব ভুলিয়া যাইতে পারে। সংস্কার স্মৃতি জাগাইয়া রাখে, মানুষ তাহাকে খেদাইবার জন্য বিস্মৃতির আয়োজন করিতে লাগিয়া যায়। স্মৃতির জ্বালা বড় জ্বালা! কেন?—কর্ম্ম যে রক্তবীজের মত মরিয়াও মরে না।

আবার সুখের স্মৃতিটুকু বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যও মানুষের চেষ্টার বিরতি নাই। সুখ-স্মৃতির মূলে আছে সুকৃতি। চন্দনপাটা ধুইয়া ফেলিলেও তার বুক হইতে চন্দনের গন্ধ যায় না। সুকৃতিও তেমনি। একদণ্ডের সুকৃতি ফুলের সৌরভের মত শতদণ্ড তোমার অনুসরণ করিবে। এ-ও তো সেই সংস্কারেরই কাজ—এ-ও তো কর্ম্মফল। দুঃখের স্মৃতি লোপ করিয়া দিবার জন্য মানুষের যতখানি আগ্রহ, সুখের স্মৃতি লোপ করিয়া দিবার জন্য কিন্তু তত আগ্রহ নাই। তাহা হইলে দেখি, সংস্কার এড়াইতে চাহিলেও আমরা সকল সংস্কার এড়াইতে চাহি না। কর্ম্ম বন্ধন হইলেও ফুলের বাঁধন সকলের কাছেই মিঠা লাগে।

সকলেই চায় দুঃখের হাত এড়াইয়া চলিতে। দুঃখের মূলে কর্ম্ম; সুখের মূলেও তাই। কাজেই সমস্ত কর্ম্ম বর্জ্জন করিলে যেমন দুঃখ থাকিবে না, তেমনি **সুখও থাকিবে না**। কর্ম্মত্যাগ অর্থে যাহারা কুঁড়েমি বোঝে, তাহারা এই কথাটা তলাইয়া দেখে না। তাই বেদান্তের নৈষ্কর্ম্ম্যের সিদ্ধি স্বারাজ্য আনিয়া দিলেও নিষ্কর্ম্মার সিদ্ধি আনিয়াছে শুধু অবসাদ, আর তার পেছনে পেছনে আসিয়াছে দুঃখ। এই জন্য কর্ম্ম-বর্জ্জনে বিপদ আছে। সব কিছু করা চলে না, বাছাই করিয়া কাজ করিতে হয়। সে বাছাই কে করিবে? মানুষ নিজে? নিজের বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়াই তো তাহার সুকৃতি-দুষ্কৃতিতে তাল পাকাইয়া যায়, একটা ভাল করিতে সে দশটা মন্দ করিয়া বসে। ইতর প্রাণীর বিচার-বিবেচনার বালাই নাই, তাই তাহাকে ভুগিতে হয় কম। তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া মানুষ সিদ্ধান্ত করিল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া আদি মানবদম্পতী যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিল আজও তাহার সন্তান-সন্ততিকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে—চিরকাল করিতেই হইবে। অতএব এই সংসার একটা

অভিশপ্ত ক্ষেত্র—পশুসুলভ আদিম নির্ব্বিচার-ভূমি হইতে চ্যুত হইয়া মানুষ ঠকিয়াছে। অবশ্য এ আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের কথা নয়; কিন্তু বর্ত্তমান অধঃপতিত হিন্দুর মনোভাব অনেকটা এমনই দাঁড়াইয়াছে! ছেঁড়া কাঁথায় সটান চিৎপাত হইয়া পড়িয়া কর্ম্ম-কোলাহল-হীন ইডেন উদ্যানের ফলাহারের চিন্তায় মশগুল হইয়া সে আরাম পায়।

পশুতে অন্যায় কাজ করে কম, মানুষে করে বেশী; এমনি একটা ধারণা আমাদের মাঝে আছে। এই বৈষম্যের হেতু দেওয়া হয় এই—মানুষের বিবেকবুদ্ধি আছে, তাহার নিজের বোঝা নিজে বইতে হয়; আর পশুর ভার প্রকৃতিদেবী স্বয়ং বহন করেন, এই জন্য তার বেতালে পা কমই পড়ে। কাম, ক্রোধ লোভইত্যাদি বৃত্তির তুলনায় আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাস্তবিকই এই সমস্ত পাশব (!) বৃত্তিতে মানুষ পশুকে ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। ইহার পরই সিদ্ধান্ত হয়, মানুষ স্বভাবতঃই দুষ্কৃতি-প্রবণ; মন্দটাই তার সহজে আসে, পাপের পথে সহজেই সে পিছলাইয়া পড়ে—ভাল হইতেই তার সাধ্য-সাধনার দরকার। বাহির দেখিয়া বিচার করিলে কথাটা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কুপ্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে খুবই সহজ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য সর্ব্ব-সাধারণের উপযোগী একটা নীতিধর্ম্মের কাঠামো গড়িতে গিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন, "তোমার প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে অকুশল কর্ম্ম না করা; দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, কুশল কর্ম্ম করা।"

দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য বড় বড় কথার মারপ্যাঁচের মাঝে না গিয়া শুধু এই একটা কথা আঁকড়িয়া ধরাই ভাল "আমি যেন অকুশল কর্ম্ম না করি, আমার দ্বারা নিজের অকল্যাণ, পরের অকল্যাণ যেন না হয়।" উপনিষদেও এই বুদ্ধবচনের অনুরূপ কথা আছে—"নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ—প্রজ্ঞা-নেনৈনমাপ্নুয়াৎ"—যে দুষ্ট আচার হইতে বিরত হয় নাই, সে প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারে না। যেমন কাজের সুবিধার দরুণ কখনও কখনও মিলিটারী আইন জারী করিতে হয় যে, আগে হুকুম তামিল কর, তার পর প্রশ্ন করিও, এই শাসনবাণীর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে। কুপ্রবৃত্তি কোথা হইতে আসে, কেন আসে, কে তার প্রণোদক, সে বিচার পরের কথা; আগে এইটী জোর করিয়া ধরিতে হইবে, অকল্যাণ করা চলিবে না। এই জোরটুকু বজায় রাখিবার জন্যই হিন্দুর এত শৌচ সদাচারের ব্যবস্থা। আচার হিন্দুর সাময়িক শৃঙ্খল, হিন্দুসমাজের সামরিক আইন। শুধু চোখ বুঝিয়া চলিবার ব্যবস্থাই যে আছে, তাহা নয়; কিছু দূর চলিবার পর আচার অভ্যস্ত হইলে তাহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। রাজা আর মন্ত্রীতে পরামর্শ হয়; খাড়া হুকুমটা আসিয়া পৌঁছে চৌকিদারের কাছে। পর পর মুরব্বি ধরিয়া সে কি আর ভিতরের খবরটা জানিতে পারে না? কিন্তু হয়ত তার কৌতূহল নাই, চেষ্টা নাই। তাই চৌকিদারীতেই তার জীবনের ইতি। হিন্দু-সমাজে আমরা অধিকাংশই এই চৌকিদার শ্রেণীর। তবে বিপদ হইয়াছে এই যে, এই চৌকিদারদের মাঝে কেহ কেহ বাঁকিয়া বসিয়াছে, "আসল কথাটা না শুনিয়া হুকুম তামিল

করিব না; ও সব মন্ত্রী বেটাদের চালাকি!" ফল কি হইবে কে জানে?

যে কথা বলিতেছিলাম। মোট কথাটা এই, কর্ম্ম বন্ধন হইলেও দুষ্কৃতির বন্ধনই প্রথমতঃ দুঃসহ বলিয়া বোধ হয়। তাই মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য, দুষ্কৃতি বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্ম করা। ইহাতে বিচারেরও প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব পুরুষের অনুষ্ঠিত সদাচার অবলম্বন করিয়া শক্তিসংগ্রহ কর, করিয়া দুর্নীতিকে ঠেকাইয়া রাখ। আচার অভ্যস্ত হইলে তার পর বিচার কর। তখন আচারের দোষ-গুণ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নিজেই বুঝিতে পারিবে—এমন কথা মনে হইবে না যে এ আচার "ভীষ সম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন!"

পূর্ব্বেও ইঙ্গিত করিয়াছি, এই ব্যবস্থার মূলে একটা সাংঘাতিক কথা রহিয়াছে, যে মানুষ স্বভাবতঃই দুষ্কৃতিপরায়ণ। মানুষ ও পশু যদি প্রকৃতিরই সন্তান হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির এমন সুন্দর সৃষ্টিকে এত দুর্ব্বল করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কি জননীর মমতার পরিচায়ক? কিন্তু আমাদের মনে হয়, মানুষ **স্বভাবতঃ** দুষ্কৃতিপরায়ণ নয়; আপাতদৃষ্টিতে তার দুষ্প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক করিয়া তোলে তার পারিপাশ্বিক। দুষ্কৃতির প্রতি প্রবণতা মানুষের স্বাভাবিক নয়, বরং নিতান্তই অস্বাভাবিক—প্রমাণ মানুষের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। মানুষের বুদ্ধি বেশী বলিয়া সে বিপাকে পড়ে; তার সমাজ-ব্যবস্থা পশুর সমাজ-ব্যবস্থা অপেক্ষা জটিল আকার ধারণ করিয়া দুষ্প্রবৃত্তির প্রচুর অবকাশ রচনা করে। কিন্তু এই বিষের প্রতিষেধকস্বরূপ সৌন্দর্য্য-বোধরূপ এক অমৃত রসায়ন যদি প্রকৃতি তাহার হৃদয়-ভাণ্ডারে সঞ্চিত না রাখিতেন, তাহা হইলে পাপের সংক্রমণে দুই দিনেই মানুষ উজাড় হইয়া যাইত। মানুষ ব্যবহারের অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যেখানে রুচিবিকারের পরিচয় দিয়াছে এবং সৌন্দর্য্যবোধকে কুণ্ঠিত করিয়াছে, সেইখানেই পাপ প্রশ্রয় পাইয়াছে। আবার এই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবোধের প্রেরণায় মানুষ **স্বভাবতঃই পাপকে ঘৃণা** করিতেও শিখিয়াছে।

যাহারা অন্যায় হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করিয়া কর্ম্মযোগের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছে, মানুষের স্বভাব যে দুশ্চরিতের প্রতিকূল, এই কথাটা জানিতে পারিলে তাহাদের প্রচুর লাভ। নীতিবাগীশেরা মানুষকে পাপী পাপী বলিয়া তাহার অন্যায় প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে এত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে যে, পাপী বেচারীরা শেষকালে পুণ্যবানদেরই একটা গলগ্রহ হইয়া পড়ে। যে অন্যায়কে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কোথায় তাহার মাঝে প্রবল আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করিয়া দিয়া পাপের মোহ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবে, তা না করিয়া যদি প্রায়শ্চিত্তের লম্বা ফর্দ্দ শুনাইয়া তাহাকে আরো আঁৎকাইয়া তোল, তাহা হইলে খোরাক জোগাইয়া অন্যায়কেই আরও জীয়াইয়া রাখা হয় নাকি? এই জন্য বলি, মানুষকে বিচার করিতে বড় হুঁশিয়ার হইতে হইবে। মানুষের হৃদয় সুরাসুরের রণভূমি বটে; কিন্তু সেখানে অসুরের বিজয় আকাঙ্ক্ষা করাই কি দেবঋণ পরিশোধ করা?

দুঃখ যদি এড়াইতে চাও, অকুশল-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না—এই হইল নেতিবাচক প্রতিজ্ঞা। ইহার পরের কথাই হইতেছে—সুখ যদি পাইতে চাও, তাহা হইলে কুশলকর্ম

কর। পূর্ব্ববর্তী যথাযথ প্রতিপালিত হইলে যে পরের অনুশাসনটী প্রতিপালিত হইল এমন কথা নয়। পূর্ব্ববর্তী পরেরটীর ভূমিকা মাত্র। শুদ্ধচিত্ত না থাকিলে সদনুষ্ঠানও বিফল। এই জন্য গীতাতেও তিন রকম কর্ম্মবুদ্ধির কথা আছে—তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী। তমো-রজকে পরাভূত করিলে তবে সত্ত্বের স্ফুরণ। তামসীবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই পাশব—জড়বৎ অনুষ্ঠান, আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার যা নাকি মূল কারণ। রাজসবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে বিক্ষোভ আছে। বিক্ষোভে অবসাদও আসে, উদ্দীপনাও আসে। দুষ্প্রবৃত্তিমূলক বিক্ষোভে অবসাদ—ফল নরক, মৃত্যু। আর নিবৃত্তি-লক্ষ্য বিক্ষোভে উদ্দীপনা জাগে—শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে সৎকর্ম্মের প্রেরণা জাগে। ইহাই কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় স্তর।

শেষ কথা—সংস্কারশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা—যেখানে সুকৃতি-দুষ্কৃতির বিচার বা বিভীষিকা নাই—কর্ম্ম যেখানে জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্ত বলিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়াও অনাবিল। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি।



শিক্ষায় সমাধি

সদ্‌গুরুর আকাঙ্ক্ষা, যে অমূর্ত্ত ভাগবতী সত্তা তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন, শিষ্যের মাঝে তা মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বে। গুরু শিষ্যের মাঝে ভগবান্ গড়তে চান না, ফোটাতে চান। চল্‌তি ভাবে আমরা যাকে শিক্ষা বলি, তার মাঝেও এই তত্ত্বটী নিহিত রয়েছে। মানুষের মাঝে ব্রহ্মত্বের স্ফূর্ত্তি শিক্ষা বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। সে বিজ্ঞান সহজ হয় কি করে, তার সঙ্কেত কি আমাদের জানা আছে?

যিনি গুরু, তিনি সংস্কারমুক্ত পুরুষ, এ কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ঘরের ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করি সংস্কারবশে। মূলে দুটা তত্ত্ব এক হয়েও ব্যবহারে এই যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, একে অদ্ভুত বলা যায় না কি?

কেন এমন হয়? হয়ত শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপটী আমাদের জানা নাই। যতটুকু তালিম দিলে মতলবসিদ্ধির অনুযায়ী মানুষ গড়তে পারে, ততটুকু দিয়েই আমরা শিক্ষার পাঠ তুলে দিই। কিন্তু প্রকৃতির কাজ চলতেই থাকে। কোরকের শিক্ষা ফলের পরিণতিতে সমাপ্ত হয়। অপ্রবুদ্ধ শিক্ষকের তখন দেখা পাওয়া যায় না যে হিসাব-নিকাশ করে সব তার কাছ থেকে বুঝে নেব। কিন্তু অন্তর্য্যামী তার অপরাধের হিসাব রাখেন। "ত্বয়া হৃষীকেশ" বলে কি তখন দায়িত্ব থেকে খালাস হওয়া যায়?

যখন শিক্ষার সমস্যা তলিয়ে ভাবতে যাই, তখন কেবলি মনে হয়, এ কি পরপ্রবোধন না আত্ম-উদ্বোধন? জুলুমবাজী না আত্মসমর্পণ? উপকার না সেবা? উপযুক্ত শিক্ষকে স্ব-প্রতিষ্ঠ গুরুভাব জাগে—শক্তিসঞ্চয়ে শক্তিসঞ্চারণের শক্তি প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রবুদ্ধ

অহঙ্কার অপরের স্তিমিত আত্ম-চৈতন্যকেও প্রদীপ্ত করে তোলে। কিন্তু আত্মাভিমানে অন্ধ যে মূঢ় যোগ্যতার অভিনয় করে পরকে দুঃখ দেয়, নিজেও দুঃখ পায়, তাকে বোঝাবে কে? অপ্রবুদ্ধ আচার্য্যম্মন্যের কোলাহলে শিক্ষার তপোবন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে; আত্ম-শ্লাঘার আস্ফালনে গুরুশক্তি লজ্জায় স্তিমিত-প্রায় হয়ে থাকে!—প্রাণ জাগাবে কে?

বাস্তবিক সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদের যে কিছু করবার আছে, এই ধারণা নিয়ে যে শিক্ষাক্ষেত্রে পা বাড়ায়, বোধ হয় সে ঠকে। সমস্যা বোঝা চাই, সমাধান তার পর। বুঝতে হলে ধৈর্য্য চাই, অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করবার মত সমবেদনা থাকা চাই— সর্ব্বোপরি সাহস চাই। অন্যায় দেখবামাত্রই যে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তার দুর্ব্বল মনোবৃত্তি কাপুরুষতারই নামান্তর। অধুনা আমাদের সমাজে, পরিবারে কাপুরুষতাই শিক্ষকের আসন দাবী করছে।

মানুষ শিক্ষার ফর্ম্মূলা তৈরী করতে পারে না, তা তৈরী করে যুগশক্তি। এ কথাটা ভুলে গিয়ে যে নিজের সংস্কারকে পরের উপর জয়ী করতে যায়, তার পরাভব সুনিশ্চিত। জবরদস্তীর জয় পরাজয়ের ভূমিকা মাত্র। পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লব তার সাক্ষী। আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যে মনোরাজ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব চলছে, এ-ও সেই তত্ত্বেরই উদাহরণস্থল। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বা নীতিবাগীশ চটলে কি হবে? কালের ধর্ম্মে মেকীর জয় টেকে না—এখন যে পক্ষকেই দুঃখ পেতে হোক্ না কেন।

ধানের ফসল মাটী করে আলুর আবাদ করলে কি হবে? প্রকৃতিতে ঋতুপর্য্যায় আছে তো? জীবনেও কি ঋতপর্য্যায় নাই? ফল ফোটাবার রসায়ন জানে প্রকৃতি, মালীর তাতে কোনও বাহাদুরী নাই। সে নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণ মাত্র করতে পারে, তাতেই তার আনন্দ। কিন্তু এমন বোকা চাষীও আছে, যারা কাগজে-কলমে লাভের অঙ্ক খতিয়ে বারোমাসী বীজের ফসল করতে যায় এবং শেষটায় ঠকে নিশ্চিন্ত হয়। শিক্ষার আবাদেও বারোমাসী ফসল ফলানো আমাদের একটা বাতিক আছে। পাকা চাষীকে বলি, সেইখানে হুঁসিয়ার।

শিক্ষকের কি কোনও কাজ নাই? কাজ আছে বই কি! কিন্তু রুটীনবাঁধা কোনও কাজ তাঁর হতে পারে না। যিনি রুটীনের বাঁধনে জীবনটী বাঁধতে পেরেছেন মনে করেন, তাঁর বজ্রআটুনী ফস্কে 'গেরো সার। বিশ্বাস না হয়, হাঁড়ীর খবর নিয়ে দেখবেন। অতয় দরকার কি—নিজের মাঝেই স্তব্ধ হয়ে বুঝে দেখুন না কেন। জীবনে বৈচিত্র্য দোষের নয়, ওটাই রসায়ন—যদি ভোগ করতে জানি। রসায়নের মশলা জোগাড় করতে হয় আলাদা করে, কিন্তু না মেশালে চমৎকারিত্ব হয় না, তার খোলে না। মেশানোর কায়দা সবাই জানে না। যারা ওপরভাসা চালে চলে, তারা কি করে এই বৈচিত্র্যের রহস্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করবে? একমাত্র ধ্যানরসিকই জানেন, বিরোধের সামঞ্জস্য কি করে হয়। তিনিই যথার্থ শিক্ষক। আনাড়ী শিক্ষক বিরোধ মিটাতে যায় একপক্ষ উচ্ছেদ করে।

আত্মসমাহিতের যে সম্মোহনশক্তি, তাই পরকে প্রবুদ্ধ করে। সনাতন শিক্ষার এই মূল মন্ত্র। যেখানে সমাধির অভাব অর্থাৎ চঞ্চলতা, সেখানে আস্ফালন যত থাকুক না কেন, শিক্ষা বন্ধ্যা—এ ধ্রুব সত্য। যেখানে

চাঞ্চল্য, সেখানেই বিদ্রোহ—এও একটা সনাতন সত্য। চঞ্চলা প্রকৃতি বশ হয়েছে অচল পুরুষের কাছে, এ কথাটাও মনে রাখ্‌তে হবে।

আমি অবিক্ষুব্ধ থাক্‌ব—জাগ্রৎ থাক্‌ব—এই শিক্ষকের প্রাণপাতী সাধনা। এক জন সাহিত্যিকের লেখায় পড়েছিলাম, এক জন আচার্য্যের কথা উল্লেখ করে তাঁর এক ছাত্র বলেছিল, "রাগ তাঁর দেখিনি। অন্যায় হলে তিনি এক রকম অদ্ভুত হাসি হাস্‌তে থাক্‌তেন। তাঁর তিরস্কার হয়ত সহ্য হত, কিন্তু অন্যায়কারী সে অদ্ভুত হাসি সইতে পারত না।" কথাটা নিছক্ সত্য। হাসি শুধু সোহাগ বাড়ায় না, শাসন করতেও জানে।

ঋষিরা তপোবনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে উদাত্ত-কণ্ঠে আহ্বান করতেন, "রাত্রি যেমন দিনের পানে ছোটে, মাস যেমন বৎসরের পানে যায়, নদী যেমন প্রবণভূমিকে অনুসরণ করে, তেমনি ব্রহ্মচারীরা আমার পানে ছুটে আসুক।" এই প্রাণের আহ্বানে প্রাণ জেগে ওঠে—উপনিষদের সৃষ্টি হয়। এ তো শিক্ষকতার ব্যবসাদারী নয়। এমনি ডাকে একদিন রামকৃষ্ণ বাংলার প্রাণকে ডেকে তুলেছিলেন। এ ডাক বাঁশীর ডাক, ডাকাতপড়া হাঁক নয়।

নারায়ণকে নরের মাঝে জাগাতে হলে তাঁর সেবা চাই। তদর্পিতাখিলাচারতাই সেবা; সমস্ত আচার সেই নারায়ণকে উদ্দেশ করেই সমর্পণ করতে হবে। গুরুগৃহে আচার্য্য এমনি নারায়ণের সেবা—নরের সেবা সার্থক করেন। অভক্ত দেখে, শালগ্রাম কুৎসিৎ শিলা মাত্র; সে তো জানে না ভক্তের প্রাণে শিলা-বিগ্রহে ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শিক্ষার সাধনা যারা করে, তাদের বলি, নত হও, সেবক হও—অভিমান বর্জ্জন কর। নরবিগ্রহে নারায়ণের অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশের জন্য সহিষ্ণু ও সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাক। অবুঝের কথায় চলো না। তোমার ঐকান্তিকতা কি বৃথা হবে মনে কর? দানবীয় উপচারে দেবতার পূজা হয় না—এই কথা স্মরণে রেখে সেবায় প্রাণ উৎসর্গ কর।

শিক্ষাকে যদি সেবাই বল্‌লাম, দেবতার পূজাই বল্‌লাম, তাহলে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার—দেবপূজায় পৌত্তলিকতা পরিহার অতি প্রয়োজন। কথাটা আঁৎকে উঠবার মত কিছু নয়। আসল কথা এই, নিজের খুসীমত দেবতা গড়তে যেও না—ওটাকে ভালবাসার লক্ষণ বলে না। তোমার সংস্কারানুরূপ যে দেবতার রূপই কাম্য হোক্ না কেন, তাই অপূর্ণ, তাই দোষদুষ্ট। দেবতার সর্ব্ববিধ বিকাশের জন্য উদার অবকাশের রচনা কর, সঙ্কীর্ণ সংস্কারে তাঁর রূপ সঙ্কুচিত করো না।

তবে জানি, রূপের মায়া এড়ানো কঠিন। তাই শিক্ষারও একটা বিশিষ্ট রূপ অজ্ঞাতসারেও হয়ত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু রূপকেই একান্ত বলে গ্রহণ করতে নাই। অরূপ হচ্ছে রূপের ভূমিকা। অরূপই আশ্রয়, রূপ তার আশ্রিত। তাই বৈরাগী ভিন্ন প্রকৃত শিক্ষক কেউ হতে পারে না।

শেষ কথা এই, যদি সেবা করতে চাও, অবিরাম সঙ্গ কর। সঙ্গের প্রভাব সেবাকে সার্থক করে। উপরোধের উপর ভরসা করে

শিক্ষকতা করা চলে না। নিঃসঙ্গ শিক্ষকতাই তো আজ আমাদের সমাজে এত হাহাকারের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষকের অভিমানও উগ্র হয়ে উঠ্‌ছে, এই জন্য। যেখানে কর্ত্তব্যের ত্রুটী, সেখানেই কামনা-বাসনার দৌরাত্ম্য বেশী। তাই অকর্ম্মা মানুষই দৈবের ভরসা বেশী করে, আর ভরসা মত জিনিষ না পেলে চটে গিয়ে ভগবানকে গাল দেয়। জীবনসমস্যা জটিল হয়ে পারিবারিক শিক্ষাও এমন বরাতী হয়ে উঠেছে। ফলে আত্মকলহ—উন্মার সৃষ্টি। সব আপদ্ মিটে যায় যদি সেবকের চিত্ত নিয়ে অহর্নিশ সেবায় তৎপর থাকৃতে পার।

সেবক-জীবন

—ঃ{*}ঃ—

গীতার উপদেশ এই, যে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, তাহারই মোড় ফিরাইয়া যদি তাহাকে ঈশ্বরাভিমুখী করা যায়, তাহা হইলেই তাহা হইবে মুক্তির সাধন। ঈশ্বর বলিতে কি বুঝিব, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। উপাস্য বলিয়া জীবনের একটা কেন্দ্রবিন্দু, কেহ পায়, কেহ পায় না। যে পায় না, তাহার পক্ষে কর্ম্মযোগের উপদেশ কি আকার ধারণ করিবে? তাহাকে বুঝিতে হইবে, স্বার্থকল্পে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন অথবা দুঃখের হেতু; আর পরার্থে অনুষ্ঠিত-কর্ম্মই মোক্ষের দ্বার। সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে স্বীকার না করিয়া যাঁরা নীতিধর্ম্ম গড়িতে যান, কর্ম্মক্ষেত্রে সেবাব্রত স্বীকার ছাড়া তাঁহাদের আর গত্যন্তর দেখা যায় না। পাশ্চাত্যখণ্ডের ভাবুকতাবিহীন Ethics-এর মতবাদগুলি আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

এই পরার্থ প্রবৃত্তি হইতেই কর্ম্ম সেবার রূপ ধারণ করে। কর্ম্ম যদি জীবের সহজধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সেবাও তাহার জীব-প্রকৃতির উৎকর্ষের সহজ উপায়। কর্ম্মমাত্রেই একটা লক্ষ্য থাকে। কাহারও মতে সে লক্ষ্য সুখ, কাহারও বা মতে জ্ঞান। এ দেশের দার্শনিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রবৃত্তির সার্থকতা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার। অনিষ্টপরিহার নেতিমূলক। সামান্যতঃ ইষ্টপ্রাপ্তিকেই কর্ম্মের লক্ষ্য বলিতে পারি। কিন্তু এই ইষ্ট কে? সর্ব্বত্রই ইষ্ট আত্মা। আত্মা যাহার কাছে যে উপাধিতে প্রকাশিত, তাহার কাছে সেইরূপেই তিনি ইষ্ট। আমার কাছে তিনি দেহরূপে প্রকাশিত, তাই দেহই আমার ইষ্ট; দেহকে ধরিয়াই আমার যোগক্ষেম করিতে হইয়াছে—উহাই আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিদান। এইরূপে কাহারও বা মন, কাহারও বুদ্ধিই আত্মারূপে ইষ্ট এবং উহাই তাহার কর্ম্মের প্রয়োজক। স্বরূপতঃ আত্মা যদি কাহারও ইষ্ট হন, অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় যদি কেহ আত্মরতি, আত্মক্রীড় অতএব আপ্তকাম হন, তাহা হইলেও তাঁহার কর্ম্ম থাকে কি না, তাহা একটা সমস্যা। এক হিসাবে তাঁহার কর্ম্ম আছে, এক হিসাবে আবার নাই। এই জন্য

কর্ম্মের বিচার হইতে আত্মস্বরূপনিষ্ঠের কথা আপাততঃ আমাদিগকে বাদ দিতে হইবে। মোটামুটী আমরা দেখিতেছি, যদি আমার আত্মা দেহ, মন, বুদ্ধির উপাধিতে প্রকাশিত হন, তাহা হইলে যে কর্ম্ম আমার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা কিন্তু স্বার্থমূলক হইবে। ইহাকে সেবা বলা যাইতে পারে না। স্বার্থমূলক কর্ম্ম দুঃখের নিদান, কেননা আত্মার ব্যাপ্তি সেখানে স্বীকৃত হয় নাই। প্রত্যেকের কাছেই নিজের স্বার্থ প্রবল হইলে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য কর্ম্মজগতে বিচরণ করিতে যাইয়া আমরা দেখি, যেখানেই দেহকে বাঁচাইয়া কাজ করিতে যাই, কিম্বা নিজের মনের সংস্কার বা বুদ্ধির কালোয়াতী জাহির করিতে যাই, সেখানেই অপরের সঙ্গে যে শুধু বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা নহে, সে বিরোধ রীতিমত আমাকে পীড়া দেয়।

এই জন্য জীবের স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে কর্ম্মযোগী পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। আত্মসুখেচ্ছা সমস্ত কর্ম্মের জনক হইলেও এ ক্ষেত্রে আত্মা অতি সঙ্কীর্ণ পরিধিতে প্রকাশিত হইতেছেন। কাজেই দেখি, সংসারে কর্ম্ম অর্থই বন্ধন, দুঃখের নিদান। ইহার প্রতীকার করিতে গিয়া কেহ বলিলেন, কাজ নাই কর্ম্ম করিয়া। গীতাকার বলিলেন, এটা স্বাভাবিক রোগের অস্বাভাবিক চিকিৎসা। দেহ, মন, বুদ্ধির উচ্ছেদ করা তোমার এক্তেয়ার নয়; তাহারা খাটিতে আসিয়াছে, খাটিবেই। তাহাদিগকে জড় করিয়া রাখিলে, তোমার ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি। সুতরাং তাহাদিগকে খাটাও, কিন্তু মজুরী দিও না—তাহা হইলেই রস মরিয়া আসিবে; অথচ তাহা দুঃখের কারণ না হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির আবির্ভাব হইবে। কর্ম্মপ্রবৃত্তি যেমন তোমার প্রকৃতির এক দিক, ফলসমর্পণও তেমনি তাহার আর এক অত্যাশ্চর্য্য গুপ্ত দিক। কর্ম্মকে সেবায় পরিণত কর, দেহ-মন বুদ্ধি বজায় রাখিয়াও আনন্দ বা মুক্তিরসায়নের ভোক্তা হইবে।

তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, সেবাতে **আত্ম-লক্ষ্য পর-লক্ষ্যে** পরিণত হইতেছে। কর্ম্মে যেমন দেখি, অভিমান বা অহংকে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিতে হয়, নতুবা কর্ম্মে জোর তাগিদ থাকে না, সেবাতেও তেমনি পরকে সর্ব্বদা চোখের সামনে রাখিতে হয়, নতুবা উহার মাধুর্য্য তৎক্ষণাৎ অম্ল হইয়া উঠে। কেহ বলেন, সেবক যন্ত্র-স্বরূপ। ঠিক যন্ত্র বলিলে সেবকের অমর্য্যাদা করা হয়। আত্মকর্তৃত্ব নাই এই হিসাবে সেবক যন্ত্র বটে; কিন্তু তাহার আত্মচৈতন্য নিত্য প্রদীপ্ত। যন্ত্র হইলেও সেবক সচেতন যন্ত্র। গীতাতে আছে, ভগবান বলিতেছেন, ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রে চাপাইয়া ঘুরাইতেছেন। ইহাই মায়া। যন্ত্রচালিত জীব যখন হৃদয়ে যন্ত্রীকে দেখিতে পায়, তখনই সে সেবক। যখন যন্ত্রী চোখের আড়াল হইয়া যায়, তখন হাঁস-ফাঁস করিয়া কর্ম্ম করিলেও সে সেবক নয়, জীবাধম যন্ত্র মাত্র। এই জন্য গীতাতে সেবাকে যোগ বলা হইয়াছে—ইষ্টে সমাহিতচিত্ততাই তাহার লক্ষণ। যাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম, তাঁহাকে ভুলিয়া শুধু কর্ম্ম করিয়া গেলেই মুক্তি হইবে না। মুক্তি যে হইবে না, তাহার প্রমাণ—এমন কর্ম্মীর ছুটফটানি বেশী, রিপুর বিকার বেশী—হোক্ না সে যত বড় ভত-হিতৈষী।

এই গোড়ার কথাটা ভুলিয়া যাই বলিয়া আমাদের সেবকজীবনে কতকগুলি সমস্যার সূত্রপাত হয়, অনর্থও ঘটে। প্রায়শঃই দেখি, সেবকে সেবকে বনিবনাও হয় না—পরস্পর আত্মদোষে অন্ধ হইয়া পরস্পরকে দোষ দেয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখে না, প্রাণের ঠাকুর আড়াল হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া আজ প্রীতির প্রস্রবণ শুকাইয়া গিয়াছে—তাই এই দোষদর্শিতা। সকলেই যদি একজনকে ভালবাসে (অর্থাৎ তাঁর সুখে সুখী হইবার চেষ্টা করে,) তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিতে বাধ্য—ইহা জ্যামিতিক সত্য (যে সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে একই বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান)। উপাস্যকে ভালবাসি বলি, অথচ পরস্পর ঝগড়া করি—এর মাঝে ভণ্ডামি আছেই।

সেবকে সেবকে ঈর্ষ্যা জন্মায়। উপাস্য-বিস্মৃতির এই আর এক নিদর্শন। সেবাধর্ম্ম ভাগবতধর্ম্ম; পরার্থপ্রবৃত্তি বা ভক্তি তাহার প্রাণ। ভাগবত বলেন, ভক্তিই পর ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি। তাহার অধিকারী কে?—ভাগবত বলেন, যে সৎ, যে উজ্ঝিত-কৈতব ও যে নির্ম্মৎসর। সেবক হইতে হইলে সাধু হওয়া চাই, অকপট হওয়া চাই, আর চাই ঈর্ষ্যাশূন্য হওয়া। ছয়টা রিপু পর পর সাজানো আছে, সকলের শেষে রহিয়াছে মাৎসর্য্য। অনেকে ভাবেন প্রথম তিনটাই প্রবল—পরের তিনটে বাজে। কিন্তু আমরা জানি, পরের তিনটাকে সামলানোই সেবাব্রতের চরম পরীক্ষা। সেবক কাম, ক্রোধ, লোভকে টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া খেদাইয়া দিতে পারে, কিন্তু মোহ ছাড়া বড় কঠিন। যদিও বা ইষ্টস্মৃতিতে মোহের ঘোর কাটিয়া যায়, তবুও অভিমান ছাড়া আরও কঠিন। কাজ করিয়া ফলটী দিয়াছি ঠাকুরকে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে কখন তাঁহার ভোগ হইতে চুরী করিয়া অভিমানের আপ্যায়ন করিতেছি। হয়ত তাঁহার কৃপায় এই দুর্দ্দৈব হইতেও বাঁচিতে পারি, কিন্তু শেষ কালে ঈর্ষ্যার হাত হইতে আর কিছুতেই নিস্তার পাই না। "ও বুঝি বেশী আদর কাড়িল"—অত্যুৎকৃষ্ট সেবকের বুকেও এই বিষের জ্বালা। যদিই বা সে বেশী সোহাগ পায়, তাহাতে যিনি সোহাগ করেন, তাঁরই তো তৃপ্তি, আমি আত্মতৃপ্তির ব্যাঘাতে ক্ষুন্ন হই কেন?—এ ভাব তো সেবকের চিত্তে জাগে না। এতেই প্রমাণ হয়—লক্ষ্য ভুল হইয়া গিয়াছে—প্রাণের ঠাকুর আড়াল হইয়া পড়িয়াছেন।

সেবকেরা কর্ম্মে বিরক্ত হইয়া পড়ে লক্ষ্য বিস্মৃতির অতি নিকৃষ্ট পরিচয়। বোঝা যায়, যন্ত্রীকে ভুলিয়া যন্ত্র বনিয়াছ। আত্মশক্তির অভিমানে অন্ধ বনিয়াছিলে, যেই সে শক্তির পুঁজি ফুরাইয়াছে, অমনি অবসাদ আসিয়াছে। অথচ অভ্যাসবশে বা পারিপার্শ্বিকের চাপে কর্ম্ম চলিতেছেই, তাহাকে এড়াইবারও উপায় নাই। কাজেই তখন অক্ষমের শেষ সম্বল বিরক্তি। সেবাতে যদি চিত্তশুদ্ধি হয়, (আর তাহাই তো হইবে), তাহা হইলে যেখানে উপাস্যস্মৃতির প্রসঙ্গমাত্রও থাকিবে, সেখানেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতেও প্রাণে অমৃত তুফান বহিয়া যাইবে—মনে হইবে, এ যে তাঁর কাজ! কেন কাজ করিব, তার কি এর চেয়ে বড় যুক্তি কেউ দিতে পারে?

সেবক উদ্ধত হয়, পরপীড়ক হয়, সংশয়াতুর হয়—ভাবে তাঁর কাজ করিতে গিয়া এটুকু না হইলে চলে না। হয়ত তোমার চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে তুমি আদর্শ সেবক। এখানেও সেই উপাস্যবিস্মৃতি। সবাই যে তাঁরই সেবক, এই গোটা জগৎটাই যে তাঁরই পূজার আয়োজন—এ কথা যে প্রাণে প্রাণে বোঝে, সে কখনও রূঢ় ও দোষদর্শী হইতে পারে না। সে ফোঁস্ করে হয়ত, কামড়ায় না—বিষ ঢালে না। বিষ ঢালে না প্রমাণ এই—অপরে তাহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব বেশীক্ষণ বজায় রাখিতে পারে না। পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি না হইলে এটা হয় না।



দম্পতী-জীবন

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—:*:—

বেদান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটী আপত্তির কথা রাম শুনতে পেয়েছেন। সেদিন একজন বল্‌ছিল, এই যদি হিন্দুদর্শনের শিক্ষা হয়, তা হলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ কি, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আর একজন রামকে জিজ্ঞাসা করল, হিন্দুর এই বেদান্ত যদি জগতের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা বা ধর্ম্ম হয়, তা হলে আজ ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা কেন, আর খৃষ্টীয় রাজ্যগুলিরই বা এত সমৃদ্ধি কেন?

এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব রাম এখন দেবেন না; কারণ এ সব আলোচনা কর্‌তে গেলে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত বিষয়সমূহের আলোচনা স্থগিত রাখ্‌তে হয়। এ সব কথার জবাব এর পরের দু'চার বক্তৃতায় রাম দেবেন, আর সে জবাব এমনি ঢঙের হবে যে তোমরা তাতে অবাক্ হয়ে যাবে। তবে বেদান্তের উপদেশ যারা শোনে, তাদের প্রতি রামের এইটুকুমাত্র অনুরোধ যে তারা যেন অধীর হয়ে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করে না বসে। একটু ধৈর্য্য ধরে বক্তার শেষ কথাটী পর্য্যন্ত যেন তারা শোনে, এই অনুরোধ।

খৃষ্টানের যেমন বাইবেল, মুসলমানের তেমনি কোরাণ। তাতে এক জায়গায় আছে —"অসত্যাচরণ কর, পাপ কর—মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়াসক্তিতে ডুবে যাও;—তাহলে তোমার সর্ব্বনাশ ঘনিয়ে আস্‌বে।" একজন মুসলমান মদ খাচ্ছে আর যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌ছে দেখে একজন মোল্লা এসে তাকে উপদেশ দিতে গেলেন, বল্লেন, "ওরকম্ কর্‌লে কোরাণের আদেশ অমান্য করা হয়।" মুসলমানটী তখন কোরাণ আওড়িয়ে বল্লে, "দেখুন,

কোরাণ বলছেন, খুব মদ খাও আর মজা লুটো। এই তো কোরাণের আদেশ। মদ খেয়ে ব্যভিচার করতে তো শাস্ত্রই বলছে, আর বলবেইনা কেন?"

তখন পুরোহিত বললেন, "ভাই তুমি করছ কি? এর পরের অংশটুকু পড়ে দেখ দেখি—লেখা আছে, 'তাতে তোমার সর্ব্বনাশ হবে।' সেটুকু বাদ দিচ্ছ কেন?" মাতাল জবাব দিল, "জগতে এমন কেউ নাই যে কোরাণের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারে। আমি না হয় এইটুকুই পালন করলাম। শাস্ত্রের কথা কি সব মানা সম্ভব? কেউ বা এতটুকু মানে, কেউ বা তার চেয়ে আর একটুকু বেশী মানে—এই যা তফাৎ। সবটা কেউ মানে না; তবে আর আমি সবটুকু মানতে যাই কেন? ওই বয়েদের প্রথম অংশটুকু মানতে পারলেই আমার যথেষ্ট হবে।"

রাম কেবল এই অনুরোধ করছেন, ওই মাতালের যুক্তিটা তোমরা দেখিওনা। সবটা শ্লোক পড়তে হবে, তার পর একটা সিদ্ধান্ত করতে হবে, তার পূর্ব্বে নয়।

রামের একটা সোণার ঘড়ি ছিল; তার চেনের সঙ্গে নানা খেলনার মাঝে একটা খেলার ঘড়ি ছিল—আসলে, সেটা একখানা চুম্বক। ঘড়িটা চলত না, কিন্তু কাঁটাগুলি এধার-ওধার করে তাতে একটা বাজানো যেত। সে ঘড়িতে সব সময় বাজত এক, দ্বৈতের অবকাশ নাই। তুমিই সেই এক—দেশ, কাল নিমিত্তের অতীত; তারা তোমার শাসনাধীন, তুমি তাদের শাসনে নও; তোমার কল্পনার চাকর তারা।—দুই, তিন সব মিথ্যা— এক সত্য, কালের বন্ধন হতে মুক্ত।

প্রশ্ন—দাম্পত্য-জীবনে কেউ সিদ্ধিলাভের প্রয়াস করতে পারে কি?

কেউ বলতে পার, এ প্রসঙ্গ এখন থাক, রামের নির্ব্বাচিত প্রসঙ্গেরই আলোচনা চলুক; তার জবাবে বলছি, সব প্রসঙ্গই রামের নির্ব্বাচিত। যদি এই বিষয়ের আলোচনাটাই শেষ পর্য্যন্ত শোন, তাহলে তোমাদের উপকারই হবে। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি চমকিয়ে দেওয়ার মত হলেও শেষ পর্য্যন্ত শোনতে হবে। এ দেশের ভাবের সঙ্গে হয়ত সেগুলো মিলবে না—তাতে রামের বয়ে গেল। রাম শ্রদ্ধা করেন শুধু তোমাদের!

এ প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত বলেন, "ওষুধ দেওয়া হয় রোগীকে, সুস্থ মানুষকে নয়।"

যারা সংসারে অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়েছে, আপদে-বিপদে মুসড়ে গেছে, তাদেরই তো বেদান্ত বেশী দরকার। যে বিবাহিত হয়ে ধর্ম্মতঃ দাম্পত্যজীবন যাপন করছে, সে যত সহজে বেদান্ত উপলব্ধি করতে পারে, অবিবাহিত ব্যক্তি তত সহজে পারে না। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি অসাবধান হলে পারবে না। পিছিয়ে পড়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সত্যিকার সম্বন্ধটা না-জানার দরুণ ভারী ভুগতে হয়। এত গরজের, এত দরদের একটা চর্চ্চা আমরা ছাড়ব কেন? তবে এই বিবাহের আর এক দিক—বিবাহের আয়োজন নিয়ে—সম্প্রতি আমরা আলোচনা করবো না, এ নিয়ে আর এক দিন বলা যাবে।

রামের বিবাহের পর দুই বৎসরকাল স্বামী-

স্ত্রীতে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছিলেন—এটা সত্য ঘটনা, বাগাড়ম্বর নয়।

বিবাহে অবনতি ঘটায় না; তবে বিবাহিত জীবনে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। কতগুলি ভাব লোককে হীন করে দেয়, যথা ভয়, বিষয়াসক্তি, রূপ-গ্রহ। "আমি দেহ, আমার স্ত্রী দেহ" এই ভাবটাই তাতে প্রবল হয়—তখন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে দখলীস্বত্ব জন্মাবার জন্য একটা দুরন্ত আগ্রহ জন্মে যায়। যদি দাম্পত্য-জীবনকে এই ভাবে পরিচালন করা হয়, তাহলে সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

পেনিলোপ একবার কাপড় বুনছে আর খুলছে, এমনি করে তার কাপড় বোনা শেষ হবে আর কবে? যতটুকু লাভ হল, ততটুকু যে নিত্য খুইয়ে ফেলে, সে এগুবে কি করে? বেদান্ত ঘোষণা করছেন, বীর্য্যবন্ত হও, প্রেমে অভিষিক্ত হও, প্রেম নামে পরিচিত কামের দীনতা ও কলুষ হতে মুক্ত হও, দেহাত্মবোধ ছাড়িয়ে ওঠ। এই হচ্ছে কাপড়বোনার সঙ্কেত। কিন্তু তার পরেই যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দেহটার দিকেই নজর দাও, তাহলে সব মাটী। তোমার উন্নতি হবে কি করে? এতে কি প্রমাণ হয় যে মানুষ বিয়ে করবে না? তা নয়; কিন্তু বিবাহের প্রয়োগ করতে হবে অন্য রকম। বেদান্তের শিক্ষা অন্তর দিয়ে গ্রহণ কর। বিবাহকে আত্ম-উদ্বোধনের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ কর—এ তোমার মস্ত বড় সহায়ক হবে। যা পথের বাধা ছিল, তা ওপরে উঠবার সিঁড়ি হবে। বিবাহ যখন ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে পরিণত হয়, তখন যতবার তোমরা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কর, ততবার বন্ধন আরও দৃঢ় হয়—আরও অতলে তোমরা তলিয়ে যাও।

প্রবক্তারা নারীজাতির নিন্দা করে বলেন, নারী নরকের দ্বার। রাম কিন্তু তার বিপরীত মত পোষণ করেন। পকেটে একটা মদের বোতল পুরে (আধখানা বোতল দেখা যাচ্ছে) রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে একজন পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "মশায়, জেলখানার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারেন—একবার দেখ্‌তে যেতাম।" (গেল সপ্তাহে রামও যেতে চেয়েছিলেন!) পাদ্রীর হাতে ছিল একটা ছড়ি; তাই দিয়ে বোতলটা দেখিয়ে বল্লেন, "ভাই, এই তো সোজা রাস্তা রয়েছে—এই ধরে ঠিক পৌঁছে যাবে।" নারীর কথাও ঠিক এই সুরে বলা হয়। জগৎটা একটা কারাগার বটে; বর্ত্তমান দাম্পত্যজীবন ঠিক কারাবন্ধনেই লোককে নিয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ যদি শুদ্ধ পরস্পরের অবনতিই ঘটায়, তাহলে যে ভগবান শাস্ত্র লিখলেন, সেই ভগবানই পুরুষের বুকে এই শাস্ত্র লিখলেন কেন যে সে নারীকে খোঁজে? এটা একটা স্বতোবিরোধ নয় কি? এ বন্ধনের মূলে একটা রহস্য আছে। অজ্ঞানই এই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে নরকের দ্বার করে তোলে। দোষ অজ্ঞানের, দাম্পত্য বন্ধনের নয়। কি করে এই দোষ দূর করতে হবে, সেই হচ্ছে সমস্যা।

ধর, এই একটা শূন্য রয়েছে। ওকে যদি দশমিকবিন্দুর ডাইনে বসাও, ওর মূল্য কম্‌বে, যদি বাঁয়ে বসাও, বাড়বে। অবস্থানসম্পর্কে ওর মূল্য নিরূপণ হবে। তেমনি দাম্পত্য-জীবনেও তোমার মূল্য নির্ভর করছে অবস্থানের উপর, তোমার ঝোঁকের উপর; নইলে তোমার নিজস্ব মূল্য কিছু নাই।

পুরুষ স্ত্রীতে আনন্দ পায় কেন? এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে, নইলে এ সমস্যার মীমাংসা হবে না। সুখের নিগড়ে বাঁধা পড়েই তো মানুষ দাস হয়েছে। ট্রোজান যুদ্ধ তার উদাহরণস্থল। এর দরুণই একটী মেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আর একটী করে না। সুখ যে স্ত্রীর নিকট হতে পাওয়া যায়, এ ধারণাটা ভুল। এর মাঝে যে ন্যায়ের ফাঁকী রয়েছে, সেটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। স্ত্রীতে বা স্ত্রীর দেহে কোনও সুখ নাই।

প্রাপ্তির বিষয়ে যদি সমস্ত সুখ নিহিত না থাকে, তাহলে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছে সর্ব্বদাই আনন্দের নিদান হবে কি? আমরা জানি, এ কথা ঠিক নয়। সুখটুকু লুটে নিলে, তার পর তোমার অবস্থা কি হয়? তখন আর সুখের মাদকতা থাকে না। পুরুষ যখন নির্ব্বীর্য্য, তখন কি স্ত্রী সুখের খনি? স্ত্রী যখন রুগ্না বা অসতী, বা তুমি যখন পীড়িত, তখন সে স্ত্রীতে সুখ থাকে না। এখানে দুটী বস্তু পাই—দ্বৈত রয়েছে এখানে। দ্বৈত যদি না থাকে, তাহলেই পূর্ণ মিলন, শুধু দেহে নয়, দেহে—মনে—আত্মাতে। তার পর এমন একটা অবস্থা আসে, যা নাকি মুখে ব্যক্ত করা যায় না। দেহ তখন দেহ নয়, জগৎ জগৎ নয়। মিলন তখন স্বর্গ, অভয়, মুক্তি! কেননা সেখানে দ্বৈত নাই—আছে ঐক্য, অবিনাভাব। জগতের প্রলয় সেখানে—দেহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। ভ্রান্তি আর তখন থাকে না। আমিও দেহ নই—স্ত্রীও নয়; আমরা দেহ-মনের অতীত, জগতের উর্দ্ধে। এই তো সিদ্ধি। বেদান্ত বলেন, তোমরা তখন শক্তি ও আনন্দের প্রতীক; কেননা তোমাদের আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ এই মিলনে; বিদ্যুতের ধন ও ঋণ প্রান্তের মত আত্মার দুটী বিভাব মিলনে এক হয়েছে আর সেই সন্ধিস্থলে বিদ্যুতের আলোর মত আলো ফুটে উঠেছে। বিদ্যুতের পূর্ণ আবর্ত্তন ঘটেছে, দুটী প্রান্ত এক হয়েছে—তাইতেই আদিম সহজানন্দময় স্থিতি লাভ হয়েছে। অভয় আনন্দ সৃজনীশক্তি, ব্রহ্ম-সত্তা—এই তো আত্মার স্বরূপ। শুধু তখনই বলা চলে, "এই মানুষই নরদেহে ভগবান্।" স্বামী ও স্ত্রী যখন এই মূল তত্ত্বে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তখন জগৎও সেই রসে বিভাবিত হয়—আত্মা তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম এ সব হচ্ছে চাউলের মত, মৃত্যুতেই তার পাক এবং পূর্ণতা। আত্মা এ সমস্তই গ্রাস করেন, কেননা সৃষ্টিশক্তি তাঁর।

আবার অন্য দিক দিয়ে বেদান্ত বলছেন, যে অজ্ঞ, সেই বাহির দেখে মজে, অসত্যকে আশ্রয় করে আত্মাকে অবহেলা করে—ভাবে শুধু বাইরের খোসাটা!

বনের মাঝে একজনে একটা বই দেখতে পেল, মাটীতে পড়ে আছে; বিদ্যুৎ চমকালো; বোকার মত সে ভাবল, ওই বইখানাতে বিদ্যুৎ হয়েছে। অন্য রকম বুঝালে সে বুঝবে না—বই আর তার পরেই বিদ্যুৎ, দুটোকে সে কার্য্যকারণের সম্বন্ধে এক করেছে। তেমনি মানুষ মিলনে সুখ পায় বটে, কিন্তু জানে না সে সুখের মূল স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়—ভাগবতী সত্তাই তার মূল। মানুষ ভাবে তার মূলে বুঝি মানুষ!

এই ব্যাপার হতে কি বোঝ? এইটুকু দৃঢ় ধারণা করতে হবে, বিষয় হতে, ইন্দ্রিয়-

পরতা হতে মন যখন নির্ম্মুক্ত, তখনই সে সুখ আস্বাদন করতে পারে ; সে সুখানুভূতি একটা প্রচণ্ড শক্তি—আত্মার স্বরূপ। নীচের মনটা তখন মরে যায়, তার এলাকায় ঢোকবারও তো কোনও প্রয়োজন থাকে না। ভাগবতী সত্তার প্রকাশই এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র। সে সত্তা অনন্তশক্তি-স্বরূপ, দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত—মহাসমুদ্রবৎ ; বিষয় তাতে ফেণ তরঙ্গ বুদ্বুদের মত—মৌলিক-তত্ত্বের বিচিত্র প্রতীক তারা। তোমার দেহ এই তরঙ্গের মত। সমস্তই জলের ভেদ। নদীর দিকে তাকিয়ে ছোট ভাই বড় ভাইকে ডেকে বলছে, "দাদা, দেখ, কত বড় ঢেউ আস্‌ছে !" মূলে ওটা জল, কিন্তু তার অভিনব প্রকাশের ওপর জোর দিয়ে বলা হচ্ছে—"আমি ঢেউ দেখাবো—নদী নয় !" তেমনি এখানেও সত্য একমাত্র ভগবান্ অসীম মানস-সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য্য দেহপিণ্ডের বীচিভঙ্গ। তুমি-আমির সৃষ্টি—তা থেকে মানুষ আনলে বহুত্ব। বৈচিত্র্যে বহুত্ব—দেহে দেহে সঙ্ঘাত—একটা ঢেউ আর একটা ঢেউএর ওপর আছড়ে পড়ছে। বস্তুর যুক্তে বস্তুর সংঘাতে আনন্দ নয়, আনন্দ আত্মাতে। ঢেউ ভাঙ্গলেই জল, তেমনি বস্তু ভাঙ্গলেই আত্মা। বেদান্তী শিশুকে সোণা চেনাবেন ; একটা আংটী দিয়ে বললেন, "এই সোণা।" শিশু বল্লে, "গোল আকারটা সোণা ?" না। "রংটা সোণা ?" না। "চাকচিক্য সোণা ?" না। কি করে তোমায় বোঝাব ? আর একটা সোণার জিনিষ দেখানো হল—শেষে স্বর্ণত্ব অবচ্ছিন্ন হল—ছেলে বুঝ্‌তে পারল। বৈচিত্র্য হতে ধর্ম্মীর ঐক্য জীবনে গেঁথে নাও।

বাদশাকে বীরবল জিজ্ঞাসা করলেন, চোখওয়ালা লোক বেশী না কাণা বেশী ? তর্ক হল অনেক, শেষে স্থির হল, পরখ করতে হবে। বাদশা ভাবলেন, কাণাই কম। একটুকরা কাপড় নিয়ে মাথায় জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ? উত্তর হল, পাগড়ী। কাঁধে ফেলে বল্লেন, এটা কি ? জবাব হল, শাল। কোমরে জড়িয়ে বল্লেন, এবার ? জবাব হল, ধুতি। বাদশা বলে উঠলেন, "সব দেখছি কাণা ! ও সব কিছু না—ও যে কাপড় !", নামরূপের আড়ালে কাপড়খানাই লুকিয়েছিল।

"আত্মানং বিদ্ধি।" সোণা চিন্‌তে ভাঙ্গতে হবে না। ঘট-পট স্ত্রী-পুরুষ সব ভাবছ—কিন্তু পেছনে যে আত্মা রয়েছেন, তাঁর কথা ভাবছ না।

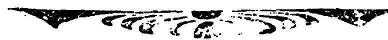
বলো না যে বিবাহ ধর্ম্মবিরোধী। সুখের প্রকৃত স্বরূপ কি, তা চেন ; বোঝ, আত্মা কি। সিদ্ধি যদি চাও, যথার্থ আনন্দ যা, মৌলিক তত্ত্ব যা, তারই ভাবনা কর। ভেদ ভুলে যাও—বন্ধন খসে যাক—সত্যে মজে যাও।

ওম্—এই আমার স্বরূপ ! পরখ চাই। এই কি স্বরূপ ? আমি কি এই ? তাই যদি হয়, জগৎ একটা তরঙ্গমাত্র, তার পেছনে ছোটা কেন ? বিদ্যুতের আলো সূর্য্যে ফোটে না। আঁধারে বিদ্যুৎ চমকায়, আলো দেখা দেয়। সূর্য্যের মাঝে যাও—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ক্ষুদ্র প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। গালাগাল করা ঠিক নয়। ডিঙ্গিয়ে না যেতে পারলে ওকে চাপা যায় না—তাই বলি ভাই, আসক্তির মোহ ছাড়িয়ে ওঠ !

জগৎ একটা ইন্দ্রজাল। আর ইন্দ্রজালের দরকার নাই। ভয় হচ্ছে পাপের মূল; আত্মজ্ঞানে ভয় দূর হয়। শুদ্ধ হও—অন্য ধর্ম্মপ্রচার বৃথা।

স্বভাবের পথে বিজ্ঞানের মতে চলে ভারতবর্ষে স্ত্রী স্বামীকে বাধা দেয় না, এগিয়ে দেয়।

সিদ্ধিলাভের পর রাম আরও দুই বৎসর ঘরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও বেদান্তের উপদেশ পেলেন—ধূপ দীপ ফুল জল নিয়ে আসতেন, আত্মধ্যানে ডুবে যেতেন। রামের সম্মুখে পূজোপকরণ নিয়ে জানু পেতে বসতেন, রামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হত, তাঁর দেহ যেন বিগ্রহ, রামে আত্মার ভাবনা করে আত্মাতে ভগবদ্দর্শন করতেন, এই ভাব ছড়িয়ে পড়ত, পরস্পর পরস্পরের মাঝে ব্রহ্মদর্শন করতেন, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে সিদ্ধ হলেন। রাম তাঁর জীবনখানি তুলে ধরলেন। কিছু কাল এই ভাবে গেল। মাসের পর মাস কেটে গেল, বিষয় চিন্তা মোটেই মনে আস্‌ত না, কামজয় হয়ে গিয়েছিল, পরস্পর পরস্পরকে বুঝতেন—তাই দুজনেই মুক্ত। স্বামী স্ত্রী সংস্কার মুছে গেল, বাঁধন রইল না। তিনিও ভাবতেন না—এই স্বামী, রামও ভাবতেন না—এ স্ত্রী। ভাবের সঙ্কীর্ণতা আর অধিকারবোধ থেকে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি। স্বার্থে স্বার্থে তখন সংঘাত—ফলে বিবাহিত জীবনের বাধা-বিপত্তি। বেদান্ত উপলব্ধি করে ও হতে মুক্ত হও! সন্তান-সন্ততিকে মুক্ত কর। মানুষের হাতে হানি হয় না। জগৎ তখন নন্দন। ভগবান কখনও মেকীতে ভোলেন না। ওম্—ওম্—ওম্!



বুদ্ধির মরণ

কথায় বলে, অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। আমাদের বুদ্ধিরও সেই দশা। বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র সংস্কার, বিচিত্র কামনা—তাই বুদ্ধিও বিচিত্র। বৈচিত্র্যের মূলে যে এক দেখে, তাকেই বলি সমঝদার। তেমনি বিচিত্র-বুদ্ধিকেও যে একটাই গুটাইয়া আনিতে পারিয়াছে, অধ্যাত্মজগতে সেই বাহাদুর।

বুদ্ধিকে একমুখী করা অর্থে তাহাকে মারিয়া ফেলা। তোমার আমার বুদ্ধি তো খণ্ড-বুদ্ধি—তাই তোমার সঙ্গে আমার মিল নাই। অথচ মূলে এক ধীশক্তি হইতেই সবার বুদ্ধি প্রেরণা পাইতেছে, বিশ্বাস করি। শুধু বিশ্বাস করা কেন, চোখের সামনে প্রতিদিনকার খুঁটিনাটিতে তাই তো দেখিতে পাইতেছি। যেমন জড়ের কতকগুলি আইন আছে—খুঁজিয়া বুঝিয়া নিতে পারলেই

তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া যাই, তেমনি মনোরাজ্যেরও কতকগুলি আইন আছে। সূক্ষ্ম হইলেও সেগুলি জড়ের কায়দাতেই চলে। তবে বৈচিত্র্য হয় কোথা হইতে? জড়ে যেমন উপাদান-মিশ্রণের তারতম্যে বৈচিত্র্যের উদ্ভব, মনেও তেমনি ঘাত-প্রতিঘাতে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। এই হিসাবে সমস্ত জড়ের মূলে যেমন এক স্বীকার করি, তেমনি সমস্ত বুদ্ধির মূলকেও এক স্বীকার করিতে তো কোনও বাধা নাই।

এখন রহস্য এই, বুদ্ধিকে এক স্বীকার করিব, বুদ্ধি দিয়াই। জড় যখন বুদ্ধির বিষয় হয়, তখন বিচারে বড় বেশী বাধে না—কেননা বুদ্ধি ও জড় পৃথক, এ সংস্কার আমাদের পূর্ব্বাপর থাকে। কিন্তু খণ্ডবুদ্ধিকে অখণ্ডবুদ্ধির সামনে দাঁড় করাইলে তাহার আর খণ্ডতা থাকে না—যেমন অন্ধকার ঘর হইতে প্রদীপকে বাহিরে সূর্য্যের আলোতে আনিলে তাহার আর দীপনী শক্তি থাকে না। প্রদীপের এই মরণকে তাহার মৃণ্ময় আধারের দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হইবে, এ যে বিনাশ, অতএব ভয়ানক। কিন্তু শিখার দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝি, এ তো তার জ্যোতিঃরই উৎকর্ষ।

জীবত্বের মায়া কাটানো এই জন্য মানুষের পক্ষে বড় কঠিন। তাই দেখি, ধুরন্ধর দার্শনিকরাও অদ্বৈতবাদকে ভয় করিয়া চলেন। আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছিলেন, দেহের সত্তা ধরিয়া যেখানে টান পড়ে, সেখানে ভয় হইবে, এ তো স্বাভাবিক, কেননা ভয় দেহেরই আছে। কিন্তু দেহের ভয় না আমার ভয়, এইটা বুঝিতে পারাই তো একটা মহাসমস্যা। দেহ আর আমি, দুইটা যে পৃথক্—এ বুদ্ধি আসিবে কোথা হইতে? হেঁয়ালী করিয়া বলিতে হয়, বুদ্ধির মরণ হইলেই এই বুদ্ধি আসিবে অর্থাৎ দেহ-বুদ্ধি গেলে তবে আত্ম-বুদ্ধি আসিবে।

কি করিয়া আসিবে, সে বিতণ্ডা চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। সাধনপন্থাও যে কত আবিষ্কার হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সমস্ত পথের মূলেই একটা ফাঁকী আছে—বিজ্ঞাপনের মোহে মানুষ সেটা খেয়াল করে না; কাজেই আসল ছাড়িয়া নকলে মজে। বইয়ের বাজারে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, বিদেশীভাষা শিখাইবার নূতন কায়দা বাহির হইয়াছে—এইবার আর মাষ্টারের সাহায্য নিতে হইবে না, ঘরে বসিয়াই শেখা চলিবে। বই কিনিয়া আনিয়া দেখিও, কেহ বা সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, কেহ বা সংক্ষিপ্ত অভিধান দিয়া পৃষ্ঠা বোঝাই করিয়াছেন। যিনি যাই করুন না কেন, সহজে বা রাতারাতি শিখাইবার সঙ্কেতটা মাথা কুটিয়াও কেহ শিখাইতে পারিতেছেন না। সেটা কিন্তু নির্ভর করিতেছে যে শিখিবে, তাহার উপর।

অধ্যাত্ম-জগতেও শোনা যায়, অমুকটা সোজা ধর্ম্ম, অমুকটা এই যুগের ধর্ম্ম। কিন্তু মানুষ দিয়া যাচাই করিলে শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই উৎরিয়া যায় বলিয়া তো মনে হয় না। তবে যে মানুষ মারামারি করিয়া মরে কিসের জন্য, তা বোঝা কঠিন। ওইটুকু বুদ্ধির কারসাজি। ওকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে এত গণ্ডগোল থাকিত না।

সহজ দৃষ্টান্ত দেখি—সময় না হইলে ফল পাকে না। জাঁক দিয়া কলা পাকানো যায়, কিলাইয়া কাঁঠাল পাকানো যায়, কিন্তু সেটা

মানুষের বুদ্ধির ফের। তাই রসভোগে সেই তো ঠকে। এই যে সময়ে সব হয়, এটা একটা মস্ত ভরসার কথা, ভয়েরও কথা বটে। কেউ বলিবে, সময়ে যদি হয়, তবে আর এখন তাড়াহুড়া কেন? এ'ও বুদ্ধির বালাই। বলি, তাড়াহুড়া কি তুমি খেয়ালখুসীতে কর, না তোমার ঘাড় ধরিয়া কেউ করাইয়া নেয়? অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, ভগবান্, এক কথায় তোমার, আমার আর জগতের শান্তি করিয়া দিতেছি। আমি যুদ্ধ করিব না। ভগবান্ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, যুদ্ধ-বুদ্ধি ছাড়িতে চাও, বটে, কিন্তু ওটাই একটা কুবুদ্ধি। তুমি করিবে না, তোমার ঘাড়ে করিবে। তার চাইতে মানে মানে করা ভাল। আবার যদি বল, আচ্ছা, আমিই করিতেছি, আমিই করিব; সেও ভাল কথা নয়—তুমিই বা করিবার কে?

এই তো দেখি মহাসমস্যা। কিছু করিব, এ বলাও বিপদ্—কেননা ফল পরের হাতে। করিব না—এ বলাও বিপদ্, হয়ত কথা রাখিতে পারিব না। এ জায়গায় কি করা যায়? বাধ্য হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হয়, হরি, তোমার যা ইচ্ছা, করাইতে হয় করাও, না করাইতে হয় না করাও। এই হইল বুদ্ধির মরণ।

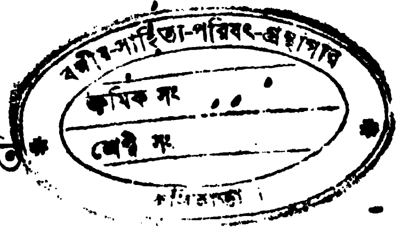
কথাটা বলা সোজা। কিন্তু থাকিতে বহুদিন লাগে। দুই কাজেতে সমান রাজী, এ কি সোজা বীরত্বের কথা? একেবারে খাঁটী মিলিটারী শিক্ষা চাই। বসিয়া আছ তো আছই, আর যদিই বা বিউগল বাজিয়া উঠিল, অমনি আর মাথা চুলকাইবার ফুরসুৎ থাকিবে না—একেবারে মরণের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।

এইবার সমর্পণের কথা বলি। বাস্তবিক, যে মরিতে ভয় পায়, সে সমর্পণ করিতে শিখে নাই, উদাসীনও বলিতে পারে নাই। হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকার উপদেশকে কুঁড়েমির প্রশ্রয় বলিয়া হয়ত কেহ মনে করে। কিন্তু সব ছাড়ার শেষ অর্থটা যে মরণ, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। শান্তির পথটা এই মরণের ভিতর দিয়াই। দেহের মরণ, ইন্দ্রিয়ের মরণ, বুদ্ধির মরণ—জীবের মরণ; এই হইল রসায়ন বা শিবায়ন। মরণের জন্য তৈরী হওয়াটাই জীবনের যথার্থ সাধনা।

যে মরিতে ভয় পায়, ধর্ম্মের বড়াই করা তার সাজে না। সাধু অসাধু, বৈদান্তিক অবৈদান্তিক এক আঁচড়ে চেনা যায়। মৃত্যুভয় থাকিলে চলিবে না। তার জন্যই সংযম, তিতিক্ষা, উপরতি।

মরণে যে আনন্দ আছে, সে যে না মরিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না। যেমন নিদ্রায় বিশ্রাম এক সময় নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন হাজার ভোগেও জাগিয়া থাকাটা অসহন হইয়া উঠে, তেমনি এক সময় মরণের জন্যও জীবন আকুল হইয়া উঠে। মরণের বাঁশীর ডাক যে শুনিয়াছে, সেই জানে, জীবনের সুর সে বাঁশীতে যেমন করিয়া বাজে, এমন আর কিছুতে নয়।

মরণ সত্য, প্রলয় সত্য। বলিতেছি না যে বৈচিত্র্য অনাবশ্যক। জীবনের বৈচিত্র্য যখন মরণের কোলে ফুটিয়া উঠে, তখনই মুক্তি, তখনই আনন্দ—এই আদর্শকে সার করিয়া থাক। কিছু-নাইর বুকেই সব-কিছু বাসা। আজ আকাশের বিরাট্ শূন্যতা না থাকিলে গ্রহ-নক্ষত্রের ফুলশয্যা বিছানো হইত কোথায়? মরণই অদ্বৈত, জীবন বহু। মরণকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিতেছেন—"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" আমাদের বুদ্ধিকে মহাকাল একের দিকে—তাঁরই কোলে টানিয়া নিতেছেন।



শ্রুতি-স্মৃতি

যোগের দ্বারা যে সমাধি হয়, তাতে একটী ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র জ্ঞান হতে পারে। বেদান্তের জ্ঞানই প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব। বেদান্তের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার পর সমাধি আনবার চেষ্টা করলে যথার্থ স্বরূপজ্ঞান বা পূর্ণ সমাধি হয়ে থাকে। বেদান্ত বেদের অন্ত, সমস্ত জ্ঞানের চরম অবস্থা বেদান্ত। জাগতিক বস্তু হতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করলে আমির অনুভব থাকে; তাকে ধরে বিচারের পথে বেদান্তের দিকে অগ্রসর হতে হয়।

*

প্রতিষ্ঠা বড় খারাপ জিনিষ—অজ্ঞাতসারে তা সাধকের মাঝে সংক্রামিত হয়। এমন কি, তাতে ত্যাগ-বৈরাগ্যযুক্ত সাধকের পর্য্যন্ত পতন ঘটায়। ক্রমাগত লোকের কাছে সাধুর সম্মান পেতে পেতে মন ঐ দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন সে সম্মান সবার কাছ থেকে দাবী করে, সম্মান না পেলে বিকার হয়। ভগবানে দাস্যভাবে আত্মসমর্পণ না করলে আর অহংনাশের উপায় নাই। তাঁতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই একমাত্র শ্রেয়ঃ। তিনি যখন যাকে দিয়ে যা করিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন, তাই করবেন, সুতরাং জীবের অহঙ্কারের কিছুই নাই, কিম্বা হেয় উপাদেয় বলেও তো কিছুই নাই।

*

সমস্ত নারীদেহই জগৎজননীর আধার। আধারকে কখনও ভালবাসতে নাই। কেন্দ্রীভূত সমষ্টি মায়ের কৃপা পেলেই ব্যষ্টি আধারেও তাঁর কৃপা ও আনন্দের অনুভূতি হয়। কিন্তু ব্যষ্টিতেও সেই সমষ্টিকেই দেখতে হবে।

*

ভগবান্ জীবকে সর্ব্বদাই পরীক্ষা করেন, দেখেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও বস্তুতে ওর আকর্ষণ হয় কি না। যদি বাজে জিনিষে ভুলিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আর নিজকে দেন না। সহজে তিনি ধরা দিতে চান না। যদি সাধক কোনও প্রলোভনেই মুগ্ধ না হয়, তাহলে অগত্যা ভগবান্ নিজে এসে সামনে দাঁড়ান। যার যে জায়গায় দুর্ব্বলতা আছে, তিনি এসে সেই জায়গাটাতেই আগে ধরেন। সাধুগিরির ভাব কি জগতে প্রশংসা ও বাহবা পাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ভাব সাধন-পথের বিষম অন্তরায়। নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি রেখে এই সমস্ত প্রলোভন হতে দূরে থাকতে হবে। যে অপরকে বঞ্চনা করে, তারও বরং উপায় থাকতে পারে, কিন্তু যে নিজকে প্রতারণা করে, সেই আত্মপ্রতারকের আর উপায় নাই। এই জন্য সাধককে সর্ব্বদাই প্রলোভন থেকে দূরে থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

*

তুমি কারু থেকে বড়ও নও, কিম্বা কারু থেকে ছোটও নও। তুমি আত্মানন্দে থাক, নিজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাক। সুখ-দুঃখ সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত, সদসৎ এ সমস্ত আসবে আবার চলে যাবে, তাদের সঙ্গে

নিজকে কখনও জড়িয়ে ফেলো না। এ জগতে তোমার হেয়ও কিছু নাই—উপাদেয়ও কিছু নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শন কর।

*

সগুণ মা, নির্গুণ বাবা। সগুণ-নির্গুণের মিলনাত্মক ভাবই আমি বা ব্রহ্ম। হরগৌরীর যুগলমিলন জ্ঞানের সমন্বয়। গৌরী সগুণ—মহাশক্তি, হর নির্গুণ—প্রেমের ভাব। হরগৌরীর ভাবে বেদান্তের সহিত সামঞ্জস্য আছে—এ ভাব অনাদি-সিদ্ধ। তার পরেই রাধাকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দরূপী মা-ই কৃষ্ণ, মায়ের হ্লাদিনী শক্তিই রাধা। জ্ঞানের সঙ্গে মিশিয়ে এই সমস্ত মূর্ত্তির আরাধনা না করলে, সে সব সংস্কার সত্য জগতে দূর করা কঠিন। ইষ্ট-মূর্ত্তিতে ভাব মিশিয়ে নিলে আর কোনও ভয় নাই।

*

নিরালম্ব নির্ব্বিকল্প অবস্থায় প্রকৃত সত্য অর্থাৎ বেদান্তজ্ঞান আপনি লাভ হয়। জীব-কোটী সে সমাধির পর ফিরে না। ঈশ্বরকোটী সঙ্কল্প থাকলে ফিরে। ভক্ত যদি জ্ঞানীকে বলেন, আমি দ্বিভুজ মুরলীধর দেখেছি, জ্ঞানী বলবেন, তুমি তোমার মনকেই দেখেছ, কিম্বা ব্রহ্মকে তোমার মনের আবরণে আবরিত করে দেখেছ, প্রকৃত সত্য দেখ্‌তে পাও নি।

*

কর্ম্ম দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বর লাভ করা কিম্বা কোনও সিদ্ধি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সিদ্ধি পাওয়া আর তাঁকে পাওয়া এক কথা নয়। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে কেউ পেতে পারে না বা জান্‌তে পারে না, তিনিই কেবল তাঁকে জানেন।

*

যে শক্তি ব্রহ্ম হতে বিকারের দিকে নিয়ে যায়, তাই বহিরঙ্গ শক্তি বা মায়া; আর যে শক্তি ব্রহ্মের দিকে অর্থাৎ নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়, তাই অন্তরঙ্গ শক্তি বা যোগমায়া। এই দুই শক্তির খেলাতেই সৃষ্টি এবং প্রলয় হচ্ছে। জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসেও এই খেলা।

*

একই আত্মা গুণভেদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উপাধি লাভ করেন। আত্মা ত্রিগুণ দিয়ে যখন ইচ্ছামত কাজ করান, তখন তিনি পরমাত্মা, আর যখন গুণের সঙ্গে নেমে এসে গুণ দ্বারা পরিচালিত হন, তখনই তিনি আত্মা।

*

ভূলোক ছাড়া অন্য কোনও লোক থেকে মুক্তি হয় না। অন্য লোকে কেবল সেই লোকেরই জ্ঞান হতে পারে। এক ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ব্রহ্মারও অন্য ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় জ্ঞান নাই। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোকের ওপরের চারি লোকে থাকলে মুক্তির দেরী হয়, কারণ সে সমস্ত লোকে উচ্চ ভোগে আসক্ত থাকলে এই লোকের কত যুগ যুগান্তর যে অতীত হয়ে যাবে, কত জন যে মুক্তি লাভ করবে, তার সীমাসংখ্যা নাই। অথচ উচ্চলোকবাসী সাধক তা জানতেই পারবে না।

*

নামজপ খুব প্রয়োজন। সাধনামাত্রই মূলে জপ। ধ্যানে স্থূলজ্ঞান গেলেই নিজের সংস্কার জেগে ওঠে, ধ্যানের মূর্ত্তি আর থাকে

না। সুতরাং জপের সূত্র ধরা না থাকলে ধ্যানে সফলতা আসবে না। তাঁর নামজপ সহ আত্মসমর্পণ ও দীনতা আনতে হবে, তবেই তাঁর কৃপা হবে।

*

বৈষ্ণবের ভাবের সাধনগুলি খাঁটী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। সখীভাবের যারা সাধন করে, তারা ক্রমে সখীতে মিশে যায়—তখন তাদের সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মাত্মক রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন হয়। সখীই বেদান্তের সাক্ষী চেতা—কেবল নির্গুণ নয়। সখীভাবে সাক্ষিস্বরূপে থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখা যায়।

*

কোনও কোনও জ্ঞানপন্থীর মত এই যে নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে জগতের জ্ঞান থাকে না—জগৎ দেখা যায় না। কিন্তু এ মত ঠিক নয়। তাহলে নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে জ্ঞানীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও মুক্তি হয়ে যাবে—জগৎও সেই জ্ঞানীতে লয় হয়ে যাবে। যদি জ্ঞানীর সত্যদর্শনও সত্য হয়; আবার ব্রহ্মময় জগতও সত্য হয়, তবে সত্যদর্শনে এই জগতের সত্যও বা জ্ঞানী কেন দেখবেন না? যদি না দেখেন, তাহলে বুঝতে হবে, ঠিক নির্ব্বিকল্প-সমাধি হয় নি।

*

এ জীবনে যত কিছু শিক্ষা বা উপদেশ পেয়েছ, তার কিছুই বৃথা নয়। যখন আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চস্তরে উঠবে, তখন ওই সব শিক্ষা ও উপদেশ আপনা হতে ফুটে উঠবে। পূর্ব্বে যা ধারণা করতে পারনি, তার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখে মোহিত হবে। বোঝা যাক্ আর না যাক্, জগতে কিছুই নষ্ট হয় না।

*

এ জগতে সবাই স্বার্থপর—সবাই সুখ চায়—ঠিক ভগবানকে চায় না। ভগবানকে চাই—এ মিথ্যা বাচালতা। যারা গোপাল কি কিশোরমূর্ত্তি চায়, তারাও তাদের মনমত, সংস্কারমত—সুন্দর দেখে তাঁকে চায়। ভগবানের শরীরে যদি সজারুর মত কাঁটা হত, বিশাল দাঁত থাকত, তাহলে এরূপ মূর্ত্তিকে ভক্ত আলিঙ্গন করত?—না, তা কেউ চায় না—সবাই নিজের মনমত সুখের জিনিষই চায়।

*

বাংলার কৃষ্ণ, বম্বের কৃষ্ণ—আর মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্ত্তি বিচার করলে দেখা যায়, প্রত্যেকে নিজের সংস্কারানুকূল মূর্ত্তি গড়ে নিয়েছে। মাদ্রাজের ওই সব দিকে গহনার খুব প্রচলন, কাজেই তারা কৃষ্ণকে গয়নার এত চাপ দিয়েছে। কৃষ্ণ তাদের মনমত হয়ে না আসলে তারা তাঁকে হয়ত চিনতেই পারবে না। কাজেই ঠিক ঠিক ভাবে না ধরলে সত্য-দর্শন হয় না।

*

ভগবৎদর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয় যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দেখতে পায় মাত্র। তার বেশী সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। (ক্রমশঃ)



"যচ্চ কামসুখং লোকে !"

—:*:—

যতক্ষণ দেহ-বোধ, ততক্ষণই কাম। কাম দেহেরই ধর্ম্ম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলছেন—ওটা দেহের সনাতন ধর্ম্ম। সে কথা বিশ্বাস করতে পারি না—কেননা দেহধর্ম্মের একটা উন্নত সংস্করণও আছে দেখেছি। সে যাক, মোটের ওপর কাম রয়েছে দেহের একটা পরিণতিকে আঁকড়ে ধরে। তাই কামদমনের পক্ষে দেহের চর্চ্চা করা সকলের আগে প্রয়োজন।

পাতঞ্জল বলছেন, শৌচের কথা। "শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা, পরৈরসঙ্গশ্চ"—শৌচ অনুষ্ঠানে নিজের দেহের প্রতি ঘৃণা হয়, পরের সঙ্গ করতেও প্রবৃত্তি হয় না। এই ভাবটা ঠিক প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজকে দেহ থেকে কতকটা আলাদা বলে ধারণা করতে হবে। ভাব অনুশীলনের যুক্তি এই—দেহটাকে সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কার না রাখলে যখন মুহূর্ত্তেই এটা ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে, তখন আর এর প্রতি এত মমতা কেন! এই হল প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু দেহশৌচের একটা উৎকর্ষও আছে। শৌচের ফলে মালিন্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক বিরতি জন্মায়—নোংরা জিনিষ ঘাঁটতে আদপেই ইচ্ছা হয় না। স্নায়ুতন্তুগুলি এত সুকুমার হয় যে মলিন জিনিষের অজ্ঞাতসারে স্পর্শ ঘটলেও দেহ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থাতেই পরের দেহের সঙ্গ জঘন্য বলে মনে হয়। কাম দমন তখন স্বাভাবিক হয়।

কিন্তু মনের কামকে তো মারা চাই। অবশ্য দেহ-মনে নিবিড় সম্পর্ক। দেহ যখন মরে আসবে, মনও তখন মুমূর্ষু হবে। তবুও কোথা থেকে সংস্কার উঁকি দেয়। এই জন্য দেহের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মনের সাধনটাও জুড়ে নিতে হয়; তাহলে কাজ পাকা হয়। মনের দিক দিয়ে কামদমনের পন্থা বলছেন, বেদান্ত।

দেহাত্মাভিমানই যখন কাম, তখন কাম দমন করতে হলে খুব তেজের সঙ্গে ভাবতে হবে, আমি দেহ নই! যেমন ইন্ধন না পেলে আগুন জ্বলে না, তেমনি দেহের আশ্রয় না পেলে কাম কখনও উদ্দীপ্ত হতে পারে না। এ জন্য লোকে বলে, শাস্ত্রেও বলে, সঙ্গবর্জ্জন করতে, অর্থাৎ পরের দেহ এড়িয়ে চল্‌তে। সে তো ভাল কথা; কিন্তু যে পর্য্যন্ত নিজের দেহটা না এড়াতে পারবে, সে পর্য্যন্ত পরের দেহ এড়িয়েও ফল হবে না। নিজকে না হটিয়ে পরকে হটিয়ে রাস্তা সাফ করবার মাঝে অনেক বিপদ আছে।

আমি দেহ নই—খুব তেজের সঙ্গে এ কথাটা বার বার আওড়াও দেখি, কাম কোথায় থাকে! কাম তো নারীদেহে বা নরের দেহে নয়—কাম যে তোমার নিজের মাঝে। কামুক নারীর প্রতি লোলুপ; সাধু-স্বন্য তার নিন্দা করেন। ক্রমে একটা কথা হয়, নারীর সৌন্দর্য্যই কাল। তখন বৈরাগী চিত্রকরের দল এসে হাজির হন, আর নারী-দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য খসিয়ে তার কঙ্কাল বের করে খুশী হয়ে ওঠেন। পরলোকের বেত্রাঘাতের ভয়ে শুষ্ক সংযমীর দল যথাসাধ্য

সেই কঙ্কালের ধ্যান করে, আর মনের কোণে আপশোষ পুষে রাখে। কেউ বা হয়ত মুখ ফুটে আপশোষের কথাটা বলেও ফেলে। অমনি সাধুর সমাজে তার ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে যায়। ধর্ম্মের জগতে এমনি করে পরকে ধরে সংযমের উপদেশ চিরকাল চলে আসছে। কিন্তু আসল গলদ যে নিজের মাঝে, সে কথাটা কেউ বুঝছে না।

কামের মাঝে নর-নারী উভয়ের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু নারীকে উপলক্ষ্য করে কথা-গুলি বলছি—কারণ এইটাই হয়েছে পদ্ধতি। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলি পুরুষের উপলক্ষ্যেও তুল্যভাবে প্রযোজ্য।

ভগবান্ নারীকে সুন্দর করলেন কেন —এ-ও একটা কৈফিয়তের বিষয় হল। এ কথা কেউ ভাবলে না, শুধু ভোগের জিনিষটা যে সুন্দর হয়, তা নয়, পূজার জিনিষটাও তো সুন্দর হয়। ঘরে ছেলে-পিলে আছে, লোভের বশে ঠাকুরের ভোগে দৃষ্টি দেবে, সেই ভয়ে কি ঠাকুরের ভোগে ভাল জিনিষ দিতে নাই? হয় ছেলে-পিলের সামনে ভোগ সাজিও না—নয়ত আরও ভাল কথা, ছেলে-পিলেদের ঠাকুরকে ভক্তি করতে শেখাও, তাঁর সুন্দর ভোগের আয়োজন করে তারা খুসী হোক্। কামুককেও এই শিক্ষা দিতে হবে, ভোগের সৌন্দর্য্য নয়—পূজার সৌন্দর্য্য দেখে সে তন্ময় হোক্! তন্ত্রের নামে মানুষ নাক সিঁটকায় —কিন্তু তার দর্শনের মূল কথাটাই এই—যা ভোগ, তার পূজা। নারীকে ভগবান্ সুন্দর করেছেন—ভালই করেছেন, আনন্দময়ীর প্রতিমায় শক্তির পূজা হচ্ছে। পূজার বস্তুতে লোভের দৃষ্টি দিতে নেই। লোভ আছে জগতে, তাই বলে পূজার পাঠ তুলে দিতে হবে—সেটাও কি একটা কথা হল?

আর এক দিক দিয়ে দেখ, নারীর রূপ কাল হল কামুকের কাছে। এক হিসাবে রূপ তো ভোগের জন্যই—নইলে তার সৃষ্টি হল কেন? তবে কিনা ভূতনাথের ভোগ আছে, আবার ভূতেরও ভোগ আছে—যা নাকি দুর্ভোগেরই সামিল। যা দিয়ে ভোগ করবে, তেমনি ফল পাবে। রূপ দেখলেই দেহ-স্মৃতি জেগে ওঠে—দেহ দিয়ে ভোগ করতে চাও—তাই পড়ে যাও। দেহের ভোগে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু মানুষ কেবল দেহ নয় বলেই, দেহের ভোগেই চরম তৃপ্তি হয় না, আরও কিছু যেন প্রাণ চায়। যে আনন্দ নকল, তার শেষ আছে অর্থাৎ স্নায়ুগুলো তাতে সঞ্জীবিত না হয়ে আসন্ন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতরাজ্যে তাই ভোগের পরেই অবসাদ। এই কাম অপ্রাকৃত হলে উজান বেয়ে চলত, দেহ ভুল হয়ে যেত, স্নায়ুজালের সঞ্জীবনী হত—উৎসব হতে উৎসবে মানুষ মাতোয়ারা হয়ে উঠতো! কিন্তু লোভী সে খবর পায় কই?

শুধু ছাড়া দেহের ভোগে দেহটা একে-বারেই খসে পড়ে না, তাহলেও শান্তি ছিল। সেটা আবার আধমরা হয়ে বেঁচে থাকে জ্বালাবার জন্য। কেন থাকে জান? আত্মার শক্তি তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে জড়িয়ে আছে কিনা! কিন্তু তুমি তো তার খোঁজ পাও নি তাই শক্তিকে ভুল পথে চালিয়ে দুঃখ পেয়েছ, কিন্তু মরতে পার নি। শুনেছি, কতকগুলি পতঙ্গ আছে, তাদের পুরুষগুলো সূর্য্যের আলোকে বেশ আনন্দে নেচে বেড়ায়, তার পর একটা মাদী পোকা দেখলেই ছুটে গিয়ে তাতে সঙ্গত হয়, আর ওই একবার আলিঙ্গনেই

সব শক্তি শেষ হয়ে যায়—বেচারী মরে যায়। মাদীটাও ডিম্ব প্রসব করে মরে যায়। দেহেও যদি একবার রমণেই সব সারা হয়ে যেত, তাহলে দেহের রমণে এত জ্বালা থাকৃত না। কিন্তু মানুষের দেহে দেহাতীত কিছু ফুটে উঠেছে বলেই দেহের তৃপ্তিটা তার কাছে কিছুতেই চূড়ান্ত হয় না; তাই তার কাম-ভোগে মধুর সঙ্গে হুলও থাকে। হুলটা ভগবানের "চৌকিদারী ডাক্—"বাসাওয়ালা জাগো।" এই দেহাতীতকে খুঁজে তার ভোগের আয়োজন করাই মনুষ্যত্ব। দেহ ভুলে যাও—কেবলি ভাব, তুমি দেহ নও, তুমি দেহ নও! তখন স্ত্রী দেহ থাকারও কোনও তাৎপর্য্য থাকবে না। তুমি আকাশের মত, আলোর মত—তোমার মাঝেই অনন্ত জীব প্রকৃতির মিথুন লীলা—তুমি সঞ্জীবন, তুমি রসায়ন—তোমার প্রেমে ওদের কাম সঞ্জীবিত!

এই ভাব যখন আসবে তখন অপ্সরী এসে জড়িয়ে ধরলেও কাম জাগবে না। ব্যষ্টিতে তখন সমষ্টির জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়ে অপরূপ মায়ার সৃষ্টি হবে—যেমন শিশির-বিন্দুতে পূর্ণ সূর্য্যবিম্ব প্রতিবিম্বিত হয়ে তার সৌন্দর্য্য বাড়ায়। ভাবুক সেই চাকচিক্য দেখেই খুশী। তারই নাম প্রেম।

দেহের মিলনে যে আনন্দ নাই, এ কথা কেউ বলবে না। যারা দেহ ছাড়া আর কিছু বোঝে না, তারা তো বলবেই না—দেহসুখে মজতে নিষেধ করেছেন যে শাস্ত্র, তিনিও বলবেন না। শাস্ত্রের মাঝেই কতকগুলি বিসদৃশ উপমা আছে। প্রপঞ্চাতীত আনন্দ কেমন, তা বোঝাবার জন্য অনেক জায়গায় রমণের উপমা আছে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবশাস্ত্র তো ওই সমস্ত উপমায় একেবারে ভরা। দৈহিক আসঙ্গরূপে যাকে চিত্রিত করা হয়েছে, দেহের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকলেও সে যে প্রাকৃত দৈহিক ক্রিয়ার সামিল নয়, এ কথা অভাবুক বস্তুতন্ত্র-বাদীকে বোঝানো বড় শক্ত। ঠিক এই জগতের স্ত্রী-পুরুষ ভাবই যে চরম সত্য নয়, এ সংস্কার দূর হতে বহু সাধ্য সাধনার দরকার। আনন্দের মাঝে জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ নাই। কিন্তু দেহের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা যার আয়ত্ত হয় নি, সে আগে বোঝে দেহ—তার পর বোঝে আনন্দ। তাই উপনিষদ যখন বলেন, "ব্রহ্মের আনন্দ কেমন জান?—যথা প্রিয়া সম্পরিষ্বক্ত ন বাহ্যং নান্তরং বেদ—স্ত্রী এসে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরলে যেমন বুঝতে পারে না কোনটা বাহির, আর কোনটাই বা ভিতর—এ-ও তেমনি।" এমনি উপমা শুনে কামুকের রসনা রসসিক্ত হয়ে ওঠে, তুরীয়লোকেও একটা গৃহস্থালী পাতা যায় কিনা, সে চেষ্টায় কল্পনা উদ্দাম হয়ে ওঠে। কল্পনার বিকৃত অপচারের চরম পরিচয় পাই, যখন দেখি, বাঙ্গালীর শিব ভক্তের কল্যাণে তুরীয়লোক ছেড়ে কুঁচুনীপাড়ায় এসে আসর জমিয়েছেন!

শাস্ত্রীয় উপমার একটা তাৎপর্য্য আছে। সম্বন্ধ সত্য. কিন্তু তাকে বিকৃত করে দেখলে, যে দেখে ক্ষতি তারই। প্রপঞ্চাতীত বস্তুকে প্রপঞ্চের ভাষায় ব্যক্ত করলে বোকা লোকে মনে করে, বুঝি স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মাঝেই ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ লুকিয়ে আছে! এখানেও যেমন মেয়ে-পুরুষের খেলা—ওখানেও বুঝি তাই। তবে এখানকার খেলায় সে

সুখটা পুরোপুরি হয় না ভরসা আছে, ওখানে হবে। বাস্তবিক, এমন ধারণা অনেকের আছে !

কিন্তু নির্ব্বোধেরা বোঝে না, উপমা উপমাই ; ধরতে হবে কায়াকে—ছায়াকে নয়। চিন্ময় বস্তু—কেমনধারা বস্তু, তা কি খেয়াল হয় না ? চৈতন্যের কি দানা আছে ? দার্শনিক ভায়া তা স্বীকার করবেন না। অথচ চৈতন্য জমাট বেঁধে যে দেহ হবে, তার রূপ চোখে দেখা যাবে কিনা, সে সংশয় অভাবুকের মনে একবার আসেও না কি ? যেখানে প্রপঞ্চ নাই, সেখানে মেয়ে-পুরুষ এমনিধারা স্থূলে থাকে কি করে ? যারা কামচিন্তা আর কামচর্চ্চা নিয়ে ব্যস্ত, দেহের বাইরে আর কিছু যারা বোঝে না—তারা দেহের সুখটা বেড়ে অনন্ত হলেই ব্রহ্ম মিলবে, এহ কথা মনে করতে পারে বটে। তাই ভাবলোককে কামলোকে নামিয়ে আনতে পারলে তবে তাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

কিন্তু শাস্ত্রের ইঙ্গিত বিপরীত মুখে। আসল কথা এই, সেখানকার আনন্দ স্ত্রী-পুরুষের অন্তহীন কামলীলার নয়—সে আনন্দ এত তীব্র, এত প্রশান্ত, এত বিপুল যে জগতের আর কোনও সুখের সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। মানুষ রমণ সুখটাই বোঝে ভাল। তাই ওরি সঙ্গে উপমা দেওয়া। তা ছাড়া কামলীলার সঙ্গে কোনও বিষয়ে এর সাদৃশ্যও আছে—ভেদাভেদ, মিলনে বিরহ ইত্যাকার কতকগুলি চরমতত্ত্বের ইঙ্গিত প্রাকৃত বিরংসাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, শাস্ত্র সে আনন্দকে রমণ সুখের কোটীগুণ বলেছেন। অথচ প্রাকৃত রমণের উপাদান যে নরদেহ ও নারীদেহ—তা সেখানে নাই, যেহেতু প্রপঞ্চ সেখানে নাই। বিশেষতঃ দেহস্বীকার গুণময়-ভূমির কথা, কিন্তু ভাব গুণাতীত। এই জন্য শাস্ত্রীয় উপমা বা লীলা বর্ণনা বুঝতে হলে ঠিক বিপরীত ধারা ধরে বুঝতে হবে। দেহজ্ঞান না ভুলতে পারলে ও সব রমণের উপমা বুঝতেই পারা যাবে না—চর্চ্চায় রমণের স্মৃতিটাই কেবল জেগে উঠবে, আর তাতে ভাবভক্তি কতটুকু থাকবে, তা সর্ব্বমঙ্গলাই জানেন। এই জন্য লীলার সাক্ষী সখী—যারা নায়ক-নায়িকার দেহ দেখেছে, নিজের দেহসুখ ভুলে !

একটা উদাহরণ ধর। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছে, ছেলেপিলের মুখে সবই মিষ্ট লাগে। বুড়োরা যা একবার মুখে দিয়ে থু থু করে ফেলে দিচ্ছে, ছেলে তাতেই অমৃতের আস্বাদ পাচ্ছে। এই জন্য একটা কথা আছে, শিশুর মুখে অমৃত—যা কিছু খায়, তা তার অমৃতের উপস্তরণে আবৃত হয়ে, স্বভাবতঃই অমৃত হয়ে যায়। তুমি-আমি রুচিকে বিকৃত করে ফেলেছি, তাই আজ আচমনের মন্ত্র আওড়িয়েও অন্নকে অমৃত করতে পারছি না—অমৃত তার অপিধানও হচ্ছে না, উপস্তরণও হচ্ছে না। এই হতে বুঝতে পারি, ভোগের সনাতন শক্তি তোমার মাঝেই রয়েছে বটে, কিন্তু তাকে অপচারে বিকৃত কর বলেই তাতে দুঃখ পাও। শক্তি যদি অবিকৃত থাকে, তাহলে অল্প উপাদান থেকেই প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। ছেলেরা সামান্য কথায় হেসে কুটীপাটী হয়—সুস্থদেহ সুস্থমন যুবকযুবতী সামান্য একটু লাস্যলীলায় প্রীতির অমরাবতী সৃজন করে। অপচারী বৃদ্ধ তা দেখে ঈর্ষ্যা-কষায়িত চোখে বলে "সব ভাতেই বাড়াবাড়ি !" কামের অপব্যবহারের শাস্তি যে কি করুণ ও নিদারুণ—এই তার প্রমাণ।

আধার যত শুদ্ধ, অনুভূতি তত তীব্র —এই তাহলে একটা সিরেট সত্য। এ দুয়ের মাঝে ব্যতিরেক মুখেও একটা অনুপাত আছে। তা হতে গণিতের নিয়মেও বল্‌তে পারি—যে আধার-সর্ব্বস্ব অতএব মলিন, তার অনুভূতি জড়বৎ; আবার যে নিরাধার অর্থাৎ দেহ-মন-বর্জ্জিত, তার অনুভূতি তীব্রতম। এই জন্য দেহাভিমান-বর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বোঝা যায় না। তাই প্রবাদ আছে—দেহাভিমান-বর্জ্জিত সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত মহাপ্রভু রাস-পঞ্চাধ্যায়ী পড়েননি।

দেহাভিমান-বর্জ্জিত হয়ে তবে আবার দেহ-বিকারের আলোচনা কেন, এ প্রশ্ন হতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের ভাব হতে উদ্দীপনাও আস্‌তে পারে, উত্তেজনাও হতে পারে। আগেরটা প্রেমিকের ভোগ্য, পরেরটা কামুকের। মিলন দেখে যার সত্ত্ব উদ্দীপনা হয়, সে কে?—যে দেহের অধীন নয়। তত্ত্বের অতীত না হতে পারলে তত্ত্ব আয়ত্ত হয় না। কামুক বিদেহীর প্রাণের আবেগ বুঝ্‌বে কি করে? সে দেখে ভাগবত-ধর্ম্মে মেয়ে-পুরুষের ঢলাঢলি; কিন্তু এটা খেয়াল করে না—ভাগবতের আর এক নাম পরমহংস-সংহিতা। যে রসিক, সে আভাসে কতটুকু আস্বাদন করে, কামুক গোগ্রাসে গিলেও তা বুঝ্‌তে পারে না। এই জন্য ব্যাসদেব বলেছিলেন কামের সুখের ষোল-গুণ হচ্ছে কাম-নিবৃত্তির সুখ।



ভক্তির সাধনা



তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্য্যাঃ—যাঁহারা ভক্তিপথের আচার্য্য, তাঁহারা ভক্তির সাধন কথা গাহিয়া গিয়াছেন। সত্য বস্তু আলোকের মত ব্যাপক। দীপশিখা যেমন শুধু সলিতাতেই আবদ্ধ থাকে না, তেমনি সত্য লাভ করিয়া যাঁহারা ফিরিয়া আসেন, তাহারাও সে সত্যকে শুধু আপনার হৃদয়-কন্দরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, সত্যের প্রভাব বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে। মানুষে মানুষে বন্ধন অতি নিবিড়। তাই অতিমানুষ মানুষের ভূমি ছাড়াইয়ে গিয়াও করুণ দৃষ্টিতে একবার পিছনপানে না তাকাইয়া পারেন না। তাঁরা জানেন, সত্য সাধ্য নয়—তাহা প্রপঞ্চাতীত লোকাতীত বস্তু, অতএব তাহা সিদ্ধসম্পদ্ মাত্র। তথাপি প্রপঞ্চান্তর্গত দুর্ব্বল সাধক চলিতে গিয়া যে কোথায় বাধা অনুভব করিতেছে, প্রাণভরা মমতাদ্বারা তাহা অনুভব

করিয়া তাঁহারা সে পথের কাঁটা দূর করিয়া দেন। সিদ্ধের এই সেবা—অজীব হইয়াও জীবের জন্য এই স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সাধনা জগতের এক অনুপম সম্পদ্। জানি, এই দরদীদের উপহাস করিবার, ব্যঙ্গ করিবার পাষণ্ডের অভাব জগতে হয় না; কিন্তু আবার এ-ও জানি, যে সাধকের হৃদয়ে সুধাবস্তুর ছায়াপাত হইয়াছে, সে তাঁহার আহ্বানকে মুগ্ধ-কুরঙ্গিণীর শ্রবণে বংশীধ্বনির মতই শোনে। সে জানে, এই যে আচার্য্যোপদেশ, এ ত শুধু নীরস বচন-পরম্পরা নয়—এ যে সঙ্গীত! শিশিক্ষু অর্জ্জুনের কাছে শাস্তা শ্রীকৃষ্ণের বাণী তাই ভগবানের গীতা!

ভক্তির যে সাধনার কথা আচার্য্যেরা উপদেশ করিয়াছেন, অধিকারীর নিকট তাহা গানের মতই মধুময় হোক্।

ভক্তির প্রথম সাধন—বিষয় ত্যাগ ও সঙ্গ-ত্যাগ। সঙ্গ অর্থে আসক্তি। শুধু বিষয়ত্যাগ করিলেই হইবে না—বিষয়ের প্রতি আসক্তি নষ্ট করিতে হইবে। আসক্তিত্যাগই যথার্থ বিষয়ত্যাগ। এই দরুণ বিষয়ত্যাগ সার্থক হইবার জন্য আসক্তি ত্যাগের অপেক্ষা রাখে। তাই দেবর্ষি উভয়কে একটী সূত্রে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "তত্তু বিষয়-ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ।"

এইখানে ভক্তিরসিক আচার্য্যপ্রবর শ্রীধরের একটী সঙ্কেত উল্লেখ করিতেছি। গীতার টীকায় তিনি বলিতেছেন, "অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি, তানি এব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণানি কথয়ন্ এব অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনানি আহ" —সাধকের পক্ষে যা জ্ঞানের সাধন, সিদ্ধের তাহাই স্বাভাবিক লক্ষণ; অতএব সিদ্ধের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে তাহা হইতে অন্তরঙ্গ জ্ঞানসাধনের কথাই হইতেছে বুঝিতে হইবে। সিদ্ধের উপদেশের সময় এই কথাটুকু সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে। ফল কথা, অন্তরঙ্গ সাধনায় নিমজ্জিত না হইলে সিদ্ধ লক্ষণ বোঝা যায় না। সাধনা ও সিদ্ধির মাঝে এই নিগূঢ় সম্বন্ধ।

উপরের সাধনটী বিভাগ করিয়া লক্ষণ করিতে পারি—প্রবর্ত্ত সাধকের পক্ষে বিষয়-ত্যাগ অবশ্য আশ্রয়ণীয়, যদিও সঙ্গত্যাগ তাহার শ্রেয়ঃ। আর সিদ্ধের পক্ষে সঙ্গত্যাগই স্বাভাবিক—বিষয়ত্যাগ তাহার অবান্তর অভি-ব্যক্তি মাত্র। অর্থাৎ সিদ্ধের অন্তরে যে সঙ্গ-ত্যাগ প্রকৃতিতে অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সাধক বিষয়ত্যাগ দ্বারা অভ্যাসকে দৃঢ় করিবে।

ত্যাগ বৈরাগ্য যে কেবল জ্ঞানপন্থীর এক-চেটিয়া অধিকার নয়, ভক্তিপন্থীকে বিশেষ করিয়া ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে বৈরাগী কথাটা সমাজে কুৎসাবাচক; যাহারা সাম্প্র-দায়িক তথাকথিত "বৈরাগী", তাহাদের আচরণও অনেক ক্ষেত্রে বৈরাগ্যের একান্ত বিরোধী। বৈরাগ্যের কি করিয়া এরূপ অর্থ বিপরিণাম ঘটিল, তাহা ভাবিবার বিষয়।

জ্ঞানপন্থীর সম্বন্ধে অপবাদ আছে, তাঁহারা জগৎটাকে ন স্যাৎ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে বৈরাগ্যের একটা স্থূলতঃ কঠোর অর্থ সমাজে প্রচলিত হইয়া জনসাধারণের মনে বিভীষিকা ও প্রতিক্রিয়ার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। জ্ঞানপন্থীর ছুঁড়িয়া ফেলা জগৎকে

কুড়াইয়া আনিয়া ভক্তিপন্থী প্রেমের কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছেন। ইষ্টমূর্ত্তিকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া তাঁহার তৃপ্তি—এ স্বাভাবিক। কিন্তু এই ইষ্টতৃপ্তি-সাধনানুকূলে সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করিতে করিতে অলক্ষিতে কোথা হইতে আত্মতৃপ্তির ভাবটুকু ভক্তিপন্থীর মধ্যে আসিয়া জুটিল! ফলে ইষ্টের ভোগ হইতে কিছু কিছু চুরী করিয়া তিনি তাহা নিজের ভোগে লাগাইতে আরম্ভ করিলেন। যে বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেবার উপকরণ জুটাইয়া দিয়া ভক্তিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল, কালে তাহা বিলাসের বিষশ্বাসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিকৃত-রুচি ভক্তিবাদী তখন বলিতে সুরু করিল, "সবই যখন ঠাকুরের প্রসাদ, তখন মজা লুটিতে আপত্তি কি? যারা স্বভাব-নীরস, তারাই রসবর্জ্জনের উপদেশ দেয়। তাদের উপদেশ শুনিয়া শুকাইয়া মরা আমাদের ধর্ম্মে বলে না।" মনে হয়, আধুনিক ভক্তিপন্থী-দের মধ্যে বৈরাগ্যের অবমাননাকারী এই প্রচ্ছন্ন বিলাস বাসনা অনেকস্থলে সনাতন ধর্ম্মকে কলুষিত করিয়াছে।

আধুনিক সমাজের মনোজগতে এই ভাবটা একটা মারাত্মক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। জানিতাম, বাঙ্গালী "বৈরাগীর" জাত, এখন সে বৈরাগীর অর্থ যাহাই হউক না কেন। কিন্তু হঠাৎ দেখিতে পাইতেছি, ইউরোপের অনুকরণে বাঙ্গালী অতিমাত্রায় প্রকৃতির উপাসক হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুন্দরী ধরণীর প্রতি প্রেমনিবেদন, বৈরাগ্যের প্রতি কটাক্ষ রাখিয়া জেদ করিয়াই সংসারলীলার গুণকীর্ত্তন একটা প্রধান উপজীব্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মনোভাবের প্রশংসা সমাজে ধরে না, কিন্তু ইহার মূল কোথায়, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিতেছে না। জগতের প্রতি অত্যধিক আসক্তি ইউরোপীয় জাতির ভক্তিধর্ম্মের একটা বিশেষ লক্ষণ; অনেকে আমাদের দেশের ভক্তিধর্ম্মেও ইহার আরোপ করিতে চান। কিন্তু উভয়জাতির দার্শনিক চিন্তা-প্রণালীর ধারা আলোচনা করিলে দেখি, খৃষ্টীয় ভক্তিধর্ম্মকে হিন্দুর ভক্তিধর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া নিতে যথেষ্ট আপত্তি থাকিতে পারে। মূল কথাটা এই, খৃষ্টীয় জগৎ একজন্মবাদী আর হিন্দুজগৎ পুনর্জ্জন্মবাদী। এই লইয়াই ইহ-জগৎটার প্রতি উভয় জাতির মনোভাব মূলতঃ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ইউরোপীয় মন ইহজগৎটাকে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবে, কেননা পরলোক তাহার কাছে অনিশ্চিত ও ভয়াবহ; তাই সুন্দরী ধরণীর স্তবগানে, সংসার-সুখের বিচিত্র কল্পনায় তাহারা চিরমুগ্ধ। কিন্তু হিন্দু জন্মজন্মান্তরের ভরসা রাখে বলিয়াই এই ধরিণী সুন্দরী হইয়াও তাহার কাছে একান্ত ভোগ্যা নয়। বৈরাগ্য দ্বারা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার একটা স্বাভাবিক শক্তি তাহার জাতীয় চেতনায় সুপ্ত রহিয়াছে। হিন্দুর ভক্তিধর্ম্মকে খৃষ্টীয় ভক্তিধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিবার পূর্ব্বে এই কথাটা বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, এই যে ভক্তির ছদ্ম আবরণে আসক্তিকে নানা আকারে আমরা প্রশ্রয় দিতেছি, ইহা অসংযম-জনিত ভোগ-সামর্থ্যের অভাবেরই বিকৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে।

বাঙ্গালী জাতটা হঠাৎ অতিমাত্রায় ভাবু-কতা করিতে গিয়া বৈরাগ্যের প্রতি খড়্গহস্ত

হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি, তাই এই কথাগুলি উল্লেখ করিলাম। আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যিক প্রেমের ন্যাকামী গাহিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারা বুঝি বৈষ্ণব মহাজনদের সুরে সুর মিলাইতেছেন। কিন্তু এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বৈরাগী মহাজনেরা কৌপীন আঁটিয়া বহির্বাস পরিয়া তবে বিশ্বপ্রেমের পালা গাহিতে সুরু করিয়াছিলেন; এখনকার মত কামস্তুতিকে বিশ্বপ্রেমের গিলটী করিয়া তাঁহারা বাজারে চালাইতে চাহেন নাই।

ভোগাসক্ত, অসংযত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির যেমন জ্ঞান হয় না, তেমনি ভক্তিও হয়না। কি জ্ঞান, কি ভক্তি—উভয়ের পক্ষে বৈরাগ্য সিংহদ্বার। বাহিরে হউক না হউক, মনের মাঝে সংসারটী পুরিয়া রাখিয়া যেমন জ্ঞানের সন্ন্যাস হয় না, তেমনি প্রেমের সন্ন্যাসও হয় না, এ কথাটাও স্মরণে রাখিতে হইবে। জ্ঞানের রাজা শিব যেমন সন্ন্যাসী, প্রেমের রাণী গৌরীও তেমনি রাজরাজেশ্বরী হইয়াও সন্ন্যাসিনী। তবে জ্ঞানের সন্ন্যাস ও প্রেমের সন্ন্যাসে আপাততঃ এই পার্থক্য দেখা যাইতে পারে, এক বিরূপে বৈরাগ্য, অপর স্বরূপে বৈরাগ্য। কিন্তু সিদ্ধলক্ষণে উভয়ে দুই হইয়াও এক। জ্ঞানীও সহজ মানুষ, প্রেমিকও তাই। সহজে সহজেই প্রীতি হয়—বৈষ্ণবদর্শনের ইহা একটী নিগূঢ় কথা। কিন্তু ইহা প্রীতি বিষয়-বৈরাগ্য ও কাম-পরিহার দ্বারা ধৃত, সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট —ইহাও একটী নিগূঢ় সত্য।

ভক্তি যদি রস স্বরূপের আস্বাদন হয়, তবে জ্ঞানও তাই। ভক্তি সরস, অতএব বৈরাগ্যাপেক্ষাশূন্য এবং জ্ঞান নীরস, অতএব বৈরাগ্য তাহারই এলাকা, এরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। কিশোর কিশোরীতে যে পার্থক্য, জ্ঞান ও ভক্তিতে তাই অর্থাৎ উভয়ে ভেদ থাকিয়াও নাই। অভেদ বলিলে মিলনাপেক্ষায় রসস্ফূর্ত্তির অভাব ঘটে, তাই পরাক্ দৃষ্টিতে ভেদ স্বীকার করা হয়; কিন্তু ভেদনিরূপক লিঙ্গও তো সেখানে নাই। তাই প্রপঞ্চাতীত, অব্যক্তলিঙ্গক কিশোর-কিশোরীর মিলনকে জ্ঞান ও প্রেমের মিলনের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বিষয়-নিরপেক্ষ ও আসক্তিশূন্য না হইতে পারিলে এই মিলনের রহস্য ধারণা করিতে পারা যায় না। তাই সাধনক্ষেত্রে বৈরাগ্য জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের প্রয়োজক।

সঙ্গত্যাগ বিষয়ত্যাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উহাই বৈরাগ্যের প্রাণ, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সাধারণ অধিকারীর পক্ষে এমন সম্ভব হয় না যে, বিষয়কে জড়াইয়া রাখিয়াও সে তাহার আসক্তি পরিহার করিতে পারে। বিষয়ধ্যান করিব, অথচ তাহাতে সঙ্গ জন্মিবে না—এ কেবল গায়ের জোরের কথা নয়। তাই সাধারণ জীবের স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া গীতা বলিতেছেন —"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে —বিষয় ধ্যান করিতে করিতে জীবের তাহাতে সঙ্গ উৎপন্ন হয়। "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ—রসবর্জ্জং—যতক্ষণ দেহ অভিমান আছে, ততক্ষণ বিষয় ঠেকাইয়া রাখিলে তাহারা দূরে থাকে বটে, কিন্তু রস মরে না।" সুতরাং আসক্তিপরিহার যে কত কঠিন ধর্ম্ম, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। "রমণীর সঙ্গে

থাকে, না করে রমণ" অথচ রমণের কোটীগুণ আনন্দ পায়—ইহা যোষিৎসঙ্গীর কথা নয়, পূর্ণ ব্রহ্মচারীর কথা। আজ কাল কথায় কথায় লোকে জনক রাজার উদাহরণ দিয়া সংসারের কোলে ঝোল টানিতে চায়। যে জনক বৈরাগ্যের রাজা শুকদেবের আচার্য্য, সচ্চিদানন্দময়ী মানসীকন্যার জনক যিনি, তিনি যে আধুনিক সংসারের রিপুতাড়িত "জনক" নন, এ কথাটা খেয়ালে রাখিয়া তবে তুলনা করিতে হয়।

প্রবর্ত্তাধিকারীর পক্ষে সঙ্গত্যাগ অভ্যস্ত করিবার জন্যই বিষয়ত্যাগ বা সংযমের ব্যবস্থা। গীতায় কচ্ছপের উদাহরণ আছে। কচ্ছপ যেমন খোলার মাঝে শরীর গুটাইয়া লয়, তেমনি করিয়া ইন্দ্রিয়গুলি গুটাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু গায়ের জোরে তা হয় না, টিকেও না। সেই জন্য গীতাকার সোজা কথায় বলিতেছেন, "সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ"—আমাকে লক্ষ্য করিয়া সংযম করিয়া আমাতেই যুক্ত থাকিবে।" জ্ঞান বা ভক্তির রসায়ন না থাকিলে সংযম ফলবান্ হয় না। এই জন্য প্রবর্ত্ত সাধক যতদূর সম্ভব ভগবানের কথা স্মরণে রাখিয়া প্রাণপণ বলে সংযম আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। রূপরসের এই আপাত-বর্জ্জনে আপশোষ করিবার কিছুই নাই; চিন্ময়ের আভাস প্রাণে পাইলে মৃণ্ময়ের ত্যাগ সহস্রগুণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে—এই গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস রাখ।

তাহা হইলে ভক্তিসাধনের প্রথম সূত্র হইল—সংযম সহায়ে আসক্তি পরিহার করিয়া বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ করা। দ্বিতীয় সূত্র হইল—অব্যাবৃত ভজনাৎ—নিরন্তর ভজন। ইহাও সাধন-সাপেক্ষ। ভক্তির নৈরন্তর্য্য বা একটানা প্রবাহ সিদ্ধদের স্বাভাবিক লক্ষণ, কিন্তু সাধকের পক্ষে তাহা সাধন-সাপেক্ষ, ইহা শ্রীধরস্বামীর সূত্রানুযায়ী বুঝিতে পারি। বৈষ্ণবদর্শনে ইহাকে অব্যর্থকালত্ব নাম দেওয়া হইয়াছে। সাধকের পক্ষে ইহার বিবৃতি আবশ্যক।

"ভগবানে যাঁহাদের মন মজিয়াছে, তাঁহারা বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারেন না। বিষয় চিন্তার আকণ্ঠ ডুবিয়া রহিয়াছে, মাঝে মাঝে দু'এক দণ্ডের জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলাম—ইহাতেই যদি ভাবভক্তির উদয় হইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। ঠিক ঠিক ভাবের উন্মেষ হইলে আর ভগবানকে ছাড়িয়া বিষয়ের দিকে মন মোটেই যাইতে চাহিবে না—বিষয়ের স্মৃতি তখন বিষবৎ মনে হইবে। বিষয়কর্ম্মে যাহারা আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারাও অব্যর্থ-কালত্বের সাধনা করিতে পারে। হাতে কাজ করিব, কিন্তু মনটী থাকিবে তাঁহার পানে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেন, "নষ্টা মেয়ে যেমন ঘরকন্নার সকল কাজই করে অথচ মন পড়িয়া থাকে উপপতির সঙ্গে, তেমনি সংসারের কাজ করিয়া যাও।"

"কাহারও সংশয় হইতে পারে, 'সংসারের কাজ তো শুধু হাতে করিয়া গেলেই কুলায় না—তাহার জন্য ভাবনা-চিন্তারও তো প্রয়োজন। সুতরাং সকল সময় ঈশ্বর চিন্তা নিয়া থাকি কি করিয়া?' কিন্তু এটা একটা মহাভ্রম। নিজের দৈনন্দিন চিন্তাগুলি যদি কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তবে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে—বৃথা চিন্তায়, এলোমেলো চিন্তায় মানুষের কত সময় কাটিয়া যায়।

হয়ত মন কখনও যাহা হইয়া গিয়াছে, বার বার তাহা আওড়াইতেছে, কিম্বা নূতন নূতন কার্য্যকারণ বা পারিপার্শ্বিক মনে মনে উদ্ভাবন করিয়া আকাশ-কুসুমের কল্পনায় মাতিয়া গিয়াছে। ইহাদের মাঝে শতকরা নব্বুইটা চিন্তা বর্ত্তমানকালের পক্ষে কোনও প্রয়োজনেই আসে না। বিষয়ীর চিত্তকে কি এই সমস্ত বাজে চিন্তা হইতে মুক্ত করা যায় না? সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইবে দৃঢ়তার সহিত এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া। "এইটা এইরূপ করিব"—এ কথা একবার ভাবিলেই তো যথেষ্ট; তার পর যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করিলেই হইল। ইহার মাঝে আর বার বার "এই করিব—এই করিব" বলিয়া একটা সঙ্কল্পেরই রোমন্থন করার কি প্রয়োজন? আবার কাজ হইয়া গেলে বার বার ফল-কল্পনারই বা কি প্রয়োজন?

"এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, বিষয়ের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করিয়াও আমরা বিষয়চিন্তা কত কমাইয়া দিতে পারি। বিষয়চিন্তা কমিয়া গেলে আপনি ভগবানে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও নির্ভর আসিবে। তখন দেখিব, আমি যদি তাঁহার কথা ভাবি, তবে আমার বিষয়ের ভাবনা তিনিই ভাবেন। তখন বিষয়ের কর্ম্মের মাঝেও পদে পদে তাঁহার করুণার নিদর্শন পাইব। এইরূপে অনাবশ্যক বিষয়চিন্তা ছাড়িলে যে সময়টুকু বাঁচে, তাহাও কি ভগবানকে দিতে পারি না? তখন তো হাতে সংসারের কাজ আর মনে তাঁহার চিন্তা নিয়া থাকা চলে।

"রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তাহলে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করল!' কি ভয়ানক! এই সব অপব্যয়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইলে তবে না ভাবভক্তি হইবে।"



সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী.



[আমরা ইতিপূর্ব্বের কারিকায় দেখাইয়াছি, উপলব্ধি না হইলেই যে কোনও বস্তুর সত্তা অপ্রমাণ হইয়া পড়ে, তাহা নহে।] বস্তু এবং উপলব্ধির মাঝে ইন্দ্রিয়-ব্যাপাররূপ দ্বার রহিয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞের অনুভূতিকে আমরা যেরূপ অকরণক বলিতে পারি, অল্পজ্ঞ জীবের অনুভূতিকে আমাদের সেরূপ বলিবার উপায় নাই। আমাদের নিকট বস্তুর সত্তা অনুভূত হইবার জন্য ব্যাপার বা করণের অপেক্ষা রাখে। এই জন্য বস্তুগত বৈশিষ্ট্য বা

করণগত বৈশিষ্ট্য হেতু বস্তু সত্তার উপলব্ধির তারতম্য হইয়া থাকে।

[একটা উপমা দিলে কথাটা বোঝা যাইতে পারে। সূর্য্যের আলোক স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু আমি যদি ঘরে বসিয়া একটী জানালামাত্র খুলিয়া দিই, তাহা হইলে সূর্য্যালোক সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সেই জানালায় যতটুকু ধরে, ততটুকু মাত্রই গৃহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে। ফলে আলোকের সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান গৃহবাসীর হইবে না। আমাদের দর্শনও এইরূপ ইন্দ্রিয়রূপী বাতায়নের ভিতর দিয়া। বাতায়ন যেমন আলোকের সর্ব্বতঃ প্রকাশকে ধারণা করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়ও তেমনি বস্তুর সার্ব্বভৌম সত্তাকে ধারণা করিতে পারে না। সকল প্রকার আবরণ ভাঙ্গিয়া দিলে আলো যেমন সকল ঠাঁই ছড়াইয়া পড়িবে, ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তি-সমূহ রোধ করিয়া স্বকারণে তাহাদের লয় করিলেও উপলব্ধি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাই সর্ব্বজ্ঞতা। সর্ব্বজ্ঞতা অর্থে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পরস্পর সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তি ও অবিনাভাব। জ্ঞেয়কে ঠিক রাখিয়া জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়ের পরকলা দিয়া সঙ্কুচিত করিয়া আনিলেই আমাদের লৌকিক উপলব্ধির সৃষ্টি হইল। ইহাতে জ্ঞান যেরূপ আবরিত, জ্ঞেয়ও সেইরূপ স্বল্প পরিসর। এই পরিসর কমিয়া যাওয়ার কয়েকটী কারণই পূর্ব্ব কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

[আমাদের উপলব্ধি এইরূপ করণদোষ ও বিষয়দোষদুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, বস্তুর অনুপলব্ধিই তাহার সত্তার অভাব প্রমাণিত করে না। সাংখ্যের চরমতত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যষ্টি অভিজ্ঞতাতেও অনুভূত হয় না। তাই বলিয়া কি তাহারা নাই? ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতি-পুরুষের আনুভবিক ব্যাপ্তি করণের পরিসর দ্বারা ব্যাহত হয় বলিয়াই তাহার অনুভূতি হয় না। গৃহের বাতায়ন ভাঙ্গিয়া ফেলার মত করণসমূহ বিলোপ করিলেই অথবা যোগের ভাষায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলেই তাহাদের সাক্ষাৎকার মিলিতে পারে। কিন্তু সেই সাক্ষাৎ অনুভূতির স্বরূপকে করণগৃহীত জগৎজ্ঞানের স্তরে নামাইয়া আনা সম্ভবপর হয় না বলিয়া এই তত্ত্ব চিরকাল অব্যক্ত, পরমগুহ্য ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। অথচ এ কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, যে পরম অনুভূতি আমাদের সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতার মূল, তাহার সামান্যতঃ স্পর্শ আমরা কোন না কোনও সময় নিশ্চয়ই পাইয়া থাকি। এই সামান্যতঃ স্পর্শ চিত্তের একাগ্রভূমিতে নিরোধের আভাস লইয়া সকল জীবের মাঝেও ফুটিয়া থাকে। অধ্যাত্ম-জগতের এই সার্ব্বভৌম নীতিকে লক্ষ্য করিয়া যোগসূত্রে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, সমাধি সর্ব্বভূমিকাতেই সম্ভব। রুদ্ধবৃত্তি ও সমাহিত অবস্থায় চেতনার যে স্ফুরণ, তাহা প্রকৃতি পুরুষ বিবেকদর্শনের নিদর্শনমাত্র। ইহারই উৎকর্ষস্বরূপে তত্ত্বাবগাহী প্রজ্ঞানের কল্পনা আমরা করিতে পারি বটে। কিন্তু যাহাই করি না কেন, মূলতত্ত্ব যে লৌকিক বিজ্ঞানের অপ্রধৃষ্য থাকিয়াই যায়, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা বলিয়া ইহা একান্ত অসৎ, এ কথা বলিবার কোনও যুক্তিই নাই।

[এই কথাগুলিকে সুস্পষ্ট করিবার জন্যই আচার্য্য পূর্ব্বপক্ষিরূপে প্রশ্ন করিলেন,] অনুপলব্ধির যে কারণগুলি উল্লিখিত হইল, ইহাদের মধ্যে কোন্ কারণবশতঃ প্রকৃতি

প্রভৃতির উপলব্ধি হয় না? তাহার উত্তরে কারিকাকার বলিতেছেন—

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চ কার্য্যং প্রকৃতিসরূপং বিরূপং চ ॥৮

—সূক্ষ্ম বলিয়াই ইহাদের উপলব্ধি হয় না, ইহারা নাই বলিয়াই নয়; কেননা কার্য্য দেখিয়া যে ইহাদের উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মহদাদি প্রকৃতির কার্য; তাহারা প্রকৃতির অনুরূপও বটে, বিসদৃশও বটে।

যেমন ছয়টী রসের অতিরিক্ত সপ্তম রস নাই বলিয়াই তাহার উপলব্ধি হয় না, তেমনি প্রকৃতি প্রভৃতি নাই বলিয়াই উপলব্ধি হয় না, এই কথা বলিতে আপত্তি কি? ইহার উত্তরে কারিকাকার বলিতেছেন, অভাবহেতু প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না, এ কথা ঠিক নহে।" কেন? "কার্য্য হইতে তাহার উপলব্ধি হইতেছে কি না।" তাহার বলিতে এখানে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইতেছে। পুরুষকে উপলব্ধি করা যায়, তাহার প্রমাণ "সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ" এই যুক্তিতে পরে বিবৃত করিব (১৭ কারিকা)।

[প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথা বলার হেতু আছে।] কোনও বিষয় যদি দৃঢ়তর প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হইয়াও অযোগ্যত্ব হেতু প্রত্যক্ষের এলাকায় না আসে, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেখানে খাটিল না এইরূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। সপ্তম রস কোনও প্রমাণ দ্বারা অবধারিত বা নিশ্চিত হয় নাই। সুতরাং সেখানে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা আছে [এবং সেই যোগ্যতার অভাব হেতুই প্রত্যক্ষ হইতেছে না] এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে।

[অভাবজ্ঞান নিরূপিত হওয়ার পক্ষে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা একটী প্রধান সামগ্রী। মীমাংসক ও বৈদান্তিক অনুপলব্ধি প্রমাণ নিরূপণের সময় ইহা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়াছেন। মোট কথা এই, ভূতলে ঘট নাই — এই যে ঘটাভাব জ্ঞান, ইহাকে কখন সার্থক বলিব? ঘট যদি এমন কোনও পদার্থ হয়, যাহা কোনও কালেই কোনও প্রমাতার ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তাহার অভাবজ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞার কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে নিতান্তই মূল্যহীন। কেননা সেরূপ ঘট থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা। সেরূপ ঘটের সত্তাতেও আমাদের চিত্তে যেরূপ কোনও ভাবে জাগে না, অসত্তাতেও তেমনি জাগিতে পারে না। এই জন্য বস্তুর অনুপলব্ধি সার্থক (real experience) হইতে হইলে এরূপ হওয়া চাই যে, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেই বস্তুটী যদি থাকিত, তাহা হইলে উপলব্ধি হইত, নাই বলিয়াই দেখা যাইতেছে না। এইরূপ স্থলেই অভাব প্রত্যয় সার্থক বা real. ইহাকেই অভাব প্রত্যয়ের বা অনুপলব্ধির যোগ্যতা বলে। এই হিসাবে বিচার করিলে, সপ্তম রস থাকিলেও আমাদের জ্ঞানগোচর হইত না, কেননা তাহাকে গ্রহণ করিবার মত ইন্দ্রিয়ই আমাদের নাই। সুতরাং তাহার অভাব জ্ঞানও নিরর্থক। প্রকৃতির অনুপলব্ধি সেরূপ নিরর্থক নহে। কেন নহে, তাহা আমরা এই কারিকার ভূমিকাতেই বলিয়াছি।]

যাহা দেখিয়া প্রকৃতির অনুমান হয়, সে

কার্য্য কি? "মহৎ প্রভৃতিই তাহার কার্য্য।" মহৎ প্রভৃতি যে প্রকৃতির লিঙ্গ তাহা ইহার পর প্রমাণ করিব। সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য হইতে বিবেকজ্ঞান হইয়া থাকে। এই কার্য্য প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়া আচার্য্য বলিলেন, "ইহা প্রকৃতির সদৃশ এবং বিসদৃশও বটে।" [অতঃপর এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ধরিয়া প্রকৃতি হইতে তাহাকে পৃথক বা বিবিক্ত করা যাইবে।] কিরূপে, তাহা পরে বলিব।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৭১।৩

জগতে আর কিছু থাক্ বা না থাক্, আমার আমি কিন্তু আছিই। আর সবাই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে, কিন্তু আমি আমার হয়ে চিরকাল থাকবই। কাজেই এই আমিটাকে খুব ভাল করে বোঝা দরকার; আগে একে বুঝে নিয়ে তার পর সব কাজ। সব ক্রিয়ার আগে আসল কর্ত্তাটীর খোঁজ চাই—নইলে ক্রিয়া সম্পন্ন করবে কে? তার পর কর্ম্ম নির্দ্ধারণ, সব শেষে তা নিষ্পাদন। ঋষিরা বেশ বুঝেই এই নিয়মে আমাদের কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া পর পর ঠিক করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা খুঁজি উল্টো দিকে, তাই ফলও হয় উল্টো।

*

ভোগীর ধর্ম্ম-পরায়ণতা কেবল লোক দেখানো। যিনি অধ্যাত্মজগতে উন্নতিকামী, তিনি বাইরের নিখিল সমস্ত ভোগের মাঝে থেকেও স্বেচ্ছায় নিজেকে তা'হতে বঞ্চিত করে, দাতার বদলে সেই আসল দাতাকেই চাইবেন। অসংযতের যে বুদ্ধি, তা কিন্তু দাতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর দান নিয়েই ব্যস্ত; বরং কি কৌশলে তা আরও অধিক আয়ত্ত করা যায়, সেই ফন্দীই করে। কিন্তু পরিণামে ত্যাগী পায় অক্ষয় মহান্ ব্রহ্মানন্দ, আর ভোগী পায় দুদিনের মন-ভুলানো অথবা ভোগোপকরণ। তাই নিয়েই সে মজে থাকতে চায়—কিন্তু তাও টিকে না। যদি শাশ্বত মঙ্গলের অভিলাষী হও, তবে সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট পেলেও আসল লক্ষ্য ভুলো না। জেনো তোমার এই জীবনটুকু সেই মহাবস্তুর তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে এমন অসংখ্য জীবন-পাতেও তার বিনিময় হয় না। অথচ একটী জীবন যথার্থরূপে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলে, 'তাঁকে পাবই' এই দৃঢ় বিশ্বাসে শত জীবনের দুঃখের বোঝা এই জীবনে বরণ করে নিতে পারলে, সে বস্তু এবারেই পাওয়া যাবে।

*

দুঃখ কষ্ট পেয়ে পেয়ে জীবনটাকে পাত করে দিতে হচ্ছেই। ভোগ্য বস্তু পেতে হলেও যেমন প্রাণপাতী পরিশ্রম করে তা অর্জ্জন করতে হয়, মোক্ষ-বস্তু পেতে হলেও

তাই করতে হয়। উভয়তঃই আপাততঃ কিছু কষ্ট স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু জীবনটা তো পাত করবার জন্যই। কিছুতেই একে ধরে রাখতে পারবে না। তবে এমন জিনিস পেতে হবে, যাতে দেহপাতেও অমর হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকা যায়। সেই হচ্ছে সত্য বস্তু। শুধু তার জন্য জীবনখানি প্রস্তুত কর—সূর্য্যের আলোকের মত তা সকল কামনার উপর দিয়ে তার শাশ্বত আনন্দ-জ্যোতিঃতে জীবন ধন্য করে দিয়ে যাবে।

*

যতই ভালবাসি না কেন, দুইটী দেহ কখনও এক হয়ে যেতে পারে না! কিন্তু অধ্যবসায় দ্বারা দুইটী মন কেন, সমগ্র মনের সঙ্গে আমার মনটীকে মিশিয়ে দেওয়া যায়। সকলের অন্তরের সঙ্গে যোগ হয়ে মানুষ অন্তর্য্যামী হয়ে যেতে পারে। সকলের সঙ্গে যেখানে যোগ, সেখানে সকলের মাঝ হতে বিশেষ প্রিয়ব্যক্তিটীও বাদ পড়ে না। অথচ পূর্ব্বের বিশেষে আর এই নিঃর্ব্বিশেষের পরের বিশেষে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে আগে শুধু ঐ এক গণ্ডীবদ্ধ অবয়ব মনে করে যতই নিবিড় করে পেতে চেয়েছি, কিছুতেই মিশে যেতে বা মিশিয়ে নিতে পারি নাই। কিন্তু নির্ব্বিশেষের মাঝে অখিল সৌন্দর্য্য দিয়ে গড়া যাকে চাইছি, সেই তখন বিশেষের রূপ ধরেও অবিশেষ হ[illegible] [illegible]মা থেকে অপৃথক হয়ে থাকবে।

*

জীবনের সার ভাগ পূরণ করাতে হবে আনন্দ দিয়ে, আর তার জন্যই জগতে আসা, কিন্তু সে আনন্দ কি দুদিনের ভোগেই পর্য্যবসিত হবে? যে আনন্দ থেকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হচ্ছে, সে আনন্দের কাছে পাঙ্কল ভোগের আনন্দ কত তুচ্ছ, তা ভাবলে কি আর ওতে অবগাহন করতে সাধ হয়?

*

ছোট ছোট কামনাগুলিকে তুচ্ছ করতে আপত্তি নাই, যদি তাদের বিনষ্ট করবার শক্তি থাকে। অগ্নিকণাকে তুচ্ছ বল, কেননা তাকে সহজেই নিবিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র কামনার অগ্নিকণাটুকু এখনই নিবাতে না পারলে তাহতে তোমার অধ্যাত্ম-রাজ্যের সকল ইমারৎ পুড়ে ছার-খার হতে পারে।

*

আমি বড় কিম্বা খুব ভাল, এ কথা সবাই ভাবে। কেননা এর মাঝে আত্মার সত্য ও মহিমা নিহিত রয়েছে। কিন্তু সে সত্য বিকৃত হয়ে জগতের মাঝে তুচ্ছ বস্তু নিয়ে কাড়াকাড়ি চল্‌ছে। "আমি" যে কত বড়, তা কেউ ভাবতে চায় না—কিন্তু তা ভাবলে দেখা যেত, যে বস্তু নিয়ে যার সঙ্গে মারামারি চল্‌ছে, তারা উভয়েই যে তারই জিনিস, বা সে নিজেই। জগতের সবই যে একচেটীয়া হয়েই আছে। কাজেই পাওয়ার তো কিছুই নাই—বিভিন্ন রূপে সব যে পেয়েই আছি—আমার চেয়ে পৃথক সত্তা কিছু থাকলে তো তাকে পেতে চাইব? কিন্তু এ কথা কেউ জানে না বলেই অহরহঃ ছুটাছুটী করে মরে।

*

আত্মার মাঝে সকল বস্তুর স্বাদই নিহিত রয়েছে। তার জন্য কোনও একটাতে মজে থাকলে যে আরগুলি বাদ পড়ে। তাই তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে মজে থেকে নাই। ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালক

তার পুতুল নিয়েই ব্যস্ত. সে জানে না যে সে স্বয়ং রাজপুত্র বা দেশের রাজা। তবে রাজা যদি খেয়াল করে ছেলের সঙ্গে পুতুল খেলেন, তবে জানব সেটা তাঁর খেয়াল-খুসীর কাজ, তার সুখে-দুঃখে তিনি পুড়ে মরবেন না। কেননা খুসীতে খেলায় নেমেও তিনি যে রাজা,' এই বোধ তাঁর ভিতর রয়েছেই। সংসারের কাজে আমাদের এমনি রাজার অনুভূতি থাকলে দুঃখ কোথায়?

*

দেবাসুরের সংগ্রাম চল্‌ছে। একবার অসুর মাথা খাড়া করছে, আবার দেবতা তার স্থানে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। জীবনে দিনরাত এমনি ভাবেই যাতায়াত করছে। এক সময়ে শত চেষ্টাতেই কিছু হয়ে উঠ্‌ছে না, আবার আর এক সময়ে অমনি সব যেন হয়ে যাচ্ছে। কোনও চেষ্টা এমন কি একটা তৃণ স্পন্দনও জগতে বিফল হচ্ছে না, কাজেই সকল চেষ্টারই ফল অবশ্য একদিন ফল্‌বেই। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না রেখে কেবল এই আলো-আঁধারের রংএর খেলা দেখে যাও। ঢেউয়ের তালে তালে তোমার ঐ দেহ-মন নৃত্য করবে করুক—কিন্তু তুমি ঠিক হয়ে বসে শুধু নাচ দেখ, ঢেউয়ের ঘায়ে টলে পড়ো না।

*

তোমার-আমার প্রভৃতি সম্বন্ধ যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণই শিক্ষা, উপদেশ ইত্যাদি। পরমতত্ত্বে পৌঁছালে কিন্তু অবাঙ্‌মানসগোচরম্। কিন্তু তবু এই বাক্য-মন নিয়েই প্রথম যাত্রা শুরু করতে হবে। তাই উপনিষদ্ আবার বলছেন, তিনি শ্রোতব্য, মন্তব্য—তাঁকে শোনা যায়, মনে করা যায়; অর্থাৎ এই মন-বুদ্ধি নিয়েই প্রথম কাজ আরম্ভ করে এদের নষ্ট করতে হবে। তার পর যখন তোমার ক্ষুদ্রশক্তির পরাকাষ্ঠা হয়েও তাঁর নাগাল মিলছে না দেখে প্রাণ অতিষ্ঠ হবে, তখনই সমস্ত অন্তরাবৃত হবে—ওপারের আলো এসে পথ দেখিয়ে নেবে।

*

প্রত্যেক গ্রহেরই একটা আকর্ষণী-শক্তি রয়েছে। আমাদের মন বা চন্দ্রকে যাবতীয় স্থূল বিষয় বা পৃথিবী নিয়ত আকর্ষণ করছে; কিন্তু যদি কোনও শক্তিবলে এই আকর্ষণের এলাকা ছাড়িয়ে সূর্য্য বা পরমতত্ত্বের এলাকায় তাকে নিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে পূর্ণ বেগে আবার সেই দিকেই তার গতি হবে। তাই চাই শুধু এই দ্বন্দ্বপূর্ণ মাধ্যাকর্ষণের ছেদন। অনন্তের আকর্ষণকে জয় করতেই হবে। মন নিষ্ক্রিয় নয়, তাকে এই পূতি-গন্ধময় স্থান থেকে তুলে নিয়ে পুষ্পোদ্যানে রাখলে এই মনই তখন দেবতার যোগ্য হয়ে সেখানে ফুটে উঠ্‌বে। তার পরে কেউ তাকে নিয়ে পূজায় দিক বা বিলাসের উপকরণ করুক, তাতে সেই চয়নকারীর রুচি বা ইচ্ছার পরিচয় হবে, ফুলের তাতে কিছু যাবে আসবে না। তাই অত সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হয়ে কত মহাপুরুষ আমাদের দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রয়েছেন দেখতে পাই। কিন্তু তাঁর অবস্থা লাভ না হলে কে তাঁর কর্ম্ম-রহস্য বুঝবে!

*

সাততালার উপর যিনি রয়েছেন, তিনি

নাচের সব দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু নীচের কেউ তাঁর দিকে নজর দিচ্ছে না—আপন আপন পুঁটুলীবাঁধার ব্যস্ততায় সবার শক্তি হরণ করেছে। ত্যাগী ভোগ ও যোগ উভয়ের আনন্দে ভরপূর, ভোগী কিন্তু যোগের কোনও তত্ত্বই খুঁজে পায় না। তাহলে বেশী লাভ হল কার?

*

দানপ্রাপ্তি

—:*:—

জেলা ময়মনসিংহ—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার চৌধুরী জমিদার নারায়ণডহর ২০৲।

বিহার—পাটনা

শ্রীযুক্ত পি, আর দাস জজ পাটনা হাই কোর্ট ২০৲, শ্রীযুক্ত এ সেন ব্যারিষ্টার ৪৲ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভাদুড়ী উকিল ৪৲, শ্রীযুক্ত শ্যামনারায়ণ সিংহ (চেয়ারম্যান অব মিউনিসিপালিটী) ১৪৲, ডি, এন্ সেন প্রিন্সিপাল বি, এন্ কলেজ ৩৷০, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সাহা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব বিহার উড়িষ্যা কাউন্সিল ৫৲, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার গুহ প্রফেসার ইঞ্জিঃ কলেজ ৩৲, শ্রীযুক্ত ডি, এন্, ঠাকুর সেক্রেটারী অব বিহার উড়িষ্যা কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ৫৲, পি, এন্, বিশ্বাস ইঞ্জিনিয়ার ৩৲, এন্ সি ঘোষ ডাক্তার ২৸০, কে, এস্, রাও ২৷০, শ্রীবল্লভ যশোদেব ৫৲।

দুইটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—এম্, এন্, ঘোষ ডাক্তার, হীরালাল দাসগুপ্ত উকিল, সমীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, সুশীলকুমার ব্যানার্জ্জি, শিবপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মনোরঞ্জন ঘোষ, সতীশচন্দ্র সেন ডাক্তার, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, তারাপদ মৈত্র, যোগেশচন্দ্র দত্ত ডিপুটিম্যাজিষ্টর, রামঅক্ষয় মল্লিক, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এ, আর, পি, এম, জ্যোতীশচন্দ্র গুহ প্রফেসর ইঞ্জিঃ কলেজ, জিতেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি হেড্ এসিষ্টাণ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, নরেন্দ্রনাথ দাস, অমরনাথ চাটার্জ্জি, ডিপুটী রেজিষ্টার, এস্ এন্ মুখার্জ্জি, অক্ষয়কুমার সেন, ডি, সি, গুপ্ত, বিমানবিহারী বসু, ভুবনমোহন দাস, ইঞ্জিনিয়ার, দুর্গাপ্রসাদ রায়, হরিসাধন চৌধুরী ক্ষিরোদচন্দ্র সেন ইঞ্জিনিয়ার, নীলমণি চাটার্জ্জি প্রিয়বন্ধু সেন শ্রীহরি চক্রবর্ত্তী ডক্টর হরিচাঁদ গণেশ দত্ত সিংহ মিনিষ্টার নওল কিশোরপ্রসাদ উকিল।

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর দে উকিল মন্মথ নাথ দে, উকিল, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র উকিল সোনালাল বসু উকিল সুরেন্দ্রনাথ দাস উকিল মথুরানাথ সিনহা উকিল প্রভাতচন্দ্র ঘোষ উকিল নির্ম্মলচন্দ্র দাসগুপ্ত উকিল অচলেন্দ্রনাথ দাস উকিল ইন্দুভূষণ বিশ্বাস উকিল গঙ্গাচরণ মুখার্জ্জি উকিল জি, মুখার্জ্জি উকিল দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ সুশীলানন্দ সেন, ডাক্তার এস্ পি সান্যাল ডাক্তার শশীভূষণ দাস উমাপদ মুখার্জ্জি ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ডাক্তার প্রিয়নাথ চাটার্জ্জি ডাক্তার ফণীভূষণ মুখার্জ্জি ডাক্তার এস্ কে ঘোষ দস্তিদার ডাক্তার রাখালদাস হাজরা ডাক্তার বি সি সেনগুপ্ত ডাক্তার টি সি বানার্জ্জি ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ডাক্তার আশুতোষ চাটার্জ্জি প্রফেসর পাটনা কলেজ নিরঞ্জন নিয়োগী প্রফেসর পাটনা কলেজ তারকনাথ তালুকদার প্রফেসর পাটনা কলেজ এস্ ভাদুড়ী প্রফেসর পাটনা কলেজ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রফেসর বি এন্ কলেজ রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি প্রফেসর ইঞ্জিঃ কলেজ দুর্গাচরণ দাস জ্যোতিষচন্দ্র বানার্জ্জি তারাপদ মুখার্জ্জি সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত শরৎচন্দ্র সেন অনুকূলচন্দ্র সরকার পি সি আর দত্ত দুর্গাপদ সরকার আর কে দত্ত শশীপদ বানার্জ্জি প্রমথনাথ বানার্জ্জি প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী পঞ্চানন দাস খগেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রবোধচন্দ্র দত্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সতীশচন্দ্র গুপ্ত এস্ সি ঘোষ চারুচন্দ্র চৌধুরী রামবিষ্ণু কর্ম্মকার সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি রায়সাহেব নলিনীমোহন দাসগুপ্ত বিনয়ভূষণ চাটার্জ্জি দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বিশ্বাস হেমপ্রসন্ন রায় দেবেন্দ্রনাথ দাস উমেশচন্দ্র পাড়ে সীতেশরঞ্জন দাসগুপ্ত দ্বারকানাথ দেব জেইলার সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জেইলার ডাক্তার মধুসূদন মুখার্জ্জি বি এম গুহ কালীচরণ কর্ম্মকার অনঙ্গমোহন বানার্জ্জি রামলাল অধিকারী পি বি মুখার্জ্জি প্রিয়নাথ বসু প্রবোধচন্দ্র চাটার্জ্জি যতীন্দ্রনাথ দে প্রমথনাথ চাটার্জ্জি পি সেন গুপ্ত

গয়া

মোহান্ত শ্রীমৎ কৃষ্ণদয়াল গিরি ১৫৲, শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ডাক্তার ২৲, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত ডাক্তার ২৲, মোহান্ত শ্রীমৎ রামধন পুরী ৫৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি ২৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জেইলার ৫৲, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীযুক্ত কানাইলাল বানার্জ্জি ২৲, মিঃ এ. জেম্‌স্ ॥০, শ্রীযুক্ত শরদিন্দুকুমার সেন গুপ্ত মুন্সেফ ২৲, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ২॥০ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র ১৲, মুকসুদপুরের রাজা বাহাদুর ২৲, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র ২৲, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদলাল রায় ২৲, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ উকিল ২৲, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সন্ন্যাল ম্যানেজার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২৲ বি. মল্লিক ডাক্তার ২৲।

একটাকা করিয়া—

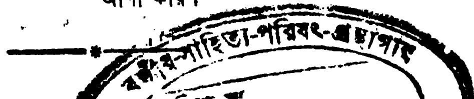
শ্রীযুক্ত প্রিয়গোপাল মজুমদার ডাক্তার এম্ গুপ্ত ডাক্তার অজিতচন্দ্র মিত্র জেইল ডাক্তার হেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী উকিল রবীন্দ্রনাথ দাস উকিল হরিদাস বসু উকিল হরিপদ গুপ্ত উকিল গিরিশচন্দ্র সেন হেড্ মাষ্টার পি সি ভট্টাচার্য্য শিক্ষক ভূতনাথ বসু শিক্ষক নিত্যরঞ্জন রায় শিক্ষক পাচুগোপাল চাটার্জ্জি পোষ্টমাষ্টার উমাপ্রসাদ বানার্জ্জি অবনীমোহন সেন জহরলাল সিনা ফণীন্দ্রনাথ সিংহ জ্যোতিশচন্দ্র মণ্ডল উপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল নগেন্দ্রনাথ বসু কালীপ্রসন্ন গুপ্ত চামার সাহু লালবাবু ব্রজবিহারী লাল ত্রিবেণীপ্রসাদ সিংহ গয়াপ্রসাদ ভানুজি মহাই হেড্ মাষ্টার দেউকীনন্দনপ্রসাদ উকিল রায় সাহেব রাধাকিশন বলরাম কিশোর শিক্ষক মৌলভী নবিবক্স খাঁ এইচ্ সি এ চ্ ক স্কুলের শিক্ষকগণ ৩॥০, সংগৃহীত ২০॥০, ।

(ক্রমশঃ)

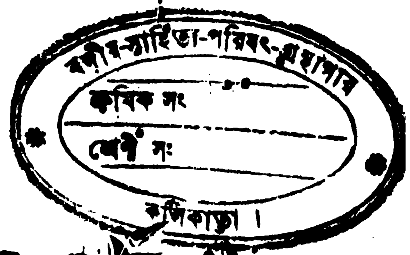
সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধাম হইতে ৩রা মাঘ তমলুক আসেন; তথা হইতে কুতুবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে যান। ইতিমধ্যে তাঁহার হালিসহর দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে পদার্পণ করিবার কথা আছে। এ বৎসর হরিদ্বার কুম্ভে তিনি যোগদান করিবেন কিনা, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

নানা দুর্বিপাকে গত মাসের পত্রিকা আমরা যথাসময়ে প্রকাশিত করিতে পারি নাই। সেই অনুপাতে এই মাসের পত্রিকাও বহু বিলম্বে প্রকাশিত হইল। এজন্য আমরা দুঃখিত। ফাল্গুন মাসের পত্রিকা চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে গ্রাহকবর্গের হস্তগত হইবে বলিয়া আশা করি।



ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ | ফাল্গুন | দ্বিতীয় খণ্ড
সমষ্টি সং ২০৩ | | পঞ্চম সংখ্যা

দ্যাবাপৃথিব্যৌ

—*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৫।২৪-২৫

[প্রজাপতি ঋষিঃ—বিশ্বদেবা দেবতাঃ—ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ]

মহি মহে দিবে অর্চ্চা পৃথিব্যৈ
কামো ম ইচ্ছঞ্চরতি প্রজানন্।
যয়োর্হ স্তোমং বিদথেষু দেবাঃ
সপর্য্যবো মাদয়ন্তে সচায়োঃ॥

বিশাল দ্যুলোকে পূজ, আর পূজ বিপুলা ধরারে—
অথির কামনা মম কারে খুঁজি ফিরে বারে বারে!
যজ্ঞভূমে, মানুষের সুরে আসি সুকণ্ঠ মিলায়,
বাড়াতে মহিমা যার দেবগণ স্তুতিগাথা গায়।১।

ধ্রুবো অংহ রোদসী সত্যমস্তু
মহে ষু ণঃ সুবিতায় প্র ভূতম।
ইদং দিবে নমো অগ্নে পৃথিব্যৈ
সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্॥

সত্য হোক্, হে রোদসী, তোমাদের ঋত সনাতন,
কল্যাণে ভূষিত কর—সার্থ কর যত আয়োজন;—
দ্যুলোকেরে নমিলাম—এই নমি পৃথিবীরে আর—
সাক্ষী তুমি হুতাশন—দিনু অন্ন, যাচি রত্নভার।

উতো হি বাং পূর্ব্যা আবিবিদ্র
ঋতাবরী রোদসী সত্যবাচঃ।
নরশ্চিদ্ বাং সমিথে শূরসাতৌ
ববন্দিরে পৃথিবি বেবিদানাঃ॥

তোমরা যে চিরকাল করিয়াছ ঋত-সম্বাহন,
ঋষিরা জানেন তাহা, সত্যবাদী যাঁরা পুরাতন।
আজো দেখ, হে ধরণী, জানে যারা তব গুণগাথা,—
মহারথি-মহাহবে তোরি পায় নোয়ায় যে মাথা।

ক অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচদ্
দেবাঁ অচ্ছা পথ্যা কা সমেতি।
দদৃশ্র এষামবমা সদাংসি
পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু॥

সত্যেরে জেনেছে কে? কে এনেছে হেথা তার বাণী?
কে পেয়েছে দেব-পায় নিয়ে যায় যেই পথখানি?
অধোমুখ গৃহ যত ইঁহাদের ওই দেখা যায়—
সঙ্গোপন ব্রতসাধি মিলে তাহা আকাশের গায়!

কবির্নৃচক্ষা অভি ষীমচষ্ট
ঋতস্য যোনা বিঘৃতে মদন্তী।
নানা চক্রাতে সদনং বেঃ
সমানেন ক্রতুনা সংবিদানে॥

সাক্ষী যিনি জগতের অংশুমালী, চিরন্তন কবি,
দেখেছেন ঋতমূলে রোদসীর হর্ষোজ্জল ছবি,
সমান দোঁহার কর্ম্ম, তাই দোঁহে বড় ভালবাসা,
বিচিত্র সদন রচে—পাখী যেন বাঁধে বহু বাঁসা।

সমান্যা বিযুতে দূরেঅন্তে
ধ্রুবে পদে তস্থতুর্জাগরূকে।
উত স্বসারা যুবতী ভবন্তী
আদুব্রুবাতে মিথুনানি নাম॥

দুটীতে সমান তারা, মেশামেশি—কভু দূরে রয়,
রহে জেগে চিরকাল, ধ্রুবপদে রচেছে আলয়!
তরুণী ভগিনী যেন দুটি তারা মিলে-মিশে থাকে—
এক ঠাঁই থাকে তাই এ উহারে জোড়নামে ডাকে।

বিশ্বেদেতে জনিমা সংবিবিক্তো
মহো দেবান্ বিভ্রতী ন ব্যথেতে।
এজদ্ ধ্রুবং পত্যতে চরদেকং
পতত্রি বিষুণং বিজাতম্॥

জনমে যা বিশ্বমাঝে, তাহাদের রাখে ঠাঁই ঠাঁই,
মহাদেবকুলে বহি এ দোঁহার কভু ক্লান্তি নাই!
চঞ্চল অথবা ধ্রুব, চরে ফিরে কিম্বা উড়ে যায়—
বিচিত্র জনম, বাস—সবি এসে একেতে মিলায়!



আত্মরক্ষা

—*—

আত্মরক্ষার চেষ্টা জীবমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। ভরসা করিতে পারি, অধ্যাত্ম-জগতেও এই নিয়ম খাটিবে। সত্যের প্রতি অনুরাগ যদি মানুষের স্বাভাবিক না হইত, তাহা হইলে সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিত না। অথচ মানুষ মূলতঃ সামাজিক জীব। আত্ম-পুষ্টির চেষ্টা তাহার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সমাজরক্ষার দায়িত্ব দ্বারা সে চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া ন্যায়, সত্য, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সামাজিক গুণগুলি স্বভাবতঃই তাহার মাঝে বিকশিত হইয়া উঠে। সমাজের জন্য মানুষ যতখানি কষ্ট ও নির্য্যাতন সহিতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে বাস্তবিকই অবাক হইতে হয়। অধ্যাত্মজগতে আত্মরক্ষার চেষ্টা তাহার এই যৌথসংস্কার হইতে উদ্ভূত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখার বিষয়।

মানুষ আত্মার সন্ধান পাইয়াছে, জীবনকে অতীতের স্মৃতি দ্বারা সঞ্জীবিত রাখিতে শিখিয়াছে, ভবিষ্যতের আশা করিতে জানিয়াছে। এই সমস্ত গুণে সাধারণ জীব-জগত হইতে সে বহু উর্দ্ধে। তাই সত্যানুরাগ তাহার অন্যতম স্বভাবজ গুণ। কিন্তু মানুষের মাঝে পশুত্বের প্রভাবও তো নিতান্ত সামান্য নহে। আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ তাহার সেই পাশব প্রেরণা। পশুত্ব ও দেবত্ব দুয়ের সংমিশ্রণে সাধারণ মানবের চরিত্র গঠিত হইয়াছে। সামাজিক শাসন বা যৌথসংস্কারে মানুষ পশু-ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইতে চেষ্টা করিতেছে—ইহাই বোধ হয় প্রাকৃত-সাধারণের অধ্যাত্মজগতের কাঠামো। এই হিসাবে দেখি, সত্যানুরাগ মানুষের মজ্জাগত হইলেও সে গুণ বিকশিত হয় সমাজের শাসনে। মানুষের অধ্যাত্ম চর্চ্চা কতটুকু নিজের খাতিরে, কতটুকু বা পরের খাতিরে, তাহা আমরা সচরাচর খেয়াল করি না। ফলে কেতাদুরুস্ত চালচলন অধ্যাত্মজগতেও বেমালুম চলিয়া যায়—এমন কি যেখানে আমার 'জবাব-দিহী করিবারও কেহ নাই, সেখানেও! এই অভ্যাসের দাসত্ব হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া তাহাকে যথার্থ আত্মনির্ভরশীল করিতে শিক্ষা দেওয়া একটা মহা দায়িত্ব।

ভগবান্ মানুষের নখ-দন্ত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার করুণার বিশিষ্ট সঙ্কেত। প্রমাণ হয়, আত্মরক্ষা করিতে মানুষকে ওগুলির প্রয়োজন হইবে না। ইহা হইতে একটা বিপরীত সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাই—আত্মপ্রসারণই মানুষের আত্মরক্ষার অমোঘ সঙ্কেত। রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ বায়ু মৃত্যু-বীজে পরিপূর্ণ। তাহার বিশুদ্ধি ঘটাইতে হইলে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বায়ু চলাচলের পথ করিতে হয়। মানুষেরও নিয়তি তাই। আততায়ীর কল্পনায় শজারুর মত নিজকে সঙ্কুচিত করিয়া কাঁটা বাহির করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। খৃষ্ট চড় খাইয়া গাল পাতিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। নিট্শে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, যেমন উনি মেষপাল, তেমনি মেষের ধর্ম্মই শিখাইয়াছেন বটে! বোধ হয় খৃষ্টের কথাটা অতিরিক্ত মোলায়েম

করিতে গিয়া নিস্তেজ করিয়া ফেলা হইয়াছে। বুদ্ধদেব আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তুমি নিজে ক্রুদ্ধ না হইয়া অপরের ক্রোধকে জয় কর, সত্য কথা বলিয়া অসত্যকে পরাভূত কর, নিজে দান করিয়া কৃপণকে লজ্জা দাও।—একই সেই একই কথা, কিন্তু বলিবার সতেজ ভঙ্গীতে মনকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে; বিশেষতঃ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাটাও এখানে সুস্পষ্ট। গীতাকার আরও তেজের সহিত বলিলেন, "যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ" মনে জ্বালা না রাখিয়া অন্যায়কে আঘাত কর!

বিভিন্ন ধর্ম্মের সারভূত এই সমস্ত বাণী হইতে প্রমাণিত হয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠাই আত্ম-রক্ষার মূল-মন্ত্র। অন্যায়কে নির্জ্জিত করিবার তিনটী ভঙ্গী উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে;—তিনটীর মূলেই ওই কথা—তুমি নিজে অটল থাক। কেহ আঘাত করিল বলিয়া তুমিও আঘাত করিবে? যদিই বা কর্ত্তব্য-বোধে আঘাত করিতে হয়, নির্ম্মল চিত্ত লইয়া আঘাত কর। শেষের কথাটা দুঃসাহসীর কথা বটে, কিন্তু গভীর সত্য। আত্মপ্রতিষ্ঠার চরম পরীক্ষা এইখানে।

আত্মরক্ষার এই নীতি সমাজেও খাটে, ব্যক্তিগত জীবনেও খাটে। কিন্তু তাহা বুঝা-ইবার পূর্ব্বে আত্মপ্রতিষ্ঠার অর্থটা ভাঙ্গিয়া বলা প্রয়োজন।

সোজা কথায় বুঝি, আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্থে নিজকে বড় করা। সবাই যদি ঠেলাঠেলি করিয়া বড় হইতে চায়, তাহা হইলে সংঘর্ষ ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। পশু-জগতেও তাই দেখিতে পাই। অথচ সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া থাকিবার উপদেশ দিলেও চলিবে না—কেন না সে উপদেশ পালন করিবার সামর্থ্য জীব-প্রকৃতির নাই। রবারের বলে ফুঁ দিয়া বাতাস ভরিয়া রাখিলে সে বাতাসটা যেমন ক্রমাগতঃই ঠেলিয়া বাহির হইতে চায় বলিয়া বলটাকে ফাঁপাইয়া চাঙ্গা করিয়া রাখে, মানুষের ভিতরেও তেমনি একটা কিছু ক্রমাগত ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। অজ্ঞানের প্রাচীরে বাধা পাইয়া উহা অভিমানের আকারে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে এবং যেখানেই আঘাত পাইতেছে, সেখানেই লাফাইয়া শূন্যপানে উঠিতে চাহিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, নিজকে বড় করিবার চেষ্টা সকলের মাঝেই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে সংঘর্ষ না বাধাইয়া কি করিয়া সকলের মাঝে বড় হওয়া যায়, ইহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

ফাঁপা বলের গায়ে একটা ছিদ্র করিয়া দিলে বলটা চুপসিয়া যাইবে, কিন্তু ভিতরের বাতাসটার ব্যাপ্তি অতএব মুক্তি ঘটিবে। বলটাকে তখন আছড়াইলেও আর সে লাফা-ইয়া উঠিবে না। নিঃশব্দে বড় হইবার এই সহজ সঙ্কেতটাই খৃষ্টের ও বুদ্ধের বাণীতে প্রকাশ পাইতেছে। মূল-মন্ত্র আত্মপ্রসারণ বা প্রেম। খৃষ্ট বলিলেন, শত্রুকেও ভালবাস। কথাটা অসমঞ্জস। শত্রুজ্ঞান থাকিতে ভালবাসা আসিবে কোথা হইতে? তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে হয়, এটা একতরফা শত্রুতার কথা হইতেছে; তোমার শত্রু থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি শত্রু-স্বরূপ নও। আরও একটু আগাইয়া গেলে গীতার কথায় বলা যাইতে পারিত, অরি, বন্ধু, উদাসীন—সক-লের প্রতি সমভাবাপন্ন হও। বুদ্ধদেব বলিলেন মৈত্রীভাবনা দ্বারা ব্রহ্মবিহার কর; ভাব, আমার হৃদয়ের প্রেমজ্যোতিঃ নিখিল জগৎকে

প্লাবিত করিয়া, ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আমি কাহাকেও হিংসা করি না, এমন কথাও নয়, তার চাইতে বড় কথা—আমাকেও কেহ দ্বেষ করে না—বাস্তবিকই না! আমি কল্পনাই করিতে পারি না, আমাকে কেহ হিংসা করে কি করিয়া, কেননা মৈত্রীভাবনা দ্বারা আমি হিংসার অর্থই ভুলিয়া গিয়াছি। স্বপক্ষে তো দূরের কথা, পরপক্ষেও হিংসার অস্তিত্বই আমি জানি না!

বুদ্ধদেবের এই ভাবনার আর তুলনা নাই। শত্রু হইতে আত্মরক্ষার এই অমোঘ সঙ্কেত—শত্রু কথাটার অর্থ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাও—সর্ব্বভূতে আপনাকে ছড়াইয়া দাও!

কিন্তু কথাটা আর এক দিয়া ভাবিয়া দেখিতে হয়। খ্রীষ্টনীতি বা বুদ্ধনীতির মূলে আত্মস্বাতন্ত্র্যের কথাটা বড় হইয়া দেখা গিয়াছে। নির্ব্বিকার হইয়া অপরের আঘাত সহ্য করার মাঝে পৌরুষ আছে বটে কিন্তু সামাজিকতা নাই। মৈত্রীভাবনায় সমস্ত জগৎ সন্মিলিত হয় আমারই একান্ত অনুভূতির মাঝে; দ্বন্দ্ব-কোলাহল-পূর্ণ বহির্জ্জগতে এই ভাবনার কোনও বাস্তব ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই না। হয়ত কোনও ক্ষাত্রনীতিবিদ্ ইহারই মধ্যে Passive resistance রূপ দুর্ব্বলের বলের সন্ধান পাইয়া বক্র ইঙ্গিতও করিতে পারেন। অবশ্য মহত্তম মানবধর্ম্মের দিক দিয়া বিচার করিলে এ কথার জবাব দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু জগতের সঙ্গে এরূপ সমন্বয় বা synthesis দ্বারা সম্বন্ধস্থাপনের পূর্ব্বে যদি ইহা অপেক্ষাও কোনও অধিকতর অর্থক্রিয়াকারী নীতির সন্ধান পাওয়া যায়, তবে একবার তাহার পরখ করিয়া দেখিতেই বা আপত্তি কি?

আমাদের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের নীতি বাস্তব-জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া উহা আদর্শ হিসাবে অন্য নীতি অপেক্ষা উন্নততর। গীতাকার যে বলিয়াছেন, মনে জ্বালা না পুষিয়া লড়াই কর—এ কথাটা শান্তিকামীর পক্ষে শ্রুতিকটু হইলেও অতি উচুদরের কথা। আত্ম-স্বার্থে অন্ধ হইয়া আঘাত করাকেই জীব আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় মনে করিয়া থাকে, তাই আঘাত করাটাই নিন্দার কাজ এরূপ একটা ধারণা সাধু সমাজে বদ্ধমূল আছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে প্রশ্ন হয়, বাস্তবিকই কি তাই? আঘাত অর্থেই হিংসা এবং হিংসা অর্থই পাপ, এরূপ সমী-করণের কোনও ভিত্তি আছে কি? একদিন বৌদ্ধ তার্কিক এই সূত্র ধরিয়া মীমাংসকের যজ্ঞবিধিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বেদপন্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মীমাংসক জবাব দিয়াছিলেন, হিংসা মাত্রেই অন্যায় নয়—যজ্ঞার্থ হিংসা bonafide হিংসা, উহাকে পাপ বলিতে পারি না। কথাটা অদ্ভুত ভাবে সত্য বটে। আত্মস্বার্থ এবং হিংসা যেখানে জড়িত, সেখানেই পাপ; কিন্তু পরার্থে ত্যাগের সঙ্গে জড়িত হিংসা পাপ নয়—ইহাই বৈদিক জগতের মনোভাব। ইহার হেতুও আছে। হিংসাবর্জ্জন অসম্ভব; সুতরাং নীতিশাস্ত্রানুযায়ী, কাজ দেখিয়া এখানে পাপ-পুণ্য বিচার করিলে চলিবে না, দেখিতে হইবে অভিসন্ধি। যেখানে ফলাভিসন্ধি নাই, সেখানে কর্ম্মজনিত পাপস্পর্শও নাই; অথচ সামাজিক দায়ে হিংসা প্রয়োজন হইতে পারে। এই সূক্ষ্ম এবং সত্যবিচারের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিলেন, "যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।" গাণ্ডীব খসিয়া পড়িলে চলিবে না—কাঁপুনী থামাইতে

হইবে; অসত্যের সঙ্গে শুধু Passive resistance নয়, Active resistance ও চাই! অথচ মনের কোনে জ্বালা রাখিতে পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ দিলেন না; একেবারে বিপ্লবের মাঝে নামিয়া সব্যসাচীর মত অন্যায়কে আঘাত করিয়া আঘাত ফিরাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এ নীতি কঠিন, অতি কঠিন; কিন্তু অতি সত্য, অতি স্বাস্থ্যকরও বটে।

এতক্ষণ আত্মরক্ষার সামাজিক দিকটা নিয়াই আলোচনা করিলাম। দেখিলাম, যেখানে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, সেখানে বিরোধকে জয় করিবার জন্য হয় নিঃশব্দে উদার হইয়া যাও, বাধার সৃষ্টি করিও না, (খৃষ্ট ও বুদ্ধ-নীতি), নতুবা বাসুদেবকে হৃদয়ে রাখিয়া নির্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া প্রাণপণে আঘাত কর—কিন্তু জয়শ্রী বণ্টনের সময় চুপিচুপি সরিয়া পড়িও। আত্মরক্ষার এই দুইটা বিধিই সুন্দর—সমাজস্থিতির অত্যন্ত অনুকূল। সামর্থ্য অনুযায়ী, অধিকারী অনুযায়ী এই ধর্মের সেবা করিতে হইবে।

কিন্তু যেখানে লড়াইটা আমার নিজের সঙ্গে, সেখানে কোন নীতি অবলম্বন করিব, এখন তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমার অত্যাচার হইতেও তো আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। মুখবন্ধে এ কথার ইঙ্গিত করিয়াছিলাম।

অধ্যাত্মজগতের আত্মরক্ষা অর্থে প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজকে বাঁচানো। আপনা হইতেই প্রশ্ন জাগে, প্রবৃত্তি মোহিনী, তাহার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিব না কেন? উত্তর পাই সমাজস্থিতির মাঝে। আমি সামাজিক জীব; কিন্তু সমাজে থাকিতে হইলেই অপরের প্রবৃত্তির সঙ্গে আমার প্রবৃত্তির একটা রফা চাই। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিতে হয়। প্রবৃত্তি সঙ্কোচে কষ্ট আছে, আবার কেন জানি না একটা আনন্দও আছে। লোকে প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিতে দেখিলে, আমাকে বাহবাও দিবে; অপরের উপর সাধুত্বের প্রভাবও বিস্তৃত হইবে—অতএব কেন প্রবৃত্তি সঙ্কোচ না করিব? এইরূপে দশের সঙ্গে বনিবনাও করিতে গিয়া প্রবৃত্তিকে খাটো করিতে করিতে শেষে নিবৃত্তিই পরমধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। তখন প্রবৃত্ত পূরণ যদি সুলভও হয়, তবুও তাহাকে খেদাইয়া দিই অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইতে আত্মরক্ষা করি। আবার কখনও কখনও "অবশঃ প্রকৃতের্বশাৎ"—প্রবৃত্তিকে ঠেকাইয়াও রাখিতে পারি না। কিন্তু ঠেকাইয়া রাখি, এ আমার একান্ত ইচ্ছা!—এই ইচ্ছা সাধারণ মানুষের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার ইতিহাস।

এই প্রচেষ্টার মূলে যে আত্মার গভীরতর সত্যানুভূতি অহরহঃ প্রেরণা জোগাইতেছে, সামাজিক জীব কিন্তু তাহা দেখিতে পায় না। তাই চালটী করিয়া তাহাকে প্রবৃত্তি ঠেকাইতে হয়; ফলে সে সহজ মানুষ না হইয়া একটা কৃত্রিম জীব হইয়া পড়ে।

আত্মার মর্ম্মে দৃষ্টি রাখিয়া কি করিয়া মানুষ সহজ হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার কোনও সোজা পন্থা আছে বলিয়া জানি না। সুতরাং সেই পথ বাৎলাইবার চেষ্টা করিব না। শুধু এইটুকু বলিতে পারি, মরণের প্রতি প্রীতি না জন্মাইলে প্রবৃত্তকে সহজ ভাবে পরিচালিত করা যায় না। স্নেহও হিংস্র, অসুরও হিংস্র—শিব-সোহাগিনী দুয়ের উপরই পা রাখিয়াছেন।

ধরিয়া নিলাম, অন্তঃপ্রেরণা বশে নয়, কেবল সামাজিক শাসন বা যৌণসংস্কার হেতুতেই আমাকে প্রবৃত্তির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। তখন কোন পথ অবলম্বন করা আমার পক্ষে শ্রেয়? বুদ্ধের না শ্রীকৃষ্ণের?

এখানে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নীতিই সর্ব্বাগ্রে প্রযোজ্য হইবে। প্রবৃত্তিদমনের বেলাতেও সেই কথা—যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। আরও কথা আছে—আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু, অতএব আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। কিন্তু এই যুদ্ধেও তাপ পুষিয়া রাখিলে চলিবে না; অর্থাৎ প্রবৃত্তির সঙ্গে যুঝ, কিন্তু হারিলেও বলিতে হইবে গোবিন্দের ইচ্ছা, জয় লাভ করিলেও বলিতে হইবে তাঁরই ইচ্ছা! যদি তাঁর ইচ্ছাই হয়, হারিলেও তো অনুশোচনার কিছুই নাই—আশঙ্কারও কিছুই নাই! প্রয়োজন হইলে আবার লড়িব, কিন্তু জয় পরাজয়ের চিহ্ন এবার নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিব। আত্মরক্ষার এই নীতি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত উপযোগী। সামাজিক হিসাবে পরপীড়ন অন্যায় কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসাবে আত্মপীড়ন সুসহ হইলে কল্যাণের কারণ। তবে মাত্রা ঠিক রাখা চাই।

আত্মরক্ষার বৌদ্ধ বিধানও আছে। কিন্তু তাহার আচরণ বড় কঠিন। প্রবৃত্তিকে বাধা দিবারও প্রয়োজন নাই—কিন্তু নিজকে বিবিক্ত রাখ। হাঁস যেমন জলে চরে, কাদা ঘাঁটে, পানা কাটে—কিন্তু পালক দিয়া নিজকে সংবৃত রাখিয়াছে বলিয়া কোথায় পঙ্কিলতায় স্পর্শ করে না—এ-ও তেমনি। পরের বেলায় এমনি সংবৃত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ—কিন্তু নিজের কাছে নিজকে এমনি সংবৃত রাখা, বুদ্ধি ও আত্মার মাখামাখিতেও দুটীকে ফারাক্ রাখা—শুধু সাধকের সাধন নয়, সিদ্ধের বিলাস। এ পথে অনুপম আনন্দ আছে, কিন্তু বিপদও ভীষণ। তাই প্রবর্ত্ত সাধকের এ দিকে পা না বাড়ানই ভাল।

উপসংহারে দুটী কথা। সামাজিক হিসাবে যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, বুদ্ধনীতির অনুসরণ কর—মৈত্রী-ভাবনা দ্বারা জগৎ প্লাবিত কর। আধ্যাত্মিক হিসাবে যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়—শ্রীকৃষ্ণের নীতি অনুসরণ কর—যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। প্রবর্ত্ত সাধকের পক্ষে এই উৎকৃষ্ট পথ।

আত্মানুভব

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—:•:—

নরনারীরূপী প্রিয়তম—

প্রশ্ন হয়েছে, জগৎ সৃষ্টি হল কবে? 'কবে' কথাটার অর্থ কি, ভেবে দেখলে বুঝতে পারি, ওর মানে হচ্ছে, "কোন সময়।" তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াল, 'সময়ের সৃষ্টি হল কোন্ সময়?' এমন প্রশ্ন শুনলে নিশ্চয়ই হাসি পায়। জগতের আরম্ভ হয়েছিল কোথায়?=দেশের আদি কোন্ দেশে? আর একটা প্রশ্ন আছে। জগৎ সৃষ্টি হল কেমন করে? কোনও কোনও বাহাদুর লোক এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে যাবে হয়ত। এ ভার আমি তাদের উপরেই দিলাম; ওটা আমার এলাকার বাইরে। কেউ কেউ এ সব সওয়ালের ফয়সালা করতে দিন গুজরান করবে—কিন্তু তাতে লাভ? কিছু দূর গিয়ে থামতেই হবে, দেখতে পাবে, সামনে এক পাথরের পাঁচীল, পার হয় কার সাধ্য!

এক জোড়া চিমটা আমার সামনে রয়েছে। চিমটা দুটা এটা-সেটা তুলতে পারে, কিন্তু যে হাত তাদের ধরে আছে, উল্টে গিয়ে সে হাতকে ধরতে পারে না। দেশ, কাল আর নিমিত্ত—এই তিনটীরও সেই অবস্থা। এরা জগদ্ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু জগতের পেছনে যে আত্মা রয়েছে, তার সন্ধান পাবে না।

চোখে ছানী হয়েছে বলে চারটা লোককে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—সেখানে অস্ত্র করা হবে বলে। চোখে যখন ছানী হয়েছে, তখন তারা তো নিরেট অন্ধ বাকী আছে শুধু চারটা ইন্দ্রিয়। জানালার সাসীগুলোর কি রং, তাই নিয়ে একদিন তাদের মাঝে তর্ক সুরু হল। একজন বল্লে, "আমার ছেলে ইউনিভার্সিটীতে পড়ে, সে এসেছিল; সে বলেছে, কাচ হলদে। তাহলে ও তো হলদেই হবে।" আর একজন বলল, "আমার খুড়ো হচ্ছেন, মিউনিসিপালিটীর কমিশনার; সে দিন এসেছিলেন না? তিনি বলেছেন, কাচটা লাল। ভারী তুখোড় লোক, সব খবর রাখেন।" তৃতীয় ব্যক্তি বলল, তার মাসতুতো ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলে গিয়েছে, কাচ সবুজ। সে বিদ্বান লোক, মিছে বলবে কেন? এমনি করে তাদের মাঝে লেগে গেল ঝগড়া।

তার পর তারা নিজেরাই কি রং তা নিয়ে গবেষণা সুরু করে দিলে। প্রথমতঃ কাচটা চেটে দেখল, কোনও রং বোঝা যায় কি না; কিন্তু জিভে রং বুঝবে কি করে? তার পর ঠুকে ঠুকে বাজিয়ে শুনতে চাইল কি রং—কিন্তু তাতে রং বোঝা গেল না। শুঁকে দেখল, হাত বুলিয়ে দেখল। কিন্তু কি আপদ, শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধে তো কাচের রং বোঝা গেল না!

আমরাও তেমনিই ইন্দ্রিয়পথে ইন্দ্রিয়া-

তাঁকে ধরতে পারি না। অনন্তকে যদি ইন্দ্রিয় দিয়েই ধরতে পারতে, তাহলে সে যে কি আজগুবি ব্যাপার হত, ভেবে দেখ দেখি! তাহলে অসীম নিশ্চয়ই সীমার চেয়ে সসীম হতেন। অসম্ভব কথা! বিশ্ব-চৈতন্য বা ঈশ্বর চৈতন্যের সহায়েই অসীমকে জানা যায়। একটা দেশলাইর কাঠি আমার হাতে আছে। হাতের চেয়ে কাঠিটা অবশ্য ছোট। সসীম কি করে অসীমকে ধারণা করতে পারে না, তা বুঝতে পারলে তো? যা ইন্দ্রিয়ের অতীত, ইন্দ্রিয় তাকে ধারণা করতে পারে না। তুমি আত্মস্বরূপ; তোমাকে বুঝতে তাহলে বাইরের কিছুর ওপর ভরসা করা চলে কি? এ যেন সেই কাণাদের মত কথা হল। তারা নিজেরা কেউ জানে না, কাচের কি রং; কিন্তু কেউ বলছে লাল, কেননা তার ভাই বলেছে লাল; কেউ বলছে হলদে, কেননা ছেলে বলেছে তাই ইত্যাদি। আমাকে ফর্ম্মুলা বলে দিলে H_2Oতে জল হয়। তাতেই আমার জ্ঞান হল? না, তা তো হবে না, সব রসায়ন-বিদেরা এসে সত্য বললেও এ কথা আমার কাছে সত্য হবে না। যখন লেবরেটরীতে গিয়ে নিজে পরীক্ষা করে দেখি, তখন কথাটা আমার কাছে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ হোন, খৃষ্ট হোন্, আর বুদ্ধ হোন্, নিজের অনুভব ছাড়া কারু প্রামাণ্যে নির্ভর করতে পারা যায় না। জান্‌তে হলে নিজে জান্‌তে হবে। খুব ভাল লোকের কাছে, নিতান্ত আপ্তজনের কাছে শুন্‌তে পার, কাচ লাল; নিজে না দেখা পর্য্যন্ত সে জানা পাকা হবে না। এক ছোক্‌রা বলছিল, "আমার বাবার পেটের আগুনে ভারী তেজ, আমার খাবারটা তিনি হজম করে দেন।" তা কি হতে পারে?

তোমার ভাত তোমাকেই হজম করতে হবে। জগতের মহাপ্রাণ মহাপুরুষদের চরণে আমার শত শত নমস্কার, কিন্তু সত্য কথা বল্‌ব—আমার ভাত তাঁরা হজম করে দিতে পারেন না,—সেটা আমাকেই করতে হবে। আমিই ব্রহ্ম—এ কথা তাঁরা আমার কাছে সপ্রমাণ করতে পারেন না—সে কিন্তু আমা-কেই করতে হবে। কেবল মাত্র বিশ্ব-চেতনার ভিতর দিয়ে সত্যকে জানা যায়। সে কথা পরে তোমাদের বল্‌ব।

স্বাধীন-ভাবুক নাস্তিবাদী বলে, "আমি নিজে খুঁজে দেখ্‌ছি।" দেখা যাক্, সে কতদূর গিয়ে পৌঁছায়। সে বলে আলো আছে দেশলাইর মাঝে। আচ্ছা, তাকে পাব কি করে? কাঠিটাকে সে টুকরো টুকরো করে কাটল, কিন্তু আলো পেল না। গুঁড়ো করল, কিন্তু তবু কিছু মিল্‌ল না। দেহটাকে নিয়ে টুকরো টুকরো করলে, জীবনের সন্ধান পেল না; অস্থি চূর্ণ করল, কিন্তু প্রাণ কোথায়? সে বলে "যদি সত্য থাকে, তবে সে তো আমি; কিন্তু সত্য জানবার তো উপায় নাই।" তার যতটুকু সাধ্য, সংশয়বাদী ততটুকুই গিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব-চেতনা তাতে এখনও প্রতিভাত হয় নি। সে খণ্ড চেতনাকে যতদূর সম্ভব অসীমের সন্ধানে নিয়োজিত করেছে, কিন্তু অসীমকে যে তাতে জানা যাবে না, এ তো সহজ কথা।

তাই দেখ্‌ছি, বুদ্ধি দ্বারা অসীমের এইটুকু নাগাল পাওয়া যায়, এইটুকু বোঝা যায় যে, অসীম কিছু আছে। কিন্তু কি তার স্বরূপ, তা বলা যায় না। যেমন পেছন থেকে কেউ এসে আমার চোখ টিপে ধরে, তাহলে বুঝতে পারি, আমার পেছনে কেউ আছে, আর যে

আছে, সে আমার কোনও বন্ধু, কেননা অচেনা কেউ এসে এমন খোসামদী করবে না। কিন্তু সে যে কে, তা তো বলতে পারি না। এ যেন দেয়ালের গায়ে একটা বল ছুঁড়ে মারলাম, বলটা দেয়াল পর্য্যন্ত গেল বটে, কিন্তু ঘা খেয়ে ফিরে এল। বুদ্ধি তেমনি অসীমকে ভেদ করতে পারে না। যদি অসীমকে জানা যেত, তাহলে অদ্বৈত গিয়ে দ্বৈত হত; তাহলে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় কেউ আর অসীম থাকত না। কিন্তু দেখেছি, বিশ্ব-চেতনায় বিশ্বাত্মার প্রতিষ্ঠা হয়।

এই ঐশী চেতনার কথা বলবার আগে, শৈশব-চেতনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। শিশুর বিশ্বানুভূতি নাই—পিণ্ডানুভূতিও নাই। নিতান্ত কাঁচা এই শিশুটী রয়েছে। ও কি জানে? ও নিজেকে জানে না, তার পর ওর সঙ্গে কথা বলব, এই বলে কি আমরা বসে থাকি? না! শিশুর চারিদিকে যা কিছু ছড়ানো রয়েছে, সেগুলো সে চিনবার আগে কি আমরা তার প্রসঙ্গ তার কাছে করি না? না, তাও তো নয়। খুব ছোট বেলায় তাকে একটা নাম দিয়েছি—যেমন খোকন। বাপ মা তাকে খোকন বলেই ডাকে, কত আদরের কথা, কত কিছুর কথা তাকে শোনায়। বলে সোনা আমার, মাণিক আমার। বাবার কথা তাকে বলে, মায়ের কথা বলে। খোকন আর একটু বড় হয়ে যখন খেলা করতে আরম্ভ করল, তখন নিজেই সে কত কিছু বলতে সুরু করল। বাবার কথা মার কথা বার বার শুনতে শুনতে সেও তার অনুকরণে বাবাকে মাকে ডাকতে শিখলে। খোকনের মুখে বাবা ডাক শুনে তার মা বল্লেন, "ও গো শুনছ, খোকন যে তোমায় ডাকছে।" বাবা বল্লেন, "খোকন, কাছে আয়।" খোকন কি সে ভাষা বোঝে? সে শুধু বাবার হাত দুখানা বাড়ানো দেখে, তাঁর আদরের ডাক শুনতে পেয়ে, বুঝতে পারে, তাকে কাছে যেতে বলা হয়েছে। এর হতে বুঝতে পারি, দেশ চেতনা বা শিশু চেতনা পারিপার্শ্বিকের সংসর্গ হতে উৎপন্ন হয়। তেমনি বিশ্ব-চেতনাও উৎপন্ন হয়, যাঁরা সে চেতনা লাভ করেছেন, যাঁরা আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের সঙ্গ থেকে। যারা শোক তাপে মুহ্যমান, তাদের সঙ্গ কর, আপনি বুকে পাথর চাপবে। হাসিভরা হাল্কা প্রাণ যাদের, তাদের সঙ্গে থাক, বুকের বোঝা নেমে যাবে। এমনিতর সঙ্গগুণে বিশ্ব-চেতনা উদ্দীপ্ত হয়। এখন প্রকৃতির সঙ্গ কর, আর মহাপুরুষের সঙ্গ কর বা তাঁদের বাণীর সঙ্গ কর, সঙ্গ হতে উদ্দীপনা আসবেই। বাপ মা খোকনকে খোকন খোকন ডাকতে ডাকতে শেষ কালে সে খোকনই হয়ে যায়। "খোকন" না হয়ে সে "বুড়া"ও হতে পারত। হয়ত একই ঘরে তিনটী চারটী ছেলে শুয়ে আছে। খোকনকে ডাকলে সেই সাড়া দেবে, আর কেউ না। এত চীৎকারেও কিন্তু অপরের ঘুম ভাঙ্গবে না—কেননা, তাদের তো ডাকা হয় নি।

ব্রহ্মের সঙ্গে যিনি আত্মার ঐক্য অনুভব করেছেন, তাঁকে অজ্ঞানী এসে বলতে পারে একটা ঘাস সৃষ্টি করতে। বলবে হয়ত, "দেখুন মশায়, আপনি তো নিজেকে ব্রহ্ম বলেন। কিন্তু আপনি কি করতে পারেন? ব্রহ্ম এই জগৎটা গড়েছেন, আপনি তো এক গোছা ঘাসও গড়তে পারেন না। তবুও আপনি হলেন ব্রহ্ম। আচ্ছা দেখান দেখি, আপনি কি করতে পারেন!" খৃষ্টকে সয়তানে

এমনি প্রলোভন দেখিয়েছিল, নয় কি? শয়তান বলেছিল, তোমার ভগবান যদি সত্য হন, তবে পাহাড় হতে লাফিয়ে পড় না কেন? খৃষ্ট তার হুম্‌কিতে না ভুলে গর্জ্জে উঠলেন, "দূর হ, এখান থেকে!" শক্তি তাঁর করায়ত্ত বটে, কিন্তু অবিশ্বাসীকে তিনি লীলা দেখাবেন কেন? কোটী কোটী প্রাতিহার্য্যেও (miracle, সিদ্ধাই) অবিশ্বাসীর প্রত্যয় হবে না। বিশ্ব চেতনার উন্মেষ তার মাঝে হওয়া চাই। নতুবা সে লীলা বুঝবে কিসে?

যখন বলি "আমি ব্রহ্ম"—তখন কি অর্থে কথাটা বলি? সে কি এই ক্ষুদ্র অহংকে লক্ষ্য করে? না, তা তো নয়। এই মনকে ধরে? তাও তো নয়। ব্যাপারটা হল এই। —একজন লোক এম্‌, এ, পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পেল, রাজা হয়ে রাজপদবী পেল, এ সব কিন্তু তার স্বরূপের বাইরে—এগুলি উপাধি. উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। বলতে পারি সাপটা কালো—কালোটা কিন্তু সাপ নয়. সেটা সর্পত্বের বাইরে সাপের গুণ সেটা। কিন্তু যদি বলি সাপটা দড়ি, তাহলে কিন্তু সেটা একেবারে আলাদা কথা হল। আমি রাজা; রাজা একটা উপাধি, একটা পদ। কিন্তু যখন বলি আমি ব্রহ্ম, তখন বুঝতে হবে সাপটা যেমন দড়ি নয়, তেমনি এই ক্ষুদ্র অহংও ব্রহ্ম নয়। না জেনে তুমি দড়িটাকে সাপ ভেবেছ, কিন্তু বাস্তবিক সেটা দড়িই। তেমনি এই ব্যক্তিত্ব-বোধও একটা মায়া—**আমি ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, অনাদ্যমনন্তম।**

আর একটু বুঝিয়ে বলি। দুটো ঢেউ আছে মনে কর। একটার জল কি আর একটার জল থেকে পৃথক? না, জল দুটোর সমানই; গোটা সমুদ্রের সেই একই জল। এখানে তার এক রূপ, ওইখানে আর এক রূপ। এখানে এক আত্মা, আর ওইখানেই কি আর এক আত্মা? না—**একই সব, একই অদ্বিতীয়।** আত্মারই দেহ; সব আমার; ভেদ কোথায়ও নাই। বিভিন্ন ভাষায় আলোকে বিভিন্ন নাম দিই; ইংরেজ বলে light, জার্ম্মান বলে licht ইত্যাদি। কিন্তু ভিন্ন নামে ডাকলেও আলো তো মূলে এক। সব জায়গাতেই সেই আলোই—নয় কি? নাম দিলেই কিছু আত্মার ভেদ হয়ে যায় না—**আত্মা সর্ব্বময়!**

দেহটা একটা সংঘাত। হাতটা যদি পৃথক হয়ে গিয়ে বলে, খাবার জোটাই আমি. কাজেই আমিই সব খাব, তাহলে কেমন হয়? তখন আর মুখে খাবার তোলা হবে না, পেটকে তা হজম করতে হবে না, সমস্ত দেহের পুষ্টিও প্রয়োজন নাই—হাত ফুঁড়ে খাবার হাতের মাঝে ঢুকিয়ে দিলেই হবে। একটা হাসির কথা হয়, নয় কি? হাতে আঠা দিয়ে টাকা জুড়ে দিতে পার কি? বোলতা এসে হাতে কামড় দিলে. হাত ফুলে ব্যথা হল। ব্যথাটা হাতের, এই বলে যদি তাকে কেটে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে অহরহ ব্যথা থাকবে সমস্ত শরীরে—কেন না হাতটা যে দেহের সামিল। পেট যখন খাবার হজম করে, তখন পুষ্টির ভাগ সব শরীরেই যায়—হাতও ভাগ পায়। সবাই একজোট হয়ে কাজ করে। তেমনি যখন বিশ্ব হতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করি, তখনই আমরা দুঃখ পাই, আর যে পর্যান্ত না বিশ্বের সঙ্গে আবার যুক্ত হই, সে পর্য্যন্ত দুঃখ পেতেই হয়। এই ব্যাপারের আর বিরাম নাই। বিশ্ব চেতনায় যুক্ত হলে দেখতে পাই, সবাই

পরস্পরের সাপেক্ষ। সব দেহই আমার, ভেদ নাই কোথায়ও।

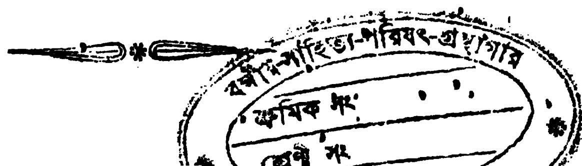
এক সন্ন্যাসী স্যাকরার কাছে গিয়ে বললেন, "সব চেয়ে ভাল আংটীটা এনে ভগবানের আঙ্গুলে পরিয়ে দাও"—বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুচীর কাছে গিয়ে বললেন, "সব চেয়ে ভাল জুতো জোড়া এনে ভগবানের পায়ে পরিয়ে দাও।" দরজীর কাছে গিয়ে বললেন, "সব চেয়ে ভাল পোষাকে ভগবানের দেহটা সাজাও"—মানে "আমাকে সাজাও।" লোকে শুনে বললে, "এ ব্যাটা নাস্তিক—দূর করে দাও ওকে—জেলে দাও।" সবাই এসে তাঁকে ধরল, জেলে নিয়ে যাবে বলে। সন্ন্যাসী বললেন, "আচ্ছা, তার আগে আমার দুটো কথা শুনতে হবে কিন্তু।" জিজ্ঞাসা করলেন, "জগৎটা কার?" সবাই বলল, "ভগবানের।" "চন্দ্র-সূর্য্য কার?" "ভগবানের।" "মাঠ ঘাট সব কার?" "ভগবানের।" "এ কথায় তোমরা বিশ্বাস কর?" সবাই বল্লে, "হুঁ, হাঁ, করি বই কি—এই তো সার কথা।" তখন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, "এই দেহ তবে কার?" ভগবানের। "কার চরণ?" ভগবানের। "কার আঙ্গুল?" ভগবানের। তারা নিজেদের যুক্তিতেই শেষ কালে এসে ঠেকে গেল—দেখলে, সাধু যা বলেছিলেন, তাই তো ঠিক। কাজেই তার আর সাজা হবে কি করে? ওরা তো অজ্ঞান, সাধু যেমন করে তলিয়ে বুঝেছেন, তেমনি করে তারা কি বুঝতে পারে?

ভারতবর্ষে মানুষ মরলে বলে দেহত্যাগ করল; এ দেশে বলে আত্মা ত্যাগ করল। এখানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, তার চেয়ে ওখানকার ভাষা বেশী শুদ্ধ—কেননা ওখানকার কথায় মনে হয় আত্মা দেহ ছাড়া আর কিছু। তাই সে দেশে এমনও বলে, তার প্রাণ বেরিয়ে গেল—সে নয়।

তিনটা লোক বসে মদ খাচ্ছিল, খেতে খেতে মাতাল হয়ে পড়ল। একজন বল্লে "একটুখানি চড়িভাতি করা যাক্ না!" তখন একজনকে মাংস ইত্যাদি আনবার জন্য পাঠানো হল—সবাই একটু ফুর্ত্তি করবে বলে। মাংস আনতে একজন চলে যেতে আর একজন তার সঙ্গীকে বল্লে, "ও ভাই, আমার যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।" সঙ্গীটী বল্ল, "তা বল্লে কি হয়, বেরুতে দিচ্ছি না তো!" এই বলে সে বন্ধুর নাক চেপে ধরল, যাতে প্রাণ না বেরুতে পারে। একেবারে বন্ধুর নাক মুখ কাণ সব চেপে সে বসে আছে, প্রাণ বেরুবার যাতে রাস্তা না পায়। ফল কি হল বুঝতে পারছ। কিন্তু মাতালের তো সে হুঁশ নাই।

কৃষ্ণ যজ্ঞ করছেন। রাজ-রাজড়ার নিমন্ত্রণ হয়েছে—কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী রাধার নিমন্ত্রণ হয় নি। নারদ বললেন নিমন্ত্রণ করতে, কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই শুনলেন না, বললেন, "না।" নারদের কিন্তু কৃষ্ণের ব্যবহার ভাল লাগল না। তিনি নিজে গিয়ে রাধাকে যজ্ঞের কথা বললেন। রাধা বললেন, "তুমি যখন উৎসব কর, তখন বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাও, কিন্তু নিজের কাছে পাঠাও কি? জানি কৃষ্ণ যজ্ঞ করবেন। কিন্তু আমরা যে এক!"

মজনুঁর প্রেয়সী লয়লা একদিন বললে, আজ শরীরটা ভাল ঠেকছে না—কিছুতেই সোয়াস্তি হচ্ছে না যেন! হাকিম ডাকা হল। হাকিম এসে সে যুগের প্রথামত লয়লার রক্তমোক্ষণ করবে বলে বাহুতে অস্ত্রাঘাত করল, কিন্তু রক্ত বেরুলো না। ও দিকে মজনুর সেই জায়গা হতে ধারে রক্ত ছুটল। দুইটী প্রেমিকের একপ্রাণতা এমনিতর!



কর্ম্মশেষ

—*—

লোভ না থাকিলে কেউ কর্ম্ম করিতে চায় না, এই দেখি সংসারের রীতি। কিন্তু ভগবান্ কর্ম্মের উপনিষদ প্রচার করিতে গিয়া বড় কঠিন আইন জারী করিলেন, বলিলেন, তোমাকে বিনি মাইনের মজুরী খাটিতে হইবে। ভরসা দিলেন, ইহাতে লোভের কিছু না থাকুক, লাভের আশা আছে। তুমি শেষ কালে আমাকে পাইবে অর্থাৎ শান্তি পাইবে। লোভ না রাখিয়া কাজ করিলে শান্তি হয়, এ কথাটা স্বতঃস্বীকার্য্যের মত ধরিয়া লইলেই ভাল। বিচারবুদ্ধি যদি রুখিয়া বলে, কেন ভাল? তাহা হইলে একটা জবাব জোটাইতেই হয়।

আপাততঃ এই কথাগুলিই মনে হয়, ফলের ভরসা করিয়া কাজ যে করিব, আমি কতটুকুই জানি, কতটুকুই বা বুঝি যে, ঠিক ঠিক ফল কি ফলিবে, তাহার আন্দাজ করিতে পারি? তুমি হয়ত জবাব করিবে, একেবারেই কি বোঝ না? ভগবান তো আক্কেল বলিয়া একটা বস্তু তোমাকে দিয়াছেন, সেটা কি কিছুই বাৎলাইয়া দেয় না? আমি বলি, স্বাভাবিক বুদ্ধি নববধূর মতই ভীরু, আশা ও সংশয়ে কম্পিত; তাহাকে নিয়া কর্ম্মের পত্তন অবশ্যই করিতে হয়, কিন্তু ফল সম্বন্ধে পাকা রায় দেওয়া চলে না। "এইটুকু বোঝা যায়, তাই এইটা করিতেছি, শেষটায় কি হইবে জানি না"—সমজদার ব্যক্তি এর চেয়ে জোর করিয়া বেশী কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু সংসারে হয় কি, বাসনার আবেগে অনিশ্চিতটাকেও আমরা সুনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া নিই—শেষে ফল না ফলিলেই বেজার হই। কবিরাজ বড়ীর ব্যবস্থা করিয়াই জেদ ধরেন, নিশ্চয়ই আরাম হইবে। কেন, জন্ম-মৃত্যু তাঁর হাতধরা না কি? কোথায়ও কথা ঠিক হয়, কোথায়ও ঠিক হয় না। ঠিক হইলে অভিমান এক কাঠি বাড়িয়া যায়, ঠিক না হইলে দুঃখের আর অন্ত থাকে না।

অনিশ্চিত নিয়া যেখানে কারবার, সমস্ত-গুলি নিমিত্ত যেখানে আমার জানা নাই, সেখানে মনটাকে ভাল মানুষের মত চুপ করাইয়া রাখাই তো ভাল। তাই হইল, ফলের দিকে না তাকাইয়া কর্ম্ম করা। কেউ বলিবে, এত ল্যাঠার কি প্রয়োজন—কর্ম্ম না করিলেই তো হয়, তখন ফলও থাকিবে না, আকাঙ্ক্ষাও থাকিবে না। ভগবান্ বলিতেছেন, "সবুর, এত তাড়াতাড়ি করিও না—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। অকর্ম্ম করিবার দিকে যেন তোমার ঝোঁক না পড়ে।"

ঝোঁক পড়িয়াও তো উপায় নাই। তুমি কি মনে কর, তুমি কম্বল ছাড়িলেই কম্বল তোমাকে ছাড়িবে? তা ছাড়ে না। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে। কর্ম্মত্যাগের যথার্থ পরিচয় হইতেছে মনের শান্তিতে। কাজকর্ম্ম ছাড়িয়াই শান্তি পাইয়া গেল, এমন কাহাকেও দেখাইতে পারিবে কি? হয়ত কাজ করিতে করিতে হাঁপাইয়া পড়িয়াছ, ভাবিতেছ এ ল্যাঠা চুকিলেই বাঁচি। কিন্তু পরখ করিয়া দেখিয়াছি, ল্যাঠা চুকিলেও বাঁচোয়া নাই।

বিশ্রাম প্রয়োজন বটে—কিন্তু সে আর এক ধরণের। বিদ্যুতের কারখানায় দুইটা করিয়া ডাইনামো থাকে। একটা যখন চলে, তখন আর একটা বন্ধ থাকে; কিন্তু কোনটারই একেবারে ছুটী হয় না, তাহা হইলে রোশনাই হবে কোথা হইতে? আমাদেরও দেহ আর মন—দুইটা ডাইনামো। যখন দেহটা চলিতে থাকে, তখন মনটা নিষ্ক্রিয় থাকে। চাষাভুষার দেহের খাটুনী বেশী, তাই মনটা জড়; সাধারণ সংসারে মেয়েদের দেহের খাটুনী বেশী, তাই তাদের মনটা স্থবির। খুঁজিলে নিজের মাঝেই এর পরিচয় পাইবে। আবার বিপরীত দিক দিয়া একটা সত্য জানিয়া রাখ, যখনই দেখিবে, ভাবনা-চিন্তায় মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই শান্তি পাইতেছ না, তখন যে কোনও একটা কাজে দেহের ডাইনামোটা চালাইয়া দিয়া দেখিও, মন হাল্কা হইয়া আসিয়াছে। মোট কথা ডাইনামো একটা না একটা চলিবেই। তবে যে মিস্ত্রী হিসাব করিয়া একটা চালায়, আর একটাকে বন্ধ রাখে, সেই ওস্তাদ বটে।

কর্ম্মটা দেহসম্পর্কেই বুঝি ভাল, তাই দেহের খাটুনী এড়াইবার ভয়ে বলি, ফল দিয়াও দরকার নাই, কাজ দিয়াও দরকার নাই। কিন্তু কুঁড়ের মন নিষ্ক্রিয় হইয়াছে, এমন উদাহরণ হাজার খুঁজিয়াও পাইবে না। যে যত অকর্ম্মা, তার মন তত কল্পনা-প্রবণ, আত্মদমনে সে তত অসমর্থ, সমাজের সে তত বড় শত্রু। তাই ভগবান্ হুঁসিয়ার করিয়া দিতেছেন, "অকর্ম্মের ভূত যেন তোমায় না পাইয়া বসে।"

কিন্তু শেষের দিকে তাকাইব না, অথচ কাজও ছাড়িতে পারিব না—এ কেমন করিয়া হয়? হওয়া কঠিন অতএব অভ্যাস-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু তবুও জানিয়া রাখ, এ হয়; আর এ হইলেই শান্তি। ভগবান্ নিজকে উপমাস্থলে রাখিয়া বলিতেছেন, "দেখ, ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, তবুও আমি কর্ম্ম নিয়াই আছি।" কর্ত্তব্য বলিতে ঠিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝ না—কর্ত্তব্য মানে অভীষ্ট ফল। ভগবানের এই কথাটি সকল কর্ম্মীরই প্রাণে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে। আমরা কাজ করি, একটা কিছু মতলবসিদ্ধির দরুণ এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এ জগতে হাজারগণ্ডা মতলব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কার মতলব যে সিদ্ধ হইবে, তাহা কি করিয়া বলি? তাই মনে রাখিতে হইবে, আমি এই গড়িয়া তুলিব—এই আমার কর্ত্তব্য—কাজেই এ দম্ভ-ভরে আমি কাজ করিতেছি, এমন অভিমান মোটেই রাখিতে নাই। **আমার করিবার কিছু নাই—কিন্তু কাজ আছে।** কর্ম্মের এই বড় জবর এক হেঁয়ালী। এটা জীবেরও কথা, শিবেরও কথা। জীব শেষের খবর তো জানেই না; তাই তার করিবার কি আছে? সে শুধু হেড মিস্ত্রীর জোগানদার—নক্সা দিবার কে? আর শিব তো জানেনই কি দিয়া কি হইবে, সুতরাং তাঁরও আর নূতন করিয়া করিবার কি আছে? তাই তিনিও চুপ। যন্ত্র চালাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, তাই তাঁর কর্ত্তব্য নাই; আমরা অল্পজ্ঞ, তাই আমাদেরও কর্ত্তব্য নাই। তিনি অধ্যক্ষ, তাই তাঁর কর্ম্মের বিরাম নাই, আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত, কাজেই আমাদেরও কর্ম্মের বিরাম নাই। এই ভাবচতুষ্টয় আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের অতি অনুকূল।

কর্ত্তব্য নাই অথচ কর্ম্ম আছে, এই হইলেই তো বাছাইর কথা আসে। কেননা ডিজাইনটা আমাকে বুঝিতে দিতেছ না, অথচ কাজের ভার ঘাড়ে চাপাইয়াছ—এখানে বুদ্ধি আকুল হইবে না? ভগবান্ একটু মিষ্টি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা হইবে বই কি! তাই বলি বোঝাপড়ার ধার দিয়াও যাইও না। কর্ম্মও বুঝিতে হইবে, অকর্ম্মও বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্মও বুঝিতে হইবে। সাধারণ মানুষ তিনটা জড়াইয়া বুঝিতে পারে না, সে বোঝে একটা। তাই সে ঠকে। ফলে তার মনে হয়, গহনা কর্ম্মণো গতিঃ—কর্ম্মের গতি বোঝার যো নাই। আমিও বলি, বাস্তবিক তাই। অতএব বোঝাপড়ার মাঝে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই।"

প্রশ্ন করিলাম, তবে কাজ করিব কি করিয়া? ভগবান্ বলিলেন, "সহজং কুরু কর্ম্ম—সঙ্গং ত্যক্ত্বা"—যেটা তোমার স্বভাবে, সেইটাই কর; তবে তাতেও ঝোঁক রাখিও না।" তোমার নিয়তি বুঝিয়া প্রকৃতি বুঝিয়া কাজ কর। তোমার স্বভাব বলিতেছে; তুমি দিনমজুরীর ওয়ারিশ, তুমি কিন্তু বিশ্বকবি হইবার বায়না ধরিলে। কথায় বলে দেখাদেখি বাঁকায় নাচে। এমন ক্ষেত্রে দুঃখ হইবে না, বুদ্ধি গুলাইয়া যাইবে না? তাই বলি, তোমার যা স্বভাব, তার অনুকূলে কর্ম্ম কর—কিন্তু ঝোঁক রাখিও না। ঝোঁক থাকিলেই আর স্বভাবের উন্নতি হইবে না—মুক্তি হইবে না।

মানিয়া নিলাম, কর্ত্তব্যবুদ্ধি না রাখিয়া, ঝোঁক না রাখিয়া স্বভাবের বশে কর্ম্ম করিয়া গেলাম। সে তো সবাই করে; তাহা হইলে তুমি আর আমাকে বেশী কি উপদেশ দিলে? ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, "সবাই ঠিক তার উল্টা করে। আর গোড়াতেই যে গলদ রহিয়াছে। তুমি যে করিতেছ আমার কাজ, আর তারা করে নিজের কাজ। এক হইল কিসে? গোড়াতে যে বলিয়াছিলে, আমি প্রপন্ন, শরণাগত—আমাকে বুদ্ধি দাও; আমিও যে বলিয়াছিলাম, আচ্ছা, তোমাকে আমি গ্রহণ করিলাম, তোমার যাতে মঙ্গল হইবে আমি তাহা করিব। গোড়ার এই গুরু-শিষ্যের স্বীকৃতিটুকু ভুলিয়া গেলে কেন? ওই সম্বন্ধ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়াই তো সহজ কর্ম্মের সহজ ধর্ম্মের উপদেশ তোমাকে দিলাম। এ রহস্য অভক্তে কখনও বুঝিতে পারিবে না। তাহাকে একথা শোনাইতেও নাই।"

শেষে প্রশ্ন—এই সহজ কর্ম্মে দিন গুজরাণ করিয়া ফল কি হইবে গোবিন্দ? গোবিন্দ বলিলেন, "আবার ফলের কথা? সে কথা তো গোড়াতেই মানা। তবুও একটা কথা তোমায় বলিতেছি—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।—যত কিছু কর্ম্ম সবের শেষ ফল জ্ঞান।" গুরুসেবার বা গুরুগৃহবাসেরও এই শেষ ফল।

সাধুত্বের সাধনা

—:{*}:—

যাহারা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়াছে, সাধুত্ব কেবল তাহাদের জন্যই, এমন একটা সংস্কার আমাদের সমাজে বদ্ধমূল আছে। গৃহস্থকে সাধু হইতে হইবে না, এমন কোনও অনুশাসন শাস্ত্রে নাই। অথচ গৃহস্থের মুখে দুইটী মারাত্মক কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই :(১) "মশায়, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়া ঘর কার, একটু-আধটু চুরী-চামারী না করিলে আমাদের পোষায় না।" (২) ধর্ম্মশীল যুবক পুত্রকে পিতা-মাতা উপদেশ দিতেছেন, "তোদের এখন বয়সকাল, এখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি তোদের সাজে? ও সব পঞ্চাশ পেরয়ে।" অথচ ঋষি বাক্য আছে—"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ!"

সাধুত্বকে ক্ষুন্ন না করিলে সংসার চলে না, এটা মিথ্যা কথা। সংসার সুখের হয়, ধনের জোরে নয়, মনের জোরে। আর সাধুত্ব অর্থই মনের জোর। সুতরাং গৃহস্থকে যখন লড়াই করিয়া সংসার করিতে হয়, তখন তার সাধুত্ব তো বেশীমাত্রাতেই থাকা উচিত। এই এক কথা। আর এক কথা, যৌবন ভোগের সময় বটে, কিন্তু সংযম না থাকিলে ভোগ দুর্ভোগ হইয়া দাঁড়ায়। যে ধাতুক্ষীণ, অম্লপিত্তের রোগী, সংসার তাহার কাছে ভোগের না দুর্য্যোগের? সাধুত্ব ছাড়া সংযম হয় না। সুতরাং ইহাতেও প্রমাণ হয়, যথেচ্ছ ভোগ করিতে হইলেও সাধুত্ব প্রয়োজন।

যাহারা ঘরে আছে, তাহাদের পক্ষে যে ব্যবস্থা, যাহারা ঘর ছাড়িয়াছে, তাহাদের পক্ষেও একই ব্যবস্থা। অর্থাৎ সাধুত্ব সবার পক্ষেই সমান ভাবে প্রয়োজন। গোড়ায় এই কথাটা মনে রাখিয়া, গৃহত্যাগী নয়, উদাসী সাধুর কথাই বিশেষ করিয়া আলোচনা করিব।

সাধু শব্দটা যে সমাজে একটা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার হয়, তাহাতে সমাজের ক্ষতি হইলেও মূলে একটা কথা আছে। ঠিক সাধুত্ব জিনিষটা কি, তাহা তলাইয়া বোঝা এবং সেই অনুকূলে অটল ভাবে নিজের জীবনকে পরিচালিত করা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এক কথায় বুঝিতে গেলে আজন্ম সাধু মানুষ জগতে বড় কম। প্রায়ই মানুষকে দায়ে পড়িয়া সাধু হইতে হয়। যিনি আজন্ম সাধু, তাঁহার আর ঘর-বাহির বলিয়া বড় একটা কিছু প্রভেদ হয় না। বৈদিক ভাষায় ইঁহাদের বলি ঋষি। কিন্তু যিনি অন্তরের চাপে কিম্বা বাহিরের চাপে পড়িয়া সাধু হন, তাঁহাকে একটা বিশিষ্ট আস্তানা গাড়িতে হয়। পৌরাণিক-ভাষায় ইঁহাকে বলি মুনি। আজকাল সমাজে মুনিব্রতের সংখ্যাই বেশী।

এই শেষোক্ত সাধুত্ব একটা ভাবোন্মাদ। কখনও কখনও দেশের মাঝে এমনি বাসন্তী মত্ততার একটা হাওয়া বহিয়া যায়, সমাজের বুকে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে সাধু ফুটিয়া উঠে —ত্যাগ বৈরাগ্যের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে। এইগুলিই যুগসন্ধি; তখনই অবতার হয়। তার পর আবার ঝরিবার পালা সুরু হয়। যারা শেষে আসে,

তারা হয়ত ঝরা ফুলই কুড়াইয়া লইয়া যায় —দেবসেবায় লাগিবে বলিয়া।

সাধুত্ব যদি মজ্জাগত না হইয়া ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। সে সমস্ত সমস্যা সাধুর সমাজেই আবদ্ধ থাকে না, গৃহস্থ সমাজেও সেগুলি বিসর্পিত হইয়া পড়ে। ফলে প্রকৃত সাধুত্বের প্রতিও মানুষের অশ্রদ্ধা ও অনাদর বাড়িয়া থাকে। কিন্তু উপায় নাই; শুদ্ধ বিচার করিয়া জগতে চলিতে পারে এমন ধীর কয় জন আছে? ভাবোচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হইয়া মানুষ ঘর বাঁধে, ঘর ভাঙ্গেও। যাহারা বাঁধে, তাহাদিগকে কিছু বলিবে না, আর সংখ্যায় মুষ্টিমেয় বলিয়া ঘর ভাঙ্গাদের লাঠি লইয়া তাড়া করিবে, ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনা হইলেও স্থিরবুদ্ধির পরিচয় নহে। তবে এ কথা স্বীকার করি, সংসার-পলাতকেরা যদি সংসারীদের মাঝে আসিয়া উপদ্রব করে, তবে তাহার ফলাফল সর্ব্বাংশে তাহাদিগকেই ভোগ করা উচিত।

কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ুর গুণে রমতা সাধুর পরিমাণ এখানে খুব কম। তাই সমষ্টিগতভাবে তাহাদের নিয়া বিচার করাও কঠিন। এ দেশে গৃহপলাতকেরা ঘরের বাহিরে আসিয়া আবার ঘর বাঁধিতে চিরকাল অভ্যস্ত। ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখ, সংঘের শরণ নেওয়া এ দেশের বহু পুরাতন রেওয়াজ —এমন কি বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্বে এই নীতি প্রচলিত ছিল। এই সুপ্রাচীন জাতীয় সংস্কারবশতঃ আজও বাঙ্গালী সাধু ঘরের বাহির হইয়াই ঘর খোঁজে দেখিতে পাই। ফলে ভাবোচ্ছ্বাস-প্রণোদিত সাধুতায় সাধুসংঘেও একটা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সংঘেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তাই সমাজের এই অভিনব আত্মপ্রকাশকে ধীর স্থির ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার মর্য্যাদা নিরূপণ করা আবশ্যক।

যে সমাজে সাধুত্বের সাধনা পরিপক্ক হইবে, সেই সমাজের একটা পরিচয় দেওয়া প্রথমতঃ প্রয়োজন। সমাজ বলিতে আমরা সংহতি বুঝি। সাধারণ সমাজ বহু ব্যক্তির সমষ্টি। কিন্তু সাধুর সমাজ বলিতে আমরা যাহাকে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা বহু ব্যক্তির সমষ্টি না-ও হইতে পারে। এমনও হইতে পারে, সাধু নামধারী অনেকে যেখানে আছেন, সেখানে বাস্তবিক সাধু এক জন, কি দুই জন, আর সবাই সাধক। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সংহতি দ্বারা সাধুত্বের আদর্শ পিণ্ডীভূত হইয়া দেখা দিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। তাই সাধুর সমাজ বলিতে বুঝি ভাবের সংহতি। একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিভূতিময় প্রকাশ এক স্থানে হইতেছে, তাহার মূলে হয়ত একজনমাত্র সাধুর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব—এই এককের সৃষ্টিকেই সাধুর সমাজ বলিব। নবাগত সাধক এই ব্যক্তিত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন ও এই সাধুশক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াই তাহার সাধনা সুরু করে। বাহির হইতে এই সাধুর সমাজকে চিনিবার যো নাই, কেননা ইহার মর্ম্মসাক্ষ্য বেশভূষায় বা কাজে-কর্ম্মে নয়, সহজ জীবনের আনন্দময় উদার বিকাশের মাঝেই ইহার প্রতিষ্ঠা। সাধক এই সহজ আনন্দের অনুভূতিই প্রথম পায়—আড়ম্বরহীন হইয়াও সাধুত্ব তাহার কাছে বড় মনোরম, বড় তেজস্কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নবানুরাগের তরঙ্গ প্রশমিত

হইলে কি করিয়া ভাবের ব্যত্যয় ঘটিতে থাকে, এখন তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আজন্ম-সাধুর কথা গোড়াতেই ছাড়িয়া দিয়াছি। ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত সাধুত্বের কথাই বলিতেছিলাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, সাধুত্বের সাধনার প্রথম স্তরে সাধকের মন ভাবে উজ্জ্বল ও উন্মুখ থাকে। তখন সাধুর সমাজে সকলকেই সাধু বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় সাধকের অন্তর্নিহিত সেবাবৃত্তিও বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। নবানুরাগের প্লাবনে চিত্ত সরস হইয়া উঠে বলিয়া সকলকেই আপন করিয়া লইতে আগ্রহ হয়, পরের সেবায় নিজকে বিলাইয়া দিয়াও যেন ভালবাসা ফুরাইতে চাহে না। কিন্তু সাধু বুঝিতে পারেন, এ জোয়ারের জল, বাহিরের আকর্ষণে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে মাত্র। এই সেবার প্রবল উচ্ছ্বাসের মাঝেও সংসার-সংস্কারের ক্রিয়া অলক্ষ্যে সুরু হইয়া যায়, অতর্কিত আঘাতে সাধকের সাধুত্বের মোহ কাটিয়া গিয়া অসংস্কৃত আদিম রূপটী প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু এ দিকে সাধুত্বের অভিমান ততদিনে তাহাকে একেবারে পাইয়া বসে। ফলে তাহার মনে এই বিচিত্র একটী ভাবের উদয় হয় যে, "এ তো দেখিতেছি, যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা নয়। আমি ভাবিয়াছিলাম ইহারা সাধু। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, এরা তো সাধু নয়।" সাধকের এই মনোভাবই তাহার নিজের সাধুত্বের সাধনাকে পণ্ড করিয়া দেয়, অভিমানে অন্ধ হইয়া তাহার দিকে সে নজর দিতে পারে না। মূলে এই কথাটাই সত্য—তোমার মাঝে যতক্ষণ সাধুত্ব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমিও অপরকে সাধু বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু তোমার মাঝে অসাধুত্বের বীজ যখন হইতে প্রবেশ করিবে, তখন হইতেই অপরকে সাধু ভাবিবার চেষ্টাটাও উদ্দাম হইয়া উঠিবে। সুতরাং যখন তুমি সাধুর সমাজে আর সাধু দেখিতে পাইতেছ না মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছ, তখন তুমি নিজে যে সাধুত্বের সংস্কারচ্যুত হইয়া পড়িতেছ, সে কথা ভুলিয়া যাইও না। সাধু অসাধু চিনিয়া ফেলিয়াছি—এই মনোবৃত্তি সাধুত্ব সাধনার একান্ত প্রতিকূল। অসাধুকেও সহ্য করিয়া যিনি তাহাকে সাধু করিবার ক্ষমতা রাখেন, সেই সিদ্ধ সাধুই সাধু-অসাধু চেনেন, তুমি-আমি সে বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া নিজের চিত্তবৃত্তিকে কলুষিত করি মাত্র।

সাধুত্বের ঝুটা লক্ষণ-জ্ঞান জন্মিবার পর সাধকের মনে অপরের উপর একটা দাবী জাগিয়া যায়। সে রোষের সঙ্গে এই কথাটা ভাবে সাধুর আস্তানায় এরা সবাই সাধু হবে না কেন? তার পর, নিজের সংস্কারানুযায়ী কোথায়ও সাধুত্বের খর্ব্বতা দেখিতে পাইলেই সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়ে এবং অসাধুত্বের নিধন সাধনের আগ্রহে অধীর হইয়া উঠে। এই অপরিণত অসহিষ্ণুতা প্রকৃত সাধুত্ব অর্জ্জনের পক্ষে বিষম বাধা। হয়ত সাধক মনে করে, অন্যায় দেখিয়া অসহিষ্ণু হইবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহার আছে; সুতরাং তাহার এ ক্রোধ পুণ্যবানের ক্রোধ (righteous wrath)। কিন্তু এটা যে কত বড় অভিমানের কথা, সে কথা সে ভাবিয়া দেখে না। তা ছাড়া এ কথাটাও সে বুঝিতে পারে না, সাধুর সমাজ ভাবের সংহতি, ব্যক্তির সংহতি নয়। এ ক্ষেত্রে যথার্থ সাধুত্ব

ভাবনিগ্রহমাত্র, আর সব'ই সাধক। সাধু হইয়া তার পর সবাই দল বাঁধে নাই—বাঁধিতেও পারে না; দল বাঁধিয়াছে সাধু হইবার জন্য। সুতরাং সবাই এখানে সাধক। সাধকে সাধকে গুঁতাগুঁতি করিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরস্পরে প্রেম না থাকুক, সহিষ্ণুতা থাকা চাই। অসাধুর উপর চটিবারও একটা অধিকার থাকা চাই। গৃহস্থ সাধুর নিন্দায় মুখর হয়, তা জানি। কিন্তু সাধু যদি সাধুর নিন্দা করে, তাহা হইলে সেটা হয় আত্মহত্যার সামিল। তাই সাধককে সর্ব্বদা স্মরণে রাখা উচিত—সাধুর ক্ষেত্রে, সবাই সাধু হইতে আসিয়াছে, সাধু হইয়া কেহ দল পাকাইতে আসে নাই। এক বনে একটা বাঘই থাকে, পালে পালে বাঘ চরে না। খাঁটী সাধু বাঘের মত একচ্ছত্র রাজা। সুতরাং যেখানে সংঘ স্বীকার করিতেছি, সেখানে সবাই সাধু হইবে, এ দাবী করা ছেলেমানুষী ও আত্মাভিমানের পরিচায়ক।

সাধুত্বের সমালোচনা করিতে গিয়া সাধক নিজে মস্ত সাধু বনিয়া যান—এই আর এক বিপদ্। আমি সাধু—এ তেজ ভিতরে থাকা চাই, সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এ তেজ খাটাইতে হইবে কাহার উপর? পরের উপর না নিজের উপর? সাধু স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে, কিন্তু পরের উপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে যাইবে না। সাধুত্বের পথ বড় বিষম, পদে পদে নিজকে যাচাই না করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু দেখিয়াছি, অধিকাংশস্থলেই সাধুত্বের যাচাইটা হয় অপরের সঙ্গে তুলনা করিয়া। সাধক অপর সাধকের ক্রটীটা খুব বড় বড় হরফে নিজের মনের মাঝে জাগাইয়া রাখিয়া ভাবে, "আমি তো এমন করি না, অতএব আমি সাধু।" এই মনোভাবের মাঝে একটা স্বতোবিরোধ রহিয়াছে। যখন ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন নিজকে নিঃসঙ্গ কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলাম। রমতা হইয়া যখন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তখনও নিজের দিকে তাকানো ছাড়া অপরের দিকে তাকানোর সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই—কেননা কাহারও সঙ্গে ঘর-কন্না করিবার সুযোগ তো তখন মিলে নাই। সাধুর জীবন বাস্তবিক এই নিঃসঙ্গ জীবন। এ কথা বিশেষ করিয়াই জানি, সাধুর জুড়ি মেলা ভার। এই নিঃসঙ্গ সাধুত্বের সাধক যখন সাধুর আস্তানায় ঢোকে, তখন সে ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব যে তার সাধনার পক্ষে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন, এ কথা সে কেন ভুলিয়া যায়? পরের কাঁধে পা তুলিয়া দিয়া বসাকে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া বলে না—স্বপ্রতিষ্ঠ মানে নিজের পায়ে নিজে ভর করিয়া দাঁড়ানো। তাই সাধুত্বের যথার্থ সাধক সেই, যে অপরের সঙ্গে যাচাই করিয়া নিজের কাছে নিজকে সাধু প্রতিপন্ন করিতে যায় না; সে জানে, আমি সত্যের সাধক, অতএব জগতে আমি একলা, কারু গুণেরও অনুকরণ করি না, দোষেরও সমালোচনা করি না। ইহাই যথার্থ আত্মপ্রতিষ্ঠা। নতুবা নিজস্বত্ব হইয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য করাকে সাধুত্ব বলে না। তবে কি অপরের অসাধুত্ব দেখিলে চোখ বুজিয়া থাকিতে হইবে?—আমি বলি, বাইরের চোখ না বুজিতে পার, মনের চোখ দুটা বুজিয়া রাখ—ক্ষুব্ধ হইও না বা নিজকে বাহাদুর মনে করিও না। তোমার তুলনা তুমি—অপরে তোমার তুল্য নয়।

অসাধুত্বকে উপেক্ষা সাধকের ধর্ম্ম, অসাধুত্বের প্রতি করুণা সিদ্ধের স্বভাব; আর অসাধুত্বের প্রতি ক্ষোভ বা আত্মশ্লাঘা নিজেরই অসাধুত্বের প্রমাণ।

অনেক জানিয়া-বুঝিয়াও চুপ করিয়া থাকা যথার্থ সাধকের লক্ষণ। নয়া ভেকওয়ালা সাধুরা চুপ করিয়া থাকে, কিছু জানে না বলিয়া। কিন্তু যেই ঘরকন্নার ঠোকাঠুকি সুরু হয়, অমনি সাধুত্বের ভেক খসিয়া গিয়া নখদন্ত বাহির হইয়া পড়ে, অথচ উভয় পক্ষই মনে করে, আমরা সাধু; এ বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি। অপরকে উপদেশ দেওয়া, পথ বাৎলাইয়া পথে আনিবার চেষ্টা করা —সাধুম্মন্যের এটা একটা মহাব্যাধি। সবাই ভাবে সাধুর খাতায় নাম লেখাইবা মাত্রই বুঝি পরকে উপদেশ দেওয়ার সনদ মিলিয়া গেল। বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি, নবানুরাগের সময় সাত চড়ে যাহার একটা কথা বাহির হইত না, দুদিন পরেই সে মস্ত প্রচারক হইয়া বসিয়াছে মন্ত্র-তন্ত্র সত্য প্রচার করা, গায়ে পড়িয়া উপদেশ দেওয়া তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাদের নয়া ভেক, তাহাদের বলি, এইখানে সাধু সাবধান। আত্মভাবা না হইলে উপদেশ দেওয়ার অধিকার মিলে না। সব বুঝি, —এই বড়াইয়েই সাধুত্বের সমাধি। প্রকৃত সাধু সব বোঝেন, কিন্তু কিছু বলেন না; তাই মনু মহারাজ বলিয়াছেন, "জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ"—বুদ্ধিমান সাধু সব জানিয়া লোকের মাঝে বোকার মত থাকিবেন। যে মুখ-চপল, তার সাধুত্বের বড় বিশ্বাস নাই।

সাধুত্বের আদর্শ সকলেরই নিজের মাঝে, কাহারও নিকট হইতে উহা ধার করিয়া আনা চলে না। ছোট ছোট ছেলেদের মাঝে দেখি, যদি কেহ একটা অন্যায় করিয়া ধরা পড়িল, তাহা হলে সাফাই স্বরূপ অমনি বলিয়া বসিবে, "অমুকেও যে করিল!" অর্থাৎ দোষী যদি একজন সঙ্গী জোটাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার দোষ যেন হাল্কা হইয়া যায়। আমরা বড় হইয়া এই শিশু-সুলভ নীতিকে সমর্থন করি না। কিন্তু রহস্য এই, সাধু বনিতে গিয়াও এই নীতিটাই অনেক সময় আমরা মনের কোণে পোষণ করি। সাধুম্মন্যের কাছে সাধুত্বের উপদেশ দেওয়া অধিকাংশস্থলে বিপদের কারণ হইয়া উঠে দেখিতে পাই। যে উপদেশ দিতে যাইবে, সাধক সাধু নিক্তির ওজনে তাহার সাধুত্বের যাচাই করিয়া তবে তাহার কথায় কাণ দিবে। এরূপ কঠিন যাচাইয়ে অধিকাংশ স্থলেই উপদেষ্টার সাধুত্ব টেকে না—ফলে উপদিষ্ট সাধু এই ভাবিয়া মনে মনে গজরাইতে থাকেন, "উনি আমাকে উপদেশ দিতে আসিলেন, কিন্তু নিজে কি, তাহা দেখেন না?" সাধক ভুলিয়া যায়, অভিমান বিসর্জ্জনই সাধুত্বের প্রধান নিশানা। আমি সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে আবার পথ বাৎলাইয়া দিবে কে—এই ভাব যাহার হৃদয়ে প্রবল, তাহার আত্মশোধনের পথ বড় সঙ্কীর্ণ। প্রকৃত সাধুর জগৎটাই পাঠশালা। অবধূত সাধু হইতে গিয়া একুশজন গুরু করিয়াছিলেন, তাহার মাঝে তির্য্যক্ প্রাণীও বাদ যায় নাই। সাধক প্রথম যখন সাধু হইতে আসে, তখন সে গুরুগৃহে আসিয়াছে বলিয়া মনে করে, ভাবে সবাই তাহার শিক্ষাদাতা। যতদিন চিত্ত এইরূপ মোলায়েম থাকে, ততদিন সাধুত্ব

অর্জ্জনের নির্ম্মল আনন্দও সে পায়। কিন্তু অলক্ষ্যে কোন্ মুহূর্ত্তে সয়তান তাহার মাঝে ঢুকিয়া তাহাকে গুরুত্বের পদবীতে অভিষিক্ত করে। যে দিন হইতে গুরুগিরি সুরু হয়, সে দিন হইতে আর অপরের নিকট হইতে শিখিবার কিছু থাকে না, সাধুত্বের সাধনারও খতম হইয়া যায়। শিশু সাধক এইখানে সাবধান।

সাধুর সমাজ একটা ভাবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলিয়াছিলাম। ভাব যেখানে অন্তর্রূঢ়, কর্ম্ম সেখানে সহজ, সাধনা সেখানে দৈনন্দিন জীবনের সহজ কর্ম্মে ফুটিয়া উঠে —ইহাই ঋষি-সমাজ বা সাধু-সমাজ বা গুরুগৃহের বিশেষত্ব। কিন্তু এই সহজ কর্ম্মে দিন গুজরাণ করিয়া সাধুত্ব অটল রাখা দেখিয়াছি অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যে সাধুকে বাহির দেখিয়া চিনিবার যো নাই, অন্তরের মাঝে নিশ্চয়ই তাঁহাকে বড় হইতে হয়; কেননা অপরের কাছে তাঁহার সাধুত্ব দেখাইবার মত কিছু না হইলেও নিজের কাছে তো সাধুত্বের আদর্শ সর্ব্বদাই উজ্জ্বল রাখিতে হয়। কিন্তু নিমিত্তাপেক্ষিতা মানুষের এমনি মজ্জাগত যে বাহিরে একটা কিছু অবলম্বন না পাইয়া ভিতরটাকে পতন হইতে নিবারণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। ইহাতেই দেখি, সহজ কর্ম্মের মাঝেও আড়ম্বর আনিয়া এক শ্রেণীর সাধক যেমন নিজের সাধুত্বকে জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তেমনি আবার উপলক্ষ্যটুকু দূর হইবা মাত্রই কেহ কেহ অক্লেশে নিজের অন্তরের সাধুভাবকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। বরং তখন "আমরা সহজ ভাবে চলি, অতএব সাধুত্ব আমাদের নিষ্প্রয়োজন" এই আত্মবিরোধী অভিমানে হৃদয় পূরিয়া উঠে। সহজ কর্ম্মের ফতোয়া পাইলেই যে অন্তঃসাধনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল, এমন কথা কিছুতেই হইতে পারে না। এই জন্য যে প্রকৃত সাধু হইতে ইচ্ছা করে, তাহার সর্ব্বদা এই মনোভাব পোষণ করা প্রয়োজন যে, "কাজে কর্ম্মে যাহাই হউক না কেন, আমি যেন মনে-প্রাণে সাধু হইতে পারি। গুরুগৃহের সহজ কর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছি বলিয়া আমাকে সাবধান থাকিতে হইবে যেন সংসার-সুলভ অসাধুজনোচিত চিত্তবিকৃতি আসিয়া আমাকে অভিভূত করিয়া না ফেলে।" সহজ কর্ম্মকে সাধুত্ব সাধনার উপকরণ করিতে হইলে মনকে নিরালম্ব অতএব প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন করিতে হয়, নতুবা সাধুত্ব বজায় রাখা যায় না।

অনেক সাধকের মাঝে সহজ কর্ম্মের উপলক্ষ্যে কর্ম্মবর্জ্জনের বাতিক ঢুকিয়া যায়। সহজ কর্ম্মে সাধুত্বের বিকাশ করিতে হইলে জগতের প্রতি একটা দায়িত্ব থাকে। অর্থাৎ তখন শুধু আমার মুক্তি, আমার সুখ—এই ভাব নিয়া থাকা চলে না। কিন্তু অনেকের মনে ধারণা, সাধু হওয়া অর্থে দায় মুক্ত হওয়া। এই ভাব নিয়া সংসার ছাড়িয়া আত্মমুক্তির সাধনাপেক্ষায় যদি কেহ রমতা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাকে বিশেষ কিছু বলিবার থাকে না, কিন্তু সে যদি সাধুর সমাজকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে অপরের নিরপেক্ষ হইয়া নিজের মুক্তির চেষ্টাটাও তাহার সাধুত্বের বিরোধী হইবে। সাধুর লক্ষ্য জগদ্ধিতে আত্মমুক্তি; সহজ কর্ম্মের ইহাই চরম পরিসমাপ্তি। এই লক্ষ্য অন্তরে জাগ্রৎ থাকিলে সাধু হইয়া সকল দায় এড়াইয়াছি, এই মনোভাব কিছুতেই

আসিতে পারে না। আমার যোগ্যতা কি আছে—এই দীন ভাব নিয়াও দায় এড়ানো যায় না কেননা যেখানে সমাজ, সেখানে এ যুক্তি একেবারেই অচল। সেবার অধিকার নিতান্ত অযোগ্যেরও আছে; বরং যে যত অভিমানবর্জ্জিত, তার সেবা করিবার আকুলতা ও সামর্থ্য তত বেশী হইবে। সহজ কর্ম্মে সাধুত্ব অর্জ্জনের প্রচেষ্টা একমাত্র সেবাবৃত্তির ভিতর দিয়া উন্মেষিত হইতে পারে। সুতরাং সাধু হইয়া দায় এড়াইয়াছি—এ কথা সাধুর সমাজে নিতান্তই অচল। যদি কোনও সাধকের মনে এই ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছে, নতুবা ক্লীবত্বের উপাসনাকে সাধুত্ব বলিয়া ভুল বুঝিতেছে।

এই সামাজিক দায়িত্বহীনতা হইতেই আবার এক শ্রেণীর সাধকের মনে একটা গভীর নিশ্চেষ্টতা আসিয়া পড়ে "খাই-দাই কাঁসী বাজাই"—ইহাই তাহাদের কাছে সাধুত্বের আদর্শ। যে সমস্ত সাধক রমতা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের চেষ্টা অনেক সময় আহার চিন্তার ঊর্দ্ধে উঠে না দেখিতে পাই; কিন্তু তবুও আহার-সংস্থানের চেষ্টাতেও তাহাদিগকে কতকটা সজীব রাখে। কিন্তু সাধুর সমাজে সহজে যে সাধক নিশ্চিন্ত হইয়া যায়, তাহার নির্জ্জীবতার আর তুলনা নাই। এই শ্রেণীর সাধক নিশ্চেষ্টতাকেই আত্মসমর্পণ বলিয়া ভুল করে। সমাজ আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, অথচ তাহার চিত্তে ঈর্ষ্যা, পরনিন্দা, কূটবুদ্ধি ইত্যাদি নীচবৃত্তি প্রবেশ লাভ করে নাই, এরূপ সাধক বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আত্মসমর্পণ যে নিশ্চেষ্টতা নয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। সাধুর সমাজে কর্ম্মত্যাগের অধিকার নিজে জুটাইয়া আনা যায় না; সমাজের মঞ্জুরীতে, সাধুর কৃপায় সাধকের কর্ম্ম দেহের এলাকা হইতে মনের এলাকায় চালান হইতে পারে মাত্র। কিন্তু তাহারও দায়িত্ব বড় ভীষণ। সর্ব্বদা হুঁসিয়ার না থাকিলে আত্মপ্রবঞ্চনার হাত হইতে সে অবস্থায় নিস্তার পাওয়া বড় কঠিন।

ভাবোচ্ছ্বাস-প্রণোদিত সাধুতা অনেক সময় নিছক ভাবুকতায় পরিণত হয়। বাঙ্গালী জাতি স্বভাবতঃই ভাব-প্রবণ; কর্ম্মে অনাস্থা তাহার মজ্জাগত। সাধকের মাঝে ভাবুকতার আতিশয্যে কর্ম্ম এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা সোজাসুজি আত্মপ্রবঞ্চনা করে, তাহাদের ফাঁকি অনেক সময়ে ধরা যায়, কিন্তু ভাবুকের ফাঁকি ধরা বড় কঠিন—কেননা সে নিজেই নিজের কাছে স্পষ্ট নয়। সাধনার একটা অবস্থায় এই ভাবুকতা যেন ভূতের মত সাধকের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। অলক্ষ্যে তাহা সাধককে তামসিকতার পথে টানিয়া নেয়, অথচ সাধক মনে করে, আমি বুঝি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি। সাধকদের ভাবুকতা সত্য না মিথ্যা, তাহার পরীক্ষা হয় ভাবুকতাকে আঘাত করিয়া। ভাবুকতায় আঘাত পড়িলে যে সাধকের মনোবৃত্তি উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তাহাকে বলি, এই বেলা সাবধান—তুমি সয়তানের পাল্লায় পড়িয়াছ। যে ভাবুকতার মধ্যে সত্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে, আঘাতে তাহার ভিত্তি দৃঢ় হয়। আর সব চেয়ে বড় কথা, যে ভাব কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করিতে জানে না, তাহা ভণ্ডামীরই কাছাকাছি। সাধক এই দুইটী লক্ষণ মিলাইয়া নিজের ভাবুকতাকে যাচাই করিয়া পথ চলিবে?

সাধুত্ব অর্থে সবলে আত্মপ্রসারণ। ঘোর কর্ম্ম ও পরম বিশ্রান্তি, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য যেখানে, সেখানেই যথার্থ সাধুত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি কুরুক্ষেত্রে সব্যসাচীর সারথি, অথচ স্বয়ং নির্লিপ্ত তিনিই সাধুর আদর্শ। এই সাধনার সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে পার্থের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। অর্জ্জুনের ঐকান্তিক লক্ষ্য নিষ্ঠা, সুকঠোর তপশ্চর্য্যা অথচ আত্মশ্লাঘার অভাব, আদর্শের প্রতি পরম প্রপন্ন ভাব, ইহাই সাধুত্ব সাধকের বরণীয়।

তবে সত্য কথা বলিতে গেলে এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা যাহাকে সাধু বা অসাধু সংজ্ঞায় অভিহিত করি, তাহা মনের ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন জগতের মিথ্যাত্ব তাহার নাস্তিত্বকে প্রমাণিত করে না, শুধু দৃষ্টির বিভিন্নতাই সত্যাসত্যের নিরূপক, তেমনি কোনও ব্যবহার দ্বারা প্রকৃত সাধুত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। তবে এ কথাটা সাধকের জানিয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই, কেননা সাধকের পক্ষে রূপান্তর সিদ্ধিই প্রথম কাম্য। এই জন্য অধ্যাত্মরাজ্যের গোড়ার আইন পাপ-পরিহার। ন পুণ্যং ন পাপং—এ কথা কঠোর সত্য হইলেও অপ্রবুদ্ধ সাধকের উহা আলোচ্য নহে। অসত্য বর্জ্জন করিয়া সত্যের আভাস না পাইলে উহার প্রসার বা প্রতিষ্ঠাই বা হইবে কি করিয়া? আর সত্যের প্রসার না হইলে অসত্যকে কুক্ষিগত করিবেই বা কে? এই জন্য স্বরূপাবস্থা স্বয়ং-সিদ্ধ অতএব অসাধ্য হইলেও সাধনার প্রয়োজনীয়তা অধিকারভেদে চিরকাল বর্ত্তমান থাকে।

সাধু হইলেই নিয়তি এড়ানো যায় না, কেননা উহা এড়াইবার প্রয়োজনও থাকে না। এই জন্য বড় বড় সাধু মহাপুরুষদের জীবনেও আমরা এমন ঘটনা সংস্থানের সমাবেশ দেখি, যাহা সাধুত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার একান্ত বিপরীত। সাধারণ মানুষ কর্ম্ম দেখিয়া বাহির দেখিয়া সাধুর বিচার করে। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ যাঁহার বিশিষ্ট লক্ষণ, অন্তর্লক্ষ্যই যাঁহার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার পরিচয় কি এই উপায়ে কখনও মিলিতে পারে? প্রারব্ধ বা নিয়তি যাহাই হউক না কেন, তাহার রূপান্তর ঘটাইবার প্রচেষ্টাকে সাধুত্ব বলে না। সাধুর কাহারও সহিত বিরোধ নাই—নিয়তির সঙ্গেও না। অথচ সাধারণ মানুষ অবোধের মত অদৃষ্টের সঙ্গেই লড়াই করিয়া মরিতেছে। এই জন্যই সাধু অসাধুকে বুঝিতে পারিলেও অসাধু কখনো সাধুকে বুঝিতে পারে না। তাই কথা আছে, সাধু না হইলে সাধু চেনা যায় না।



শ্রুতস্মৃতি

—*—

হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রৎ; এর মত মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক্ বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝিতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয় না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

*

নিজে কতটুকু আনন্দের অধিকারী হয়েছে, চিত্তে কতটুকু শান্তি এসেছে, তা বিচার করে পরের উন্নতি করতে যাওয়া উচিত।

*

নিজকে যে পরের জন্য বিলিয়ে দিতে পারে, সেই ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের মত ত্যাগী কে?

*

ব্রহ্মবিদ্ গুরু সাক্ষাৎ বেদান্তস্বরূপ; গুরু বাক্যকেই বেদান্ত বাক্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। শঙ্কর জগদ্‌গুরু, কেননা তিনি বেদান্তের ঘনীভূত বিগ্রহ। "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি।"

*

সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হলে, তবে বেদান্ত শোনবার অধিকার জন্মে। বই পড়ে কেউ বেদান্ত শিখতে পারে না। প্রথমতঃ গুরু মুখে শ্রবণ, তার পর মনন ও নিদিধ্যাসন করতে হয়। নিজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করব, কিন্তু মুক্ত হব এও বাসনা। চিত্তকে একেবারে নিস্তরঙ্গ করতে হবে। একমাত্র আত্মাই নিত্য আর সমস্তই অনিত্য, এই ভাবে বিচার করে বিবেক জাগ্রৎ করতে হবে।

*

জনক রাজা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য অষ্টাবক্রের কাছে গেলে, অষ্টাবক্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি করেছ যে জ্ঞানের অধিকারী হবে?" জনক বলিলেন, "প্রথম আমি কর্ম্ম হতে বিরত হয়েছি, তার পর বাক্য হতে বিরত হয়েছি, অবশেষে চিন্তা হতে বিরত হয়ে অবস্থান করছি।" এই অবস্থায় জনকের মন বাসনা-শূন্য হয়ে নিরালম্ব ছিল। সুতরাং জনকই প্রকৃত বেদান্তাধিকারী।

*

ভগবানের দেহ তত্ত্বময় এবং জ্ঞানময়। ভগবানের দেহ আর দেহীতে উপাদানগত কোনও পার্থক্য থাকতে পারে না, সেখানে দেহ দেহী এক। ভগবানের দেহে স্থূলধাতুর কোনও উপাদান আদৌ থাকে না—তাঁর স্বরূপ ও দেহ একই সচ্চিদানন্দময় অবস্থা। যেমন জলে এক খণ্ড বরফের সৃষ্টি হল; বরফে আর জলে উপাদানগত কোনও পার্থক্যই নাই—আবার ইচ্ছামাত্র বরফ সেই জলেই পরিণত হতে পারে। ভগবানের দেহেরও তেমনি স্বতন্ত্র কোনও সত্তা নাই।

তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়; তবে আবশ্যক মত তত্ত্বময়, জ্ঞানময়, কিম্বা ভাবময় দেহ ধারণ করে থাকেন।

*

জীবাত্মার আকার একটা জ্যোতিঃকণার মত। পরমাত্মাকে চন্দ্র গোলক কল্পনা করলে জীবাত্মা যেন তারই একটী ধূলিকণা। পরমাত্মা এক ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। চক্ষু টেনে ধরলে যে একটু জ্যোতিঃকণার আভাস পাওয়া যায়, তাই জীবাত্মার আভাস।

*

শান্ত ভাব আত্মজ্ঞানীর বা যোগীর ভাব। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য দ্বৈত ভাব। দ্বৈত ভাব হলেও একে অপরের সহিত একপ্রাণ, একের সুখে অপরের সুখ, একের দুঃখে অপরের দুঃখ, এমনতর মেশামেশি ভাব। দ্বৈতভাবের মাঝে বাৎসল্য ভাব সবার বড়। তার মাঝে কোনও কামনা নাই। ছেলের কাছ থেকে কিছুই চায় না অথচ প্রাণপণে ছেলের সেবা করছে, ছেলের সুখ-দুঃখে একেবারে আত্মহারা—এই হল বাৎসল্য। বাৎসল্যভাবই সাধনার চরম অবস্থা। মধুরভাব সিদ্ধাবস্থা, তাই হল অদ্বৈত ভাব, তাতে আপন সত্তা একেবারে লোপ হয়ে যায়। বাৎসল্যভাবে সাধনার চরম হলেই মধুরভাব বা সিদ্ধাবস্থা আপনা আসবে। মধুরভাবে পূর্ব্বের চার ভাবেরই সমাবেশ আছে। মধুর ভাব বেদান্তের অপরোক্ষ ভাব অর্থাৎ আমিই সেই—এই জ্ঞানে মধুর ভাব পর্য্যবসিত।

*

পঞ্চ ভাব হতেও গোপী ভাব শ্রেষ্ঠ। তা বেদান্তের "সাক্ষী চেতা নির্গুণশ্চ" এই ভাব। গোপীর নিজের কোনও কামনাই নাই, সে চায় কৃষ্ণকে এনে রাধার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে সেই যুগলমিলন দেখবে। তার নিজের সুখবাঞ্ছা নাই, রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দেই তার আনন্দ তাই গোপীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের অধিকারী; যুগলমিলনের সমষ্টিগত আনন্দই সাক্ষিভাবে গোপী অনুভব করে থাকে, অথচ সে নির্লিপ্ত। এই তো বেদান্তের চরম সিদ্ধি। জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলানো কিম্বা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ—এই সবই রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন। এই মিলন দেখাই গোপী ভাব বা সাক্ষী ভাব। বেদান্তের দ্বারা বৈষ্ণবের ভাব পথ ঠিক করে নিলেই সব চেয়ে মধুর হয়, তখন তার কোনও ভুল থাকতে পারে না।

*

কামই নির্গুণে গেলে প্রেম হয়। কামটা খারাপ জিনিষ নয়, ও-ই প্রেমের উপাদান। যৌবনেই কামের পূর্ণত্ব; এই জন্য যুবকদেরই উৎসাহ, উদ্যম এবং আনন্দের ভাব এই সময়েই বেশী দেখা যায়। বৃদ্ধকালে কাম শিথিল হয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌বৃত্তিগুলিরও ক্রিয়া শিথিল হয়ে যায়। কামতত্ত্ব অতি নিগূঢ়। সাংসারিক লোক এ তত্ত্ব জানলে উপকার হত। কিন্তু জানবার তাদের অবসর কোথায়? সংযম ছাড়া তত্ত্ব জানা যায় না। সংসারী সাধারণতঃ পশুর মত রমণীতে আসক্ত, তত্ত্বানুসন্ধান করবে আর কখন?

*

দেহতত্ত্ব জানা থাকলে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের তত্ত্ব সহজে

বোধগম্য হয়। কেননা স্থূলেই তো সূক্ষ্ম ও কারণের চরম বিকাশ হয়েছে। তাই স্থূল বিকাশ ধরে সূক্ষ্মে ও কারণে গিয়ে আবার সেই কারণ ও সূক্ষ্মে কি করে স্থূলে প্রকাশ হয়েছে তা দর্শন করলে তবে জ্ঞানের পূর্ণত্ব হয়।

*

বৈষ্ণবের ভাব সাধন বড়ই মধুর, কারণ এগুলি জগতের স্বাভাবিক উপাদান। নিত্য যা চোখের সামনে ঘটছে, তা থেকেই ভাব-গুলো নেওয়া হয়েছে। তাই ভাবের সাধনে বিরুদ্ধাচরণ আদৌ নাই—স্বভাবের অনুকূলেই ভাব সাধনা। সন্ন্যাসাদি কঠোর সাধনাতেও স্বভাববিরুদ্ধ নিয়ম সংযম করতে হয়, কিন্তু ভাবের সাধন স্বভাবানুযায়ী। জগতে যত রকম ভাবের বিকাশ আছে, সব নিয়েই বৈষ্ণব এক একটা সাধন পথ তৈরী করেছেন। বিশেষতঃ ভাবগুলি ভগবানের নিত্য-জগতের জিনিষ, তাই এত মধুর। উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা সব তো এই জগতেরই স্বাভাবিক অবস্থা। এই স্বাভাবিক ভাবগুলি ভগবানে আরোপ করতে পারলে অর্থাৎ ভগবানের জন্য এমনি সহজভাবে সাধনা করতে পারলেই জীবন সার্থক।

*

বেদান্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে আদৌ আসে নি কিম্বা খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও ধরেনি। জীবাত্মা কূটস্থ চৈতন্য বা আত্মার অংশ এ-ও স্বীকার করেন। অর্থাৎ বেদান্ত ব্যষ্টি ভাব আদৌ ধরেনি, একেবারে মূল ও সমষ্টি ভাব ধরেছে। প্রত্যেকেই সগুণ ব্রহ্ম, গুণ পরিত্যাগ করলেই স্বরূপত্ব বা আত্মত্ব প্রকাশিত হবে। এই সর্ব্বোচ্চ ভাবই বেদান্তের শিক্ষা।

*

স্বপ্ন দেখাও কতকটা সৃষ্টির মত। জ্ঞানীর হয় এই স্বপ্নাবস্থা আদৌ হয় না, কিম্বা স্বপ্ন-সৃষ্টির সঙ্গে নিজের জ্ঞান বজায় রেখে তা থেকে তিনি আনন্দ গ্রহণ করেন। তিনি যেন নিজেই বাঘ সাজলেন, নিজকেই ভয় দেখালেন আবার নিজেই দর্শক হলেন।

*

কূটস্থ-চৈতন্য বা আত্মা এক ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থলেই সমভাবে বিরাজিত। তথাপি স্থূল পরমাণুতে যে অংশ পড়েছে, তাই স্থূল দ্বারা অধ্যাসিত হয়ে জীব-চৈতন্যের সমষ্টি ভাব হয়ে দাঁড়ায়। এর ব্যষ্টি ভাবই জীবাত্মা।

*

পরমাত্মা আর আত্মা একই, তবে জীবাত্মার সঙ্গে তুলনা বা বিচার করতে গিয়ে পরমাত্মা বলা হয়। অর্থাৎ আত্মাতে জীব যেমন একটা বিশেষণ, পরমাত্মাও তেমনি একটা বিশেষণ। যোগশাস্ত্রে পরমাত্মার উল্লেখ দেখা যায়, নইলে সাংখ্য মতে আত্মাই বলা হয়েছে।

*

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ বেদান্তের সমষ্টির জ্ঞানে এক রকম; আবার সাংখ্য মতে অর্থাৎ ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ পৃথক। মূলে সমুদ্ভূত সমষ্টি কারণ হতেই উৎপন্ন হয়েছে, তবে স্তরভেদে কারণও ক্রমশঃ বিকার প্রাপ্ত হয়েছে সূক্ষ্ম ও স্থূলেরও ক্রমশঃ বিকার হয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থেরও বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও কারণ রয়েছে। সমষ্টি কারণকে বৈকারিক কারণ বলা যায়; ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ তৈজস; স্থূলের কারণ ভৌতিক। বেদান্ত

মতে সমষ্টি ব্রহ্মের কারণাবস্থা—মহাকারণ সগুণ ভাব ; সমষ্টি ব্রহ্মের সূক্ষ্মাবস্থা—মহত্তত্ত্ব, অহং-তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র তত্ত্ব ; সমষ্টি ব্রহ্মের স্থূলাবস্থা—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বের মিশ্রিতাবস্থা অর্থাৎ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান। বেদান্ত সৃষ্টির এই উপাদান পর্য্যন্তই বিচার করেছে ; অবশিষ্টগুলি স্বতঃসিদ্ধ, তাই তার আর বিচার করে নি। সাংখ্য কিন্তু এই স্থান হতেই আরম্ভ করেছে। কিন্তু সাংখ্যের বিচার্য্য ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের কারণেরই বিকারযুক্ত কারণাবস্থা। সূক্ষ্ম ও স্থূলেও তাই।

*

শ্রীগৌরাঙ্গ নিষ্কলঙ্ক আদর্শ। গৌরাঙ্গ অবতারে ভগবান্ জগৎকে ত্যাগ বৈরাগ্য ও প্রেমের আদর্শ দিয়ে গিয়েছেন, একাধারে জ্ঞান ও প্রেমের খেলা দেখিয়েছেন। যে দিক দিয়েই হউক, কেউ তাঁর কোনও দোষ বের করতে পারবে না। তিনি বাংলার একমাত্র অবতার—বাঙ্গালী জাতির গৌরব-স্বরূপ।

*

জ্ঞানবাদীর দুটী বিশেষ কর্ত্তব্য—(১) বিচার দ্বারা তত্ত্ব বোঝা, (২) সেই সব অবস্থা উপলব্ধির জন্য ব্যাকুলতা।

*

উপাসনার উদ্দেশ্যই স্বারূপ্য লাভ করা। যে যার উপাসনা করবে, ক্রমশঃ তার মন তদাকারকারিত হয়ে তৎস্বারূপ্য লাভ করবে। নচেৎ ভগবান্ স্তুতি মিনতি বা খোসামোদে ভোলেন না, তাঁর কাছে "শালা"ও যা, "বাবা"ও তা। তবে তাঁর গুণাবলীর আলোচনাতে জীবেরই মঙ্গল হয় অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবৎ প্রসঙ্গ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।

*

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি - ব্রহ্মসদ্ভাব, ধ্যান, বাহ্য পূজা—এইগুলি সাধনার স্তর। মনন হতে মন্ত্রের উদ্ভব। সুতরাং মন্ত্রও কর্ম্মের অন্তর্গত। গুরু মুখে জ্ঞান কথা শ্রবণ মাত্র সে ভাব যে গ্রহণ করতে পারে, সেই উত্তম অধিকারী। ব্রহ্মের সৎ ভাবে থাকা অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাতে সর্ব্বদা অবস্থানই তার পথ।

*

মৃত্যু হইলেও জীবাত্মার পরিবর্ত্তন হয় না। মরণের পূর্ব্বে তার যে গুণকর্ম্মের আবরণ ছিল, তাই নিয়েই সে বেরিয়ে যায়, শুধু অন্নময়-কোষটা ছাড়ে মাত্র। ইচ্ছা হলে আবার এই অন্নময় দেহের আকারে আকারিত হয়ে সে দেখা দিতে পারে। তখন যে দেহ ক্ষিতি তত্ত্বের উপাদানে গঠিত, তাতে রক্ত-মাংস আদি সাতটী ধাতুর অস্তিত্ব থাকে না। দেখতে তা স্থূলদেহের মত হলেও কার্য্যতঃ তা নয়।

*

মৃত্যুর পর ভোগান্তে জীবের যখন আবার জন্মের সময় হয়, তখন প্রথমতঃ ধ্রুবলোকে যায়। সেখান হতে শিশির বিন্দুর সঙ্গে মিশে পৃথিবীতে পড়ে এবং কোনও গাছ বা ওষধির সঙ্গে মিশে যায়। দেশ, কাল, পাত্রানুসারে এমনি সুশৃঙ্খলে সে মাটীতে পড়ে যে যার ঔরসে সে জন্মগ্রহণ করবে, সেই পুরুষই তাকে উদরস্থ করতে পারে। পুরুষের খাদ্যের সঙ্গে উদরস্থ হয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমে যে রস, রক্ত, মজ্জা ও অবশেষে শুক্রের মাঝে জীবাণু-

রূপে অবস্থান করে। তার পর যথা সময়ে মাতৃ আধারে বীজরূপে শোণিতের সঙ্গে মিশে যায়। সেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে এবং জীবাত্মার গুণ ও কর্ম্ম অনুযায়ী দেহ তৈরী হতে থাকে। এই দেহ প্রস্তুত করাও জীবের স্বেচ্ছাধীন। মানুষের নিজ কর্ম্ম ও গুণ অনুযায়ী দেশ-কাল-পাত্রানুসারে দেহ প্রস্তুত হয়ে থাকে। যার যে কর্ম্মের জন্য দেহ প্রস্তুত হয়েছে, সে নিশ্চয়ই সে কর্ম্ম সাধন করবে। রোগ-শোকের নিয়তি থাকলে তাও ভোগ করতে হবে, কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নাই। মানুষ বোঝে না বলেই প্রারব্ধ কর্ম্ম এড়াবার দরুণ মানসিক ও দেবতার পূজা করে থাকে। কিন্তু তাদের এতে আরও অনিষ্টই হয়। কারণ এতে প্রারব্ধ তো খণ্ডন হয়ই নাই, বরং নূতন কর্ম্ম সঞ্চয়ে আরও জালে জড়িয়ে পড়তে হয়।

*

বেদান্তেরমতে সাধনপথ নাই। শুধু শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যা হয়, তা ছাড়া অন্য কোনও সাধনপথ নাই। এই জন্য শঙ্করের পরবর্ত্তী কালে অতি অল্প লোকেরই প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান হত, বরং অধিকাংশস্থলে বিপরীত ফলই ফলত। সাধারণ লোকেও সোহং বলতো আর নিজকে শিব মনে করে অবাধে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিত। লোকে হয়ত ভগবানের ভয়েও পাপ করতে সাহস পায় না। কিন্তু তখনকার বেদান্তবাদীরা বেশীর ভাগই যখন শিব হয়ে গেল, তখন আর ভয় করবে কাকে? কাজেই পাপের মাত্রা ষোলআনার জায়গায় আঠার আনা হয়ে গেল। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হল। তিনি বেদান্তের সাধনপথ দেখিয়ে দিলেন। সাধনা দ্বারা যাতে জীব অনায়াসে বেদান্তজ্ঞানে পৌছাতে পারে, তিনি সেই পথ ধরিয়ে দিলেন, অথচ নিম্ন অধিকারীকেও বঞ্চিত করলেন না। শঙ্করের মত আর গৌরাঙ্গের পথ, এই দুয়ে সামঞ্জস্য করে নিতে পারলেই বেদান্তজ্ঞান সহজলভ্য হয়ে যায়। অবস্থাভেদে গৌরাঙ্গদেবকে অদ্বৈত-বাদের বিরুদ্ধেও বলতে হয়েছে, কারণ পুরাতন সংস্কার দূর না করে দিলে নূতন কিছুর পত্তন করা কঠিন হয়ে পড়ে। গানের একটা সুরে সংস্কার জন্মে গেলে তার পর সেই গানেরই আর একটা ভাল সুর শুনলেও তা আয়ত্ত হতে চায় না, আগের সুরটাই ফুটে ওঠে। এই জন্য প্রত্যেক অবতারকে নিজ মত প্রচার করবার জন্য পূর্ব্ব মতের নিন্দা করতে হয়েছে। বুদ্ধদেবও বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ বেদবিহিত কাম্যকর্ম্মে মানুষের সংস্কার তখন এতই প্রবল হয়েছিল যে নিষ্কাম কর্ম্ম করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। তাই বুদ্ধদেবকে একেবারে কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আবার শঙ্করাচার্য্যকেও বৌদ্ধ শূন্যবাদ খণ্ডন করে তাকে নির্ব্বাসিত করতে হয়েছিল। তাও লোকের সংস্কার দূর করবার জন্য, নইলে শূন্যবাদ অধ্যাত্মজগতের বিরোধী নয়, জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। শঙ্করাচার্য্য যদিও খাঁটী অদ্বৈতজ্ঞান প্রচার করেছিলেন, তবুও নিম্নাধিকারীকে তিনি অবহেলা করেন নি। তাদের দরুণ নানা দেবদেবীর স্তব ও বাহ্য পূজার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তেমনি গৌরাঙ্গদেবও অদ্বৈত ও দ্বৈত মতের বহু আদর্শই জীবকে দিয়ে গিয়েছেন। যখনই যে অবতার এসেছেন,

তিনিই নূতন বিরাট পন্থার মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথগুলিও অবগাহিত করে রেখে গিয়েছেন।

*

যার প্রত্যক্ষ কিছুই দর্শন হয় নি, তবে কি না চারদিক বেঁধে দৃঢ় হয়ে উঠ্‌ছে, সেই শ্রেষ্ঠ। তার যে উন্নতি হচ্ছে, এ কথা সে নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পারে। আবার যে ভক্তিপথে সামান্য একটু আনন্দ পেয়ে তাতেই মত্ত হয়েছে, তার পক্ষে উন্নতি হওয়া কঠিন, কারণ ভাল মত পথই তাকে দেখাও, সে সব অগ্রাহ্য করবে, যে একটু আনন্দ সে উপলব্ধি করেছে, তা কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। কর্ম্মের উপর এই সমস্ত লোকের খুব অশ্রদ্ধা আসে। একটু আনন্দ পেয়ে তাই ধরে থাক্‌লে ক্রমে প্রতিষ্ঠার ভাব এসে পড়ে, লোকে আমাকে খুব ধার্ম্মিক কি ভাল মনে করুক, এই দিকে তখন দৃষ্টি যায় এবং তাতে অহং-এর আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়। যিনি নিজকে ভক্ত মনে করেন, আর যিনি জ্ঞান পথে সামান্য উন্নতি লাভ করেই নিজকে জ্ঞানী মনে করেন—এই দুজনেই আত্ম প্রতারক। কারণ ভক্ত আদৌ মনে করতে পারে না যে তার ভক্তি এসেছে, যতই ভক্তির অধিকারী হবে, ততই সে আরও কাঙ্গাল হয়ে যাবে, ততই নিজকে দীন-হীন মনে করবে। এমন লোক কাগজে-কলমে ভক্তি প্রকাশ করে না বা দলাদলিতেও মেশে না—সে তখন চুপ হয়ে যায়। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিতে সমান দৃষ্টি রেখে ক্রমশ উন্নত হওয়াই খাঁটী। নচেৎ গোঁড়ামীতে কিছু হবার নয়।

*

যোগীরও নাদ শ্রবণ বা জ্যোতিঃদর্শনের পর ওই পথেই মন পড়ে যায়, উচ্চতর সাধনার প্রবৃত্তি তখন আর আসে না। কারণ বর্ত্তমানে সে যে আনন্দ পেয়েছে, তা ছাড়তে তার ইচ্ছা হয় না, কাজেই উন্নতির রাস্তা অন্য দিকে খোলা থাকলেও সে দিকে সে যেতে চায় না। ক্রমে অহংকার এসে পড়ে, আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। শেষে সামান্য অনুভূতিই বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজের অহঙ্কার খুব বেড়ে যায়—এমনি করে সেও আত্মপ্রতারণা সুরু করে। কাজেই সাধন পথে অতি সতর্কতার সহিত চল্‌তে হয়। (ক্রমশঃ)



তিনের মায়া

—:{*}:—

তিনি যে কিসে থাকেন, বুঝি না। এটাতে আছেন, ওটাতে নাই—এ কথা বললে তাঁকে পক্ষপাতী বলা হয়। না বলেও তো পারি না—কেননা বুঝি না। অথবা তিনি কি, তাই চিনি না—নিজের আনন্দটুকুকেই তিনি বলে মনে করি। সে মনে করায় ভুলই বা কোথায়?—তিনি তো সর্ব্বময়!

মোট কথা, বিচারে পাওয়া যায় না, কেননা তিনি শুধু 'ব্যষ্টির যোগফল নন, পরন্তু সমষ্টির রসস্বরূপ।' ব্যষ্টিতে চাইলে ভুল হয় না বটে, কিন্তু ব্যষ্টি ভুলিয়ে দিতে পারে। সম্ভাব্য তাঁর শক্তি, সঞ্চিত ও সংহত রয়েছে বলে জড়জ্ঞানে অবহেলা করা যায় না।

দেখছি, রজঃ বা তমে থাকলে ইন্দ্রিয় বানচাল হয়ে পড়ে, মনে বিকার আসে, বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে থাকে; অথচ সাত্ত্বিকতায় তার বিপরীত। ত্রিগুণ ছাড়া তো জগৎ নাই; এখন কোথায় বলব তাঁর আবাসস্থল? কাকে বলব তিনি?—

কাউকেই তিনি বলবার প্রয়োজন নাই। তিনি এ সবেতেই আছেন, কিন্তু কোনটাতেই তাঁর সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। তিনি এ সবের চেয়ে বড়—প্রভু আমার গুণাতীত, নির্গুণ হয়েও গুণাধার—এই বলেই সকলে তাঁকে বলে। এর পর আর ধারণা হয় না। বুকে টেনে নিলেন যখন, তখন আর সন্দেহ কেন?

রজস্তমঃ যখন স্বপ্রধান, তখনই তারা বন্ধন। কিন্তু তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে যখন তারা আসে, তখন আর বাঁধতে পারে না। কেউ যে কেবাল বাঁধে, তা নয়; এক লক্ষ্য ধরে অটল থাকলে যা বাঁধে, মুক্তির আনন্দও তার মাঝে থেকেই অনুভব করা যায়। সত্ত্বেও রজস্তমঃ আছে—নিলীন হয়ে, বশীভূত হয়ে। সত্ত্ব সংশোধনের চরম ফল, তাই সত্ত্বশুদ্ধ হলে খাটী জিনিষ চেনা যায়। আর রজস্তমঃ মোহ বা মলিনতাযুক্ত থাকায় তাতে খাঁটীত্বের আস্বাদ মিলে না।

একটী একটী করে অতিক্রম করতে হবে। প্রথমে তমঃ। এর মত-মতে চললে শরীরটী এক আবর্জ্জনার আস্তানা হয়ে ওঠে। তাই তামসিকতায় অজীর্ণ, প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা—এগুলো জন্মায়। ফলে মানুষকে দেহ-সর্ব্বস্ব, ইহ-সর্ব্বস্ব হয়ে পড়তে হয়। তমঃ যেমন প্রভুকে ভুলিয়ে দিতে পারে, এমন আর কেউ নয়। কেননা সে বোঝে না, সে ছেলেমানুষ। ভাল ছেলে নয়—দুষ্টু ছেলে। কাণমলে একে ঠাণ্ডা রাখতে হয়। কাজেই সংযম মানে দেহের পীড়ন নয়—প্রবৃত্তির শাসন। শাসনের বর্ত্তমান শাস্তি হলেও ভবিষ্যৎ—শান্তি।

তার পর হচ্ছে রজঃ। এর দেওয়া ফল হচ্ছে কাম, ক্রোধ, উত্তেজনা, আসক্তি, অহঙ্কার ইত্যাদি। এ-ও প্রভুর অবাধ্য। এ প্রভুর সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে চায়। রেষারেষি এর স্বভাব। এ বলে আমিই প্রভু—আমাকেই মান। এর বাক্যের আড়ম্বর বেশী। কিছু যুক্তিতর্কও জানে। তর্কে জিতে গেলেই মনে করে, আমি জিতে গেলাম। কিন্তু শুধু তর্কে

মিলেলেই তো নিরপেক্ষ বিচারফল বা যথার্থ মীমাংসা লাভ হয় না। তাই রজোগুণের কাছে গায়ের জোরে হারলেও আমরা আপন-খুসীতে তার বশ হতে পারি না—তর্কে হেরেও মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে থাকে। মনে হয়, এর চেয়ে উদার কেউ আছেন, যিনি সন্তুষ্ট করতে পারেন—উভয় পক্ষের উপরই যাঁর সমান প্রভাব।

ইনিই হচ্ছেন সত্ত্ব। ইনি প্রভুর শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ। কাজেই এঁর প্রভাবকে যখন আমরা আশ্রয় করি, তখন ইনি নিঃশ্রেয়সপক্ষ অবলম্বনের অভিজ্ঞতা আমাদের মাঝে বিলিয়ে দেন। ইনি ন্যায়নিষ্ঠ, সদাশুচি জ্ঞানবান—তাই এঁর সহবাসে জ্ঞান জন্মে। প্রভুর যথার্থ অস্তিত্ব এঁর সাহায্যেই উপলব্ধ হয়।

সাধনপথে তিন অনুচর—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। রজস্তমকে ছাড়িয়ে সত্ত্বের সঙ্গে যে আলাপচারী করতে পারে, সেই বৈকুণ্ঠধামে সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করে। রজস্তমের অল্প বয়স—এখনো মতি স্থির হয় নি, তাই পথিককে নিয়ে তারা খেলাধূলাতে পাশায় দাবায় মত্ত রাখতে চায়। যে বিশ্বাসী, সে এদের কথায় ভুলবে না। যে প্রভুকে চায়, সে প্রভুকেই পাবে—খেলাধূলা আমোদ প্রমোদ তার ভালই লাগবে না।

এখন মতিস্থির কর—প্রভুকে চাও, না ভবঘুরে হতে চাও। তাঁর কারো উপর পক্ষপাত নাই—যে যা চায়, তাকে তাই দেন। তিনি সত্ত্বেরও নন, রজেরও নন, তমেরও নন। তবে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত বলে স্বভাবতঃই তাতে তাঁর আবেশ।

সব দিকেই পথ খোলা—কাউকে তিনি ঠেকিয়ে রাখেন না। বাস্তবিক আমরা এত প্রচণ্ডভাবে স্বাধীন যে তা আমাদের সব সময় বুঝে ওঠাই অসম্ভব। ভাল-মন্দ যা চাও, তাই পাবে—তবে জীর্ণ করা চাই। যখন জীর্ণ করতে পারলে না, তখনই তো ঠেকে গেলে। ঠেকাই শিক্ষা। এক জীবনের ঠেকায় আর এক জীবনের শিক্ষা হয়। সবি ঠেকে শিখব—একটী জীবনের পক্ষে এ বহু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই আমরা আপ্তবাক্য আশ্রয় করি। যাঁরা তাঁকে পেয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে পাবার পথ জেনে নেওয়া—এ হচ্ছে স্বল্প ব্যয়ে ভূরি লাভ। সহজে কে না চায়? কিন্তু আমাদের মনবুদ্ধি এমনি মজার, রজস্তমের অভিভবে যে অসৎএর বশ্যতা, তাকেই সহজ জেনে আঁকড়ে থাকি। পরে আঘাতে যখন অভিমানের গোমর ভেঙ্গে যায়, তখন দেখি, লুটিয়ে পড়াতেই যথার্থ স্বাধীনতা—তাঁকে পাবার এই-ই সহজ পন্থা। সত্ত্বশুদ্ধ চিত্তের ধর্ম্মই আত্মনিবেদন—ফলে যেখানে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের বিরতি, সেখানেই অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্ফুরণ।

আনন্দ ছাড়া কে কি চায়? আনন্দ বা আপন খুসী এই জগতের সারসর্ব্বস্ব। আমরাও চলছি খুসীর প্রেরণাতে। এই খুসীকে ঠিক পথে চালিয়ে নেওয়া—এই হচ্ছে সবের সেরা কৌশলের কাজ। খুসী যত দিন রজ আর তমোতে জড়িয়ে থাকে, তত দিন খুসী কিছুতেই মিটে না—এটা থেকে সেটায় ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে মানুষ কেবল চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। তার পর তাঁর কৃপায় সত্ত্বে যখন বিশ্রাম লাভ হয়, তোমার আমার ক্ষুদ্র খুসী তখন তাঁর খুসীতে পরিণত ও পরিপুষ্ট হতে থাকে। তখনি আমরা স্বপ্রতিষ্ঠ ও যথার্থ স্বাধীন হই। সত্ত্বের দান এই গুণগুলি তখন জীবনে ফুটে উঠে—অল্পে টলি না, অল্পকে বলি না; ক্ষতিতে ক্ষোভ, লাভে ব্যস্ততা থাকে না; আলো ছাড়া আঁধার কারু মাঝে দেখি না; জগন্ময় সর্ব্বত্র এক ভাব, এক জ্যোতিঃ, এক অমৃতকে অনুভব করি।

উড়ো চিঠি

—:{*}:—

একটা সুখবর নিয়ে এসেছি তোমার কাছে—আমি ভাল আছি। আমার কাছে এ খবরটার কোনও মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কাছে যে এর মূল্য কতখানি, তা কি আমি জানি না ঠাকুর? আমি তোমাকে চাই বা না চাই, সে বিচার করবার অবসর আমার হয় না; কিন্তু তুমি যে আমাকে চাও, দিনের মাঝে নানা ছলে এই কথাটা যখন মনে পড়ে, তখন ভিতরের বাঁধনগুলো যেন সব এলিয়ে পড়ে। তাই যে দিন আমাকে আমার কাছে সুন্দর মনে হয়, সে দিন তোমার চোখে যে কি অপরূপ হাসি ফুটে উঠবে, তাই ভেবে আমার মন মাতাল হয়ে ওঠে—মনের মাঝে এই কথাটাই কেবল গুণ্ গুণ্ করে ফিরে—আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু!—এই জন্যই তো বলছিলাম, আমি ভাল আছি—এ যে তোমার কাছে একটা মস্ত সুখবর!

কাঠিয়াবাবার তিনটী উপদেশ সে দিন আমায় শুনিয়েছিলে—(১) চার প্রহরমেঁ জাগনা, (২) ভিতরসে কাম করনা, (৩) সদাসে গুরু রহনা। কথা তিনটা ভারী মনে ধরেছে। বিশেষতঃ ওই দ্বিতীয় উপদেশটা। আজ সারাটা দিন আমার কাছে মধুময় হয়েছিল—ওই কথাটী স্মরণে রেখে। শুনে তুমি খুসী হবে নিশ্চয়ই!

বাস্তবিক আমাদের তো সব মাটী হয়ে যায় শুধু ছটফটানীতে। তোমার কাছে কথাগুলো শুনেছিলাম বটে না গোড়ার কথাটা এতদিনে তলিয়ে বুঝলাম। সারাটা দিন চরকীর পাকের মত পাক খেয়ে ফিরেছি—কিন্তু কোথায় শ্রান্তি, কোথায় অবসাদ!—বেশ বুঝেছি, এই তো আমাদের সাধনা—এই তো তপস্যা; প্রাণায়াম নয়, পূজা অর্চ্চনা—নয়, খেচরী শাম্ভবী নয়—তবুও এই তো আমাদের সাধনা। দেহের শক্তি আর কতটুকু? দেহ তো শক্তির বাহনমাত্র। ওর জোর আসে মন থেকে। মন তাকে যা করতে হুকুম করবে, ও তাই করবে, করতে বাধ্য। আবার মনও শক্তি পাবে সত্য ভাব থেকে। এ সব কথা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না, কেননা বিপরীত ভাবনায় সংস্কার পাকা হয়ে আছে কি না। চলতে ফিরতে প্রথমেই দেহটা হাতে আসে, কাজেই তার দিকে তাকিয়ে কাজের যাচাই করি। ভাবি, ওই তো দেহ—তাতে এইটুকুই হবে কি বড় জোর ওইটুকু হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেহের সঙ্গে এতটুকু হওয়া-না-হওয়ার সম্পর্ক কি? পেশী শ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রান্তির নিদান কি? স্থূল কিছু কি? তা তো দেখছি না। অদৃশ্য রাজ্য থেকে উৎসাহ আসে, আবার অবসাদও আসে। তাহলে আর অদৃষ্টকে বিশ্বাস করব না কেন? ওপার থেকে শক্তির স্রোত এসে যে নীচটাকে সজীব করে তুলবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? উপরের শাসনে নীচটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এইটুকু বুঝতে পারা, আর বুঝে কাজে ফলিয়ে তোলা, এই আধ্যাত্মিক সাধনার সার কথা। তোমার দেহ বলছে, না খেলে পারব না, না ঘুমোলে চলবে না, কিন্তু দেহকে খেতে

না দিয়ে ঘুমোতে না দিয়েও তো মানুষ বেঁচে থাকার সাধনা করেছে। তাতেই মনে হয়, উপরের শাসনেই নীচটা চলছে। নইলে এ কথনো সম্ভব হত না।

খুব বক্তৃতা করছি, না? তুমি হেসো না। ও সব কথা একা আমার নয়, ও তোমারই কথা। তুমি প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছ বলেই না ওগুলো ফুটল্যো, আর তাইতেই না এতখানি আনন্দ পেলাম।

আর একটা মনে হয়, তুমি যে আমাদের দিয়ে সব করাচ্ছ, এটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসাধনা নয় কি? তুমি বলেছিলে বিশ্বাস করতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি।' আবার তুমিই বলেছিলে, 'সেই তিনিই এই হয়েছেন।' সারাদিনের কাজের মাঝে এই দুটো কথার সামঞ্জস্য বিচিত্র হয়ে আমার মাঝে ফুটে ওঠে, ভাবি, আমরাও ব্রহ্মের মতই সর্ব্বভূতে, সর্ব্বভাবে, সর্ব্বকর্ম্মে ছড়িয়ে পড়ছি—তোমার সেবাকে উপলক্ষ্য করে। তোমার সেবায় তো অভিমান রাখবার জো রাখ নি। আমিই ব্রাহ্মণ, আমিই শূদ্র, আমিই কেরাণী, চাষী, মজুর, মিস্ত্রী, ধোপা, নাপিত—সবই সাজছি। কর্ম্মের ফেরে দিনের মাঝে কতবার রূপ বদলাতে হচ্ছে—কোনটা যে আমি, তা ঠিক করে বলবার জো নাই। অথচ আমি যে তোমার, এ কথাটী প্রাণের মূলে গাঁথা রয়েছে। তাই তোমার কাছে নিজকে ছেড়ে দিয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনুভব করছি—"সেই আমি—বহু হয়েছি!" এর চেয়ে সহজ আর প্রত্যক্ষ বেদান্তের শিক্ষা কোথায় মিলত?

দেশ-কাল মানতে হয় প্রথম সাধনায়। আমি মাথার ওপর—এমন একটা ভাবনায় ফল আছে। কাজ করছি আর নিজকে রাখতে চাইছি—"শিরসি সহস্রারে"—দেখি, দেহটা চলছে যেন কলের মত। বাস্তবিক রাজার মত কাজ করবার অধিকার আমাদের দিয়ে রেখেছ, কিন্তু আমরা তা ব্যবহারে লাগাই না। তোমার অন্তরের ধন হয়েও আমরা ভয়ের দাস, কামনার দাস—ধূলোয় পড়ে ছট্‌ফট্ করি শুধু!

সবতাতেই তাড়াহুড়ো করি—আর তাতেই তো মরণ ঘটে। কিন্তু বাস্তবিক স্থির হয়ে যদি ভাবতে যাই, তাহলে দেখি, এই যে শত-সহস্র বাসনার বিক্ষোভ, এর মাঝে কোনটা আমার আয়ত্তে? ইচ্ছা করলেই তো আমি অপরকে চেতাতে পারি না; সুতরাং সে ক্ষেত্রে ফলকামনায় বিন্দুমাত্র লাভ আছে কি? আমার ওপর আমার ইচ্ছা কতকটা খাটে বটে; কিন্তু তাও থাকে নিরোধের বেলায়, সৃষ্টির বেলায় তো নয়। অথচ আমার সৃষ্টিটাই উদ্দাম বেগে চলুক, এইটাই সর্ব্বদা চাইছি। তার চেয়ে বলা ভাল, প্রলয়টা প্রচণ্ড বেগে হোক্—আমার প্রলয়—আমার আমিত্বের প্রলয়—তাহলেই বিনাশের নির্ম্মল নীল ভূমিকায় সৃজনের আলোকে তুমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

ভাবি, তুমি আমার কি? আমি বলতে তো শুধু এই খাঁচাটা; এ ছাড়া আর যা কিছু এর সাথে জড়িয়ে আছে, সবই তো তুমি—শুধু একলা তুমি নও—আমার তুমি! তোমার কথা ভাবতে ভাবতে তাই তুমিই হয়ে যাই! মনে হয়, এ তো আমি কাজ করছি না—করছ তুমি! এই যে শুচি-স্নিগ্ধ মন, এই যে ললিত তনু-ভঙ্গী, এই যে আনন্দের

ঘনীভূত বিগ্রহ—এই তো তুমি—এই তো তুমি!—আমি কোথায়? তোমাতে সে মিশে রয়েছে—শুষে নিয়েছ তাকে!

তাড়াহুড়ো করি কাজ এগুবে না ভয়ে তো! কিন্তু ওতেই কাজ আরও পিছিয়ে যায়। মানে সব জিনিষ বাড়বার একটা কায়দা আছে, সময় আছে। গাছের গোড়ায় খুব করে জল ঢাললেই গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয় না—বরং ওতেই গোড়া পচে যায়। দেখেছি, তাড়াহুড়ো করিনি যে কাজটাতে, সেইটাই সুডোল, সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে তারই শেষে দেখতে পেয়েছি—তোমার হাসিমাখা সপ্রেম দৃষ্টিখানি! অবাক্ হয়ে তাই ভাবি—সুস্থ থাকো, আনন্দে থাকা এত সহজ—অথচ এই সহজটাকেই আমরা ভুলে থাকি কি করে!

প্রেম যেখানে থাকে, সেইখানেই সেবায় আগ্রহ জন্মায়। তোমায় ভালবাসি, এ কথাটা যদি সত্য হত, তাহলে তোমার কাজে আমাদের কাড়াকাড়ি পড়ে যেত—কাজ পড়ে থাকত না। কিন্তু আমরা সবাই গা বাঁচিয়ে চলতে চাই, অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সেখানেই আরামভঙ্গের আশঙ্কা হয়, সেখানেই চ্যাঁচামিচি সুরু করে দিই। যখন এই কথাটা মনে পড়ে, কি যে লজ্জা হয়, তার আর কি বলব।

তোমার পায়ে আমার এই মিনতি শুধু—বিরামহীন-কাজের সঙ্গে আমার চির-বিরামকে তুমি মিলিয়ে দাও। কাজের তাগিদ যেন আমায় পেয়ে না বসে। শ্বাস স্বাভাবিকই বইছে—সেটা তাড়াতাড়ি, বইছে কি আস্তে আস্তে বইছে—তার হিসাব করে তো কোনও ফল নাই। তবে দেখি, যে প্রাণবন্ত বলে পরিচয় দিতে জোরে জোরে শ্বাস ফেলে, সে হাঁপিয়ে পড়ে, মরণ তার ঘনিয়ে আসে! তাই বলি স্বচ্ছন্দ কর্ম্ম—এই আমার স্বভাব হোক। তাতে আমারও স্বস্তি, তোমারও আনন্দ!

বাস্তবিক বাসনা ত্যাগই তো আনন্দ—সেই তো তোমার রূপ। অটুট, সত্য সঙ্কল্প তুমি—চঞ্চল পঙ্কিল বাসনা আমি! ছিঃ ছিঃ—আকাশ পাতাল ফারাক হলে তোমার সঙ্গে মিলবো কি করে? যা হবার তা হবে জেনে সর্ব্বনাশের মাঝেও ঝাঁপিয়ে পড়বার মত বুকের পাটা করা এই তো আনন্দ। তার সঙ্কেত কি? তুমিই বলেছিলে উচ্ছ্বাস নয়, উত্তেজনা নয়—বৃহৎ সঙ্কল্প ও নিষ্ফল প্রয়াস নয়—ধীর স্থির প্রশান্তভাবে সুনিশ্চিত পদক্ষেপে লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাওয়া—এই তো মনুষ্যত্ব। তোমার কর্ম্মের পরিচয় তোমার জগৎ! মেলা কাজ বলে একটা দিনও এক মিনিট বড় হতে দেখলাম না। সব শান্ত—অথচ সব সুনিশ্চিত। তাই তো দেখি ষড়-ঋতুর আবর্ত্তনে ধরিত্রীর অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য আর ধরে না! এই সহজ সুরে জীবন বাঁধা কি চলে না?

স্বপ্নের আবরণে তোমায় পাই—কিন্তু আশা তাতে মিটছে না।—আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠ!—স্থূলে নয়, সে তো পাচ্ছিই; আমার সূক্ষ্মতম আনন্দানুভূতিতে অহরহ যে তোমায় আমি চাই!



আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

— ঋগ্বেদসংহিতা—৩।২।৮

যাঁকে ভালবাসি, তাঁর জন্য সব করতে পারি, কিন্তু নিজের অস্তিত্বটুকু মুছেও মুছ্‌তে পারি না। তাই একে ধরে কখনও আমরা নিচের দিকে—মান-অভিমানের দিকে ঝুঁকে পড়ি, আবার কখনও এই আমিকে উপরের দিকে তুলে নিয়ে চির তরে তাঁর করে রাখ্‌তে চাই। এই যে "আমি" বোধ, এই তো জ্ঞানের বীজ; তাকে যে অপর আর একজনের করে দিতে চাই, তাই প্রেম বা ভালবাসার বীজ। প্রেমের ন্যায় জ্ঞানও মানুষের স্বাভাবিক। এর উভয়েই স্বতঃস্ফূর্ত্ত। আপাত-দৃষ্টিতে একটী থেকে আর একটী পৃথক বোধ হলেও যে রাস্তা দিয়েই যাও না কেন, একটীর সঙ্গে আর একটী এক জায়গায় গিয়ে মিলবেই।

*

যতক্ষণ আমাকে খাটো করে ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়-সুখের কামনায় কিছু চাইছি, ততক্ষণই পাচ্ছি না বলে ছুটাছুটী করি। কিন্তু আপন বিরাট সত্তানুভূতিতে তন্ময় হলে কোনও কিছু থেকে নিজকে বঞ্চিত বলে মনে হয় না। মূল উপাদান ও তার বিচিত্র বিকাশ ভঙ্গী দেখে এক অপূর্ব্ব আনন্দ সকল কামনার পূরণ করে।

*

কোনও গুণের আদর্শ নিয়ে নয়, কেবল-মাত্র আত্মস্বরূপ—এই আদর্শে সকলকে আপন বলে জান। কারও উপর বিশিষ্ট ভাব রেখো না—সকলেই আমার এই দেহটার মতই আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা একীভূত। এই দেহটার চেয়েও সবাই আপন। কেননা, দেহের কথা হয়ত কখন কখনও ভুলে যেতে পারি, কিন্তু আমার অস্তিত্ব সব সময়ে থাকেই। এই অস্তিত্বের সংস্কার সকলকে নিয়ে হোক্। চেতন অচেতন সকলকে ব্যাপ্ত করে "আমি" কেন্দ্রগত হয়ে আছি।

*

প্রথমতঃ শুধু নামরূপ বর্জ্জনেই নয়—নাম-রূপ দিয়ে প্রতিপন্ন বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত, বিশিষ্ট ভাবকেও ভুলতে হবে। তাদের মূল সত্তার সঙ্গে আপন সত্তার একত্ব জেনে তার প্রকাশের বিচিত্র লীলা দেখে আনন্দ কর। তাহলেই জগৎও আবার ফুটে উঠ্‌বে। এমনি করে নাম রূপ বাদ দিয়ে একবার জগৎকে লীন করে আবার তার লীলা দেখ্‌তে শেখাই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্কেত।

*

স্বার্থ খুঁজ্‌তে জানলে, ঠিক ঠিক স্ব-বস্তুকে চিনে নিয়ে তার অর্থে জীবন খাটালে, তা সকলের অর্থেই পর্য্যবসিত হয়। স্বার্থ বল্‌তে ক্ষুদ্র স্বার্থকেই আমরা আগে চিনে নিয়ে তাই আগ্‌লে বসি, আর ও দিকে বৃহৎ স্বার্থ সেই অবসরে হারিয়ে যাই। ভগবান্ দেখে হাসেন মাত্র। শতকরা নিরনব্বুই জন আমরা এই করি, আর অপরকে স্বার্থপর বলে গাল

দেই। আমাকে ক্ষুদ্র করে ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মজে যাই আর ও দিকে বিরাট বিষয় বা স্বীয় সম্পত্তি ব্রহ্মবস্তু হারিয়ে বসি। বোকা ছেলে বাজে জিনিস দিয়ে পেট ভরে মিষ্টান্নের বেলায় উঠে যায়।

*

প্রত্যহ কিছু দান করতে হবে, এই ছিল ঋষিদের নিয়ম, তাই তাঁরা পঞ্চ মহাযাগ করে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মানুভূতিতে সকল ঋণের পরিশোধ হয় এবং সকল দানের পর্য্যবসান ঘটে। তাই সন্ন্যাসী বা পরমহংসের কোনও বিশিষ্ট যাগ করতে হয় না। স্থূলে যেমন এমনি, সূক্ষ্মেও আবার তেমনি তিনি যেখানে যান, বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত সেখানে পরিপুষ্ট হয়। তিনি যেন প্রদীপের মত, যেমন ঘরেই তাঁকে নিয়ে যাও, যে আবেষ্টনেই তাঁকে আবদ্ধ কর না কেন, দেহে মনে প্রাণে বহুজন হিতায় আত্মোৎসর্গ করে সেই স্থানকে তিনি উজ্জ্বল করে তোলেন। এই সন্ন্যাস জীবনই চতুরাশ্রমের আদর্শ; তাই শীর্ষপ্রদেশে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছে। জীবনে চাই এই ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর আদর্শ।

*

ভাল-মন্দ উভয় বীজই মানুষের মাঝে রয়েছে। মূলগত বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে এ জীবনে নষ্ট হয় না। কিন্তু তার গুণের পরিবর্ত্তন করা খুবই চলে। আমের আঁটি থেকে কাঁঠাল গাছ উদ্ভব হয় না সত্য, কিন্তু চেষ্টার বিশেষত্বে ভাল আম উৎপাদন করা অসম্ভব নয়। যিনি যেমন প্রকৃতির মানুষ, তাঁর সেই ধাত সংশোধন করতে হবে। একেবারে পরিবর্ত্তন হবেও না, তার তেমন বিশেষ প্রয়োজনও নাই। কেবলমাত্র সংশোধিত হয়ে সেই ধাতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে। এ না হলে প্রত্যেক মহাপুরুষের মাঝে বিশেষত্ব থাকতো না।

*

ভাব বা সংস্কারশুদ্ধির পরীক্ষা হয় স্বপ্নের মাঝে। জাগ্রতের সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে হয়ত আমার স্বরূপকে স্মরণ রাখতে চেষ্টা করছি, কিন্তু যত দূর সফল হয়েছি, সংস্কার যতটুকু বিশুদ্ধ হচ্ছে, নিজের কাছে তা এক মাত্র স্বপ্ন দিয়ে পরীক্ষা হয়। সেখানেও যাতে দ্রষ্টৃত্ব বজায় থাকে, তার জন্য সর্ব্বদা শুদ্ধ সত্য চিন্তা ব্যবহার দ্বারা আহার-বিহারে ও বাক্যের মাঝে আপন ভাব বজায় রাখতে হয়।

*

কথা আসে আবেগ হতে। আবেগ আসে চিত্তের অনিরুদ্ধ অবস্থা থেকে। কিন্তু যদি মূলে এমন কোনও মধুময় ভাব ভিতরে থাকে যে, যার তুলনায় সব তুচ্ছ মনে হয়, তবে বাইরে কথা না বলেও ভিতরে দেবতার সঙ্গে মধুর আলাপে মহানন্দে তৃপ্ত থাকা যায়। ছত্রের প্রত্যেকটী অক্ষর যদি সমান উঁচু হয়ে, একে-বেঁকে না যায়, তাহলে যেমন সমগ্র পংক্তিটী সোজা হয়, তেমনি প্রত্যেকটী ভাব যদি সুসম্বদ্ধ ধারা ধরে অন্তর দেবতার সংস্পর্শে শান্ত ও সুন্দর হয়, তবে বাইরের প্রত্যেকটী কথাবার্ত্তা ও চাল-চলনের ভিতর দিয়াও মানুষের একটী মহান্ স্নিগ্ধ ভাব ফুটে উঠে।

*

আমাকে বাদ দিয়ে জগতে আমার কিছু নাই। যা কিছু দেখছি, বা আমার সংস্পর্শে আসছে, আমি তার মাঝে না ঢুকলে তাদের

মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারি না। 'আমি' দ্বারা ব্যাপ্ত করে বা আমার বোধ তার মাঝে অনুস্যূত করে তবে অপর বস্তুর রস গ্রহণ করি। নতুবা সে আমার বোধগম্য হয় না। আবার আমি না থাকলে বুঝবে কে? দ্রষ্টা না হলে দৃশ্যকে দেখবেই বা কে? কাজেই জলে-স্থলে, দৃশ্যে-অদৃশ্যে সর্ব্বত্র আমি ব্যাপ্ত হয়ে আছি; রূপে রূপে যে বৈচিত্র্য, তার সমন্বয় শুধু আমার ব্যাপ্তিতে। এই আমাকে খণ্ডিত করে অভাব সৃষ্টি করি বলেই দুঃখ আসে, আর এই অজ্ঞাননাশই মায়ার তিরোধান বা দুঃখের নিবৃত্তি।

*

আমাকে সকলে ভয় করে চলুক, এ আদর্শ ধরো না। কেননা বনের বাঘকেও তো সকলে ভয় করে চলে। বরং সকলে ভালবাসুক এই ভাব অনেকটা ভাল। কেননা ভালবাসা পেতে হলে, ভালবাসা দিতেও হয়। তার জন্য নিজকে অপরের মাঝে বিস্তার করে দিয়ে অপরের করে তুলতে হয়। তার উপায় অন্তরে ও বাহিরে সকল অবস্থায় পরের প্রয়োজনে বা সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখা। ক্রমশঃ আত্মত্যাগে আত্মার বিস্তৃতি ঘটে। আমি ভালবেসে সেবা করে যাই, কিন্তু কারও সেব্য বা ভালবাসার পাত্র হলাম কি না, সে বিষয়ে মন একেবারে ভ্রূক্ষেপশূন্য। যিনি এইরূপে আদর্শ সেবক হয়ে সানন্দে আপনাকে বিলিয়ে দেন, সকলে তাঁকে না ভালবেসে থাকতে পারে না। আমার দিক দিয়ে যদি আমি সকলের সংযোগ-সূত্রটীকে আয়ত্ত করতে পারি, তাহলে সকলে আমার না হয়ে যায় না।

দানপ্রাপ্তি

—:*:—

বিহার (পাটনা)

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—

আর এন্ গুপ্ত নরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি বিনয়কুমার পাঁড়ে প্রফুল্লচন্দ্র দে সতীশচন্দ্র বসু মিহিরলাল সিনা যোগেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি হৃষিকেশ ব্যানার্জ্জি হেড্ মাষ্টার এস্ সি গুহ জে কে দত্ত উকিল জে এন্ মুখার্জ্জি অবনীভূষণ মুখার্জ্জি উকিল গজেন্দ্রপ্রসাদ দাস উকিল ইন্দুভূষণ দত্ত এম্ পি সেন পি এন্ মজুমদার কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কিশোরীমোহন ঘোষ রামচন্দ্র রায় গৌরীকান্ত বিশ্বাস পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য সত্যেন্দ্রলাল বসু জি পি হাজারী প্রফেসার বি এন্ কলেজ রঘুবন সহাই মোক্তার রায় বাহাদুর বিষ্ণুস্বরূপ শ্যামবিহারী শর্ম্মা মোক্তার মনোহরলাল ব্যারিষ্টার বিহারীকিশোর শরণ উকিল নিরছু নারায়ণ সিংহ

উকিল রামানন্দ সিনা উকিল কেশো দয়াল প্রফেচার পাটনা কলেজ বলদেব সহাই উকিল গোপী বল্লভ সহাই ডাক্তার রামাশ্রয় সহাই উকিল লছমী নারায়ণ সিংহ উকিল হরেশ্বর প্রসাদ সিনা উকিল রামজী দাস গুপ্ত প্রফেচার ইঞ্জিঃ কলেজ শিবনন্দন রায় উকিল বি এন সিংহ ভুবনেশ্বরী প্রসাদ বর্ম্মা এন কে সিনা যোগেশ্বর নাথ কে এম নারায়ণ এস পি বর্ম্মা ব্যারিষ্টার গোপাল প্রসাদ ব্যারিষ্টার রায় ত্রিভুন সহাই উকিল কে পি এম চৌধুরী রাম নন্দন সহাই রাম প্রসাদ চৌধুরী রঙ্গন ব্রাদার্স ৯নং পোষ্টেল মেছ প্রভাত কুটির মেচ জনৈক হিতৈষী সংগৃহীত ৮১৲

হাজারিবাগ

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র উকিল ৫৲, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি ২৲, শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার উকিল ৩৲, শ্রীযুক্ত রামাচরণ মুখার্জ্জি ২৲, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় উকিল ২৲ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত ২৲, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ সরকার ডাক্তার ২৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কর ২৲, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি ২৲, শ্রীযুক্ত কল্যাণ সিংহ ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় উকিল ২৲, হেল্থ অফিসার ২৲।

একটাকা করিয়া--

শ্রীযুক্ত—শৈলেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত উকিল নিবারণচন্দ্র বানার্জ্জি উকিল গোপীমোহন মল্লিক উকিল কে এন্ সরকার উকিল যতীন্দ্রনাথ ঘোষ উকিল বীরেন্দ্রপ্রসাদ সরকার উকিল ভূদেবচন্দ্র সরকার উকিল নরেশচন্দ্র সেন কবিরাজ এ সি বানার্জ্জি ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র নাথ মৈত্র প্রফেসর শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রফেসর চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রফেসর শিশিরকুমার বসু প্রফেসার কে এস্ ঘোষ প্রফেসার হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি প্রফেসার নরোত্তম ঘোষ প্রফেসার ক্ষেত্রনাথ লাহড়ী প্রফেসার সি বানার্জ্জী প্রফেসার ভট্টাচার্য্য ডাক্তার এ টি এস্ গয়ানাথ সেনগুপ্ত বাঘাম্বর ঘোষাল সতীতোষ বানার্জ্জি এস্ পি সেন নলিনীকান্ত দত্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এ এস্ গুপ্ত জানকীনাথ গুপ্ত মন্মথনাথ গুপ্ত সব্ রেজিষ্টার রমণীমোহন সেন জি এল্ বানার্জ্জি পুলীনবিহারী ঘোষ ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত এস্ কে বসু নরেন্দ্রকান্ত মতিলাল ডাক্তার বৈজুলাল বসু পি পি সিনা প্রফেসার রঘুনন্দন প্রসাদ মুন্সেফ রঘুনন্দন সহাই উকিল ছত্রকধারীপ্রসাদ উকিল নওলকিশোর প্রসাদ উকিল যদুনাথ সহাই উকিল জহরলাল রামানন্দ সিংহ মুলজি কাঞ্চিচরণ জানকীরাম কৃষ্ণকিঙ্কর নিয়োগী মিঃ এন্ বক্সী আই সি এস্ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লেডি ডাঃ বিন্দুবাসিনী দত্ত সরোজিনী দাসী লেডি ডাঃ লেডি ডাঃ আই এস্ পেরিস জিলা স্কুল বোর্ডিং ৪৷৷০ কমলবাজ কলেজ হোষ্টেল ১২৷৷০ সংগৃহীত ৩৩৷৷০।

পুরুলিয়া (মানভুম)

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সিভিল সার্জ্জন ৫৲, শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষাল মুন্সেফ ২।০, শ্রীকালীপদ গাঙ্গুলী কণ্টাক্টর ২৲, শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মুখার্জ্জি ২৲ ডাক্তার ২৲, এম্. এন্. মুখার্জ্জি লালা দামোদরপ্রসাদ জজ ২৲, ষ্টেশন মাষ্টার ২৲, শ্রীমণীন্দ্রলাল বানার্জ্জি উকিল ১।০।

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—

সতীশ চন্দ্র দে উকিল যাদবচন্দ্রসিংহ মহাত্র উকিল বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি উকিল যতীন্দ্র মোহন

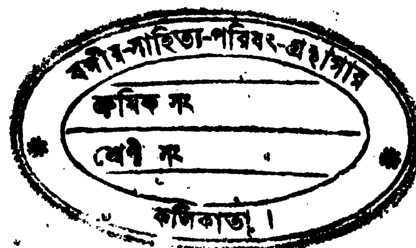
দত্ত উকিল সুরেশচন্দ্র সরকার উকিল ব্রজেন্দ্র নাথ মজুমদার উকিল মানগোবিন্দ সরকার রাধানাথ সড়ঙ্গী উকিল সর্ব্বানন্দ সরকার উকিল গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকিল শশধর গাঙ্গুলি উকিল জগদীশচন্দ্র মুখার্জ্জি উকিল নীলকণ্ঠ চাটার্জ্জি উকিল কালীপদ মুখার্জ্জি মোক্তার যতীন্দ্রনাথ রায় মোক্তার প্রমথনাথ দাস মোক্তার কেশবলাল ঘোষ মোক্তার রাধাগোবিন্দ মিত্র ডাক্তার নন্দকিশোর চৌধুরী মুন্সেফ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সেরেস্তাদার জজ কোর্ট হরিপদ ঘোষ জ্ঞানানন্দ চক্রবর্ত্তি শ্রীকণ্ঠ সেন আশুতোষ সরকার নগেন্দ্র নাথ ঘোষ রামপদ ভট্টাচার্য্য অনন্তকুমার সেন গুপ্ত হরি-মোহন দাস ঈশান চন্দ্র পাল পূর্ণচন্দ্র মিত্র যোগেন্দ্র নাথ সরকার এস্ আই এস্ চক্রবর্ত্তী এম সিংহ আই পি প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস উকিল

এম কে রায় হেমচন্দ্র গুহ জে সি দা চন্দ্র শেখর পট্টনায়ক সত্যনারায়ণ সিংহ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভুবনেশ্বরী শরণ বর্ম্মা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জাহ্নবী প্রসাদ সিংহ এস ডিঃ এওচন্দ্র চাটার্জ্জি কণ্টাক্টার জঙ্গবাহাদুর কণ্টাক্টর নেছরি শরণ দয়া কণ্টাক্টর অর্জ্জুন লাল কণ্ট্রাক্টর ভগবান কারা কণ্ট্রাক্টর মনজি রাঘব কণ্ট্রাক্টর ঘনশ্যাম দাস কণ্ট্রাক্টর বালাদীন, কণ্ট্রাক্টর ভেটারিনারী হাসপাতাল জিলা স্কুল ৫০ সংগৃহীত ৩৬১০। (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

গত ১৫ই চৈত্র মঙ্গলবার শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ সশিষ্যে কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে হরিদ্বার যাত্রা করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার ৪ঠা মাঘ আসাম-বঙ্গীয় কোকিলামুখ সারস্বতমঠের শাখা আশ্রম বগুরীগুরীতে স্থানীয় ভক্তসম্মিলনীর সভা হইয়াছিল। সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে সোণারি চা বাগানের হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন সভাপতি হইয়াছিলেন। গ্রামস্থ ভক্তগণ এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত প্রায় সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।



ওঁ তৎ সৎ

অর্চনা

১৯শ বর্ষ
সমষ্টি সং ২০৪

চৈত্র

দ্বিতীয় খণ্ড
ষষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দ-লহরী

—*—

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

—*—

কিরীটং বৈরিঞ্চং পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ
কঠোরে কোটীরে স্খলসি জহি জম্ভারিমুকুটং।
প্রণম্রেষ্বেতেষু প্রসভমুপজাতস্য ভবনং
ভবস্যাভ্যুত্থানে তব পরিজনোক্তি র্বিজয়তে॥

"বিরিঞ্চিকীরিট ওই সুকঠোর রয়েছে সমুখে,
হরি-ইন্দ্র-মুকুটও যে—দেখো যেন চরণ না ঠেকে —
প্রণত আছেন এঁরা"—শম্ভু যবে প্রবেশে ভবন
সাবধানি—বলিহারি!—ফুকারে মা তব পরিজন!

চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভুবনং
স্থিতস্তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রৈঃ পশুপতিঃ।
পুনস্ত্বন্নির্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনা
স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্ ॥

চতুঃষষ্টি তন্ত্রদৃষ্টি মেলি শিব জেনেছে ভুবন,
ব্যাকুল মহেশ এবে সফলিতে সে সব সাধন ;—
তোর সাধ, সন্তানে মা যাহা চায় পায় এক ঠাঁই—
স্বতন্ত্র এ কুলতন্ত্র মহাদেব প্রচারিল তাই!

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ
স্মরো হংসঃ শক্রস্তদনু চ পরামারহরয়ঃ।
অমী হৃল্লেখাভিস্তিসৃভিরবসানেষু ঘটিতা
ভজন্তে তে বর্ণাস্তব জননি নামাবয়বতাম্ ॥

শিব, শক্তি, কাম, হরি,—ধরি পুনঃ শক্তি, কাম, হরি—
রবি, শশী, কাম, হংস বাসবেরে নিই এক করি ;—
এ তিন কূটের শেষে জুড়ি দিই যদি মা হ্রীংকার—
উঠে তায় মা গো তোর সুললিত নামের ঝঙ্কার!

স্মরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদৌ তব মনো
নিধায়ৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ।
জপন্তি ত্বাং চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষরলয়াঃ
শিবাগ্নৌ জুহ্বন্তঃ সুরভিঘৃতধারাহুতিশতৈঃ ॥

কাম, যোনি, লক্ষ্মী—তিনে জুড়ি কেহ হয়ে একমন
জপে তোরে নিরবধি—মহাভোগী রসিক সে জন!
সুরভি ঘৃতের ধারে কুলানলে শত হোম করে—
কামকলাগুণে গাঁথা অক্ষরের কুহরে বিহরে!

তবাধারে মূলে সহসময়য়া লাস্যপরয়া
শিবাত্মানং বন্দে নবরসমহাতাণ্ডবনটম্।
উভাভ্যামেতাভ্যামুভয়বিধিমুদ্দিশ্য দয়য়া
সনাথাভ্যাং জজ্ঞে জনকজননীমজ্জগদিদম্ ॥

লাস্যপরা বাগীশ্বরী মূলাধারে রয়েছে প্রকট,
তাঁরি সাথে আছে শিব, নবরস-তাণ্ডবের নট!
প্রেমরসে মগ্ন দোঁহে করুণায় সৃজিল জগৎ—
জনক-জননীরূপে তুমি তারা—লহ দণ্ডবৎ!

তব স্বাধিষ্ঠানে হুতবহমধিষ্ঠায় নিয়তং
তমীড়ে সংবর্ত্তং জননি জননীং তাঞ্চ সময়াম্,
যদালোকে লোকান্ দহতি মহতি ক্রোধ-
কলিলে
দয়ার্দ্রা দৃষ্টিস্তে শিশিরমুপচারং রচয়সি ॥

স্বাধিষ্ঠান-হুতাশনে আছে মা গো যাঁর অধিষ্ঠান,
সেই রুদ্রদেবে আর জননীরে করি মা প্রণাম!
মহারোষে দীপ্ত তাঁর দৃষ্টি যবে দহে চরাচরে—
করুণায় স্নিগ্ধ দুটী আঁখি তোর সে তাপ সংহরে।

তড়িত্বন্তং শক্ত্যা তিমিরপরিপন্থিস্ফুরণয়া
স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষম্।
তব শ্যামং মেঘং কমপি মণিপূরৈকশরণং
নিষেবে বর্ষন্তং হরমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনম্ ॥

নিবিড় শ্যামল মেঘে মণিপুর রয়েছে মা ছেয়ে,
রত্নসাজে ইন্দ্রধনু—বুকে তার, অপরূপা মেয়ে;
তড়িতের লেখা যেন, তনু তার ঘুচায় তিমির—
নমি তারে, আবরে যে বিশ্বদাহী মহেশমিহির!

—✻—

জন্মান্তর

—:•:—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—:•:—

হে নরনারীরূপী আত্মমূর্ত্তি!

ভারতবর্ষে এক ধনী বণিক তার স্বনগরবাসী সকলকে একটা বড় ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল। বড় বড় ভোজে সাধারণতঃ বাই-নাচের ব্যবস্থা করা হয়। আজ কাল এ প্রথা উঠে যাচ্ছে বটে, কিন্তু রাম যখনকার কথা বলছেন, তখন তার খুব চল ছিল।

একটী মেয়ে নাচতে আর গাইতে সুরু করল। সে যে গানটা গাইল, সেটা অত্যন্ত কুৎসিৎ। কেউ সে গান শুনে খুসী হত না — কিন্তু তবুও তখনকার মত সবার কাণে সে গানটা যেন মধু ঢেলে দিলে। তার কারণ কি? তোমরা বোধ হয় জান, ওদেশে শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় এ সব অসভ্য আমোদের একান্ত বিরোধী; কিন্তু তবুও ওই গানটার মাঝে এমন কি যাদু ছিল যে সবাই শুনে একেবারে মোহিত হয়ে গেল। এর পর মাসের পর মাস ধরে শিক্ষিত, সভ্যলোকদের দেখা গিয়েছে রাস্তায় চলতে চলতে তারা গুণ্ গুণ্ করে ওই গানটা গাইছে। যারা একবার সে গান শুনেছে, তারাই আর তা ভুলতে পারে নি, গানখানা যেন তাদের প্রাণে একেবারে গেঁথে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন এ, এই গানটার মাঝে রস ছিল কোথায়? যারা গানখানি শুনেছিল, তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, ওটা তাদের এত ভাল লাগল কেন? সবাই বলবে, গানখানি ভারি সুন্দর, ভারী মিষ্টি, মনটাকে যেন কোথায় নিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবিক তো তা নয়। মেয়েটী গানখানি গাইবার আগে তারা ওর পদগুলি অশ্লীল বলেই জানত, কিন্তু এখন সেই গানই তাদের ভাল লাগছে। এটা একটা ভুল। আসল মিষ্টত্ব ছিল গানের ধরণে, সুরে, মেয়েটীর হাব-ভাবে, রূপে। আসলে মেয়েটীতে সৌন্দর্য্য ছিল, সেই সৌন্দর্য্য গানে উপচরিত হয়েছে মাত্র।

জগতে এই ব্যাপারই ঘটে থাকে। লোক শিক্ষা দিতে এক জন এলেন,—ভারী মিষ্টি তাঁর মুখখানি —চোখ দুটী যেন স্বপ্নময়! তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, কথা বলবার সময় একবার এ দিকে ঢুলে পড়েন, একবার ও দিকে। যাই বলেন, তাই সুন্দর, তাই মনোহর। একেবারে মধুবৃষ্টি হয় যেন। এইখানে জগতে ভুল করে। সত্যকে কেউ বাজিয়ে দেখতে চায় না। গানটার কথা কেউ ভাবে না। কথা বলবার ভঙ্গী, বোঝাবার কায়দা, বাইরের সুডোল সৌষ্ঠব—এতেই লোকের কাছে বক্তার বক্তৃতাকে মনোরম করে তোলে।

সে দিন রামেরই এক জন অনুগত ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু এক জন সাধুর কথা বলেছিলেন —স্বামী বিবেকানন্দের কথা। রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর নাক চোখের গড়ন ভারী সুন্দর, না? বলি বক্তৃতা শুনতে

গিয়েছিলে, না নাক চোখের গড়ন দেখতে গিয়েছিলে?

এই হচ্ছে জগতের ধারা। অনেক বক্তার মাঝে আসল মাধুর্য্য থাকে গলার স্বরে বা বলবার ভঙ্গীতে, কিন্তু সে মাধুর্য্যকেই বক্তৃতাতে আরোপ করা হয়। একটা জিনিষের নিঠ ওজন কি, তাই দেখ না। বক্তাকে দেখ, তার রূপের দিকে তত নজর দিও না। এই কথাগুলো কর্কশ ও শ্রুতিকটু মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু জেনো, রাম কাউকে রেয়াৎ করে চলেন না। রাম শ্রদ্ধা করেন তোমার আত্মস্বরূপকে, সত্যস্বরূপকে। সত্যই তোমার স্বরূপ; আর সেই সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে রাম তোমায় শ্রদ্ধা করেন। বলবার ভঙ্গীটা তোমাদের পছন্দ না হতে পারে, রামের বোঝাবার কায়দাটা তোমাদের রুচিসঙ্গত না ঠেকতে পারে, কিন্তু রাম তোমাদের বলছেন, তাঁর আত্মস্বরূপকে বলছেন, যদি সত্যকার সুখ শান্তি চাও, তাহলে রামের কথা শুনতেই হবে, এই সব বক্তৃতায় উপস্থিত হতেই হবে। এতে আনন্দ পাবে। কথাগুলো বেআক্রতে পরখ কর। যা শোন, তা ভাব, তাতে তন্ময় হয়ে যাও। বাড়ী গিয়ে আবার সেগুলো স্মরণ করে কার্য্যে পরিণত করতে চেষ্টা কর।

রাম বেদান্তের ধর্ম্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এত সব প্রশ্ন এসে জড়ো হয়েছে। এই সব প্রশ্ন পাঠান হয়েছে রামের কাছে জবাব মিলবে বলে। যদি কোনও প্রশ্ন না-ও আসত, তবু রাম একটা বিষয়ের পর একটা বিষয় ধরে এ সব কথা বুঝিয়ে যেতেন। সময় মতে সব কথারই জবাব মিলবে; কিন্তু কেউ কেউ চায়, তার সওয়ালের জবাবটা আগে হোক। আজকার রাতে যে সব প্রশ্নের জবাব হতে পারে, তা বলতে পারি না। এক এক রাতে এক একটা প্রশ্নের উত্তর হবে; এক একটা প্রসঙ্গ এক এক রাতের খোরাক হবে। এই প্রশ্নটাই আগে হয়েছিল, তাই এটার আলোচনাই আগে সুরু করলাম।

আগে বাইবেল, কোরাণ, বেদ ও গীতার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। এই সব বই মানুষে অকপটে বিশ্বাস করে, কারণ তাদের মনোমত লোকের লেখা এগুলি কি না। 'খৃষ্ট ভারী ভাল মানুষ' ছিলেন, কত লোক তাঁর শরণ নিয়েছে—কাজেই তাঁর মুখ দিয়ে কত শাস্ত্র কথা বের করা হল;—এখন সেগুলো আমাদের মানতেই হবে। কৃষ্ণও ভারী সৎলোক, গীতা তাঁর মুখের বাণী, কাজেই আমাদের অবিকল তা মেনে নিতে হবে। বুদ্ধও ভাল মানুষ, অমুক বই তাঁর লেখা, অন্ততঃ তাঁর রচনা বলে প্রসিদ্ধ—অতএব অকুণ্ঠিত চিত্তে আমাদের তা বিশ্বাস করতে হবে—আর ভাবনা-চিন্তার কোনও প্রয়োজন নাই। আর ধ্যান-ধারণা করতে হবে না—সত্য লাভ করেছি বলে নিশ্চিন্ত হতে হবে যেহেতু অমুক বলেছেন। বাঈজীর গান শুনে লোকের যেমন ভুল হয়েছিল বলেছিলাম, এটাও ঠিক সেই ধরণের ভুল নয় কি? ঠিক একই ভুল! উপদেশ এক, চরিত্র ও জীবন আর। অনেক সময় এমন হয়, মানুষটী সে যুগের সেরা মানুষ, কিন্তু তাঁর শিক্ষা অসম্পূর্ণ। এই ভুল ধারণা হতে জগতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়। ধর্ম্ম নিয়ে যত ঝগড়া, মারামারি সবার মূল হচ্ছে এই কথা।

ওলিভর গোল্ডস্মিথের কথা বোধ হয়

তোমরা জান ; ডাক্তার জনসন বলবেন, লোক-টার লেখায় অমৃত ক্ষরে। নিজে এক জন এম্ ডি। গোল্ডস্মিথ দিব্যি খেতো, কথা বলতো, কিন্তু কি করে খেতো আর কি করে কথা বলতো তা বোঝাতে গিয়ে বলত, নীচের চোয়াল আমি কখনো নাড়ি না—আমার ওপরের চোয়ালটাই নড়ে, নীচেরটা ঠিকই থাকে। এই নিয়ে জনসনের সঙ্গে তার মহা ঝগড়া। ভুলটাও সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে-ছিল। সবাই জানে, আমরা যখন খাই বা কথা বলি, তখন নীচের চোয়ালটাই নড়ে, ওপরেরটা ঠিকই থাকে। অবশ্য সমস্তটা মাথা নাড়লে ওপরের চোয়ালটাই নড়ে, কিন্তু তবু গোল্ডস্মিথের ধারণা যে ওপরের চোয়ালটাই নড়ে, নীচেরটা নয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কারবার, ততক্ষণ গোল্ডস্মিথের কোথা-য়ও ভুল-চুক নাই—কিন্তু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বা জীবন ও কর্ম্মের কথা বলতে গিয়েই সব গোল হয়ে যেত। জানই তো, কাজ করা এক কথা, আর কোন বিজ্ঞানের উপর আমাদের কাজের ভিত্তি, তা বুঝতে পারা আর এক কথা। ইংরাজী সবাই বল, কিন্তু ইংরাজী ব্যাকরণ জান কয়জনা? যুক্তিতর্ক এক রকম না এক রকম সবাই কর, ন্যায়-দর্শনের সূত্র জান কয়জনা? তেমনি একটা আদর্শ ধরে জীবনযাপন করা এক কথা, আর সেই আদর্শের তত্ত্ব প্রচার করা, যুক্তি দেখানো সম্পূর্ণ আলাদা চিজ্। এই খানেই লোকে ভুল করে। তারা আচার্য্যের দেহধর্ম্ম বা ব্যক্তিধর্ম্মকে তাঁর উপদেশে আরোপ করে, করে নির্ব্বিচারে দাস বনে যায়। রাম বলেন, সাবধান, সাধু সাবধান।

খৃষ্টের আর কয়খানা পুঁথি পড়া ছিল? তবুও কত বি, এ, এম্, এ, বাইবেলে কি লেখা আছে তার খবর করতে গিয়ে মাথা ঘুলিয়ে ফেলে! মহম্মদ ভারী সুন্দর উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁর প্রেরণা ও জ্ঞানের মূল ছিল কোথায়? সে জ্ঞান আর প্রেরণা সরাসরি যেখান থেকে আসত, সে উৎস তো তোমার মাঝেও আছে!

মনুর যুগে এত পুথিপত্র ছিল না, তবুও হিন্দুদের আইন-কানুনগুলো তিনি কেমন সুন্দর বেঁধে দিয়েছেন। হোমরের লেখাপড়া আর কি জানা ছিল, তবুও তাঁর ইলিয়ড আর ওডিসি এমন ধরণের কাব্য, যে আজ সব ভাষায় তার অনুবাদ হচ্ছে। আরিস্তোতল এম্ এ ও পাশ করেন নি, ডক্টর উপাধিও পান নি, তবুও উপাধিওয়ালাদের তাঁর বই পড়তে হয়।

খৃষ্ট আর কৃষ্ণ প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? ভিতর থেকে। তাঁরা যদি নিজের মাঝেই ভাবের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তুমি পেতে পার না কি? নিশ্চয়ই পার। যে উৎস হতে তাঁদের ভাবস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, সে উৎস তোমার মাঝেই আছে। তাঁরা যা করেছেন, তুমি তা করতে পার না কি? নিশ্চ-য়ই পার। তাই যদি হয় তাহলে যে জল আজ হাজার হাজার বছর ধরে জমে জমে পচে দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে, সেই জলের জন্য এত পিপাসা কেন? তোমার মাঝে ডুব দিয়ে একেবারে অমৃতের পাত্রে চুমুক দাও না কেন? অমৃতের উৎস যে তোমার মাঝেই!

রাম বলছেন, "ভাই আত্মস্বরূপ, সে সব লোক ছিলেন সে যুগের। তুমি এই যুগের;

হাজার বছরের পুরোনো মমী হয়ে লাভ আছে কি? মড়ার হাতে প্রাণ সঁপে দিও না। অমৃত রয়েছে তোমার মাঝে। যখন প্রাচীনদের গ্রন্থ হাতে নাও, তখন এমন সঙ্কল্প করো না যে তার মাঝে যা কিছু লেখা আছে তার কাছেই আত্মবিক্রয় করতে হবে। নিজে ভাব, ধ্যান চড়াও। যদি সত্য অনুভূতি না জাগে, যা বোঝ তা ব্যবহারে না লাগাতে পার, জীবন দিয়ে যদি সত্যের যাচাই না করতে পার, তাহলে খ্রীষ্ট কি বলেছেন, বুঝতে পারবে না, বেদার্থ তোমার কাছে স্পষ্ট হবে না, গীতা বা বাইবেলের বাণী বুঝতে পারবে না। এই যে কথায় বলে, মিল্টন বুঝতে চাইলে মিল্টন হওয়া চাই, তেমনি খ্রীষ্ট বুঝতে হলে খ্রীষ্ট বনতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে হলে শ্রীকৃষ্ণ হতে হবে, বুদ্ধ হয়ে তবে বুদ্ধকে জানা যাবে। "হওয়ার" মানে কি? বুদ্ধ হতে হলে তোমায় কি ভারতবর্ষে গিয়ে জন্মাতে হবে? তা কেন? খৃষ্ট হতে হলে প্যালেষ্টাইনে জন্মাতে হবে কেন? মহম্মদ হতে কি আরবদেশে জন্মাতে হবে? তা নয়। তবে কেমন করে বুদ্ধ, খৃষ্ট বা মহম্মদ হওয়া যাবে? একটা গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে।

একটা লোক প্রেমের কবিতা পড়ছিল —লয়লা-মজনুর প্রেমের কাহিনী—ভারী চমৎকার কিন্তু! নায়ক মজনুর চরিত্র তাকে এমনি মুগ্ধ করেছিল যে তার মজনু হতে সখ গেল। তাকে এক জন একটা ছবি দেখিয়ে বলেছিল, এইটা লয়লার ছবি। মজনুর সাধক করলে কি, সেই ছবিখানা নিয়ে বুকে রাখল, চুমো খেল, চোখের জলে নাইয়ে দিল—বসতে লাগল, আর কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না। কিন্তু কৃত্রিম প্রেম তো বেশী দিন টেকে না। এই তো কৃত্রিম ভালবাসা। যথার্থ ভালবাসার নকল হয় না, আর এই লোকটা চাইছে সেই ভালবাসারই নকল করতে।

লোকে এসে তাকে বলল, কি করছ ভায়া? এই কি মজনু হবার ফিকির? মজনু হতে গেলে তার লয়লাটীকে কেড়ে আনতে হবে না—মজনুর যে অগাধ প্রেম, হৃদয়ে তারই সাধনা করতে হবে। প্রেমের সেই পাত্রীটীর প্রয়োজন নয়—মজনুর মত প্রেমের গভীরতা প্রয়োজন। তোমারো কেউ প্রেমপাত্রী থাকতে পারে, বা তুমি অপর কাউকে লয়লার জায়গায় অভিষিক্ত করতে পার। কিন্তু মজনুর মত বুক ভরা প্রেমের আবেগ থাকা চাই। এই হচ্ছে খাঁটী মজনু হবার সঙ্কেত।

রামও তাই বলছেন, খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ বা কৃষ্ণ হতে গেলে তাঁরা কি করেছিলেন, কি ভাবে চলতেন, তা নকল করবার তো প্রয়োজন নাই। তাঁদের কর্ম্ম আর বচনের কাছে দাসখত লিখে দিতে হবে না, তাঁদের চরিত্রবল অর্জ্জন করতে হবে, ভাবের গভীরতা আয়ত্ত করতে হবে, যে অনুভূতি, প্রেরণা ও শক্তিতে তাঁরা সিদ্ধ ছিলেন, তার সাধনা করতে হবে। জীবনে যদি সেই ভাবের অভিব্যক্তি ঘটাতে পার, তাহলে এখন যে পারিপার্শ্বিকের মাঝে আছ, নিশ্চয়ই তার পরিবর্ত্তন হবে। খৃষ্ট যদি এই দণ্ডে এসে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে কি করতেন? তিনি কি আবার এসে ক্রুশে চড়ে বসতেন? তা নয়। তুমি ক্রুশে না চড়েও জীবন্তে খৃষ্ট হতে পার। খৃষ্ট তাঁর অনুভূতিকে সার্থক করবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন; আর

শোপেনহাউর তাঁর অনুভূতির সফলতা খুঁজেছিলেন জীবনের অভিব্যক্তিতে। নিজের বিশ্বাস ও অনুভূতিকে মনে বজায় রাখার চেয়ে জীবনে তাদের ফুটিয়ে তোলা অনেক সময় বেশী কঠিন।

এই হল আমার ভূমিকা। সার কথা এই, প্রত্যেক জিনিষকে স্বরূপে বিচার কর। অবতারের ব্যক্তিগত জীবনকে তাঁর উপদেশের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলো না। জীবন ও শিক্ষা পৃথক ভাবে আলোচ্য।

প্রথম প্রশ্ন এই, পুনর্জ্জন্ম যদি সত্য হয়, তাহলে পারিবারিক বন্ধন তাতে ছিন্ন হয়ে যায় না কি? আর এই প্রশ্নেরই আর একটা দিক, এ জীবনে যারা এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে, মরলে পরে তারা এক ঠাঁই গিয়ে মিল্‌বে না কি?

সুন্দর প্রশ্নটী কিন্তু। প্রশ্নটার এক একটার অংশের জবাব দিচ্ছি। "পুনর্জ্জন্ম যদি সত্য হয়, তাতে পারিপার্শ্বিক ছিন্ন হয়ে যায় না কি?"

রাম শুধু এই কথাটাই জান্‌তে চাইছেন, পারিবারিক বন্ধন বলে জগতে কিছু আছে কি না। তোমার কোনও পারিবারিক বন্ধন আছে কি? একজনের ছেলে হল; যতদিন ছেলে না সাবালক হবে, ততদিন সে বাপের সঙ্গে থাকবে। ছেলে ক্রমে বড় হল, বড় একটা কাজ পেল, তখন থেকে বাপকেও এড়িয়ে চল্‌ল। ছেলে যে টাকা উপায় করে, তার ভাগ বাপে পাবে কেন? তখনি তো বাঁধন ছিঁড়ে যায়। ছেলের নিজের সংসার হল। ছেলে হয়ত কি জার্ম্মানী কি অন্য কোনও দেশে গেল; বাপও বিদেশে গেল। পারিবারিক বন্ধন থাকল কোথায়?

হাঁ, তবে বন্ধন আছে বটে, শুধু নামের বন্ধন। আমি জর্জ্জস্ স্যাণ্ডারসন, আমার বাপ জন স্যাণ্ডার্সন। শুধু একটা নাম—তা ছাড়া আর কি? নামে আছে কি ছাই? দেখা যাক্, যোগসূত্র কোথায়ও পাওয়া যায় কি না।

এ দেশে একটা ছেলে হল, আর এক দেশে হল একটা মেয়ে। ছেলেটার বাড়ী আমেরিকায়, মেয়েটার বাড়ী জার্ম্মাণীতে; দুজনের বিয়ে হল। ছেলের পরিবারসূত্র ছিল এক মুলুকে, মেয়ের ছিল আর এক মুলুকে; এখন তারা স্বামী স্ত্রী। পুরাতন বন্ধন তাহলে কি হল? তারা নূতন বন্ধনে পড়েছে। আবার যদি বিবাহচ্ছেদের সময় আসে, তখন দুজনেই নূতন করে বিয়ে করবে। বন্ধন তাহলে গেল কোথায়? বাঁধনটা এক জায়গায় টিকিয়ে রাখ্‌তে পারবে কি? ভাই বোন্ এক পিতা মাতা হতে জন্মেছে, ছেলেবেলায় এক বাড়ীতে এক সঙ্গে খেলাধুলো করেছে; দু'য়ে পারিবারিক বন্ধন একটা আছে বটে। ছেলেটা গেল অষ্ট্রেলিয়া, সেখানে গিয়ে নূতন করে সংসার পাতিল। মেয়েটী গেল ফ্রান্সে, গিয়ে ফরাসী মেয়ে হল। বন্ধন রইল কোথায়?

এখন প্রশ্নটী ধর, পুনর্জ্জন্ম যদি সত্য হয়, তাহলে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় না কি? এ জগতে পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নাই—তা আবার ভাঙ্‌বে কি? তাই পুনর্জ্জন্মে বন্ধন ছেঁড়ে না—কেননা বন্ধন যে মোটেই নাই।

যদি ধরা যায় আত্মীয়তার বন্ধন বলে একটা কিছু আছে, আর এ জীবন কিছু দিন পর্য্যন্ত তা বজায় রাখ্‌তেও পারা যায়; তাহলেও কিন্তু পুনর্জ্জন্ম সে বন্ধনকে শিথিল করে না। ধর, তোমার অনেকগুলি ছেলে পুলে রয়েছে। তার একটা মরল। পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে চাও বটে, কিন্তু একটীকে যমে কেড়ে নিল। এ জগতেও তাহলে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, পরলোকে তা গিয়ে 'জোড়া লাগ্‌বে। যদি তাই সম্ভব হয়, আর যদি তোমারও এমন সাধ হয় যে এখানকার ছিন্ন সূত্র আর কোথায়ও গিয়ে জোড়া লাগুক; তাহলে একটা কাল্পনিক স্বর্গের সত্তা স্বীকার করবার প্রয়োজন কি? ভূগোলে তেমন স্বর্গের সন্ধানও দিতে পারবে না, বিজ্ঞানেও তার ঠিকানা বল্‌তে পারবে না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন আরও কিছু কাল বজায় থাকুক—এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে জন্মান্তরের আইন অনুযায়ী সে সম্বন্ধ মৃত্যুর পর আর অনুস্যূত হতে তো পারে না। কেন পারে না? কারণ মানুষ নিজেই যে তার ভাগ্যের নিয়ন্তা। তোমার ব্যক্তিগত প্রীতি-মমতার বন্ধনগুলি যে তুমি নিজে সৃষ্টি করেছ। মরবার সময় কারু প্রতি বিশেষ একটা আসক্তি পোষণ করে মর, তাহলে পরের জন্মে সেই মানুষই অপর কোনও দেহে জন্মগ্রহণ করে তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেখ্‌তে পাবে। এ জন্মে যদি তাকে না চেয়ে থাক, তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে থাক, তাহলে পরের জন্মেও তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। জন্মান্তর আইনে এমন কথা বলে না যে এ জন্মের যারা তোমার শত্রু মিত্র ছিল, যাদের সঙ্গ পরিহার করেছ বা যাদের একান্ত ভাবে চেয়েছ, মৃত্যুর পর তাদের যে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে এমন কিছু নয়। বেদান্ত এমন বলে না যে যার মুখ দর্শন করতে চাও না, যার সঙ্গ ভীষণাদপি ভীষণ বলে মনে হয়, সে-ও এসে তোমার ঘাড়ে চাপ্‌বে। একটী মেয়ে যদি স্বামী ত্যাগ করে, স্বামীর মুখ আর না দেখতে চায়, তাহলে কর্ম্মবিধি অনুযায়ী স্বামীও আর তাকে উত্যক্ত করবে না। যাদের দেখ্‌তে চায়, যাদের আপন করে রাখ্‌তে চায়, পরজন্মেও আবার সে তাদেরই দেখা পাবে।

এ বিষয়ে অনেকের ভুল ধারণা আছে। একটী একটী করে তার বিচার করা যাবে। ইউরোপ আর আমেরিকায় পরলোক সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে ভুল ধারণা প্রচলিত, আগে তারই আলোচনা করব। তোমার স্বর্গকে কি খৃষ্টীয়ানের স্বর্গ বলব, না চার্চ্চের স্বর্গ বলব? স্বর্গের ধারণায় একটা স্বতোবিরোধ রয়েছে নয় কি? স্বর্গ বল্‌তে লোকে এমন একটা ঠাঁই বোঝে, যেখানে সবাই জড় হয়ে আছে। রাম বলছেন কি, একটু ভেবে দেখ না কেন! অন্ততঃ সত্যের খাতিরে একটু ভাববে না কি? যেখানে তোমার চারদিকে বেড়া, সেখানে বাস্তবিক সুখ পেতে পার কি? সঙ্কোচে সুখ আছে কি? অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। স্বর্গে গিয়েও যদি সেই গুঁতোগুঁতি থেকে যায় যারা কোন্ যুগে মরেছে, বা কোন্ যুগে মরবে, বা ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা বা অন্য কোথায়ও যারা ধর আজ মরেছে, তারা সবাই যদি সেখানে হাজির হয়, তাহলে সুখ হবে কি?

আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক বলেছিল, আমি

চরাচরের রাজা, আমার অধিকার খর্ব্ব করবে কে? যখন গাড়ীতে চাপ, তখন মন বলে গোটা গাড়ীটাই যদি আমার হত! আর কেউ যদি গাড়ীতে ঢুকতে চায়, তুমি বিরক্ত হও। ঘরে বসে আছ, কেউ দেখা করতে এল; চাকরকে দিয়ে খবর পাঠাও, বলগে বাড়ী নেই!

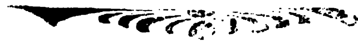
তোমার ঘর-দোর সবই আছে, অপরেরও তেমন ঘর-দোর আছে; কিন্তু বেদে আর বাইবেলে যত বচনই থাক না কেন, তবুও কিন্তু তোমার ইচ্ছা হয়, প্রতিবেশীর চেয়ে যদি তোমার বেশী ধন থাকত! সে যদি তোমার সমানে সমান না হয়ে অধীন হত! এমন ধারা কত খ্রীষ্টান রয়েছে—তাদের খ্রীষ্টান বলা ঠিক নয়, বাস্তবিক তারা অখৃষ্টান—যদি জাহাজে যেতে কোনও বৌদ্ধ, মুসলমান বা হিন্দু সঙ্গীর সঙ্গে তাদের মিশতে হয়, তাহলে গায়ে জ্বালা ধরে যেন। এমন ব্যাপার রাম স্বচক্ষে দেখেছেন। তাদের সুখ শান্তি এতে নষ্ট হয়ে যায়। আর স্বর্গে গিয়ে যদি সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়—যাঁরা তোমার চেয়ে ঢের উন্নত, এমন লোকের সঙ্গে থাকতে হয়, খৃষ্ট-বুদ্ধের সঙ্গে এক ঘরে দিন কাটাতে হয়, তাহলে তাতে তোমার সুখ হবে কি? মনে শান্তি থাকবে কি? কথাটা একটুখানি ভেবে দেখো দেখি!

যেখানে ভেদ জ্ঞান, সেখানে কিছুতেই সুখ শান্তি থাকতে পারে না। অসম্ভব —একেবারেই অসম্ভব। তোমার মুখের হাসি মিলিয়ে যায় কেন? পরের মুখের পানে চেয়ে। সবাই একলাটী থাকতে চায়। সবাই চায় একচ্ছত্র, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হতে। বাইবেলে যে স্বর্গের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে স্বর্গ তোমরা ভুল বুঝেছ—সেখানে গিয়ে কিছুতেই তোমাদের সুখ হতে পারে না।

আচ্ছা, তাহলে বাইবেলকে কেমন করে ব্যাখ্যা করলে পর তার মাঝে সত্যের সন্ধান মিলতে পারে, বল দেখ? বাইবেলে আছে —স্বর্গে গিয়ে আমাদের মিলন হবে। স্বর্গে সবার সঙ্গেই দেখা হয়; বন্ধুদেরও দেখা। কিন্তু সে দেখার অর্থ কি? ঠিক ঠিক কথাটা তলিয়ে বোঝ দেখি—ভাব তো, তার অর্থটা কি হতে পারে। যে বাইবেলে লিখেছে, স্বর্গে আমাদের মিলন হবে, সেই বাইবেলে এমন কথা আছে না কি—স্বর্গ রাজ্য তোমার মাঝে। ভগবানের অধিষ্ঠান, স্বর্গের সম্পদ তোমার মাঝেই—তোমার বাইরে তো নয়। স্বর্গ বাইরে আছে বলে কল্পনা করছ কেন? আকাশের দিকে চেয়ে নক্ষত্রের মাঝে স্বর্গ খুঁজছ কেন? ভগবানের উপর একটু করুণা হয় যেন। বেচারা যদি মেঘের রাজ্যে বাস করেন, তাহলে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর সর্দ্দী হবে যে। স্বর্গ তোমার মাঝে, ভগবান্ তোমার মাঝে!—এইটী দেখ।

ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে যাও, গভীর মিলনে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাও, আমিত্বের নির্ব্বাণ ঘটুক—পরমানন্দময় সে ভাব পেলে, তুমি আর স্বর্গে কেন, তুমিই যে স্বর্গ তখন! বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে তুমি তখন যুক্ত। যারা জীবিত, কি মৃত, কি জন্মাবে, তাদের সকলের সঙ্গে এক হয়ে আছ সেখানে। স্বর্গ তোমার মাঝেই—আর এই সূত্রে স্বর্গে আমাদের সঙ্গে মিলন হয়। যিনি জীবন্মুক্ত, দেহত্যাগের পূর্ব্বেই যিনি মুক্তি লাভ করেছেন, তিনি

নিরন্তর স্বর্গবাসী জীবিত-মৃত সকলের সঙ্গেই তিনি যুক্ত। যারা জগতে জন্মগ্রহণ করবে, তিনি তাদের সঙ্গেও যুক্ত। এই অনুভূতি তিনি লাভ করেন, গ্রহ-নক্ষত্র জীব জন্তু সবই তাঁর আত্মস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ - ভাবজ্ঞেয় নিত্য সত্তা। তিনি সর্ব্বময়, তাই তিনি স্বর্গের অধিকারী -- তাই স্বর্গ রাজ্যে সবার সঙ্গে তাঁর মিলন সম্ভবপর হয়। (ক্রমশঃ)



সংঘ-সাধনা



একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই -- "সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে।" কিন্তু কথাটাকে স্বভাব হিসাবে না আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিব, তাহাই হইল সমস্যা। আমাদের দেশে দেখি, সংঘ একটা আদর্শ, কেননা বিচ্ছিন্ন থাকাই হইল আমাদের স্বভাব। অনেকেই বলেন, এই জন্যই আমরা দুর্ব্বল, পরপদদলিত -- ঈশপের সেই ষাঁড়ের গল্পটাও আমাদের শুনাইয়া দেন। বিদেশের দিকে চাহিয়া দেখি, সংঘবদ্ধ হওয়া বা দলবাঁধা সেখানে একটা স্বভাব। সোসাইটী, এসো শিয়েসন, লিগে এক একটা দেশ একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। শুনিতে পাই, এমনি করিয়া তাহারা নাকি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে; অন্ততঃ আমাদের তন্-মন্-ধনের রাজা যে তাহারাই, ইহা ত স্পষ্টই দেখিতে পাই। ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া তাহাদের অনুকরণে দল বাঁধিতে যাই, কিন্তু পারি না। ক্ষোভটা তখন আরও বেশী হয়, স্বজাতি নিন্দায় রসনা আরও মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের এই অসামর্থ্যের নিদানে কোনও তৈত্তিক সত্য নিহিত আছে কিনা, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। শুনি, এখন কলির সন্ধ্যা। কিন্তু এই কলিই অন্যত্র ফুল হইয়া ফুটিল আর আমাদের ভাগ্যে তাহার কলহার্থটাই সার্থক হইয়া উঠিল কেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

সংঘের কল্পনায় চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে, এ কথা সত্য। সংঘশক্তির সুন্দর একটী উদাহরণ আছে -- চণ্ডীতে। দেবতারা অসুরের তাড়া খাইয়া ছুটাছুটি করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহাদের কি সুবুদ্ধির উদয় হইল, সবাই এক ঠাঁই আসিয়া জুটিয়া পড়িলেন। গরম গরম দুই চারিটা বক্তৃতা হইল, সবারই রক্ত তাতিয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া আগুনের ফুলকি বাহির হইতে লাগিল; আর অমনি সেই তেজ এক জায়গায় পিণ্ডীভূত হইয়া শক্তিরূপিণী এক নারী মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। দেবতারা তাহার স্তব করিলেন; শুধু স্তব পড়িয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, যার যেমন সামর্থ্য তেমনি আভরণ, প্রহরণ ইত্যাদি জুগাইতে লাগিলেন। উপসংহারে মা অসুর নিধন করিয়া দেবশক্তিকে পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠ করিলেন।

এইখানে সংঘশক্তির মহিমা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কয়েকটী কথা লক্ষ্য করিতে

হইবে। প্রথম কথা, অভাবের বা দুর্ভাবের তাড়নায় সংঘের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং বলিতে পারি—এই উপাখ্যান সংঘের negative দিক। ঠিক এইরূপ দশা আমাদেরও উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিক হইতে প্রতিকূল শক্তির তাড়া খাইয়া আমরা কেবলই দানা বাঁধিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি; কিন্তু দানা বাঁধিতে পারিতেছি না কেন? তাহার উত্তর উপাখ্যানের দ্বিতীয় ভাগেই রহিয়াছে। দশজন উৎপীড়িত ব্যক্তি একত্র হইলেই সেখানে মায়ের আবির্ভাব হয় সত্য—কিন্তু সে মা মহাশক্তি হইয়াও নিরস্ত্রা এবং নিরাভরণা অতএব নিষ্ক্রিয়া এবং অসুন্দরী। মাকে সাজাইতে হইবে, শুধু অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া নয়, দিব্যাভরণ ও ফুলের মালাও দিতে হইবে। এই কবিত্বকর্ম্মের ভাব ও শিল্পনৈপুণ্যটুকু আমাদের এখনও আয়ত্ত হয় নাই—তাই আমরা সংঘে মায়ের আবাহন করিয়াও কিছু করিতে পারি না। মা মা করিয়া তারস্বরে চীৎকার করি; মা ও হয়ত আসেন বটে; কিন্তু অসত্যের সঙ্গে লড়াই করিবার অস্ত্রটা যে আমাদিগকেই জুগাইতে হইবে, শুধু চীৎকার আর অশ্রুপাতেই যে কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই—এ কথাটা তো আমাদের খেয়ালে আসে না। তাই আমরা তাড়া খাইয়া দল বাঁধিয়াও বাঁধিতে পারি না।

কিন্তু বলিয়াছি, এটাও সংঘের negative দিক। তাড়না, উত্তেজনা ইহার নিদান—বিনাশ বা বিলোপ সাধন ইহার ফল। সংঘের এই মূর্ত্তি সপ্রয়োজন বটে, কিন্তু ইহার আর এক মূর্ত্তিও আছে, তাহারও সেবা প্রয়োজন। শুধু ভাঙিবার ব্রত গ্রহণ করিলেই হইবে না—গড়িতেও হইবে, রক্ষাও করিতে হইবে। যে সংঘে রক্ষণ ও সৃজন শক্তির ক্রিয়া নাই, আছে শুধু প্রলয় শক্তির তাণ্ডব, সে সংঘ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয় মাত্র।

চণ্ডীতে আমরা সংঘের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়াছি। সংঘের শিবকরী মূর্ত্তি দেখিতে পাই বেদে ও উপনিষদে। বেদে সভা ও সমিতির স্তুতি আছে; ঋক্ সংহিতা সমাপন কালে জ্বলন্ত ভাষায় সংহতি কামনার কথা আছে; উপনিষদে আছে ঋষি-সংঘের কথা। এগুলি সমস্তই সংঘের শিবময় রূপ। ইহার নিদান কি? ঋষি বলিতেছেন, সঙ্গতি, সংবাদ, সংজ্ঞান—ইহাই সংহতির নিদান। "সমান চল, সমান বল, সমান জান। মন্ত্রণা সমান হোক, সমিতি সমান হোক, মন সমান হোক, চিত্ত সমান হোক, হবিঃ সমান হোক, আকূতি সমান হোক, হৃদয় সমান হোক"—সংঘগঠনের ইহাই অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ। ইহার মাঝে কোনও মতলব প্রচ্ছন্ন নাই—শুধু প্রাণের টানে, প্রেমের দায়ে এক হওয়া—যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গের দেবতা অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া এই ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণ করা।

আবার দেখি, উপনিষদে আছে—ব্রহ্মবিদ্যা ঋষিসংঘজুষ্টা। যে পরমার্থ লাভ হইয়াছে, সংঘ সযত্নে তাহা রক্ষা করিতেছেন, উপযুক্ত অধিকারী দেখিয়া তাহা বিতরণ করিতেছেন। সংঘ যখন আত্মরক্ষাতেই পর্য্যবসিত না হইয়া আত্মদানের ব্রতও গ্রহণ করে, তখনই উহা সার্থক।

এই তো দেখি সংঘের অধ্যাত্ম প্রতিরূপ ইহার মাঝে কোথাও বিন্দুমাত্র উত্তাপ সঞ্চিত

নাই, প্রাণের উদারতা বিশ্বব্যাপী হইয়া দেখা দিয়াছে বলিয়া তীব্র প্রাণন চেষ্টাও কোথায়ও নাই; অথচ এই সংঘই সকলের প্রাণাধার—ইহার বাহ্য প্রচেষ্টাহীন প্রাণনকে জড়ত্ব বলিয়া ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই, কেননা ক্ষুদ্ধ প্রাণ শক্তি ইহার আশ্রয় পাইয়াই শান্ত ও সমাহিত হইতেছে, দেখিতে পাই।

কিন্তু সংঘকে এমনি তুরীয়ভূমিতে রাখিলে সংসারে কাজ চলে না। তাই সংঘের লৌকিক প্রতিরূপও আছে। জৈবিক প্রেরণাতে উহা সহজ মূর্ত্তিতেই দেখা দেয়। Herd instinct বলিয়া একটা কথা আছে; পাণিনি বলেন পশুর "সমজ।" মানুষের হইলেই তাহাতে একটা আকার বেশী দিয়া "সমাজ" গড়িয়া তোলা হয়। পশুর বেলাতেই হউক, আর মানুষের বেলাতেই হউক, সংঘের সামাজিক রূপকে স্বীকার না করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু প্রাণিজগতে আবার এমনও আছে, যাহারা নখদন্তের জোরে একলাই টিকিয়া থাকে। তবে তাহারা সমষ্টি-জগতের বিবর্তনের সহায়ক কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহা হইলেও কিন্তু শ্লেষ করিয়া ইঙ্গিত করা হয়, যাহারা শষ্প-ভোজী, অতএব নিরামিষাশী, সংঘ তাহাদেরই আশ্রয়; এমন কি মানুষের বেলাতেও নাকি এই লক্ষণটা খাটে।

কিন্তু মানুষ আমিষাশী না নিরামিষাশী, সে তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নাই। সুযোগ বুঝিয়া বোধ হয় সে দুইই হয়। তাই তাহার সমাজে সংঘের মহিমা ও নখদন্তের আস্ফালন সমানভাবে আধিপত্য করিয়া থাকে। ইহাদের এক পক্ষকে উচ্ছেদ করিবার কল্পনা অনেকে করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহ সফলকাম হইয়াছেন কিনা, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। প্রাচীন হিন্দু সমাজ একটা রফা করিয়াছিল। রফাটা সর্ব্বাংশে সুখের না হোক, স্বস্তির যে হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু বুঝিয়াছিল, আমিষভোজী আর নিরামিষভোজীর লড়াইটা চিরকালই থাকিবে; কাহাকেও তাড়াইবার দরকার নাই বা চাপ দিয়া রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজন নাই। উভয়ের এলাকা নিরূপিত করিয়া দেওয়া হউক, মীমাংসা আপনা হইতেই হইয়া যাইবে।

গীতায় গুণকর্ম্মবিভাগে সমাজ ব্যবস্থার কথা আছে। ইহাই রফার মূলমন্ত্র। সমস্তটা সমাজ একটা সংঘ; সংঘের আধ্যাত্মিক নিয়মানুযায়ী তাহার একটা সমান আকৃতি থাকা সম্ভব বটে, কিন্তু সকলের কাছে তো তাহা সুস্পষ্ট নহে। ভোজ্যবস্তু লইয়া বিবাদের সূত্রপাত এইখান হইতেই হয়। গুণ কর্ম্মে বিভক্ত সমাজ, বিবাদকে অস্বীকার করে না, কিন্তু তাহার বিসর্পণকে নিয়ন্ত্রিত করে। বড় হইতে কে না চায়? কিন্তু সবাই বড় হইতে গেলে সমাজের সংহতি বজায় থাকে না। তাই কোথায়ও কোথায়ও আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব্ব করিতে হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আশাকে জীয়াইয়া রাখা দরকার। হিন্দুর জন্মান্তরবাদে ইহা সুকর হইয়াছে। হিন্দু, সমাজে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষাটাকে পরজন্মের দিকে ঠেলিয়া দিয়াও কতকটা স্বস্তিতে থাকে। জীবনের এই বিস্তৃতির অনুভূতিতে হিন্দু-সমাজের আর কিছু না হউক, পরমায়ু বাড়িয়াছে নিশ্চয়ই।

সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মুখে গ্রামীণ তন্ত্র, পিতৃ-তন্ত্র প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই। ভারতবর্ষীয় আর্য্য-প্রতিষ্ঠানের ইহাও একটা বশেষত্ব। আজও ইহার ধ্বংসাবশেষ হিন্দুর সমাজে ও পরিবারে দেখা যায়। Herd-instinctএর ইহা একটা ফলোপধায়ক রূপ নিশ্চয়ই। সংঘ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য এইখানে হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া সংঘ হইতে পারে কিনা, ইহা একটা সমস্যার কথা। আজকাল গণতন্ত্রের ধুয়া উঠিয়াছে। ইতরলোকের দিকে সবাই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, নিষ্পেষিতদের প্রতি করুণা একেবারে কুম্ভীরের অশ্রুপাতের মত উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আসলে দেখিতেছি, গণ-স্বাতন্ত্র্য কোথায়ও বজায় রাখা যাইতেছে না—সর্ব্বত্রই প্রভুতন্ত্রের আসর। অথচ প্রাচীন সমাজতন্ত্রে গুরু-লঘুর মাঝে যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিনিময় দেখা যাইত, স্বাতন্ত্র্যের লোলুপতায় তাহার সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে। কন্তু মোটের উপর তাহাতে সমাজের সুখ বাড়িয়াছে কিনা বলা কঠিন। নানা দিক বিচার করিয়া এই রায়ই দিতে হয়, পরিবারে যেমন গৃহপতি থাকা প্রয়োজন, সমাজে তেমনি সমাজপতির, রাষ্ট্রে তেমনি রাষ্ট্রপতির একটা বিধিদত্ত গৌরবের আসন বজায় রাখাই ভাল। সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন হউক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সংস্কার করিতে গিয়া সমূলে সংহার না করা হয়। বহু নৃপতির শাসনে আমরা পতিত হইয়াছি, না পতিহীন বলিয়াই পাতিত্যের দিকে দিন দিন গড়াইয়া চলিতেছি তাহা একটা চিন্তার বিষয়।

নেতার অধীনে দল বাঁধিয়া থাকা—ইহা মানুষের আদিম যৌথ-সংস্কার। সংঘের স্থূল প্রতীক যে একান্নবর্ত্তী পরিবার, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমাজ, রাষ্ট্রে মণ্ডলাধীশের আধিপত্য—এগুলি এই প্রাণি-সুলভ যৌথসংস্কারেরই স্বাভাবিক পরিণতি। এখানে সংহতি ঠিক স্বাতন্ত্র্যের সংহতি নয় বহুলপরিমাণে পরতন্ত্রের সংহতি। নয়া রোশনাইর দেমাকে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু এই মশলা না হইলে নূতন কিছু গড়িতেও পারিব না। তাই দেখি, "অন্ধ আনুগত্য ছাড, slave mentality ছাড়" বলিয়া যাঁহারা আজকাল চীৎকার করেন, তাহারা কতগুলি অন্ধ ও দাস অনুচর লইয়া দল পাকাইতে পারিলেই নিজকে কৃতী মনে করেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ বটে!

এই জন্যই বলিতেছিলাম, 'সংঘের স্থূল-প্রতীক, উপনিষদের ভাষায় "পুরুষবিধ"; তাহার একটা মাথা চাই, বুক, হাত, পা থাকা চাই। বেদের পুরুষসূক্তে আর্য্য-সমাজকে এমনি একটা মাথাওয়ালা সংঘরূপেই দাঁড় করান হইয়াছে—বহুচরণবিশিষ্ট কবন্ধের পূজাকেই সংঘ-দেবতার পূজা বলিয়া চালানো হয় নাই। এখন আর্য্যেরা পরাধীন: তাই স্বাধীন হইবার বাতিকটা বোধ হয় কিছু বেশী। কিন্তু স্বাধীন আর্য্যদের কল্পনা আংশিক পরাধীনতাকেই সংঘের সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছিল।

এইখানে একটা দার্শনিক পরিভাষার কথা তুলিয়া সংঘতত্ত্বটা হিন্দুর মস্তিষ্কে কি ভাবে খেলাইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিই। সংঘ, সংঘাত, সংহতি একই কথা। যেখানেই সংঘাত সেখানই মূলে আছে পারার্থ্য; এটা সাংখ্যের একটা প্রসিদ্ধ বচন। সকলেই জানেন, সংহতির ভাবটা সাংখ্যকারকে এমনি পাইয়া বসিয়াছিল যে তিনি গোটা প্রকৃতিটাই

একটা অখণ্ড সংঘাতরূপে নিরূপণ করিয়াছেন —কোথায়ও ছেদ নাই, ভেদ নাই—একটা বিরাট্ সুষম (Homogeneous) স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তি এই প্রকৃতি। সংঘের idea এর চেয়ে কি আর বিরাট হইতে পারে? কিন্তু এই সংঘরূপা প্রকৃতির স্ফূর্ত্তির কারণ সাংখ্যকার নিরূপণ করিবেন, পারার্থ্য বা পর প্রয়োজন। এই পর কে? পুরুষ। পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতির এই সংঘ-প্রচেষ্টা। বিশ্ব রেণু রেণু হইয়া থাকিলেই বা কি ক্ষতি ছিল? দানা বাঁধিল কেন? এই পারার্থ্যের প্রেরণায়, পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের আকাঙ্ক্ষায়। তাই যেখানেই সংঘ, সেখানেই পারার্থ্য বা পরানুগত্য একান্ত প্রয়োজন। স্থূল সংঘাত এই দেহ পারার্থ্যের একটা জীবন্ত উদাহরণ। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি পরিধির বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া এক কেন্দ্রে আত্মসমর্পণ করে, তাতেই চক্র চলে। জীবাণুবিদ্ বলেন, অতি সূক্ষ্ম জীবাণুকোষেরও এমনি একটা কেন্দ্রপুরুষ বা nucleus রহিয়াছে। জড়বিজ্ঞান বলে, পরমাণুর দেহগত তাড়িত-কণা একটা নির্গুণ বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া ঘুরপাক খাইতেছে। যে নিয়মে একটা তাড়িতকোষ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই নিয়মেই প্রকাণ্ড সৌরজগৎটা চলিতেছে—ব্রহ্মাণ্ডটাও বুঝি চলিতেছে।

এই তো দেখি, দর্শনের, বিজ্ঞানের, জীবতত্ত্বের, জ্যোতিস্তত্ত্বের রায়ে সংঘতত্ত্বের একই ধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটা কথা মনে পড়িল। মনস্তত্ত্বের একটা ফাঁকি আছে —mob-consciousness এ ও এক বিচিত্র রহস্য। আমি একা থাকিলে হাসি পায় না; কিন্তু যাত্রার আসরে বসিয়া একটা ভাঁড়ের সামান্য মুখভঙ্গীতে হাসিয়া কুটীপাটী হই। একা একা থাকিলে হয়ত অমন হাজার ভ্যাঙ্গানোতেও মুখের একটা পেশী শিথিল হইত না। সভায় গিয়া শুনিলাম—"বন্দে-মাতরং।" গলা ফাটাইয়া আমিও চীৎকার করিলাম "বন্দেমাতরং।" বাড়ীতে আসিয়া একা পড়িলে কিন্তু উত্তেজনা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কীর্ত্তনে "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" বলিয়া দশায় পড়িয়াছি, কিন্তু ঘরের কোণে একমনে বসিয়া জপে মন নিবিষ্ট করিতে পারি নাই। অনেক সময় মনে হয়, বৈষ্ণবের সংকীর্ত্তন বা সংঘোপাসনায় গণভাবটা চেতাইয়া তোলে, তাহাতে লাভ না ক্ষতি? খৃষ্টান বা ব্রাহ্মের চার্চ্চীয় উপাসনা, মুসলমানের নমাজ, বৈষ্ণবের সংকীর্ত্তন—ধর্ম্মজগতে সপ্রয়োজন বটে, কিন্তু আদর্শ হিসাবে কতখানি উঁচু? mob-consciousness এর একটা সুন্দর উদাহরণ সেক্সপিয়ারের জুলিয়াস্ সিজারে—ব্রুটাস ও আণ্টনীর বক্তৃতায়। শুধু গণভাবটাকে চেতাইয়া তুলিয়া এণ্টনী ব্রুটাসের এতদিনকার সুচিন্তিত, সুকল্পিত কাজটাকে একেবারে মাটী করিয়া দিল।

এই সব উদাহরণ হইতে সাংখ্যের তত্ত্বটাই জোর করিয়া মনকে দখল করে। সংঘাত মানেই কথঞ্চিৎ জড়ত্ব; অতএব তাহার পারার্থ্য প্রয়োজন। পূর্ব্বের উদাহরণগুলিতেই দেখিতেছি সংঘাতে গণচেতনা উদ্বুদ্ধ হইলেও তাহার কার্য্যকরী কোনও মূল্য থাকিতেছে না—যে পর্য্যন্ত নাকি একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ আসিয়া মাথায় না দাঁড়াইতেছেন; আবার সংঘের পাল্লায় পড়িয়া বিশিষ্ট বুদ্ধিও ফিকে হইয়া যাইতেছে। এই দুইটাকে মিলাইয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হয়—তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও

নিছক জড়ত্ব—দুয়ের মাঝামাঝি সংঘ। সংঘে পূর্ব্বেরটাকে নিষ্প্রভ করে ও পরেরটাকে চেতাইয়া তুলে। যাহাদের চোখে সব জিনিষ ছোট হইয়া দেখা দেয়, সংঘের উপাসনা ছাড়া তাহাদের গতি নাই। কিন্তু যাহারা স্বভাবতঃই বড়, সংঘকে প্রত্যাখ্যান করাই তাহাদের পৌরুষের সার্থকতা।" ইহাই সাংখ্যকারের বিবেক। অধ্যাত্মজগতে এই প্রত্যাখ্যান শক্তিটা থাকা এক হিসাবে ভারী দরকার। নিট্‌শের many-too-many and the superfluousর প্রতি অবজ্ঞার মূলে এই সংঘাতকে প্রত্যাখ্যান। সর্ব্বাংশে ইহাকে ভাল বলি না—কেননা ইহা একদেশ-দর্শিতা। বেদান্ত এই বিরোধের সমন্বয় করিয়াছে। সে কথা পরে বলিব। (ক্রমশঃ)

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ

ছেলেদের নিয়ে এমন আট্‌কে পড়েছি, তার উপর আসনপূজার ভার কাহার উপর দিয়ে যাব এটা খুব সমস্যার বিষয় হওয়ায় এবারে যে আমার কুম্ভে যাওয়া হবে তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইত, যদিও শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ গত ভক্তসম্মিলনীতে বয়সহিসাবে কুম্ভে যাওয়ায় আমার দাবীই অধিক প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

এবার তিনি হালিসহরে এসে আমাকে বল্লেন যে, ভুবনের খুব ইচ্ছা সে কুম্ভে যায়, তার পর তোমাদের দুজনের একসঙ্গে কুম্ভে যাওয়া চলিতে পারে না, অথচ ভবিষ্যতে তোমার কুম্ভে যাওয়া অপেক্ষা করাও চলে না। অতএব তোমাদের উভয়ের কুম্ভে যাওয়া সম্বন্ধে খুব সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।" আমি দেখিলাম, ইহার একটা সহজ মীমাংসা হয় যদি আমি কুম্ভে না যাইতে চাই। আমি সেইরূপই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি এক কাজ করিতে পার, কুম্ভস্নানের সময় আমি ভুবনকে লইয়া কুম্ভে যাইব, তুমি বরঞ্চ এ ক'দিনের মধ্যে হরিদ্বার ভ্রমণ করে ফিরে এস, তুমি ২৫শে মার্চ্চ নাগাদ সেখান থেকে ফিরে এসো, তার পর ভুবন ২৯শে তারিখে আমার সঙ্গে যাবে, আর সে আমার সঙ্গে গেলে সেবার সাহায্য হইবে।" আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। আমাকে এক দিন পরেই রওনা হইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বেই হিন্দী ব্রহ্মচর্য্য-সাধন ছাপা হইয়াছে। খান দশেক বই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রাদি লইয়া ২০শে ফাল্গুন রওনা হইলাম।

বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আমাকে জয়দেবপুর হইয়া যাইতে হইল। তথাকার কাজ শেষ করিয়া হরিদ্বার অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িলাম।

একেবারে হরিদ্বার পর্য্যন্ত টিকিট পাইলাম না, মৈমনসিংহ টিকিট পাইলাম। বেলা শেষে মৈমনসিংহ পৌঁছিয়া, তথা হইতে হরিদ্বারের টিকিট কিনিলাম। ভাড়া ১৪৸৵০ আনা। রাত্রে কাওনিয়া জংশনে পৌঁছিয়া তথায় গাড়ী বদল করিতে হইবে। কিন্তু গাড়ীতে এত

ভিড় যে পর পর দুখানি ট্রেন ত্যাগ করিতে হইল। পর দিন বেলা ৯টার সময় তৃতীয় ট্রেন ধরিয়া রওনা হইলাম। গাড়ীতে এমন ভিড় যে বেঞ্চিতে স্থান পাইলাম না। নীচেই নিজের বিছানার গাঁইটের উপর বসিয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই একদল বাঙ্গালী বৃন্দাবন যাত্রী ঐ গাড়ীতে প্রবেশ করিল ও তাহাদের পোঁটলা-পাঁটলী আমার নিকটেই স্তূপীকৃত করিল। তাহা সংখ্যায় ও পরিমাণে এত বেশী যে দরজার পর যে স্থানটুকু ছিল তাহা ভর্ত্তি হইয়া আমার মাথা ছাপাইয়া উঠিল, ঐগুলি ক্রমশঃ গাড়ীর ঝাঁকনে বিশৃঙ্খল হইয়া আমার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল। আমি গত্যন্তর না দেখিয়া তাহার চাপ সহ্য করিয়াই চলিতে লাগিলাম। যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তাহার মধ্যে একটী আবার বৃদ্ধা। তিনি এত মুখরা ও কোন্দলপরায়ণা যে গাড়ীর মধ্যে কোন্দলের দোসর না পাইয়া আমার উপরই বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার দোষ এই যে আমি তাহার পোঁটলার উপর ভর দিয়াছি, তাহাতে তাঁহার দ্রব্যাদি নষ্ট হইবার কথা। তাহার পোঁটলাই যে আমার উপর ভর দিয়াছে তাঁহার এ বিষয় ভাবিয়া উঠা বোধ হয় একান্তই অসম্ভব ছিল। কাণপুর পর্য্যন্ত সারারাস্তাই তাঁহার বাক্যবাণ সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম। লক্ষ্ণৌ আমরা উভয়েই গাড়ী বদল করিতে যাইতেছি এমন সময়ে, সেই বৃদ্ধা আমার বিছানার উপর যথেষ্ট পরিমাণ থুথু ফেলিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এবারে অন্য গাড়ীতে একটু বসিবার স্থান করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্ব্বত্রই লোকের ভিড়। এ গাড়ীতেও এত ভিড় যে অনেকেই দাঁড়াইয়া যাইতেছে। তাহার উপর আবার ২।৪ জন টিকিট না করিয়াই উঠিয়াছে। যখন টিকিটচেকার গাড়ীর এক দিকে টিকিট চেক করিতে লাগিল, তখন তাহারা অন্য দিকে লুকাইয়া রহিল। আবার অন্য দিক যখন চেক করিতে চলিল, তখন তাহারা আবার স্বস্থানে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া রহিল। এক ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্তদের এইরূপ অসাধুতার বিষয় প্রকাশ করিলেও অত ভিড়ের মধ্য হইতে তাহাদিগকে বাহির করা টিকিটচেকারদের সাধ্য হইল না। তিনি গম্ভীরভাবে গাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

লাক্‌সারে গাড়ী বদল করিয়া ছোট গাড়ীতে উঠিতে হইল। তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। ঐ গাড়ীতে উঠিয়া একখানি বেঞ্চ পাইয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। রাস্তায় কয়েকদিন শরীরটাকে লম্বা করিবারও সুযোগ পাই নাই। আজ এই সুযোগ পাইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যখন জাগিলাম, দেখিলাম গাড়ীতে বেশী লোক নাই। শুনিলাম যে হরিদ্বার ছাড়াইয়া আরও দুইটী ষ্টেশন আসিয়া পড়িয়াছি। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। সেই ষ্টেশনে সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় আমার দুর্দ্দশায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাকে একখানি ষ্ট্রেচারে শুইতে দিলেন। সকালে ১০টার গাড়ীতে হরিদ্বার পৌঁছিলাম। তথায় নামিয়া কোথায় যাইব স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক একটী কুলী সঙ্গে করিয়া সহরের দিকে রওনা হইলাম। রাস্তায় একটী সুন্দর ধর্ম্মশালা দেখিয়া তথায় উঠিবার আশায়

গিয়া শুনিলাম, ধর্ম্মশালায় ঘর পাওয়া যায় বটে কিন্তু দ্রব্যাদি ঘরে রাখিয়া অন্যত্র গেলে অপরে তালা ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ করে। দারোয়ানটী স্বতঃপরতঃ আমাকে উপদেশ দিল—"আপনি ভোলাগিরির আশ্রমে যান, তথায় অনেক বাঙ্গালী আছে।" আমার হরিদ্বার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহার পরামর্শমত ও বাঙ্গালী আছে এই আশ্বাসসূচক বাক্যে ভোলাগিরির আশ্রম অভিমুখে চলিলাম। রাস্তায় "গুরুধাম" বলিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে একটী দালানের শীর্ষে খোদিত দেখিয়া উহা অবশ্য বাঙ্গালীর বাড়ী হইবে ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই কয়েকটী বাঙ্গালী বাবুকে পায়চারী করিতে দেখিলাম, বুঝিলাম তাঁহারা এ বাড়ীর কেহ নহে, অতিথি, কুম্ভস্নানে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ উত্তর পাইলাম না। পরে একটী ব্রহ্মচারি বেশী ভদ্রলোককে দেখিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনিই বাটীর মালিক। আমি যতক্ষণ না আমাদের লোকের খোঁজ পাই ততক্ষণের জন্য তাঁহার বাড়ীতে আমার জিনিষ পত্র রাখিবার অনুমতি পাইলাম। কুলীটীকে বিদায় দিয়া আমি স্নানাদি সারিয়া আমাদের লোকের খোঁজের জন্য ব্রহ্মকুণ্ডের কিনারে চলিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম আমাদের ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারে থাকিবার জন্য স্থান লওয়া হইয়াছে। পুল পার হইয়া ওপারে গিয়াই দেখি কুমারানন্দজী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং অধিক খোঁজ-খবর করিতে হইল না বলিয়া আনন্দিত হইলাম। দেখিলাম কুমারানন্দজী আমাদের জন্য গৃহীত ১০০০৲ বর্গফুট জমীর এক অংশে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দুজনে বাস করিতেছেন। কুম্ভকমিটী হইতে তখনও বিশেষ কোন বন্দোবস্ত হয় নাই, তাঁহারা চিন্তায় পড়িয়াছেন, এখন কি করা যাইবে, এমন সময়ে তাঁহারা আমাকে পাইয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। আমার জিনিষপত্র গুরুধাম হইতে তখনই নিজের স্থানে আনিয়া লইলাম। আর ভোলাগিরিজীর আশ্রমে যাইতে হইল না। আমরা তিন জনে সেই কুটীর মধ্যে আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ কুম্ভ কমিটী হইতে গৃহাদি নির্ম্মাণের প্ল্যান, টাকাকড়ি, লোকজন আসিয়া পড়িতে লাগিল; আমরা বেশ দলে-বলে পুষ্ট হইয়া আমাদের প্রবাসের নূতন আবাসে আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। গৃহাদি নির্ম্মাণ হইতে থাকিল। দ্রব্যাদি হরিদ্বারে ক্রমশঃ মহার্ঘ হইয়া উঠায় নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন জ্বালাপুর হইতে খড় বাঁশ ইত্যাদি গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইতে লাগিল। ৮।১০ দিনের মধ্যে ১০।১২ খানি খড়ের ঘর একটী আসন ঘর (মন্দির) অফিস ও ডিস্পেন্সারী ঘর তোলা হইল। সুবেদার সাহেব শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কর্ম্মকর্ত্তারূপে কমিটী হইতে প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি আমাদের ও কুলীদের উপরও সুবেদারী করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার পরিচালনা নৈপুণ্যে শীঘ্রই প্রবাসে আমাদের সকল অভাব অসুবিধা দূর হইতে লাগিল। তিনি কখনও বা কুলীদের লইয়া গৃহ নির্ম্মাণের কাজে ব্যস্ত, কখন বা জ্বালাপুর জিনিষ পত্র আনার বন্দোবস্ত করিতে ছুটিতেছেন, কখন বা সমাগত লোকদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার কাজের অন্ত নাই। আবার

সকলে যখন শুইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত কমিটীতে রিপোর্ট দিবার জন্য পত্র লিখিতে ব্যস্ত। আবার অবসর কালে তাঁহার প্রবাস কাহিনী, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি আমাদের কাছে এমন ভাবে বলিতেন যে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শুনিতে থাকিতাম। তাঁহার "চটকুসে খেঁচো" গল্পটী চিরদিন মনে থাকিবে। যখন তিনি বাঙ্গালী পল্টনে ছিলেন, তখন প্রথম প্রথম তাঁহারা সামান্যমাত্র মাহিনা পাইতেন, তাহাতে তাঁহাদের ভাল করিয়া খাওয়া হইত না। একমাসে তাঁহারা খাওয়ার জন্য মাহিনার অতিরিক্ত খরচ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপরওয়ালা সাহেব এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাওয়ায় তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমরা বাঙ্গালী জাতি, আমরা শারীরিক দুর্ব্বল, আমরা যদি একটু ভাল করে না খাই তাহা হইলে কিরূপে আমাদের বন্দুক 'চটকুসে খেঁচিতে' পারিব?" এই কথায় সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলেন এবং ধীরেনবাবুর উপর প্রসন্ন ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। সে মাসের বাঙ্গালী পল্টনের অতিরিক্ত খরচ সামরিক বিভাগ হইতেই প্রদত্ত হয়। "চটকুসে খেঁচো" এই কথাটী সাহেবের একচেটে ছিল। যখনই তিনি বাঙ্গালী পল্টনকে প্যারেড্ করাইতেন, তখন ঐ কথাটাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন। পল্টনের ছেলেরা বন্দুক অতি ক্ষিপ্রতার ও যোগ্যতার সহিত উঠা-নামা করিলেও, সাহেবের "চটকুসে খেঁচো" এ বুলি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ একটা বাই (mania) ছিল। ধীরেনবাবুর অবশ্য ইংরাজী না যোগানোতেই এই কথা মুখ দিয়া দৈবাৎ বাহির হইয়া যায়, কিন্তু সাহেব তাঁহার এই বিশেষ কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেবার খরচের দায়ে রেহাই দিয়াছিলেন। অন্য এক জন সাহেব কর্ম্মচারী ধীরেনবাবুর সেই কথা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "Your wits have saved you."

এইরূপ যুদ্ধ ও দেশ সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমাদের বিশ্রামকাল প্রকাশে আনন্দে কাটিতে লাগিল। আমরা যে প্রবাসে আছি তাহা মুহূর্ত্তের তরেও মনে হইত না। তার পর তহশিলদার মহাশয়, যিনি মেলার জন্য বিশেষ ভাবে সরকারী কর্ম্মচারিরূপে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি আমাদের সর্ব্ব প্রকারে সহানুভূতি ও সাহায্য করিতেছেন। তিনি আমাদের প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে আপনারা সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্লট পাইয়াছেন। ফণীবাবুকে তিনি Mr. Funny বলিতেন। ফণীবাবু তাঁহার নিকট জমী সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফণীবাবুর কথায় ও ব্যবহারে এতই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার কথা বলিতেন ও তাঁহার খোঁজ লইতেন। যখন তিনি শুনিলেন যে ফণীবাবুও কুম্ভে আসিতেছেন, তখন বলিলেন, "Tell Mr. Funny to bring রসগোল্লা চম্ চম্ and শীতলপাটি।" কারণ বাঙ্গালার এই জিনিষগুলি তাঁহার খুব প্রিয়। তিনি আমাদের ঘরের সম্মুখে অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য জলের কলসীর বন্দোবস্ত দেখিয়া এমনি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীজাতির যে-বিবেকবুদ্ধি আছে তাহা পশ্চিমভারতীয় লোকের নাই।" তিনি প্রথমেই আমাদের দেখিয়া যাইতেন ও নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়া আমাদের বন্ধুর কার্য্য করিতেন।

এখানে আমাদের "কুম্ভ কমিটী" সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। ইতিপূর্ব্বে খড়কুশমা আশ্রমে গত পৌষ মাসে ভক্তসম্মিলনীতে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর ভিতর একটী প্রস্তাব উত্থিত হয় যে এবার সশিষ্য্যে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে কুম্ভে গমন করিতে হইবে। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ বলেন, "আমাকে যদি যাইতেই হয় তাহা হইলে এরূপ বন্দোবস্ত কর, যাহাতে আমরা যে বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে যাইতেছি, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা হয়। ২১৫ জন ভক্ত শিষ্য লইয়া আমি যাইলে আমার যাওয়া হইবে না। তোমরা সকলে গেলে আমি যদি নাও যাই তবুও আমার যাওয়া হইবে। সেখানে আমরা যে কয় দিন থাকিব, আমাদের আসাম মঠকে যেন সেই ক'দিনের জন্য তথায় উঠাইয়া আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হইবে। সেইরূপ দৈনন্দিন পূজা আরতি স্তোত্রাদি পাঠ হইবে। হরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে ও সাধুদিগের ছত্রে ছত্রে গিয়া নগর সংকীর্ত্তন করিয়া আসিতে হইবে। বাঙ্গালী যে কেহ সেখানে প্রসাদ পাইব বলিয়া আসিলে যেন ফিরিয়া না যায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

এ বিষয়ে কি পরিমাণ খরচ পত্র হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আনুমানিক দুই সহস্র টাকার কথা বলেন। স্থির হয় যে এই প্রস্তাব পরামর্শান্তে পুনরায় উত্থাপন করা হইবে, কিন্তু অর্থ সমস্যা থাকায় এ প্রস্তাব ধামাচাপা পড়িয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ উক্ত ভক্ত-সম্মিলনীতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনে তিনটী সাধ ছিল, তার মধ্যে সশিষ্যে কুম্ভে যাওয়া একটী। কুম্ভস্নানের প্রায় এক মাস পূর্ব্বে চিদানন্দজীর মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সাধটী অপূর্ণ থাকিয়া যায়, এ ভাবনা এতই প্রবল হইয়াছিল যে তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, গুরুভাইগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্রের এমনই প্রভাব যে তাহাতে কেহই উদ্বুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সকলেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। তাহার ফলে শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া কুম্ভ কমিটী খাড়া করা হইল। তাহার হিসাবপত্র ও ঝঞ্ঝাট কিন্তু চিদানন্দজীর উপরই ন্যস্ত হইল। তিনি এই সব অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া রাত্রি জাগিয়া হিসাব পত্র ইত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত রহিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশেই ধীরেনবাবুর ন্যায় উপযুক্ত কর্ম্মী সেবক হরিদ্বারে প্রেরিত হইয়াছিল। যে দুই হাজার টাকা ভক্তসম্মিলনীর প্রস্তাবে সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে ততোধিক টাকা অবাধেই সংগৃহীত হইল। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ওপারে ঠিক যেখানে সাঁকো দুইটী শেষ হইয়াছে সেই গঙ্গা ও নীলধারার মধ্যবর্ত্তী "রোরী" নামক দ্বীপের সম্মুখভাগের ত্রিকোণভূমির এক অংশে প্রায় ১০০০০ বর্গ ফুট স্থান ৩০০৲ তিন শত টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর চতুষ্পার্শ্বে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যভাগে আসন ঘর (মন্দির) ও শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের থাকিবার জন্য তাম্বুর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সম্মুখে রাস্তার উপর একটী

বৃহৎ ও সুদৃশ্য গেট করিয়া বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় "আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, মেলা ক্যাম্প" বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। উক্ত প্রবেশদ্বারের উপর পার্শ্বে অফিস গৃহ ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে। সমাগত রোগিগণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইতেছে ও সেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের অভিপ্রায় মত যেন মঠই সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেই নির্জ্জন, বালুর চর এখন পবিত্র দেবভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেবক-ভক্তগণের কলরবে স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় নাম সংকীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠাদিতে ও মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঝাঁজর, ঘণ্টা নাদে স্থানটী অপূর্ব্ব দেব-আয়তনরূপে বিরাজ করিতেছে। দিবারাত্রি দীয়তাং ভুজ্যতাং রব উঠিয়াছে।

নিকটে গঙ্গা ও নীলধারা অপূর্ব্ব কলতানে প্রবলবেগে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়াছে। তাহার স্বচ্ছ ও সুশীতল জল প্রবাহ এবং শিকরসিক্ত বায়ু প্রাণ মন ও দেহের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে। উভয় পারে অসংখ্য সাধু ও ভক্ত সমাগম বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! এই কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে করিয়া ভারতবর্ষের এমন প্রদেশ নাই যাহা হইতে লোক সমাগম না হইয়াছে। কুম্ভ যে কেবলমাত্র সাধু-সম্মিলনী তাহা নহে। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় শ্রেষ্ঠ, উন্নত, জ্ঞানী, ধনী ও ব্যবসায়ীর সমাগম হওয়ায় উক্ত স্থান অপূর্ব্ব মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র ভারতকে দেখিবার ও চিনিবার ইহা অপূর্ব্ব সুযোগ। ভারতের যেখানে যাহা বিচিত্র ও অপূর্ব্ব তাহা এখানে সমাগত। নানা দেশের নানা ব্যবসায়ী বিচিত্র খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সাজাইয়া দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। কেহ বা গানে, বক্তৃতায়, দৃশ্যে সর্ব্ব প্রকারে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে ব্যাকুল। কোথাও প্রদর্শনী বসিয়াছে, কোথাও ধর্ম্মগ্রন্থ বিক্রীত হইতেছে. কোথাও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে, কোথাও মিছিল চলিয়াছে। কোথায় বা সাধুর পঙ্গত বসিয়াছে, কোথায় বা ছাউনী বসিয়াছে। কোথায় কুটীর নির্ম্মাণ, কোথায় বা তাম্বু সমাবেশ। এইরূপে লছমন ঝোলা হইতে কনখল পর্য্যন্ত গঙ্গার দুপারে প্রায় ২০।২৫ মাইল স্থান কেবল লোক সমাবেশ। ক্ষুদ্র হরিদ্বার সহর লোকে লোকারণ্য, রাস্তাঘাট যানবাহনে পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

——:০:——

শ্রুতিস্মৃতি

পশুত্বত্যাগে প্রথমতঃ মনুষ্যত্ব লাভ, তার পর দেবত্বলাভ, তার পর ঈশ্বরত্ব আর অবশেষে ব্রহ্মত্ব লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। যিনি এই ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁতে আর ভগবানে কোনও প্রভেদ নাই। এমন মহাপুরুষের জগতে অভাবও নাই। সুতরাং যাঁতে এই চারটী আদর্শই প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁকেই আদর্শ করে প্রত্যেকের জীবন গঠন করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

*

চিত্তশুদ্ধি না হলে রসতত্ত্বের আদৌ অধিকারী হওয়া যায় না। গোপীভাব, সম্ভোগ ইত্যাদি ভাবাশ্রয় কামকামনাযুক্ত লোকের পক্ষে যে কি ভীষণ, তা বলবার নয়। সোহহং-বাদী সন্ন্যাসীদের পতন অপেক্ষাও এই রসতত্ত্ব-সাধকদের পতনের আশঙ্কা বেশী এবং এতে আরও বেশী অনিষ্ট হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে সাধারণ লোক কিছুই বোঝে না—তারা শুধু স্থূল লীলার অনুকরণ করে। জ্ঞান ছাড়া রসতত্ত্ব বোঝার উপায় নাই।

*

জ্ঞানীর যে কি আনন্দ, তা মুখ ফুটে বলবার নয়। জ্ঞানীর কাছে রাধাকৃষ্ণের মিলনের আনন্দের মত জগতের সকল মিলনের আনন্দই ফুটে ওঠে, আর তিনি দর্শকরূপে সেই সমষ্টি আনন্দ ভোগ করেন। বৈষ্ণবের রসতত্ত্ব সাধনে বিকার আসতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী নির্ব্বিকার। তাঁর সম্মুখে অনন্ত মিলনের খেলা চলছে, কিন্তু আমিত্ব না থাকায় তাঁর কোনও বিকার নাই। তাই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

*

ফুলকে আদর্শ কর। ফুল আপনি ফোটে আবার আপনিই ঝরে পড়ে—দেবসেবায় দিলেও আপত্তি নাই, আবার নারকীয় সেবায় দিলেও আপত্তি নাই। সেবাই তার ধর্ম্ম। রূপের উৎকর্ষ ফুলে রয়েছে, তবুও তার স্বভাব পরকে আনন্দ দেওয়া—নিজের কিন্তু কিছুই নাই—নীরবে ফুটছে, নীরবেই ঝরে পড়ছে। তোমরাও ফুলের আদর্শ নাও—ফুলের মত সকলকে অবিচারে আনন্দ দাও—সেবা কর, নিজের জন্য কিছুই রেখো না—সবই পরের জন্য বিলিয়ে দাও।

*

আত্মবিশ্বাস আর নির্ভরতা—এই দুটী সাধনপথের সহায়।

*

জীবনের লক্ষ্য স্থির না করে কোনও কাজই সফল হয় না। সংসারীই হও, আর সন্ন্যাসীই হও, লক্ষ্য স্থির না হলে কিছুতেই উন্নতি হবে না। প্রত্যেক কাজেই লক্ষ্য স্থির রাখা উচিত। নচেৎ উড়ো উড়ো হয়ে সংসার ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেও কিছু হবে না—কর্ম্মেও কিছু হবে না। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সংসারই কর আর সন্ন্যাসই কর—সব দিক ঠিক হবে। তখন সমস্ত জগৎ

বিরুদ্ধ হলেও লক্ষ্য পথ থেকে নড়াতে পারবে না। গুরু যে সাধন দিয়েছেন, তাতে নিষ্ঠা রেখে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে হবে—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই কথাটী ধারণা করতে হবে। সাফল্য হোক বা না হোক সে দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখবে না। জীবন পর্য্যন্ত পণ করে কর্ম্ম করবে। আজ এটা, কাল ওটা এমনভাবে কাজ করলে কোনটাতেই ফল হবে না।

*

যে সত্যকে আশ্রয় করেছে, তার ভুল থাকলেও ক্রমে ভুল দূর হয়ে তার সত্য লাভ হবে। তাই যে যে পথ ধরেই থাক, সত্যের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ থাকলে নিশ্চয়ই সে সত্যে পৌঁছবে। অসত্যগুলি শরীরের ময়লার মত ঝরে পড়ে যাবে। থাকবে শুধু খাঁটী ভাবটুকু।

*

বাকসংযম না হলে চিত্তসংযম হয় না। বাক্‌সংযমই চিত্তসংযমের পূর্ব্বাবস্থা। সুতরাং কথা বলতে খুব সাবধান ও সংযত হওয়া কর্ত্তব্য।

*

ভালবাসার লোক দূরে থাকলেও আনন্দ—তার স্মৃতিতে বা চিন্তাতেই কত আনন্দ। সতী স্ত্রীর স্বামী বিদেশে থাকলেও তার কথা মনে পড়তেই তার বুকখানা ফুলে উঠে। আশে পাশে কত পুরুষ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কারু দিকে তো তার মন যায় না। ভগবানকে তেমনি ভাল না বাসতে পারলে তাঁকে দেখলেও তেমন আনন্দ পাবে না। আর তাঁকে ভালবাসতে পারলে তাঁর দেখা না পেলেও তাঁর স্মৃতিতেই আনন্দ পাবে। টান ক্রমে বেশী হলে অবশেষে ভগবান দেখা দেবেন। তিনি সহজে ধরা দিতে চান না—ভক্তকে খাঁটী করে তার পর আসেন।

*

হিন্দুদের বীজমন্ত্রগুলি যুগ্মাত্মক। "হরি" এবং "হ্রীং" মূলে একই দাঁড়ায়। হ (শিব) + র (মিলন) + ই (শক্তি) = হরি ; আবার হ (শিব) + (র) মিলন + ঈ (শক্তি) = হ্রী ; হ্রী + ং (নাদবিন্দু) = হ্রীং।

*

ব্রহ্মবিকাশে অন্ধকার আপনা হতে দূর হয়ে যায়, যেমন বহুদিনের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালা মাত্র সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সাধক তখন আত্মহারা হয়ে সমস্ত বস্তুই আলোতে উদ্ভাসিত দেখে আর অবাক হয়ে যায়। তখন আর তার রিপু বা প্রবৃত্তি জোর করে দমন করতে হয় না—ও সব আপনা হতেই দমন হয়ে যায়।

*

লোকে বলে অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু তা আদৌ হয় না। বিশ্বাস কখনও অন্ধ নয়, সর্ব্বদাই চক্ষুষ্মান্। যার বিশ্বাস এসেছে, তারও যে হঠাৎ এসেছে, তা নয়। কত জন্মজন্মান্তর কত বিচার, কত তর্ক করে তার পর তার বিশ্বাস এসেছে। তাই দেখা যায়, একটী বালকের হয়ত অগাধ ভক্তিবিশ্বাস, আর একটী বৃদ্ধের একেবারে তার বিপরীত। আবার বিচার করে দেখ, বিশ্বাস করতে লোকে, ঋষি

বাক্য বা গুরুবাক্যেই বিশ্বাস করে থাকে। সুতরাং বিশ্বাস কখনও অন্ধ হতে পারে না। যার বিশ্বাস এসেছে, তার তো কোনও চিন্তাই নাই। যার বিশ্বাস আসেনি, বিশ্বাস আনবার জন্যই তাকে সাধ্যসাধনা করতে হয়। বিশ্বাসের মত বড় জিনিষ আর কিছু নাই।

*

নিম্নস্তরেই যত ভেদ। যতই উঁচুতে উঠবে, ততই ভেদবুদ্ধি দূর হয়ে যাবে—সব অখণ্ড বলে জ্ঞান হবে।

*

আমি দেহ হতে পৃথক—এইটী উপলব্ধি হলেই মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। কেননা জীবের দেহই নষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। যার মৃত্যু হয়েছে, তার আবার জন্ম হবে—এটা গীতায় ভগবানের কথা। সুতরাং আমার যদি মৃত্যু হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আবার জন্মও হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কোনও দিন জন্মাই নি, কিম্বা কোন দিন মরিও নি কি মরবও না। আমায় মরে কোথায়ও যেতেও হবে না, কারণ যাওয়া থাকলে আবার আসাও আছে। আমার যাওয়া-আসা নাই; আমি জীবন্মুক্ত; এখানেই আমি সব উপলব্ধি করব। এই হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞানীর কথা।

*

সাধারণতঃ একটা সুন্দর জায়গা দেখলেই লোকে মোহিত হয়ে যায়। আর যদি সমস্ত ভারতবর্ষ যুগপৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাহলে সে তো আত্মহারা হয়ে যাবে। তখন কি নিজের ভাবনা থাকতে পারে? নিজের দিকে তখন আদৌ দৃষ্টি থাকে না। এইটুকু দৃষ্টির বিস্তার হলেই এমন হয়, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করলে তখন তো আর কথাই নাই।

*

মহাপুরুষ ছাড়া কেউ মহাপুরুষ চিনতে পারে না। তোমার যতটুকু উন্নতি হয়েছে, ততটুকুই চিনবে। সাধারণতঃ যার যেমন সংস্কার, তার অনুকূলে কথা বললেই লোকে সাধু মনে করবে; আবার বিপরীত কথা বললেই সে হয়ে যাবে অসাধু। নিজের মনবুদ্ধি দিয়ে লোকে সাধু দেখে। সুতরাং নিজে সাধু না হলে কিম্বা সাধুর কৃপা ছাড়া কেউ সাধু চিনতে পারে না। খুব ভক্ত হলেও যে সাধু চিনতে পারা যায়, তা নয়; তবে কিছু কিছু বোঝা যায় মাত্র। ভক্ত যে দিন গুরুতে লয় হয়ে যাবে, সেই দিন সাধুকে চিনতে পারবে।

*

যারা সদ্‌গুরুর সেবার অধিকার পেয়েছে, জানবে, আধ্যাত্মিক জগতে তাদের প্রয়োজন উন্নতি ধরাই রয়েছে। তাদের জন্য সমস্তই সাজানো রয়েছে, শুধু সময় সাপেক্ষ। চিত্তশুদ্ধি হলেই তাদের দৃষ্টি খুলে যাবে।

*

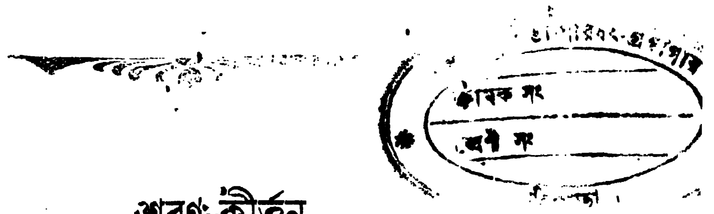
ভগবানকে দেখতে চাওয়াও একটা কামনা। দেখতে চাইলেই তিনি দেখা দেবেন না; কারণ কামনা থাকতে কখনও ভগবানকে পাওয়া যায় না। একমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর ছাড়া—তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ ভগবানের দর্শন পায় না। নিষ্কাম হলে, চিত্ত শুদ্ধ হলে তিনি আপনা হতেই দর্শন দেন।

*

তাঁর ইচ্ছা ছাড়া চোখের পলক পড়ে না—গাছের পাতা নড়ে না—অন্য কাজ তো দূরের কথা। এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু এটা উপলব্ধির বিষয়। সাধারণ জীবকে এ কথা শোনালে চলবে না। অহং নাশ না হলে এ সত্য কেউ বুঝতে পারে না।

*

স্ত্রী-পুরুষ ভাই-বন্ধু এ সব ব্যবহারিক জগতের কথা। মূলে সবাই এক আত্মা, কোনও লিঙ্গভেদ বা সম্বন্ধভেদ নাই। আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী স্ত্রী, মা বোন ইত্যাদি সম্পর্ক আদৌ নাই; সুতরাং পূর্ব্বজন্মের মা এই জন্মে স্ত্রী কি অন্য আত্মীয় হয়ে জন্ম নিতে পারে। যে মা ছিল, সে কখনও স্ত্রী হতে পারে না, এমন একটা কথা চলতি আছে—সেটা ঠিক নয়। কর্ম্মের সংযোগবশতঃ জন্ম হয়, মিলন হয়—এর মাঝে সম্পর্ক বিচার কি আছে?



শ্রবণ-কীর্ত্তন

আসক্তি ত্যাগ ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে এই কথাও বলা হইয়াছে যে আসক্তিত্যাগকে সহজ-সাধ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য বিষয়ত্যাগও প্রয়োজন। তবে কিনা বিষয়ত্যাগকে ত্যাগের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা সাধকের পক্ষেই আদর্শ। যাঁহারা রসিক ও সিদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে নির্গুণ ত্যাগই স্বাভাবিক।

ইহার পর দেবর্ষি অব্যাবৃত ভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাজনেরা ইহাকে অব্যর্থকালত্বরূপ ভাবাঙ্কুর নামে অভিহিত করিয়াছেন। অব্যর্থকালত্বের বিবৃতিও সেই সঙ্গে করা হইয়াছে। তাঁহার প্রসঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা না যায়, ইহাই তাহার নিষ্কৃষ্টার্থ।

এখানে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, শরীরযাত্রা নির্ব্বাহকল্পে যে সমস্ত কার্য্য অত্যাবশ্যক, তাহার সম্পাদন কালে তো সাধককে ভজন হইতে বিরত হইতে হইবে? ভজন বলিতে যদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বুঝি, তাহা হইলেই এই কথাটা উঠিতে পারে। কিন্তু তাহা ভজনের স্থূল অর্থ। অবশ্য নিম্নাধিকারীর পক্ষে অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন, না হইলে তাহার চিত্তে নিষ্ঠা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ভজন বলিতে অন্তরের মাঝে ভাবের ফোয়ারা উৎসারিত করিয়া তোলা—এ কথা কোন ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে, ইহা প্রবর্ত্ত অধিকারীর পক্ষে একটা সমস্যা বটে। কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়া থাকিতে গেলে অনেক সময় চিত্তের গতি, ঔৎসুক্য ভুলিয়া

শৈথিল্য আসিয়া পতন ঘটায়, ইহাও দেখা গিয়াছে। আবার অতিরিক্ত অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে আসল বস্তু চাপা পড়িয়া যায়, ভগবদ্ভজন ও সংসারকর্ম্ম পরস্পরের বিরোধী হইয়া উঠে, ইহাও নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। এই দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য করা কঠিন হইলেও ইহা ছাড়া আর মুক্তিলাভের অন্য কোনও পন্থা নাই।

"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্" অব্যাবৃতভজনের ইহা আদর্শ বটে। ভজন আর তখন কোনও সংসারবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ নহে, উহা অন্তর হইতে অভিব্যক্ত সহজ কর্ম্মেই আত্মপ্রকাশ করিয়া সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু জগন্মাতাকে অন্তরে সর্ব্বদা অনুভব না করিলে কর্ম্মমাত্রই যে তাঁহার পূজা, এ কথা তো সহজে ধারণা হয় না। কতকগুলি জৈব ভাবের মাঝে আমরা অব্যাবৃতভজনের সুন্দর উদাহরণ পাই। সন্তঃপ্রসূত সন্তানের জন্য মায়ের ব্যাকুলতা, পতিসৌভাগ্যবতী নারীর স্বামীর প্রতি ভালবাসা—এইগুলিতে দেখা যায়, ভাব আর কর্ম্মে কেমন সুন্দর সন্ধি হইয়াছে। ঠিক ভগবানের প্রতি এইরূপ স্বাভাবিক প্রীতি উৎসারিত হইলেই অব্যাবৃতভজনের সার্থকতা ঘটিতে পারে।

কিন্তু ইহার পক্ষে প্রথম বাধাই এই যে ভগবান্ আমাদের কাছে শূন্য-স্বরূপ। মা ছেলেকে বুকে চাপিয়া আনন্দ পায়, স্ত্রী স্বামীকে দিনান্তে কাছে পাওয়ার গরবে বিভোর থাকিতে পারে—কিন্তু ভগবানকে এমন করিয়া আমরা কোথায় পাইব? আপনার মনোমত তাঁহার কল্পমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াও যেন প্রাণে তৃপ্তি হয় না—একান্ত সন্নিকর্ষের অভাব চিত্তকে পীড়িত করিয়া রাখে। মনে হয়, স্ত্রী-পুত্র যেমন সত্য, এই ভগবান কি তেমনি সত্য? এ-ও তো কল্পনা! যাহারা একটু বিচারশীল, তাহাদের এই অবিশ্বাসের জ্বালা। আবার যাহারা বিচার না করিয়া ভগবান্ মানিয়া লইতে প্রস্তুত, তাহারাও সাম্প্রদায়িক কোনও প্রতীকে চিত্ত আবদ্ধ করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তি পাইতে চায়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহাদের এই ভাবও কল্পনার মোহ ছাড়া কিছুই নয় বটে, কালে তাহাতে গোঁড়ামী ও অন্ধতা আসিয়া উন্নততর ভজনের পথ অবরুদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু তথাপি চিত্তের এই ক্ষণিক তৃপ্তি একান্ত উপেক্ষার জিনিষ নয়। তবুও স্থূল উপাসনা হইতে চিত্তকে সূক্ষ্মাভিমুখী করিবার জন্য একটা বিশেষ চেষ্টা রাখা প্রয়োজন।

স্থূল ও সূক্ষ্মের সন্ধিতে নামজপের আশ্রয় লইলে সব দিক দিয়া মীমাংসা হয়। অজপা-জপ বা শ্বাস-প্রশ্বাসে ইষ্টমন্ত্র জপ একটী সুন্দর পন্থা। ইহাতে সংসার-কর্ত্তব্যে কোনও ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, আবার অব্যাবৃতভজনেও কোনও বাধা নাই। এইরূপে স্মৃতি এত দৃঢ়মূল হইবে যে নাম শ্বাসের সঙ্গে গাঁথা হইয়া যাইবে এবং অন্তকালে তাহা সাধককে মৃত্যু-গহন প্রদেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

অব্যাবৃত ভজনকে সহজ করিবার জন্য দেবর্ষি আরও একটী উপায় বলিয়াছেন —**লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাৎ**—সংসারে চলিতে ফিরিতে যতক্ষণ পার, ভগবানের গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন কর। কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণ সহজসাধ্য, তাই দেবর্ষি শ্রবণের কথাই আগে উল্লেখ করিলেন। লীলাশ্রবণকে সার্থক করিতে

হইলে শ্রুতিকেও আগে অভ্যস্ত করিয়া নিতে হয়। তার জন্যও কি শুনিব না শুনিব, তাহার বাছাই করিতে হয়। বেদে আছে, "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়ামঃ"—যাহা শুভ, কাণ দিয়া তাহাই শুনিব। ইহারই নেতিমূলক দিক, পাপ-প্রসঙ্গ কখনও শুনিব না, যেখানে সে প্রসঙ্গ হয়, সেখানে থাকিব না। পাপালোচনা শুনিতে শুনিতেও অবশেষে শ্লীলতা নষ্ট হইয়া যায়, কুকথা তখন আর কাণে বিঁধে না। ইহা নৈতিক দুর্গতি বই কি? তাই কুপ্রসঙ্গ শ্রবণ হইতে বিরত হইয়া কর্ণকে শুদ্ধ করা প্রথমতঃ প্রয়োজন। তার পর সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণে তাহাকে অভ্যস্ত করা।

আজকালি মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে শ্রবণটা চাক্ষুষ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। যাহার যাহা বক্তব্য, সে তাহা ছাপাইয়া দেয়, আমরা চোখ দিয়া সেগুলো শুনি। সুতরাং আজকালকার উপযোগী ব্যাখ্যা করিতে হইলে ঋষিব্যবস্থিত শ্রবণকে অধ্যয়নেরও উপলক্ষণস্বরূপ ধরিতে হইবে। হরিকথা শুনাইবে, এমন লোক আজকাল কোথায়? কিন্তু কলির প্রভাবে কুগ্রন্থের অভাব কোথায়ও হইতেছে না, বরং তাহার প্রচার দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এইগুলিকে সযত্নে বর্জ্জন করিয়া চলা উচিত। তার পর সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন। শ্রবণের অনুকল্পে ইহা দ্বারাই আজকাল চিত্ত শুদ্ধি করিতে হইবে। অবশ্য বলিয়া রাখা ভাল, জীবন্ত মানুষের মুখের কথা আর মরা পুথির পাতার আঁচড়ে অনেক তফাৎ। কিন্তু কেন জানি না, কুগ্রন্থের বেলায় আবার এই নিয়মটা খাটে না—সেখানে মানুষ মুখ ফুটিয়া যা না বলিতে পারিত, কলমের আগায় অনায়াসে তাহা বাহির করিয়া দেয়। এইখানে সাধু সাবধান।

এই তো গেল সাধারণ ভাবে শ্রবণের কথা। শ্রবণের মাঝে একটা মাধুর্য্যও আছে, যাহার আস্বাদন ভাগ্যবানরাই পাইয়া থাকেন। একটা উদাহরণ দিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। ছেলে যখন প্রথম বাপ ডাকিতে শিখে, তখন ছেলের মুখে সেই ডাক শুনিয়া মায়ের মনে যে হর্ষ ও লজ্জামিশ্রিত পরমানন্দের উৎপত্তি হয়, শ্রবণজনিত সেই সুখ বাস্তবিকই অতি দুর্লভ। মা নিজমুখে প্রিয়জনকে ডাকে না, কিন্তু প্রিয়জনের মুখে সেই ডাক শুনিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। ভগবানের কথাও তেমনি ভক্তের মুখে শুনিতে পাইলে রসিকের প্রাণ পুলকে এলাইয়া পড়ে। এই শ্রবণ শুধু সাধকের কাম্য নয়, সিদ্ধেরও বিলাস বটে। মরমী পাঠক অনুভবে তাহা বুঝিয়া লইবেন। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা বহু সৌভাগ্যের ফল বলিতে হইবে।

শ্রবণ-কীর্ত্তন পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গ-ভাবে যুক্ত বটে, কিন্তু সাধনাঙ্গ হিসাবে বিচার করিলে শ্রবণের পর কীর্ত্তনের স্থান। ভিতরে ভাবের আবেশ না হইলে কীর্ত্তনে রুচি হয় না। মহাজনেরা এই ভাবাঙ্কুরের নাম দিয়াছেন—নামগানে সদারুচিঃ। "আসক্তি-স্তদ্‌গুণাখ্যানে"—ইহাকেও কীর্ত্তনাঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

কীর্ত্তন সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। বাঙ্গালীজাতির প্রতি মহাপ্রভুর ইহা এক অপূর্ব্ব দান। কীর্ত্তনের লোকাভিভাবী শক্তি অলৌকিক। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালেই প্রাথমিক সাধনাঙ্গ হিসাবে কীর্ত্তনের সমাদর যথেষ্ট

হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কি ভাবোদ্গারে, কি লোকসংগ্রহে, কি শিল্প-নৈপুণ্যে ইহার যেরূপ উৎকর্ষসাধন হইয়াছে, অন্যত্র কোথায়ও সেরূপ হইয়াছে কিনা জানি না। তবে সংঘোপাসনা হিসাবে কীর্ত্তনের স্থান নিরূপণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিগত সাধন হিসাবে কীর্ত্তনের উপযোগিতাই আমাদের বিচার্য্য।

কীর্ত্তনের আভ্যন্তরীণ রূপ অজপাজপের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করাও কীর্ত্তনের অঙ্গ এবং উহা সহজসাধ্য বটে। উষায় ও সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভাবে একত্র হইয়া ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করা ভক্তদার্চ্যের এক অতি সুগম পন্থা। সন্ধি-সময়গুলির প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। প্রাতঃসন্ধ্যার কীর্ত্তনে চিত্তপ্রসাদ ও সায়ংসন্ধ্যার কীর্ত্তনে আত্মসমর্পণের ভাব জাগাইয়া তুলিবে। এই দুইটীর অন্তরালে মানুষের সংসারকর্ম্ম ও বিশ্রামের সময়। যদি আদি ও অন্তে ভগবানের সহিত সংযোগ থাকে, তাহা হইলে কর্ম্ম ও বিশ্রাম উভয়েরই পুষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মেই সহজে গুণক্ষয় হয়।

এইরূপ সাময়িক কীর্ত্তন ছাড়া সমস্ত দিনরাত্রির অবকাশ মধ্যে ভগবানের কোনও বিশিষ্ট নাম উচ্চারণ অভ্যাসগত করিয়া লইতে পারিলে বিশেষ উপকার দেখা যায়। মানুষের মন সর্ব্বদাই আন্দোলিত হইতেছে। এই আন্দোলনের মাত্রা অধিক হইলেই উহা স্বতঃই ভাষা ও কর্ম্মে ফুটিয়া উঠে। এই জন্য দেখা যায়, মনের আবেগে মানুষ অজ্ঞাতসারেও নিজ নিজ অভ্যাসানুযায়ী "মা গো"—কি এমনি একটা কিছু বুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে। এই বোলগুলি যদি ইষ্টের বাচক হয়, তাহা হইলে উপকার বেশী হইবে। আপনা হইতেই তখন আবেগের সহিত ভগবানকে স্মরণ ও তাঁহাতে সমস্ত সমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিবে।

ইহা ছাড়া কীর্ত্তনের আর এক রূপ আছে, ইষ্টগোষ্ঠী করা। যাহাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন রহিয়াছে, তাহাদের প্রীতির মূল নিদান যদি গুরু বা ভগবান হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত সময় সময় একত্র হইয়া ইষ্ট প্রসঙ্গ করিলে যেরূপ অনুপম আনন্দ পাওয়া যায়, সেরূপ উপকারও হয়। দশজনে মিলিয়া গল্প-গুজব করা মানুষের একটা স্বভাব। কিন্তু এই আলাপ-আলোচনা যথা সম্ভব ইষ্ট বিষয় লইয়াই হয়, তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি অবান্তর প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সাধক কৌশলে তাহার মোড় ফিরাইয়া দিয়া আবার ইষ্ট কথাতেই পর্য্যবসিত করিতে শিক্ষা করিবেন।

সংসারের কাজ কর্ম্ম ইত্যাদি করিতে করিতেও যতটুকু শ্রবণ-কীর্ত্তন স্বচ্ছন্দে করা যাইতে পারে, তাহারই কয়েকটী সুপরিচিত উপায় মাত্র এখানে উল্লেখ করা হইল। শ্রবণ কীর্ত্তনের ইহা অপেক্ষা উন্নততর রূপ অবশ্যই বর্ত্তমান। প্রয়োজনক্রমে তাহা সাধকজীবনে স্বতঃই আবির্ভূত হইবে।

—*—

দেশের ও দশের কথা

বৎসর আসে, বৎসর চলিয়া যায়—আমরা শুধু উদাসীনের মত তাহার দিকে চাহিয়া থাকি। পুরাতন বৎসরই বা আমাদের কি নিয়া যায়, নব বর্ষই বা কি দিয়া যায়? যে জাতি দিন দিন কৌপীনমাত্রৈকসম্বল হইয়া পড়িতেছে, পুরাতনের বিদায়ে বা নূতনের অভিনন্দনে তাহার কিছু মাথা-ব্যথা আছে কি? দিন গুণিয়া বছরের হিসাব রাখিয়া সুখ হয়, যদি দেখি, জাতীয় জীবনের একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে, একটা বিশিষ্ট সাধনা আছে। সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা তখন চিত্তে বিচিত্র রঙে আশার ফুল ফুটাইতে থাকে, ভাবের অঞ্জন চোখে মাখিয়া নূতনকে বরণ করিয়া নিতে তখন সাধ যায়। কিন্তু যে জাতির সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমান হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহার মাঝে রস কোথায় যে সে বরণডালা সাজাইয়া বসিবে? বাস্তবিক ব্যক্তিগত জীবনের ঔদাসীন্যকে হয়ত সহা যায়, কেননা গাছের এতগুলি সবুজ পাতার মাঝে দুটা একটায় যদি হলদে রং ধরে, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না—হলদে পাতাটী ঝরিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সবুজের কুশী দেখা দেয়। কিন্তু যদি হঠাৎ সমস্তটা গাছই হলদে হইয়া উঠে, তাহা হইলে প্রবল বৈরাগ্য-সাধনাকে প্রাণ-ঘাতক বলিয়া ভয় না করিয়া তো চলে না। আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনটাই যেন এমনই একটা প্রচণ্ড স্থবিরত্বের কালগ্রাসে ধীরে ধীরে তলাইয়া যাইতেছে প্রাচীনের বুকে নবীনকে আবাহন করিয়া আনিবে, সে শক্তি সে মাদকতা কোথায়? তাই "উদাসীনবদাসীনঃ" হইয়া বলিতে হয়—বছর আসে, বছর যায়, আমাদের তাহাতে কি?

*

বছর ভরিয়াই হিন্দুকে লড়াই করিতে হইয়াছে। তাহাতে জয় লাভ করা তাহার ভাগ্যে ঘটিল কি? বছরের গোড়াতেই দেখি হিন্দু-মুসলমানের প্রচণ্ড বিক্ষোভ। কে বলিবে, আজ সাত শত বছর ধরিয়া ইহারা এক সঙ্গে ঘর করিতেছে, একই দেশের অন্ন-জলে মানুষ হইতেছে—তাহাদের এক আশা, এক ভাষা—ঝিমুনীর ধরণটাও এক, দুর্ভিক্ষে ম্যালেরিয়ায় নির্ব্বিবাদে উৎসন্ন হইয়া যাওয়ার কায়দাটাও এক! এক জন আছেন পরপারের পাথেয় সঞ্চয়ে একান্ত ব্যস্ত, অথচ ইহকালের গোনা দিন কয়টা কাটিতেছে—শুধু বুভুক্ষায় লালসায়, পরের গোলামীতে। আর একজনের সিরতাজ কবে খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও রুমের বাদশাহীর স্বপন দেখিয়া ঘুমের ঘোরে "কেয়াবাৎ" বলিয়া উঠিবার অভ্যাসটা যায় নাই! পেটের জ্বালায় হিন্দু আজ আমেরিকায়, আফ্রিকায় গিয়া গোরাঙ্গের দুয়ারে মাথা কুটিয়া মরিতেছে—পেট ভরিতেছে না; মুসলমান গোসা করিয়া ইস্তাম্বুলের এলাকায় ঘর বাঁধিতে ছুটিতেছে—গুঁতা খাইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেও হইতেছে। অথচ ঘরে আসিয়া এ ইহার দাড়ি উপড়াইতেছে, ও উহার টিকি ছিঁড়িতেছে—বলিতেছে, "দেখ্, আমার ধর্ম্মকে যদি বড় না বলিস্ তো—"

বিধাতা এ কি নিদারুণ প্রহসন রচনা করিয়াছেন!

*

হিন্দু মুসলমানের রাতারাতি মিলন ঘটাইবার জন্য নেতারা কত চেষ্টাই করিলেন। হিন্দু খিলাফতের চাঁদা আদায় করিল, মুসলমানকে এক সঙ্গে লইয়া খানা খাইল, চাকরীর বখরা দশ-আনা ছ'আনা করিল—কিন্তু হায়রে, সকলি বৃথায়! একবার রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, মহাত্মা মারাত্মক সরলতার বশে হিন্দুদের মুসলমানের হাতে তুলিয়া দিলেন—ইহার ফল ভাল হইবে না। হিন্দু-মুসলমানের তখন অনুরাগের গাঙে নূতন জোয়ার আসিয়াছে—দুই দলই এ কথা শুনিয়া মহা খাপ্পা। কিন্তু আজ চালাকীর মিলনের ফল চারিদিকেই দেখা দিয়াছে। দুর্ব্বলে সবলে কখনও মৈত্রী হয়—"ভেড়িয়া-ভেড়ে" সন্ধি হয়? কাগজে-কলমে হিন্দু চিরকাল বলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ধর্ম্ম-প্রাণতার তুলনা কোথায়ও মিলিবে না। আজ মুসলমানও বড় গলায় সেই কথাই বলিতেছে। অথচ এক জন ধর্ম্মের নামে অপরের টুঁটি চাপিয়া ধরিতেছে, আর এক জন শালগ্রামশিলা ফেলিয়া পিতৃপুরুষের নাম লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইতেছে। ধর্ম্মের জয় উভয়তঃ! মন্দিরে কে ঢুকিতে পারিবে না পারিবে, তা নিয়া কাশীর পণ্ডিতেরা প্রকাণ্ড সভা করিলেন, অনেক অনুস্বার বিসর্গের শ্রাদ্ধ হইল—অস্পৃশ্য হিন্দুকে দেহের অস্পৃশ্য অঙ্গের সহিত তুলনা করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী উদারতা ও শ্লীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কিন্তু আজ যখন দেবমন্দির কলুষিত হইতেছে বলিয়া চারিদিক হইতে সম্বাদ আসিতেছে, তখন অস্পৃশ্যতা সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য একটী পণ্ডিতেরও টিকি দেখা যাইতেছে না কেন? তারকেশ্বরের শুদ্ধির সময় বহু আড়ম্বর করিয়া সত্যাগ্রহ চলিল, হিন্দু নিজের জয়ঢাক নিজেই বাজাইল (আজ আবার কেলেঙ্কারীর কথাও শুনিতে পাইতেছি)—কিন্তু এখন দেবতার মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য একটী ছোটখাট সমিতিও গড়িয়া উঠিতেছে না কেন? আসল কথাটা হইতেছে—আমরা "গেহেনর্দ্দী"র জাত; ভাইকে ঠেঙ্গাইয়া আত্মকলহ করিয়া বীররসের পরিচয় দিই। পরের বেলায় বলি—"ক্ষমাই সাধুর লক্ষণ!"

*

মুসলমানকে রুটীর ভাগ বেশী করিয়া দিয়া হিন্দু তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে চাহিয়াছিল, আজ সে জেদ ধরিয়াছে, রুটীর ভাগও যেমন লইবে, বেটীর ভাগও তেমনি লইবে। হিন্দুর দেশে মুসলমান ছিল অতিথি; তখন অতিথি-সৎকারের কি রেওয়াজ চলতি ছিল, ইতিহাসে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। আজও সেই সনাতন অতিথিবৎসল জাতি রুটী-বেটীর ভাগ হইতে অতিথিকে বঞ্চিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে বুঝি। হিন্দু নারীর সতীত্ব গৌরবের জিনিষ; এর প্রতি রাজনৈতিক হিসাবে একটু কটাক্ষ করিয়া বাংলার লাট পর্য্যন্ত এই সে দিন বাংলার বিশ্বকবির কাছে বড় গালটাই খাইলেন। কিন্তু সতীর মর্য্যাদা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাগজে কলমে রক্ষা করা চলে, ততক্ষণই ভাল, কেননা তাতে পিঠটা মাথাটা নিরাপদে থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার ভার দৈবের উপর ছাড়িয়া দিলে

তো পয়সা খরচ নাই! নারীকে সতী-সাধ্বী বানাইবার বয়েদ আওড়াইতে হিন্দু খুব মজবুত; তার পর নিজেদের বহু আয়াসে গড়া "সবলা অবলা" গৃহলক্ষ্মীদের দুর্বৃত্তের হাতে ছাড়িয়া দিয়া পলাইতেও তাহার দক্ষতা অসাধারণ; আবার তাহার বিশেষ সদ্বিবেচনার পরিচয় পাই, যখন হিন্দু সমাজপতি সাজিয়া নারীত্বের চির অবমাননার দুঃখ অভাগিনীদের মাথায় চাপাইয়া তাহাদের খেদাইয়া দেয়। সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, এক নীতি—"বল পরীক্ষাটা দুর্ব্বলের উপর করিও; আর ধর্ম্ম রক্ষাটা করিও বিনা খরচে।" ধর্ষিতা নারীদের নিয়া খ্রীষ্টান মিশনারী উদ্ধার আশ্রম খুলিতে পারে, আর হিন্দু পাপ বিদায় করিয়া সমাজকে শুদ্ধ রাখিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করে! এমন সমাজ যদি বিধাতার হাতে মার না খায়, তবে মার খাইবে কে?

*

নারীর প্রতি অত্যাচারের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ সে দিন লইল খড়্গ সিংহ বাহাদুর। বাঙ্গালার শিক্ষিত নারীদের পক্ষ হইতে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নানা প্রকার চেষ্টা চলিতেছে, ভালই। সকলেই বলেন, "যদিও তাহার হত্যার সমর্থন কিছুতেই করিতে পারি পারি না, তথাপি তাহাকে বীর বলি বটে।" আমরাও বলি, নিঃসম্পর্কীয়া রাজকুমারীর প্রতি অত্যাচারকে, সমগ্র নারীজাতির প্রতি এবং স্বজাতির প্রতি অবমাননা মনে করিয়া সে যে প্রতীকারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল —ইহা তাহার বাহাদুরী বটে। তাহার এই মহাপ্রাণতা আমাদের চোখে এমনই অনভ্যস্ত ঠেকে যে তাহাকে হিন্দু বলিয়া আপনাদের দলে টানিয়া আনিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, —নেপালী বলিয়া তাহাকে দূরে রাখিয়া বিস্ফারিত লোচনে তাহার বীরত্বের তারিফ করিতেই ভাল লাগে। হত্যাকে শ্রেফ্ হত্যা বলিয়া অননুমোদনের দৃষ্টিতে দেখাটাও বর্ত্তমান গীতাপন্থীদের পক্ষে কতখানি সুসমঞ্জস হয়, বলিতে পারি না। এরূপ ক্ষেত্রে আঘাত না করিয়া অত্যাচারীর পিঠে হাত বুলাইয়া বা ধর্ম্মের কাহিনী শোনাইয়া তাহার মতিগতি শোধরানো সম্ভব পর কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়। খড়্গসিংহ নারীর অপমানকারীর প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছে, তাহা হিন্দু ক্ষাত্রনীতি অনুযায়ী গুরুতর বা অসঙ্গত বলা চলে না—নজীর কীচক বধ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে খড়্গ সিংহকে আমরা হিন্দু সমাজের গণ্ডীতে আনিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি, সে ক্ষেত্রে হিন্দুর ক্ষাত্র নীতির তরফ হইতেই আমরা বলিতে পারি, তাহার বিহিত দণ্ড উপযুক্ত হইলেও সুপ্রযুক্ত হয় নাই; অত্যাচারীকে অতর্কিতে আক্রমণ করাটা বীর নীতির বিরুদ্ধ। এত বড় মহাপ্রাণতার কাজটার মধ্যেও খড়্গসিংহের জাতিসুলভ মনোবৃত্তি কিরূপ ভাবে ক্রিয়া করিয়া তাহার বীরত্বের মাঝেও কাপুরুষতার ছাপ মারিয়া দিয়াছে, তাহাও বিচার করিতে হইবে।

*

হিন্দুর প্রাণের উপর, তাহার প্রাণাধিক প্রিয় ও রক্ষণীয় মা-বোনের উপর আঘাতের পর আঘাত আসিয়া পড়িতেছে। এরূপ স্থলে অর্জ্জুন-বিষাদ যোগের পুনরভিনয় করাটা নিতান্তই অস্বর্গ্য ও অকীর্ত্তিকর ক্লৈব্য। কিন্তু হিন্দু করিবে কি? অপরের প্রাণ হরণ

করিবে, না পরের ঘরের মেয়ে কাড়িয়া আনিবে ? হিন্দু তাহা করিতে পারে না ; আজ দুর্ব্বল বলিয়াই যে পারে না, তাহা নয়, সবল হইলেও পারিত না ; কেননা ইহা তাহার প্রকৃতি ও শিক্ষার বিরুদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া সবল হইয়া আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতাটুকুও যে অহিংসনীতির যূপকাষ্ঠে বলিদান করিতে হইবে, ইহাই বা কোন্ শাস্ত্রে লিখে ? আত্মরক্ষার অধিকার ও প্রচেষ্টা সকলেরই আছে ; হিন্দুরও যে নাই, তাহা বলিতেছি না ;—তবে কিনা বর্ত্তমানে তাহার নীতিটা হইতেছে—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি !" দেবভাষায় এই মনোবৃত্তি নিবদ্ধ করিয়া যে কুলাঙ্গার দেবভাষাকে কলঙ্কিত করিয়াছিল, সে বোধ হয় কল্পনাও করে নাই, এক দিন এই নীতিকেই হিন্দু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবে। আত্মরক্ষার এমন কদর্য্য অর্থকরণে হিন্দু অভ্যস্ত হইয়াছে যে আজ এই বিপ্লবের দিনে যদি কেহ আত্মরক্ষার কোনও উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতেও চায়, অমনি পণ্ডিতমণ্ডলী সনাতন ধর্ম্মের গায়ে ইহাতে কতটুকু আঁচড় লাগিল তাহারই গবেষণায় ব্যস্ত হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও মনোভাব এমনই উৎকট যে তাহা দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব, তাহা স্থির করিতে পারি না। শুদ্ধি ও সংগঠন তো মানব ধর্ম্ম নয় ; যেহেতু সনাতন ধর্ম্মের পাঁতিওয়ালারা যে এখনও তাহার পাঁতি দেন নাই !

*

কাফেরকে মারিয়া বেহেস্তে যাইবে, এই ভাবিয়া আবদুলরসিদ ছল করিয়া বৃদ্ধ, রুগ্ন, পরম সাধু শ্রদ্ধানন্দজীর বুকে গুলি মারিল ; আবার বিচারালয়ে গিয়া কৃতকর্ম্মের ফল এড়াইবার জন্য পাগলামীর ভাণও করিল ! যে দেশের লোক ছলনা দ্বারা, গুপ্তঘাত দ্বারা, কাপুরুষতা দ্বারা ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দেয়, সে দেশকে আধ্যাত্মিক না বলিয়া উপায় নাই। শ্রদ্ধানন্দজীর মৃত্যুতেও যে হিন্দু সমাজের কোনও চেতনা হইবে, তাহাও নয় ; বিশেষতঃ তিনি কাঁটায় কাঁটায় হিন্দু ছিলেন কিনা, সে নিয়াও একটা তর্ক উঠিয়াছে। এই একটা ব্যাপারেই প্রমাণ হয়, পার্থ-সারথীর কর্ম্মভূমিতে আজ কি পরম শান্তিময় ক্লীবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে আর হিন্দু মুসলমান বাছিবার উপায় নাই। ধর্ম্ম নিয়া ঝগড়া একটা বাজে কথা মাত্র—সর্ব্বত্রই দেখি জাতীয় স্বভাবই প্রবল। কুরুক্ষেত্রের পর কৌরবপক্ষ মরিয়া হইয়া উশৃঙ্খল নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, পঞ্চ পাণ্ডবকুমারের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিল। এ দেশের লোকের পক্ষে এখন তাহাই নজীর হইয়াছে —ইহাতে আর হিন্দু মুসলমান ভেদ করিবার নাই। মুসলমান আড়াল হইতে চিমটী কাটিতেছে, হিন্দু শুধু চ্যাঁচাইয়া মরিতেছে —উভয়ত্রই সমান পৌরুষের পরিচয়। এক ম্যাকস্যুইনী মরিয়া সে দেশে প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল ; এ দেশে এখনও গান্ধীজীর চৌদ্দ বছর নিরম্বু উপবাসেও কিছু হইবে না—দশ বিশ জন শ্রদ্ধানন্দের শোণিতাঞ্জলিতেও কিছু হইবে না। দু দিন হৈ চৈ তার পর সব চুপ।

*

বিলাতী ফুড গুলির বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর যতই থাকুক না কেন, যে ছেলেকে মাতৃস্তন্য

হইতে বঞ্চিত হইয়া শুধু ফুড্ গিলিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহার প্রাণশক্তি কিছুতেই সব দিক দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। আমাদের দেশে শিক্ষানীতিতে কর্ত্তার ইচ্ছায় বিলাতী ফুডের ব্যবস্থাই চৌদ্দ আনা। এক আনা বাংলা আর এক আনা সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল। তাও মাতৃস্তন্যকে শোধন করিবার জন্য বিষ সাহেব একবার রোমান হরফ চালাইবার ফিকির করিয়াছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্য, এমন সাধু উদ্দেশ্যটা ধোপে টিকিল না। এইবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা একটা অনুকল্পের ব্যবস্থা করিতেছেন। সংস্কৃত চিরকাল উপ-ভাষার আসনে থাকিয়াও কোনও রকমে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া টিকিয়া ছিল। এইবার প্রস্তাব হইয়াছে, ছেলেদের কোমল মস্তিষ্কে অনুস্বার-বিসর্গের দাণ্ডাগুলি চালাইয়া উহাদের মাথা জখম করা কেন, ও ফ্যাসাদ হইতে উহাদিগকে রেহাই দিলে বেচারারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। আমরা কর্ত্তৃ-পক্ষের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারি না। সংস্কৃতকে তাঁহারা গ্রীক লাটীনের কোঠায় ফেলিয়াই এই মতলব বাহির করিয়াছেন। স্পেন্সার কার্য্যকরী শিক্ষাপদ্ধতির খাড়া করিতে গিয়া classical language উপর একচোট ঝাল ঝাড়িয়াছেন—সেইটাই আমাদের দেশেও নজীর হইবে, ইহাই তাঁহাদের মনোভাব। কিন্তু এই কয়টা কথা কি তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন না যে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার যাহা কিছু দিবার ছিল, Renaissanceএর যুগে ইউরোপ তাহা একেবারে শুষিয়া নিয়াছে; গ্রীক রোমান সভ্যতার গায়ে যে ইউরোপীয় সভ্যতার পরগাছা গজাইয়াছিল, আজ তাহা পুরাতন গাছটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ভাবে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার কাছ হইতে নূতন কিছু পাইবার আর আশা নাই। তাই প্রাচীন সভ্যতা আজ নবীন ইউরোপের কাছে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয়। তার পর যে কোনও ইউরোপীয় ভাষার মারফতে গ্রীক রোমান সাহিত্য আয়ত্ত করাও সে দেশে কঠিন নয়। বলিতে গেলে সমস্তটা প্রাচীন সাহিত্যই তাহারা নিজেদের জাতীয় সাহিত্যে অবিকল তুলিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতের বেলাতেও কি তাই হইয়াছে? যে মুষ্টিমেয় আলোক প্রাপ্ত শিক্ষিতেরা সাগরপারে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সংস্কৃতের সহিত তাঁহাদের কারবার না রাখিলেও চলে।—তাঁহারা Bibliotheca Indica র অনুবাদ পড়িয়া খুসী থাকিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুয়ানীর গর্ব্বটা এখনও কোনও রকমে যাহারা জীয়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কি গতি হইবে? এখনও যে হিন্দুকে পিতৃপুরুষের দোহাই দিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। হিন্দুসভ্যতার প্রাণপুরুষ যে এখনও দেবভাষার মমতা ছাড়িয়া বিজাতীয় বুলি কপচাইতে শিখেন নাই। জাতীয় জাগরণের দিনে আজ কোথায় বিশেষ করিয়া দেব-ভাষারই অনুশীলন চলিবে, সংস্কৃত ছাড়াও পালি-প্রাকৃতের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইবে, প্রাচীন গৌরবের অধ্যায়গুলি উদ্ঘাটিত হইবে—তাহা না করিয়া কর্ত্তাদের এ কি বিভীষণ লীলা! তাও যদি বুঝিতাম, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কৃত শিক্ষার দরুণ কর্ত্তাদের অর্থব্যয় শক্তিব্যয় করিয়া শেষকালটায় হাল ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে! এক তো মেট্রিক পর্য্যন্ত সংস্কৃতের ব্যবস্থা—তাও আবার গিলো-

প্রদেশ পঞ্চতন্ত্রের সোয়া পাঁচ আনা রকমের বিদ্যা—তাহে বার টাকা মাইনের একটী জীর্ণ শীর্ণ গোবেচারী পাণ্ডিত সংস্কৃতের কপালে এত সুখে বুঝি কর্ত্তাদের চোখ টাটায়!

*

"যে যত দুর্ব্বল, তার ভিতর বিদ্বেষবুদ্ধি তত প্রবল। এই বিদ্বেষবুদ্ধি যখন আবার স্বদেশ-হিতৈষণার মুখোস পড়িয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার তুল্য শত্রু আর হইতে পারে পারে না। আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ অতি প্রবল;—এমন কি আমরা সাধু বলিয়া, বসুধৈব কুটুম্বক নীতির দোহাই দিয়াও ছোবল হইতে রেহাই পাই না। কিছু দিন হইল, আমরা আমাদের কৃষি বিভাগের তরফ হইতে একটী নৈশবিদ্যালয়ের পত্তন করিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার অনুরূপ চেষ্টা করিয়াও আমরা সফলকাম হইতে পারি নাই। এইবার কিন্তু কতকগুলি প্রবাসী হিন্দুস্থানী ছেলেপিলের আগ্রহে বিদ্যালয়টা টিকিয়া যায়। তাহাদের দেখাদেখি কয়েকটী আসামী ছেলেও বিদ্যালয়ে আসিতে থাকে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই ছেলেরা স্কুলে যাতায়াত বন্ধ করে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, এক জন স্বদেশ-হিতৈষী প্রবীণ ব্যক্তি এই মধ্যে অভিভাবকদের উপর এক ফতোয়া জারী করিয়াছেন যে, "ইহারা বিদেশী, ছেলেদের বাঙ্গালী বানাইয়া ভাটীতে চালান দিবে —খবরদার, ইহাদের ওখানে ছেলে পাঠাইতে পারিবি না।" অথচ এই স্বদেশী লোকটী এক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক। এ দেশে কৃষিই লোকের উপজীবিকা—ছেলেদের দিনে পড়াশুনার সুবিধা হয় না। নৈশবিদ্যালয়ে দূর দূরান্তর হইতেও ছেলেরা দল বাঁধিয়া আসিতে চায়—কিন্তু স্বদেশীয়ানার বিড়ম্বনা! এমনি ধারা স্বজাতি-বৎসলতা না থাকিলে কি দেশের উন্নতি হয়?

*

বৎসরের মাঝামাঝি কৌলাচার্য্য শ্রীমৎ রামদাস পরমহংস স্বাক্ষরিত কয়েকখানি পত্র ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি আমাদের হস্তগত হয়। পাঠে অবগত হইলাম, মহাকাল পশুপতিনাথের আদেশে ইনি ব্রহ্ম-গায়ত্রী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহস্থাশ্রমের উদ্ধার ও সাধু-সন্ন্যাসী সংহার করিবার জন্য হিমালয় হইতে নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পত্রগুলি এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তিতে পরিপূর্ণ যে তাহা পাঠ করিয়া হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। অথচ রহস্য এই, আমাদের দেশেরই কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত পরমহংসজী যে এক জন সাধু-পুরুষ, সে বিষয়ে লম্বা সার্টিফিকেট দিয়াছেন। এই খানেই আমরা একটা ধাঁধায় পড়িয়াছি। এ দেশে অবতার হওয়ার একটা নাস্তিক আছে; কিন্তু এই পর্য্যন্ত সমস্ত অবতারকেই আমরা স্বয়ং প্রতিষ্ঠ বা দেবাদিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছি এখন ভিতরে যাহাই থাকুক না কেন। কিন্তু পণ্ডিতের সার্টিফিকেট লইয়া পরমহংসাবতার—একেবারে নয়া চিজ্, ইহা বলিতেই হইবে। আমরা জানি সাধু-পরমহংসের পায় কত গণ্ডায় গণ্ডায় শাস্ত্র পণ্ডিত গড়াগড়ি যায়; কিন্তু কলির কি আশ্চর্য্য প্রভাব, মহাকাল পশুপতিনাথকেও তো সে রেহাই দেয় নাই। নহিলে আজ হঠাৎ তাহার আত্ম-অবিশ্বাস এত প্রবল হইবে

কেন যে তাঁহার "পয়গম্বরকে" হুকুমনামা দিয়া পাঠাইয়াও তাঁহার ভরসা হয় নাই—পেছনে আবার গোটাকতক পণ্ডিতের সার্টিফিকেট আঠা দিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন! এমন অবতার দিয়া ভারতোদ্ধার হইবে বলিয়া যদি মহাকাল আশা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সম্প্রতি তিনি গাঁজার মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য.

বিগত পৌষমাসের ভক্তসম্মিলনীতে মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব ঘোষণা করিয়াছিলেন, "নানা কারণে আমি পরিশ্রান্ত ও অসুস্থ; সুতরাং আমি বাকী জীবন বিশ্রাম গ্রহণ করিব। সেবক ও সদস্যগণকে মঠ ও আশ্রম পরিচালনের ভার দিলাম। অতঃপর কেহ আমাকে কোনও পত্রাদি লিখিতে পারিবে না। যখন মঠে অথবা বাঙ্গালার কোনও আশ্রমে থাকিব, তখন শিষ্য-ভক্তগণ আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে। সাধারণকে আর পুস্তকের লিখিতমত কোনও জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তরও দিতে পারিব না। আমি এ জীবনের মত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। মঠ ও আশ্রমসমূহ ভবিষ্যতে কি ভাবে পরিচালিত হইবে, সে সম্বন্ধে আগামী মঠের সম্মিলনীতে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

সমাগত ভক্তমণ্ডলী তাঁহার এই নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা পত্রিকাতেও ইহা বিজ্ঞাপিত করিলাম। অতঃপর যদি কাহারও কোনও বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তিনি তাহা মঠে অথবা বিভাগীয় আশ্রমসমূহে পত্র লিখিয়া কিম্বা উপস্থিত হইয়া জানিয়া বুঝিয়া লইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের পুরীধামে অবস্থান কালে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, কিম্বা, তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবেন না, সকলের নিকট আমরা ইহাই আশা করিতেছি।

সংবাদ ও মন্তব্য

—:{*}:—

আশ্রম-সংবাদ

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের বৈশাখের প্রথম ভাগেই হরিদ্বার কুম্ভ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা। হরিদ্বার হইতে আসিয়া তিনি পুরীধামেই অবস্থিতি করিবেন।

আগামী ২১শে বৈশাখ হইতে ২৩শে বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অত্রত্য সারস্বতমঠের বিংশ বার্ষিক মহোৎসব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে এই উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

হেড্ অফিসে ইণ্ডেণ্ট করিয়াও প্রায় তিন সপ্তাহ কাল টিকিট না পাইয়া আমরা ফাল্গুন মাসের পত্রিকা ছাপাইয়া রাখিয়াও যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এ সংবাদ গ্রাহকগণকে জানাইবারও কোনও উপায় ছিল না। বর্ত্তমান সংখ্যায় আর্য্যদর্পণের উনবিংশ বর্ষ শেষ হইল। আগামী-বর্ষের পত্রিকা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অন্যত্র ছাপা হইয়াছে। আমরা তাহার প্রতি গ্রাহকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

—*—

পুস্তক পরিচয়

বৈষ্ণবদাসের নিবেদন

প্রথম খণ্ড, শ্রীরামগোবিন্দ মহান্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত, মূল্য ।৵০। "গ্রাম চন্দ্রপুর, পোঃ লালা, জেলা কাছাড়" এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের ক্রেতাগণ দ্বিতীয় খণ্ড অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন।

অধুনাতন বৈষ্ণব সমাজে যে প্রবল ব্যভিচারের স্রোত বহিতেছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতের পরিপোষক স্বরূপ সাধু ও গোস্বামিগণের উক্তিও ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সমাজের যে কোনও দুষ্ট ব্যধির প্রতীকারকল্পে যিনিই কোনও মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করেন, তিনিই আমাদের ধন্যবাদার্হ। প্রেম ও কামে যে "বহুত অন্তর", গ্রন্থকার আবেগময়ী ভাষায় তাহা বুঝাইয়াছেন। গ্রন্থকারের অধিকাংশ কথাই সাধকের প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু কোন কোনও বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত নহি। "বিশুদ্ধ" ভজন প্রথাকে প্রচারিত করিতে গিয়া সহাজয়া পন্থাকে নির্ব্বিচারে ব্যভিচাররূপে প্রতিপন্ন করা, রাগাত্মিকা পদাবলীর সঙ্কেতিত অর্থ ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক পক্ষে তাহার ব্যাখ্যা করা, পঞ্চ রসিকের সাধন পন্থার রূপক ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি আমরা সমীচীন বোধ করি না। সহজ সাধনের মূলে যে গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা রহিয়াছে, তাহার অপলাপ করা সত্যেরই অপলাপ এবং বাঙ্গালীর গৌরবহানি বলিয়াই আমরা মনে করি। অধিকারভেদ দ্বারা সাধনপন্থাগুলিকে নিষ্কলুষ

রাখিতেই চেষ্টা করিতে হইবে বটে, কিন্তু ব্যভিচার নিবারণ কল্পে সত্যের মূলোচ্ছেদ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

মহারাজা সীতারাম (ঐতিহাসিক নাটক)—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, "পোঃ কুরাঘাট, গোরক্ষপুর" এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামকে ভিত্তি করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নূতন নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়া এবং উপজীব্য চরিত্রসমূহে অভিনব ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিয়া গ্রন্থকার অনেক স্থলে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে সর্ব্বত্র সংযম, শুচিতা ও স্বদেশপ্রাণতার একটা একটানা স্রোত প্রবাহিত। বাঙ্গলার প্রাচীন কীর্ত্তি কাহিনী এইরূপ ভাবে যতই আলোচিত হয়, ততই মঙ্গল। আমরা গ্রন্থকারকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা—১৩৩৪ সাল, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু ও শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত ও কলিকাতা, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট স্বাস্থ্যধর্ম্ম সংঘ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

এই পঞ্জিকাখানির নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা যেরূপ ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিচিত্র বিষয়-সম্ভারে (শুধু বিজ্ঞাপন-সম্ভারে নয়) পূর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে যেরূপ বিরাট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহার উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত। গৃহ পঞ্জিকা বলিতে কি বুঝায়, তাহা এই পঞ্জিকাখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে আছে—অভিনব হর পার্ব্বতীর সংবাদ (স্বাস্থ্য ও সদাচার সম্পর্কে সুললিত পদ্য নিবন্ধ), মানবের দশদশা, গো রোগের চিকিৎসা, কৃষি, ডাকঘরের ব্যাপার, সহজ মুষ্টিযোগ, বিসমার্কের তিনটী বোমা, শরীর চর্চ্চা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা, চিত্রবীথী, বাংলা ও বাঙ্গালীর স্বরূপ, কলিকাতা কর্পোরেশন, প্রসিদ্ধ রেলওয়ে সমূহের মাশুলের পূর্ণ তালিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রচলিত পঞ্জিকাতে এই সমস্ত বিষয় নাই—অথচ উহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই সুবিন্যস্ত আকারে ইহাতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকাকে কিরূপে স্বদেশ-সেবার উপকরণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সংঘ তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—❊—

দানপ্রাপ্তি

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ময়নামতী আশ্রমে—

শ্রীযুক্ত—

ব্রজনাথ দত্ত ৫৲, হরিপদ বিশ্বাস ৫৲, মনীন্দ্রনাথ বসু ৫৲, সুধীরকুমার রায় চৌধুরী ২৲, সূর্য্যকুমার সরকার ১০৲, ললিতমোহন দে ২৲, প্রবীরচন্দ্র দে ৩৲, সতীশচন্দ্র সরকার বিধুভূষণ হোর ১৲, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৲, গোপী প্রামাণিক ১৲, দীনেশচন্দ্র সনাজ্জি ১৲, হরগোবিন্দ সাহা ১৲, প্রভাতচন্দ্র শীল

২৲, এস্, এন্, শর্ম্মা ১৲, এস্. সি, ঘোষ ১৲, এস্. এম্, পাল ১৲, কে, সি, চাটার্জ্জি ১৲, কে, সি, ঘোষাল ‼০, জি, গোপাল রাও ১৲, সারদাপ্রসন্ন মজুমদার ১৲, যতীন্দ্রমোহন সরকার ১৲, এইচ, মণ্ডল ১৲, শ্রীমতী মল্লিকাসুন্দরী ১৲. ডাঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তী ৫৲, ডাঃ কে, বি চাটার্জ্জি ৫৲, ডাঃ ডি, এন্, চৌধুরী ৪৲, রামজনম সিংহ ৮৲, বলদেব সিংহ ৫৲, ডি, ধারী ১৲, পরেশচন্দ্র রায় ১৲, কে, জি, সরকার ১৲, এস্, এন্, সিংহ ২৲, কে, এস্, এম্, আচার্য্য ২৲, ফনীভূষণ সরকার ১৲; অরুণচন্দ্র সিংহ ১৲, রাধাচরণ দাস ১৲, শরৎ-চন্দ্র মিত্র ‼০, এ, কে, ঘোষ, ‼০, ডি, পি, বিশ্বাস ।০, আর, এন, খাসনবিশ ১৲, ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী ‼০, মন্মথনাথ বক্সী ‼০, বসন্ত-কুমার দাস ১৲, ডাঃ কে, সি, দত্ত ৫৲; প্রমোদরঞ্জন ‼০, আর, জি, বিশ্বাস ১৲, এম্, সি, বসু ।০, জে, সি, দত্ত ১৲, এ, কে, নাগ ১৲, এস্, সি, সরকার ২৲, এ, সি, সাহা ১৲, এল্, গিরি ।০, ইউ, এন্, দাস গুপ্ত ২৲, হীরালাল বিশ্বাস ।০, চারুচন্দ্র বসু ১৲, জে, এম্, ঘোষ ১৲, পি, সি, সরকার ৩৲, দি বেঙ্গল এজেন্সী ১৲, ঘোষ ব্রাদার্স ।০, শ্যামা-পদ চক্রবর্ত্তী ‼০, ভোলা মহারাজ ১৲, আশুতোষ দাস ১৲, জি, এম্, মুখার্জ্জি ২৲, এ, আর, মুখার্জ্জি ১৲, আর গুপ্ত ২৲, বি, সি, রায় ১৲, জে, বসাক ১৲, এ, এন্, রায় ১৲, এন, ডি, চক্রবর্ত্তী ‼০, পি, সি, লোধ ‼০, দিজেন্দ্রনাথ ‼০, আর, সি, ভট্টাচার্য্য ১৲, জে, এন্, বসাঠী ‼০, ইউ, এন্, ভট্টাচার্য্য ‼০, সি, ভি, রাও ১৲, হলধর দে ‼০, এম্, বাগচী ১৲, জে, সি, দে ‼০, এল, এম্, দে ‼০, পি, সি, সিংহ ‼০, এ, সি, দত্ত ১৲, এস্, বি, গুপ্ত ২৲, এ, সি, রায় ১৲, এস্, এন্, চাটার্জ্জি ১৲, এ, কে, বানার্জ্জি ‼০, এস্, সি, দাস ২৲, জ্যোতির্ম্মোহন বসু ২৲, ৬১ নং পি রোড ২৲, (সাধারণ হইতে প্রাপ্ত) ১৬৮/০।

পশ্চিম বাঙ্গালা খড়কুশমা আশ্রমে—

শ্রীযুক্ত—

হরিপদ বন্দ্যঘটী ভদ্রকালী মেদিনীপুর ‼০, শ্রীমতী নিস্তারিনী দেবী বাসুদেবপুর মেদিনী-পুর ২‼০, ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী ১‼, হারাধন দলাই ‼০, রাখালচন্দ্র পাল কোতাইগড় মেদিনীপুর ১‼৵১০, মথুরানাথ সিং ঐ ১৲, শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাস কোতাইগড় মেদিনীপুর ।০, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল কোতাইগড় মেদিনীপুর ১৲, মাধবচন্দ্র সৎপতি ঐ মেদিনীপুর ‼০, পুলিন-বিহারী মাইতি ঐ ঐ ২৲, ভুবনচন্দ্র অষ্ট্য কোতাইগড় মেদিনীপুর ।০, নিত্যানন্দ নন্দী বারুইপুর হাওড়া ১৲, রাজেন্দ্রনাথ পাল ধর্ম্মপুর মেদিনীপুর ১৲, সুরেন্দ্রনাথ পাল ঐ মেদিনীপুর ১‼০, বিপিনবিহারী দাস বড়কলঙ্কই মেদিনীপুর ‼০, শ্রীমতী গান্ধারী দাসী বড়কলঙ্কই মেদিনীপুর ১৲, যদুনাথ দে বড়কলঙ্কই মেদিনীপুর ১৲, রাখালচন্দ্র মান্না বড়কলঙ্কই মেদিনীপুর ‼০, বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য ঐ মেদিনীপুর ১৲, ভুবনচন্দ্র মাইতি বড়-কলঙ্কই ঐ ‼০, জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র বসু বড়-কলঙ্কই মেদিনীপুর ১৲, গুণধর সামন্ত সরগেড় ঐ ১৲, কিশোরীমোহন দাস বড়-কলঙ্কই ঐ ।০, শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসী বড়কলঙ্কই মেদিনীপুর ।০, জানকীনাথ মাইতি ঐ মেদিনীপুর ১৲, দীনবন্ধু নন্দী বড়কলঙ্কই মেদিনীপুর ‼০, পিয়ারীলাল মাইতি বড়কলঙ্কই ঐ ।০, ফকিরচন্দ্র মাইতি বড়কলঙ্কই মেদিনী-পুর ১৲, জমিদার রাসবিহারী পাল কোতাই-গড় মেদিনীপুর ১৲, পি, বি, মুখার্জ্জি গিরিডি হাজারিবাগ ১৲, এস্, এন্, বেনার্জ্জি ঐ হাজারিবাগ ১৲, বিশ্বনাথ সরকার ১৲, এককড়ি মুখার্জ্জি ১৲, গগনচন্দ্র মুখার্জ্জি ১৲, আর, সি, শূর ১৲, অক্ষয়কুমার সাহা ১৲, বিমলাকিঙ্কর সাহানা ১৲, সতীশচন্দ্র রায় ১৲, কে, কে, মিত্র ২৲, এন্, এন্, মুখার্জ্জি ১৲, জে, এস্, মল ২৲, প্রমোদকুমার দত্ত ‼০,

মণিমোহন কুণ্ড ॥০, অনিলকুমার সরকার ।৵০, এস্, কে, সেন ॥০, খগেন্দ্রনাথ সাহা ॥০, জগদীশচন্দ্র চৌধুরী ॥০, বেনিয়ার্ড অফিস ষ্টাফ্ ১২৲, হেমচন্দ্র চৌধুরী ধানবাদ ২৲, উকীল বাবু ২॥০, বিনোদলাল মণ্ডল ডাঃ অতুলচন্দ্র রায় কুলটী বৰ্দ্ধমান ২৲, মাষ্টার ষ্টাফ্ কুলটী (এইচ্, ই স্কুল) ২৲ কালীপদ ঘোষ ১৲ গোষ্ঠবিহারী পান ১৲ ধুন্দাবাদ ভক্তবৃন্দ ধুন্দাবাদ ১৩৵০ ষ্টেশন ষ্টাফ্ সিতারামপুর ৬৷৵০ বড়ধেমো কলিয়ারি অফিস ৪৲ সত্যকিঙ্কর চাটার্জ্জি ধেমো মেন কলিয়ারি ১৲ কন্ট্রাক্টার অফিস ॥০ হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি সেন্ড্ডি কলিয়ারি বৰ্দ্ধমান ১৲ ডাঃ পি মুখার্জ্জি ॥০ নিউ বীরভূম কলিয়ারি অফিস ১৷০ ডাঃ পি বেনার্জ্জি মিহিজাম সাঁওতাল পরগণা ১৲ নবকৃষ্ণমণ্ডল সিউলীবাড়ী ঐ ১৷০ কিরণচন্দ্র বসু আসানসোল বৰ্দ্ধমান ২৲ প্রফুল্লকুমার আচার্য্য ঐ বৰ্দ্ধমান ১৲ সোমনাথ বেনার্জ্জি আসানসোল ঐ ১৲ হরিদাস বেনার্জ্জি আসানসোল ঐ সুরেন্দ্রনাথ সেন ডিষ্টিলারি ঐ বৰ্দ্ধমান ১৲ হেরম্বনাথ চক্রবর্ত্তী ডিষ্টিলারি আসানসোল ১৲ (এক্সাইজ সাব্ ইন্‌স্পেক্টর কালীবাবু ও নগেন বাবু) ২৲ মুন্সেফ বাবু ১৲ মাঃ পশুপতি চক্রবর্ত্তী লোকেল বোর্ড ২৲ গিরিশচন্দ্র মণ্ডল কোর্ট আসানসোল বৰ্দ্ধমান ১৲ মাঃ এক্সাইজ হেড ক্লার্ক উদয় বাবু ৫॥৵০ দক্ষিণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যাল হেড্ ক্লার্ক আসানসোল বৰ্দ্ধমান ১৲ পোষ্ট মাষ্টার আসানসোল বৰ্দ্ধমান ॥০ হরিশ্চন্দ্র সেন এঃ সার্জ্জন ১৲ মনোজমোহন রায় আসানসোল বৰ্দ্ধমান ॥০ মণীন্দ্রনাথ বসু আসানসোল বৰ্দ্ধমান ॥০, মাঃ নিহাররঞ্জন নন্দী ২॥০, অতিরিক্ত আদায় ৷৵০, পুওর ফাণ্ড বার্ণপুর ॥০, এম্, ই, স্কুল এম্ এন্ রায় বার্ণপুর বৰ্দ্ধমান ॥০, এল্, এম্, স্বরস্বতী বার্ণপুর বৰ্দ্ধমান ॥০, বি, সি, ঘোষাল বার্ণপুর বৰ্দ্ধমান ॥০, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঐ ॥০, নকুলচন্দ্র মণ্ডল ভোরা বৰ্দ্ধমান ১৲, অতিরিক্ত আদায় বার্ণপুর ১৷৵০।

বর্ষশেষে নিবেদন

শ্রীগুরুর কৃপায় "আর্য্য-দর্পণের" ১৯শ বর্ষ শেষ হইল। বৈশাখ মাস হইতে আর্য্য-দর্পণ ২০শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। বৰ্ত্তমান বৎসরের পত্রিকা বর্ষশেষ হইবার বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ধৰ্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের আনুকূল্যে "আর্য্যদর্পণ" ধীরে ধীরে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—ইহা শ্রীগুরুরই কল্যাণময় আশীর্ব্বাদের ফল। আগামী বর্ষের পত্রিকা আমরা আরও অধিক সংখ্যায় মুদ্রিত করিব, স্থির করিয়াছি। যাঁহারা এ বৎসর গ্রাহক থাকিয়া সনাতন ধর্ম্মপ্রচারে আমাদিগের সহায়তা করিয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা আগামী বর্ষেও গ্রাহক থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। সঙ্ঘাশ্রিত ভক্ত-শিষ্যগণও পত্রিকার প্রচারকল্পে অধিকতর উৎসাহী ও মনোযোগী হইবেন, ইহাও আশা করিতেছি।

বর্ত্তমানে পত্রিকার আকার রয়াল অক্টাভো; আগামী বর্ষ হইতে আমরা ইহাকে ডবল ক্রাউন অক্টোভোতে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে পত্রিকার আয়তন বৃদ্ধি পাইবে—কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না।

এ বৎসরের শেষ কয়েক মাসে নানা দুর্বিপাকে আমরা যথা সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি নাই। সে জন্য আমরা দুঃখিত। আগামীবর্ষের পত্রিকা যাহাতে যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয়, আমরা তাহার আয়োজন করিতেছি। কিন্তু মফঃস্বল হইতে, বিশেষতঃ আমাদের মফঃস্বল হইতে পত্রিকা প্রকাশ করা কিরূপ দুরূহ কার্য্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। এই জন্য কোনও বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। আগামী বর্ষ হইতে কোনও মাসের পত্রিকা নিরূপিত সময়ের পরে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাসেই আমরা তাহা বিজ্ঞাপিত করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে গ্রাহকবর্গ পত্রিকার অপ্রাপ্তির দরুণ উৎকণ্ঠা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিবেন বলিয়া আশা করি।

পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু জানাইতে হইলে অনেকেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করেন না। গ্রাহক নম্বর না দিলে আমাদের তথ্যনির্ণয়ে বড়ই অসুবিধা হয় এবং সে জন্য সকল ক্ষেত্রে আমরা সময়মত পোষ্টাল তদন্তও করিতে পারি না। এ বিষয়ে গ্রাহকগণ অবহিত হইলে বাধিত হইব।

যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনিঅর্ডারযোগে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। ২০শে বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের চতুর্থ সপ্তাহে গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ২০শে বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে তাঁহাদিগের কোনও ক্ষতিই হয় না; কিন্তু আমাদিগকে নিরর্থক ডাকখরচ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকাখানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরত আসিলে আমাদিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা আছে, আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।

